تفسير انوار القرآن

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

১

[১ম থেকে ৫ম পারা পর্যন্ত]

রচনা ও সংকলনে

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

তাফসীরে জালালাইন শরীফের অনুবাদক

লেখক ও সম্পাদক : ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন (১ম খণ্ড)

রচনা ও সংকলনে ◈ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

প্রকাশক ◈ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

শব্দবিন্যাস ◈ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণে ◈ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
২৮/ এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

হাদিয়া ◈ ৫৫০.০০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين. والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد! : فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم - "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون" وقال رحمة للعالمين ﷺ : تركت فيكم امرين ماتمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا : كتاب الله وسنتي -

প্রথমে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি রহমান ও রহীম। যার দয়া অফুরন্ত ও অসীম। যিনি আমাদের উপর আপন অনুগ্রহে বেহিসাব নায-নিয়ামত দান করেছেন। বিশেষ করে অধম কে স্বীয় কালামে পাকের ব্যখ্যাগ্রন্থ 'তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন' রচনার তৌফিক দিয়েছেন।

আম্মা বাদ :

দুনিয়াবি ও উখরবি জিন্দেগিতে মানবতার শাশ্বত মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে বহু নিদর্শনাবলি পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। কখনো বা পৃথিবীবাসীকে অপার দয়া-রহমত আবার কখনো বেদনাদায়ক আজাব-শাস্তির স্বাদ চাখিয়েছেন। কখনো বা নিজ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলির অবলোকন করিয়েছেন। সময়ে সময়ে আদেশ-নিষেধ সম্বলিত সহীফা ও কিতাব অবতারণ করেছেন। এতসব কিছুর লক্ষ্য একটাই, মানুষের বিকার মস্তিষ্কে যেন বোধের উদয় ঘটে। দুনিয়া, নফস ও শয়তানের ফাঁদ এড়িয়ে এক ইলাহে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। মহিয়ান গরিয়ান রাব্বুল আ'লামীনের মানশা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখেরাতে সিদ্ধকাম হতে পারে। কিন্তু কোনটি যে তামাম জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ– তা তো এই নগণ্য জিন ও ইনসান সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়! তাহলে এখন উপায় কী হবে? এরই ধারাবাহিকতায় আখেরি উম্মতের জন্য রাব্বানার পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ অবতীর্ণ করা হয় খোলাচিঠি 'আল-কুরআন'।

এই আল-কুরআনকে বলা হয় আদর্শ জীবন বিধান। এর মাঝে রয়েছে বৈচিত্রময় ও শতবাকধারী জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা। বিশ্বাসগত, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পরিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক– সকল বিষয়ে রয়েছে সর্বযুগের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য মৌলিক নীতিমালা। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি যুগের সমসাময়িক সমস্যার সমাধানও তো কুরআনের মূলনীতি থেকেই উদ্ভাবিত হয়। তাছাড়া কুরআন তেলাওয়াত ও নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও কুরআন ছাড়া শুদ্ধ হয় না। শুধু তাই না কুরআনের অনুকরণ ছাড়া জিন্দেগির সফলতাও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন– 'তোমাদের মাঝে আমি এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা ধরে থাকলে আমার পরে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত।' (মুসনাদে আহমাদ : ৪/৫০)

- বলা বাহুল্য, আমল, আখলাক, কথাবার্তা, চাল-চলন তথা বৈষয়িক জীবনে অনুপম আদর্শে সাহাবায়ে কেরামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের মূল হেতু কিন্তু এই আল কুরআনের অনুধাবন ও অনুকরণ। এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন–

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن

"আমাদের মাঝে কেউ যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি সেগুলোর অর্থ অনুধাবন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ব্যতীত সেগুলোকে অতিক্রম করতেন না। (তাফসীরে তাবারী : ১/ ২৭; বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হিজরি)। সাহাবায়ে কেরাম তো আখেরি নবীর সোহবত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সময়ে সময়ে কুরআনের আয়াত অবতারণের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট আলোকন করেছেন। তার উপর আবার অবোধগম্য বিষয়াবলি নিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা কীভাবে কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করব? সংকীর্ণ মেধাতে ইলাহী কালাম অনুধাবন করার সাধ্য কার? এর প্রেক্ষিতেই তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশ। এর সূচনাটাও হয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে। প্রথমত হযরত মুহাম্মদ ﷺ তো ছিলেন কুরআনেরই জীবন্ত ব্যাখ্যাপুরুষ। তাঁর পবিত্র জীবনে এই কুরআনই তো নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়েছিল। তাই তো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন– 'তিনি তো সাক্ষাৎ কুরআন।' দ্বিতীয়ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআনকে মানুষের সামনে তুলে ধরা তো ছিল রাসূল ﷺ-এর গুরুদায়িত্বসমূহের অন্যতম; এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"আমি তোমার প্রতি এক স্মরণিকা (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন তা তুমি মানুষের জন্য বয়ান তথা ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা : নাহল; আয়াত : ৪৪; পারা : ১৪)

সারকথা, তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমেই সূচিত হয়েছে এবং এটাও উপলব্ধ যে, তাফসীর হলো আল-কুরআনেরই বিশ্লেষিত রূপ। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআনের মর্ম মর্মে অনুধাবন করা অতঃপর তদনুযায়ী অনুকরণ, অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই তো আল্লামা যারকাশী (র.) আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন (১/৩৩) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন-

هو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد ﷺ وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه

অর্থাৎ, এটা এমন এক বিজ্ঞানের নাম, যার দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন, তার অর্থের ব্যাখ্যা ও আয়াতের বিধি-বিধান এবং এর রহস্য জানা যাবে।

আর ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী (র.) আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন (১/১৫-১৬; কায়রো : মাকতাবা ওয়াহাবা; ১৪১৬ হি.) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন– بيان كلام الله أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماته অর্থাৎ, (এটা) আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অথবা এটা কুরআনের শব্দমালা ও ভাবসমূহের সুস্পষ্টকারী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানব জীবনে দু'জাহানের শান্তি-সুখ ও সফলতা লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আল-কুরআনের, ঠিক তেমনি কুরআন অনুধাবনের জন্য তাফসীর শাস্ত্রে প্রয়োজন।

- ইসলামিয়া কুতুবখানা -এর উদ্যোগে ইতঃপূর্বে আনওয়ারুল কুরআন নামক পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সূরা বাকারা, নিসা, মায়িদা, আন'আম, আ'রাফ, আনফাল ও তাওবা -এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু সূরার সরল অনুবাদ, শাব্দিক অনুবাদ, ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং শানে নুযূলসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এর আঙ্গিকে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছিল। সহজ ও সরল পাঠে প্রয়োজনীয় তবে নির্ভুল তত্ত্বে উপস্থাপিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আনওয়ারুল কুরআন পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাদের আকৃতি, হৃদয়ের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুরআনের একটি যুগোপযোগী তাফসীর গ্রন্থ রচনার বিষয়টি সামনে আসে। এরই প্রেক্ষিতে ইসলামিয়া কুতুবখানার সত্ত্বাধিকারী আলহাজ্জ মাওলানা মোস্তফা সাহেব (দা. বা.) কুরআনের খেদমত করার মনস্থ করত আমাকে আনওয়ারুল কুরআনের আদলে একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানান। কিন্তু কুরআনের এত বড় খেদমত

করতে গিয়ে না জানি কলঙ্কের ছোঁয়া লাগে– এই ভয়ে আমি অনুরোধে সাড়া দিচ্ছিলাম না। কিন্তু মাওলানা সাহেবও খেদমত করার সুযোগ হাতছাড়া করার ব্যক্তি নন। অবশেষে তাঁর অনুরোধকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানালাম। মূলত তাঁর দিলের তড়পেই আমি এ খেদমতে হাত লাগালাম। তাফসীর গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আনওয়ারুল কুরআনের রচনা কাঠামোর আলোকে রচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আশরাফ আলী থানবী (র.) -এর তরজমার অনুকরণ করা হয়েছে। এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইদ্রিস কান্দেলভী (র.) এর মা'আরিফুল কুরআন কে অনুসরণ করা হয়েছে। আর তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) -এর মা'আরিফুল কুরআনকে সামনে রাখা হয়েছে। এছাড়াও তাফসীরে নূরুল কুরআন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী, ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাজহারীর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনাও সমভাবে উপাস্ত হয়েছে। দীর্ঘদিনের মেহনতের বদৌলতে তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন আজ প্রকাশের পথে, তাই এ আনন্দঘন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি পাবলিকেশনের জগতে অনুকরণীয় আদর্শ আলেমে দীন আলহাজ মাওলানা মোস্তাফা সাহেব (দা. বা.) -এর জন্য দোয়া করি– 'আল্লাহ! হযরতকে সিহহাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর সমস্ত দীনি খেদমত ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন।' এবং যারা আমাকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা, মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করি– 'হে আল্লাহ! তাদেরকে উত্তম জাযা ও খায়ের দান করুন এবং এই তাফসীর গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে সর্বস্তরের পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে কবুল করে নিন।' পরিশেষে কবিতার চরণে ইতি টানছি–

ওফাতের পরে আমি, জাহানের একক স্বামী,
তোমারি আদালতে, হাজির হব যবে।
হিসেবের খাতায় লিখে, রেখো গো যতন করে,
অধমের গ্রন্থখানি, হে দয়াময়! তবে।

মোহাম্মাদ আবুল কালাম মাসূম
৪১১দক্ষিণ, মনিপুর
মিরপুর, ঢাকা
২৩/০৭/২০১৩ ইং
১৩ রমাজানুল মুবারক

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায়
এ আনওয়ারুল কুরআনটি আলোর মুখ দেখেছে

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

মাওলানা মোহাম্মদ আনওয়ারুল হক
সিনিয়র সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

মাওলানা আব্দুল আলীম
উস্তাদ, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইদারাতুল উলূম, আফতাব নগর, ঢাকা

মাওলানা মোহাম্মদ আকবর হুসাইন
ফাযেলে দারুল উলূম হাটহাজারী চট্টগ্রাম।

মাওলানা রফিকুল ইসলাম সিরাজী
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
সাবেক উস্তাদ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

মাওলানা মোহাম্মদ মাহমূদ হাসান
উস্তাদ, মাদরাসা উলূমে শরী'আহ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

মাওলানা মোহাম্মদ এনামুল হাসান
উস্তাদ, মাদরাসা নূরুল কুরআন, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।

মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মোহাম্মাদিয়া মোহাম্মদনগর, ঢাকা।

মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান
ফাযেলে দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।

মাওলানা মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান
ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা

মাওলানা হাফেজ ইমাম উদ্দীন
ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা

মাওলানা মোহাম্মদ মোবারক হুসাইন
সাবেক শিক্ষক, আল ফারুক ইসলামিয়া একাডেমি চাটখিল, নোয়াখালী

সূচিপত্র

কুরআন পরিচিতি

কুরআন কি?

কুরআন বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ ও মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মানব জাতির পথনির্দেশের জন্য প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এটি মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মূল উৎস। পবিত্র কুরআনের উপরেই ইসলামের পরিপূর্ণ কাঠামো ভিত্তিশীল। ইসলামের মূলনীতি ও নিয়ম কানুন সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনায় কুরআনপাক চূড়ান্ত দলিল বলে স্বীকৃত। আল্লাহ তা'আলার আদেশে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট প্রেরিত নির্দেশাবলির সংকলনই হচ্ছে– 'কুরআন'।

'কুরআন' শব্দের আভিধানিক অর্থ : আরবি কুরআন (قُرْاٰنٌ) শব্দটি قَرَأَ يَقْرَأُ -এর ক্রিয়া মূল (مَصْدَرٌ)। সে হিসেবে قُرْاٰنٌ অর্থ পাঠ করা। শব্দটি مَفْعُوْلٌ তথা مَقْرُوْءٌ [পঠিত] অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই একে কুরআন (قُرْاٰنٌ) বলে নামকরণ করা হয়েছে।

কুরআনের পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় কুরআনের সংজ্ঞা হলো নিম্নরূপ–

اَلْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ۔

অর্থাৎ, কুরআন ঐ কিতাবকে বলা হয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি নাজিল করা হয়েছিল এবং যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যা "তাওয়াতুর" (تَوَاتُرٌ) -এর সাথে অর্থাৎ, সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে। –[নূরুল আনওয়ার, পৃ. ৯ ও ১০]

নামকরণ : কুরআন মানে পাঠ, পাঠ করা হয়েছে বা পঠিত। যেহেতু কুরআন অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এক সাথে অবতীর্ণ হয়নি; বরং পূর্ণ ২৩ [তেইশ] বৎসরে আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁরই নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট প্রয়োজন অনুসারে পাঠ করে শুনিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা মানুষকে পাঠ করে শুনিয়েছেন, যা অদ্যাবধি মানুষ পাঠ করছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পাঠ করতে থাকবে। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে 'কুরআন'।

কুরআন মাজীদের নামসমূহ :

১. اَلْقُرْاٰنُ : ইরশাদ হয়েছে– نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ـ

এরূপভাবে কুরআন মাজীদের আরো ৬৫ স্থানে এই قُرْاٰن কুরআন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২. اَلْكِتَابُ : ইরশাদ হয়েছে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا

৩. اَلذِّكْرُ : ইরশাদ হয়েছে– اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

৪. اَلْفُرْقَانُ বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। যথা– هُوَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ

৫. اَلنِّعْمَةُ বা নিয়ামত, বিশেষ দান। যথা– وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ

৬. كَلَامُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বাণী। যথা– حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ

৭. اَلنُّوْرُ বা আলোকবর্তিকা। যথা– وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

৮. اَلْكَرِيْمُ বা সম্মানিত। যথা– اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ

৯. اَلْحِكْمَةُ বা তত্ত্বজ্ঞান। যথা– وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

১০. اَلْحُكْمُ বা বিচার। যথা– أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ

১১. اَلصِّرَاطُ বা পথ। যথা– وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا

১২. اَلْحَقُّ বা সত্য, সঠিক। যথা– إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ

১৩. اَلتَّنْزِيْلُ বা প্রত্যাদেশ, অবতীর্ণ। যথা– إِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

১৪. اَلْمَوْعِظَةُ বা উপদেশ বা নসিহত। যথা– قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

১৫. اَحْسَنُ الْحَدِيْثِ বা সর্বোত্তম বাণী। যথা– اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ

১৬. اَلْهُدٰى বা হেদায়েত, পথ প্রদর্শক। যথা– هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

১৭. اَلرُّوْحُ বা আত্মা। যথা– يُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهٖ

১৮. اَلشِّفَاءُ বা নিরাময়কারী। যথা– وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ

১৯. اَلْعِلْمُ বা জ্ঞান। যথা– مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

২০. اَلْحَبْلُ বা রশি। যথা– وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

২১. اَلْاَمْرُ বা আদেশ। যথা– ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَهٗ إِلَيْكُمْ ;

২২. اَلْمُبِيْنُ বা প্রকাশ্যমান। যথা– حٰمٓ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ

২৩. اَلرَّحْمَةُ বা দয়া, করুণা। যথা– وَرَحْمَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

২৪. اَلْوَحْيُ বা প্রত্যাদেশ। যথা– إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ

২৫. اَلْبَشِيْرُ বা সুসংবাদদাতা। যথা– بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ

২৬. اَلنَّذِيْرُ বা ভয় প্রদর্শনকারী। যথা– اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

২৭. اَلْعَزِيْزُ বা মহাপরাক্রমশালী। যথা– وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ

২৮. اَلْقَوْلُ বা কথা। যথা– اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ

২৯. اَلْمُكَرَّمَةُ বা সম্মানিত। যথা– فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ

কুরআন অবতরণের সময় ও পদ্ধতি

মহাগ্রন্থ 'কুরআন' নিছক একটি ধর্মগ্রন্থ নয়; বরং এটা মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থা সম্বলিত একটি ঐশী গ্রন্থ। কুরআনপাক লাওহে মাহফূযে সুরক্ষিত। এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ অর্থাৎ, বরং এ মহিমান্বিত কুরআন লাওহে মাহফূযে সুরক্ষিত। লাওহে মাহফূয হতে পবিত্র রমজান মাসে 'লায়লাতুল কদর' বা মহিমান্বিত রাতে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কুরআন পৃথিবীর প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ওহীর মাধ্যমে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হতো।

ওহীর অর্থ : ওহী শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– গোপনে সংবাদ দেওয়া। অন্তঃকরণে কোনো ভাব সৃষ্টি এবং ইঙ্গিত দান করাকেও ওহী বলে।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ওহী হচ্ছে– هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى أَنْبِيَائِهٖ অর্থাৎ, নবীদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতারিত বাণীকে ওহী বলে।

ওহীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর পৃথিবী হলো মানব জাতির জন্য পরীক্ষাগার। কেননা এখানে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি উপভোগে তাঁরই ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং আদেশ-নিষেধের অনুসরণে সাবধানে চলতে হয়। আল্লাহর খলিফা হিসেবে তাকে পৃথিবীর মোহাচ্ছন্নতা ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে দূরে থাকতে হয়, তাই তাকে জানতে হয় কোনটি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ এবং কোনটিতে রয়েছে তাঁর অসন্তুষ্টি। মানুষ সাধারণত তিনটি মাধ্যমে কোনো কিছু জানতে পারে। যথা– ১. পঞ্চেন্দ্রিয়, ২. জ্ঞান ও ৩. ওহীর মাধ্যমে পঞ্চেন্দ্রিয় ও জ্ঞানের মাধ্যমে যা জানা যায় তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা কোনটি তার চলার সঠিক পথ, কোনটি সুখ-শান্তি ও কল্যাণের পথ, কোনটি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পথ তা সে পরিপূর্ণভাবে জানতে সক্ষম হয় না। তাই সিরাতে মুস্তাকীমের নির্দেশনা পেতে হলে তাকে ওহীর জ্ঞান জানা অত্যাবশ্যক। কেননা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সীমা যেখানে শেষ সেখানেই ওহীর জ্ঞানের শুরু। বিবেকবুদ্ধি ও যুক্তি যেখানে এসে তিমিরাচ্ছন্নতায় থমকে দাঁড়ায় ওহী সেখানে আলোর পথ দেখায়। ওহী অস্বীকার করা আল্লাহকে অস্বীকার করার নামান্তর। তাই পৃথিবীর পরীক্ষাগার হতে উত্তীর্ণ হয়ে মানযিলে মাকসূদে পৌঁছতে হলে ওহীর জ্ঞান অপরিহার্য।

ওহীর প্রকারভেদ

ওহী বা ঐশী প্রত্যাদেশ সাধাণত দুই প্রকার। যথা– ১. ওহীয়ে মাতলূ বা পঠিত ওহী ২.ওহীয়ে গায়রে মাতলূ বা অপঠিত ওহী। যে ওহীর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাকে ওহীয়ে মাতলূ বলে। আর যে ওহীর মর্মার্থ আল্লাহর, কিন্তু ভাষা রাসূল ﷺ-এর তাকে ওহীয়ে গায়রে মাতলূ বলে। তাই পবিত্র কুরআন হলো ওহীয়ে মাতলূ এবং হাদীস শরীফ বা সুন্নাহ হলো ওহীয়ে গায়রে মাতলূ।

ওহী অবতরণের পদ্ধতি

সত্যের জ্ঞানের প্রধান উৎস ওহী। আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -এর উপর বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ওহী অবতীর্ণ করেছেন। হাদীশাস্ত্র পর্যালোচনা করে ওহী অবতরণের যে সকল পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে–

(১) ঘণ্টাধ্বনির মতো এক ধরনের ওহী। ঘণ্টা যেমন বিরতিহীনভাবে বাজতে থাকে, ওহী-এর ঘণ্টাও তেমনি। এ ধরনের ওহী নাজিল হলে রাসূল ﷺ অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করতেন, ওহী নাজিলের সকল পদ্ধতির মধ্যে এটিই ছিল সর্বাধিক কষ্টকর।

(২) কখনো কখনো রাসূল ﷺ-এর ঘুমন্ত বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ওহী নাজিল হতো। আর রাসূল ﷺ-এর স্বপ্ন সাধারণ লোকের জাগ্রত অবস্থায় বাস্তব ঘটনা স্বচক্ষে দেখার চেয়েও সত্য।

(৩) কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ.) মানুষের আকৃতিতে ওহী নিয়ে আসতেন। যেমন– রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– হযরত জিবরাঈল (আ.) অধিকাংশ সময় হযরত দিহইয়াতুল কালবী (প্রখ্যাত সাহাবী)-এর আকৃতিতে আমার নিকট ওহী নিয়ে আসতেন

(৪) কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে ওহী নিয়ে আসতেন।

(৫) কোনো কোনো সময় পর্দার আড়াল হতে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কথা বলেছেন। এ প্রকারের ওহীতে তাঁদের মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী ছিল না।

(৬) মাঝে মাঝে রাসূল ﷺ -এর অন্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে সরাসরি ওহীর উদয় হতো। রাসূল ﷺ আল্লাহ প্রদত্ত এ ওহীকে তাঁর নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করতেন।

(৭) হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর সাথে রাসূল ﷺ কথা বলতেন। এ পদ্ধতিতে মি'রাজের রাতে মহানবী ﷺ ওহী লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া কোনো কোনো সময় হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে হযরত ইসরাফীল (আ.) ও মহানবী ﷺ-এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।

ওহী লেখকদের নাম

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওহী লেখার কাজ যাঁরা আঞ্জাম দিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা কোনো কোনো মুফাসসির চল্লিশ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত যুবায়ের, হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা, আমর ইবনে আস, উবাই ইবনে রাবী, মুগীরা ইবনে শু'বা, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ, সাঈদ ইবনে আস, মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান, যায়েদ ইবনে সাবেত, তালহা ইবনে ওবায়দিল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, মু'আইকিব দাউসী, হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান ও হুয়াইতিব ইবনে আবদিল ওজ্জা (র.)।

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ইতিহাস : কুরআন মাজীদ মূলত আল্লাহর কালাম। এজন্য যে কুরআন কারীম লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ছিল। যেমন– কুরআনে আছে– بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ "বরং এটাতো সম্মানিত কিতাব যা লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত" অতঃপর বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী পুরো কুরআনে কারীমকে কদরের রজনীতে লাওহে মাহফূয থেকে প্রথম আকাশে বায়তুল ইজ্জত নামক ঘরে অবতীর্ণ করা হয়। বাইতুল ইজ্জতকে বাইতুল মা'মূরও বলে, যা কা'বা শরীফের ঠিক বরাবর প্রথম আসমানে অবস্থিত। এটি ফেরেশতাদের ইবাদতগাহ। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) বাইতুল ইজ্জত থেকে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হতেন। যার ধারাবাহিকতা ২৩ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে।

কুরআন সংকলন করা ও তার হেফাজতের ইতিহাস

এ কুরআন কারীম লিখে একত্র করা হয়েছে প্রথমবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে। দ্বিতীয়বার হযরত আবূ বকর (রা.) -এর যুগে। তৃতীয়বার হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে।

রাসূলের যুগে কুরআন হেফাজতের পদ্ধতি : কুরআন কারীম যেহেতু একসাথে অবতীর্ণ হয়নি; বরং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই কিতাব আকারে লি'খ সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। তাই রাসূল ﷺ-এর সময়ে কুরআন কারীমের হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য কুরআনে কারীম মুখস্ত করে নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। প্রাথমিক পর্যায়ে যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন রাসূল ﷺ সাথে সাথে তা বার বার পড়তে থাকতেন, যাতে করে মুখস্থ হয়ে যায়। এ কারণে সূরায়ে কিয়ামায় আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে বলেন, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় কুরআন মুখস্থ করার জন্য বারবার পড়ার দরকার নেই; বরং আমি নিজেই তা মুখস্থ করিয়ে দিব, এবং আপনার হৃদয়ে গেঁথে দিব। অর্থাৎ, আপনাকে এমন মুখস্থ শক্তি দান করা হবে যে, একবার ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি তা কখনো ভুলবেন না। সুতরাং তাই হলো। একদিকে রাসূল ﷺ-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতো, অন্য দিকে রাসূল ﷺ-এর তা মুখস্থ হয়ে যেত এভাবে রাসূল ﷺ-এর পবিত্র সীনা মুবারকে পুরা কুরআনে কারীম সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। আর রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন কারীম মুখস্থ করিয়ে দিতেন। কুরআন মুখস্থ করার উৎসাহ উদ্দীপনা এমন ছিল যে, কোনো কোনো মহিলা নিজের স্বামীর কাছ থেকে মহর গ্রহণ করার পরিবর্তে কুরআন কারীম মুখস্থ করিয়ে দেওয়াকেই মহর হিসেবে গ্রহণ করতেন। শতশত সাহাবায়ে কেরাম তাদের জিন্দেগী কুরআন কারীমের পিছনে বিলীন করে দিয়েছেন। হযরত উবাদা (রা.) বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি হিজরত করে মদিনায় আসত তখন তাকে রাসূল ﷺ আমাদের একজনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন কুরআন শিখিয়ে দেওয়ার জন্য, এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম -এর এক বিশাল জামাত কুরআন কারীমের হাফেজ হয়ে গেলেন। যাঁদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ছাড়াও হযরত তালহা, হযরত সা'আদ, হুযায়ফা, সালিম, আবূ হুরায়রা, আমর ইবনে আস, কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালামা (রা.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুরআন কারীমকে হেফজ করা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ তা লেখকদের মাধ্যমে লিখিয়ে রাখতেন। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর ওহী লেখার কাজ করতাম। এছাড়া খেলাফায়ে রাশেদীন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত হোযায়ফা, হযরত মুয়াবিয়া ইবনে সুফিয়ান, হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা, হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ, হযরত ছাবেত ইবনে কায়েস, হযরত শুরাহবীল ও হাসানা (রা.)-এর নাম কাতেবে ওহী হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। হযরত উসমান (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর অভ্যাস ছিল, যখন কুরআনের কোনো আয়াত নাজিল করা হতো তখন তিনি কাতেবে ওহীদেরকে বলতেন, যে এই আয়াতটিকে অমুক পারার অমুক সূরার অমুক আয়াতের সাথে লেখ। সেই যুগে আরবদের নিকট যেহেতু কাগজের প্রচলন খুবই কম ছিল। এ কারণে কুরআনে কারীমের বেশির ভাগ আয়াত পাথরের উপর, চামড়ার উপর, খেজুর গাছের খোলের উপর, বাঁশের উপর এবং জানোয়ারের হাড়ের উপর লেখা হতো। এভাবে রাসূল ﷺ-এর জমানাতেই রাসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে কুরআনে কারীমের একটি খণ্ড লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। যদিও তা পুস্তক আকারে বিন্যস্ত ছিল না।

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর যুগে কুরআনের সংকলন

যেহেতু রাসূল ﷺ-এর জমানায় কুরআন কারীম কিতাব আকারে সংকলিত ছিল না এবং সাদা পাথরের টুকরায়, চামড়ার উপর, বাঁশের উপর এবং খেজুর গাছের ডালের মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল তাই ঐ সময় কুরআন কারীম হেফাজত করতে বেশি নির্ভর করা হতো হাফেজে কুরআনদের উপর। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফত কালে যখন নবুয়তের মিথ্যাদাবিদার مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ [মুসাইলাতুল কায্যাব]-এর বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হলো, তখন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক সাহাবী শহীদ হলেন। যার মধ্যে ৭০ জন্য হাফেজে কুরআন সাহাবীও ছিলেন।

হাফেজ সাহাবীদের শহাদাতের কারণে হযরত ওমর (রা.) এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, যদি এভাবে হাফেজ সাহাবীরা শহীদ হতে থাকেন তাহলে কুরআনের বিরাট একটি অংশ আমাদের থেকে হাত ছাড়া হয়ে যাবে। অতএব কুরআন এভাবে শুধু হেফজের উপরে ছেড়ে দেওয়া যায় না; বরং পুরা কুরআনে কারীমকে গ্রন্থাকারে নিয়ে আসা উচিত। তাই তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট ব্যাখ্যা ভিত্তিক প্রস্তাব পেশ করলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন,

"আমি এমন কাজ করব না যা রাসূল ﷺ করেননি।" কিন্তু হযরত ওমর (রা.) বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন এবং উক্ত কাজটির উপকারিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে ভালোভাবে বুঝাতে লাগলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বরাবরই তা প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রা.) অনেক ভেবে চিন্তে হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, এবং বললেন–

شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ عَلٰى مَا قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ "ওমরের প্রস্তাবের উপর আল্লাহ আমার দিলকে খুলে দিলেন।" অর্থাৎ, ওমরের প্রস্তাবের যথার্থতা আল্লাহ আমার দিলে ঢেলে দিলেন। অতএব হযরত ওমর (রা.)-এর যে অভিপ্রায় আমারও সেই অভিপ্রায়। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাবে একমত হয়ে গেলেন। অতঃপর এ কাজের জন্য كَاتِبُ الْوَحْىِ [ওহী লেখক] হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-কে দায়িত্ব দেওয়া হলো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যয়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-কে ডেকে বললেন, হে যায়েদ! তুমি একজন যুবক, বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষ। তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ওহী লেখার গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছ। অতএব তুমি কুরআনে কারীমের আয়াতগুলো সংগ্রহ করে জমা করে দাও। হযরত যায়েদ (রা.) -ও এই প্রস্তাবকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ন্যায় প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু তাঁদের উভয়ের পীড়াপীড়িতে অবশেষে এ গুরুদায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নেন।

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) কিভাবে কুরআন মাজীদ সংকলন করেছিলেন?

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) নিজে হাফেজ ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে নিজে নিজের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে পুরা কুরআন লিখতে পারতেন। এছাড়া শত শত হাফেজে কুরআন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলকে নিয়ে কুরআন মাজীদ লিখতে পারতেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যে নুসখা লেখা ছিল হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) ঐ নুসখার দ্বারা পুরা কুরআন সংকলন করতে পারতেন; কিন্তু তিনি সতর্কতা অবলম্বন করে কোনো একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেননি; বরং তিনি সমস্ত পদ্ধতিকে সামনে রেখে কুরআনে কারীম সংকলন করেছেন। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) তার নুসখার মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো আয়াত লিখতেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত আয়াতটি مُتَوَاتِرْ হওয়ার উপরে মৌখিক কিংবা লিখিত সাক্ষী না পাওয়া যেত। তাছাড়া রাসূল ﷺ-এর যুগে যে নুসখা লেখা হয়েছিল তা বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) সে সমস্ত নুসখাকে একত্র করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁর কাছে যতটুকু কুরআন কারীম ছিল, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত সেগুলোকে একত্র করে নিলেন। যখন কোনো সাহাবী তাঁর কাছে কোনো লিখিত আয়াত নিয়ে আসতেন, তখন তিনি তা চার পদ্ধতিতে যাচাই করতেন।

১. সর্বপ্রথম তিনি দেখতেন তিনি যেভাবে মুখস্থ করেছেন তার সাথে মিল আছে কিনা?
২. অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটি হযরত ওমর (রা.) কে দিয়ে সত্যায়ন করাতেন। কারণ হযরত ওমর (রা.) হাফেজ ছিলেন।
৩. লিখিত কোনো আয়াতকে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এ আয়াতের সত্যায়নের উপর দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সাক্ষ্য না দিত যে, তা রাসূলের সামনেই লেখা হয়েছিল।
৪. অতঃপর সে আয়াতকে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের লিখিত আয়াতের সাথে মিলানো হতো। এভাবে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কুরআনের একটি নুসখা তৈরি করলেন, কিন্তু নুসখাটির আয়াতগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তারতীব অনুযায়ী লিখা হলেও সূরাগুলো রাসূল ﷺ-এর তারতীব অনুযায়ী বিন্যস্ত ছিল না এবং এ নুসখার মধ্যে কুরআনের সাত কেরাতকেও জমা করা হয়েছিল। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর প্রস্তুতকৃত নুসখাটি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট ছিল, তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট ছিল এবং তাঁর ইন্তেকালের পর উম্মুলমুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট রাখা ছিল, তাঁর ইন্তেকালের পর মারওয়ান ইবনে হাকাম সেই নুসখাটি বিলুপ্ত করে দেন। কারণ, তখন হযরত উসমান (রা.)-এর তৈরিকৃত নুসখাই চলছিল।

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে কুরআন সংকলন

যখন হযরত উসমান (রা.) খলিফা হলেন তখন ইসলাম আরব থেকে রুম ও ইরান পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। এ দিকে আজারবাইজান, খোরাসান, বুখারা, সমরকান্দ, তাশখন্দ, তুর্কিস্থান, উজবেকিস্তান, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, কাযাকিস্তান, কিরগিজিস্তান, সিজিস্তান, তাজিকিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান মুসলমানরা জয় করতে লাগল এবং এসব এলাকার লোকেরা যখন মুসলমান হতে লাগল তখন তারা বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম থেকে বিভিন্ন কেরাত অনুযায়ী কুরআন শিখতে লাগল, আর প্রত্যেক সাহাবী তার শাগরেদকে ঐ কেরাত অনুযায়ী কুরআন পড়াতেন যে কেরাত তিনি নিজে রাসূল ﷺ-এর কাছে পড়েছেন। এভাবে কেরাতগুলোর إِخْتِلَافْ দূর দূরান্তে পৌছে গেল। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ বিষয়ে অবগত ছিল যে, কুরআন সাত কেরাতের উপর নাজিল হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাঝে কেরাতের ভিন্নতার কারণে কোনো প্রকারের সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। পরবর্তীতে কেরাতের ভিন্নতা যখন দূর দূরান্তে পৌছে গেল এবং লোকেরা কুরআন সাত কেরাতের উপর অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে অবগত ছিল না বিধায় তাদের মাঝে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে গেল, তখন কিছু লোক নিজের কেরাতকে সহীহ এবং অন্যের কেরাতকে ভুল বলতে লাগল। এ ঝগড়ার দ্বারা লোকেরা একদিকে

কুরআনের مُتَوَاتِرْ তথা ধারাবাহিক কেরাতগুলোকে ভুল গণা করার অপরাধে লিপ্ত হতে লাগল। অন্য দিকে তা যাচাই করার মতো কোনো সুযোগও ছিল না। কারণ হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর প্রস্তুতকৃত নুসখা শুধু মদিনাতেই ছিল। এছাড়া কুরআনের নির্ভরযোগ্য কোনো নুসখা ছিল না।

শামের লোকেরা উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কেরাত অনুযায়ী কুরআন পড়ত আর ইরাকের লোকেরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর কেরাত অনুযায়ী কুরআন পড়ত। যেহেতু শামের লোকেরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কেরাতের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিল, সে কারণে তারা ইরাকের লোকদেরকে কাফের বলতে লাগল। মদিনাতেও এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হতে লাগল। এ পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উসমান (রা.) বড় বড় সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে পরামর্শ করলেন। পরামর্শে এ সিদ্ধান্ত হলো যে, সকলে মিলে কুরআনের এমন একটি নুসখা তৈরি করবে যা সকলে পড়বে ও পড়াবে এবং সাত লুগাতের ছয় লুগাতকেই বাদ দিয়ে শুধু লুগাতে কোরাইশের উপরই কুরআনকে সংকলন করা হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত উসমান (রা.) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং অন্যান্য জলীলুল কদর সাহাবীদেরকে নিয়ে একটি টিম গঠন করলেন এবং তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন যে, হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে রাখা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর প্রস্তুতকৃত নুসখা থেকে এমন একটি নুসখা তৈরি করবে যার মধ্যে সূরাগুলো সঠিক ধারাবাহিকতায় থাকবে এবং কুরআন শুধু লুগাতে কুরাইশের উপরই বহাল থাকবে। এভাবে কুরআনের একটি কপি তৈরি হলো।

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে কুরআনের তৈরি নুসখার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে প্রস্তুতকৃত নুসখার মধ্যে সূরাগুলো তারতীব অনুযায়ী ছিল। যা হযরত আবূ বরক সিদ্দীক (রা.)-এর জমানায় প্রস্তুতকৃত নুসখার মধ্যে ছিল না।

২. কুরআন কারীমের আয়াতগুলো এমন এক তারতীবে লেখা ছিল যে, লেখার ভিতরে কোনো হরফের নুকতাও ছিল না, এমনকি যের, যবর ও পেশ কিছুই ছিল না।

৩. হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে প্রস্তুতকৃত নুসখাটি পুরো উম্মতের সম্মিলিত সত্যায়নের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছিল। উক্ত নুসখার সংখ্যা ছিল ৫টি, আবার কেউ কেউ বলেন ৭টি। ৭টি নুসখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো–

১. একটি নুসখা মক্কায়, এ নুসখাটি ৬৫৭ হিজরি পর্যন্ত মক্কায় ছিল। মা'মার ইবনে জুবায়ের আন্দালুসী ৫৭৯ হিজরিতে তা দর্শন করেছিলেন। আল্লামা শিবলী নুমানী (র.) লিখেন, যে যুগে তিনি সফর করেছিলেন, তখন এ নুসখাটি জামে দিমাশক-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কাশশাফুল মাহদি ১৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, সুলতান আব্দুল হামিদ খান যিনি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় আসীন ছিলেন এবং আনুমানিক ৩০ বৎসর পর্যন্ত ক্ষমতা পরিচালনা করেন, তাঁর যুগে একবার মসজিদে জামে দিমাশকে আগুন লেগে যায়, তখন ঐ নুসখাটি পুড়ে যায়।

২. একটি নুসখা ছিল শামে, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আল্লামা আহমদ মুকরী ৩৭৫ হিজরিতে এ নুসখাটি দর্শন করেছিলেন। এ নুসখাটি পরে সালাতীনে আন্দালুস, অতঃপর সালাতীনে মুহিদ্দীন অতঃপর সালাতীনে বনী মুরীনের হস্তগত হয় এবং জামে কুরতুবার মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। পরবর্তীতে কুরতুবাবাসী এ নুসখাটি সুলতান আব্দুল মুমিনকে দিয়ে দেন। পরবর্তীতে আব্দুল মুমিনের নির্দেশে ইবনে শাকুরী রাজধানী মারাকেশে নিয়ে যান। সম্ভবত স্থানান্তরটি ১১ শাওয়াল ৫৫২ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। ৬৪৫ হিজরিতে খলিফা মুতাযিদ আলী ইবনে মামুনের কাছে ছিল। ঐ বৎসর খলিফা তালেমান আক্রমণ করেন। ঐ যুদ্ধে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং যুদ্ধের মধ্যে নুসখাটি হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে যেকোনোভাবে নুসখাটি তালেমানের শাহী খাজানায় পাওয়া যায় সেখান থেকে একজন ব্যবসায়ী ক্রয় করে পাছ শহরে নিয়ে আসেন যা এখনো পাছের মধ্যেই আছে।

৩. একটি নুসখা ছিল ইয়েমেনে, ঐতিহাসিকদের মতে এ নুসখাটি মিশরের কুতুবখানা জামে কায়রোর মধ্যে রয়েছে।

৪. একটি নুসখা ছিল বাহরাইনে, ঐতিহাসিকদের মতে এ নুসখাটি ফ্রান্সের কুতুবখানায় রয়েছে।
৫. একটি নুসখা ছিল বসরায় এ নুসখাটি মিশরের খাদিও নামক কুতুবখানায় ছিল তা সুলতান সালাউদ্দিন আইউবীর উজির ৫৭৫ হিজরিতে ৩০ হাজার আশরাফী দিয়ে ক্রয় করে নেন।
৬. একটি নুসখা ছিল কুফায়, এ নুসখাটি কুস্তুনতুনিয়ার কুতুবখানায় রয়েছে।
৭. একটি নুসখা ছিল মদিনায়। এই নুসখাটি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট ছিল। পরে হযরত আলী (রা.)-এর হস্তগত হয়। হযরত আলী (রা.)-এর পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খলিফা হওয়ার পর তার হস্তগত হয়। সেখান থেকে আন্দালুস চলে যায়। সেখান থেকে মারাকেশের রাজধানী পাছে চলে যায়। সেখান থেকে আবার মদিনায় ফিরে আসে। প্রথম মহাযুদ্ধে গভর্নর ফখরী পাসা অন্যান্য বরকতময় জিনিসের সাথে এ নুসখাটি কুস্তুনতুনিয়ায় নিয়ে যান। এখনো সেখানে আছে বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এছাড়া হযরত উসমান (রা.)-এর আরো ৩টি নুসখা ছিল একটি কায়রোর জামে সাইয়েদিনা হুসাইন (রা.)-এর মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয়টি জামেয়া মিল্লিয়া দিল্লিতে ছিল। যদি ভারত বিভক্তির সময় নষ্ট বা ধ্বংস না হয়ে থাকে তাহলে এখনো থাকতে পারে। তৃতীয়টি ইণ্ডিয়া অফিস লন্ডন কুতুবখানায় রয়েছে। তার উপর লেখা ছিল কাতাবাহু উসমান ইবনে আফ্ফান। এ নুসখাটি মোগল সম্রাটের কাছে ছিল। তার উপর বাদশাহ আকবর এর সিল মোহর লাগানো আছে। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মেজর রাওনাস তার সন্ধান পান। পরে তিনি তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুতুবখানায় দিয়ে দেন। এটি এখনো ইণ্ডিয়া অফিসের কুতুবখানায় রয়েছে।

–[সূত্র– আল্লামা শামসুল হক আফগানীর লিখিত উলূমুল কুরআনের ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা]

উক্ত নুসখাগুলো তৈরি হওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) ছোট ছোট যত নুসখা সাহাবায়ে কেরামের কাছে সংরক্ষিত ছিল সবগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে দিলেন এবং হযরত উসমান (রা.)-এর প্রস্তুতকৃত নুসখার উপর সমস্ত উম্মত একমত হয়ে গেল যে, কুরআন কারীমকে রুসমে উসমানীতে তথা হযরত উসমান (রা.)-এর লিপির বিপরীত অন্য কোনো পদ্ধতি লিপির লেখা জায়েজ নেই।

কুরআনকে সাত লুগাতে অবতীর্ণ করার তাৎপর্য

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমকে সাতটি গোত্রের ভাষায় নাজিল করেছেন। যাতে করে কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না হয় এবং সহজেই তেলাওয়াত করা যায়। এজন্য উম্মতে মুহাম্মদীকে কুরআনের শব্দকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কারণ অনেক সময় অনেক মানুষ কোনো শব্দকে অন্যের মতো একইভাবে পড়তে পারে না। তাই তেলাওয়াতের সুবিধার্থে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে সাতটি পদ্ধতিতে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ "কুরআন কারীমকে সাত কেরাত এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।" অতএব এই সাত পদ্ধতির যে কোনো পদ্ধতি তোমাদের কাছে সহজ মনে হয় সে পদ্ধতিতে পড়।

সাত পদ্ধতি কি কি?

১. إِخْتِلَافُ الْأَسْمَاءِ এ এখতেলাফের মধ্যে- مُفْرَدْ، تَثْنِيَة، جَمْع، تَذْكِيْر، تَانِيْث -এর পার্থক্য শামিল রয়েছে। যেমন এক কেরাত এর মধ্যে تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ অথচ অন্য কেরাতের মধ্যে আছে تَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ
২. إِخْتِلَافُ الْأَفْعَالِ এ এখতেলাফের মধ্যে যেমন এক কেরাতে রয়েছে صِيْغَةُ الْمُضَارِعِ অথচ অন্য কেরাতের মধ্যে আছে صِيْغَةُ الْأَمْرِ আবার অন্য কেরাতে আছে صِيْغَةُ الْمَاضِيْ যেমন : رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا অথচ অন্য কেরাতে আছে بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا বَيْنَ اَسْفَارِنَا
৩. إِخْتِلَافُ وُجُوْهِ الْاِعْرَابِ অর্থাৎ যার মধ্যে إِعْرَابْ -এর পার্থক্য রয়েছে। যেমন এক কেরাতে আছে لَا يُضَارُّ كَاتِبٌ অন্য কেরাতে আছে لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ

৪. اِخْتِلَافُ قِلَّةِ الْاَلْفَاظِ وَكَثْرَتِهَا শব্দের কম বেশির اِخْتِلَافٌ অর্থাৎ এক কেরাতের মধ্যে কোনো لَفْظ কম আছে আর অন্য কেরাতের মধ্যে কোনো শব্দ বেশি আছে। যেমন– এক কেরাতে আছে تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ অন্য কেরাতে আছে تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ

৫. اِخْتِلَافُ تَقْدِيْمِ الْاَلْفَاظِ وَتَاخِيْرِهَا অর্থাৎ, শব্দের আগে পরের পার্থক্য। যেমন, এক কেরাতের মধ্যে একটি لَفْظ আগে আছে। আরেক কেরাতের মধ্যে পরে আছে। যেমন এক কেরাতের মধ্যে আছে وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ অন্য কেরাতের মধ্যে আছে وَجَاءَتْ سَكْرَتُ بِالْحَقِّ الْمَوْتِ

৬. اِخْتِلَافُ تَبْدِيْلِ الْاَلْفَاظِ অর্থাৎ, এক কেরাতের মধ্যে একটি لَفْظ আছে। অন্য কেরাতের মধ্যে এর পরিবর্তে অন্য لَفْظ আছে যেমন এক কেরাতে আছে نُنْشِزُهَا অন্য কেরাতের মধ্যে আছে نُنْشِرُهَا

৭. اِخْتِلَافُ اللَّهْجَةِ অর্থাৎ এর মধ্যে لَفْظ -এর পরিবর্তন হয় না। কিন্তু পড়ার পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন এক কেরাতে আছে مُوْسٰى আর এক কেরাতে আছে مُوْسٰى

কুরআন কারীমের তারতীব

কুরআন মাজীদ এর বর্তমান তারতীব লাওহে মাহফূয -এর তারতীব অনুযায়ী, নাজিল হওয়ার তারতীব অনুযায়ী নয়। অর্থাৎ শুরুতেই যখন কুরআনে কারীম লাওহে মাহফূয থেকে সামায়ে দুনিয়াতে অবতীর্ণ হলো তখন লাওহে মাহফূয -এর তারতীব অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে, অতঃপর সামায়ে দুনিয়া থেকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত জিবরাঈল (আ.) তারতীব ছাড়াই প্রয়োজন অনুসারে কিছু কিছু করে নিয়ে অবতীর্ণ হন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামকে লিখিয়ে দিতেন বা ইয়াদ করিয়ে দিতেন তখন লাওহে মাহফূয এর তারতীব অনুযায়ী ইয়াদ করিয়ে দিতেন বা লিখিয়ে দিতেন। স্বয়ং রাসূল ﷺ প্রত্যেক রমজান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে দাওর করতেন এবং জীবনের শেষ রমজানেও হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে দাওর করেছিলেন। উদ্দেশ্যে ছিল যাতে করে কুরআনের তারতীব লাওহে মাহফূয এর তরতীব অনুযায়ী হয়ে যায়। সুতরাং বর্তমান কুরআনের তারতীব লাওহে মাহফূয -এর তারতীব অনুযায়ী আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ।

কুরআন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হওয়ার হেকমত বা রহস্য

এ ব্যাপারে মুফাসসিরে কেরাম কয়েকটি জবাব পেশ করেছেন–

১. কুরআন কারীম যদি এক সাথে অবতীর্ণ হতো তাহলে কুরআন মুখস্থ করা ও আয়ত্ব করা কঠিন হয়ে যেত।

২. কুরআন যদি এক সাথে অবতীর্ণ হতো তাহলে কুরআনের হুকুম আহকাম জানা কঠিন হয়ে যেত।

৩. যেহেতু কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনেক কষ্ট দিতো, তাই হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বারবার আসা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্ত্বনার কারণ হতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্টের মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করা সহজ হতো এবং তাঁর ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পেত।

৪. কুরআনের একটি বিরাট অংশ বিভিন্ন ঘটনা ও প্রশ্ন প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং সমীচীন হলো যখন ঘটনা বা প্রশ্ন আসবে তখনই আয়াত নাজিল হবে। যাতে করে মানুষ সময় উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। –[সূত্র : তাফসীরে কাবীর, ২ : ৩৩৬]

কুরআনকে ত্রিশ পারায় ভাগ করা : কুরআনকে ত্রিশ পারায় ভাগ করাটা অর্থের দিক থেকে করা হয়নি; বরং বাচ্চাদের পড়ার সুবিধার্থে কুরআনকে ত্রিশ পারায় বন্টন করা হয়েছে। হযরত উসমান (রা.) সর্বপ্রথম কুরআনকে ত্রিশ পারায় ভাগ করেন।

কুরআন মাজীদের হরফের সংখ্যা

১. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন কুরআনের حَرْف সংখ্যা হলো- ৩ লক্ষ ২১ হাজার ৬ শত একাশি।
২. হযরত ফজল বিন আতা বিন ইয়াছার বলেন, কুরআনের حَرْف সংখ্যা হলো- ৩ লক্ষ ২৩ হাজার পনেরটি।
৩. হাজ্জাজ বিন ইউসূফ তৎকালীন সমস্ত হাফেজ, কারী ও কাতেবদেরকে ডেকে কুরআনের হরফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা ভালো করে গুণে সর্বসম্মতভাবে রায় দিলেন যে, কুরআনে হরফ সংখ্যা হলো ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৭ শত ৪ সংখ্যা হলো-

ا -এর সংখ্যা ৪৮ হাজার ৪ শত ৭২টি
ب -এর সংখ্যা ১১ হাজার ২০০টি।
ت -এর সংখ্যা ১ হাজার ১ শত ৯২টি।
ث -এর সংখ্যা ১ হাজার ২ শত ৭৬টি।
ج -এর সংখ্যা ৩ হাজার ২ শত ৭৬টি।
ح -এর সংখ্যা ৩ হাজার ৩ শত ৭৩টি।
خ -এর সংখ্যা ২ হাজার ৪ শত ১৬টি।
د -এর সংখ্যা ৫ হাজার ৬ শত ৪২টি।
ذ -এর সংখ্যা ৪ হাজার ৬ শত ৯৭টি।
ر -এর সংখ্যা ১১ হজার ৭ শত ৯৩টি।
ز -এর সংখ্যা ১ হাজার ৫ শত ৯০টি।
س -এর সংখ্যা ৫ হাজার ৮ শত ৯১টি।
ش -এর সংখ্যা ২ হাজার ২ শত ৫৩টি।
ص -এর সংখ্যা ২ হাজার ১৩টি।
ض -এর সংখ্যা ১ হাজার ৬ শত ৩৭টি।
ط -এর সংখ্যা ১ হাজার ২ শত ৭৪টি।
ظ -এর সংখ্যা ৮ শত ৪৬টি।
ع -এর সংখ্যা ৯২ হাজার ২ শতটি।
غ -এর সংখ্যা ২ হাজার ২ শত ৮টি।
ف -এর সংখ্যা ৮ হাজার ৪ শত ৯৯টি।
ق -এর সংখ্যা ৬ হাজার ৮ শত ১৩টি।
ك -এর সংখ্যা ৯ হাজার ৫ শত ২২টি।
ل -এর সংখ্যা ৩ হাজার ৪ শত ৩২টি।
م -এর সংখ্যা ২৬ হাজার ৫ শত ৩৫টি।
ن -এর সংখ্যা ২৬ হাজার ৫ শত ৬০টি।
و -এর সংখ্যা ২৫ হাজার ৫ শত ৩৬টি।
ه -এর সংখ্যা ১৯ হাজার ৭০টি।
ء -এর সংখ্যা ৪ হাজার ১ শত ১৫টি।

পবিত্র কুরআনের লাম আলিফের সংখ্যা ৩ হাজার ৭ শত ২৫টি। ى -এর সংখ্যা হলো ২৫ হাজার ৯ শত ১৯টি। উল্লিখিত তথ্য আল্লামা আবূ নায়েছ সমরকান্দি তার কিতাব বুস্তানী মুহাদ্দিসাতে তাঁর উস্তাদ আব্দুল আজীজ ইবনে আব্দুল্লাহর থেকে বর্ণনা করেছেন।

হরকতের সংখ্যা : কুরআনের মধ্যে হরকত অর্থাৎ যবর, যের, পেশ এবং দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশের চিহ্ন সর্বপ্রথম আবুল আসওয়াদ দুয়ালী (র.) লাগিয়েছেন; কিন্তু তার লাগানো হরকত বর্তমানে আমাদের সামনে যে হরকত রয়েছে এ আকৃতিতে ছিল না; বরং যবর বুঝানোর জন্য হরফের উপরে এক নুকতা। যের বুঝানোর জন্য হরফের নিচে এক নুকতা আর পেশ বুঝানোর জন্য হরফের সামনে এক নুকতা এবং দুই যবর দুই যের দুই পেশ বুঝানোর জন্য অন্য চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে আমাদের সামনে যে হরকতের চিহ্ন রয়েছে তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ-এর নির্দেশে হযরত ইয়াহ ইবনে ইয়ামার, হাসান বসরী, হযরত নছর ইবনে আসিম, হযরত লাইছী (র.) সম্মিলিতভাবে লাগিয়েছেন।

عُلُومُ الْقُرْآنِ لِلْأَفْغَانِيِّ -এর বর্ণনা মতে এবং বিখ্যাত আলেম সুপ্রশিদ্ধ ফকীহ আল্লামা আবুল লাইছ সামারকান্দী (র.)-এর অভিমত অনুসারে اَلْقُرْآنُ। এর যবর-এর সংখ্যা ৫৩ হাজার ২ শত ৪২ টি বা ৪৩ টি; যের -এর সংখ্যা ৪৯ হাজার ৫ শত ৮২টি; পেশ এর সংখ্যা ৮ হাজার ৮ শত ৪টি।

تَشْدِيد وَهَمْزَه হযরত আহমদ ইবনে খলিল (র.) ১৭০ হিজরিতে লাগিয়েছিলেন। আবু লাইছ সামারকান্দির মতানুসারে কুরআনের তাশদীদ এর সংখ্যা ১ হাজার ২ শত ৫২ টি। এবং হামযা -এর সংখ্যা ৪ হাজার ১ শত ১৫টি عُلُومُ الْقُرْآنِ لِلْأَفْغَانِيِّ তেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আরববাসীদের মধ্যে হরফের উপর নুকতা লাগানোর কোনো নিয়ম ছিল না। পরবর্তীকালে যখন অনারবীরা ইসলামে দিক্ষিত হতে লাগল; তখন তারা কুরআন কারীম ভুল পড়তে লাগল। তাই অনারবীদের সুবিধার্থে কুরআনের হরফের উপর নুকতা লাগানো হয়েছে। তবে সর্বপ্রথম কে নুকতা লাগিয়েছেন, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১. কারো কারো মতে হযরত আবুল আসওয়াদ আদ দুয়ালী (র.) হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশে সর্বপ্রথম কুরআনে নুকতা লাগিয়েছেন।
২. আবার কেউ কেউ বলেন কুফার গভর্নর যিয়াদ ইবনে আবী সুফিয়ান এ কাজটি করেছেন।
৩. আবার কেউ কেউ বলেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্দেশে হযরত হাসান বসরী, ইয়াহইয়াহ ইবনে ইয়ামার, নছর ইবনে বনূ আসিম লাইছি এ কাজটি করেছেন।

আল্লামা লাইছির অভিমত অনুসারে কুরআনের নুকতার সংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬ শত ৮১ টি অথবা ১ লক্ষ ৫ হাজার ১ শত ৮৪টি আবার কেউ বলে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬ শত ৪৮টি, আবার কেউ বলেন ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬ শত ৮২টি।

মদের সংখ্যা : কুরআনের মদের সংখ্যা হলো ১ হাজার ৭ শত ৭১টি

কুরআনের জ্ঞাতব্য কিছু বিষয়

কুরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ তা'আলা। পবিত্র কুরআনে 'আল্লাহ' শব্দটি ২ হাজার ৫ শত ৮৪ বার এসেছে।

কুরআন নাজিল হয়েছে মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর। পবিত্র কুরআনে 'মুহাম্মদ' শব্দটি ৪ বার এসেছে এবং আহমদ শব্দটি ১বার এসেছে।

কুরআন নাজিল হয়েছে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে রুহুল আমিন, রুহুল কুদুস বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

সর্বপ্রথম কুরআন নাজিল হওয়ার সময় ও স্থান

কুরআন সর্বপ্রথম ১৭ই রমজান ৬১০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই আগস্ট রোজ সোমবার হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর নাজিল হয়। পুরা কুরআন নাজিল হতে সময় লেগেছে ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিন। পবিত্র কুরআন সংরক্ষিত আছে লাওহে মাহফূযে। পবিত্র কুরআনের হেফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।

কখন কোন সূরা নাজিল হয়েছে

১. নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম বৎসর : সূরা আলাক, আল কলম, আল মুয্যাম্মিল ও আল মুদ্দাসসির।

২. নুবয়তের ২য় বৎসর : আল-আ'লা, আত তাকভীর, আল ক্বিয়ামাহ, আল ইখলাস, আল ফীল, কুরাইশ, আল ফজর, আত ত্বীন, আল লাহাব, আল ফালাক, আন নাস।

৩. নবুয়তের ৩য় বৎসর : আশ শামস, আল লাইল, আদ দুহা, আল ইনশিরাহ, আল বালাদ, আত্ব ত্বারিক, আল বুরূজ, আবাসা, আল ফাতিহা, আশ শু'আরা, আত্ব তূর, আয যারিয়াত, ক্বাফ, আল গাশিয়াহ, আল আদিয়াত, আত তাকাসূর।

৪. নবুয়তের ৪র্থ বৎসর : আল ফুরকান, আন নামল, সাবা, ফাত্বির, আন নাজম, আল কামার, আর রহমান, আল ওয়াকিয়াহ, আল মুলূক, আল হাক্কাহ, আল মা'আরিজ।

৫. নবুয়তের ৫ম বৎসর : আল মুরসালাত, আদ্দাহর, নূহ, সা'দ, ত্বা-হা, মারইয়াম, আলমাউন, আল কাউসার, আস সাফ্ফাত, হা-মীম সাজদা।

৬. নবুয়তের ৬ষ্ঠ বৎসর : ইয়াসীন, আননাবা, আল আসর, আত তাত্বফীফ, আল ইনফিতার, আল কাফিরূন

৭. নবুয়তের ৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর : আন নাযি'আত, আল ইনশিকাক, আর রূম, আল ক্বারিআহ, আল আম্বিয়া।

৮. নবুয়তের ৮ম বৎসর : আল কদর, আল বায়্যিনাহ, আল হুমাযা।

৯. নবুয়তের ৯ম বৎসর : আল আনকাবূত, আস সাজদাহ, লুকমান, আয যিলযাল।

১০. নবুয়তের ১০ম বৎসর : আন নামল, আল মুমিনূন, আশ শূরা, আয যুখরুফ, আদ দুখান, আল জাসিয়া, আল জিন।

১১. নবুয়তের ১০/১১ম বৎসর : আল আহকাফ।

১২. নবুয়তের একাদশ বৎসর : আল মুমিনূন, আল আন'আম, ইউনুস, হূদ, ইউসুফ, আর রা'দ, ইবরাহীম, আল হাজার।

১৩. নবুয়তের একাদশ-দ্বাদশ : আয যুমার, আল আ'রাফ।

১৪. নবুয়তের দ্বাদশ : বনী ইসরাঈল, আল কাহাফ, আল কাসাস, আংশিক হা-মীম আস সাজদা।

১৫. নবুয়তের ত্রয়োদশ বৎসর হিজরি ১ম সন : আল হাজ, আত তাগাবুন, মুহাম্মদ।

১৬. হিজরি ১-২য় সন : আল বাকারা, আল ইনফি'তাল।

১৭. হিজরি ২য়-৩য় সন : আল ইমরান।

১৮. হিজরি ৩য় সন : আন নিসা, আল মায়েদা, আস সাফ।

১৯. হিজরি ৩য়-৪র্থ সন : আল জুমুআ।

২০. হিজরি ৪র্থ সন : আল আশার।

২১. হিজরি ৫ম বৎসর : আল মুনাফিকুন, আল আহযাব, আন নূর।

২২. হিজরি ৬ষ্ঠ বৎসর : আত তালাক, আল ফাতহ, আল মুজাদালা।

২৩. হিজরি ৭ম সন : আত তাহরীম, আংশিক আহযাব।

২৪. হিজরি ৮ম সন : আল মুমতাহিনা, আল হাদীদ।

২৫. হিজরি ৯ম সন : আত তওবা, আল হুজুরাত।

২৬. হিজরি ১০ম সন : আন নাস, ও اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

আয়াতের শ্রেণি বিন্যাস

قَالَ الدَّانِيْ : اَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّ عَدَدَ اٰيٰتِ الْقُرْاٰنِ سِتَّةُ اٰلَافِ اٰيَةٍ. ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْمَا زَادَ عَلٰى ذٰلِكَ. فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَزِدْ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : وَمِئَتَا اٰيَةٍ وَاَرْبَعُ اٰيٰتٍ. وَقِيْلَ وَاَرْبَعَ عَشَرَةَ. وَقِيْلَ وَتِسْعَ عَشَرَةَ. وَقِيْلَ : وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ. وَقِيْلَ : وَسِتٌّ وَثَلَاثُوْنَ. (بِمُعْجَمِ اٰيٰتِ الْقُرْاٰنِ الدُّكْتُوْر حُسَيْن تَصَارْ فِي الْمُقَدَّمَةِ)

প্রথম ও শেষ বিবিধ আলোচনা

১. নাজিলকৃত সর্বপ্রথম শব্দ হলো اِقْرَاْ

২. মক্কায় সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে সূরায়ে আলাকের প্রথম ৫ আয়াত।

৩. মক্কাবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা আছে। কেউ বলেন, সূরায়ে আনকাবূত, কেউ বলেন, সূরায়ে মুমিন, কেউ বলেন, সূরায়ে তাখফীফ।

৪. মদিনায় সর্বপ্রথম নাজিলকৃত সূরা হলো সূরায়ে বাকারা।

৫. সর্বশেষ সূরা হলো সূরায়ে মায়েদা।

৬. সমষ্টিগতভাবে সূরা আলাক -এর প্রথম পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম নাজিল হয় এবং সর্বশেষ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ নাজিল হয়।

৭. তবে পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে সর্বপ্রথম সূরায়ে ফাতেহা নাজিল হয়।

৮. কুরআনের সর্বপ্রথম হাফেজ হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ।

৯. কুরআনের সর্বপ্রথম আয়াত বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)।

১০. আল কুরআনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছিলেন রবার্ট ক্যাটেনেনিছা।

১১. সর্বপ্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন মাওলানা আমীরুদ্দীন বশুনিয়া আংশিক ১৮০৮ ঈসায়ী সালে এবং মৌলভী নঈমুদ্দীন পূর্ণাঙ্গ।

১২. সর্বপ্রথম পুস্তক আকারে অনুবাদ করে প্রকাশ করে গিরিশ চন্দ্র সেন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। অনেক ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কুরআনের অনুবাদ মূল গিরিশ চন্দ্র সেন করেননি; বরং অনুবাদ করেছেন মৌলভী আব্দুর রহীম। কিন্তু পুস্তক আকারে প্রকাশ করার জন্য তার কাছে পর্যাপ্ত টাকা পয়সা ছিল না। যার কারণে তিনি সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তৎকালীন ইংরেজদের রাজধানী কলকাতায় গেলেন ইংরেজদের কাছ থেকে কিছু সহযোগিতা নেওয়ার জন্য; কিন্তু ইংরেজরা মৌলভী আব্দুর রহীম থেকে কুরআনের পাণ্ডুলিপি জোর করে ছিনিয়ে নেয়। অতঃপর মৌলভী আব্দুর রহীম অনেক অনুনয় করার পরেও কুরআনের পাণ্ডুলিপি ফেরত না পেয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে রিক্ত হস্তে বাড়িতে ফিরে আসেন। এদিকে ইংরেজরা কুরআনের পাণ্ডুলিপি গিরিশচন্দ্র সেন -এর হাতে তুলে দেয়। গিরিশচন্দ্র সেন অনেকখানি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নিজের নামে প্রকাশ করে। ১৫১৫ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কুরআন সবচেয়ে বেশি উর্দূ ভাষায় অনূদিত হয়। যার সংখ্যা ৭৭০ টি। এ পর্যন্ত ১২০ ভাষায় কুরআনের অনুবাদ হয়। ছাপার অক্ষরে কুরআনের সর্বপ্রথম তাফসীর গ্রন্থ হলো مَوَاهِبُ اَلْوَهِيَّةِ যা তাফসীরে হোসাইনী নামে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা থেকে মুদ্রিত হয়।

কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা হলো সূরায়ে বাকারা। আর সবচেয়ে ছোট সূরা হলো সূরায়ে কাউছার। কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত হলো اٰيَةُ الدَّيْنِ অর্থাৎ সূরায়ে বাকারার ৩৮ নম্বর আয়াত। কুরআনের সবচেয়ে ছোট আয়াত হলো– وَالْفَجْرِ وَالضُّحٰى ইত্যাদি।

স্থান ও কাল হিসেবে আয়াতের প্রকারভেদ

স্থান ও কাল হিসেবে আয়াত কয়েক প্রকার :

১. اٰيَات حَضَرِيٌّ [আয়াতে হাজারী] অর্থাৎ সমস্ত আয়াত বাড়িতে নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে হাজারী বলে।

২. اٰيَات سَفَرِيٌّ [আয়াতে সাফারী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত সফর অবস্থায় নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে সাফারী বলে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) এর ধরনের আয়াতের সংখ্যা ৪০ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। –[সূত্র : ইতকান– ১ : ১৯-২১]

৩. اٰيَات نَهَارِيٌّ [আয়াতে নাহারী] অর্থাৎ দিনে অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে আয়াতে নাহারী বলা হয়। অধিকাংশ আয়াত এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

৪. اٰيَات لَيْلِيٌّ [আয়াতে লাইলী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত রাতে নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে লাইলী বলে। যেমন সূরায়ে আলে ইমরানের শেষ আয়াত– اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ

৫. اٰيَات صَيْفِيٌّ [আয়াতে সাইফী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত গরমকালে নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে সাইফী বলে। যেমন সূরায়ে নিসার শেষ আয়াত– يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ

৬. اٰيَات شِتَائِيٌّ [আয়াতে শিতায়ী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত শীতকালে নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে শিতায়ী বলে। যেমন– সূরায়ে নূরের আয়াত– اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْا بِالْاِفْكِ

৭. آيَات فِرَاشِيٌّ [আয়াতে ফেরাশী] অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াত বিছানায় থাকাকালীন অবস্থায় নাজিল হয়েছে তাকে আয়াতে ফেরাশী বলে। যেমন– اَللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ –[সূত্র : ইতকান– ১ : ১২-২১]

৮. نَوْمِيٌّ যেগুলো নিদ্রা অবস্থায় নাজিল করা হয়েছে।

৯. سَمَاوِيٌّ যেগুলো মে'রাজের সময় আকাশে অবস্থানকালে নাজিল করা হয়েছে।

১০. فَضَائِيٌّ শূন্যে অবতীর্ণ আয়াত। –[প্রাগুক্ত ৬৪-৬৬]

حِزْب وَمَنْزِلٌ **মানযিল বা হিযব :** সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং তাবেয়ীগণ সপ্তাহে কমপক্ষে একবার কুরআন মাজীদ খতম [শেষ] করতেন। আর এ উদ্দেশ্যে তাঁরা দৈনন্দিন তেলাওয়াতের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন, যাকে মানযিল বা হিযব বলা হয়। তাই তাঁরা পাঠের সুবিধার্থে পবিত্র কুরআনকে ৭ মানযিলে বিভক্ত করেছেন–

প্রথম মানযিল : সূরা ফাতিহা হতে সূরা আননিসা -এর শেষ পর্যন্ত

দ্বিতীয় মানযিল : সূরা মায়িদা হতে সূরা আত তাওবা -এর শেষ পর্যন্ত

তৃতীয় মানযিল : সূরা ইউনূস হতে সূরা আন নাহল -এর শেষ পর্যন্ত

চতুর্থ মানযিল : সূরা বনী ইসরাঈল হতে সূরা আল ফুরকান -এর শেষ পর্যন্ত

পঞ্চম মানযিল : সূরা আশ-শুআরা হতে সূরা ইয়াসীন -এর শেষ পর্যন্ত

ষষ্ঠ মানযিল : সূরা আস্‌সাফফাত হতে সূরা আল হুজুরাত -এর শেষ পর্যন্ত

সপ্তম মানযিল : সূরা কাফ হতে শেষ সূরা পর্যন্ত।

جُزْء **বা পারা :** পবিত্র কুরআনে ত্রিশটি অংশে বিভক্ত যাকে ত্রিশ পারা বলা হয়। পারার এই বিভক্তি অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়নি: বরং পড়তে যাতে সহজ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সমান অংশে কুরআনে কারীমকে বিভক্ত করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে, ত্রিশ পারার এই বিভক্তি সর্বপ্রথম কে করেছেন? তবে কারো কারো ধারণা এটা নবী জামাতা হযরত উসমান (রা.) মাসহাফ অনুকপি করানোর সময় পৃথক পৃথক ত্রিশটি পারায় [সহীফায়] লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। কিন্তু আল্লামা তকী উসমানী [দা.বা.] বলেন, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের কিতাবে আমি -এর কোনো দলিল এ পর্যন্ত পাইনি।

আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (র.) বলেন, কুরআনের ত্রিশ পারার এই নিয়ম প্রসিদ্ধভাবে ধারাবাহিকতার সাথে চলে আসছে এবং মাদরাসাসমূহের কুরআনী নুসখায়ও এটা প্রচলিত রয়েছে। বাহ্যত মনে হয় যেন এই বণ্টনধারা সাহাবা পরবর্তী যুগে শিক্ষাদানের সুবিধার্থে করা হয়েছে।

اَخْمَاسْ وَ اَعْشَارْ **খুমুস এবং আ'শার :** প্রথম যুগের কুরআনি নুসখায় আরেকটি প্রচলন ছিল, তা হলো– পাঁচ আয়াতের পরে হাশিয়াতে খামছ বা خ এবং দশ আয়াত শেষে আ'শার বা ع লেখা হতো।

প্রথম প্রকারের চিহ্নকে اَخْمَاسْ এবং দ্বিতীয় প্রকারের চিহ্নকে اَعْشَارْ বলে। -[মানাহিলুল ইরফান, খ. ১ম, পৃ. ৪০৩] পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের মাঝে এ ব্যাপারে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এই আলামতগুলো জায়েজ, আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো মাকরূহ। -[আল ইতকান, খ. ২য়, পৃ. ১/১৭]

عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهٗ كَرِهَ التَّعْشِيْرَ فِى الْمُصْحَفِ

অর্থাৎ হযরত মাসরূক (রা.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) পাণ্ডুলিপির মাঝে اَعْشَارْ সংযোজন করাকে অপছন্দ করতেন। -[মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা,খ. ২য়, পৃ. ৪৯৭]-এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আশার সাহাবা যুগে প্রচলিত ছিল।

رُكُوْع **রুকূ' :** আরেকটি চিহ্ন হচ্ছে রুকূ'। যার প্রবর্তন পরবর্তীকালে করা হয়েছে এবং এ যাবত প্রচলিত রয়েছে। রুকূ' গঠনে সাধারণত আলোচ্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, যেখানে এক ধরনের আলোচনা শেষ হয়, সেখানেই হাশিয়াতে রুকূ' এর চিহ্ন দেওয়া হয়। আর তার সংকেত হচ্ছে (ع)। উলূমুল কুরআনের প্রণেতা হযরত মাওলানা তাকী ওসমানী [দা. বা.] বলেন, আমি যথেষ্ট খোজাখুঁজি করেও নির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পারিনি যে, কে কবে রুকূ'র সূচনা করেন। [তারিখুল কুরআন, পৃ. ৮১] কারো কারো ধারণা হচ্ছে, হযরত ওসমান (রা.)-এর সময়েই রুকূ' নির্ধারণ করা হয়। মাওলানা তাকী উসমানী [দা.বা.] বলেন, রেওয়ায়েতে এর কোনো প্রমাণ আমি পাইনি।

অবশ্য একথা প্রায় নিশ্চিত যে, এই আলামতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়াতের এমন একটি পরিমাণ নির্ণয় করা যা নামাজের এক রাকাতে পাঠ করা যায়। এই চিহ্নগুলোকে রুকূ' এই জন্য বলা হয় যে, নামাজে এই স্থানে পৌছে রুকূ' করা হয়।

رُمُوْز اَوْقَاف **বিরাম চিহ্ন :** কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদের সহজীকরণের নিমিত্তে আরেকটি উপকারী কাজ এটা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন বাক্যের শেষে এমন কিছু চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যাবে যে, এই স্থানে ওয়াকফ করাটা কেমন? এই চিহ্নগুলোকে রুমূযে আওকাফ বলে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো একজন অনারবী ব্যক্তি যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে, তখন যেন সে যথাস্থানে ওয়াক্‌ফ করতে পারে এবং ভুল স্থানে শ্বাস ত্যাগ করার কারণেও যেন অর্থের মাঝে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত না হয়। এ ধরনের অধিকাংশ চিহ্নের প্রণেতা হলেন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়ান্দী (র.)।

পবিত্র কুরআনের বিরামচিহ্নসমূহ নিম্নরূপ :

○ : বাক্যের শেষে এই চিহ্ন থাকে। এটা ওয়াকফ তাম -এর সংক্ষেপ। বিরতির চিহ্ন। একটি আয়াতের সমাপ্তি বুঝায়। কিন্তু এর উপরে অন্য কোনো চিহ্ন থাকলে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

ط : এটা ওয়াকফ মুতলাকের সংক্ষিপ্তরূপ। এর উদ্দেশ্য হলো এখানে ধারাবাহিক আলোচনা বা কথার মিল সমাপ্ত হয়েছে। তাই এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি করা উত্তম।

ج : এটা ওয়াকফ জায়িজ -এর চিহ্ন। এ চিহ্নিত স্থানে থামা না থামা উভয়েরই অনুমতি আছে। তবে থামাই ভালো।

ز : ওয়াকফে মুযাওয়াযের এটা সংক্ষিপ্তরূপ। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা না থামা উভয়েরই অনুমতি আছে। তবে এখানে না থামাই ভালো।

ص : এটা ওয়াকফে মুলাখখাসের চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়া ভালো। তবে যেহেতু বাক্য দীর্ঘকার বা প্রলম্বিত হয়েছে সেহেতু নিঃশ্বাস রাখা সম্ভব না হলে বিরতি করা যায়।

م : এটা ওয়াক্ফে লাযেম -এর সংকেত। এরূপ চিহ্নিত স্থানে যদি ওযাকফ করা না হয়, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এ স্থানে বিরতি করা [ওয়াকফ্ করা] অতি উত্তম। কেউ কেউ একে ওয়াকফে ওয়াজিব নামেও অভিহিত করেছেন।
তবে এখানে ওয়াজিব বলতে পারিভাষিক ওয়াজিব বুঝানো হয়নি, যা না করলে গুনাহ হয়; বরং এখানে ওয়াজিব বলতে বুঝানো হয় যে, মাঝে মাঝে এই স্থানে ওয়াক্ফ করা অধিক উত্তম।

لا : এটা لَا تَقِفْ -এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থেমো না। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এখানে ওয়াক্ফ করা নাজায়েজ; বরং এর অনেক স্থান এমন আছে, যেখানে ওয়াক্ফ করলে কোনো অসুবিধা নেই। এরূপ চিহ্নিত স্থানে যদি ওয়াক্ফ করতে হয় তবে উত্তম হলো একে পুনরায় মিলিয়ে পড়া। উপরোল্লিখিত বিরাম চিহ্নসমূহ সম্পর্কে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো এর প্রবর্তনকারী হলেন আল্লামা সাজাওয়ান্দী (র.)।

سكتة : এটা সাকতার চিহ্ন। এ স্থানে পড়া ক্ষান্ত করে কিঞ্চিত থামতে হয়; কিন্তু নিঃশ্বাস ছাড়া যায় না। এটা সাধারণত এমন স্থানে আনা হয়, যেখানে মিলিয়ে পড়লে অর্থের মাঝে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কুরআনের ৪ স্থানে এটা আছে।

قف : এ ধরনের চিহ্নিত স্থানে সাকতার থেকে সামান্য দীর্ঘ বিরতি করতে হয়। এ ধরনের স্থানে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা যাবে না।

ق : এটা قِيلَ عَلَيْهِ -এর সংক্ষেপ। এখানে থামার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি হবে, আর অন্যান্যদের মতে বিরতি হবে না।

وقف : এর অর্থ থেমে যাও। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা উচিত।

صل : এটা [قَدْ يُوْصَلُ] কাদইউসালু -এর সংক্ষেপ। এরূপ স্থানে থামা না থামা উভয়টাই সঠিক তবে থামাই ভালো।

صلى : এটা اَلْوَصْلُ اَوْلٰى -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ মিলিয়ে পড়া উত্তম এই অর্থ প্রকাশ করে।

مع – مُعَانَقَة এটা মু'আনাকা নামে অভিহিত। আয়াতের বা শব্দের ডানে বা বামে উক্ত তিন বিন্দু অথবা مَعَ - এর চিহ্ন থাকে অথবা বলা হয় এক আয়াতের দুটো তাফসীর যেখানে সম্ভব, সেখানে এই চিহ্ন লেখা হয়েছে। এক তাফসীর অনুযায়ী এক স্থানে ওয়াকফ হবে এবং অন্য তাফসীর অনুযায়ী অন্য স্থানে ওয়াক্ফ হবে। তবে এ দুয়ের মাঝে যেকোনো এক স্থানেও ওয়াকফ করতে পারে; কিন্তু যদি এক স্থানে বিরতি করে তাহলে অন্য স্থানে ওয়াকফ করা জায়েজ নেই। –[উলূমূল কুরআন, পৃ.২০০] একে مُقَابَلَة নামেও অভিহিত করা হয়।

وَقْفُ النَّبِيِّ : কোনো কোনো রেওয়ায়েত মুতাবিক হযরত মুহাম্মদ ﷺ এখানে ওয়াকফ করেছিলেন।
وَقْفُ جِبْرَائِيْل : এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামলে বরকত লাভ হয় বলে বর্ণিত আছে.
وَقْفُ غُفْرَانْ : এর চিহ্নিত স্থানে ওয়াকফ করলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।
اَلرُّبُعُ : এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ পারার এক চতুর্থাংশ।
اَلنِّصْفُ : অর্ধাংশ অর্থাৎ পারার অর্ধাংশ।
اَلثُّلُثُ : তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ পারার তিন চতুর্থাংশ। –[প্রাগুক্ত : ১৯৩–২০১]

কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের তারতীব ও ধারাবাহিকতা : কুরআন শরীফের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল আয়াত ও সূরা যে তারতীবে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে, মূলত সেটাই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র তরতিব। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মারফত রাসূল ﷺ-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করে তিনি কুরআনের এই ধারাক্রম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতঃপর হুজুর ﷺ সাহাবায়ে কেরামকেও এই তরতিবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, কুরআনে বর্তমান তরতিব একান্তই ওহীগত একটি বিষয়। এ বিষয়ে আল্লামা সুয়ূতী (র.) মুসলিম উম্মাহর ইজমা উল্লেখ করে লিখেন–

"কুরআনের প্রত্যেক সূরা ও আয়াতসমূহের তরতিব আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ-কে অবগত করানোর পর সুবিন্যস্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। –[হাশিয়াতুল জামাল, খ. ১., পৃ. ১২]
কুরআনের প্রথম ৭টি সূরা বড়। পরিভাষায় এগুলোকে سَبْعِ طِوَالْ বলা হয়। সূরা বাকারা হতে তওবা পর্যন্ত। তার পর কম বেশি একশত আয়াত সম্বলিত বৃহৎ সূরাগুলো রয়েছে। পরিভাষায় এগুলোকে مِئِيْن [মিঈন] বলা হয়। এরূপ সূরা সূরা ইয়াসীন থেকে সূরা কাফ পর্যন্ত ২৪টি। তারপর রয়েছে শতের কম আয়াত সম্বলিত সূরাসমূহকে এসব। বলা হয় مَثَانِىْ [মাছানী]। এ সূরাগুলোতে ঘটনাবলি ও উপদেশসমূহের পুনরুক্তি রয়েছে, তাই এগুলোকে মাছানী বলে নামকরণ করা হয়েছে। তারপর রয়েছে ছোট সূরাগুলো। এগুলোকে বলা হয় مُفَصَّلْ মুফাসসাল। সূরা হুজুরাত থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাসসাল বলে।

মুফসসাল সূরাগুলো আবার তিনভাগে বিভক্ত :

১. طِوَال مُفَصَّلْ : সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলোকে তিওয়ালে মুফাসসাল বলা হয়। এতে মোট ৩০টি সূরা রয়েছে।
২. اَوْسَط مُفَصَّلْ : সূরা বুরুজ থেকে সূরা বায়্যিনাহ [সূরা লাম ইয়াকুন] পর্যন্ত সূরাগুলোকে আওসাতে মুফাসসাল বলা হয়। এতে মোট ১৩টি সূরা রয়েছে।
৩. قِصَار مُفَصَّلْ : সূরা বায়্যিনাহ [লাম ইয়াকুন] থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে কিসারে মুফাসসাল বলা হয়। এতে মোট ১৭টি সূরা রয়েছে। –[তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি : ই. ফা. বা]

কুরআন পাকের বিষয়বস্তু

পবিত্র কুরআন হলো মহান আল্লাহর অমিয় বাণী যা আশরাফুল মাখলুকাত ও আল্লাহর খলিফা মানব জাতিকে হেদায়েতের সরল-সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষকে লক্ষ্য করেই পবিত্র কুরআনের সকল আলোচনা কেন্দ্রীভূত। তাই পবিত্র কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো, মানুষ এবং মানুষের পার্থিব ও পরকালীন জীবন। কুরআনের বিষয়বস্তু নিম্নোক্ত পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা–

(১) عِلْمُ الْمُحَاكَمَةِ **বা শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান** : মানব জীবনের অত্যাবশ্যকীয় হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ পবিত্র কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। ফরজ, ওয়াজিব, হালাল, হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে এতে আলোচিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ অর্থাৎ 'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং জাকাত আদায় করো।

(২) عِلْمُ الْمُخَاصَمَةِ **বা ভ্রান্তপন্থীদের আকিদা খণ্ডন ও তাদের সাথে বিতর্কের জ্ঞান** : সমকালীন বিশ্বে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আদর্শ যেমন– ইহুদি, খ্রিস্টান এবং কাফের, মুশরিক ও নাস্তিক্যবাদী ইত্যাদি মতবাদের সকল প্রশ্নের জবাব এতে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেন– وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করছ সব কিছু।

(৩) عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِاَيَّامِ اللّٰهِ **পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাবলি** : পবিত্র কুরআন ইতিহাসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। অসংখ্য ঐতিহাসিক কাহিনী এতে বর্ণনা করার মাধ্যমে নৈতিক উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِاٰلَاءِ اللّٰهِ **[আল্লাহর নিয়ামতরাজি ও নিদর্শনাবলি সংক্রান্ত জ্ঞান]** পৃথিবীতে মহান আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ছড়িয়ে আছে। এসব নিয়ামতরাজির উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ. অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে সকল পাবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যদি তোমরা একান্তভাবেই তাঁরই ইবাদত কর।

(৫) عِلْمُ التَّذْكِيْرِ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ **[মৃত্যু পরবর্তীকালীন যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান]** মানুষের জন্য পৃথিবীর এই জীবনই শেষ নয়; বরং মৃত্যুর মাধ্যমে শুরু হবে তার প্রকৃত জীবন পরকাল বা আখেরাত। এতে আখেরাতের বিভিন্ন পর্যায়– কবর, হাশর, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে– فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ, আজ (হাশরের দিন) কারো প্রতি একবিন্দু জুলুম করা হবে না। আর তোমাদেরকে তেমন প্রতিফল দেওয়া হবে, যেমন তোমরা আমল করেছিলে। وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! আপনি তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে দিয়ে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত।

চিত্রে পবিত্র কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের পরিসংখ্যান

সূরা	১১৪	যবর	৫৩২৪২
রুকূ'	৫৪০	যের	৩৯৫৮২
মদনী আয়াত	৩২১৪	পেশ	৮৮০৪
মক্কী আয়াত	৩২২১	মাদ্দ	১৭৭১
বসরী আয়াত	৬২২৫	তাশদীদ	১২৫২
শামী আয়াত	৬২২৬	নোক্তা	১৫৬৮৪
মোট শব্দ	৭৭,৪৩৯	হরফ	৩,৬৪,২১৯

أَسْبَابُ النُّزُوْل [শানে নুযূল] : অবতরণের দিক দিয়ে কুরআনের আয়াতসমূহ দুপ্রকার। শানে নুযূলবিহীন আয়াত ও শানে নুযূল বিশিষ্ট আয়াত। কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতই এমন, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা নিজেই বান্দার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ কোনো ঘটনার বিবরণ কিংবা সে সময়ে সংঘটিত কোনো সমস্যার সমাধান এসব আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য আয়াতসমূহ এরূপ যেগুলো কোনো সমস্যার সমাধান বা কোনো প্রশ্নের জবাব প্রদান কিংবা বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। মূলত আয়াত নাজিলের পটভূমির এসব সমস্যা, উত্থাপিত প্রশ্ন ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলিকে তাফসীর শাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হয় শানে নুযূল।

মক্কী মদনী সূরা

নবুয়ত লাভের পর প্রিয়নবী ﷺ মক্কা শরীফে ১২ বছর ৫ মাস ২ দিন ছিলেন, অতঃপর তিনি মদিনা শরীফে হিজরত করেন এবং ১০ বছর ৬ মাস ৯ দিন মদিনা শরীফে অতিবাহিত করার পর ১১ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি ইন্তেকাল করেন।

মক্কা শরীফে অবস্থান কালে পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত সূরা নাজিল হয়েছে সেগুলোকে "মক্কী" সূরা বলা হয়। আর যেসব সূরা মদিনা শরীফে অবস্থানকালে নাজিল হয়েছে সেগুলোকে "মদনী" সূরা বলা হয়।

আমরা কথাটিকে এভাবেও বলতে পারি যে, হিজরতের পূর্বে যেসব সূরা নাজিল হয়েছে, সে সূরাসমূহকে মক্কী সূরা বলা হয়। আর হিজরতের পর অবতীর্ণ সূরাসমূহকে মদনী সূরা বলা হয়। নিম্নে মক্কী ও মদনী সূরাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো।

ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	
১	সূরা আলাক	১৯	মক্কা শরীফ
২	সূরা মুদ্দাস্‌সির	৩৫	"
৩	সূরা মুজ্জাম্মিল	৩০	"
৪.	সূরা দোহা	১১	"
৫	সূরা ইনশিরাহ	৮	"
৬	সূরা ফালাক	৫	"
৭	সূরা নাস	৬	"
৮	সূরা ফাতেহা	৭	"
৯	সূরা কাফিরূন	৬	"
১০	সূরা ইখলাস	৪	"
১১	সূরা লাহাব	৫	"
১২	সূরা কাউসার	৩	"
১৩	সূরা হুমাযা	৯	"
১৪	সূরা মাউন	৭	"
১৫	সূরা তাকাসুর	৮	"

১৬	সূরা লাইল	২১	”
১৭	সূরা কলম	৫২	”
১৮	সূরা বালাদ	২০	”
১৯	সূরা ফিল	৫	”
২০	সূরা কুরাইশ	৪	”
২১	সূরা কদর	৫	”
২২	সূরা আত্‌তারেক	১৭	”
২৩	সূরা আশ্‌শামস	১৫	”
২৪	সূরা আবাসা	৪২	”
২৫	সূরা আ'লা	১৯	”
২৬	সূরা আত্‌তীন	৮	”
২৭	সূরা আসর	৩	”
২৮	সূরা বুরূজ	২২	”
২৯	সূরা কারিয়া	১১	”
৩০	সূরা যিলযাল	৮	”
৩১	সূরা ইনফিতার	১৯	”
৩২	সূরা তাকভীর	২৯	”
৩৩	সূরা ইনশিকাক	২৫	”
৩৪	সূরা আদিয়াত	১১	”
৩৫	সূরা নাজি'আত	২৪	”
৩৬	সূরা মুরসালাত	৫০	”
৩৭	সূরা নাবা	৪০	”
৩৮	সূরা গাশিয়া	২৩	”
৩৯	সূরা ফাজর	৩০	”
৪০	সূরা কিয়ামা	৪০	”
৪১	সূরা মুত্বাফফিফীন	৩৬	”
৪২	সূরা আল-হা-ককা	৫২	”
৪৩	সূরা জারিয়াত	৬০	”
৪৪	সূরা তূর	৪৯	”
৪৫	সূরা ওয়াকিয়া	৯৬	”

৪৬	সূরা নজম	৬২	"
৪৭	সূরা মা'আরিজ	৪৪	"
৪৮	সূরা আর রহমান	৭৮	"
৪৯	সূরা কমর	৫৫	"
৫০	সূরা সাফ্‌ফাত	১৮২	"
৫১	সূরা নূহ	২৮	"
৫২	সূরা দাহর	৩১	"
৫৩	সূরা দুখান	৫৯	"
৫৪	সূরা কাফ	৪৫	"
৫৫	সূরা তোয়াহা	১৩৫	"
৫৬	সূরা শুয়ারা	২২৭	"
৫৭	সূরা হিজর	৯৯	"
৫৮	সূরা মারইয়াম	৯৮	"
৫৯	সূরা ছোয়াদ	৮৮	"
৬০	সূরা ইয়াসীন	৮৯	"
৬১	সূরা যুখরুফ	৮৯	"
৬২	সূরা জিন	১৮	"
৬৩	সূরা মূলক	৩০	"
৬৪	সূরা মুমিনূন	১১৮	"
৬৫	সূরা আম্বিয়া	১১৩	"
৬৬	সূরা ফুরকান	৭৭	"
৬৭	সূরা বনী ইসরাঈল	১১১	"
৬৮	সূরা নমল	৯৩	"
৬৯	সূরা কাহফ	১১০	মদিনা শরীফ
৭০	সূরা সিজদা	৫৪	"
৭১	সূরা হামীম-আস সিজদা	৫৪	"
৭২	সূরা জাসিয়া	৩৭	"
৭৩	সূরা নাহল	১২৮	"
৭৪	সূরা রূম	৬০	"
৭৫	সূরা হুদ	১২৩	"

৭৬	সূরা ইবরাহীম	৫২	"
৭৭	সূরা ইউসুফ	১১১	"
৭৮	সূরা মুমিন	৮৫	"
৭৯	সূরা কাসাস	৮৮	"
৮০	সূরা যুমার	৭৫	"
৮১	সূরা আনকাবুত	৬৯	"
৮২	সূরা লোকমান	৩৪	"
৮৩	সূরা শুরা	৫৩	"
৮৪	সূরা ইউনুস	১০৯	"
৮৫	সূরা সাবা	৫৪	"
৮৬	সূরা ফাতির	৪৫	"
৮৭	সূরা আ'রাফ	২০৬	"
৮৮	সূরা আহকাফ	৩৫	"
৮৯	সূরা আন'আম	১৬৬	"
৯০	সূরা রা'দ	৪৩	"
৯১	সূরা বাকারা	২৮৬	"
৯২	সূরা বাইয়্যিনা	৮	"
৯৩	সূরা তাগাবুন	১৮	"
৯৪	সূরা জুমা	১১	"
৯৫	সূরা আনফাল	৭৫	"
৯৬	সূরা মুহাম্মদ	৩৮	"
৯৭	সূরা আলে ইমরান	২০০	"
৯৮	সূরা সফ্	১৪	"
৯৯	সূরা হাদীদ	২৯	"
১০০	সূরা নিসা	১৭৭	"
১০১	সূরা তালাক	১২	"
১০২	সূরা হাশর	২৪	"
১০৩	সূরা আহযাব	৭৩	"
১০৪	সূরা মুনাফিকুন	১১	"

১০৫	সূরা নূর	৬৪	"
১০৬	সূরা মুজাদালা	২২	"
১০৭	সূরা হজ্জ	৭৮	"
১০৮	সূরা ফাত্হ	২৯	"
১০৯	সূরা তাহরীম	১২	"
১১০	সূরা মুমতাহিনা	১৩	"
১১১	সূরা নাসর	৩	"
১১২	সূরা হুজুরাত	১৮	"
১১৩	সূরা তওবা	১২৯	"
১১৪	সূরা মায়েদা	১২০	"

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য

১১৪ সূরার মধ্যে ৮৬ টি সূরা মক্কী ২৮ টি সূরা মদনী।

১. মাক্কী সূরাগুলো অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। ভাষা জোরালো ও আবেগপূর্ণ।

২. মাক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত, ইবাদত, কুফর, শিরক, আখেরাত, বেহেশ্ত, দোজখ, সৃষ্টি কৌশল এবং পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের বর্ণনা রয়েছে।

৩. যে সকল সূরায় كَلَّا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো মক্কী।

৪. (হানাফী মাযহাব মতে) যে সকল সূরায় সেজদার আয়াত এসেছে সেগুলো মক্কী।

৫. সূরা বাকারা ব্যতীত যে সকল সূরায় হযরত আদম (আ.) ও ইবলীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মক্কী।

৬. মক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত يَاأَيُّهَا النَّاسُ দ্বারা সম্বোধন হয়েছে।

৭. মক্কী সূরাগুলোর বর্ণনারীতি সাধারণত অত্যন্ত অলঙ্কার বহুল এবং এগুলোতে উপমা-উৎপেক্ষা অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু এ সকল সূরায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ শব্দ সম্ভারের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

মদনী সূরার বৈশিষ্ট্য

১. যে সকল সূরাতে ইসলামি শরিয়তের হুকুম-আহকাম বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে সেগুলো মদনী সূরা।

২. মদনী সূরাগুলো সাধারণত দীর্ঘ ও ভাবগম্ভীর।

৩. মদনী সূরা সালাত, জাকাত, হজ, হিবা, উশর ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

৪. মদনী সূরাগুলো অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক।

৫. এ সূরাগুলোতে ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

৬. সূরা 'আনকাবূত' ব্যতীত যে সকল সূরায় মুনাফিকদের আলোচনা বিদ্যমান সেগুলো মদনী।

৭. মদনী সূরাসমূহে আহলে কিতাব এবং জিম্মিদের সাথে আচরণ ও সন্ধির বিধান বর্ণিত হয়েছে।

৮. জিহাদ, গনিমত, ফাই, জিযিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে যে সূরায় আলোচিত হয়েছে তা মদনী।

পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য

১. পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে আমি আল্লাহ পাকের কালাম, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

২. পবিত্র কুরআন সে গ্রন্থ, যা বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন এক ব্যক্তি নিয়ে এসেছেন, যিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম মানুষ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সর্বাধিক সম্মানিত, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পবিত্র এবং সকলের নিকট সুস্পষ্ট, যাঁর প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ।

৩. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা গোমরাহীর ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন বিশ্বমানবের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ইনকিলাব এনেছে, মূর্খতার বদলে জ্ঞান এবং জুলুম অত্যাচারের স্থলে সুবিচার কায়েম করার মহান শিক্ষা পেশ করেছে।

৪. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা সকল সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং যাবতীয় মন্দ কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

৫. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে বিশ্ববাসীকে তার মোকাবিলার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছে। কিন্তু কুরআনের একটি ক্ষুদ্র সূরার মোকাবিলা করতেও বিশ্ববাসী সক্ষম হয়নি।

৬. পবিত্র কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা ভাষার অলংকারে, ভাবের উচ্ছ্বাসে, শব্দ চয়নে, এককথায় সব ব্যাপারেই অনন্য-সাধারণ, অদ্বিতীয়, যার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজেও পাওয়া যায় না।

৭. পবিত্র কুরআন একমাত্র কিতাব, যা বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত, যুগের আবর্তন-বিবর্তন তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন করতে পারেনি, এমনকি একটি যের যবরেরও পরিবর্তন হয়নি।

৮. পবিত্র কুরআন এমনি এক গ্রন্থ, যার পূর্ণ ইতিহাস সম্পূর্ণ সংরক্ষিত।

৯. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা সর্বদা এবং সর্বত্র পাঠ করা হয়, সারা পৃথিবীতে সর্বাধিক লোক পাঠ করে থাকে।

১০. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা লক্ষ লক্ষ মানুষ সকল যুগে মুখস্থ করে রাখে, এতদ্ব্যতীত আর কোনো গ্রন্থ এভাবে হেফজ করা হয় না।

১১. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ যার অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা তাফসির পৃথিবীর প্রায় সকল বিখ্যাত ভাষায় করা হয়েছে।

১২. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা বারে বারে পাঠ করলেও কোনো দিন পুরাতন মনে হয় না।

১৩. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার তাফসীরে সকল যুগের ওলামায়ে কেরাম আজীবন সাধনা করেছেন।

১৪. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার মধ্যে গবেষণা করে তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ লক্ষ লক্ষ মাসআলা প্রমাণ করেছেন। শুধু আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.) পবিত্র কুরআন থেকে ১৩ লক্ষ মাসআলা বের করেছেন। একবার ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর শিষ্য ইমাম আহমদ (র.)-এর মেহমান ছিলেন, তাঁর শয়নকক্ষে তাহাজ্জুদের নামাজের অজুর জন্য পানি রাখা হয়েছিল, ফজরের নামাজের সময় দেখা গেল যথাস্থানে অজুর পানি রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন না, এ কথা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। ইমাম আহমদ (র.) তাঁর উস্তাদের মেজাজ পুরসী করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর রাতে কি আপনার শরীর খারাপ হয়েছিল? তিনি বললেন, "না, তবে শয়নকালে পবিত্র কুরআনের একখানি আয়াত মনে হয়েছিল, তা বারবার পাঠ করছিলাম এবং আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম। এরই মধ্যে ফজেরর আজান শ্রবণ করলাম, অবশ্য এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক একশত একটি মাসআলা প্রমাণ করার তৌফিক দান করেছেন।" মূলতঃ এটি শুধু আল্লাহ পাকের কালামেরই বৈশিষ্ট্য।

১৫. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার বিধি-নিষেধের উপর সর্বদা সর্বত্র আমল করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত আমল করা হবে।

১৬. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ পাক স্বয়ং গ্রহণ করেছেন।

১৭. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার মহান শিক্ষা মানুষের স্বভাব মোতাবেক এবং যুক্তিপূর্ণ, বাস্তবের অগ্নিপরীক্ষায় শতবার পরীক্ষিত।

১৮. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা দ্বারা একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি এবং একজন সাধারণ মানুষ উভয়েই উপকৃত হতে পারেন।

১৯. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যাতে রয়েছে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম-কানুন তথা অর্থনৈতিক যাবতীয় সমস্যার সমাধান, সমাজ জীনের দায়িত্ব ও অধিকার, ইবাদত-বন্দেগী, আচার-ব্যবহার, আকিদা-বিশ্বাস এক কথায় মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান, সকল প্রশ্নের উত্তর পবিত্র কুরআনে রয়েছে। ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল নিয়ম-কানুন এক কথায় মানব জীবনের চরম সাফল্য এবং চিরশান্তি লাভের পথ-নির্দেশ করেছে পবিত্র কুরআন।
২০. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা নারী সমাজে অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ করেছে
২১. পবিত্র কুরআনই সে গ্রন্থ, যা ক্রীতদাসের মুক্তি লাভের পথ-নির্দেশ করেছে।
২২. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার প্রশংসায় অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেরাও পঞ্চমুখ।
২৩. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরস্পরের পরামর্শের বিধান কায়েম করেছে।
২৪. পবিত্র কুরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য বর্ণনাতীত এমনকি কল্পনাতীত, এর সবই অলৌকিক, সবই বিস্ময়কর, সবই অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন– পৃ. ৮৭-৮৯]

কুরআন সম্পর্কীয় কতিপয় সন ও তারিখ

১. হিজরি ১০ সনে আরজায়ে আখির অর্থাৎ শেষ শুনানী অনুষ্ঠিত হয়; যাতে সূরার ধারাবাহিকতা আয়াত বিন্যাস এবং লুগাতে কুরাইশ নির্ধারণের কাজ সুস্পষ্টভাবে সুসম্পন্ন করা হয়।
২. হিজরি ১০ সনে সফর মাসে কুরআন অবতরণ সমাপ্ত করা হয়।
৩. হিজরি ১২ সনে সিদ্দিকী যোগে সর্বসুধিজন স্বীকৃত পূর্ণ কপি প্রস্তুত হয়।
৪. হিজরি ১৫ সনে ফারুকী আমলে তারাবীর নামাজে বিরাট জামাতে পূর্ণ কুরআন খতমের সুন্নতের প্রচলন হয়।
৫. হিজরি ২০ সনের উসমানী যুগে সর্ব সম্মতিক্রমে ৬ষ্ঠ লুগাত রহিত এবং কুরাইশী লুগাত বহাল রাখা হয় এবং ঐ বৎসরেই কুরাইশী লুগাতে কুরআনের আসমানি অনুলিপি প্রস্তুত হয়।
৬. হিজরি ৭৫ সনে সহজে বুঝার জন্য পুরা কুরআনে কারীমকে ৩০ পারা এবং প্রত্যেক পারা ثلث، نصف، ربع অংশের চিহ্নিত করা হয়।
৭. হিজরি ৭৫ সনে তৎকালীন ইরাকী শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আজমী বা অনারবী মুসলমানদেরকে পড়ার সুবিধার্থে কয়েকজন বুযুর্গের সাহায্যে কুরআনে কারীমের মধ্যে হরকত এবং নুকতার ব্যবস্থ করেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের তরজমা

কুরআন একমাত্র গ্রন্থ, যা বহু ভাষায় তরজমা করা হয়। এতেই কুরআনের জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়। সর্ব প্রথম ১১৪৬ সালে লেটিন, ভাষায় কুরআনের তরজমা করা হয় তার পরবর্তীতে জার্মান, গ্রীক, পেলিস, ইটালিয়া, ইস্পেলিস, বেনজারী, ফ্রোজো, পরতুগিজ, সার্ভিয়া, হলাণ্ড, ইন্দোচীন, ডেনমার্ক, রোমানিস, আর্মেনিয়, অস্ট্রেলিয়া, বুলগেরিয়, জাপানী, বহেলী, চীনা, সুইডিস, আফগানী, পাবী, তামীল, সিন্দি, গুজরাটী, জাভা, পস্তু, তুর্কি, হিন্দী, বার্মিজ, তেলেগু, মারহাটি, পূর্ব আফ্রিকা, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজি ইত্যাদি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করা হয়।

কুরআনে উল্লিখিত কতিপয় নবীর নাম

১. হযরত আদম (আ.) ২. হযরত নূহ (আ.) ৩.হযরত ইদরীস (আ.) ৪. হযরত হূদ (আ.) ৫. হযরত সালেহ (আ.) ৬. হযরত ইবরাহীম (আ.) ৭. হযরত ইসমাঈল (আ.) ৮. হযরত ইসহাক (আ.) ৯. হযরত লূত (আ.) ১০. হযরত ইয়াকূব (আ.) ১১. হযরত ইউসুফ (আ.) ১২. হযরত মূসা (আ.) ১৩. হযরত হারুন (আ.) ১৪. হযরত শুআইব ১৫. হযরত ইউনুস (আ.) ১৬. হযরত ইলিয়াস (আ.) ১৭. হযরত আলইয়াসা (আ.) ১৮. হযরত যুলকিফল (আ.) ১৯. হযরত দাউদ (আ.) ২০. হযরত সুলাইমান (আ.) ২১. হযরত আইউব (আ.) ২২. হযরত ইয়াহইয়াহ (আ.) ২৩. হযরত জাকারিয়া (আ.) ২৪. হযরত উযাইর (আ.) ২৫. হযরত ঈসা (আ.) ২৬ হযরত মুহাম্মদ ﷺ। কুরআনে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়েছে হযরত মূসা (আ.)-এর নাম, তার নাম কুরআনের মধ্যে ১৩৫ বার এসেছে আর মুহাম্মদ (সা.) শব্দটি ৪ বার এসেছে আর আহমদ শব্দটি ১ বার এসেছে।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অনুবাদ : 'আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট অভিশপ্ত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

শাব্দিক অনুবাদ : أَعُوْذُ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি بِاللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নিকট مِنَ হতে الشَّيْطَانِ শয়তান الرَّجِيْمِ অভিশপ্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওহী নিয়ে আসেন, তখন তিনি রাসূল ﷺ-কে বলেন, আপনি পাঠ করুন– أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ অতঃপর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে বলেন।

তখন রাসূল ﷺ প্রথমে আ'উযুবিল্লাহ ও পরে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করেন। অতঃপর اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الخ অবতীর্ণ হয়।

تَعَوُّذْ -এর নামকরণ : تَعَوُّذْ অর্থাৎ আ'উযুবিল্লাহ বাক্যটি কুরআন পকের অংশ নয়; বরং এটি একটি কুরআন পাকের নির্দেশিত বাণী। تَعَوُّذْ পাঠের দ্বারা অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট, ক্ষতি ও প্ররোচনা হতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। তাই এ পবিত্র বাক্যটি تَعَوُّذْ অর্থাৎ, আশ্রয় প্রার্থনা বাক্য নামে অভিহিত।

تَعَوُّذْ পাঠের নিয়ম : পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ যখন কুরআন পাঠ করো, তখন শয়তানের প্রতারণা হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও। দ্বিতীয়ত কুরআন পাঠের প্রাক্কালে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ পাঠ করা সুন্নত। এ পাঠ চাই নামাজের মাধ্যেই হোক বা নামাজের বাইরেই হোক। কুরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য কাজে শুধু বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত, আ'উযুবিল্লাহ নয়। যখন কুরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করা হয়, তখন আ'উযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ উভয়টিই পাঠ করা সুন্নত। তেলাওয়াতকালে একটি সূরা শেষ করে অন্য সূরা আরম্ভ করতে (সূরা তাওবা ব্যতীত) শুধু বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করতে হয়। তেলাওয়াতকালে সূরা তাওবা মাঝখানে আসলে তখন বিস্‌মিল্লাহ পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথম তেলাওয়াতই যদি সূরা তওবা দ্বারা আরম্ভ করতে হয়, তাহলে আ'উযুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ উভয়টি পাঠ করতে হবে। তেলাওয়াতের মাঝখানে যদি কোনো কারণবশত বিরতি দিতে হয়, তাহলে পুনঃ আরম্ভ করতে হলে 'আউযুবিল্লাহ পাঠ করা জরুরি।

اَللّٰهُ শব্দের বিশ্লেষণ : اَللّٰهُ শব্দটি মহান আল্লাহর জাতিবাচক নাম এবং ইসমে আযম। এ পবিত্রতম নামটি বচনগত পার্থক্য থেকে মুক্ত। জগতের কোনো ভাষায়, শব্দে অথবা প্রতিশব্দে এর অনুবাদও হতে পারে না। اَللّٰهُ বলতে অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকেই বুঝায়। যিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও পালনকর্তা। এ নামে অন্য কোনো কিছুকে আখ্যা দেওয়া হয়নি এবং হবেও না।

আবার কোনো কোনো তাফসীরকারকদের মতে اَللّٰهُ শব্দটি اَلْاِلٰهُ শব্দ হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। এটি একটি গুণবাচক শব্দ। ইসলামের পূর্বে এ শব্দ দ্বারা প্রকৃত ও কল্পিত উভয়বিধ উপাস্যকে বুঝানো হতো। পরে শরিয়তে اَللّٰهُ শব্দটিকে প্রকৃত ও একক উপাস্য বিশ্ব স্রষ্টার জন্যই নির্ধারিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ইসমে জাত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত মতই নির্ভরশীল ও গ্রহণীয়।

اَلشَّيْطَانِ শব্দের বিশ্লেষণ : شَيْطَانٌ শব্দটি شَطَنٌ বা شَيْطٌ মূলধাতু হতে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হচ্ছে দূরীভূত, বিতাড়িত ও পথভ্রষ্ট। এ জন্য সরল, সঠিক পথ হতে বিচ্ছিন্নকারী প্রত্যেক জীবকে 'শয়তান' বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

رَجِيْم শব্দের বিশ্লেষণ : رَجِيْم শব্দটি رَجْمٌ ধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে অভিশপ্ত, দূরীভূত, বিতাড়িত। যেহেতু শয়তান আল্লাহর আদেশ অমান্য করে অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত হতে ফেরেশতাদের দ্বারা নক্ষত্রের ঢিলে বিতাড়িত হয়েছিল তাই তাকে اَلشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বা বিতাড়িত শয়তান নামে আখ্যায়িত করা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَعُوْذُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اِثْبَات فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْذُ শব্দমূল (ع ـ و ـ ذ) জিনসে اجوف واوى অর্থ– আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَجِيْمٌ : এ শব্দটি فَعِيْلٌ এর ওজনে اِسْم فَاعِل مُبَالَغَة -এর সীগাহ। অর্থ– অত্যধিক অভিশপ্ত।

বাক্য বিশ্লেষণ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ : اَعُوْذُ ফে'ল, এতে اَنَا যমীর ফায়েল, بَاء শব্দটি হরফে জার, اللّٰهِ শব্দটি মাজরূর/ জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক। مِنَ হরফে জার اَلشَّيْطَانِ মাওসূফ, اَلرَّجِيْمِ সিফাত; মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে দ্বিতীয় মুতা'আল্লিক। ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়াহ গঠিত হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সরল অনুবাদ : পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

শাব্দিক অনুবাদ : بِسْمِ اللّٰهِ আল্লাহর নামে (শুরু করছি) الرَّحْمٰنِ (যিনি) পরম করুণাময় الرَّحِيْمِ অতি দয়ালু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **-এর বিশ্লেষণ :** সকল মুসলমান এতে একমত যে, এ আয়াতটি কুরআনে কারীমের সূরা নামল-এর একটি আয়াতের অংশ। আর এতেও একমত যে, সূরা তাওবা ব্যতীত সকল সূরার প্রথমে بِسْمِ اللّٰهِ লেখা হয়। এটি কি সূরা ফাতিহার অংশ না সকল সূরারই অংশ তা নিয়ে ইমামগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, بِسْمِ اللّٰهِ সূরা নামল ব্যতীত অন্য কোনো সূরার অংশ নয়। তবে এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত, যা প্রত্যেক সূরার প্রথমে লিখা হয়েছে (সূরা তাওবা ব্যতীত) এবং দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

এ আয়াতকে تَسْمِيَة বলা হয়। এর মর্মার্থ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা। যেহেতু কোনো কাজের শুরুতে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণের উদ্দেশ্যে এটি পঠিত হয় তাই একে তাসমিয়া বলা হয়।

এ কল্যাণময় বাক্যে আল্লাহ তা'আলার তিনটি মহিমান্বিত নামের সমাবেশ ঘটেছে, আর তা হচ্ছে আল্লাহ্, রাহমান ও রাহীম। এ আয়াতটির মধ্যে একটি ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে। ক্রিয়া পদটি উহ্য থাকার তাৎপর্য হচ্ছে যে, মুসলমানের যাবতীয় শুভ কাজের সূচনা এ কল্যাণময় বাক্য দ্বারা করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ **এর ব্যাখ্যা :** ভাষার নিয়ম অনুযায়ী بِسْمِ اللّٰهِ-এর بَاء বর্ণটি আল্লাহর নামের পূর্বে اِسْم শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে মাসহাফে উসমানীতে সাহাবীগণের সম্মিলিত অভিমত উদ্ধৃত করে মন্তব্য করা হয়েছে যে, بَاء বর্ণটি আলিফের সঙ্গে মিলিয়ে এবং اِسْم শব্দটি পৃথকভাবে লেখা উচিত ছিল। এমতাবস্থায় শব্দের রূপ হতো بِاسْمِ اللّٰهِ কিন্তু মাসহাফে উসমানীর লিখন পদ্ধতিতে 'হামযাহ; বর্ণটি উহ্য রেখে بَاء বর্ণটিকে سِيْن-এর সাথে যুক্ত করে লিখে بَاء কে اِسْم-এর অংশ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে অর্থ হয় আল্লাহর নামে আরম্ভ। একই কারণে অন্যত্র الف-কে উহ্য রাখা হয়নি, যেমন– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ এতে بَاء-কে الف-এর সাথে লিখা হয়েছে। মোটকথা, বিস্‌মিল্লাহর বেলায় বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসরণ করেই بَاء বর্ণকে اِسْم-এর সঙ্গে মিলিত করে লিখার নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **শব্দদ্বয়ের বিশ্লেষণ :** رَحْمٰن শব্দটি فَعْلَانٌ-এর ওযনে এবং رَحِيْم শব্দটি فَعِيْل-এর ওযনে رَحْمٌ মাসদার হতে নির্গত। رَحْمٰن-এর অর্থে এমন আধিক্য বিদ্যমান, যা رَحِيْم শব্দে নেই।

ইবনুল হিসারসহ অনেক ভাষাবিদের মতে الرَّحْمٰنِ শব্দটি اَلرَّحْمَةُ হতে নিষ্পন্ন। অর্থাৎ এমন দয়াপরায়ণ সত্তা যার দয়ার কোনো তুলনা নেই।

رَحْمٰن ও رَحِيْم উভয়টি মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম। রাহমান অর্থ– সাধারণ ও ব্যাপক রহমতের অধিকারী এবং রাহীম অর্থ– পরিপূর্ণ ও বিশেষ রহমতের অধিকারী। رَحْمٰن শব্দটি আল্লাহ তা'আলার 'যাতের' সাথে নির্দিষ্ট, তাই কোনো সৃষ্টিকে রাহমান বলা যায় না। কারণ, আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো সত্তা নেই, যার রহমত বা দয়া সমগ্র বিশ্বচরাচরে সমভাবে বিস্তৃত হতে পারে। তাই আল্লাহ শব্দের ন্যায় রাহমান শব্দেরও বচনভেদ হয় না। কেননা শব্দটি একক সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। –[কুরতুবী]

اَلرَّحْمٰن ও اَلرَّحِيْم শব্দদ্বয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তিনভাবে হতে পারে। যথা–

১. اَلرَّحْمٰن ও اَلرَّحِيْم উভয় শব্দই পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ আল্লাহ এই পৃথিবীতে মুসলিম, কাফের, মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল মানুষের উপর তাঁর দয়া বর্ষণ করেন, সে হিসেবে তিনি اَلرَّحْمٰن। আবার এ পৃথিবীতে তিনি মুসলমানদের উপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন, তাই তিনি রাহীম।

২. اَلرَّحْمٰن দ্বারা মহান আল্লাহ যে ইহ ও পরজগতে রহমত বর্ষণকারী তা বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে اَلرَّحِيْم দ্বারা তিনি যে বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি পরকালীন রহমত বর্ষণকারী সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. اَلرَّحْمٰن দ্বারা শুধু পরকালীন রহমত এবং اَلرَّحِيْم দ্বারা ইহকালীন রহমতকে বুঝানো হয়েছে। এ অর্থ অনুযায়ী اَلرَّحْمٰن শব্দের অর্থে আধিক্য বিদ্যমান। কারণ পরকালীন নিয়ামতের তুলনায় ইহকালীন নিয়ামত অতি তুচ্ছ। –[কাশশাফ]

اَلرَّحْمٰن কে اَلرَّحِيْم -এর পূর্বে নেওয়ার কারণ : اَلرَّحْمٰن ও اَلرَّحِيْم উভয় শব্দই আধিক্যের অর্থপ্রকাশক এবং স্থায়ী গুণবাচক শব্দ। اَلرَّحْمٰن কে اَلرَّحِيْم -এর পূর্বে আনার কারণ হলো–

(ক) اَلرَّحْمٰن দ্বারা মহান আল্লাহ যে, এ পৃথিবীতে মু'মিন, কাফের নির্বিশেষে সকল সৃষ্টজীবের প্রতি রহমত বর্ষণকারী তা বুঝানো হয়েছে। আর اَلرَّحِيْم দ্বারা তিনি যে পরকালে মু'মিনদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর নিয়ামত ও রহমত আখেরাতের পূর্বে বিধায় اَلرَّحْمٰن -কে পূর্বে আনা হয়েছে।

(খ) اَللّٰه শব্দটি যেমন মহান সত্তা ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না তেমনি اَلرَّحْمٰن শব্দটিও অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এ দিক দিয়ে শব্দ দু'টির মাঝে মিল রয়েছে। তাই এ শব্দ দু'টিকে পাশাপাশি উল্লেখপূর্বক اَلرَّحِيْم -কে পরে নেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক বৈধ কাজে বিসমিল্লাহ বলার রহস্য

জাহিলিযুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীর নামে শুরু করতো। এ প্রথা রহিত করার জন্য হযরত জিবরাঈল (আ.) পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম যে বাণী নিয়ে এসেছেন তাতে ইরশাদ হয়েছে– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ, পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে। অতঃপর বিসমিল্লাহ অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলামে সর্বকালের জন্য বিসমিল্লাহ বলে যাবতীয় বৈধ কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে।

মুসলিম ব্যক্তি তার প্রতিটি কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করার মাধ্যমে আল্লাহমুখী হয়ে উঠে। বারবার আল্লাহর নামে কাজ শুরু করার মাধ্যমে সে প্রতি মুহূর্তেই আনুগত্যের স্বীকারোক্তির নবায়ন করে যে, আমার অস্তিত্ব ও আমার যাবতীয় কাজ-কর্ম এক আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্য ব্যতীত সম্পাদিত হতে পারে না। এ নিয়তের ফলে তার উঠা-বসা, চলা-ফেরা, লেখা-পড়া, খাওয়া-দাওয়া ও চাকরি-ব্যবসাসহ পার্থিব জীবনের সকল কাজ-কর্ম ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়।

বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করতে যেমন সময়ের কোনো অপচয় ঘটে না তেমনি কষ্টও হয় না; বরং এতে তার প্রতিটি কাজ দীনের কাজে রূপান্তরিত হয় এবং সে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়।

বিসমিল্লাহর ফজিলত

হাদীস শরীফে এসেছে– যেসব ভালোকাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করা হয়নি তা লেজকাটা অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। রাসূল ﷺ আরো বলেছেন– যে কাজ বিসমিল্লাহ ব্যতীত শুরু করা হয়, তাতে কোনো বরকত থাকে না। তাফসীরকারগণ বলেন, বিসমিল্লাহর মধ্যে ১৯ টি হরফ রয়েছে, জাহান্নামের ফেরেশ্‌তাও উনিশ জন। যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ পড়বে, তার জন্য এর বরকতে এক এক ফেরেশতা দূরে সরে যাবে। যদি মা-বাবা কবরে আজাবে নিপতিত থাকে আর সন্তান মক্তবে বিসমিল্লাহ পড়ে, তখন মা-বাবার আজাব হালকা হয়ে যায়। বিসমিল্লাহ ছাড়া জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করা হালাল হয় না।

বিসমিল্লাহ পাঠের বিধান : বিসমিল্লাহ যেহেতু কুরআন কারীমের একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত, তাই এর বিধান পবিত্র কুরআনের অনুরূপ। অন্যান্য আয়াতের মতো এ আয়াতটিরও সম্মান করা ওয়াজিব। অজু ছাড়া এটি স্পর্শ করা জায়েজ নয়। গোসল ফরজ হয় এরূপ অপবিত্র অবস্থায় তেলাওয়াতরূপে পাঠ করাও নাজায়েজ। তবে কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে দোয়া রূপে পাঠ করা সর্বাবস্থায় জায়েজ ও ছওয়াবের কাজ।

বাক্য-বিশ্লেষণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : بَاء হরফে জার, اِسْمِ টি মুযাফ, اللّٰهِ মাওসূফ, اَلرَّحْمٰنِ এবং اَلرَّحِيْمِ উভয়টি সিফাত, মাওসূফ ও উভয় সিফাত মিলে মোযাফ ইলাইহ, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরুর; জার মাজরুর মিলে মুতা'আল্লিক হলো اَبْتَدِأُ উহ্য ফে'ল -এর, اَبْتَدِأُ ফে'ল তাতে اَنَا যমীর ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হলো।

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

সূরা ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৭, রুকূ-১
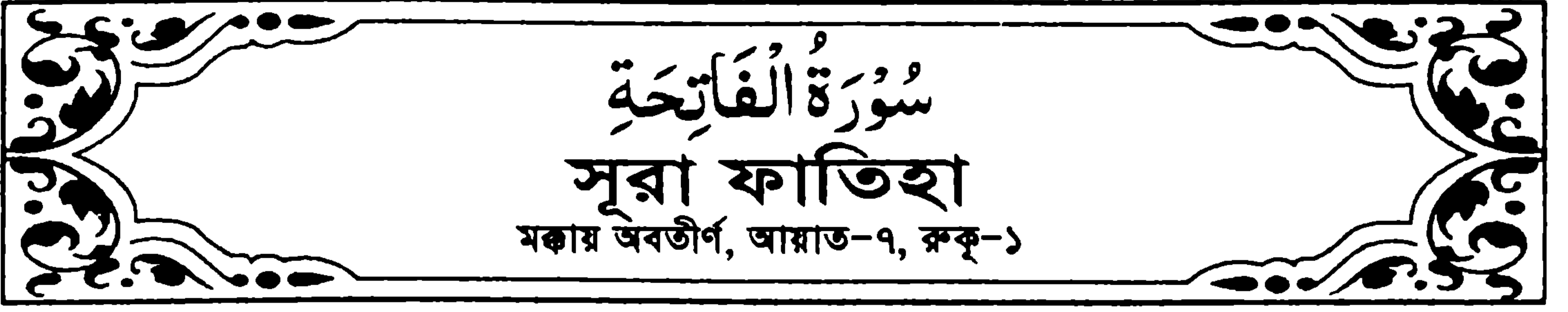
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই উপযোগী- যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١)
(২) যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢)
(৩) যিনি প্রতিফল-দিবসের [কিয়ামত-দিবসের] মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٣)
(৪) আমরা আপনারই ইবাদত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٤)
(৫) আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٥)
(৬) ঐ লোকদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন।	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٦)
(৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব বর্ষিত হয়েছে, আর না তাদের পথ, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।	غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ (٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(১.) اَلْحَمْدُ সমস্ত প্রশংসা لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলারই উপযোগী رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক

(২) الرَّحْمٰنِ যিনি পরম করুণাময় الرَّحِيْمِ অতি দয়ালু ।

(৩) مٰلِكِ যিনি মালিক يَوْمِ الدِّيْنِ প্রতিফল দিবসের ।

(৪) اِيَّاكَ نَعْبُدُ আমরা আপনারই ইবাদত করছি وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।

(৫) اِهْدِنَا আমাদেরকে প্রদর্শন করুন الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ সরল পথ ।

(৬) صِرَاطَ الَّذِيْنَ ঐ লোকদের পথ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন ।

(৭) غَيْرِ তাদের পথ নয় الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ যাদের প্রতি আপনার গজব বর্ষিত হয়েছে وَلَا আর না তাদের পথ الضَّآلِّيْنَ যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহের মধ্যে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম স্থান লাভ করেছে। এটি কেবল সংকলনগত বিন্যাসই নয়; বরং নাজিল হওয়ার দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে এ সূরাটিই প্রথম।

নামকরণ : ফাতিহা শব্দের অর্থ হচ্ছে– আরম্ভিকা, অবতরণিকা, উদ্বোধনী, উপক্রমণিকা ইত্যাদি। বাংলায় একে ভূমিকা বা মুখবন্ধ বলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরাটিকে فَاتِحَةُ الْكِتَابِ বা 'গ্রন্থের সূচনা' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রসঙ্গ : রাসূল ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর এ সূরাটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে। এটি পবিত্র কুরআনের সর্বাগ্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে সূরাটির অধিক গুরুত্ব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

এ সূরার অন্যান্য নামসমূহ : উপরিউক্ত নামটি ছাড়াও হাদীসে এ সূরাকে আরো কতিপয় তাৎপর্যবহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন–

২. উম্মুল কুরআন (কুরআনের উৎস)।

৩. উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল)। কেননা পূর্ণাঙ্গ কুরআন এ সূরাটির স্থূল বিষয়সমূহের বিস্তৃত বিবরণ।

৪. আল-কানয (সর্বজ্ঞানাধার)। কেননা এতে সূক্ষ্মভাবে যাবতীয় জ্ঞানের প্রতি দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৫. আল-কাফিয়া (স্বয়ংসম্পূর্ণ)। কেননা এতে রীতি-নীতি থেকে কর্ম-নীতি পর্যন্ত সব কিছুর জন্য সংক্ষেপিত দিক নির্দেশনা রয়েছে।

৬. আসাসুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তি)। কেননা এতে কুরআনের মৌলিক বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

৭. আসসাব'উল-মাছানী (নিত্যপাঠ্য বাণী সপ্তক)। কেননা নামাজে এ সূরাটি পুনঃ পুনঃ পঠিত হয়ে থাকে।

৮. সূরাতুল হামদ (প্রশংসাসূচক সূরা)। কেননা এ সূরাটির সূচনা আল-হামদু দ্বারা করা হয়েছে।

৯. সূরাতুস সালাত (নামাজের সূরা)। কেননা এ সূরাটি ছাড়া নামাজ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না।

১০. আদইয়াউল মাসআলা (যাচনার সূরা)। কেননা এতে আল্লাহর প্রতি বান্দার বিনয় প্রকাশ ও জীবনের মুখ্য বিষয়ের প্রার্থনা রয়েছে।

১১. সূরাতুশ-শিফা (রোগমুক্তির সূরা)। কেননা মর্মার্থসহ এ সূরাটি তেলাওয়াত করলে মানসিক ও দৈহিক রোগমুক্তি লাভ হয়।

১২. সূরাতুল ওয়াফিয়া (পূর্ণাঙ্গ সূরা); কেননা এ সূরাটি স্থূলভাবে জীবনের সর্ববিষয়ের ধারক ও বাহক।

১৩. সূরাতুল মুনাজাত (প্রার্থনার সূরা); কেননা এ সূরাটিতে আল্লাহর সমীপে প্রয়োজনীয় প্রার্থনার বচন রয়েছে।

১৪. সূরাতুল তাফবীয (আত্মসমর্পণের সূরা); কেননা এ সূরার মর্মকথা হলো, নিজেকে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করা।

১৫. সূরাতুর রুকইয়া (রক্ষা কবচমূলক সূরা); কারণ এতে মানসিক ক্লেদ মুক্তি ও দৈহিক জ্বরা মুক্তির গুণাবলি রয়েছে।

১৬. সূরাতুশ-শুকর; কেননা এ সূরাটি দ্বারা আল্লাহর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

১৭. সূরাতুন নূর; কেননা এ সূরাটি মন-মানসিকতার পরিচ্ছন্নতার জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

সূরার বিষয়বস্তু : মূলত এ সূরা একটি প্রার্থনার পদ্ধতি মাত্র। এ সূরার প্রথমার্ধে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর বিশেষ গুণগান প্রার্থনার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর প্রতি অনুগত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ তা'আলা এ প্রার্থনা পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। এ সূরার প্রারম্ভে রয়েছে সর্বগুণাধার আল্লাহ নামের মহত্ত্বের স্বীকৃতি ও তাঁর বন্দনা। অতঃপর ইহলোক ও পরলোকে তাঁর অন্যতম গুণবত্তার স্বীকৃতি। তৎপর তাঁর সাথে পরম আত্মীয়তার সূত্রে তাঁর দাসত্বের স্বীকৃতি ও সর্ববিষয়ে তাঁর সাহায্যের প্রার্থনা। অতঃপর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মহামনীষীদের অনুসৃত সরল পথ প্রাপ্তির আবেদন এবং পরিশেষে অভিশপ্ত জাতিগুলোর বিকৃত পথ হতে রক্ষা করার আকুল মিনতি। মূলত এগুলোই কুরআনের সারবস্তু।

এ সূরায় প্রার্থনা করা হয়– হে আল্লাহ! আমরা সর্ববিষয়ে একমাত্র আপনার দাসত্ব স্বীকার করি এবং একমাত্র আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার প্রিয় বান্দাদের অনুসৃত সত্য ও সঠিক পথ দেখান এবং অভিশপ্ত জাতির বিকৃত পথ থেকে আমাদেরকে দূরে রাখুন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ কুরআন মানুষের সম্মুখে জীবনবিধান রূপে পেশ করে পরবর্তী সূরার শুরুতেই "এ কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, এটা সত্য অনুসন্ধানকারীদের জন্য একমাত্র জীবন-বিধান" একথা বলে দেওয়া হয়েছে।

সূরার মাহাত্ম্য : রাসূল ﷺ বলেন, এ সূরার তুল্য তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে কোনো সূরা নেই। কুরআন মাজীদ সব স্বর্গীয় গ্রন্থের মূল, আর সূরা ফাতিহা কুরআন মাজীদের মূল। যে ব্যক্তি ফাতিহা পাঠ করল সে যেন সমগ্র তাওরাত, যাবুর

ইনজিল ও কুরআন মাজীদ পাঠ করল এবং যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহার তাফসীর জানল, সে যেন সমগ্র কুরআন মাজীদের তাফসীর অবগত হলো. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, সূরা ফাতিহার কল্যাণে সর্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয়ে যায়। উক্ত সূরা কুরআন মাজীদের মূল এবং সব রকমের পীড়ায় আরোগ্যপ্রার্থীদের মহৌষধ। হযরত জাফর সাদিক (রা.) বলেন, "আলহামদু শরীফ চল্লিশবার পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিয়ে রোগীর মুখে ছিটিয়ে দাও. ইনশাআল্লাহ রোগমুক্ত হবে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফেরেশতা কর্তৃক সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে দু'টি উজ্জ্বল জ্যোতি প্রাপ্ত হয়েছেন, যা তাঁর পূর্ববর্তী কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। তা হতে একটি সূরা ফাতিহা, অপরটি হলো সূরা বাকারার শেষ কয়েকটি আয়াত। –[ইবনে কাছীর, খাযিন]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, সূরা ফাতিহা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম তিনটি আয়াত আল্লাহর জন্য নিবেদিত ও শেষের তিনটি আয়াত বান্দার জন্য বিশেষিত। আর إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ আয়াতটি আল্লাহ এবং বান্দা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত। অর্থাৎ إِيَّاكَ نَعْبُدُ আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আর وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ বান্দার জন্য বিশেষিত। কারণ সাহায্য প্রার্থনা করাটাই হলো বান্দার নিজের জন্য নির্ধারিত। এ সূরাটি দোয়া কবুল হওয়া এবং বিভিন্ন বিপদ-মসিবত দূরীভূত হওয়ার জন্য অধিক কার্যকর।

সূরার শানে নুযূল : আল্লামা ওয়াহিদী কর্তৃক বর্ণিত 'আসবাবুন নুযূল' গ্রন্থে এবং আল্লামা ছা'লাবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সূরায়ে ফাতেহা আরশের তলদেশ থেকে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, সূরায়ে ফাতিহা যখন নাজিল হয়, তখন ইবলিস কেঁদেছিল। আর তা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসিরগণ উভয় বর্ণনা যথাস্থানে সঠিক বলেই মত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেন যে, সূরায়ে ফাতিহা দু'বার নাজিল হয়েছে। একবার মক্কায় দ্বিতীয়বার মদিনায় অবতীর্ণ হয়। সূরা আল-ফাতিহা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে রাসূল ﷺ -এর উপর একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে এটাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বে শুধু কয়েকটি খণ্ড আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যা সূরা আল-আলাক, মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাস্সিরের অন্তর্ভুক্ত।

একদা রাসূল ﷺ নির্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, হে মুহাম্মদ! তিনি উপরে দিকে তাকিয়ে দেখলেন আকাশ ও জমিনের মাঝে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। এতে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসেন। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকলে তিনি হযরত খাদীজা (রা.)-কে তা জানান। হযরত খাদীজা বহুশাস্ত্রবিদ জ্ঞানী ওয়ারাকা ইবনে নওফলের নিকট রাসূল ﷺ -কে নিয়ে গেলেন। তিনি ঘটনা শুনে বলে উঠলেন– কুদ্দূসুন, কুদ্দূসুন (শুভ শুভ) তিনি আল্লাহর বাণীবাহক হযরত জিবরীল (আ.)।

অতঃপর তিনি বললেন, আবার এরূপ অদৃশ্য বাণী শুনলে আপনি ভীত না হয়ে তা শ্রবণ করবেন। পরামর্শ অনুসারে রাসূল ﷺ পুনরায় প্রান্তরের মাঝে দিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে যখন 'ইয়া মুহাম্মদ' ধ্বনি শুনতে পেলেন তখন তিনি 'লাব্বায়েক' (উপস্থিত) বলে সাড়া দিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত নবী এবং আমি তাঁর প্রেরিত ফেরেশতা জিবরাঈল। তখন তিনি বললেন, বলুন! বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অতঃপর 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' থেকে শুরু করে 'ওয়ালাদ দোয়াল্লীন' (আমীন) পর্যন্ত সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করেন। –[দালায়েলে বায়হাকী, ইতকান]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ : حَمْدٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রশংসা, তবে বিশেষ প্রশংসাকে হামদ বলে, আর সাধারণ প্রশংসাকে মাদাহ বলা হয়। তবে হাম্দ দ্বারা পৃথিবীতে যত ধরনের (সৃষ্টি নৈপুণ্যের) প্রশংসা রয়েছে সকল ধরনের প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

দুনিয়াতে যে কোনো স্থানে যে কেনো বস্তুর প্রশংসা করা হয়, বাস্তবে তা আল্লাহরই প্রশংসা। কেননা বিশ্বচরাচরে অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলি, অসংখ্য মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিরাজি আর সীমাহীন উপকারী বস্তুসমূহ সর্বদাই মানব মনকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তাঁর প্রশংসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, সকল বস্তুর অন্তরালেই এক অদৃশ্য সত্তার নিপুণ হাত সদা সক্রিয় রয়েছে।

যখন পৃথিবীর কোথাও কোনো বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তার প্রতিই গিয়ে বর্তায়। আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্তার সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই যে অনন্ত অসীম শক্তির। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর মধ্যে অতি সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা রহিত করা হলো। তা ছাড়া এর দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একত্ববাদের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। কুরআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিতে একদিকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপর দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতি বাস্তবের দিকে আকৃষ্ট করত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পূজা অর্চনাকে চিরতরে রহিত করা হয়েছে।

حَمْد এবং شُكْر ও مَدْح -এর মধ্যে পার্থক্য: حَمْد এবং مَدْح -এর মধ্যে আম ও খাস মুতলাকের সম্পর্ক। হাম্‌দ হলো খাস আর মাদ্‌হ হলো আম। হাম্‌দ হলো কারো স্বেচ্ছাকৃত বিষয়ের প্রশংসা করা, চাই তার পক্ষ থেকে সেটা কোনো নিয়ামত হোক বা অন্য কিছু হোক। আর মাদ্‌হ বলা হয় সাধারণত কারো কোনো উত্তম বিষয়ের প্রশংসা করা, চাই তা ঐ ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত হোক বা খোদা-প্রদত্ত হোক। অতএব, حَمِدْتُ خَالِدًا عَلٰى خُطْبَتِهٖ বলা বৈধ। কিন্তু حَمِدْتُهٗ عَلٰى طُوْلِهٖ বলা বৈধ নয়। কেননা خُطْبَة (বক্তৃতাদান) স্বেচ্ছাকৃত বিষয় আর طُوْل (লম্বা হওয়া) স্বেচ্ছাকৃত নয়। তবে مَدَحْتُهٗ عَلٰى طُوْلِهٖ বলা বৈধ; شُكْر অর্থ হচ্ছে, কারো অনুগ্রহের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা সম্মান প্রদর্শন করা চাই তা বক্তব্যের মাধ্যমে হোক বা কর্মের মাধ্যমে হোক, অথবা বিশ্বাসের মাধ্যমে হোক।

আল্লামা যামাখশারীর মতে مَدْح এবং حَمْد -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ই সমার্থক শব্দ। حَمْد এবং مَدْح - এর বিপরীত ذَمّ আর شُكْر -এর বিপরীতে كُفْر ব্যবহৃত হয়।

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : رب শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– প্রতিপালক। প্রতিপালন বলতে কোনো বস্তুকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে সামনে অগ্রসর করে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দেওয়াকে বুঝায়। এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। তবে সম্বন্ধ পদরূপে অন্যের জন্যও ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয়। কেননা প্রত্যেকটি প্রাণী বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

اَلْعَالَمِيْنَ শব্দটি اَلْعَالَمُ শব্দের বহুবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। যথা–আকাশ-বাতাশ, চন্দ্র-সূর্য, তারকা-নক্ষত্ররাজি, ফেরেশ্‌তাকুল, জিন, জমিন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

অতএব رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক! সৃষ্টিকুলের মধ্যে যা কিছু আমাদের সৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না, সে সবগুলোই এক একটা আলম। তা ছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা দেখতে পাই না। সে জগতের সংখ্যা কেউ বলে চল্লিশ হাজার, আবার কেউ বলে আশি হাজার। এ ছোট বাক্যটির প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট জগতের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত সুদৃঢ় ও কত অচিন্তনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এ সকল জগতের ব্যবস্থাপনার অতি প্রাজ্ঞ পরিচালক একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা।

اَلرَّحْمٰنِ ও اَلرَّحِيْمِ -এর মধ্যকার পার্থক্য : اَلرَّحْمٰنِ ও اَلرَّحِيْمِ শব্দ দু'টি رَحْمٌ ধাতু হতে নির্গত। রাহমান শব্দটি আল্লাহর জন্য খাস, অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা হয় না এবং এর স্ত্রীলিঙ্গও হয় না। বাংলা ভাষায়-এর অর্থ হয় দয়াময়। রাহীম শব্দের অর্থ–বিশেষ দয়ালু। আল্লাহর দয়া দু' প্রকার। এক প্রকার দয়া যা সকলে পাচ্ছে বা ভোগ করছে। এ দয়া হতে কাফের, নাস্তিক, অন্যান্য কাউকেই বঞ্চিত করা হয় না। এ প্রকারের দয়া চিরস্থায়ী থাকে না। শুধু ইহজগতের সাথে সম্পৃক্ত।

দ্বিতীয় প্রকারের দয়া আল্লাহর খাস দয়া, যা ইহলোকে ও পরলোকে চিরস্থায়ী হবে। এ প্রকারের দয়া শুধু তারাই পাবে যারা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য স্বীকার করবে এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মানবে, তারাই হলো মুসলিম। এরাই পরলোকে মুক্তি পাবে, জান্নাত লাভ করবে। তাই আল্লাহ তা'আলা সকলের জন্য দয়ালু, অনুগ্রহদাতা, বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি পরম দয়াশীল, অনুগ্রহশীল ও স্থায়ী নিয়ামতদাতা।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -এর অর্থ : এর আভিধানিক অর্থ 'প্রতিদান দিবসের স্বত্বাধিকারী, একচ্ছত্র অধিপতি'। সাধারণ ব্যবহারে 'ইয়াওম' বলে এক সূর্যোদয় হতে পরবর্তী সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে। আবার আরবি ভাষায় ইয়াওম শব্দটি সাধারণ সময় বা কাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার সুবিশাল সময়কেও ইয়াওম বলা হয়। এখানে সুদীর্ঘ সময় অর্থই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কারণ কর্মফলের সময়টা দ্বিতীয়বার উত্থান-বিষাণে ফুঁক দেওয়ার সময় হতে আরম্ভ করে মানব সৃষ্টির আদি হতে মহাপ্রলয় পর্যন্ত সমস্ত লোকের হিসাব হয়ে জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশ করার হুকুম পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

مَالِكِ এবং مَلِكِ -এর মধ্যকার পার্থক্য : এ শব্দটি মীমের পরে আলিফ এবং আলিফ ছাড়া উভয়ভাবেই পড়া যায়। মক্কা ও মদীনার লোকেরা আলিফ ছাড়া পড়েন। আবার অনেকের মতে আলিফ দিয়ে পড়া উত্তম। اَلْمَلِكُ বলতে বুঝায়, اَلَّذِيْ يُدَبِّرُ اَعْمَالَ رَعِيَّتِهِ الْعَامَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার প্রজা-সাধারণের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন, অথচ তাদের ব্যক্তিগত বিশেষ কাজ ও ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। কিন্তু মালিক (مَالِكُ) সর্ববিষয়ের নিয়ন্তা; এতে একটি অক্ষর বেশি হওয়াতে এর অর্থ অধিকতর ব্যাপক ও সর্বাত্মক হয়েছে।

প্রতিদান দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা : প্রথমতঃ প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরূপ কি? দ্বিতীয়তঃ সমগ্র সৃষ্টির উপর প্রতিদান দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার একক অধিকার থাকবে, তদরূপভাবে আজও সকল কিছুর উপর তাঁরই তো একক অধিকার রয়েছে, সুতরাং প্রতিদান দিবসের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, প্রতিদান দিবস সে দিনই বলা হয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা ভালো মন্দ সকল কাজকর্মের প্রতিদান দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। রোযে-জাযা শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়া ভালো মন্দ কাজ কর্মের প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার স্থান নয়; বরং এটি হলো কর্মস্থল: কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা। যথার্থ প্রতিদান বা পুরস্কার গ্রহণেরও স্থান এটা নয়। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কারো অর্থ সম্পদের আধিক্য ও সুখ শান্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে না যে, এ লোক আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়েছেন বা তিনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র। অপর পক্ষে কাউকে বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না যে, তিনি আল্লাহর অভিশপ্ত। যেমনি করে কর্মস্থলে বা কারখানার কোনো কোনো লোককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে না; বরং সে এ ব্যস্ততাকে জীবনের সাফল্য বলেই গণ্য করে এবং যদি কেউ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা থেকে রেহাই দিতে চায়, তবে তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে মনে করে। সে তার এ ত্রিশ দিনের পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপ সে লাভ করে।

এ জন্যই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশি বিপদাপদে পতিত হয়েছেন এবং তারপর ওলী-আউলিয়াগণ সবচেয়ে অধিক বিপদে পতিত হন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের তীব্রতা যত কঠিনই হোক না কেন, দৃঢ়পদে তাঁরা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত চিত্তেই তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে সত্যবাদিতা ও সঠিকতা এবং বিপদাপদকে খারাপ কাজের নির্দশন বলা যায় না।

অবশ্য কখনো কোনো কোনো কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও প্রকাশ করা হয় বটে, তবে তা সে কাজের পূর্ণ বদলা হতে পারে না। এগুলো সাময়িকভাবে সতর্ক করার জন্য একটু নিদর্শন মাত্র।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ : বাক্যটিতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই একথা জানেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ প্রকাশ্যে, গোপনে জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানা তুলনাযোগ্য নয়। কেননা মানুষের মালিকানা আরম্ভ ও শেষের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ। এক সময় তা ছিল না; কিছু দিন পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য। বস্তুর বাহ্যিক দিকের উপরই বর্তায়; গোপনীয় দিকের উপর নয়। জীবিতের উপর বর্তায়, মৃতের উপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তা'আলার মালিকানা বিশেষভাবে প্রতিদান দিবসের এ কথা বলার তাৎপর্য কি? কুরআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, যদিও দুনিয়াতেও প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তা'আলারই, কিন্তু তিনি দয়াপরবশ হয়ে আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান করেছেন এবং পার্থিব জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। বিশ্বচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর এবং আসবাব-পত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এত একেবারে ডুবে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এ কথা ঘোষণা করে এ অহংকারী ও নির্বোধ-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের। এমন দিন অতি সত্বরই আসছে, যেদিন কেউই জাহেরী মালিকও থাকবে না, কেউ কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাওয়ার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর মালিনা এক ও একক সত্তার হয়ে যাবে।

সূরা ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরার প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা ও তা'রীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর তাফসীরে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ঈমানের মৌলিক নীতি ও আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনাও সূক্ষ্মভাবে দেওয়া হয়েছে।

اَلدِّيْنِ -এর অর্থ : সাধারণ ব্যবহারে দীন অর্থ– ধর্ম, কর্মফল, আইন ইত্যাদি। এখানে কর্মফল অর্থটিই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়– আল্লাহ তা'আলা কর্মফল দিবস তথা বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ শুধু রাহমান-রাহীমই নন, অনুগ্রহকারী আর মেহেরবানই নন, সুবিচারকও বটে। তিনি এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিচারক ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন যে, সেদিন তাঁর অনুমতি ব্যতীত আর কারো একটি বাক্যও উচ্চারণ করার ক্ষমতা থাকবে না, এটাই হবে শেষ বিচার দিবস। ঐ দিনের ফয়সালাই বেহেশত বা দোজখের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ উক্তিতে মাফউলকে ফে'লের পূর্বে নেওয়ার কারণ: এবং اِيَّاكَ نَعْبُدُ এবং وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এ উক্তি দু'টোতে اِيَّاكَ মাফউলকে ফে'ল-এর উপর مُقَدَّمْ করা হয়েছে। অথচ নিয়ম হলো ফে'লকে পূর্বে উল্লেখ করা এবং মাফউল পরে আনা। এরূপ করা হয় اِخْتِصَاصْ -এর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, ফে'লটিকে ঐ মাফউলের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া উদ্দেশ্য হয়। অতএব অর্থ দাঁড়ায়– হে আল্লাহ! "আমরা তোমারই জন্য ইবাদত করি (ইবাদত একমাত্র তোমারই জন্য খাস)। আর তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" অর্থাৎ তুমি ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য চাই না।

اَلْعِبَادَةُ -এর অর্থ : اَلْعِبَادَةُ (ইবাদত) শব্দটি عَبْدٌ -এর ক্রিয়ামূল। আবদ বলা হয় দাস ও বান্দাকে। এটারই ক্রিয়ামূল হলো ইবাদত অর্থাৎ বন্দেগি বা দাসত্ব করা। কথাটির মর্ম নিম্নরূপ–

১. যে বন্দেগী স্বীকার করে সে বান্দা ছাড়া আর কিছু নয়। বান্দা হওয়া ও বান্দা হয়ে থাকাই তার সঠিক মর্যাদা।
২. সৃষ্টির মূলে এমন এক নেতা আছেন যাঁর বন্দেগি করা অপরিহার্য।
৩. যাঁর বন্দেগী করা হবে, তাঁর তরফ হতে নিয়ম ও আইন-বিধান নাজিল হলে যে ব্যক্তি বন্দেগি করবে সে তাঁকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিধানকেও পুরোপুরি মেনে নিতে হবে।
৪. কাউকে মা'বূদ বলে স্বীকার করা এবং তাঁর দেওয়া আইন-কানুন পালন করে চলার একটি অনিবার্য ফলাফল রয়েছে, যে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রেখেই এ বন্দেগির কাজ করা হবে।

عِبَادَةٌ শব্দ থেকেই عُبُوْدِيَّةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ দাসত্বের স্বীকৃতি তথা অধীনতা স্বীকার করা, সর্ববিধ আদেশ-নিষেধ মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। এর আর এক অর্থ مَا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوْعِ وَالْخَوْفِ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভালোবাসা, বিনয় ও ভীতি এসব ক'টি ভাবধারা যাতে সমন্বিত হয় তাই عُبُوْدِيَّةٌ নামে অভিহিত হয়।

মানবের প্রধানতম কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা। মূলত আল্লাহ এ জন্যই মানবকুলকে সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন মানবের পক্ষে এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে চলা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই ইবাদতের অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গে বান্দার ভাষায় ব্যক্ত করা হচ্ছে– হে আমাদের পরওয়ারদিগার! এ কর্তব্য পালনের জন্য তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করছি। এতে আল্লাহর পক্ষ হতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, বান্দা ইবাদতের জন্য দৃঢ়সংকল্প হোক, নিজের সাধ্যমতো এ কর্তব্য পালন করে যাক, আর আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকুক, আমি তাকে শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করব।

اَلْاِسْتِعَانَةُ -এর অর্থ : اَلْاِسْتِعَانَةُ মানে طَلَبُ الْمَعُوْنَةِ অর্থাৎ, সাহায্য প্রার্থনা করা। কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য মতে বান্দার কোনো কাজ আল্লাহর مَعُونَةٌ ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক مَعُوْنَةٌ দু'প্রকার। যথা– ضَرُوْرِيَّةٌ এবং غَيْر ضَرُوْرِيَّةٌ অর্থাৎ, যা ছাড়া কোনো কিছু করা সম্ভব হয় না তাকে ضَرُوْرِيَّةٌ বলা হয়। আর যা ছাড়া কাজ করা যায়; তবে কষ্ট হয়; সহজভাবে করা যায় না তাকে غَيْر ضَرُوْرِيَّةٌ বলে। এখানে اِسْتِعَانَةٌ বলে উভয় প্রকার مَعُوْنَةٌ -কে বুঝানো হয়েছে।

مَعْنَى الْهِدَايَةِ [হেদায়েতের অর্থ] : هِدَايَةٌ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ– পথ প্রদর্শন করা, অথবা পথের শেষ মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। মানুষকে এ হেদায়েত চারটি দিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথমত স্বভাবজাত জ্ঞান হতে কাজের পথ জেনে নেওয়ার সুব্যবস্থা গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনা ও ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে জীবন পথের জ্ঞান অর্জন করা তৃতীয়ত স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধির পথনির্দেশ লাভ করা এবং চতুর্থত দীন হতে পথ নির্দেশনা লাভ করা।

প্রথমোক্ত তিন ধরনের হেদায়েত সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে; কিন্তু এ স্বভাবজাত হেদায়েত দ্বারা মানুষের জীবনের ব্যাপক, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনসমূহ কিছুতেই পূরণ হতে পারে না। জীবনকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করতে হলে দীন ভিত্তিক হেদায়েত একান্ত আবশ্যক যা মানুষের কাছে আসে আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে এবং যা বাস্তবায়ন করেন রাসূলগণ।

اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ-এর অর্থ : اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ-এর বিভিন্ন অর্থ দেখা যায় ; যথা– (১) সিরাতে মুস্তাকীম হলো কিতাবুল্লাহ, (২) ইসলাম, (৩) আবুল আলিয়ার মতে হযরত মুহাম্মদ (সা.), আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর আদর্শ উদ্দেশ্য, (৪) সাহল বলেন, সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবা উদ্দেশ্য, (৫) ইমাম মুযানী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর তরিকাকে সিরাতে মুস্তাকীম বলা হয়েছে এবং (৬) আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, সত্য পথ ও দীন ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

اَلْاِسْتِقَامَةُ-এর অর্থ : اِسْتِقَامَةٌ শব্দের অর্থ– সোজা, সরল হওয়া, সুদৃঢ় হওয়া, اِعْتِدَالٌ তথা সমান্তরাল হওয়া ইত্যাদি। সূরা ফাতিহায় اِسْتِقَامَةٌ বলতে সরল-সোজা পথকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু ইসলাম সরল সোজা পথ তথা নির্ভেজাল জীবন ব্যবস্থা, সেহেতু এখানে ইসলামকেই সিরাতে মুস্তাকীম বলা হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : যারা আল্লাহর পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছে তাদের বর্ণনা সূরা নিসার ৯ম রুকূ'তে নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে– اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন তারা হলেন, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের অন্তর্গত। কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও সম্পূরক বিবরণ হিসেবে অনুগ্রহ প্রাপ্তদের উল্লিখিত প্রকার اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ উক্তির নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা এবং এরাই উক্তিটির মুখ্য ব্যক্তিত্ব।

اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলে ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন– وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের উপর গজব এবং অভিশাপ অবতরণ করেছেন। –(ইবনে কাসীর)

اَلضَّالِّيْنَ বলতে নাসারা তথা খ্রিস্টানদের বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রসঙ্গে বলেছেন– قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا অর্থাৎ 'তারা নিজেরা পূর্বেই ভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেক লোককে ভ্রষ্ট করেছে।'

অথবা, مَغْضُوْب এবং ضَالِّيْنَ বলে মুনাফিক উদ্দেশ্য, অথবা مَغْضُوْب দ্বারা ফাসিক অর্থাৎ কবীরা গুনাহে লিপ্ত উদ্দেশ্য আর ضَالِّيْنَ দ্বারা মন্দ আকিদা পোষণকারীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

সূরা ফাতিহা পঠনান্তে اٰمِيْن বলা প্রসঙ্গ: আমীন শব্দটি কুরআন মাজীদের আয়াত বা অংশ নয়। তবে সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করে আমীন বলা মোস্তাহাব। হাদীসে এসেছে, হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে আমীন বলতে শুনেছি এবং তিনি এতে স্বর দীর্ঘায়িত করেছিলেন। আবূ দাউদে এসেছে যে, রাসূল ﷺ اٰمِيْن শব্দ উচ্চৈঃস্বরে বলতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ-এর নিকট اٰمِيْن শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আয় আল্লাহ! তুমি কবুল করো।' জাওহারী বলেন, এর অর্থ 'এরূপ হোক'। ইমাম তিরমিযী বলেন, এর অর্থ 'আমাদের নিরাশ করো না'। ওলামায়ে কেরামের অধিকাংশ বলেন, সাধারণভাবে এর অর্থ 'আয় আল্লাহ! তুমি আমাদের দোয়া কবুল করো"; কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য অর্থও গৃহীত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে আমীন বলতে শিখিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, চিঠিপত্রে যেরূপ সীলমোহর লাগানো হয়, তদ্রূপ সূরা ফাতিহার জন্য আমীন সীলমোহর স্বরূপ। যখন বান্দা সূরা ফাতিহা পাঠ করে আমীন বলে, তখন ফেরেশতাগণও আমীন বলে থাকেন এবং এরই অসিলায় আল্লাহ তা'আলা পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দেন।

মোটকথা : সূরা ফাতিহা কুরআন মাজীদের সর্বপ্রকার বিষয়বস্তুর সার, এর বিস্তারিত বিবরণ হলো পূর্ণ কুরআন মাজীদ।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْحَمْدُ : এখানে ال টি استغراقى সমস্ত বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত আর حَمْدٌ শব্দটি বাবে سَمِعَ -এর মাসদার, মূলবর্ণ (ح - م - د) জিনস صحيح অর্থ– সকল প্রশংসা, যাবতীয় প্রশংসা।

رَبِّ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَرْبَابٌ সীগাহ واحد مذكر صفت مشبه বহছ বাব نَصَرَ মাসদার رَبًّا، رَبَابَةٌ মূলবর্ণ (ر - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রতিপালক।

الْعٰلَمِيْنَ : এ শব্দটি বহুবচন, একবচনে عَالَمٌ শব্দগত جمع مذكر سالم এবং অর্থগত جمع قلت কিন্তু جمع كثرت -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থ– সমস্ত বিশ্বজগত।

الرَّحْمٰنِ : এ শব্দটি رَحْمَةٌ ধাতু হতে নির্গত, সিফাতের সীগাহ, মূলবর্ণ (ر - ح - م) জিনস صحيح অর্থ– পরম দয়ালু।

مٰلِكِ : এ শব্দটি একবচন, বহুবচন مُلَّاكٌ - مُلْكٌ অর্থ– মনিব, কর্তা।

الدِّيْنِ : এ শব্দটি একবচন, বহুবচন اديان অর্থ– কর্মফল।

نَعْبُدُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مضارع معروف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع - ب - د) জিনসে صحيح অর্থ– আমরা উপাসনা করি, আমরা ইবাদত করি।

نَسْتَعِيْنُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعَانَةُ মূলবর্ণ (ع - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا : এখানে نا শব্দটি যমীরে মানসূবে মুত্তাসিল, সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করুন।

الصِّرَاطَ : এ শব্দটি একবচন, বহুবচন صُرُطٌ অর্থ– রাস্তা, পথ।

الْمُسْتَقِيْمَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সরল, সোজা, সঠিক।

اَنْعَمْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْعَامُ মূলবর্ণ (ن - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন।

الْمَغْضُوْبِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَضَبُ মূলবর্ণ (غ - ض - ب) জিনস صحيح অর্থ– অভিশপ্ত। এখানে اَلْمَغْضُوْبِ এর ال টি اَلَّذِىْ অর্থে যারা অর্থাৎ ইহুদিরা।

الضَّآلِّيْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন ضَالٌّ অর্থ– পথভ্রষ্ট, যারা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পথভ্রষ্ট হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : اَلْحَمْدُ মুবতাদা, لِ হরফে জার, اللّٰه মাওসূফ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে সিফাত; মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর; জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক হলো ثَابِتٌ শিবহে ফে'ল -এর। শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হলো।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ : اِهْدِنَا ফে'ল যমীর ফায়েল, نَا টি মাফঊলে বিহী الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফঊলে বিহী ছানী। অবশেষে ফে'ল, ফায়েল, ও উভয় মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়ায়ে ইনশাইয়্যা হলো।

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ
সূরা বাকারা

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত– ২৮৬, রুকূ'– ৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ (১) আলিফ-লাম-মীম। [আল্লাহ তা'আলাই এর অর্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত]	الٓمّٓ ﴿١﴾
(২) এই কিতাব এমন যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, [এটা] আল্লাহভীরুগণের জন্য পথপ্রদর্শক।	ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾
(৩) ঐ আল্লাহভীরুগণ এমন যে, বিশ্বাস স্থাপন করে অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রতি এবং নামাজ কায়েম/ প্রতিষ্ঠা রাখে, আর আমি তাদেরকে যা প্রদান করেছি, তা হতে ব্যয় করে।	الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾
(৪) এবং তারা এমন যে, বিশ্বাস স্থাপন করে এই কিতাবের প্রতিও যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর ঐ সমস্ত কিতাবের প্রতিও যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আখেরাতের প্রতিও তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।	وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১) الٓمّٓ আলিফ লাম মীম [আল্লাহ তা'আলাই এর অর্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত।]

(২) ذٰلِكَ الْكِتٰبُ এই কিতাব এমন لَا رَيْبَ فِيْهِ যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই هُدًى [এটা] পথ প্রদর্শক لِّلْمُتَّقِيْنَ আল্লাহভীরুগণের জন্য,

(৩) الَّذِيْنَ ঐ আল্লাহভীরুগণ এমন যে, يُؤْمِنُوْنَ বিশ্বাস স্থাপন করে بِالْغَيْبِ অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রতি وَيُقِيْمُوْنَ এবং কায়েম/প্রতিষ্ঠা রাখে الصَّلٰوةَ নামাজ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ আর আমি তাদেরকে যা প্রদান করেছি তা হতে يُنْفِقُوْنَ তারা ব্যয় করে,

(৪) وَالَّذِيْنَ এবং তারা এমন যে, يُؤْمِنُوْنَ বিশ্বাস স্থাপন করে بِمَآ এই কিতাবের প্রতিও যা اُنْزِلَ اِلَيْكَ আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে وَمَآ اُنْزِلَ আর ঐ সমস্ত কিতাবের প্রতিও যা অবতীর্ণ হয়েছিল مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ এবং আখেরাতের প্রতিও তারা يُوْقِنُوْنَ দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা 'আল-ফাতিহা'য় হেদায়েতের পথে পরিচালিত করার জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করা হয়েছিল। আর সূরা 'আল-বাক্বারা'য় উক্ত প্রার্থনা মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে গৃহীত হওয়ার সুসংবাদ দান প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে, 'এটা সেই কিতাব, যাতে কোনোই সন্দেহ নেই'। সুতরাং সেটার অনুসরণ কর : এ দৃষ্টিকোণ থেকে সূরাদ্বয়ের পরস্পরের সম্পর্ক (রবত) সুস্পষ্ট।

নামকরণ : اَلْبَقَرَةُ শব্দটি একবচন, বহুবচন بَقَرَاتٌ অর্থ-গাভী। এ সূরা ৬৭ হতে ৭১ আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের প্রতি গাভী জবাইয়ের আদেশ এবং তাদের অবাধ্যতা সংক্রান্ত ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যদিও এ সূরায় বহুবিধ উন্নত আলোচনা ও হেদায়েতপূর্ণ বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে, তথাপি নামকরণের জন্য সাধারণ সম্পর্ক বা যোগসূত্রই যথেষ্ট।

উল্লিখিত بَقَرَة শব্দ অবলম্বনে অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে اَلْبَقَرَةُ (আল-বাক্বারা)। নবী করীম ﷺ মহান আল্লাহর নির্দেশে শিরোনামের পরিবর্তে প্রত্যেকটি সূরার নাম নির্ধারণ করেছেন। সূরার নামকরণ 'আল-বাক্বারাহ' করার অর্থ এই নয় যে, এতে শুধু গাভী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; বরং অপরাপর বিষয়ের মধ্যে গাভী সম্পর্কিত আলোচনাও এতে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা বাকারার ফজিলত : এ সূরা বহু আহকাম সম্বলিত সবচেয়ে বড় সূরা। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সূরা বাক্বারা পাঠ করো। কেননা এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোনো اَهْلِ بَاطِلْ তথা জাদুকরের জাদু কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

নবী করীম ﷺ এ সূরাকে سَنَامُ الْقُرْاٰنِ (সিনামুল কুরআন) ও ذُرْوَةُ الْقُرْاٰنِ (যারওয়াতুল কুরআন) বলে উল্লেখ করেছেন। سَنَامٌ ও ذُرْوَة বস্তুর উৎকৃষ্ট ও উঁচু অংশকে বলা হয়।

সূরাতুল বাক্বারায় اٰيَةُ الْكُرْسِي নামের একটি আয়াত রয়েছে; তা কুরআন মাজীদের অন্যান্য সকল আয়াত থেকে উত্তম। –[ইবনে কাছীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, এ সূরায় এমন দশটি আয়াত রয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি সেগুলো নিয়মিত পাঠ করে তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের মতো সকল বালা-মসিবত, রোগ-শোক, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে নিরাপদে থাকবে।

তিনি আরো বলেছেন, যদি বিকৃত মস্তিষ্ক লোকের উপর এ দশটি আয়াত পাঠ করে দম করা হয়, তবে সে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করবে। আয়াত দশটি হচ্ছে– সূরার প্রথম চার আয়াত, মধ্যের তিনটি তথা আয়াতুল কুরসী ও তার পরের দুটি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত।

আহকাম ও মাসায়েল : আহকাম ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা বাক্বারা সমগ্র কুরআনে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। এ সূরায় এক হাজার আদেশ, এক হাজার নিষেধ, এক হাজার হিকমত এবং এক হাজার সংবাদ ও ঘটনাবলি রয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

বিষয়বস্তু : সূরা 'আল-বাক্বারা' পবিত্র কুরআনের সর্ববৃহৎ ও দীর্ঘতম সূরা। এতে ২৮৬ টি আয়াত ও ৪০টি রুকূ' রয়েছে এ সূরায় শরিয়তের আহ্কাম, রীতি-নীতি, আদেশ-নিষেধ যত অধিক বর্ণিত হয়েছে, তত অধিক অন্য কোনো সূরায় বর্ণিত হয়নি। –[মা'আরিফুল কুরআন]

এ সূরার শুরুতে বলা হয়েছে– 'এটা সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী।' অতঃপর মু'মিন, কাফের ও মুনাফেকদের পরিচিতি বর্ণনা করে– মু'মিনগণ কিভাবে মহান আল্লাহর আদেশ মান্য করে, আর কাফের ও মুনাফেকরা কিভাবে অমান্য করে, তা বর্ণিত হয়েছে। জীবন, মৃত্যু, পুনর্জীবন, পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি, খলিফা নিয়োগের সংকল্প, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, পৃথিবীতে অবতরণ ও মার্জনা লাভ, বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন অনুগ্রহ, তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ ও প্রতিশ্রুতি দান এবং তাদের অবাধ্যতা ও পরিণাম প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর আহলে কিতাবদের বাকবিতণ্ডা এবং কিভাবে আহলে কিতাবরা নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং গর্ব ও অহঙ্কার শেষে রাসূল ﷺ -কে অস্বীকার করে, তা বিস্তারিত ও সুবিন্যস্ত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ প্রসঙ্গ এবং একে পবিত্রকরণ, সার্বজনীন ধর্ম স্থাপন এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বিনীত প্রার্থনা সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর 'বাইতুল মাকদিস-এর পরিবর্তে পবিত্র কা'বাকে কেবলা নির্ধারণ করে একে উপাসনার কেন্দ্র নির্দেশ করা হয়েছে এবং তার কারণে আহলে কিতাবদের অন্তরে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তা আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করার পর শরিয়তের হুকুম-আহকাম, খাদ্য, পানীয়, সালাত, সাওম, জাকাত, হজ, কিসাস, অসিয়ত, জিহাদ, বিয়ে, তালাক, মহরানা, ঈলা, খুলা, রাজা'আত, ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, বন্ধক, মদ, জুয়া, অনাথ, এতিম, ঋণ আদান-প্রদান ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ, প্রাণ ও ধন উৎসর্গ, আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক যোগ্যতা, জ্ঞানবল-বাহুবলই যে জাতীয় নেতৃত্বের অন্যতম মানদণ্ড তা বিবৃত হয়েছে। অতঃপর মু'মিনদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তালূত-জালূত ও হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলগণের পরস্পরের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ঘোষণা, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে নমরূদের বিতর্কের ঘটনা আলোচিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পথে দান, দানের নামে নির্যাতনের পরিণাম, লেনদেনে সাক্ষী ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব এবং কাফেরদের বিপক্ষে সফলতা অর্জনে মু'মিনদের দোয়া শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে সূরাটি শেষ করা হয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : সূরা 'আল-বাক্বারা'-এর বেশিরভাগ আয়াত নবী করীম ﷺ-এর মাদানী জীবনের প্রথম যুগে অবতীর্ণ হয়। কারো কারো মতে মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে এ সূরাটি প্রথম। শুধুমাত্র وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ মহানবী ﷺ -এর জীবনের শেষ দিকের আয়াত এবং সুদের আয়াতগুলোও তাঁর জীবনের শেষ দিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা ফাতেহার সাথে সূরা বাকারার সম্পর্ক

সূরা ফাতেহার সাথে সূরা বাকারার সম্পর্ক এই, সূরা ফাতেহাতে বান্দা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথের জন্য আরজি পেশ করেছে, তারই জবাবে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। তাই সূরা বাকারার শুরুতেই ইরশাদ হয়েছে– لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

"এই কিতাব, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, এই কিতাব পথ প্রদর্শক আল্লাহভীরু লোকদের জন্য।

অতএব সূরায়ে ফাতেহায় হেদায়েতের যে দরখাস্ত করা হয়েছে তা মঞ্জুর হওয়ার খোশখবরী রয়েছে সূরা বাকারার প্রারম্ভে।

قَوْلُهُ الٓمّٓ ...... هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উক্ত আয়াতসমূহ মালেক ইবনে সাইফ ইহুদি প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে। সে মুমিনদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টির মানসে বলত– 'এ কুরআন সেই কিতাব নয়, যার সুসংবাদ পূর্ববর্তী কিতাবে দেওয়া হয়েছে। তখন মহান রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম তাদের বিভ্রান্তিকর উক্তির সন্দেহ দূর করেন। অতঃপর চারটি আয়াত মুমিনদের প্রশংসায়, দুটি আয়াত কাফেরদের অসৎ চরিত্র বর্ণনা এবং পরবর্তী আয়াতটি মুনাফিকদের নিন্দায় নাজিল করেন। –[লুবানুন নুকূল]

- ❖ কেউ কেউ বলেন, মহান রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুভ সংবাদ রূপে এ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, 'আমি আপনার উপর অতি সুন্দর ও অতুলনীয় গ্রন্থ নাজিল করব। যখন পবিত্র কুরআন নাজিল হতে শুরু করে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করেন– 'হে প্রতিপালক! এটাই কি সেই কিতাব, যার সংবাদ আপনি পূর্বে দিয়েছিলেন? তখন মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় রাসূলের ইচ্ছা ও প্রশ্নের উত্তরে অত্র আয়াতগুলো নাজিল করেন।
- ❖ নবী করীম ﷺ প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করার পর যখন তথাকার অধিবাসীগণ ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে এবং ইসলাম ধর্মের গৌরব ও শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন ইহুদিরা তার নবুয়ত, রিসালাত ও পবিত্র কুরআনকে সত্য বলে অস্বীকার করে এবং জনমনে সন্দেহ সৃষ্টির অপকৌশল অবলম্বন শুরু করে। তখন তার প্রতিবাদে এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

الٓمّٓ এর বিশ্লেষণ : পবিত্র কুরআনের বহু সংখ্যক সূরার শুরুতে এ ধরনের 'হরফ বা বর্ণ রয়েছে। এসব হরফ বা বর্ণকে حُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ বলা হয়। এগুলোর সঠিক অর্থ মানুষের জ্ঞানের অগম্য। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর মধ্যবর্তী এ রহস্য অন্যের নিকট অপ্রকাশ্য। কেউ কেউ এগুলোর তাফসীরও করেছেন; কিন্তু তাদের এ তাফসীরে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

- ❖ হযরত ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, এগুলো সূরার নাম।
- ❖ আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, এগুলো পবিত্র কুরআনের নামের মধ্যে অন্যতম।
- ❖ আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো আল্লাহ্র নাম।
- ❖ প্রখ্যাত মুফাস্সির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, الم এটা আল্লাহর নাম।
- ❖ অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে, এটা আল্লাহর কসম এবং তাঁর নাম।

- ❖ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, الٓمٓ অর্থ– اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ আমিই অভিজ্ঞ আল্লাহ।
- ❖ কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন, 'আলিফ অর্থ– আনা, আহাদ, আযালী, আবাদী, আওয়াল ও আখির অর্থাৎ আমি, অদ্বিতীয়, অসীম, অনন্ত, আদি ও অন্ত; আর 'লাম অর্থ– আল্লাহ লাতীফুন– সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ; 'মীম অর্থ– মিন্নী, মাজীদ, মা'বুদ ও মালিক। এরূপ আরো অনেক অর্থ মুফাস্‌সিরগণ করেছেন। গ্রহণযোগ্য ও সঠিক অভিমত হলো, এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। সর্বসাধারণের জন্য এর অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করা অনুচিত।

ذٰلِكَ হলো اِسْمُ اِشَارَهْ لِلْبَعِيْد বা দূরজ্ঞাপক। তবে আরবি সাহিত্যের সাধারণ ব্যবহারে ذٰلِكَ 'ইহা এবং 'উহা উভয় অর্থে ব্যবহৃত; তাই প্রখ্যাত মুফাস্‌সির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে ذٰلِكَ অর্থ হচ্ছে هٰذَا এ দু'টো اِسْمُ اِشَارَهْ একটি অন্যটির স্থলে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, এটা দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে الٓمٓ -এর প্রতি। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে ذٰلِكَ দ্বারা সেই কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর সাথে ইতঃপূর্বে اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا-এর মাধ্যমে করেছিলেন।

অথবা, এখানে ذٰلِكَ অর্থাৎ দূরজ্ঞাপক ইসমে ইশারাহ সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারো কারো মতে এখানে 'লাওহে মাহফূয-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ **এর ব্যাখ্যা :** এ কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। পবিত্র কুরআনের সাবলীল ভাষা, বর্ণনার মাধুর্য, অকাট্য যুক্তি ও বিজ্ঞানময় বক্তব্য তার যথার্থতা প্রমাণ করে। কিন্তু কেউ যদি অবাস্তব সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে, তাতে পবিত্র কুরআনের বাস্তবতা বিনষ্ট হবে না; বরং এতে সত্য বিমুখতাই প্রমাণিত হবে। এ জন্য পবিত্র কুরআনে সন্দেহের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হলেও সন্দেহকারীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়নি।

اَلْكِتٰبُ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** কিতাব অর্থ লিখিত পুস্তক, অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থা। এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনুল কারীম। কালামুল্লাহর অংশবিশেষকে কিতাব বলা হয়। কিতাবের সংজ্ঞা বা পরিচিতি প্রদানে ওলামায়ে কেরাম বলেন,

اَمَّا الْكِتَابُ فَالْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ۔

অর্থাৎ কিতাব হলো কুরআন যা নবী করীম ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ ও মাসাহেফে লিখিত এবং নবী করীম ﷺ হতে এমনভাবে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, যাতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

لَا رَيْبَ فِيْهِ **-এর অর্থ :** কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী, কুরআন সম্পর্কে অপবাদজনিত কোনো প্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই। কোনো কালাম বা বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দু'কারণে হতে পারে। (১) কালাম ভুল, আর কুরআনের ক্ষেত্রে এ কারণ অসম্ভব। কেননা বিধর্মীরা এটা প্রমাণ করতে পূর্বেই অপারগ হয়েছে। (২) কালাম নির্ভুল, তবে কারো বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতার দরুন সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে। যার উল্লেখ কুরআনের অন্যত্র রয়েছে– وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا الخ যদি তোমরা এতে সন্দেহ পোষণ করো। ...... (বস্তুত বুদ্ধির স্বল্পতা হেতু করো)। তাই মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এরূপ বলা ন্যায়সঙ্গত যে, এ কিতাবে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা পবিত্র কুরআন সত্য তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ যা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত।

ঈমানের অর্থ : অভিধানে اِيْمَانٌ অর্থ হলো تَصْدِيْق বা সত্যতা জ্ঞাপন করা, যেমন আল্লাহর বাণী– وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا অর্থাৎ بِمُصَدِّقٍ لَّنَا - اِيْمَانٌ শব্দটি اَمْنٌ মূলধাতু থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

ফাতহুল মুলহিম-এর গ্রন্থকার ইমাম গাযালী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, শরিয়তের পরিভাষায় ঈমান হলো–تَصْدِيْق এবং اِعْتِقَادٌ অর্থাৎ সে সকল আহকামকে সত্যতা জ্ঞাপন এবং বিশ্বাস করা, যেগুলো মহানবী ﷺ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে। ইমাম বায়যাভী (র.)-এর অভিমতও এরূপ।

ইমাম গাজালী (র.) তাঁর ফায়সালাতুত তাফরেকাহ গ্রন্থে আরও বলেন– اَلْاِيْمَانُ تَصْدِيْقُ النَّبِىِّ بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ عَلَيْهِ অর্থাৎ মহানবী ﷺ যে সকল আসমানি প্রত্যাদেশ নিয়ে এসেছেন সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ইমাম রাযী (র.)ও এই অভিমত পোষণ করেন।

غَيْب-এর মর্মার্থ : غَيْب-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য হওয়া, অনুপস্থিত, মানুষের জ্ঞান এবং অনুভূতির উপরে হওয়া। ঐ সমস্ত জিনিস, যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং অনুভূতির নাগালের বাইরে; যার জ্ঞান নবীদের বলা ব্যতীত লাভ করা যায় না। নবীদের কাছে আগত ওহী, অদৃশ্য জ্ঞান- এ সমস্ত অর্থেই কুরআন মাজীদে غَيْب-এর ব্যবহার হয়েছে। غَيْب শব্দটি পবিত্র কুরআনে نكرة [অনির্দিষ্ট] হিসেবে ব্যবহার হয়নি। আবার ب-এর উপর যবর, পেশ ও যের তিন রূপেই ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই معرفة হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মোট ৪৯ বার শব্দটি এসেছে। মাত্র এক জায়গায় এটি اضافت হয়েছে সর্বনামের দিকে। অবশিষ্ট ৪৮ স্থানে একে ال যোগে معرفة করা হয়েছে এবং প্রথম ইসমের দিকে اضافت হয়েছে। আমরা এখন উদাহরণ স্বরূপ ইমাম রাগেবের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রথম কয়েকটি আয়াতের ব্যাখ্যা উপস্থিত করব। عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ যে সমস্ত জিনিস তোমরা দেখ এবং যা সম্বন্ধে তোমরা জান আর যে সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জান না, আল্লাহ সবকিছু জানেন। তোমরা কিছুই জান না আল্লাহ ঐ সবকিছুই জানেন। –[সূরা হাশর : ২৩] اِطَّلَعَ الْغَيْبَ [সূরা মারইয়াম : ৭৮] যে সমস্ত জিনিস চক্ষু এবং দিব্য জ্ঞানের সীমার উপরে, যে পর্যন্ত কল্পনা ও দৃষ্টি পৌছাতে পারে না। সে কি তার দিকে ঝুঁকে দেখেছে? তার কি সেই বিষয় জ্ঞান লাভ হয়েছে?

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ যে সমস্ত বস্তু মানুষের অনুভূতি এবং জ্ঞানের সীমার বাইরে রয়েছে তা আল্লাহ ব্যতীত আসমান জমিনের কেউ জানে না। –[সূরা নামল : ৬৫]

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ –[সূরা আলে ইমরান : ১৭৯] যে সমস্ত বস্তু তোমাদের কাছে প্রকাশ করা যাবে না এবং যা তোমাদের দৃষ্টি ও জ্ঞানের আওতায় নয়, সে সমস্ত বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে অবহিত করবেন না। এখানে غيب-এর অর্থ ওহীও হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন নন যে, তোমাদের কাছে সরাসরি ওহী পাঠিয়ে তোমাদেরকে সেই সমস্ত বিষয় অবহিত করবেন। اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ [সূরা মায়েদা : ১০৯] যা সত্য যা সন্দেহাতীত, মানুষের জ্ঞান যেখানে পৌছতেও পারে না, আল্লাহ সে সম্বন্ধে ভালো করেই জানেন। وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ [সূরা আন'আম : ৫৯] যে সমস্ত রহস্য তালাবদ্ধ রয়েছে, যে পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান পৌছতে পারে না আল্লাহর কাছেই রয়েছে তা খোলার চাবি।

لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا هُوَ এর অর্থও তাই। رَجْمًا بِالْغَيْبِ –[সূরা কাহাফ : ২৩] যা তারা দেখেনি এবং যা তারা জানে না, সেটার প্রতি তারা তীর চালায়।

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ [সূরা বাকারা : ২] যার সঠিক জ্ঞান ওহী ব্যতীত লাভ হয় না, তার প্রতি তারা ঈমান আনে। অনুভূতিরও বুদ্ধি-জ্ঞান যেখানে পৌছায় না, নবীগণকে ওহী দ্বারা তার জ্ঞান দান করেন। যেমন, আল্লাহ আ'আলার জাত এবং সিফাত, হাশর-নশর, জান্নাত এবং বিশ্বাস করে। অথবা বলা যায়, যখন সে মুসলমানদের নিকট হতে আলাদা হয়ে যায় সেই সময়ও এই সবের উপর বিশ্বাস করে। অর্থাৎ তাঁর ঈমান খাঁটি।

اَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ [সূরা আম্বিয়া : ৪৯] যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আকাশ এবং পৃথিবীতে যা তোমাদের অজ্ঞাত তার জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। আল্লাহই তার খালিক, মালিক এবং তাতে হস্তক্ষেপকারী। حَافِظَاتٌ بِالْغَيْبِ [সূরা নিসা : ৩০] তারা [স্ত্রীরা] স্বামীদের অনুপস্থিতিতে নিজের ইজ্জত এবং স্বামীর মালের হেফাজত করে। এখানে غَيْب এর অর্থ দেহের অঙ্গও হতে পারে, যা লোকদের সামনে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। مَنْ يَخَافُهٗ بِالْغَيْبِ [সূরা মায়েদা : ১৯৩] যে একাকী অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে। لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ [সূরা ইউসুফ : ৫২] তাঁর আযীযের অনুপস্থিতিতে তাঁর আমানতে খেয়ানত করিনি।

فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا [সূরা জিন : ২৭] আল্লাহ ওহীর কথা নবী ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রকাশ করেন না। وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ [সূরা তাকরীম : ২৪] আল্লাহর রাসূল ﷺ ওহীর ব্যাপারে কোনো প্রকার কৃপণতা করেন না। অর্থাৎ আল্লাহ যে ওহী প্রেরণ করেন নবী ﷺ -এর উপর তিনি তা যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌছে দেন। তিনি তা গোপন রাখতেন না। ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ [সূরা আলে ইমরান : ৪৩] প্রাচীনকালের যেসব খবরসমূহ তোমাদের অজানা ছিল। সে সব গোপন খবরের অন্তর্ভুক্ত সেগুলো। وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ [সূরা ইউসুফ : ৬১] আমরা অদৃশ্য বিপদ হতে বাঁচাতে পারতাম না। অথবা ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। উপরিউক্ত আয়াতসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় غَيْب শব্দটি ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(১) غَيْبٌ ঐ জিনিস যার নিকট অনুভূতি এবং আকলের হেদায়েত পৌঁছতে পারে না। নবীদের কথা ব্যতীত সেগুলো সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতেও পারে না। (২) লোকদের নিকট হতে আলাদা হয়ে যখন নিভৃতে সময় কাটায়। (৩) ওহী (৪) কোনো কোনো অতীতকালীন ঘটনা (৫) ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়সমূহ। (৬) গুপ্তাঙ্গ বা গুপ্ত বস্তু প্রকাশ করে দেওয়া।

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য : আভিধানিক অর্থে কোনো বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকে ঈমান এবং কারো অনুগত হওয়াকে ইসলাম বলে। ঈমানের আধার হলো অন্তর। ইসলামের আধার অন্তরসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু শরিয়তে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমান কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নবীর উপর আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য ও তাঁবেদারী প্রকাশ করা না হয়। ظَاهِرًا তথা প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি ঈমান তথা অন্তরের বিশ্বাস না থাকে তবে কুরআনের ভাষায় এটাকে نِفَاقٌ (নেফাক) বলে। এটাকে কুফর হতেও জঘন্য অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে।
ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, কিন্তু সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ ঈমান যেমন অন্তর থেকে শুরু হয় এবং প্রকাশ্য আমলে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রূপ ইসলামও প্রকাশ্য আমল থেকে শুরু হয় এবং অন্তরে পৌঁছে তা পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য আমল পর্যন্ত না পৌঁছলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপ প্রকাশ্য আমলও তাঁবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌঁছলে গ্রহণযোগ্য হয় না। ইমাম গাযালী (র.)-ও এ মত পোষণ করেন।
মোদ্দাকথা হলো, ইসলামি শরিয়তে ঈমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

هِدَايَةٌ**-এর অর্থ :** আয়াতে ব্যবহৃত هِدَايَةٌ শব্দটি মাসদার। আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর মতে هُدًى এমন পথ যা اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ বা গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। গন্তব্যে না পৌঁছালে ঐ পথকে هِدَايَةٌ বলা হবে না। কেননা পবিত্র কুরআনে হেদায়েতের বিপরীতে ضَلَالٌ বা ভ্রষ্টতা ব্যবহৃত হয়েছে।
আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, هِدَايَةٌ দু'প্রকার। যথা– (ক) পথ দেখানো। যা নবী রাসূলগণের দায়িত্ব ছিল وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে। আল্লাহর বাণী– وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ আপনি সরল পথের দিকে আহ্বান করবেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা هِدَايَةٌ -এর অর্থ 'পথ দেখানো এবং রাস্তার দিকে আহ্বান করা বুঝিয়েছেন। (খ) هُدًى -এর দ্বিতীয় অর্থ– অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করা বা চূড়ান্তভাবে সঠিক পথে আনয়ন করা। এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ আপনার পছন্দমতো আপনি কাউকে হেদায়েত দিতে পারবেন না। অর্থাৎ কাউকে মুমিন বানিয়ে ফেলতে পারবেন না। –[ফাতহুল কাদীর]

মুত্তাকীদের পরিচয় : আলোচ্য আয়াতে মুত্তাকীদের তিনটি গুণের কথা আলোচিত হয়েছে। তা হলো, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং স্বীয় জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় করে তারাই মুত্তাকী।
হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, মুত্তাকী তারাই যারা হারাম কাজ হতে বিরত থাকে এবং ফরজ কাজসমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।
কালবী (র.) বলেন, মুত্তাকী তারাই আয়াতে যাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।
মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুত্তাকী তারাই যারা ঈমান আনার পর شِرْكٌ তথা অংশীদারিত্ব, كَبَائِرٌ তথা কবীরা গুনাহ, فَوَاحِشٌ তথা অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকেন এবং মহান আল্লাহর আদেশ নিষেধাবলি যথাযথ মেনে চলেন।
একদা হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে মুত্তাকীদের পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন যে, যারা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে দূরে রয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে তারাই মুত্তাকী।
প্রখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল কাদীরে মহানবী ﷺ -এর একটি হাদীস উদ্ধৃত আছে যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেন, কোনো বান্দা মুত্তাকী হতে পারবে না যতক্ষণ সে 'অসুবিধা নেই এমন বস্তুকে ছেড়ে দেয় এই ভয়ে যে, অসুবিধা আছে এমন কোনো কাজে জড়িয়ে যেতে পারে।

সূরার প্রথমে الٓمّٓ **উল্লেখের কারণ :** পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে حُرُوْفِ مُقَطَّعَاتٌ ব্যবহারের প্রকৃত কারণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কিন্তু তাফসীরকারগণ এর কিছু কিছু হিকমত উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন–

- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রবল ক্ষমতাবান। এ ধরনের শব্দাবলির প্রকৃতার্থ তিনি ব্যতীত অন্য কেউ না জানাটা তাঁর ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত, অতএব এতে তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে।
- الٓمّٓ অক্ষরগুলো মানুষের অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ সূরার প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

- দু'ধরনের বাক্য দিয়ে সবাই কথা বলেন, কিন্তু আল্লাহ বলেছেন– এতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, যদি সম্ভব হয় এমন করে বল।
- শ্রবণকারী কথাটার আওয়াজ শ্রবণ মাত্রই অনুধাবন করতে পারে যে, এর সমকক্ষ কোনো শব্দ দ্বারা তাদের পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়।
- এ অক্ষরগুলো স্বয়ং মু'জিযা। এটা এমন নবীর মুখ থেকে নিঃসৃত, যিনি কস্মিনকালেও শিক্ষকের দ্বারস্থ হননি। তাঁর মুখ থেকে প্রকাশ পাওয়ার অর্থই হলো এগুলো তাঁর নিজের বানানো নয়, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে এসেছে।

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ **বলার কারণ :** পবিত্র কুরআন একমাত্র মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েতের উৎস স্বরূপ। মূলত এটা সমগ্র মানবজাতির জন্যই হেদায়েতের পথ দেখায়। কিন্তু যারা কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে না তারা খোদাভীরু নয়। খোদাভীরুগণই এটা থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে– যারা খোদাভীরু হতে চেয়েছেন তাদের জন্যই কুরআন পথপ্রদর্শক। শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত, প্রকৃতার্থে নয়।

নামাজ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য : ইকামাতে সালাত বলতে শুধু নামাজ আদায় করাকেই বুঝায় না; বরং নামাজকে তার আহকাম-আরকানসহ যথানিয়মে সঠিক সময়ে আদায় করার নাম ইকামাতে সালাত।

তাফসীরকারগণ ইকামাতে সালাতের কয়েকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। যথা–

- আহকাম আরকান সহ যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা।
- রীতিমতো একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করা।
- একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করার জন্য সার্বিক দিক থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে তৈরি থাকা, যেন কোনো প্রকারে নামাজ ছুটে না যায়।

اِنْفَاقٌ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** اِنْفَاقٌ অর্থ– আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এখানে ফরজ জাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয় সেসব কিছুই বুঝানো হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে সাধারণত اِنْفَاقٌ শব্দ নফল দান-খয়রাতের অর্থেই ব্যবহৃত রয়েছে। যেখানে ফরজ জাকাত উদ্দেশ্য সেখানে زَكٰوة (যাকাত) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে গভীরভাবে চিন্তা ফিকির করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক সৎ মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাগরিত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। একজন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করবে যে, আমাদের নিকট যা কিছু রয়েছে তা সবই আল্লাহর দান ও আমানত। যদি এগুলো তার পথে ব্যয় করি তবেই মাত্র এ নিয়ামতের হক আদায় করা হবে।

শুধু সালাত ও ব্যয়কে উল্লেখ করার কারণ : আয়াতে কারীমাতে মূল ইবাদতসমূহের উল্লেখ প্রয়োজন ছিল, শুধু নামাজ ও ব্যয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার কারণ কি? এর উত্তরে বলা যায় যে, যত রকমের আমল রয়েছে তা ফরজ হোক বা ওয়াজিব হোক সবই মানুষের দেহ বা ধন-দৌলতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইবাদতে বদনী তথা শারীরিক ইবাদতের মধ্যে নামাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে নামাজের বর্ণনা এনেছেন এবং যেহেতু আর্থিক ইবাদত সবই اِنْفَاقٌ-এর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এ উভয় প্রকার ইবাদতের বর্ণনার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় ইবাদতের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

রিজিক বলতে যা বুঝায় : رِزْقٌ অর্থ– অংশ, رِزْقٌ বলা হয় ঐ অংশকে যা বান্দার জন্য নির্দিষ্ট হয়। কেউ বলেন, رزق ঐ বস্তুকে বলে যা ভক্ষণ করা হয় অথবা ব্যবহার করা হয়। আবার কেউ বলেন, যা মালিকানায় আছে তা-ই রিজিক। এ দু'টি মতোই ঠিক নয়। কেননা মালিকানায় নেই এমন বস্তুকেও রিজিক বলা হয়। যেমন– اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ وَلَدًا صَالِحًا (হে আল্লাহ আমাকে নেক সন্তান দান করো।) আর খাদ্যবস্তুকে এ জন্য রিজিক বলা ঠিক নয় যে, রিজিক খরচ করার জন্য বলা হয়েছে, আর ভক্ষিত বস্তু খরচ করা সম্ভব নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অধিকাংশ আলেমের মতে, যা দ্বারা কল্যাণ পাওয়া যায় তাই রিজিক, চাই তা হালাল হোক বা হারাম হোক। আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতে মাখলুকের জন্য যা কিছু দেওয়া হয়েছে সব কিছুই রিজিকের অন্তর্ভুক্ত।

يَقِيْن **-এর অর্থ :** يَقِيْن-এর অর্থ হলো সন্দেহের পর কোনো বিষয়ের এমন জ্ঞান অর্জন করা যার মাধ্যমে উক্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। আর এ কথা বলা যায় না যে, تَيَقَّنْتُ اَنَّ السَّمَاءَ فَوْقِىْ কেননা আকাশ যে উপরে এ ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই। তবে যদি কোনো বিষয়ে সন্দেহ না থাকা সত্ত্বেও কেউ সন্দেহ করে, তারপর বিভিন্ন প্রমাণাদির মাধ্যমে এর সত্যতা উদঘাটিত হয়, তাহলে يَقِيْن ব্যবহার করা যাবে। যেমন– تَيَقَّنْتُ اَنَّ الْاِلٰهَ وَاحِدٌ

আখেরাত বলতে যা বুঝায় : আখেরাত শব্দের অর্থ হলো– পরে আগত বস্তু, পিছনে আসা। এ শব্দটি সর্বদাই স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটা اَلدُّنْيَا -এর বিপরীত শব্দ। পরিভাষায় আখেরাতের সংজ্ঞা প্রদানে বলা হয়- اَلْحَيَاةُ الْاُخْرَوِيَّةُ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ দুনিয়াবী জীবন শেষ হবার পর পরবর্তী যে জীবন শুরু হয় তাকে আখেরাত তথা পরকাল বলা হয়।

وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ **-এর তাৎপর্য :** আল্লাহ তা'আলা هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ বলে মুসলমানদের মর্যাদা দান করেছেন। আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিল. যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সাথীরা, তাদের মর্যাদা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ এতে তাদের সম্মানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : যদ্দ্বারা বাকি আহলে কিতাবদের উৎসাহিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর ঈমানের গুরুত্ব

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন দ্বারা পূর্ব শরিয়তের উপর আমল করার প্রয়োজন নেই। কেননা اِيْمَانٌ শব্দের অর্থ تَصْدِيْقٌ : কিন্তু আমল করা স্বতন্ত্র বিষয়। পূর্ববর্তী নবীদের উপর ঈমান আনা ফরজ এবং এটা ঈমানের একটা মৌলিক শর্ত। এ প্রসঙ্গটিকে বুঝতে হবে এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত কিতাবগুলো যে নাজিল করেছেন এটা বাস্তব সত্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বার্থপর এবং দুর্ভাগা লোকেরা উক্ত কিতাবসমূহের মধ্যে যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে তা ভ্রান্তিপূর্ণ। আমলের ব্যাপারে বক্তব্য হলো– আমল শুধু কুরআনের আহকাম অনুযায়ী হবে। কেননা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে পূর্বের কিতাবসমূহের আহকাম مَنْسُوْخٌ বা রহিত হয়ে গেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

هُدًى : শব্দটি মাসদার, বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى এখানে هَادٍ ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– পথপ্রদর্শক, হেদায়েতকারী।

يُؤْمِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ا ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা বিশ্বাস স্থাপন করে।

يُقِيْمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা প্রতিষ্ঠা করে।

اُنْزِلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْزَالُ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ل) জিনসে صحيح অর্থ– নাজিলকৃত, অবতারিত।

يُوْقِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْقَانُ মূলবর্ণ (ى ـ ق ـ ن) জিনস مثال يائى অর্থ– তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

رَبٌّ : শব্দটি একবচন, বহুবচন ارباب এটা اسم فاعل مبالغة অর্থ– প্রতিপালক।

اَلْمُفْلِحُوْنَ সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفْلَاحُ মূলবর্ণ (ف ـ ل ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা সফলকাম।

বাক্য বিশ্লেষণ

الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ : الٓمّٓ শব্দটি هذه মুবতাদা محذوف-এর খবর। আর ذٰلِكَ الْكِتٰبُ দ্বিতীয় খবর অথবা بدل (বদল)। অথবা الم হলো مبتدأ আর উহ্য متحدى বা معجزة খবর।

অথবা, এভাবে বলা হয় الم প্রথম مبتدأ আর ذلك দ্বিতীয় مبتدأ আর الكتاب খবর। অতঃপর বাক্যটি প্রথম মুবতাদার খবর।

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ : এখানে واو হলো حرف عطف আর اُولٰئِكَ হলো مبتدأ اول এবং هُمْ হলো مبتدأ ثانى আর اَلْمُفْلِحُوْنَ হলো উভয় মুবতাদার খবর। অতএব, مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية অতঃপর এটা معطوف হলো। معطوف عليه ও معطوف মিলে جملة عاطفة;

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)

অনুবাদ : (৫) তারাই রয়েছে তাদের প্রভু হতে প্রাপ্ত হেদায়েতের উপর এবং তারাই পূর্ণ সফলকাম।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦)

(৬) নিশ্চয় যারা কাফের হয়ে গেছে, তাদের জন্য উভয়ই সমান, আপনি তাদরেকে ভয় দেখান বা না দেখান। তারা ঈমান আনবে না।

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧)

(৭) আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহের উপর ও তাদের কর্ণসমূহের উপর; এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা রয়েছে। আর তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (٨)

(৮) আর মানুষের মধ্যে কতক এমন লোক রয়েছে যারা বলে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি, অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়।

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩)

(৯) তারা চালবাজী করে আল্লাহ এবং মুমিনদের সাথে; বস্তুত তারা কারো সাথে চালবাজী করে না নিজের ব্যতীত, অথচ তারা এ সম্বন্ধে বোধই রাখে না।

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠)

(১০) তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে কঠিন পীড়া, পরন্তু আল্লাহ তাদের পীড়া আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি, এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলত।

শাব্দিক অনুবাদ :

(৫) أُولَٰئِكَ তারাই عَلَىٰ هُدًى রয়েছে হেদায়েতের উপর مِّن رَّبِّهِمْ তাদের প্রভু হতে প্রাপ্ত وَأُولَٰئِكَ هُمُ এবং তারাই الْمُفْلِحُونَ পূর্ণ সফলকাম।

(৬) إِنَّ الَّذِينَ নিশ্চয় যারা كَفَرُوا কাফের হয়ে গেছে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ তাদের জন্য উভয়ই সমান أَأَنذَرْتَهُمْ আপনি তাদেরকে ভয় দেখান বা أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ না দেখান لَا يُؤْمِنُونَ তারা ঈমান আনবে না।

(৭) خَتَمَ اللَّهُ আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দিয়েছেন عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ তাদের অন্তরসমূহের উপর وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ও তাদের কর্ণসমূহের উপর وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর রয়েছে غِشَاوَةٌ পর্দা وَلَهُمْ আর তাদের জন্য রয়েছে عَذَابٌ عَظِيمٌ গুরুতর শাস্তি।

(৮) وَمِنَ النَّاسِ আর মানুষের মধ্যে কতক এমন লোকও রয়েছে مَن يَقُولُ যারা বলে آمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি بِاللَّهِ আল্লাহ তা'আলার প্রতি وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ এবং শেষ দিবসের প্রতি وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়।

(৯) يُخَادِعُونَ তারা চালবাজী করে اللَّهَ আল্লাহ وَالَّذِينَ آمَنُوا এবং মুমিনদের সাথে وَمَا يَخْدَعُونَ বস্তুত তারা কারো সাথে চালবাজী করে না إِلَّا أَنفُسَهُمْ নিজের ব্যতীত وَمَا يَشْعُرُونَ অথচ তারা এ সম্বন্ধে বোধই রাখে না।

(১০) فِي قُلُوبِهِم তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে مَّرَضٌ কঠিন পীড়া, فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا পরন্তু আল্লাহ তাদের পীড়া আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন وَلَهُمْ আর তাদের জন্য রয়েছে عَذَابٌ أَلِيمٌ যন্ত্রণাময় শাস্তি بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলত।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১১) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না ভূপৃষ্ঠে, তখন তারা বলে, আমরা তো শুধু শান্তিই স্থাপনকারী।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ (١١)
(১২) সাবধান! নিশ্চয়, এরাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী; কিন্তু এ সম্বন্ধে বোধই রাখে না।	اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ (١٢)
(১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তদ্রূপ ঈমান আন যেরূপ ঈমান এনেছে অন্যান্য লোক, তখন তারা বলে, আমরা কি ঈমান আনব যেরূপ ঈমান এনেছে এ নির্বোধেরা? মনে রাখুন! তারাই নির্বোধ কিন্তু তারা বুঝতে পারতেছে না।	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ (١٣)
(১৪) আর যখন মুনাফেকরা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন তারা গোপনে মিলিত হয় নিজ দুষ্ট নেতাদের সাথে, বলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা তো শুধু ঠাট্টা করে থাকি।	وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ (١٤)
(১৫) আল্লাহই তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন এবং তাদেরকে ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন, ফলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে।	اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (١٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(১১) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন তাদেরকে বলা হয় لَا تُفْسِدُوْا তোমরা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে قَالُوْٓا তখন তারা বলে اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ আমরা তো শুধু শান্তিই স্থাপনকারী।

(১২) اَلَآ সাবধান! اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ নিশ্চয় তারাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী وَلٰكِنْ কিন্তু এ সম্বন্ধে لَّا يَشْعُرُوْنَ বোধই রাখে না।

(১৩) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন তাদেরকে বলা হয়, اٰمِنُوْا তদ্রূপ ঈমান আন كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ যেরূপ ঈমান এনেছে অন্যান্য লোক قَالُوْٓا তখন তারা বলে اَنُؤْمِنُ আমরা কি ঈমান আনব كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ যেরূপ ঈমান এনেছে এ নির্বোধেরা? اَلَآ মনে রাখুন! اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ তারাই নির্বোধ وَلٰكِنْ কিন্তু لَّا يَعْلَمُوْنَ তারা বুঝতে পারছে না।

(১৪) وَاِذَا لَقُوْا আর যখন মুনাফিকরা সাক্ষাৎ করে الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুমিনদের সাথে قَالُوْٓا তখন তারা বলে اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি وَاِذَا خَلَوْا আর যখন তারা গোপনে মিলিত হয় اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ নিজ দুষ্ট নেতাদের সাথে قَالُوْٓا বলে اِنَّا مَعَكُمْ নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি اِنَّمَا نَحْنُ আমরা তো শুধু مُسْتَهْزِءُوْنَ ঠাট্টা করে থাকি।

(১৫) اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ আল্লাহই তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন وَيَمُدُّهُمْ এবং তাদেরকে ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন فِىْ طُغْيَانِهِمْ ফলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে يَعْمَهُوْنَ উদভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬)– اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতটি আবূ জাহল, আবূ লাহাব, উতবা, শাইবা এ ধরনের নির্দিষ্ট কিছু কাফেরের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। যাদের ব্যাপারে আল্লাহর ইলম ছিল যে, তারা কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে; তারা কখনো ইসলাম গ্রহণ করবে না, সবার ব্যাপারে নয়। কারণ এ কথা তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরেও অনেক কাফের মুসলমান হয়েছে ভবিষ্যতেও হবে। ইনশাআল্লাহ।

(৮)– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল মুতাজির ইবনে কুশাইরকে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহকে ভয় কর, নেফাক ছেড়ে দাও। উপরে একরকম ভিতরে অন্য রকম থাকা উচিত নয়। তখন তারা বলল, আশ্চর্য তো আপনি আমাদের মুসলমানদেরকে কাফের বলছেন, তাদের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উপরের আয়াত নাজিল করেন।

(১৪) وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল এবং তার অনুচরদের ব্যাপারে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে : ঘটনাটি হলো এই, একবার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল ও তার অনুচররা দেখল, এক জায়গায় হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত আলী (রা.) দাঁড়িয়ে আছেন। তখন সে তার অনুচরদেরকে বলল, দেখ আমি তাদের সাথে কিভাবে মজা করি। সে প্রত্যেকের হাত ধরে আলাদা আলাদা প্রশংসা করলো। সে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে লক্ষ্য করে বলল,

مَرْحَبًا لِلشَّيْخِ وَالصِّدِّيْقِ وَلِعُمَرَ مَرْحَبًا بِالْفَارُوْقِ الْقَوِيِّ فِيْ دِيْنِهٖ وَلِعَلِيٍّ يَا ابْنَ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ

"ধন্যবাদ হে প্রবীণ ও সিদ্দীক, হযরত ওমর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলল, ধন্যবাদ হে ফারূক! আপনি ন্যায়ের পথে নিজ ধর্মে অটল, হযরত আলী (রা.)-কে লক্ষ্য কর বলল, ধন্যবাদ হে রাসূলের চাচাতো ভাই! তখন হযরত আলী (রা.) তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, মুনাফেকী করো না। সে মুহূর্তে সে বলল, আপনি একি বললেন! আমার ঈমান তো আপনাদের ঈমানের অনুরূপই। পরে সে তার সাথীদেরকে বলল, দেখলে কিভাবে মজা করলাম। মুসলমানদেরকে দেখলে তোমরাও এরূপ মজা করবে। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ কে এ ঘটনাটি জানালেন। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قوله اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا **দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতে كَفَرُوْا দ্বারা আবূ জাহ্ল, আবূ লাহাব, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, শায়বা, উতবা ও তাদের মতো মক্কার কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

كُفْر -এর অর্থ : كُفْر শব্দটির আভিধানিক অর্থ– আচ্ছাদন করা, আবৃত করা, ঢেকে দেওয়া, গোপন করা। এর মর্মার্থ হলো, অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা। অধর্ম ধর্মকে, অসত্য সত্যকে, অনাচার সদাচরকে, অকৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতাকে আচ্ছাদিত করে বলেই كُفْر কে كُفْر বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় اِنْكَارُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা, নবী-রাসূলগণ, ধর্মগ্রন্থসমূহ, বেহেশ্‌ত, দোজখ, পরকাল, ফেরেশ্‌তা, তাকদীর ইত্যাদির প্রতি অবিশ্বাস করে, তাকেই অবিশ্বাসী বা كَافِرٌ বলা হয়।

اَلْكُفْرُ -এর প্রকারভেদ : কুফর চার প্রকার। যথা–

(১) كُفْرُ الْاِنْكَارِ **(কুফরে ইনকার) :** মুখে এবং অন্তরে কোনো জিনিসকে ইনকার বা অস্বীকার করা।

(২) كُفْرُ الْجُحُوْدِ **(কুফরে জুহূদ) :** সত্যকে নিজের অন্তর দিয়ে বুঝা, কিন্তু মুখে অস্বীকার করা। যেমন– ইবলিসের অস্বীকার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী– فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ

(৩) كُفْرُ الْمُعَانَدَةِ **(কুফরে মু'আনাদাহ) :** সত্যকে অন্তর দিয়ে বুঝা, মুখে বলা, কিন্তু গ্রহণ না করা এবং হককে দীন হিসেবে মেনে না নেওয়া। যেমন হযরতের চাচা আবূ তালেবের কুফরি।

(৪) كُفْرُ النِّفَاقِ **(কুফরে নেফাক্ব) :** মুখে বলা, কিন্তু অন্তরে অস্বীকার করা।

ঈমান ও কুফরির পরিণতি : ঈমান ও ইসলামের দ্বারা ব্যক্তির মনে নূর বিচ্ছুরিত হয়। মানুষ দৈনন্দিন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই তার সকল নির্ভরযোগ্য আশ্রয় বলে মনে করে। ফলশ্রুতিতে সকল মুমিন পরস্পরে ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, একে অপরের কল্যাণকামী হয়। তাদের এই আত্মীক সম্পর্ককেই আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেন, رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাতের পরম শান্তি যা হবে– جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

অপরদিকে কুফরি হলো এক ভ্রান্ত মতবাদ। বিশ্বপ্রতিপালকের অস্বীকৃতিরূপ অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেলে। পরিণতিতে সমস্ত অন্ধকার এবং দুর্বলতা তাদেরকে কাপুরুষে পরিণত করে। তখন সমসৃষ্ট মানুষও তাদের জন্য ভয়ের কারণ হয় ঈমানের ন্যায় মূল্যবান সম্পদকে অস্বীকার করার কারণে; একদিক তাদের ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে যায়। তাই পরকালে তারা নিক্ষিপ্ত হবে অন্ধকার আগুনে। অন্ধকার আত্মাকে অন্ধকার আগুন দিয়েই পুরস্কৃত করা হবে।

قوله سواءٌ عليهم **-এর ব্যাখ্যা :** 'আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন, আর না-ই করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান' । এর দ্বারা রাসূল ﷺ -কে ভয় প্রদর্শন হতে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়নি । কেননা ইসলাম প্রচারের কাজে যদি কোনো পক্ষেরই উপকার না হতো, তবে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হতো । এখানে কাফেরদেরকে উপদেশ দিলে তাদের কোনো উপকার হোক বা না হোক রাসূল ﷺ তো দাওয়াতি কাজের ছওয়াব অবশ্যই পাবেন? ; কাফেরদের হেদায়েত গ্রহণ একমাত্র আল্লাহর হাতে । তা কোনো নবী অথবা পীরের হাতে নয় ।

এনযার শব্দের অর্থ : 'এনযার' শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সংবাদ দেওয়া যাতে ভয়ের সঞ্চার হয় । আর اِبْشَارٌ এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শুনে আনন্দ লাভ হয় ; সাধারণ অর্থে এনযার বলতে ভয় প্রদর্শন করা । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে 'এনযার' বলা হয় না; বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বুঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে । যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন ; 'নাযির' বা ভয় প্রদর্শনকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাঁরা অনুগ্রহ করে মানবজাতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন । এজন্যই নবী রাসূলগণকে খাসভাবে নাযীর বলা হয় । কেননা তাঁরা দয়া ও সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যম্ভাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন । নবীগণের জন্য 'নাযীর' শব্দ ব্যবহার করে একদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাঁরা তাবলীগের দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে– সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মমতা ও সমবেদনা সহকারে কথা বলা ।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত জেদী অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে শুনেও কুফরি ও অস্বীকৃতির উপর দৃঢ় অনড় হয়ে আছে, অথবা অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে কোনো সত্য কথা শুনতে কিংবা সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ দেখতেও প্রস্তুত নয়, তাদের পথে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিরামহীন চেষ্টা করেছেন তা ফলপ্রসু হওয়ার নয় ; এদের ব্যাপারে চেষ্টা করা না করা একই কথা ।

পাপের শাস্তি পার্থিব সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া : এ দুটি আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি তো পরকালে হবেই, তবে কোনো কোনো পাপের আংশিক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়ে থাকে । দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্রবিশেষ নিজের অবস্থা সংশোধন করার সামর্থ্যকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় ; শুভবুদ্ধি লোপ পায় ।

মানুষ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর পথে এমন দ্রুততার সাথে এগুতে থাকে, যাতে অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত তাদের অন্তর থেকে দূরে চলে যায় । এ সম্পর্কে কোনো কোনো বুযুর্গ মন্তব্য করেছেন যে, পাপের শাস্তি এরূপও হয়ে থাকে যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে আকর্ষণ করে, অনুরূপভাবে একটি নেকীর বদলায় অপর একটি নেকী আকৃষ্ট হয় ।

হাদীসে আছে, মানুষ যখন কোনো একটি গুনাহের কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে । সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ লাগার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথমাবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে । এ অবস্থায় যদি সে তওবা না করে , আরো পাপ করতে থাকে, তবে পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায় । এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে ভালো মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায় ।

উপদেশ দান করা সর্বাবস্থায় উপকারী : এ আয়াতে সনাতন কাফেরদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নসিহত করা না করার সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে । এর সাথে عَلَيْهِمْ -এর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ সমতা কাফেরদের জন্য, রাসূলের জন্য নয়, তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধন করার চেষ্টা করা ছওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে ; তাই সমগ্র কুরআনের কোনো আয়াতেই এমনসব লোককে ঈমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া হতে নিষেধ করা হয়নি । এতে বুঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত, তা ফলপ্রসু হোক বা না হোক, সে এ কাজের ছওয়াব পাবেই ।

একটি সন্দেহের নিরসন : এ আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ভাষা সূরায়ে মুতাফফিফীনের এক আয়াতেও উল্লিখিত হয়েছে যথা– كَلَّا بَلْ سَكْرَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ –

অর্থাৎ এমন নয়; বরং তাদের অন্তরে তাদের কর্মের মরিচা গাঢ় হয়ে গেছে । তাতে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের মন্দকাজ ও অহংকারই তাদের অন্তরে মরিচার আকার ধারণ করেছে । এ মরিচাকে আলোচ্য আয়াতে 'সীলমোহর' বা আবরণ শব্দের

দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এরূপ সংশয় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় যে, যখন আল্লাহই তাদের অন্তরে সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন, এবং গ্রহণ ক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরি করতে বাধ্য। কাজেই তাদের শাস্তি হবে কেন? এর জওয়াব হচ্ছে যে, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী। যেহেতু বান্দাদের সকল কাজের সৃষ্টি আল্লাহই করেছেন, তিনি এস্থলে সীলমোহরের কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছে।

قوله خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ **-এর ব্যাখ্যা :** 'আল্লাহ তা'আলা তাদের (কাফেরদের) অন্তঃকরণে কুফরির মোহর মেরে দিয়েছেন। এ আয়াতের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলার কারণেই তারা ঈমান গ্রহণ করতে পারেনি; বরং এর অর্থ হলো, তারা যখন ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের জন্য কুরআনের উপস্থাপিত পথের পরিবর্তে অন্য পথ বেছে নিয়েছে, তা থেকে তাদেরকে নিয়ে আসা যাবে না। কিন্তু যেহেতু মানুষের যাবতীয় কার্যসমূহ তাদের ইচ্ছাকৃত হলেও সমস্ত কিছুরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা, তাই তিনি আয়াতে নিজেকে উক্ত কার্যসমূহের স্রষ্টা বলে প্রকাশ করেছেন। যখন তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশের কর্তা হলো এবং সেই সর্বনাশকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে উদ্যত হলো, তখন আল্লাহ তা'আলাও এরূপ অবস্থায় তাদের অন্তর এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সৃষ্টি করে দিলেন। সুতরাং তাদের কৃতকর্মই অন্তরের উপর মোহরাঙ্কনের কারণ হলো।

অন্তঃকরণে মোহর মারার অর্থ : অন্তঃকরণে মোহর মারার অর্থ হলো, হক সম্পর্কে অনবহিত থাকা। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলির উপর চিন্তা-গবেষণা না করা। বরং তাদের এমন অবস্থা প্রকাশিত হওয়া যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা সত্য সম্পর্কে কোনো চিন্তাই করে না। মনে হয় যেন তাদের অন্তঃকরণে সত্যের কোনো স্থানই নেই।

কানে মোহর মারার অর্থ : কানে মোহর মারার অর্থ হচ্ছে, তারা হক বা সত্য কথা শুনতে রাজি থাকে না। যদিও শোনে; কিন্তু আমল বা বাস্তবে রূপ দেওয়ার চিন্তা করে না। পবিত্র কুরআনের আয়াত তাদের সামনে পঠিত হয় বটে; কিন্তু তারা তা বুঝতে চেষ্টাও করে না। সত্যের পথে ডাকা হলে কর্ণপাতও করে না। মনে হয়, তাদের কানে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে।

وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ **-এর ব্যাখ্যা :** 'এবং তাদের চক্ষুসমূহে আবরণ পড়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করার পর দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, যেন তারা সৃষ্টি জগতের প্রতি তাকিয়ে স্রষ্টার খোঁজ করে। প্রত্যেকটি দৃষ্টি যেন হয় স্রষ্টার পরিচায়ক। কিন্তু নির্বোধ মুশরিক ও কাফেররা সৃষ্টি জগতের প্রতি তাকায়, তবে শিক্ষার নিয়তে তাকায় না, হেদায়েতের আশায় দৃষ্টি দেয় না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টির অবস্থা এরূপ করে দিয়েছেন।

তিনটি ইন্দ্রিয়কে উল্লেখ করার কারণ : এ তিনটি ইন্দ্রিয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে চেনা ও জানা অতি সহজ। কেননা অন্তর অনুধাবনযোগ্য, কান শ্রবণযোগ্য এবং চক্ষু দৃষ্টিযোগ্য। এ তিন স্তরের মাধ্যমে বস্তুর প্রকৃত পরিচয় ঘটে। তাই এগুলো আল্লাহকে চেনা ও জানার মাধ্যম।

ءَاَنْذَرْتَهُمْ **-এর কেরাত :** ءَاَنْذَرْتَهُمْ–এর এখানে পাঁচটি কেরাত রয়েছে– (১) উভয় همزه -কে ঠিক রেখে পড়া। (২) উক্ত দু'টো همزه -এর মধ্যখানে একটি الف যুক্ত করে পড়া। (৩) উভয় همزه -কে সহজ করে পড়া (تَسْهِيْل) (৪) تَسْهِيْل -এর মধ্যখানে الف যুক্ত করে পড়া। (৫) দ্বিতীয় همزه -কে الف দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া।

مِنَ النَّاسِ **দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে :** প্রখ্যাত মুফাস্সির সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনানুযায়ী আহলে কিতাব, যেমন– আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, ইবনে কুশাইর এবং ইবনে কায়েস প্রমুখকে বুঝানো হয়েছে। অপর বর্ণনায় সাধারণ মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে।

اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ **-এর অর্থ :** اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ শেষদিন বা পরকাল। اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ বলতে ঐ সময়কে বুঝানো হয়েছে, যার কোনো সীমা নেই, যা অনন্ত, কোনো সময়েই তা শেষ হবার নয়।

কেউ কেউ বলেন, কবর থেকে উঠার পর হতে জান্নাতী জান্নাতে আর দোজখী দোজখে প্রবেশ করা পর্যন্ত সময়কে اَلْيَوْم الْاٰخِر বলা যেতে পারে।

نِفَاق -এর প্রকারভেদ : নিফাক দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– (১) نِفَاق اِعْتِقَادِيْ (২) نِفَاق عَمَلِيْ

১. نِفَاق اِعْتِقَادِيْ হলো, বিশ্বাসের দিক থেকে নিফাক। কুরআনের ভাষায় এদের শাস্তি হলো– اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের অধিবাসী।

২. نفاق عملى হলো, আমলের দিক থেকে নিফাক, কার্যত এরাও প্রকৃত মুনাফিক। এটা কবীরা গুনাহ। হাদীস শরীফে বর্ণিত এদের কতিপয় নিদর্শন নিম্নরূপ– (১) اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (২) وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ যখন তাদের কাছে আমানত রাখা হয় তারা খেয়ানত করে। (৩) اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ যখন অঙ্গীকার করে তখন তা পূর্ণ করে না। নিফাক প্রকটভাবে মদীনার যুগে পরিলক্ষিত হয়েছিল। কেননা মদীনায় মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছিল তাই তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের অনুকূলে কথা বলতো, আর অলক্ষ্যে আগোচরে ইসলামের শত্রুদের সাথে শলা-পরামর্শে লিপ্ত হতো।

يَقُوْلُ -কে একবচন, আর مُؤْمِنِيْنَ বহুবচন ব্যবহারের কারণ : يَقُوْلُ ফে'লের পূর্বে مَنْ ইসমে মাওসূল রয়েছে, যা অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন, আর শব্দের দিক দিয়ে একবচন। সুতরাং مَنْ -এর শব্দের দিকে লক্ষ্য রেখে يَقُوْلُ একবচন বলা হয়েছে, আর من -এর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে مُؤْمِنِيْن বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

قوله يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ -এর ব্যাখ্যা : তারা আল্লাহ তা'আলা ও ঈমানদারদের সাথে প্রতারণা করে। এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। মুনাফিক হলো যারা মুখে যা বলে, অন্তরে তার বিপরীত বিশ্বাস গোপন রাখে। তারা মুসলমানদের নিকট নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করতো, আবার কাফেরদের নিকটে গিয়ে মুসলমানদেরকে বোকা ও নির্বোধ বলে হাসি-তামাশা করতো। তারা মনে করত যে, তারা মুসলমান ও তাদের প্রভুকে ধোঁকা দিচ্ছে। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তারাই নিজেদের ধোঁকা দিচ্ছে। তাদের এ কপটতা ও প্রতারণা তাদের নিজেদেরই সাথে আত্মপ্রতারণায় পরিণত হয়। অথচ তারা নিজেদের এ আচরণ সম্পর্কে একটুও ভেবে দেখে না।

মুনাফেকরা কিভাবে আল্লাহ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয় : মুনাফেকরা আল্লাহ ও ঈমানদারদেরকে ধোকা দেয়। এখানে প্রশ্ন হয়, কিভাবে এরা ধোঁকা দেয়। আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়। ধোঁকা তো ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, যে ঐ বিষয় সম্পর্ক জানে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গোপন, অতীত ও ভবিষ্যৎ ভালোভাবে জানেন। তাঁকে ধোঁকা দেওয়া তো কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, (১) এখানে মুনাফেকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, তা নয়; বরং তারা রাসূল ﷺ -কে ধোঁকা দেয়। রাসূল ﷺ -এর মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ -এর স্থানে নিজেকে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বুঝা গেল, মুনাফেকরা যখন রাসূল ﷺ -কে ধোঁকা দেয়, প্রকারান্তরে তারা আল্লাহকেই ধোঁকা দেয়। (২) অথবা, তাদের বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে ধোকা দেয়। ধোকাবাজ যেমন স্বীয় বিশ্বাসকে গোপন করে অন্য বিষয়কে প্রকাশ করে, তেমনি মুনাফেকরা আল্লাহর সামনে ঈমান প্রকাশ করে কুফরি লুকিয়ে রাখে। তখন তারা মনে করে যে, আল্লাহকে ঈমানের মধ্যে ফাঁকি দিয়েছি। তাই আমরা কাফের হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে মু'মিন ভেবে আহকাম নাজিল করেছেন।

قوله فَزَادَهُمُ اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন– এ আয়াতের বিশ্লেষণ এই যে, তাঁরা ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে জ্বলে-পুড়ে দিন দিন ছাই হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তো দিন দিন তার দীনের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন।

مَرَضٌ শব্দের ব্যাখ্যা : আয়াতে বর্ণিত مَرَضٌ শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত পাওয়া যায়–

- مَرَضٌ শব্দের অর্থ– রোগ-ব্যাধি।
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে مَرَضٌ শব্দ দ্বারা সন্দেহ-দ্বিধা বুঝানো হয়েছে।
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় مَرَضٌ -এর অর্থ– 'নিফাক করা হয়েছে।
- হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, এখানে مَرَضٌ দ্বারা দীনি রোগ বুঝানো হয়েছে, শারীরিক রোগ নয়। তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহের রোগ ছিল। তারা সর্বদাই মুসলিম বিদ্বেষী চিন্তায় লিপ্ত থাকতো।

মুনাফিকদের হত্যা করা থেকে রাসূল ﷺ -এর বিরত থাকার কারণ

নবী করীম ﷺ মুনাফেকদের সংখ্যা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানতেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে নবী ﷺ -কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবুও তিনি তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছেন। এর কারণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো–

(১) নবী করীম ﷺ ছাড়া অন্য কেউ মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে জানতো না। যেহেতু তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রধান কাজি, সেহেতু তিনি এর শাস্তির ফয়সালা দিতে পারেন না।

(২) আসহাবে শাফেয়ীর মতে তাদেরকে এজন্য হত্যা করেননি যে, কেননা সে ধর্মদ্রোহী যে কুফরি গোপন করে ঈমান প্রকাশ করে, তার কাছে এটার তওবা চাওয়া হবে, হত্যা করা যাবে না।

(৩) নবী করীম ﷺ -এর লক্ষ্য ছিল তাদের অন্তর জয় করে নেবেন। এরই আলোকে তিনি হযরত ওমর (রা.)-কে বলেন, হে ওমর মানুষ বলবে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর অনুচরদের হত্যা করছে। এটি অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

فَسَادٌ -এর অর্থ : فَسَادٌ শব্দটি صَلَاحٌ -এর বিপরীত। অর্থ– ধ্বংস করা, নষ্ট করা। কল্যাণ ও সৎকর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। সহজ-সরল এবং গঠনমূলক কার্য থেকে বিমুখ হয়ে বিপরীত ভূমিকা রাখাই হচ্ছে ফ্যাসাদের বাস্তবরূপ। স্বাভাবিক নিয়মের ব্যাঘাত ঘটিয়ে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টিও ফ্যাসাদের একটি রূপ। নবী করীম ﷺ ও কুরআনুল কারীমের উপর ঈমান আনা ছিল স্বভাবজাত চাহিদা। কিন্তু এটা থেকে বিমুখ হয়ে কুফরির মাধ্যমে জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করাকে আল্লাহ তা'আলা ফ্যাসাদ বলে অভিহিত করেছেন। –[কুরতুবী]

قوله لَا تُفْسِدُوْا -এর ব্যাখ্যা : তোমরা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না। মুনাফিকরা কিভাবে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতো? পবিত্র কুরআনে لَا تُفْسِدُوْا শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, তারা দুনিয়াতে এমন কিছু কাজ আঞ্জাম দিতো যা মুসলমানদের জন্য ক্ষতির কারণ হতো। যেমন তারা মুসলমানদের প্রতারিত করতো, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করতো, মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের উসকানি দিতো, গোপনে মুসলমানদের তথ্য সংগ্রহ করতো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল উভয় দলের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহ সৃষ্টি করা। অথচ তারা বলতো আমরা তোমাদের দু' দলের মধ্যে মীমাংসাকারী।

اَلْاَرْضُ শব্দটির বিশ্লেষণ : اَرْض শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ, اسم جنس বা জাতিবাচক বিশেষ্য। যে সকল مونث শব্দের শেষে تانى تانيث থাকে না তাদের বহুবচনের শেষে ت যুক্ত হয়। যেমন– عرسات، اعرس। অতএব اَرْض -এর جمع হওয়ার দরকার ছিল اَرَضَاتٌ; কিন্তু তারা اَرْضُوْنَ বলেছে। কোনো কোনো সময় এর বহুবচন اَرَاضٍ ও اُرُوْضٌ ব্যবহৃত হয়। তবে اَرَاضِىْ ও নিয়মের বিপরীতে হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মুনাফিকরা নিজের দোষকে গুণ ও অপরের গুণকে দোষ মনে করে

قوله لَا يَشْعُرُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : মুনাফিকরা মুসলমানদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতো, আর প্রকাশ্যে তাদের কল্যাণ কামনার ভান করতো তাদের এ খবর ছিল না যে, নবী করীম ﷺ তাদের এ কাজ সম্পর্কে অবহিত।

অথবা, এ অর্থও করা যেতে পারে যে, তাদের ফিতনামূলক কার্যক্রম তাদের নিকট ফিতনা বা ফ্যাসাদ মনে হতো না; বরং তারা কল্যাণ মনে করেই এগুলো করতো। অথচ এটাই ফ্যাসাদ। তাদের কাজকর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর নাফরমানিই প্রকাশ পেয়েছে, এটা তাদের জানা ছিল না।

১৩ নং আয়াতে মুনাফিকদের সামনে সত্যিকার ঈমানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধারা হয়েছে– اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ অর্থাৎ অন্যান্য লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তেমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন। এখানে 'নাস' শব্দের দ্বারা সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন অবতরণের যুগে তাঁরাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ তা'আলার দরবারে সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য। যে বিষয়ে তাঁরা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন, অনুরূপ ঈমান যদি অন্যেরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয়; অন্যথা তাকে ঈমান বলা চলে না। এতে বুঝা গেল যে সাহাবীগণের ঈমানই ঈমানের

কষ্টিপাথর। যার নিরিখে অবশিষ্ট সকল উম্মতের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় যে ঈমান সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাকে ঈমান বলা যায় না এবং অনুরূপ ঈমানদারদেরকে মুমিন বলা চলে না। এর বিপরীতে যত ভালো কাজই হোক না কেন, আর তা যত নেক নিয়তেই করা হোক না কেন, আল্লাহর নিকট তা ঈমানরূপে স্বীকৃতি পায় না। সে যুগের মুনাফিকরা সাহাবীদেরকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুতঃ এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা ভ্রষ্টকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণতঃ বোকা, অশিক্ষিত, মূর্খ প্রভৃতি আখ্যাই জুটে থাকে। কিন্তু কুরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি।

১৪ নং আয়াতে মুনাফিকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা মুসলমান হয়েছি, ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের কাফেরদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলমানদের সাথে উপহাস করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের বোকা বানাবার জন্য মিশেছি।

১৫ নং আয়াতে তাদের এ বোকামির উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা মনে করে, আমরা মুসলমানদেরকে বোকা বানাচ্ছি। অথচ বাস্তবে তারা নিজেরাই বোকা সাজছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটু ঢিল দিয়ে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছেন। প্রকাশ্যে তাদের কোনো শাস্তি না হওয়াতে তারা আরো গাফলতিতে পতিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপহাস ও ঠাট্টার প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন বলেই একে উপহাস বা বিদ্রূপ বলা হয়েছে।

মুনাফিকরা যাদের সাথে ঠাট্টা করতো : মুনাফিকরা মু'মিনদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। সাধারণ মুমিনদের সামনে বড় বড় সাহাবীদের প্রশংসা করতো। আর বড় বড় সাহাবীদের মর্যাদা উল্লেখ করে সাধারণ মুমিনদের থেকে মর্যাদাবান বলে আলোচনা করতো, অথচ তাদের অন্তরে মুমিনদের জন্য সামান্যতম মর্যাদাবোধও ছিল না; বরং হিংসা-বিদ্বেষে ভরপুর ছিল।

اِسْتِهْزَاء শব্দটির অর্থ : اِسْتِهْزَاء অর্থ– اِسْتِخْفَافٌ বা কাউকে তুচ্ছ সাব্যস্ত করা। سُخْرِيَّة বা হাসি-ঠাট্টা করা। ইমাম গাযালীর (র.) -এর মতে اِسْتِهْزَاء অর্থ– অপমান করা, হালকা মনে করা, দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে হাস্য ভরে সম্বোধন করা। এটা ব্যক্তির কাজ বা কথার দ্বারাও হতে পারে আবার ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমেও হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার ঠাট্টার ধরন : আল্লাহ তা'আলার জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ মানায় না। তদুপরি আয়াতে উল্লেখ আছে হেতু মুফাস্সিরগণের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জবাব পাওয়া যায়। যেমন–

(১) আল্লাহ তাদের প্রতিফল দান করবেন।

(২) মুমিনদের সাথে ঠাট্টার প্রতিফল তাদের উপরই আপতিত হবে। তারা মুমিনদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

(৩) তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। এখানে ঠাট্টা হলো سَبَبٌ আর আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা হলো مُسَبَّبٌ

(৪) আল্লাহ উভয় জাহানে তাদের সাথে ঠাট্টাকারীর ন্যায় আচরণ প্রদর্শন করবেন। দুনিয়ার ঠাট্টার ধরন হলো, তারা নিফাক গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে তা উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন। পরকালের ঠাট্টা হবে এমন যে, মুনাফিকরা জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত পেয়ে তাতে প্রবেশের জন্য এগিয়ে আসবে: তখনি তাদের সামনে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আল্লাহ বিদ্রূপকারীর ন্যায় ব্যবহার করবেন।)

(৫) অথবা, আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন তিনি কিভাবে ঠাট্টা করবেন। আমরা বাহ্যিক শব্দের উপর ঈমান আনব, تَاوِيْل করার প্রয়োজন নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُخٰدِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُخَادَعَةُ মূলবর্ণ (خ ـ د ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা ধোঁকা দেয়।

اٰمَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ا ـ م ـ ن) মাসদার اَلْاِيْمَانُ জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা ঈমান এনেছে/ বিশ্বাস করেছে।

مَايَخْدَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মূলবর্ণ (خ ـ د ـ ع) মাসদার اَلْخَدْعُ জিনস صحيح অর্থ– তারা ধোঁকা দেয় না।

اَنْفُسَهُمْ : শব্দটি বহুবচন, একবচন نَفْسٌ ; اَنْفُسَ মুযাফ هُمْ যমীর مضاف اليه অর্থ– তাদের আত্মাসমূহ, তাদের প্রাণ।

مَايَشْعُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ش ـ ع ـ ر) মাসদার اَلشُّعُوْرُ অর্থ– তাদের চেতনা নেই, তারা বুঝে না।

مُصْلِحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصْلَاحُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– সংশোধনকারীগণ।

اَلْمُفْسِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفْسَادُ মূলবর্ণ (ف ـ س ـ د) জিনস صحيح অর্থ– দুষ্কৃতকারী, বিধ্বংসী।

لَقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) মাসদার اَلْلِقَاءُ জিনস ناقص يائى অর্থ– [যখন] তারা সাক্ষাৎ করে। যখন তারা মিলিত হয়। لَقُوْا মূলতঃ لَقِيُوْا ছিল তা'লীল হয়ে لَقُوْا হয়েছে।

قَالُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) মাসদার اَلْقَوْلُ জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা বলল।

يَسْتَهْزِئُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, উপহাস করা।

يَمُدُّ : আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে সুযোগ দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেতাদের ঔদ্ধতার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। يَمُدُّ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَدُّ মূলবর্ণ (م ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ঢিল দিয়েছেন, সুযোগ দিয়েছেন

يَعْمَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْعَمَهُ মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– তারা হয়রান ও পেরেশান হয় বা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله خَتَمَ اللهُ عَلىٰ قُلُوْبِهِمْ : এখানে خَتَمَ ফে'ল الله হলো فاعل আর علي হলো حرف جار এবং قُلُوْبِ হলো مضاف আর هِمْ হলো مضاف اليه অতএব مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور হয়েছে। অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো خَتَمَ ফে'লের সাথে। ফে'ল ফায়েল ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : এখানে وَلَهُمْ-এর واو হলো حرف عطف আর ل শব্দটি حرف جار এবং هم শব্দটি مجرور অতএব جار এবং مجرور মিলে متعلق হয়েছে ثابت শিবহে ফে'ল -এর সাথে। এখন শিবহে ফে'ল তার متعلق-কে নিয়ে شبه جملة হয়ে خَبَر مُقَدَّم হয়েছে। আর عَذَابٌ শব্দটি موصوف এবং عَظِيْمٌ শব্দটি صفت অতঃপর موصوف ও صفت মিলে مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ হয়েছে। অতএব, مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ : এখানে ما পদটি مشبه بليس আর هم যমীর اسم ما আর بِمُؤْمِنِيْنَ হলো খবর।

قوله فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ এখানে فِيْ قُلُوْبِهِمْ হলো خبر مقدم আর مَرَضٌ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرٌ

قوله اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ : এখানে ان হলো حرف مشبه بالفعل আর هم যমীর ان-এর اسم আর هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ হলো خبر ان অতঃপর ان তার ইসম ও খবর নিয়ে جملة اسمية হয়েছে।

قوله فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا : এখানে زَادَ ফে'ল هُمْ যমীর مفعول به اول আর اَللّٰهُ হলো ফা'য়েল, مَرَضًا দ্বিতীয় মাফঊল। ফে'ল, ফা'য়েল এবং উভয় মাফঊল মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة

قوله نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ : এখানে نَحْنُ যমীর مبتدأ আর مُصْلِحُوْنَ হলো خبر:

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৬) তারা ঐ সমস্ত লোক যারা গ্রহণ করেছে গোমরাহী হেদায়েতের পরিবর্তে; সুতরাং তাদের এই ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা ঠিক পথে চলেনি।	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰلَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِحَتْ تِجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦)
(১৭) তাদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির অবস্থার ন্যায়, যে কোথাও আগুন জ্বালিয়ে অতঃপর যখন আগুন তার চারদিকের সবকিছু আলোকিত করল, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ছিনিয়ে নিলেন তাদের আলো এবং তাদেরকে ফেললেন অন্ধকারে, তারা কিছুই দেখতে পায় না।	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَٰتٍ لَا يُبْصِرُونَ (١٧)
(১৮) বধির, মূক, অন্ধ- কাজেই তারা আর ফিরবে না।	صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (١٨)
(১৯) অথবা এ মুনাফিকদের অবস্থা এরূপ যেমন আসমান হতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়, তাতে অন্ধকারও আছে আর বজ্র ধ্বনি এবং বিদ্যুৎও আছে, এমতাবস্থায় যারা পথ চলে তারা গুজে দেয় নিজেদের অঙ্গুলিসমূহ নিজেদের কর্ণকুহরে, বজ্রনিনাদে মৃত্যুর ভয়ে; আল্লাহ ঘিরে রেখেছেন কাফেরদেরকে সবদিক হতে।	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَٰعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَٰفِرِينَ (١٩)
অনুবাদ : (২০) মনে হয় যেন বিদ্যুৎ এখনই তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়; যখনই তাদের উপর বিদ্যুৎ প্রদীপ্ত হয়, তখন তার আলোকে তারা চলতে থাকে, আর যখন অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে; আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তাদের কর্ণ ও চক্ষু সমস্তই কেড়ে নিতেন; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ তারা ঐ সমস্ত লোক যারা اشْتَرَوُا গ্রহণ করেছে الضَّلَٰلَةَ গোমরাহী بِالْهُدَىٰ হেদায়েতের পরিবর্তে; فَمَا رَبِحَتْ সুতরাং লাভজনক হয়নি تِجَٰرَتُهُمْ তাদের এই ব্যবসা وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ এবং তারা ঠিক পথে চলেনি।

(১৭) مَثَلُهُمْ তাদের অবস্থা كَمَثَلِ الَّذِي ঐ ব্যক্তির অবস্থার ন্যায়, اسْتَوْقَدَ نَارًا যে কোথাও আগুন জ্বালিয়ে فَلَمَّا أَضَاءَتْ অতঃপর যখন আগুন আলোকিত করল مَا حَوْلَهُ তার চারদিকের সবকিছু ذَهَبَ اللَّهُ এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ছিনিয়ে নিলেন بِنُورِهِمْ তাদের আলো وَتَرَكَهُمْ এবং তাদেরকে ফেললেন فِي ظُلُمَٰتٍ অন্ধকারে لَا يُبْصِرُونَ তারা কিছুই দেখতে পায় না।

(১৮) صُمٌّ বধির بُكْمٌ মূক عُمْيٌ অন্ধ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ কাজেই তারা আর ফিরবে না।

(১৯) أَوْ অথবা এ মুনাফিকদের অবস্থা এরূপ كَصَيِّبٍ যেমন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয় مِّنَ السَّمَاءِ আসমান হতে فِيهِ ظُلُمَٰتٌ তাতে অন্ধকারও আছে وَرَعْدٌ আর বজ্র ধ্বনি وَبَرْقٌ এবং বিদ্যুৎও আছে يَجْعَلُونَ এমতাবস্থায় যারা পথ চলে তারা গুজে দেয় أَصَٰبِعَهُمْ নিজেদের অঙ্গুলিসমূহ فِي آذَانِهِم নিজেদের কর্ণকুহরে مِّنَ الصَّوَٰعِقِ বজ্রনিনাদে حَذَرَ الْمَوْتِ মৃত্যুর ভয়ে; وَاللَّهُ مُحِيطٌ আল্লাহ ঘিরে রেখেছেন সবদিক হতে بِالْكَٰفِرِينَ কাফেরদেরকে।

(২০) يَكَادُ الْبَرْقُ মনে হয় যেন বিদ্যুৎ يَخْطَفُ এখনই তাদের কেড়ে নেয় أَبْصَٰرَهُمْ দৃষ্টিশক্তি كُلَّمَا যখনই أَضَاءَ لَهُم তাদের উপর বিদ্যুৎ প্রদীপ্ত হয়, مَّشَوْا فِيهِ তখন তার আলোকে তারা চলতে থাকে وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ আর যখন অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে قَامُوا তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন لَذَهَبَ তবে কেড়ে নিতেন بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ তাদের কর্ণ ও চক্ষু সমস্তই إِنَّ اللَّهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ সমস্ত বস্তুর উপর قَدِيرٌ ক্ষমতাবান।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (٢١)

(২১) হে মানবজাতি! তোমরা ইবাদত কর, তোমাদের প্রতিপালকের যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তাদেরকে যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে, আশ্চর্য নয় তোমরা দোজখ হতে মুক্তি পাবে।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٢٢)

(২২) তিনি এমন, যিনি করেছেন জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানাস্বরূপ এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ, আর আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, উৎপন্ন করেছেন তা দ্বারা ফলসমূহ তোমাদের খাদ্যরূপে, অতএব, তোমরা কাউকেও আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করো না, তোমরা তো জান, বুঝ।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٢٣)

(২৩) আর যদি তোমরা সন্দিহান হও, আমার খাস বন্দার প্রতি অবতারিত কিতাবে, তবে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা রচনা কর এবং ডেকে নাও, তোমাদের সাহায্যকারীদের, যারা আল্লাহ হতে পৃথক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

শাব্দিক অনুবাদ

(২১) يَاَيُّهَا النَّاسُ হে মানবজাতি! اعْبُدُوْا তোমরা ইবাদত কর, رَبَّكُمُ তোমাদের প্রতিপালকের الَّذِيْ خَلَقَكُمْ যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ এবং তাদেরকে যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আশ্চর্য নয় তোমরা দোজখ হতে মুক্তি পাবে।

(২২) الَّذِيْ جَعَلَ তিনি এমন, যিনি করেছেন لَكُمُ তোমাদের জন্য الْاَرْضَ জমিনকে فِرَاشًا বিছানাস্বরূপ وَّالسَّمَآءَ এবং আসমানকে بِنَآءً ছাদ স্বরূপ وَّاَنْزَلَ আর বর্ষণ করেছেন مِنَ السَّمَآءِ আসমান হতে مَآءً পানি فَاَخْرَجَ بِهٖ উৎপন্ন করেছেন তা দ্বারা مِنَ الثَّمَرٰتِ ফলসমূহ رِزْقًا لَّكُمْ তোমাদের খাদ্যরূপে فَلَا تَجْعَلُوْا অতএব তোমরা কাউকেও স্থির করো না لِلّٰهِ اَنْدَادًا আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ তোমরা তো জান, বুঝ।

(২৩) وَاِنْ كُنْتُمْ আর যদি তোমরা হও فِيْ رَيْبٍ সন্দিহান مِّمَّا نَزَّلْنَا অবতারিত কিতাবে عَلٰى عَبْدِنَا আমার খাস বন্দার প্রতি فَاْتُوْا তবে তোমরা রচনা কর بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ অনুরূপ একটি সূরা وَادْعُوْا এবং ডেকে নাও شُهَدَآءَكُمْ তোমাদের সাহায্যকারীদের مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ যারা আল্লাহ হতে পৃথক اِنْ كُنْتُمْ যদি তোমরা হও صٰدِقِيْنَ সত্যবাদী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ الخ -১৯ **আয়াতের শানে নুযূল** : মদিনা হতে দুজন মুনাফিক পলায়ন করে মক্কার দিকে চলে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে প্রবল বৃষ্টির বজ্র, গর্জন এবং বিদ্যুৎ তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে উভয়ই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। বিদ্যুৎ চমকালে তারা কিছুদুর অগ্রসর হতো, আবার অন্ধকার হলে দাঁড়িয়ে যেতো। বজ্রের ভীষণ গর্জনে মৃত্যুর ভয়ে কর্ণ-কুহরে অঙ্গুলি প্রবেশ করাতো। অবশেষে ভীত হয়ে বলতে লাগল, যদি সকাল হয় এবং মেঘমালা চলে যায়, তবে আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুগত হয়ে যাব; কথামতো সকাল হতেই তারা হুজুর ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাদের ঈমান নবায়ন করে নেয় এবং খাঁটি মুসলমান হয়ে যায়। তাদের বর্ণনায় উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

১৬ নং আয়াতে মুনাফিকদের সে অবস্থার বর্ণনা রয়েছে যে, তারা ইসলামকে কাছে থেকে দেখেছে এবং তার স্বাদও পেয়েছে, আর কুফরিতে তো পূর্ব থেকেই লিপ্ত ছিল। অতঃপর ইসলাম ও কুফর উভয়কে দেখে-বুঝেও তাদের দুনিয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করেছে। তাদের এ কাজকে ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করে জানানো হয়েছে যে, তাদের ব্যবসায়ের কোনো যোগ্যতাই নেই। তারা উত্তম ও মূল্যবান বস্তু ঈমানের পরিবর্তে নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন বস্তু কুফর খরিদ করেছে।

১৭-২০ এই চার আয়াতে দুটি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের কার্যকলাপকে ঘৃণ্য আচরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের দু'শ্রেণির লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে পৃথক দু'টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

মুনাফিকদের একশ্রেণির লোক হচ্ছে তারা, যারা কুফরিতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছে থেকে আর্থিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করতো। দ্বিতীয় শ্রেণির লোক হচ্ছে তারা, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে কখনো প্রকৃত মুমিন হতে ইচ্ছা করতো, কিন্তু দুনিয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে এ ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতো। এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দিনাতিপাত করতো।

আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর নাগালের ঊর্ধ্বে নয়। সব সময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংসও করতে পারেন। এমনকি তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে পর্যন্ত রহিত করে দিতে পারেন। এই তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে অনেক আহকাম ও মাসআলা এবং গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত বা উপদেশ রয়েছে। যথা–

কুফর ও নেফাক সে যুগেই ছিল, না এখনো আছে : আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা জানতে পারি যে, মুনাফিকদের কপটতা নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান নয়; বরং মুনাফিক। দ্বিতীয়তঃ এই যে, তাদের কথা-বার্তা ও কার্যকলাপে ইসলাম ও ঈমানবিরোধী কোনো কাজ প্রকাশ পাওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তিরোধানের পর ওহী বন্ধ হওয়ার প্রথম পদ্ধতি মুনাফিকদের সনাক্ত করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এখনো রয়েছে। যে ব্যক্তি কথা-বার্তায় ঈমান ও ইসলামের দাবিদার, কিন্তু কার্যকলাপে তার বিপরীত, তাকে মুনাফিক বলা হবে।

ঈমান ও কুফরের তাৎপর্য

আলোচ আয়াতে চিন্তা করলে ঈমান ও ইসলামের পূর্ণ তাৎপর্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অপরদিকে কুফরের হাকিকতও প্রকাশ পায়। কেননা এ আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ঈমানের দাবি اٰمَنَّا بِاللّٰهِ এবং কুরআনের পক্ষ হতে এই দাবির খণ্ডনে ঘোষিত وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে আরো কিছু বিশেষ চিন্তা-ভাবনার অপেক্ষা রাখে : যে সমস্ত মুনাফিকের বর্ণনা কুরআনে দেওয়া হয়েছে, সাধারণতঃ তারা ছিল ইহুদি। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও রোজ কিয়ামতে বিশ্বাস করা তাদের ধর্ম মতেও প্রমাণিত ছিল, তাদেরকে রাসূল ﷺ -এর রিসালাত ও নবুয়তের প্রতি ঈমান আনার কথা এখানে বলা হয়নি; বরং মাত্র দু'টি বিষয়ে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ও শেষবিচার দিনের প্রতি। এতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা চলে না। তা সত্ত্বেও কুরআন কর্তৃক তাদেরকে মিথ্যাবাদী এবং তাদের ঈমানকে অস্বীকার করার কারণ কি? আসল কথা হচ্ছে যে, কোনো না কোনো প্রকারে নিজ নিজ ধারণা ও ইচ্ছা মাফিক আল্লাহ এবং পরকাল স্বীকার করাকে ঈমান বলা যায় না। কেননা মুশরিকরাও তো কোনো না কোনো দিক দিয়ে আল্লাহকে মেনে নেয় এবং কোনো একটি নিয়ামক সত্তাকে সবচাইতে বড় একক ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করে। আর ভারতের মুশরিকগণ 'পরলোক' নাম দিয়ে আখেরাতের একটি ধারণাও পোষণ করে থাকে। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে একেও ঈমান বলা যায় না; বরং একমাত্র সে ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যাতে আল্লাহর প্রতি তাঁর নিজের বর্ণনাকৃত সকল গুণাগুণসহ যে ঈমান আনা হয় এবং পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণনাকৃত অবস্থা ও গুণাগুণের সাথে যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞা

কুরআনের ভাষায় ঈমানের তাৎপর্য বলতে গিয়ে সূরা বাকারার ত্রয়োদশতম আয়াতে বলা হয়েছে اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের যথার্থতা যাচাই করার মাপকাঠি হচ্ছে সাহাবীগণের ঈমান। এ পরীক্ষায় যা সঠিক বলে প্রমাণিত না হবে, তা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট ঈমান বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না।

যদি কোনো ব্যক্তি কুরআনের বিষয়কে কুরআনের বর্ণনার বিপরীত পথে অবলম্বন করে বলে যে, আমি তো এ আকীদাকে মানি, তবে তা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। যথা– আজকাল কাদিয়ানীরা বলে বেড়ায় যে, আমরা তো খতমে নুবয়তে বিশ্বাস

করি, অথচ এ বিশ্বাসে তারা রাসূল ﷺ -এর বর্ণনা ও সাহাবীগণের ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে। আর এ পর্দার অন্তরালে মির্জা গোলাম আহমদের নবুয়ত প্রতিষ্ঠার পথ বের করছে। তাই কুরআনের বর্ণনায় এদেরকেও وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ -এর আওতাভুক্ত করা হয়।

শেষকথা, যদি কোনো ব্যক্তি সাহাবীগণের ঈমানের পরিপন্থি কোনো বিশ্বাসের কোনো নতুন পথ ও মত তৈরি করে সে মতের অনুসারী হয় এবং নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে, মুসলমানদের নামাজ রোজা ইত্যাদিতে শিরিকও হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনে প্রদর্শিত পথে ঈমান আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের ভাষায় তাদেরকে মুমিন বলা হবে না।

একটি সন্দেহের নিরসন : হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রের একটি সুপরিচিত সিদ্ধান্ত এই যে, আহলে কেবলাকে কাফের বলা যাবে না। এর উত্তরও এ আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, আহলে কেবলা তাদেরকেই বলা হবে যারা দীনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ে স্বীকৃতি জানায়। কোনো একটি বিষয়েও অবিশ্বাস পোষণ করে না বা অস্বীকৃতি জানায় না। পরন্তু শুধু কেবলামুখি হয়ে নামাজ পড়লেই কেউ ঈমানদার হতে পারে না। কারণ তারা সাহাবীগণের ন্যায় দীনের যাবতীয় জরুরিয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

মিথ্যা একটি জঘন্য অপরাধ

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আয়াতে মুনাফিকদের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তারা প্রথম স্তরের কাফের হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জানা মতে মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইত। তাই তারা ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ এবং রোজ কিয়ামতের কথা বলেই ক্ষান্ত হতো, রাসূলের প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গ দৃঢ়তার সাথে পাশ কাটিয়ে যেত, কেননা এতে করে তাদের পক্ষে সরাসরি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় ছিল। এতে বুঝা যায় যে, মিথ্যা এমন একটি জঘন্য ও নিকৃষ্ট অপরাধ যা কোনো আত্মমর্যাদা সম্পন্ন লোকই পছন্দ করে না– সে কাফের-ফাসেকই হোক না কেন।

নবী এবং ওলীগণের সাথে দুর্ব্যবহার করা প্রকারান্তরে আল্লাহর সাথে দুর্ব্যবহারেরই শামিল : উপরিউক্ত আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ অর্থাৎ এরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, অথচ এ মুনাফিকদের মধ্যে হয়তো একজনও এমন ছিল না, যে আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার মনোভাব পোষণ করত; বরং তারা রাসূল ﷺ এবং মুমিনগণকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সমস্ত ঘৃণ্য কাজ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদের এ আচরণকে আল্লাহকেই ধোঁকা দেওয়া বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং প্রকারান্তে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহর রাসূল বা কোনো ওলীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আল্লাহর সাথেই মন্দ আচরণ করে। প্রসঙ্গতঃ আল্লাহর রাসূলের সাথে বে-আদবী করায় আল্লাহর সাথেই বে-আদবী করা হয়, এ কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলার রাসূল এবং তাঁর অনুসারীগণের বিপুল মর্যাদার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

মিথ্যা বলার পাপ

আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কঠোর শাস্তির কারণ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ অর্থাৎ তাদের মিথ্যাচারকে স্থির করা হয়েছে। অথচ তাদের কুফর ও নিফাকের অন্যায়ই ছিল সবচাইতে বড়। দ্বিতীয় বড় অন্যায় হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কঠোর শাস্তির কারণ তাদের মিথ্যাচারকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যায়। এ বদ অভ্যাসই তাদেরকে কুফর ও নিফাকই পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এ জন্যই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও নিফাকই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা। তাই কুরআন মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত করে ইরাশাদ করেছে– فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

অর্থাৎ মূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে বিরত থাক। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর হেদায়েতকে মানা না মানার ভিত্তিতে মানবজাতিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে, প্রত্যেকের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে তিনটি দলকেই সমগ্র কুরআনের মূল শিক্ষার প্রতি আহবান করা হয়েছে। এতে সৃষ্টিজগতের সবকিছুর আরাধনা পরিহার করে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি এমন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে যাতে সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও একটু চিন্তা করলেই তাওহীদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়।

نَاس [নাস] আরবি ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের তিন শ্রেণিই এ আহবানের অন্তর্ভুক্ত তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ ইবাদত শব্দের অর্থ নিজের অন্তরে মাহাত্ম্য ও ভীতি জাগ্রত রেখে সকল শক্তি আনুগত্য ও তাবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে দূরে থাকা। –[রূহুল বয়ান পৃ. ৭৪] 'রব শব্দের অর্থ পালনকর্তা। ইতঃপূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তদনুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত কর।

এ ক্ষেত্রে 'রব' শব্দের পরিবর্তে 'আল্লাহ বা তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে থেকে অন্য যে কোনো একটি ব্যবহার করা যেতে পারতো, কিন্তু তা না করে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, এখানে দাবির সাথে দলিলও পেশ করা হয়েছে। কেননা ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ; যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুণান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন।

মানুষ যতই মূর্খই হোক না কেন নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পালনের সকল দায়িত্ব নেওয়া আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয় আর সাথে সাথে একথাও উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষকে এ অগণিত নিয়ামত না পাথর-নির্মিত কোনো মূর্তি দান করেছে, না অন্য কোনো শক্তি। আর তারা করবেই বা কিরূপে? তারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বা বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার মুখাপেক্ষী। যে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে? যদি কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্রকৃতপ্রস্তাবে সে সত্তার ব্যবস্থাপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার ইবাদতের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্তা আদৌ ইবাদতের যোগ্য নয় :

আমল নাজাত ও বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত উপায় নয় : لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ বাক্যটিতে لَعَلَّ শব্দ আশা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি এমন ক্ষেত্রে বলা হয়, যেখানে কোনো কাজ হওয়া নিশ্চিত হয়ে থাকে। ঈমান তাওহীদের পরিণাম নাজাত সম্বন্ধে আল্লাহর ওয়াদা নিশ্চিত, কিন্তু সে বস্তুকে আশারূপে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, মানুষের কোনো কাজই মুক্তি ও বেহেশতের মূল্য বা বিনিময় হতে পারে না; বরং একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানিতেই মুক্তি সম্ভব। ঈমান আনা ও আমল করার তৌফিক হওয়া আল্লাহর মেহেরবানির নমুনা, কারণ নয়।

তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন : ইসলামের মৌলিক আকীদা তাওহীদ বিশ্বাস শুধু একটি ধারণা বা মতবাদমাত্রই নয়; বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়ও বটে। যা মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং সকল দুঃখ দুর্বিপাকের মর্মসাথী। কেননা তাওহীদ বিশ্বাসের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সৃষ্ট সকল বস্তুর পরিবর্তন-পরিবর্ধন একমাত্র একক সত্তার ইচ্ছাশক্তির অনুগত এবং তাঁর কুদরতের প্রকাশ। এ দুটি আয়াতে এমন এক কালাম পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোই হতে পারে না। ব্যক্তিগত মেধা কিংবা দলগত উদ্যোগের দ্বারাও এ কালামের অনুরূপ রচনা করা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির এ অপারগতার আলোকেই এ সত্য প্রমাণিত যে, এ কালাম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নয়। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে উদ্দেশ করে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা এ কালামকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের কালাম বলে মনে কর, তবে যেহেতু তোমরাও মানুষ, তোমাদেরও অনুরূপ কালাম রচনা করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা উচিত। কাজেই সমগ্র কুরআন নয়; বরং এর ক্ষুদ্রতম একটি সূরাই রচনা করে দেখাও। এতে তোমাদেরকে আরো সুযোগ দেওয়া যাবে যে, একা না পারলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলে , যারা তোমাদের সাহায্য-সহায়তা করতে পারে এমন সব লোক নিয়েই ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু না, তা পারবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের সে যোগ্যতাই নেই। তারপর বলা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও যখন পারবে না। তখন দোজখের আগুন ও শাস্তিকে ভয় কর। কেননা এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মানব রচিত কালাম নয়; বরং এমন অসীম শক্তিশালী সত্তার কালাম যা মানুষের ধরা-ছোঁয়া ও নাগালের উর্ধ্বে। যাঁর শক্তি সকলের উর্ধ্বে এমন এক মহা সত্তা ও শক্তির কালাম। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে দোজখের কঠোর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা কর।

মোটকথা, এ দুটি আয়াতে কুরআনুল কারীমকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বাপেক্ষা বড় মু'জিযা হিসেবে অভিহিত করে তাঁর রিসালাত ও সত্যবাদিতার দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। রাসূল ﷺ -এর মু'জিযার তো কোনো শেষ নেই এবং প্রত্যেকটিই অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু তা সত্ত্বেও এস্থলে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার মু'জিযা অর্থাৎ কুরআনের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রেখে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা হচ্ছে কুরআন এবং মু'জিযা অন্যান্য নবী রাসূলগণের সাধারণ মু'জিযা অপেক্ষা স্বতন্ত্র ; কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতে রাসূল প্রেরণের সাথে সাথে কিছু মু'জিযাও প্রকাশ করেন। আর এসব মু'জিযা যে সমস্ত রাসূলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে ; সেগুলো তাঁদের জীবন কাল পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে ; কিন্তু কুরআনই এমন এক বিচিত্র মু'জিযা যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ : رَيْبٌ শব্দের অর্থ সন্দেহ, সংশয় কিন্তু ইমাম রাগেব ইসফাহানীর মতে رَيْبٌ এমন সন্দেহ ও ধারণাকে বলা হয়, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সামান্য একটু চিন্তা করলেই যে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্য কুরআনে অমুসলিম জ্ঞানী সমাজের পক্ষেও رَيْبٌ -এ পতিত হওয়া স্বাভাবিক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন একটি গতিশীল ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মু'জিযা

অন্যান্য সমস্ত নবী ও রাসূলগণের মু'জিযাসমূহ তাঁদের জীবন পর্যন্তই মু'জিযা ছিল। কিন্তু কুরআনের মু'জিযা রাসূল ﷺ-এর তিরোধানের পরও পূর্বের মতোই মু'জিযা সুলভ বৈশিষ্ট্যসহই বিদ্যমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোনো জ্ঞানগুণীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, কুরআনের সমতুল্য কোনো আয়াত ইতঃপূর্বেও কেউ তৈরি করতে পারেনি, এখনো কেউ পারে না, আর যদি সাহস থাকে তবে তৈরি করে দেখাও।

সুতরাং কুরআনের রচনাশৈলী, যার নমুনা আর কোনোকালেই কোনো জাতি পেশ করতে পারেনি, সেটাও একটি চলমান দীর্ঘস্থায়ী মু'জিযা। রাসূল ﷺ-এর যুগে যেমন এর নজির পেশ করা যায়নি, অনুরূপভাবে আজও তা কেউ পেশ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না।

অনন্য কুরআন : উপরিউক্ত সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, কিসের ভিত্তিতে কুরআনকে আর কি কারণে কুরআন শরীফ সর্বযুগে অনন্য ও অপরাজেয় এবং সারা বিশ্ববাসী কেন এর নজির পেশ করতে অপারগ?

দ্বিতীয়ত : মুসলমানদের এ দাবি যে, চৌদ্দশত বৎসরের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও কেউ কুরআনের বা এর একটি সূরার অনুরূপ কোনো রচনাও পেশ করতে পারেনি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবির যথার্থতা কতটুকু এ দুটি বিষয়ই দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ।

কুরআনের মু'জিযা হওয়ার অন্যান্য কারণসমূহ : প্রথম কথা হচ্ছে যে, কুরআনকে মু'জিযা বলে অভিহিত করা হলো কেন, আর কি কি কারণে সারা বিশ্ব এর নজির পেশ করতে অপারগ হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর প্রত্যেক মুফাসসিরই স্ব স্ব বর্ণনা ভঙ্গিতে এর বিবরণ দিয়েছেন। এখানে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হলো।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এ আশ্চর্য এবং সর্ববিধ জ্ঞানের আধার মহান গ্রন্থটি কোন পরিবেশে এবং কার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সে যুগের সমাজ পরিবেশ কি এমন কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা এমন পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে, যাতে সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ সন্নিবেশিত করা স্বাভাবিক হতে পারে? সমগ্র মানব সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক সম্বলিত নির্ভুল পথ নির্দেশ ও গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার মতো কোনো সূত্রের সন্ধান কি সে যুগের জ্ঞান ভাণ্ডারে বিদ্যমান ছিল, যা দ্বারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিকেরই সুষ্ঠু বিকাশের বিধানাবলি থেকে শুরু করে পারিবারিক নিয়ম শৃঙ্খলা, সমাজ সংগঠন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তথা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য আইন-কানুন বিদ্যমান থাকতে পারে?

যে ভূ-খণ্ডে এবং যে মহান ব্যক্তির প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, এর ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা জানতে গেলে সাক্ষাৎ ঘটবে এমন একটা ওজর শুষ্ক মরুময় এলাকার সাথে যা ছিল বাত্‌হা বা মক্কা নামে পরিচিত। যে এলাকার ভূমি না ছিল কৃষিকাজের উপযোগী, না ছিল এখানে কোনো কারিগরি শিল্প। আবহাওয়ায়ও এমন স্বাস্থ্যকর ছিল না, যা কোনো বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারে। রাস্তা-ঘাটও এমন ছিল না, যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়। সেটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এমন একটি মরুময় উপদ্বীপ, যেখানে শুষ্ক পাহাড়-পর্বত এবং ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়তো না। কোনো জনবসতি বা বৃক্ষলতার অস্তিত্বও বড় একটা দেখা যেত না।

এ বিরাট ভূ-ভাগটির মধ্যে কেনো উল্লেখযোগ্য শহরেরও অস্তিত্ব ছিল না। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম এবং তার মধ্যে উট ছাগল প্রতিপালন তো দূরের কথা, নামেমাত্র যে কয়টি শহর ছিল, সেগুলোতেও লেখাপড়ার কোনো চর্চাই ছিল না। না ছিল কোনো স্কুল কলেজ, না ছিল কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র ঐতিহ্যগতভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন একটা সুসমৃদ্ধ ভাষাসম্পদ দান করেছিলেন, যে ভাষা গদ্য ও পদ্য বাক-রীতিতে ছিল অনন্য। আকাশের মেঘ গর্জনের মতো সে ভাষার মাধুরী অপূর্ব সাহিত্যরসে সিক্ত হয়ে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো। অপূর্ব রসময় কাব্যসম্ভার বৃষ্টিধারার মতো আবৃত হতো পথে প্রান্তরে। এ সম্পদ ছিল এমনি এক বিস্ময় আজ পর্যন্তও যার রসাস্বাদন করতে গিয়ে যে কোনো সাহিত্য প্রতিভা হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল তাদের স্বভাবজাত এক সাধারণ উত্তরাধিকার। কোনো মক্তব-মাদরাসার মাধ্যমে এ ভাষাজ্ঞান অর্জন করার রীতি ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের কোনো আগ্রহও পরিলক্ষিত হতো না। যারা শহরে বাস করতো, তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্ব ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পণ্যসামগ্রী একস্থান থেকে অন্যস্থানে আমদানি-রপ্তানিই ছিল তাদের একমাত্র পেশা।

সে দেশেই সর্বপ্রাচীন শহর মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, যাঁর প্রতি আল্লাহর পবিত্রতম কুরআন নাজিল করা হয়। প্রসঙ্গতঃ সে মহামানবের অবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা যাক।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তিনি পিতৃহারা হন, জন্মগ্রহণ করেন অসহায় এতিম হয়ে। মাত্র সাত বছর বয়সেই মাতৃবিয়োগ ঘটে: মাতার স্নেহ-মমতার কোলে লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগও তিনি পাননি। পিতৃ-পিতামহগণ ছিলেন এমন দরাজদিল যার ফলে পারিবারিক সূত্র থেকে উত্তরাধিকাররূপে সামান্য সম্পদও তাঁর ভাগ্যে জুটেনি যার দ্বারা এ অসহায় এতিমের যোগ্য লালন-পালন হতে পারতো। পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় নিতান্ত কঠোর দারিদ্র্যের মাঝে লালিত পালিত হন। যদি তখনকার মক্কায় লেখাপড়ার চর্চা থাকতো তবুও এ কঠোর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে লেখাপড়া করার কোনো সুযোগ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কোনো অবস্থাতেই সম্ভবপর হতো না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানীন্তন আরবে লেখাপড়ার কোনো চর্চাই ছিল না, যে জন্য আরব জাতিকে উম্মী তথা নিরক্ষর জাতি বলা হতো। কুরআন পাকেও এ জাতিকে উম্মী জাতি নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সে মহান ব্যক্তি বাল্যকালবধি যে কোনো ধরনের লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন রয়ে যান। সে দেশে তখন এমন কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিরও অস্তিত্ব ছিল না, যাঁর সহচর্যে থেকে এমন কোনো জ্ঞান-সূত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো, যে জ্ঞান কুরআন পাকে পরিবেশন করা হয়েছে। যেহেতু একটা অনন্য সাধারণ মু'জিযা প্রদর্শনই ছিল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য, তাই মামূলী একটু অক্ষর জ্ঞান যা দুনিয়ার যে কোনো এলাকার লোকই কোনো না কোনো উপায়ে আয়ত্ব করতে পারে, তাও আয়ত্ব করার কোনো সুযোগ তাঁর জীবনে হয়ে উঠেনি। অদৃশ্য শক্তির বিশেষ ব্যবস্থাতেই তিনি এমন নিরক্ষর উম্মী রয়ে গেলেন যে, নিজের নামটুকু পর্যন্ত দস্তখত করতে তিনি শিখেননি।

তদানীন্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্য চর্চা। স্থানে স্থানে কবিদের জলসা-মজলিস বসতো। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী চারণ ও স্বভাব কবিগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হতো। প্রত্যেকেই উত্তম কাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার চেষ্টা করতো। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ তা'আলা এমন রুচি দান করেছিলেন যে, কোনো দিন তিনি এধরনের কবি জলসায় শরিক হননি। জীবনেও কখনো একছত্র কবিতা রচনা করারও চেষ্টা করেননি।

উম্মী হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রতা-নম্রতা, চরিত্রমাধুর্য ও অত্যন্ত প্রখর ধীশক্তি এবং সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর অসাধারণ গুণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো, ফলে আরবের ক্ষমতাদর্পী বড়লোকগুলোও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতো সমগ্র মক্কা নগরীতে তাঁকে আল-আমীন বলে অভিহিত করা হতো।

এ নিরক্ষর ব্যক্তি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কা নগরীতে অবস্থান করেছেন। ভিন্ন কোনো দেশে ভ্রমণেও যাননি। যদি এমন ভ্রমণও করতেন, তবুও ধরে নেওয়া যেত যে, তিনি সেসব সফরে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার্জন করেছেন। মাত্র সিরিয়ায় দুটি বাণিজ্যিক সফর করেছেন, যাতে তাঁর কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কায় এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন যে, কোনো পুস্তক বা লেখনী স্পর্শ করেছেন বলেও জানা যায় না, কোনো মক্তবেও যাননি, কোনো কবিতা বা ছড়াও রচনা করেননি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মুখ থেকে সে বাণী নিঃসৃত হতে লাগল, যাকে কুরআন বলা হয়। যা শাব্দিক ও অর্থের গুণগত দিক দিয়ে মানুষকে স্তম্ভিত করতো। সুস্থ বিবেকবান লোকদের জন্য কুরআনের এ গুণগত মান মু'জিযা হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ ছিল। কিন্তু তাতেই তো শেষ নয়; বরং এ কুরআন সারা বিশ্ববাসীকে বারংবার চ্যালেঞ্জ সহকারে আহবান করেছে যে, যদি একে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকেত, তবে এর নজির পেশ করে দেখাও।

একদিকে কুরআনের আহ্বান অপরদিকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধী শক্তি যা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ধ্বংস করার জন্য স্বীয় জান-মাল শক্তি-সামর্থ্য ও মান-ইজ্জত তথা সর্বকিছু নিয়োজিত করে দিন-রাত চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এ সামান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে কেউ সাহস করেনি। ধরে নেওয়া যাক, এ গ্রন্থ যদি অদ্বিতীয় ও অনন্য সাধারণ নাও হতো, তবু একজন উম্মী লোকের মুখে এর প্রকাশই কুরআনকে অপরাজয়ের বলে বিবেচনা করতে যে কোনো সুস্থবিবেক সম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। কেননা একজন উম্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রন্থ রচনা করতে পারা কোনো সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ : পবিত্র কুরআন ও কুরআনের নির্দেশাবলি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সম্বোধন ছিল প্রত্যক্ষভাবে আরব জনগণের প্রতি। যাদের অন্য কোনো জ্ঞান না থাকলেও ভাষা শৈলীর উপর ছিল অসাধারণ বুৎপত্তি। এদিক দিয়ে আরবরা সারাবিশ্বে এক শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। কুরআন তাদেরকে লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ করেছে যে, কুরআন যে আল্লাহর কালাম তাতে যদি তোমরা সন্দিহান হয়ে থাক, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সাধারণ সূরা রচনা করে দেখাও। যদি আল কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ শুধু এর অর্ন্তগত গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথা এবং নিগুঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হতো, তবে হয়তো এ উম্মী জাতির পক্ষে কোনো অজুহাত পেশ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারতো, কিন্তু ব্যাপার তা নয়; বরং রচনা শৈলীর আঙ্গিক সম্পর্কেও এতে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য জাতির চাইতে আরববাসীরাই ছিল বেশি উপযুক্ত। যদি এ কালাম মানব ক্ষমতার উর্ধ্বে কোনো অলৌকিক শক্তির রচনা না হতো, তবে অসাধারণ ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন আরবদের পক্ষে এর মোকাবিলা কোনো মতেই অসম্ভব হতো না; বরং এর চাইতেও উন্নতমানের কালাম তৈরি করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। দু একজনের পক্ষে তা সম্ভব না হলে,

কুরআন তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুযোগ দিয়েছিল ; তা সত্ত্বেও সমগ্র আরববাসী একেবার নিশ্চুপ রয়ে গেল কয়েকটি বাক্যও তৈরি করতে পারল না।

আরবের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো কুরআন ও ইসলামকে সম্পূর্ণ উৎখাত এবং রাসূল ﷺ-কে পরাজিত করার জন্য যেভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, তা শিক্ষিত লোকমাত্রই অবগত। প্রাথমিক অবস্থায় হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর স্বল্পসংখ্যক অনুসারীর প্রতি নানা উৎপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে তারা তোমাদের পথ ধরলো। আরবের বড় সরদার ওতবা ইবনে রাবী'আ সকলের প্রতিনিধিরূপে হুজুর ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, আপনি ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকুন। আপনাকে সমগ্র আরবের ধন সম্পদ, রাজত্ব এবং সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে। তিনি এর উত্তরে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। হিজরতের পূর্বে ও পরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। কিন্তু কেউই কুরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হলো না। তারা কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা এমনকি ছত্রও তৈরি করতে পারল না। ভাষাশৈলী ও পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে কুরআনের মোকাবিলা করার ব্যাপারে আরবদের এহেন নীরবতাই প্রমাণ করে যে, কুরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং তা আল্লাহরই কালাম। মানুষ তো দূরের কথা, সমগ্র সৃষ্টিজগত মিলেও এ কালামের মোকাবিলা করতে পারে না।

আরববাসীরা যে এ ব্যাপারে শুধু নির্বাকই রয়েছে তাই নয়, তাদের একান্ত আলোচনায় এরূপ মন্তব্য করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি যে, এ কিতাব কোনো মানুষের রচনা হতে পারে না। আরবদের মধ্যে এরূপ স্বীকৃতির সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই ইসলাম গ্রহণও করেছে। এরূপ স্বীকৃতির পর কেউ কেউ পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগের কারণে অথবা বনী আবদে মুনাফের প্রতি বিদ্বেশবশতঃ কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার করেও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে।

কুরাইশদের ইতিহাসই সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। তারই মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে অতি সহজে বুঝা যাবে যে, সমগ্র আরববাসী কুরআনকে অদ্বিতীয় ও নজিরবিহীন কালাম বলে স্বীকার করেছে এবং এর নজির পেশ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি নিতে সচেতনভাবে বিরত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কুরআন নাজিলের কথা মক্কার গণ্ডী ছাড়িয়ে হেজাযের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে এরূপ সংশয়ের সৃষ্টি হলো যে, আসন্ন হজের মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীগণ যখন মক্কায় আগমন করবে, তখন তারা রাসূল ﷺ-এর কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। এমতাবস্থায় এরূপ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করার পন্থা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশরা একটি বিশেষ পরামর্শসভার আয়োজন করলো। এ বৈঠকে আরবের বিশিষ্ট সরদারগণও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা বয়সে ও বিচক্ষণতায় ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। সবাই তার নিকট এ সমস্যার কথা উত্থাপন করল। তারা বলল, এখন চারদিক থেকে মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞেস করবে। তাদের সেসব প্রশ্নের জবাবে আমরা কি বলব? আপনি আমাদেরকে এমন একটি উত্তর দিন, যেন আমরা সবাই একই কথা বলতে পারি।

অনেক ভাবনা চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন, যদি তোমাদের কিছু বলতেই হয়, তবে তাঁকে জাদুকর বলতে পার। লোকদেরকে বল যে, এ লোক জাদু-বলে পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন। সমবেত লোকেরা তখনকার মতো প্রস্তাবে একমত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তখন থেকেই তারা আগন্তুকদের নিকট একথা বলতে আরম্ভ করল, কিন্তু আল্লাহর জ্বালানো প্রদীপ কারো ফুৎকারে নির্বাপিত হওয়ার নয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধারণ লোকদের অনেকেই কুরআনের অমীয় বাণী শুনে মুসলমান হয়ে গেল। ফলে মক্কার বাইরেও ইসলামের বিস্তার সূচিত হলো। – [খাসায়েসে কুবরা]

এমনিভাবে বিশিষ্ট কুরাইশ সরদার নযর ইবনে হারেস তার স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আজ তোমরা এমন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। মুহাম্মদ ﷺ তোমাদেরই মধ্যে যৌবন অতিবাহিত করেছেন, তোমরা তাঁর চরিত্রমাধুর্যে বিমুগ্ধ ছিলে, তাঁকে তোমরা সবার চাইতে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে, আমানতদার বলে অভিহিত করতে। কিন্তু যখন তাঁর মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছে, আর তিনি আল্লাহর কালাম তোমাদেরকে শোনাতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাঁকে জাদুকর বলে অভিহিত করছ। আল্লাহর কসম! তিনি জাদুকর নন। আমি বহু জাদুকর দেখেছি, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ কোনো অবস্থাতেই তাদের মতো নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আরো জেনে রেখ, আমি অনেক জাদুকরের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা জাদুকরের কথাবার্তার সাথে কোনো বিচারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তোমরা তাঁকে কবি বল, অথচ আমি অনেক কবি দেখেছি, এ বিদ্যা আয়ত্ব করেছি, অনেক বড় বড় কবির কবিতা শুনেছি, অনেক কবিতা আমার মুখস্থও আছে, কিন্তু তাঁর কালামের সাথে কবিদের কবিতার কোনো সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাইনি। কখনো কখনো তোমরা তাঁকে পাগল বল, তিনি পাগলও নন।

আমি অনেক পাগল দেখেছি, তাদের পাগলামিপূর্ণ কথাবার্তাও শুনেছি ; কিন্তু তাঁর মধ্যে তাদের মতো কোনো লক্ষণই পাওয়া যায় না। হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে চিন্তা কর, সহজে এড়িয়ে যাওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব তিনি নন।

হযরত আবূ যর (রা.) বলেছেন, আমার ভাই আনীস একবার মক্কায় গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবি করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার মানুষ এ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে কেউ কবি, কেউ পাগল, কেউ বা জাদুকর বলে। আমার ভাই আনীস একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ লোক ছিলেন ; তিনি আমাকে বললেন, আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি, মানুষের এসব কথা ভুল ও মিথ্যা। তাঁর কালাম কবিতাও নয়, জাদুও নয়, আমার ধারণায় সে কালাম সত্য।

হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, ভাইয়ের কথা শুনে আমি মক্কায় চলে এলাম। মসজিদে হারামে অবস্থান করলাম এবং ত্রিশ দিন শুধু অপেক্ষা করেই অতিক্রম করলাম। এ সময় যমযম কূপের পানি ব্যতীত আমি অন্য কিছুই পানাহার করিনি। কিন্তু এতে আমার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব হয়নি। দুর্বলতাও উপলব্ধি করিনি। শেষ পর্যন্ত কা'বা প্রাঙ্গন থেকে বের হয়ে লোকের নিকট বললাম, আমি রোম ও পারস্যের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোকদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক জাদুকর দেখেছি, কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ-এর বাণীর মতো কোনো বাণী আজও পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। কাজেই সবাই আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর।

ইসলাম ও হযরতের সবচাইতে বড় শত্রু আবূ জাহল, এবং আখনাস ইবনে শোরাইকা ও লোকচক্ষুর অগোচরে কুরআন শুনত, কুরআনের অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি এবং অন্যান্য রচনারীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতো। কিন্তু গোত্রের লোকেরা যখন তাদেরকে বলতো যে, তোমরা যখন এ কালামের গুণ সম্পর্কে এতই অবগত এবং একে অদ্বিতীয় কালামরূপে বিশ্বাস কর, তখন কেন তা গ্রহণ করছ না? প্রত্যুত্তরে আবূ জাহল বলতো, তোমরা জান যে, বনী আবদে মুনাফ এবং আমাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিরামহীন শত্রুতা চলে আসছে, তারা যখন কোনো কাজে অগ্রসর হতে চায়, তখন আমরা তার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বাধা দেই। উভয় গোত্রই সমপর্যায়ের। এমতাবস্থায় তারা যখন বলছে যে, আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁর নিকট আল্লাহর বাণী আসে, তখন আমরা কিভাবে তাদের মোকাবিলা করব, তাই আমার চিন্তা। আমি কখনো তাদের একথা মেনে নিতে পারি না।

মোটকথা কুরআনের এ দাবি ও চ্যালেঞ্জে সারা আরববাসী যে পরাজয় বরণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে তাই নয়; বরং একে অদ্বিতীয় ও অনন্য বলে প্রকাশ্যভাবে স্বীকারও করেছে। যদি কুরআন মানব রচিত কালাম হতো, তবে সমগ্র আরববাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসী অনুরূপ কোনো না কোনো একটি ছোট সূরা রচনা করতে অপরাগ হতো না এবং এ কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকারও করতো না। কুরআন ও কুরআনের বাহক পয়গম্বরের বিরুদ্ধে জান মাল, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত সবকিছু ব্যয় করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কুরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দুটি শব্দও রচনা করতে কেউ সাহসী হয়নি। এর কারণ এই যে, যে সমস্ত মানুষ তাদের মূর্খতাজনিত কার্যকলাপ ও আমল সত্ত্বেও কিছুটা বিবেকসম্পন্ন ছিল মিথ্যার প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণ্যবোধ ছিল। কুরআন শুনে তারা যখন বুঝতে পারল যে, এমন কালাম রচনা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তখন তারা কেবল একগুয়েমীর মাধ্যমে কোনো বাক্য রচনা করে তা জনসমুক্ষে তুলে ধরা নিজেদের জন্য লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করতো। তারা জানত যে, আমরা যদি কোনো বাক্য পেশ করিও, তবে সমগ্র আরবের শুদ্ধভাষী লোকেরা তুলনামূলক পরীক্ষায় আমাদেরকে অকৃতকার্যই ঘোষণা করবে এবং এজন্য অনর্থক লজ্জিত হতে হবে। এজন্য সমগ্র জাতিই চুপ করে ছিল। আর যারা কিছু ন্যায় পথে চিন্তা করেছে, তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি যে, এটা আল্লাহর কালাম।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে, আরবের একজন সরদার আস'আদ ইবনে যেরার হযরতের চাচা আব্বাস (রা.)-এর নিকট স্বীকার করেছেন যে, তোমরা অনর্থক মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের ক্ষতি করছ এবং পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ করছ ; আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি যে কালাম পেশ করেছেন তা আল্লাহর কালাম এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

তৃতীয় কারণ : তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, কুরআন কিছুই গায়বি সংবাদ এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছে, যা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। যথা– কুরআন ঘোষণা করেছে, রোম ও পারস্যের যুদ্ধ প্রথমতঃ পারস্যবাসী জয়লাভ করবে এবং দশ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর মক্কার সরদারগণ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোম জয়লাভ করল, এবং বাজীর

শর্তানুযায়ী যে মাল দেওয়ার কথা ছিল, তা তাদের দিতে হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্য এ মাল গ্রহণ করেননি। কেননা এরূপ বাজী ধরা শরিয়ত অনুমোদন করে না। এমন আরো অনেক ঘটনা কুরআনে উল্লিখিত রয়েছে, যা গায়েবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অতীতে হুবহু ঘটেছেও।

চতুর্থ কারণ : চতুর্থ কারণ হচ্ছে, কুরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, শরিয়ত ও তাদের ইতিহাস এমন পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগের ইহুদি-খ্রিস্টানদের পণ্ডিতগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের বিজ্ঞ লোক মনে করা হতো, তারাও এতটা অবগত ছিল না। রাসূল ﷺ -এর কোনো প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা ছিল না। কোনো শিক্ষিত লোকের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেননি। কোনো কিতাব কোনোদিন স্পর্শও করেননি। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার প্রথম থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর ঐতিহাসিক অবস্থা এবং তাদের শরিয়ত সম্পর্কে অতি নিখুঁতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা আল্লাহর কালাম ব্যতীত কিছুতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই যে তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চম কারণ : পঞ্চম কারণ হচ্ছে, কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব সংবাদ দেওয়া হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সব কথাই সত্য। এ কাজও আল্লাহ তা'আলারই কাজ, তা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ষষ্ঠ কারণ : ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে, কুরআনে এমন সব আয়াত রয়েছে যাতে কোনো সম্প্রদায় বা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা অমুক কাজ হবে না; তারা তা করতে পারবে না। ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বলেই মনে করে, তবে তারা নিশ্চয় তাঁর নিকট যেতে পছন্দ করবে। সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় হতে পারে না এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে। وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا (তারা কখনো তা চাইবে না।)

মৃত্যু কামনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা কুরআনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতো। কুরআনের ইরশাদ মোতাবেক তাদের মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। ইহুদিদের পক্ষে মৃত্যু কামনার [মোবাহালা] এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কুরআনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মত হওয়া তাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদি ও মুশরিকরা মুখে কুরআনকে যতই মিথ্যা বলুক না কেন, তাদের মন জানতো যে, কুরআন সত্য, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মৃত্যু কামনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি এবং একটি বারের জন্যও মুখ দিয়ে মৃত্যুর কথা বলেনি

সপ্তম কারণ : কুরআন শরীফ শ্রবণ করলে মুমিন, কাফের, সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সবার উপর দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন, হযরত জুবাইর ইবনে মুত'ইম (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হুজুর ﷺ -কে মাগরিবের নামাজে সূরা তূর পড়তে শুনেন। হুজুর ﷺ যখন শেষ আয়াতে পৌছলেন, তখন হযরত জুবাইর (রা.) বলেন যে, মনে হলো, যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কুরআন পাঠ শ্রবণের এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সেদিনই কুরআন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। আয়াতটি হচ্ছে–

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَّا يُوقِنُونَ - أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ

অর্থাৎ তারা কি নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে, না তারাই আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছে? কোনো কিছুতেই ওরা ইয়াকীন করছে না। তাদের নিকট কি আমার পালনকর্তার ভাণ্ডারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তারাই রক্ষক?

অষ্টম কারণ : অষ্টম কারণ হচ্ছে, কুরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে বিরক্তি আসে না। বরং যতিই বেশি পাঠ করা যায়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যত ভালো ও আকর্ষণীয় পুস্তকই হোক না কেন, বড় জোড় দু চারবার পাঠ করার পর তা আর পড়তে মন চায় না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কুরআনের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত বেশি পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে। অন্যের পাঠ শুনতেও আগ্রহ জন্মে।

নবম কারণ : নবম কারণ হচ্ছে, কুরআন ঘোষণা করেছে যে, কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এ ওয়াদা এভাবে পূরণ করেছেন যে, প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, যারা কুরআনকে এমনভাবে স্বীয় স্মৃতিপটে ধারণ করেছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর তথা স্বরচিহ্ন পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। নাজিলের সময় থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর অতিবাহিত হয়েছে; এ দীর্ঘসময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতি যুগেই স্ত্রী

পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে কুরআনের হাফেজ ছিলেন ও রয়েছেন। বড় বড় আলেম যদি একটি যের-যবর বেশ-কম করেন, তবে ছোট বাচ্চারাও তাঁর ভুল ধরে ফেলে। পৃথিবীর কোনো ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সে ধর্মের লোকেরা এক দশমাংশও পেশ করতে পারবে না। আর কুরআনের মতো নির্ভুল দৃষ্টান্ত বা নজির স্থাপন করা তো অন্য কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। অন্যে ধর্মীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে এটা স্থির করাও মুশকিল যে, এ কিতাব কোনো ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে কয়টি অধ্যায় ছিল।

গ্রন্থাকারে প্রতি যুগে কুরআনে যত প্রচার ও প্রকাশ হয়েছে, অন্য কোনো ধর্ম গ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা কাফের মুশরিকদের তুলায় কম ছিল এবং প্রচার মাধ্যমও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের তুলনায় কম ছিল। এতদসত্ত্বেও কুরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলনায় অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের এত প্রচার ও প্রকাশনা সম্ভব হয়নি। তারপরেও কুরআনের সংরক্ষণ আল্লাহ তা'আলা শুধু গ্রন্থ ও পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেননি যা জ্বলে গেলে বা অন্য কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বীয় বান্দাগণের স্মৃতিপটেও সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ না করুন সারা বিশ্বে দাঁড়িয়ে থাকা কুরআনের লিখিত সবগুলো কপিও যদি কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবুও এ গ্রন্থ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। কয়েকজন হাফেজ একত্রে বসে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তা লিখে দিতে পারবেন। এ অদ্ভুত সংরক্ষণও আল কুরআনেরই বিশেষত্ব এবং এ যে আল্লাহরই কালাম তার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহর সত্তা সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোনো সৃষ্টির হস্তক্ষেপের কোনো ক্ষমতা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর কালাম সকল সৃষ্টির রদ-বদলের উর্ধ্বে এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বিগত চৌদ্দশত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রকাশ্য মু'জিযার পর কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়াতে কোনো সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে না।

দশম কারণ : কুরআনে ইলম ও জ্ঞানের যে সাগর পুঞ্জীভূত করা হয়েছে, অন্য কোনো কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দসম্ভারের মধ্যে এত জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র সৃষ্টির সর্বপ্রকারের প্রয়োজন এবং মানবজীবনের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। আর বিশ্বপরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ছাড়া মাথার উপরে ও নিচে যত সম্পদ রয়েছে সে সবের প্রসঙ্গ ছাড়ও জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এমনকি রাজনীতি, অর্থনীতিও সমাজনীতির সকল দিকের পথনির্দেশ সম্বলিত এমন সমাহার বিশ্বের অন্য কোনো আসমানি কিতাবে দেখা যায় না।

শুধু আপাতঃদৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সেসব নির্দেশ একটা জাতির বাস্তব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়ে তাদের জীবন ধারা এমনকি ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস এবং রুচিরও এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন দুনিয়ার অন্য কোনো গ্রন্থের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এমন নজির আর একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা নিরক্ষর উম্মী জাতিকে জ্ঞানে, রুচিতে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এত অল্পকালের মধ্যে এমন পরিবর্তিত করে দেওয়ার নজিরও আর দ্বিতীয়টি নেই। সংক্ষেপে এই হচ্ছে কুরআনের সেই বিস্ময় সৃষ্টিকারী প্রভাব, যাতে কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে প্রতিটি মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিদ্বেষের কালিমায় সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে যায়নি, এমন কোনো লোকই কুরআনের এ অনন্য সাধারণ মু'জিযা সম্পর্কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করতে কার্পণ্য করেনি। যারা কুরআনকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এমন অনেক অমুসলিম লোকও কুরআনের এ নজিরবিহীন মু'জিযার কথা স্বীকার করেছেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত মনীষী ডা. মারড্রেসকে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কুরআনের বাষট্টিটি সূরা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর স্বীকারোক্তিও এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন— 'নিশ্চয় কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি সৃষ্টিকর্তার বর্ণনাভঙ্গিরই স্বাক্ষর। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুরআনের যেসব তথ্যাদি বর্ণিত হয়েছে, আলাহর বাণী ব্যতীত অন্য কোনো বাণীতে তা থাকতে পারে না।

এতে সন্দেহ পোষণকারীরাও যখন এর অনন্যসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে, তখন তারাও এ কিতাবের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্বত্র শতাধিক কোটি মুসলমান ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কুরআনের বিশেষ প্রভাব দেখে খ্রিস্টান মিশনগুলোতে কর্মরত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের মধ্যে একটি লোকও ধর্মত্যাগী মুরতাদ হয়নি।

মোটকথা, কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাযোগ্য বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হলেও সংক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বলা হলো, এতেই সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, কুরআন আল্লাহরই কালাম এবং রাসূলে মাকবুল ﷺ -এর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُهْتَدِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (هـ ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- হেদায়েতপ্রাপ্তগণ সঠিক রাস্তায় চলে যারা এটি كَانُوْا ফে'লের خبر হওয়াতে নসবের হালতে হয়েছে।

مَثَلُهُمْ : مَثَلٌ মুযাফ هُمْ যমীর مضاف اليه শব্দটি একবচন, বহুবচন اَمْثَالٌ অর্থ- তাদের মতো।

اسْتَوْقَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِيْقَادُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ د) অর্থ- সে আগুন প্রজ্বলিত করল। সে আগুন জ্বালালো।

اَضَاءَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِضَاءَةُ মূলবর্ণ (ض ـ و ـ ء) অর্থ তার চারপাশে আলোকিত করল। এটি লাযেম ও মুতা'আদ্দী উভয় অর্থে ব্যবহার হয়।

رَعْدٌ : গর্জন। অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে رَعْدٌ এক ফেরেশতাদের নাম। যিনি মেঘকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান। [মাযহারী]।

بَرْقٌ : বিজলী, বিদ্যুৎ চমক। বহুবচন بُرُوْقٌ আসে। অধিকাংশ মুফাসসিরদের মত হলো, আগুনের কড়ার চমক যার দ্বারা রা'দ ফেরেশতা মেঘমালা হাঁকায়। -[মাযহারী]

الصَّوَاعِقِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَاعِقَةٌ অর্থ- গর্জন। বিজলীর শব্দ। বজ্রধ্বনি।

مُحِيْطٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح ـ و ـ ط) জিনস اجوف واوى অর্থ- বেষ্টনকারী।

الْكٰفِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- কাফের।

يَكَادُ : এটি একটি فعل ناقص আর সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব كَادَ ـ يَكَادُ ফা- فعل يفعل -এর ওজন মাসদার اَلْكَوْدُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ- নিকট হয়েছে।

تَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তোমরা [জাহান্নাম] থেকে বেঁচে যাবে।

فَأْتُوْا : فَأْتُوْا -এর মধ্যে فاء টি حرف جزائية ; اِئْتُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ অর্থ- তোমরা নিয়ে আস। باء দ্বারা متعدى হওয়ার কারণে অর্থ হয়েছে নিয়ে আসা।

ادْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) অর্থ- ডাকা, আহবান করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا الخ : এখানে مَثَلُهُمْ হলো مبتدأ আর كَمَثَلِ الخ হলো خبر আর لما হলো حرف شرط আর اَضَاءَتْ ফে'ল, ফায়েল, ও মাফউল মিলে শর্ত।

قوله ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ : ذَهَبَ ফে'ল, اللّٰهُ ফায়েল بِنُوْرِهِمْ হলো متعلق ফে'ল, ফায়েল ও متعلق মিলে جواب شرط হয়েছে।

قوله صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ : এখানে শব্দগুলো مرفوع হয়েছে। প্রত্যেকটি এক هُمْ উহ্য মুবতাদার তিন খবর হয়েছে। যথা- هُمْ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ

قوله فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ : এখানে ف টি عطف -এর জন্য আর هُمْ যমীর مبتدأ আর لَا يَرْجِعُوْنَ জুমলা হয়ে خبر, অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়ে معطوف হয়েছে।

قوله اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর اللّٰه হলো اسم ان আর عَلٰى হলো حرف جار আর كُلِّ شَىْءٍ হলো مجرور অতঃপর জার মাজরূর মিলে قَدِيْرٌ -এর متعلق আর قَدِيْرٌ হলো خبر এখানে اِنَّ তার اسم ;خبر ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله حَذَرَ الْمَوْتِ : এটা يَجْعَلُوْنَ -এর مفعول له হয়েছে।

قوله يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ : এখানে يَكَادُ ফে'ল الْبَرْقُ হলো اسم আর يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ টি جملة হয়ে خبر অতঃপর جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ (٢٤)

অনুবাদ : (২৪) অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা কখনো তা করতে পারবে না, তবে তোমরা আত্মরক্ষা কর দোজখ হতে যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, [তা] প্রস্তুত রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢٥)

(২৫) আর আপনি সুসংবাদ দিন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, নিশ্চয় তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে তার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; যতবারই তাদেরকে উক্ত জান্নাত হতে কোনো ফল খেতে দেওয়া হবে, ততবারই তারা বলবে- এটা তো সেই খাদ্য যা ইতঃপূর্বে আমাদেরকে খেতে দেওয়া হয়েছিল, বস্তুত প্রত্যেকবারই তাদেরকে সাদৃশ্যপূর্ণ ফল দেওয়া হবে; আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-সাফ বিবিগণ। তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْىٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ (٢٦)

(২৬) নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না যেকোনো উপমা বর্ণনা করতে- মশা-ই হোক বা তদপেক্ষা [ক্ষুদ্রতায়] অধিক হোক সুতরাং যারা ঈমান এনেছে, যা-ই হোক না কেন তারা তো এটাই স্থির বিশ্বাস করবে যে, এ উপমা খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে, আর যারা কাফের হয়েছে, সর্বাবস্থায় তারা এ কথাই বলবে, "এ সমস্ত নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহর মতলবই বা কি?" তিনি বিপথগামী করে থাকেন এটা দ্বারা অনেককে এবং এটা দ্বারা হেদায়েত করেন অনেককে এবং এটা দ্বারা তিনি বিপথগামী করেন কেবল ফাসেকদেরকে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৪) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا। অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার। وَلَنْ تَفْعَلُوْا এবং তোমরা কখনো তা করতে পারবে না। فَاتَّقُوْا তবে তোমরা আত্মরক্ষা কর النَّارَ। দোজখ হতে الَّتِىْ وَقُوْدُهَا। যার ইন্ধন হবে النَّاسُ। মানুষ وَالْحِجَارَةُ এবং পাথর اُعِدَّتْ তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে لِلْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের জন্য।

(২৫) وَبَشِّرِ আর আপনি সুসংবাদ দিন। الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ। এবং নেক কাজ করেছে اَنَّ لَهُمْ নিশ্চয় তাদের জন্য جَنّٰتٍ এমন জান্নাত রয়েছে تَجْرِىْ প্রবাহিত হচ্ছে مِنْ تَحْتِهَا তার তলদেশ দিয়ে الْاَنْهٰرُ। নহরসমূহ; كُلَّمَا যতবারই। رُزِقُوْا তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে مِنْهَا উক্ত জান্নাত হতে مِنْ ثَمَرَةٍ কোনো ফল। قَالُوْا ততবারই তারা বলবে- هٰذَا الَّذِىْ। এটা তো সেই খাদ্য رُزِقْنَا যা আমাদেরকে খেতে দেওয়া হয়েছিল مِنْ قَبْلُ ইতঃপূর্বে وَاُتُوْا بِهٖ বস্তুত প্রত্যেকবারই তাদেরকে ফল দেওয়া হবে; مُتَشَابِهًا সাদৃশ্যপূর্ণ وَلَهُمْ فِيْهَآ আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ পাক-সাফ বিবিগণ। وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।

(২৬) اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ لَا يَسْتَحْىٖ লজ্জাবোধ করেন না اَنْ يَّضْرِبَ বর্ণনা করতে مَثَلًا যে কোনো উপমা مَّا بَعُوْضَةً মশা-ই হোক বা فَمَا فَوْقَهَا তদপেক্ষা [ক্ষুদ্রতায়] অধিক হোক। فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا সুতরাং যারা ঈমান এনেছে فَيَعْلَمُوْنَ যা-ই হোক না কেন তারা তো এটাই স্থির বিশ্বাস করবে যে, اَنَّهُ الْحَقُّ এ উপমা খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে مِنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কাফের হয়েছে فَيَقُوْلُوْنَ সর্বাবস্থায় তারা এ কথাই বলবে مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ। আল্লাহর মতলবই বা কি? بِهٰذَا مَثَلًا। এ সমস্ত নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা يُضِلُّ بِهٖ তিনি বিপথগামী করে থাকেন এটা দ্বারা। كَثِيْرًا অনেককে وَيَهْدِىْ بِهٖ এবং এটা দ্বারা হেদায়েত করেন। كَثِيْرًا অনেককে وَمَا يُضِلُّ بِهٖ এবং এটা দ্বারা তিনি বিপথগামী করেন না اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ তবে কেবল ফাসেকদেরকে।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (٢٧)

অনুবাদ : (২৭) যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং ছিন্ন করে ঐ সব সম্বন্ধ যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে ভূপৃষ্ঠে: তারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٢٨)

(২৮) কেমন করে তোমরা আল্লাহর না-শোকরী করছ অথচ তোমরা ছিলে নির্জীব, তৎপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন, শেষে তোমরা তাঁরই সমীপে নীত হবে।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۤ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۗءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۭ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٢٩)

(২৯) তিনি এমন যিনি তোমাদের হিতের জন্য সৃষ্টি করেছেন দুনিয়ার সবকিছু, অতঃপর মনঃসংযোগ করেন আসমানের প্রতি এবং তাকে যথাযথভাবে নির্মাণ করেন সাত আসমানরূপে: তিনি তো সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭) الَّذِيْنَ যারা يَنْقُضُوْنَ ভঙ্গ করে عَهْدَ اللّٰهِ আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ তা দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর وَيَقْطَعُوْنَ এবং ছিন্ন করে ঐ সব সম্বন্ধ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ যা আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন اَنْ يُّوْصَلَ অবিচ্ছিন্ন রাখতে وَيُفْسِدُوْنَ এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ তারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত।

(২৮) كَيْفَ কেমন করে تَكْفُرُوْنَ তোমরা না-শোকরী করছ بِاللّٰهِ আল্লাহর وَكُنْتُمْ অথচ তোমরা ছিলে اَمْوَاتًا নির্জীব فَاَحْيَاكُمْ তৎপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন ثُمَّ اِلَيْهِ শেষে তাঁরই সমীপে تُرْجَعُوْنَ তোমরা নীত হবে।

(২৯) هُوَ الَّذِيْ তিনি এমন যিনি خَلَقَ لَكُمْ তোমাদের হিতের জন্য সৃষ্টি করেছেন مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا দুনিয়ার সবকিছু ثُمَّ اسْتَوٰٓى অতঃপর মনঃসংযোগ করেন اِلَى السَّمَاۗءِ আসমানের প্রতি فَسَوّٰىهُنَّ এবং তাকে যথাযথভাবে নির্মাণ করেন سَبْعَ سَمٰوٰتٍ সাত আসমানরূপে وَهُوَ তিনি তো بِكُلِّ شَيْءٍ সর্ববিষয়ে عَلِيْمٌ জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

٢٦- قوله اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত কাফেরদের একটি সন্দেহজনক প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। কুরআন মাজীদে اَلنَّحْلُ (মধুমক্ষিকা), اَلْعَنْكَبُوْتُ (মাকড়সা), اَلنَّمْلُ (পিপীলিকা) ইত্যাদি সাধারণ নিকৃষ্ট প্রাণীর উল্লেখের কি প্রয়োজন ছিল? কুরআন যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত। আর আল্লাহ যেহেতু মহান, সেহেতু তাঁর উপমাগুলোও উঁচু মানের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমনি সাধারণ দৃষ্টান্তসমূহ আল্লাহর পক্ষে দেওয়া যথোপযুক্ত হয়নি। এই ছিল কাফেরদের প্রশ্ন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ছোট বস্তুর উপমা কুরআনের বৈশিষ্ট্যকে বিনষ্ট করে না; বরং তা কালামের ফাসাহাত বা বাকশৈলীতাকে আরো বৃদ্ধি করে। তবে এ সকল উপমায় কাফেরদের সম্মানের ব্যাঘাত ঘটায় হেতু তারা বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নাবলি উত্থাপন করে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস

(রা.) বলেন, আয়াতে মূর্তিগুলোকে মাকড়সার জালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তা অবতীর্ণ হলে ইহুদিরা বলতে শুরু করল যে, এত ক্ষুদ্র জিনিস উপমার যোগ্য নয়। অপরদিকে اَلنَّاسُ ও اَلظُّلُمٰتُ اَلرَّعْدُ وَالْبَرْقُ এবং সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হলে আরবের মুশরিকরা প্রশ্ন উত্থাপন করতে আরম্ভ করল : হযরত ইবনে মাসউদ ও কাতাদা (রা.) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে। ফলকথা আলোচ্য আয়াতটি ইহুদি, কাফির এবং মুশরিকদের বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নোত্তরে অবতীর্ণ হয়। اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ দ্বারা ইহুদিদের চুক্তিভঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাওরাত ও ইঞ্জিলে তাওহীদ এবং রিসালাতের সত্যতার উপর তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার আদায় করা হয়েছিল, কিন্তু রাসূল ﷺ প্রেরিত হলে তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا অথচ তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ এ ছাড়াও তারা আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিন্ন করত। يَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যত্র আরো বলা হয়েছে যে, فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ কিন্তু এ কাফেররা এসব ওয়াদা-অঙ্গীকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি; বরং উল্টো আল্লাহর জমিনে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করেছে।

আয়াতে বর্ণিত حِجَارَةُ -এর অর্থ : حِجَارَةُ শব্দের অর্থ পাথর। এখানে حِجَارَةُ শব্দের অর্থ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতে حِجَارَةُ দ্বারা গন্ধকের কঠিন কালো বড় বড় দুর্গন্ধময় পাথর বুঝানো হয়েছে, যার আগুন তীব্র হয়ে থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এ পাথরগুলো আসমান-জমিন সৃষ্টির সাথে সাথে প্রথম আকাশে সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সর্বপ্রকার পাথর বুঝানো হয়েছে।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, حِجَارَةُ দ্বারা সেসব মূর্তিকে বুঝায়, যেগুলো কাফেররা পূজা করতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যার উপাসনা কর, সেগুলো দোজখের ইন্ধন, আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর মতে حِجَارَةُ দ্বারা স্বর্ণ-রৌপ্য বুঝায়।

মানুষ ও পাথর উভয় দোজখের জ্বালানী হওয়ার কারণ : আয়াতে اَلنَّاسُ শব্দের অর্থ মানুষ। আর حِجَارَةُ শব্দের অর্থ– পাথর। মানুষ ও পাথরের মাঝে পার্থক্য হলো, মানুষ বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন সচল প্রাণী, আর পাথর নির্জীব তথা জড় পদার্থ। এখন প্রশ্ন হলো মানুষের সাথে পাথরকে দোজখের জ্বালানী হিসেবে নির্দিষ্ট করার কারণ কি? এর জবাবে তাফসীরকারগণ বলেন–

১. যেহেতু মুশরিকরা পাথরকে নিজেদের পাশাপাশি রেখে ইবাদত করতো সেহেতু মানুষের সাথে পাথর উল্লিখিত হয়েছে।
২. মুশরিকরা পাথরের মূর্তি তৈরি করে প্রভু জ্ঞানে তার পূজা করতো। আর পাথর যে তাদেরকে আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না তা প্রমাণের জন্যই আল্লাহ ঐ সব মুশরিকের সাথে পাথরের মূর্তিও জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।
৩. অথবা, পাথর জ্বলন্ত অগ্নিকে আরো প্রজ্বলিত ও দীর্ঘস্থায়ী করবে। তাই মানুষের সাথে পাথরকেও জাহান্নামে পাঠানো হবে।
৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পাথরের অগ্নির তীব্রতা বেশি, তাই কাফেরদের অধিক শাস্তির প্রতি দিক নির্দেশ করে পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
৫. অথবা, মুশরিকরা পাথরের তৈরিকৃত মূর্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করতো, তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণের জন্য মানুষের সাথে পাথরের উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে এতে পাথরের কোনো আজাব বা কষ্টও হবে না এবং পাথরের উপর অন্যায়ও করা হবে না।

حِجَارَةُ -কে নির্দিষ্ট করণের কারণ : পাথর নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তা দ্বারা তৈরি মাবুদকে এদের পূজারীদের সামনে জ্বালানীর মাধ্যমে সেগুলোর অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এদের জ্বালানো হবে। অথবা, পাথরকে জ্বালানীরূপে ব্যবহার করলে আগুন অধিক প্রজ্বলিত হবে বিধায় তা করা হবে। আর এর দ্বারা পাথরের উপর অন্যায় করা হবে না।

بَشِّرْ দ্বারা কাকে সম্বোধন করা হয়েছে : بَشِّرْ হলো امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر এখানে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করেছেন। অথবা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করার মাধ্যমে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

تَبْشِير **অর্থ :** সুসংবাদ, এটা সাধারণত খুশির ব্যাপারে হয়ে থাকে, তবে কোনো কোনো সময় দুঃসংবাদের ক্ষেত্রেও تَبْشِير শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন– فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, খারাপের দিক সাথে সাথে উল্লেখ করতে হবে।

اَلْجَنَّةُ **-এর অর্থ :** اَلْجَنَّةُ একবচন; বহুবচন اَلْجَنَّاتُ ও اَلْجِنَانُ অর্থ– জান্নাত, উদ্যান। আরবদের মতে ঘন ছায়াদার খেজুর ও অন্যান্য বৃক্ষরাজির সমষ্টি যেখানে রয়েছে, তাকে جَنَّة বলে। اَلْجَنَّةُ শব্দের অপর অর্থ হচ্ছে اَلسَّتْرُ ঢাকা বা আবৃত। তাই গাছপালা এবং লতাপাতা দ্বারা আবৃত স্থানকে اَلْجَنَّة বলে।

جنة -এর শ্রেণিবিভাগ : জান্নাত মোট আটটি (১) ফিরদাউস (২) আদ্‌ন (৩) জান্নাতুল মাওয়া (৪) জান্নাতুল খুল্‌দ (৫) দারুস সালাম (৬) দারুল মাকাম (৭) দারুল ক্বারার।

واتوا به متشابها -এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, জান্নাতবাসীগণ সাদৃশ্যপূর্ণ ফল প্রাপ্ত হবে। এর অর্থ এই যে, এদের প্রত্যেকটি বাহ্যত পূর্বটির অনুরূপ হবে এবং জান্নাতবাসীগণ মনে করবেন, এগুলো তো পূর্বেকার ফলের মতোই। বস্তুত জান্নাতীদের অত্যধিক স্বাদ ও তৃপ্তি পরিবর্তনের জন্যই এরূপ করা হবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে এ ফলসমূহের রস-স্বাদ পূর্ববর্তী ফলসমূহ হতে ভিন্ন রকমের হবে, যদিও সেগুলোর আকার-প্রকার একই ধরনের হবে। কাজেই এতে জান্নাতীদের জন্য নিত্য-নতুন উপভোগের আস্বাদ দ্বিগুণভাবে বর্ধিত হবে।

اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ -এর মর্মার্থ : اَزْوَاجٌ শব্দটি বহুবচন, একবচন زَوْجٌ অর্থ– জোড়, স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের জন্যই এ শব্দ ব্যবহার হতে পারে। স্বামীর পক্ষে স্ত্রী যাওজ এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামী যাওজ। জান্নাতে এ স্বামী-স্ত্রী পবিত্র সম্পর্কযুক্ত হবে, তবে উভয়কেই ঈমানদার ও সত্যবাদী হতে হবে। এ শব্দটি হুর-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

مُطَهَّرٌ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা মাসিক স্রাব, পায়খানা, প্রস্রাব, কফ ও থুথু ইত্যাদি হতে পবিত্রা। সাথে সাথে তারা এমন অবস্থা হতেও পবিত্র, যা স্ত্রীদের মধ্যে খারাপ ও দূষণীয় মনে করা হয়।

উপমার ক্ষেত্রে কোনো তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ দূষণীয় নয় :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোনো নিকৃষ্ট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ কোনো ত্রুটি বা অপরাধ নয় কিংবা বক্তার মহান মর্যাদার পরিপন্থিও নয়। কুরআন, হাদীস এবং প্রথম যুগের ওলামায়ে কেরাম ও প্রখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের বাণী ও রচনাবলিতে এ ধরনের বহু উপমার সন্ধান মিলে, যা সাধারণভাবে একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। কুরআন হাদীস এসব তথাকথিত লজ্জা ও সম্ভ্রমের তোয়াক্কা না করে প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ উপমা বর্জন মোটেও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেনি।

يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ [আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে–] এতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা চুক্তি লঙ্ঘন করা জঘন্য অপরাধ। এর পরিণতিতে সে যাবতীয় পুণ্য থেকে বঞ্চিতও হয়ে যেতে পারে।

وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ [এবং আল্লাহ পাক যে সব সম্পর্ক অটুট রাখতে বলেছেন, তারা তা ছিন্ন করে]। এতে বুঝা যায়, যে সব সম্পর্ক শরিয়ত আচ্ছন্ন রাখতে বলেছে, তা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক এবং তা ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, একজন মানুষের প্রতি আল্লাহর এবং অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টিকুলের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করার নির্ধারিত পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সীমা ও বাঁধনের সমষ্টির নামই দীন বা ধর্ম। বিশ্বের শান্তি ও অশান্তি এসব সম্পর্ক যথাযথভাবে বজায় রাখা বা না রাখার উপরই নির্ভরশীল। এজন্য وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ [তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তির সৃষ্টি করে] বাক্যাংশের মাধ্যমে উল্লিখিত সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করাকেই বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার একমাত্র কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এ হলো যাবতীয় অশান্তি ও কলহের মূল কারণ। اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ [তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত।] এ বাক্যের মাধ্যমে যারা উল্লিখিত নির্দেশাবলি অমান্য করবে, তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। সে তুলনায় পার্থিব ক্ষতি উল্লেখযোগ্য কোনো বিষয় নয়।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহসমূহ বর্ণনার পর বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অগণিত দয়া ও সুখ সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতা প্রদর্শনে কিভাবে লিপ্ত থাকতে পারে। এতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব প্রমাণাদি সম্পর্কে নির্দিষ্ট চিন্তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু

স্বীকার কতে তারা যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে অন্ততঃ দাতার দানের স্বীকৃতি এবং তার প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা তো প্রত্যেক সভ্য ও রুচিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক ও অবশ্য কর্তব্য।

প্রথম আয়াতে সেসব বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহাদির বর্ণনা রয়েছে, যা মানুষের মূল সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যা প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে উপস্থিত। যথা– প্রথমাবস্থায় সে ছিল নিষ্প্রাণ অণুকণা, পরে তাতে আল্লাহ পাক প্রাণ সঞ্চার করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে সেসব সাধারণ অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, যা দ্বারা সমগ্র মানবজাতি ও গোটা সৃষ্টি যথাযথভাবে উপকৃত হয় এবং যা মানুষের টিকে থাকার জন্য একান্ত আবশ্যক এসবের মধ্যে প্রথমে ভূমি ও তার উৎপন্ন ফসলের আলোচনা রয়েছে, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অতঃপর যে আসমানসমূহের সাথে ভূমির সজীবতা ও উৎপাদন ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেগুলোর আলোচনা করা হয়েছে।

وَجْهُ نَصْبِ بَعُوْضَةً : بَعُوْضَةً নসববিশিষ্ট হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–
(১) مَا অতিরিক্ত এবং بَعُوْضَةً বদল হয়েছে مَثَلًا হতে। (২) مَا টি نكرة এটি مَثَلًا হতে বদল হয়ে মানসূব হয়েছে। (৩) আর بَعُوْضَةً পূর্ববর্তী مَا -এর সিফাত হওয়ায় মানসূব হয়েছে। (৪) يَضْرِبَ ক্রিয়াটি يَجْعَلَ -এর অর্থ দেয়। এমতাবস্থায় بَعُوْضَةً শব্দটি مفعول ثانى

فَمَا -এর মধ্যকার فَاء ও مَا -এর অর্থ : فَاء টি এখানে اِلٰى অথবা حَتّٰى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর ما এখানে অতিরিক্ত। অথবা, فَاء তারতীব অর্থে, আর مَا আতফ হয়েছে بَعُوْضَةً -এর উপর। তখন ইসম হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অথবা, مَا কে موصولة বা موصوفة উভয় প্রকার বলা যায়।

فَمَا فَوْقَهَا -এর অর্থ : فَمَا فَوْقَهَا -এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা–
ক. পরিমাণের দিক থেকে এর চেয়ে বড়। যেমন– মাছি, মাকড়সা। কেননা সমকালীন কাফেররা উক্ত বস্তুসমূহের উপমাকে অস্বীকার করেছিল।
খ. মশার চেয়ে অধিক ছোট। এ অর্থটি এখানে বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা উপমা উপস্থাপন দ্বারা প্রতিমাগুলোর অপমান উদ্দেশ্য। তাই مشبه به যত ছোট এবং নিকৃষ্ট হবে উদ্দেশ্য তত বেশি ফলপ্রসূ হবে।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ -এর মর্মার্থ : فَتْحُ الْقَدِيْرِ গ্রন্থকারের মতে يُضِلُّ -এর অর্থ হলো يُخْذِلَ অর্থাৎ বিভিন্ন ছোট ছোট উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ফাসিকদেরকেই নিরাশ করেন বা পরিত্যাগ করেন।

কারো মতে ضَلَالٌ -এর অর্থ ঠিক থাকবে। তবে অর্থ হবে এভাবে, যেহেতু আল্লাহ প্রত্যেক কর্মের سبب সেহেতু ضَلَالٌ - এর নিসবত তার প্রতি করা হয়েছে। মূলত তিনি কাউকেও বিপথগামী করেন না; বরং তাদের হঠকারী মনোবৃত্তি ও আল্লাহর নির্দেশের রীতিমতো লঙ্ঘনের দ্বারা সত্য উপলব্ধি ও তার গ্রহণের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে, ফলে তারা নিজেরাই ভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতার মধ্যে পড়ে গেছে।

اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ -এর মর্মার্থ : اَلْفَاسِقِيْنَ শব্দটি فِسْقٌ থেকে নির্গত। শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে اَلْخُرُوْجُ عَنِ الْقَصْدِ মিতাচারিতা থেকে বের হয়ে যাওয়া। যেমন কবি রাউবাহ -এর উক্তি– فَوَسَقَا عَنْ قَصْدِهَا جَوَائِرًا অর্থাৎ 'আলোচিত রমণীরা চরিত্রগত মিতাচারিতা-বহির্ভূত ও সীমালঙ্ঘনকারিণী।

শরিয়তের পরিভাষায় فَاسِقٌ বলা হয়– اَلْخَارِجُ عَنْ اَمْرِ اللّٰهِ بِارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ অর্থাৎ কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত ব্যক্তি। এর তিনটি স্তর রয়েছে। যথা–
(ক) دَرَجَةُ التَّغَابِىْ তথা কবীরা গুনাহকে মন্দ জেনে করতে থাকে, প্রায়ই তা করা।
(খ) دَرَجَةُ الْاِنْهِمَاكِ তথা বেপরোয়াভাবে কবীরা গুনাহ করতে থাকা।
(গ) دَرَجَةُ الْجُحُوْدِ তথা কবীরা গুনাহকে সঠিক জেনে তা করতে থাকা।

প্রথম দু'টি স্তরে ব্যক্তি ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয় না। কিন্তু তৃতীয় স্তরে পৌছলে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় স্তরকেই বুঝানো হয়েছে, তাই এর তাফসীরে বলা হয়েছে– اَلْخَارِجُ عَنِ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ ঈমানের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত ব্যক্তিগণ। যেমন– আল্লাহ তা'আলা মুনাফেকদের ব্যাপারে বলেছেন– اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ
–বায়যাবী

عَهْدَ اللّٰهِ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** عَهْد শব্দের অর্থ হলো–দৃঢ় অঙ্গীকার। আয়াতে عَهْد দ্বারা কোন অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বলেন–

১. এখানে عَهْد দ্বারা আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষকে প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা গৃহীত অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। আর এ জ্ঞানলব্ধ অঙ্গীকার বান্দার উপর আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ববাদ এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের সত্যতার ব্যাপারে প্রমাণ। এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

২. অথবা, রাসূলগণের মাধ্যমে স্ব স্ব উম্মত থেকে গৃহীত সেই অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যে, পরবর্তীতে তাদের নিকট যে কোনো নবী সত্য নিয়ে আগমন করবেন, তাঁকে যেন বিশ্বাস করে এবং তাঁর অনুসরণ করে। তবে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীটি এ দিকেই ইঙ্গিত করে– وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

৩. কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার তিন প্রকার :

(ক) আলমে আরওয়াহে তথা আধ্যাত্মিক জগতে সমস্ত আদম সন্তান কর্তৃক আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের অঙ্গীকার। (খ) আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নবীদের থেকে দীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গৃহীত অঙ্গীকার। (গ) আল্লাহ কর্তৃক ওলামায়ে কেরাম থেকে সত্যকে বর্ণনা করার এবং গোপন না করার ব্যাপারে গৃহীত অঙ্গীকার।

وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** মহান আল্লাহ যোগসূত্র রক্ষার আদেশ করেছেন। তা ছিন্ন করার অর্থ এমন সব সম্পর্ক ছিন্ন করা যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। যেমন– মানবতা ভিত্তিক সম্পর্ক ছিন্ন করা, মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব থেকে অনীহা পোষণ করা, নবীদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা, কিতাবসমূহের বিশ্বাসে পার্থক্য করা, মু'মিনদের দল ত্যাগ করা ইত্যাদি।

অথবা, আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, এমন অন্যায়মূলক আচরণ করা যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করে।

مِيْثَاق **দ্বারা উদ্দেশ্য :** কসম সম্বলিত অঙ্গীকার বা সুদৃঢ় চুক্তি। مِيْثَاقٌ শব্দটি اَلْوَثَاقَةُ থেকে নির্গত। যার অর্থ–দৃঢ়ভাবে বাঁধা বা গিট দেওয়া। এখানে সুদৃঢ় অঙ্গীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোন বস্তুর সাথে মিল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : নিম্নোক্ত বিষয়ে যোগসূত্র রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন– (১) আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা। (২) কথা ও কাজের মিল রাখা। তথাপিও তারা কথা ও কাজের সামঞ্জস্য রক্ষা করেনি; বরং তারা মুখে বলে বেড়াতো, কিন্তু কাজে বাস্তবায়িত করতো না। (৩) কারো মতে تصديق তথা সত্যায়ন করাকে সকল নবীদের সাথে মিলানোর নির্দেশ। কিন্তু তারা কিছু নবীর সত্যায়ন করে আর কিছু নবীকে অস্বীকার করেছে। (৪) কারো মতে এর দ্বারা আল্লাহর দীন এবং জমিনে তাঁর ইবাদত প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

خَاسِرِيْنَ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, خُسْرَانٌ শব্দটি যখন অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হবে কুফর। আর যখন মুসলমানের প্রতি নিসবত করা হয় তখন পাপ বা অন্যায় অর্থ গ্রহণ করা হয়। ইবনে জারীর বলেন, اَلْخَاسِرِيْنَ শব্দটি خَاسِرٌ-এর বহুবচন। আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার মাধ্যমে যারা নিজেদের নফসের অধিকারকে নষ্ট করে ফেলে তাদেরকে اَلْخَاسِرُوْنَ বলা হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে خَاسِرٌ বলা হয়। এমনিভাবে মুনাফিক এবং কাফের আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। –ইবনে কাছীর

عَهْد ও مِيْثَاقٌ **-এর মধ্যকার পার্থক্য :** কোনো বিষয়ে দু'পক্ষের পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে عهد বলে। আর এ কৃত চুক্তি যথাযথ পালনের মাধ্যমে সুদৃঢ় করাকে مِيْثَاقٌ বলে।

قوله وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ : এখানে তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। এখানে اَمْوَاتٌ শব্দটি مَيْتٌ-এর বহুবচন। মৃত ও নিষ্প্রাণ বস্তুকে مَيْتٌ বলা হয়। আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ তার সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির সূচনা ঐ নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে, যা আংশিকভাবে জড়বস্তুর আকৃতিতে, আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে এবং আংশিকভাবে খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ সেসব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্র করেছেন। অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। এ হলো মানব সৃষ্টির সূচনাপর্বের কথা।

قوله ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ [অনন্তর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন।] অর্থাৎ যিনি তোমাদের ইতস্তঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য অণুকণা সমন্বয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তিনিই মরজগতে তোমাদের আয়ুর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবনশিখা নিভিয়ে দিবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কিয়ামতের দিন তোমাদের দেহের নিষ্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

প্রথম মৃত্যু হলো তোমাদের সৃষ্টিধারায় সূচনাপর্বের, নিস্প্রাণ ও জড় অবস্থা যা থেকে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন ; আর দ্বিতীয় মৃত্যু হলো মরজগতে মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। বস্তুতঃ তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে কিয়ামতের দিন।

মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময় : আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার সূচনা হবে কিয়ামতের দিন থেকে। কিন্তু যে কবরদেশের প্রশ্নোত্তর এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা কুরআনে পাকের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত– এখানে তার কোনো উল্লেখ নেই, মানুষ ইহকালে যে জীবন লাভ করে এবং পরকালে যে জীবন লাভ করবে, কবরের জীবন অনুরূপ কোনো জীবন নয়; বরং তা কল্পনাময় স্বাপ্নিক জীবনের মতোই এক মধ্যবর্তী অবস্থা। একে ইহলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তি এবং পারলৌকিক জীবনের প্রারম্ভও বলা যেতে পারে। সুতরাং এটি এমন স্বতন্ত্র জীবন নয়, পৃথকভাবে যার আলোচনা করার প্রয়োজন থাকতে পারে।

قوله هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا: [তিনিই সে মহান আল্লাহ, যিনি তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসামগ্রী সৃষ্টি করেছেন] এখানে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র প্রাণীজগত সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহই লাভ করেছে, বা করতে পারে সংক্ষেপে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঔষধ-পত্র বসবাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের্যর জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এ মাটি থেকেই উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে।

জগতের কোনো বস্তুই অহেতুক নয় : বিশ্বের সব কিছুই যে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, আলোচ্য আয়াতে এ তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না।– তা সে উপকার ইহলৌকিক হোক, বা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত হোক। অনেক জিনিস সরাসিরি মানুষের আহার ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার আবেদন ও উপকারিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে। অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, বিষধর জীবজন্তু প্রভৃতি যেসব বস্তু দৃশ্যতঃ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, সেগুলোও কোনো না কোনো দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে। যেসব জন্তু একদিকে মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তা দ্বারা তারা উপকৃত হয়ে চলেছে।

প্রখ্যাত সাধক, আরিফ বিল্লাহ ইবনে আ'তা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক সারা বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যেন জগতের যাবতীয় বস্তু তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে, আর তোমরা যেন সর্বতোভাবে আল্লাহর আরাধনায় নিয়োজিত থাক। তবেই যেসব বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা তা নিঃসন্দেহে লাভ করবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে সেসব বস্তুর অন্বেষণে ও সাধন চিন্তায় নিয়োজিত থেকে সে মহান সত্তাকে ভুলে না বসা, যিনি এগুলোর একক স্রষ্টা।

سَبْعَ سَمٰوٰتٍ **তথা সপ্ত আকাশের নাম :** সপ্ত আকাশের সাতটি স্তরের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১। رَقِيْع (রাকী') এটা সবুজ যমরুদ পাথর দ্বারা নির্মিত।
২। اَرْفَلُوْن (আরফালুন) এটা সাদা রৌপ্য দ্বারা নির্মিত।
৩। قَيْدُوْم (কায়দূম) এটা লাল ইয়াকুত পাথরের তৈরি।
৪। مَاعُوْن (মাউন) এটা সাদা রৌপ্যের তৈরি।
৫। رَبْقَاء (রাবকা) এটা লাল স্বর্ণের তৈরি।
৬। وَقْنَاء (ওয়াকানা) এটা হলুদ ইয়াকুত পাথরের তৈরি।
৭। عَرُوْبَاء (আরুবা) এটা উজ্জ্বল নূরের তৈরি।

خَلَقَ ও جَعَلَ -এর পার্থক্য : خَلَقَ শব্দের অর্থ : আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পৃথিবীর যে কোনো জিনিসের সৃষ্টি। সুতরাং خَلَقَ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সাথে خَاص, আর جَعَلَ শব্দের অর্থ করা, সৃষ্টি করা। এ শব্দটি عَام কেননা خَلَقَ সৃষ্টিগত অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তবে جَعَلَ অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

اِسْتَوٰى -এর অর্থ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ অর্থাৎ অতঃপর তিনি মনোযোগ দেন আকাশের প্রতি। اِسْتَوٰى -এর আভিধানিক অর্থ হলো– اَلْاِعْتِدَالُ বা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা, اَلْاِسْتِقَامَةُ বা দৃঢ় থাকা, সোজা হয়ে দাঁড়ানো। তাছাড়া এ শব্দটি اِرْتِفَاعٌ তথা উঁচু বা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, اَلْعُلُوُّ বা কোনো বস্তুর উপর আরোহণ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কারো মতে, এ শব্দটি مُتَشَابِهَاتٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কেরামের মতে, এ ধরনের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যাতে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়; বরং শুধু ঈমান রাখবে যে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।–[ফাতহুল কাদীর]

ইমাম মালেক (র.) বলেন, اِسْتِوَاء অর্থ তো জানা আছে, কিন্তু كَيْفِيَّتْ (ধরন বা প্রকার) জানা নেই। এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করা বিদ'আত। ঈমান আনা ওয়াজিব।

তবে কেউ বলেছেন, স্থানভেদে অর্থ পরিগ্রহণ করা হবে। অতএব কোথাও ইচ্ছা করা, কোথাও স্থান গ্রহণ করা কোথাও কায়েম হওয়া, কোথাও নিজ নিয়ন্ত্রণে নেওয়া, কেথাও কিছুর উপর আরোহণ করা ইত্যাদি অর্থ নিতে হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ অর্থ- তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

مُتَشَابِهًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّشَابُهُ মূলবর্ণ (ش . ب . ه) জিনস صحيح অর্থ- অবিকল। যা সাদৃশ্য রাখে।

اَزْوَاجٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন زَوْجٌ; অর্থ স্ত্রীগণ زَوْج শব্দ স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়।

مُطَهَّرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّطْهِيْرُ মূলবর্ণ (ط . ه . ر) জিনস صحيح অর্থ- প্রত্যেক প্রকারের নারীসূলভ, দৈহিক এবং আত্মিক অপবিত্রতা হতে যাকে পবিত্র করা হয়েছে যাকে।

خٰلِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُلُوْدُ মূলবর্ণ (خ . ل . د) জিনস صحيح অর্থ- চিরস্থায়ীগণ, যারা সর্বদা বর্তমান।

كَفَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك . ف . ر) জিনস صحيح অর্থ- তারা কুফরি করেছে।

يَقُوْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق . و . ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা বলে, তারা বলবে, তারা বলত ইত্যাদি।

اَرَادَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ر . و . د) মাসদার اَلْاِرَادَةُ জিনস اجوف واوى অর্থ- সে চেয়েছে, ইচ্ছা করেছে।

يَهْدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضار معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- হেদায়েত করেন।

الْفٰسِقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر سالم বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفِسْقُ মূলবর্ণ (ف . س . ق) জিনস صحيح অর্থ- নাফরমান লোকগণ, অবাধ্যতাকারী লোকজন।

يُوْصَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (و . ص . ل) মাসদার اَلْاِيْصَالُ জিনস مثال واوى অর্থ- অক্ষুণ্ন রাখা হয়, যে সম্পর্ক জোড়া লাগানো হয়।

يُفْسِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ف . س . د) মাসদার اَلْاِفْسَادُ জিনস صحيح অর্থ- তারা সন্ত্রাস ছড়ায়, ধ্বংস ক্রিয়া চালায়।

يُمِيْتُكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (م . و . ت) মাসদার اَلْاِمَاتَةُ জিনস اجوف واوى অর্থ- আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন।

يُحْيِيْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ح . ي . ي) মাসদার اَلْاِحْيَاءُ জিনস لفيف مقرون অর্থ- তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেন।

تُرْجَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ ع) মাসদার اَلرُّجُوْعُ জিনস صحيح অর্থ– তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

اسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– মনঃসংযোগ করেন।

سَوّٰهُنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّسْوِيَةُ মূলবর্ণ– (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তিনি তাকে সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন। যথাযথ সৃষ্টি করেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এখানে وَبَشِّرِ ফে'ল ফা'য়েল الَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল اٰمَنُوْا ও عَمِلُوْا সিলাহ। صله ও موصول মিলে مفعول হলো بَشِّرِ-এর। ফে'ল, ফা'য়েল ও مفعول মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ : এখানে وَلَهُمْ হলো خبر مقدم আর اَزْوَاجٌ হলো موصوف আর مُطَهَّرَةٌ হলো صفة এবার موصوف ও صفة মিলে مبتدأ مؤخر হয়েছে। আর فِيْهَا উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, حال হয়েছে। এবার مبتدأ مؤخر ও خبر مقدم মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ : এখানে هُمْ যমীর আর مبتدأ আর فِيْهَا হলো متعلق আর خَالِدُوْنَ হলো خبر অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً الخ : এখনে اِنَّ পদটি حرف مشبه بالفعل আর اللّٰه পদটি ان اسم আর لَا يَسْتَحْيٖ তার পরবর্তী অংশসহ اَنْ يَّضْرِبَ আর خبر اِنَّ বাক্য হয়ে يَسْتَحْيٖ এর مفعول به যদি তা সরাসরি متعدى হয়, আর যদি তা منصوب بنزع الخافض হয়, তাহলে مَثَلًا পদটি اَنْ يَّضْرِبَ-এর مفعول বিধায় মানসূব হয়েছে। مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً الخ আয়াতে প্রথম ما টি نكره এর পরবর্তী শব্দ দ্বারা তার صفة আনা হয়। তাবে পরবর্তী صفة কখনো جملة হয়ে থাকে। فَمَا فَوْقَهَا-কে بَعُوْضَةً-এর উপর عطف করা হয়েছে। এই مَا টি مَا موصوفة-ও হতে পারে আবার ما موصولة ও হতে পারে। এটা محلا منصوب হয়েছে।

قوله اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ : এখানে اِلَيْهِ জার মাজরূর মিলে تُرْجَعُوْنَ-এর সাথে متعلق مقدم অতঃপর تُرْجَعُوْنَ ফে'ল, ফা'য়েল ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ : এখানে فَا হলো حرف عطف আর سَوّٰى ফে'ল-ফা'য়েল, هُنَّ হলো مفسر, سَبْعَ سَمٰوٰتٍ হলো তাফসীর। তাফসীর ও মুফাস্‌সার মিলে মাফঊল। ফে'ল ফা'য়েল ও মাফঊল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে। আর এ তারকীবটি এভাবেও করা যায়– سَوّٰى যদি خَلَقَ অর্থে হয়, তাহলে سَبْعَ سَمَاوَاتٍ হবে حال আর যদি صر অর্থে হয়, তাহলে হবে مفعول ثانى [اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ]

قوله وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ : এখানে واو হরফে আত্ফ, هو হলো مبتدأ আর بِكُلِّ شَيْءٍ মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম হলো عَلِيْمٌ শিবহে ফে'লের সাথে। عَلِيْمٌ শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে خبر অতঃপর মুবতাদা আর খবর মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

অনুবাদ : (৩০) আর যখন বললেন আপনার প্রভু ফেরেশতগণকে, নিশ্চয় আমি বানাব ভূপৃষ্ঠে একজন প্রতিনিধি; তারা বলল, আপনি কি সৃষ্টি করবেন জমিনে এমন লোক যারা তাতে ফ্যাসাদ করবে ও রক্তারক্তি করবে? পরন্তু আমরা সর্বদা তাসবীহ পাঠ করছি আপনার প্রশংসার সাথে এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করে আসছি; আল্লাহ বললেন, আমি তা জানি যা তোমরা জান না।

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٣٠)

(৩১) আর আল্লাহ জ্ঞান দিলেন আদমকে সকল বস্তুর নামের। অনন্তর পেশ করলেন তা ফেরেশতাদের সামনে এবং বললেন, তোমরা আমার নিকট এ সমস্ত বস্তুর নাম বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٣١)

(৩২) ফেরেশতারা বলল, আপনি অতি পবিত্র, আমাদের জ্ঞান নেই, কেবল ততটুকুই আছে যা আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন, নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী– বড় হিকমতময়।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (٣٢)

(৩৩) আল্লাহ বললেন, হে আদম! বলে দাও তাদেরকে ঐ সমস্ত জিনিসের নাম, অনন্তর যখন আদম তাদেরকে সমস্ত জিনিসের নাম বলে দিলেন তখন আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি অবগত আছি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় আসমান ও জমিনের এবং জ্ঞাত আছি যা তোমরা ব্যক্ত কর আর যা অন্তরে গোপন রাখ তাও।

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (٣٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩০) وَاِذْ قَالَ আর যখন বললেন رَبُّكَ আপনার প্রভু لِلْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতগণকে اِنِّىْ جَاعِلٌ নিশ্চয় আমি বানাব فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে خَلِيْفَةً একজন প্রতিনিধি قَالُوْٓا তারা বলল اَتَجْعَلُ আপনি কি সৃষ্টি করবেন فِيْهَا জমিনে مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا এমন লোক যারা তাতে ফ্যাসাদ করবে وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ও রক্তারক্তি করবে? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ পরন্তু আমরা সর্বদা তাসবীহ পাঠ করছি بِحَمْدِكَ আপনার প্রশংসার সাথে وَنُقَدِّسُ لَكَ এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করে আসছি قَالَ আল্লাহ বললেন اِنِّىْٓ اَعْلَمُ আমি জানি مَا لَا تَعْلَمُوْنَ যা তোমরা জান না।

(৩১) وَعَلَّمَ আর আল্লাহ জ্ঞান দিলেন اٰدَمَ আদমকে الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا সকল বস্তুর নামের ثُمَّ عَرَضَهُمْ অনন্তর পেশ করলেন তা عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাদের সামনে فَقَالَ এবং বললেন اَنْۢبِـُٔوْنِىْ তোমরা আমার নিকট বল بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ এ সমস্ত বস্তুর নাম اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(৩২) قَالُوْا ফেরেশতারা বলল سُبْحٰنَكَ আপনি অতি পবিত্র لَا عِلْمَ لَنَآ আমাদের জ্ঞান নেই اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا কেবল ততটুকুই আছে যা আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী– الْحَكِيْمُ বড় হিকমতময়।

(৩৩) قَالَ আল্লাহ বললেন يٰٓاٰدَمُ হে আদম! اَنْۢبِئْهُمْ বলে দাও তাদেরকে بِاَسْمَآئِهِمْ ঐ সমস্ত জিনিসের নাম فَلَمَّآ অনন্তর যখন اَنْۢبَاَهُمْ আদম তাদেরকে বলে দিলেন بِاَسْمَآئِهِمْ সমস্ত জিনিসের নাম قَالَ তখন আল্লাহ বললেন اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে اِنِّىْٓ اَعْلَمُ নিশ্চয় আমি অবগত আছি غَيْبَ সমস্ত অদৃশ্য বিষয় السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের وَاَعْلَمُ এবং জ্ঞাত আছি مَا تُبْدُوْنَ যা তোমরা ব্যক্ত কর وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ আর যা অন্তরে গোপন রাখ তাও।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ٭ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (٣٤)

অনুবাদ : (৩৪) আর আমি যখন হুকুম দিলাম ফেরেশতাদেরকে সেজদায় পতিত হও আদমের সামনে, তখন সকলেই সেজদায় পতিত হলো ইবলীস ব্যতীত: সে অমান্য করল, অহংকৃত হলো এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (٣٥)

(৩৫) আর হুকুম দিলাম, হে আদম! বাস কর তুমি এবং তোমার স্ত্রী বেহেশতে এবং খাও উভয়ে তা হতে স্বচ্ছন্দে ও যথেচ্ছা, আর যেও না এ বৃক্ষের কাছে, অন্যথা তোমরাও পরিগণিত হবে জালেমদের মধ্যে।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ (٣٦)

(৩৬) অনন্তর পদস্খলিত করল শয়তান আদম ও হাওয়াকে ঐ বৃক্ষের কারণে, অতঃপর বহিষ্কৃত করে ছাড়ল তাদরেকে সে সুখ-শান্তি হতে যাতে তারা ছিলেন, অনন্তর আমি বললাম, নিচে নেমে যাও, তোমাদের কতিপয় কতিপয়ের শত্রু থাকবে, আর ভূপৃষ্ঠে তোমাদের কিছুকাল অবস্থান করতে হবে এবং ফায়েদা উঠাতে হবে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (٣٧)

(৩৭) অতঃপর আদম (আ.) লাভ করলেন স্বীয় প্রভু হতে [ক্ষমা প্রার্থনাসূচক] কতিপয় বাক্য তখন আল্লাহ কৃপা-দৃষ্টি করলেন তার প্রতি; নিশ্চয় তিনি বড় তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৪) وَاِذْ قُلْنَا আর আমি যখন হুকুম দিলাম لِلْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাদেরকে اسْجُدُوْا সেজদায় পতিত হও لِاٰدَمَ আদমের সামনে, فَسَجَدُوْٓا তখন সকলেই সেজদায় পতিত হলো اِلَّآ اِبْلِيْسَ ইবলীস ব্যতীত اَبٰى সে অমান্য করল وَاسْتَكْبَرَ অহংকৃত হলো وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

(৩৫) وَقُلْنَا আর হুকুম দিলাম يٰٓاٰدَمُ হে আদম! اسْكُنْ বাস কর اَنْتَ তুমি وَزَوْجُكَ এবং তোমার স্ত্রী الْجَنَّةَ জান্নাতে وَكُلَا এবং খাও উভয়ে مِنْهَا তা হতে رَغَدًا স্বচ্ছন্দে حَيْثُ شِئْتُمَا ও যথেচ্ছা, وَلَا تَقْرَبَا আর কাছে যেও না هٰذِهِ الشَّجَرَةَ এ বৃক্ষের فَتَكُوْنَا অন্যথা তোমরাও পরিগণিত হবে مِنَ الظّٰلِمِيْنَ জালেমদের মধ্যে।

(৩৬) فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ অনন্তর পদস্খলিত করল শয়তান আদম ও হাওয়াকে عَنْهَا ঐ বৃক্ষের কারণে فَاَخْرَجَهُمَا অতঃপর বহিষ্কৃত করে ছাড়ল তাদরেকে مِمَّا كَانَا فِيْهِ সে সুখ-শান্তি হতে যাতে তারা ছিলেন وَقُلْنَا অনন্তর আমি বললাম اهْبِطُوْا নিচে নেমে যাও بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ তোমাদের কতিপয় কতিপয়ের থাকবে, عَدُوٌّ শত্রু وَلَكُمْ আর তোমাদের করতে হবে فِى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে مُسْتَقَرٌّ কিছুকাল অবস্থান وَمَتَاعٌ এবং ফায়েদা উঠাতে হবে اِلٰى حِيْنٍ এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।

(৩৭) فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ অতঃপর আদম (আ.) লাভ করলেন مِنْ رَّبِّهٖ স্বীয় প্রভু হতে [ক্ষমা প্রার্থনাসূচক] كَلِمٰتٍ কতিপয় বাক্য فَتَابَ তখন আল্লাহ কৃপা-দৃষ্টি করলেন عَلَيْهِ তার প্রতি اِنَّهٗ নিশ্চয় তিনি هُوَ التَّوَّابُ বড় তওবা কবুলকারী الرَّحِيْمُ পরম দয়ালু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ الخ ٣٤- **আয়াতের শানে নুযূল :** মহান রাব্বুল আ'লামীন তাঁর আহ্‌কাম কার্যকর করানোর জন্য তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে তাঁর মর্যাদা সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে ফেরেশ্‌তাদেরকে সেজদা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ফেরেশতাগণ সবাই সেজদা করলেও ইবলীস অহংকার করে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করেনি, সেজন্য আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে অভিশপ্ত অবস্থায় বেহেশত থেকে বের করে দিলেন। তখন থেকেই ইবলীস হযরত আদম (আ.)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করার প্রতিজ্ঞা করল যে, সে হযরত আদম (আ.)-কে বেহেশতে থাকতে দেবে না। এমনকি সে আল্লাহ তা'আলার নিকট দরখাস্ত করে কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার সুযোগ গ্রহণ করল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং ইবলীস হযরত আদম (আ.)-কে বিভ্রান্ত করার জন্য কি পদ্ধতি নিল এবং ফল কি দাঁড়ালো ইত্যাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গ ও ইবলিসের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিন সৃষ্টির পর পৃথিবীতে জিন জাতিকে বসবাস করতে দেন। ফেরেশতাকুলের আবাস নির্ধারিত হয় আসমানে। জিন জাতি হাজার হাজার বছর যাবৎ পৃথিবীতে বসবাস করে। ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া, ফ্যাসাদ, কলহ আরম্ভ হয়। পরিণতিতে শুরু হয় রক্তপাত।

আল্লাহ তা'আলা ফেতনা সৃষ্টিকারীদের কবল থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার নিমিত্তে ইবলিসের নেতৃত্বে একদল ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন। ইবলিস ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে জিন জাতিকে মেরে; পিটিয়ে সাগরে ও পাহাড়ে তাড়িয়ে দেয়। অতঃপর ফেরেশতারা বসবাস করতে শুরু করে।

যখন আদম সৃষ্টির কথা তারা অবগত হয়, তখন জিন জাতির অবস্থা অনুমান করে বলতে থাকে আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা পৃথিবীতে রক্তপাত ঘটাবে? আমরা তো আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন "আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার চারটি মৌলিক বস্তুর সমন্বয়ে (আগুন, পানি, মাটি, বাতাস) স্বীয় প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতম আকৃতিতে আদম দেহ নির্মাণ করে তাতে আত্মার সঞ্চারিত করেন। এতে হযরত আদম (আ.) জীবিত হয়ে উঠলেন। অতঃপর হযরত আদম (আ.)-কে জাগতিক সকল জিনিসের নাম শিক্ষা প্রদান করতঃ উক্ত জিনিসগুলো ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং সেগুলোর নাম বলতে নির্দেশ দিলেন। ফেরেশতাগণ লজ্জিত হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ পূর্বক বললেন, হে প্রভু আপনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তদ্ব্যতীত আমাদের আর কোনো জ্ঞান নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে ঐ বস্তুগুলোর নাম বলতে আদেশ করলেন। হযরত আদম (আ.) সবগুলোর নাম বলে দিলেন।

তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তাকে সম্মানসূচক সেজদা করার নির্দেশ প্রদান করেন। একমাত্র ইবলিস ব্যতীত বাকি সবাই আল্লাহর আদেশ পালন করলেন।

আগুনের তৈরি ইবলিস মাটির তৈরি আদমকে সেজদা করতে অহংকারের সাথে অস্বীকার করল এবং তা অমান্য করার কারণে অভিশপ্ত ও বিতারিত শয়তানে রূপান্তরিত হলো।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর সুখ শান্তি বর্ধনের জন্য তদীয় বাম পাঁজর থেকে বিবি হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করে উভয়ের বিবাহ দেন। বেহেশতে শর্তসাপেক্ষে তাদের থাকার নির্দেশ জারি করেন। শর্ত হলো ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হওয়া যাবে না।

হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর সুখ শান্তি দর্শনে ইবলিস তাদের পেছনে লেগে নানারকম প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করার ফন্দি আঁটে এবং আদম ও হাওয়া (আ.)-কে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে প্ররোচনা দেয়। শয়তানের দীর্ঘ দিনের চেষ্টার ফলে প্রথমে বিবি হাওয়া (আ.) প্ররোচিত হয়ে হযরত আদম (আ.)-কেও সে প্ররোচনায় জড়িয়ে ফেলেন। হযরত আদম (আ.) প্রথমে অস্বীকৃতি জানালেও পরে আল্লাহর কসম মিথ্যা হতে পারে না ভেবে ঐ ফল ভক্ষণ করেন। এ ভ্রমের ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতী আবরণ থেকে মুক্ত করেন এবং শর্ত মোতাবেক দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। পৃথিবীতে তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় অবস্থিতি এবং ভোগ সম্পদ নির্ধারিত করলেন। হযরত আদম (আ.) যারপর নাই অনুশোচনা ও অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে সদা অশ্রু বিসর্জনপূর্বক তার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকেন। দয়াময় আল্লাহ তার অপার করুণায় আদম ও হাওয়া (আ.)-এর অপরাধ মার্জনা করে দেন; কিন্তু সে বেহেশতে আর স্থান দেওয়া হয় নি।

مَلَائِكَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : مَلَائِكَةٌ শব্দটি বহুবচন, একবচন مَلَكٌ শব্দটির অর্থ– বাণীবাহক। শাব্দিক অর্থ হলো ফেরেশতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদি সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত চিরানুগত এক সম্প্রদায়। তারা নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি। তাদের দেহাকৃতি উজ্জ্বল। বায়বীয় আহার, নিদ্রা অথবা শয়তানের প্ররোচনাজনিত কোনো ক্রোধ, লোভ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত, সর্বদা মহান আল্লাহর প্রশংসা, কীর্তন ও বিশ্বজগত পরিচালনের তাঁর আদেশ নির্দেশের অনুসরণই তাদের কাজ।

خَلِيْفَةً দ্বারা উদ্দেশ্য : খলীফা অর্থ নায়েব বা প্রতিনিধি। এখানে খলীফা দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তিনি আল্লাহর হুকুম-আহকাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর প্রতিনিধি।

অথবা, خَلِيْفَةً অর্থ– পরিবর্তন, যেহেতু হযরত আদম (আ.) জিন জাতির পরিবর্তে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

অথবা, আদম সন্তানরা একে অন্যের স্থলবর্তী হবে, এজন্য তাদেরকে খলীফা বলা হয়েছে। মূলকথা হলো যেহেতু আদম (আ.) শরিয়তের হুকুম আহকাম প্রতিষ্ঠা ও শান্তি নির্ধারণে আল্লাহর প্রতিনিধি, সেহেতু তাকে خَلِيْفَةً বলা হয়েছে।

خَلِيْفَةً শব্দের তাৎপর্য : خَلِيْفَةً তাকে বলা হয়, যে অন্য কারো মালিকানায় তারই প্রদত্ত ক্ষমতা এখতিয়ার ব্যবহার করে। খলীফা কখনো মালিক হতে পারে না। প্রকৃত মালিকের ইচ্ছা ও বাসনা পূরণই তার কর্তব্য হয়। এমতাবস্থায় সে নিজে যদি মালিক হওয়ার দাবি করে বসে এবং মালিক প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহের অপব্যবহার করতে শুরু করে, কিংবা প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক মনে করে, আর তারই ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ ও আদর্শ বাস্তবায়নে তৎপর হয়, তবে তা হবে বিদ্রোহ এবং বিশ্বাস ঘাতকতামূলক পদক্ষেপ।

اٰدَمَ শব্দের অর্থ : শব্দটি اُدْمَةُ الْاَرْضِ অথবা اُدْمِىٌ থেকে مُشْتَقٌ এর অর্থ ভূপৃষ্ঠ বা গন্দম বর্ণ। হযরত আদম (আ.) গন্দমবর্ণ মৃত্তিকা হতে সৃষ্ট এবং গন্দম বর্ণবিশিষ্ট ছিলেন বলেই তিনি اٰدَمَ নামে অভিহিত হয়েছেন।

اَلْاَرْضِ দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতে ব্যবহৃত اَلْاَرْضِ শব্দ দ্বারা পূর্ব থেকে পশ্চিম গোটা জমিনকেই বুঝানো হয়েছে। জমিনের কোনো অংশ বাদ নেই।

কারো মতে, শুধুমাত্র মক্কার ভূমিকেই বুঝানো হয়েছে।

قوله قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَ আয়াতাংশের তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অন্যত্র ফেরেশতাদের প্রশংসায় বলেছেন, لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ অথচ এখানে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে খলীফা বানানোর প্রস্তাবের সাথে সাথে মন্তব্য করল– اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا

এ জটিল সন্দেহের উত্তরে বলা হয় যে, যখন তারা খলীফা خَلِيْفَةً শব্দ শুনতে পেয়েছে, তখনই তারা বুঝতে পেরেছে যে, খলীফার কাজ হলো তাদের মধ্যে একটি দল ফ্যাসাদে লিপ্ত হলে সে তার মীমাংসা করবে। কিন্তু বর্ণনার সময় তারা সাধারণভাবে সকলের প্রতি ফ্যাসাদ-এর নিসবত করে দিয়েছে। পরে আল্লাহ বর্ণনা দিলেন যে, তোমাদের এ ধারণা ভুল; বরং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক হবে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী আর কিছু সংখ্যক হবে অনুগত।

কারো মতে, ফেরেশতাগণ জিন জাতি কর্তৃক সৃষ্ট ফ্যাসাদ-বিপর্যয় ইত্যাদি উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা দেখেছিল। তাই তারা মানুষের ব্যাপারে এই মন্তব্য করেছেন।

ইবনে যায়েদ বলেন– আল্লাহ তাদেরকে জানিয়েছেন যে, একজন খলীফা নিযুক্ত করব, যার বংশধরদের মধ্যে একদল ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হবে, তখন তারা এই বক্তব্য পেশ করেছিল।

ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর পরামর্শের তাৎপর্য : আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি কারো পরামর্শের মুখাপেক্ষী নন তবুও তিনি এ পৃথিবীতে তাঁর খলীফা প্রেরণের প্রাক্কালে ফেরেশতাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিলেন কেন? এর তাৎপর্য বর্ণনায় মুফাসসিরগণ বলেন–

- এখানে পরামর্শ নেওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং বিষয়টি তাদেরকে অবহিতকরণই মূল উদ্দেশ্য।
- অথবা, এর দ্বারা বান্দাকে সকল সৎকর্মে পরামর্শ গ্রহণের নীতি শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য।
- অথবা, এখানে পরামর্শ নেওয়া মানে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
- অথবা, এর দ্বারা সৃষ্ট খলীফার মর্যাদা বুঝানো উদ্দেশ্য।
- অথবা, ইবাদতের উপর عِلْم -এর প্রাধান্য দেওয়া উদ্দেশ্য।

الْأَسْمَاءَ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْأَسْمَاءَ -এর অর্থের ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন– ১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও কাতাদা (রা.) প্রমুখের মতে, দুনিয়ার ছোট বড় সকল বস্তুর নাম আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষা দিয়েছেন।

২। আল্লামা তাহাবী (র.) বলেন– اَلْأَسْمَاءَ দ্বারা ফেরেশতাদের নাম উদ্দেশ্য।

৩। হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেন– اَلْأَسْمَاءَ বলতে সকল বংশধরদের নাম উদ্দেশ্য।

৪। রাবী ইবনে খাইসাম (র.) বলেন, এখানে বিশেষ করে ফেরেশতাদেব নাম উদ্দেশ্য।

ফেরেশতাদের ছাড়া হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষাদানের কারণ : আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গির আলোকে বুঝা যায়, বস্তুসমূহের প্রকৃতি ও নাম শিক্ষা দেওয়ায় হযরত আদম (আ.) বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করা হতো তবে তারাও বিশেষভাবে জ্ঞানী এবং প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা লাভ করত।

এ প্রশ্নের আলোকে বলা যায় যে, মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে কিছু বিশেষ জ্ঞানের যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু ফেরেশতাদের সে যোগ্যতা প্রদান করা হয়নি। মনুষ্য প্রকৃতি বুঝতে হলে মানবসুলভ প্রকৃতির অধিকারী হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। আর তা হয়েছেও বটে। ফেরেশতাকুলের মধ্যে সে মানবিক গুণাবলি অনুপস্থিত। অতএব যে প্রকৃতির জন্য যেরূপ জ্ঞান উপযোগী হয় আল্লাহ তাকে সেরূপ জ্ঞানই দান করে থাকেন।

أَنْبِئُونِي দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাকুলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, أَنْبِئُونِي তোমরা আমাকে বলে দাও বা খবর দাও, অথচ এ ব্যাপারে ফেরেশতাদের কোনো عِلْم ছিল না। মূলতঃ এটা তাদের শক্তির বাইরে تَكْلِيف বা কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তারা যে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও পরিকল্পনার সামনে সম্পূর্ণ অক্ষম তা বুঝানো উদ্দেশ্য। এটা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেলাফতের সকল কাজ পরিচালনা করতে হলে সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এ যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের দেননি। একথা প্রমাণ করাই এখানে উদ্দেশ্য।

ফেরেশতারা কি করে জানল যে, খলীফা জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে : আলোচ্য আয়াতে মানুষ জমিনে ফেতনা ফ্যাসাদে লিপ্ত হবে বলে ফেরেশতাদের মন্তব্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এর কারণ, তারা ইতিপূর্বে জিন জাতির শাসনামল দেখেছে। তারা অবলোকন করেছে যে, ওরা করেনি এমন কোনো কাজ নেই। অতএব হয়তোবা মানুষও এমন করতে পারে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে, মূলতঃ এখানে কিছু ইবারত উহ্য আছে। যেমন– إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً يَفْعَلُ كَذَا، كَذَا এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা বলেছিল– أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

ফেরেশতাদের তাসবীহ ও তাহমীদ : হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, তাসবীহ দ্বারা নামাজ উদ্দেশ্য। কারো মতে, تَسْبِيْح অর্থ-উচ্চৈঃস্বরে জিকির করা। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, তাদের تَسْبِيْح হলো سُبْحَانَ اللّٰهِ হযরত আব্দুর রহমান বিন কুরত বলেন, নবী করীম ﷺ মে'রাজের সময় উর্ধ্ব আকাশে তাসবীহ শুনেছিলেন, তা ছিল, سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلٰى سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى আর তাহমীদ হলো উপযুক্ত গুণাবলির দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করা। যেমন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْكَبِيْرِ الْعَلِيِّ الْعَزِيْزِ

قوله يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ বাক্যটি দ্বারা খলীফাদের উপর অপবাদ : যেহেতু ফেরেশতারা গায়েব জানে না সেহেতু ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আদম বা তার সন্তানদের উপর এটা বড় ধরনের অপবাদ। এ প্রেক্ষিতে এ কথাই বলা যায় যে, প্রশ্নকারীর এতটুকু অধিকার রয়েছে যে, সে যেন কোনো বিষয় ও ব্যাপার সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে। তাছাড়া ফেরেশতাগণ ইতিপূর্বে জিনদের অবস্থা দেখেছিল।

হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানদের আকৃতিগত বিভিন্নতার কারণ

তাফসীরকারদের বিভিন্ন আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আ.)-কে আগে ফেরেশতাদের মাধ্যমে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে ষাট রং ও প্রকারের মাটি একত্র করে এবং বিভিন্ন প্রকারের পানি মিশিয়ে নরম করতঃ তা দিয়ে হযরত আদম (আ.)-এর অবয়ব তৈরি করেন। অবশ্য আদম সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হিসেবে আগুন এবং বায়ুও স্থান পায়। সে দেহাবয়বটিতে দীর্ঘ দিন পর প্রাণ সঞ্চারিত করা হয়। মৌলিক উপাদানের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে আদম সন্তানের আকৃতিগত এবং চরিত্রগত পার্থক্য হয়ে থাকে।

وَجْهُ تَسْمِيَةِ اٰدَمَ হযরত আদম (আ.) -এর নামকরণের কারণ : اٰدَمُ শব্দটি আনারবী নাম। যেমন কুরআনে উল্লিখিত اٰزَرُ নাম। কেউ কেউ শব্দটিকে আরবি আখ্যায়িত করে বলেন যে, اٰدَمُ শব্দটি اُدْمَةٌ (যবর যোগে) বা اَلْاُدْمَةُ (পেশ যোগে) শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ اَلْاُسْوَةُ (আদর্শ)। অথবা اَدِيْمُ الْاَرْضِ থেকে নির্গত অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। অথবা الادمة ও الادم থেকে নির্গত। যার অর্থ اَلْاُلْفَةُ (ভালোবাসা)। তবে শব্দটি তাওরাত ও ইঞ্জীল গ্রন্থে উল্লিখিত "এডাম" শব্দের অপভ্রংশ রূপ। অনারবী হওয়াই বিশুদ্ধ। –[বায়যাবী]

ফেরেশতাদের উপর আদম (আ.)-এর সম্মান লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্য জ্ঞাপক ধারণার সমাধান : যদি কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, যেভাবে হযরত আদম (আ.)-কে সমস্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও নামসমূহ শিক্ষা দেওয়ার ফলে তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন এবং প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যদি ফেরেশতাগণও এরূপ শিক্ষা পেতেন, তবে তারাও ঐ বিশেষ জ্ঞান ও প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা লাভ করতেন; এটা বাহ্যতঃ বৈষম্য আচরণ বুঝায়।

উত্তরে বলা যায় যে, হযরত আদম (আ.) পার্থিব উপাদান থেকে সৃষ্ট বিধায় পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও বিষয়ের জ্ঞান ধারণ করার যোগ্যতা তাঁর মধ্যে স্বভাবগতভাবেই উপস্থিত ছিল। তাই সৃষ্টির অভিযাত্রাতেই তাকে নামগুলো শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে তিনি স্বভাবগত জ্ঞানের মাধ্যমে ঐগুলো আয়ত্ত করে ফেলেন। এ বস্তুগুলো বহু পূর্ব থেকেই ফেরেশতাদের দেখা-শোনা বস্তু ছিল; কিন্তু তারা অতি প্রাকৃতিক সৃষ্টি বিধায় এ প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের নামগুলো আয়ত্ত করতে পারেন নি। এ নামগুলো শিক্ষা দিলেও একই কারণে তাদের আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না। তাই দেখা-শোনার ভিত্তিতে তাদের কাছে নাম বলার প্রশ্ন রাখা হয়েছে। অতএব, এখানে বৈষম্যের ধারণা অবান্তর।

قوله اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের কয়েকটি বক্তব্য পরিদৃষ্ট হয়। যথা–

১. আমি আকাশ ও পৃথিবীর সকল গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।
২. কেউ কেউ বলেন, এখানে غَيْبَ السَّمٰوٰتِ দ্বারা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণকে বুঝানো হয়েছে। আর غَيْبَ السَّمٰوٰتِ দ্বারা আদম পুত্র কাবিল কর্তৃক হাবিলকে হত্যা করা বুঝানো হয়েছে।
৩. কেউ কেউ বলেন, غَيْبَ السَّمٰوٰتِ দ্বারা লওহে মাহফূযে রক্ষিত তাকদীর, আর غَيْبَ السَّمٰوٰتِ দ্বারা জিন ও মানব জাতির সংঘটিতব্য পার্থিব কার্যকলাপ বুঝানো হয়েছে।

قوله وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা যা প্রকাশ করছ এবং যা গোপন করছ, সব কিছু সম্পর্কে আমি অবগত। এখানে প্রকাশিত বিষয় দ্বারা মানব জাতির প্রতি ফেরেশতাদের উক্তি "মানুষেরা দুনিয়াতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত করবে" এ মন্তব্যটি উদ্দেশ্য। আর গোপনকৃত বিষয় দ্বারা তাদের উক্তি نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ -এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিজেদের যোগ্যতার যে দাবি ছিল যে, আমাদের মতো অনুগত কোনো সৃষ্টি নেই।" এটাই তাদের গোপনকৃত মনোভাব।

কারো কারো মতে গোপনকৃত বিষয় দ্বারা ফেরেশতাদের আনুগত্য ও ইবলিসের নাফরমানিমূলক আচরণ উদ্দেশ্য। –[বায়যাবী]

হযরত আদম (আ.)-কে সেজদার নির্দেশের কারণ

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলো হযরত আদম (আ.)-কে খলীফা নিযুক্ত করবেন। এ মর্মে তাকে খেলাফতের যোগ্য প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ইলমও দান করলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে তা প্রমাণও করলেন। তবে তার জ্ঞানের কোনো কোনো অংশ ফেরেশতাদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু জিন জাতি সে সকল ইলমের নগণ্য অংশই লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। যেহেতু হযরত আদম (আ.)-এর মাঝে ফেরেশতা ও জিন সম্প্রদায়ের যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে, সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সুবিদিত।

অতএব আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি কার্যকরভাবে প্রকাশ করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন, এ মর্মে ফেরেশতা এবং জিনদের দ্বারা হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি এমন বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করানোর ব্যবস্থা করলেন, যদ্দারা কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বস্তুতঃ তিনিই তাদের উভয় দল থেকে শ্রেষ্ঠতর। এজন্য সেজদার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

سجدة -এর অর্থ এবং এখানে তা দ্বারা উদ্দেশ্য : সেজদার অর্থ হলো আনুগত্য করা, ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় وضع الجبهة على الأرض بقصد العبادة অর্থাৎ ইবাদতের উদ্দেশ্যে আনুগত্যের সাথে জমিনের উপর কপাল রাখাকে সেজদা বলে। ইসলামের বিধান মোতাবেক সেজদা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও করা জায়েজ নয়। অতএব এখানে সেজদার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন–

১. কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, আল্লাহ ব্যতীত যখন অন্য কাউকে সেজদা করতে বলা হবে তখন অর্থ হবে সেবা, আনুগত্য, আদেশ পালন, শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার প্রভৃতি। এটাই আধুনিক তাফসীরকারদের অভিমত।
২. কেউ কেউ বলেন, যদিও আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা জায়েজ নেই; কিন্তু এখানে আল্লাহই নির্দেশ করেছেন। এ নির্দেশ অবশ্য পালনীয়।

তাফসীরে ইবনে কাছীরের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় . , কোনো মানুষের সম্মানার্থে শির নত বা সেজদা করা পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য জায়েজ ছিল। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তার ভাইয়েরা সেজদা করেছিল। আমাদের শরিয়তে তা মানসূখ হয়ে গেছে এখানে ফেরেশতাদেরকে সেজদার নির্দেশ এজন্যই দেওয়া হয়েছে, যেন হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

সেজদার নির্দেশ কি জিনদের প্রতিও ছিল : এ আয়াতে বাহ্যতঃ যে কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার হুকুম ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন এ কথা বলা হলো যে, ইবলিস ব্যতীত সবাই সেজদা করল; তখন তাতে প্রমাণিত হলো যে, সেজদার নির্দেশ সকল বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি প্রতিই ছিল। সকল ফেরেশতাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে শুধু ফেরেশতাদের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, তারাই ছিল তখন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ যখন তাদের হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হলো তাতে জিন জাতি অতি উত্তমরূপে এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেল।

ইসলামে সেজদার বিধান : এ আয়াতে আদম (আ.)-কে সেজদা করতে ফেরেশতাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তার পিতা মাতা ও ভাইগণ মিসর পৌঁছার পর সেজদা করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, এ সেজদা ইবাদতের উদ্দেশ্যে হতে পারে না। কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা শিরক ও কুফরি। কোনো কালে কোনো শরিয়তে এরূপ কাজের বৈধতার কোনো প্রমাণ নেই। প্রাচীনকালের সেজদা আমাদের কালের সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকার সমার্থক ও সমতুল্য ছিল।
ইমাম জাস্সাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেন, পূর্ববর্তী নবীদের শরিয়তে বড়দের প্রতি সম্মানজনক সেজদা করা বৈধ ছিল। শরিয়তে মুহাম্মদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। রুকূ'-সেজদা এবং নামাজের মতো করে হাত বেঁধে দাঁড়ানোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, سَجْدَة تَعْظِيْمِيْ রহিত হওয়ার দলিল কি? যেহেতু এর বৈধতার প্রমাণ কুরআনে রয়েছে। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক متواتر ও মাশহুর হাদীস দ্বারা سَجْدَة تَعْظِيْمِيْ হারাম বলে প্রমাণিত হয়। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি আমি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা জায়েজ মনে করতাম, তবে প্রত্যেক স্ত্রীর স্বামীকে সেজদা করার জন্য নির্দেশ দিতাম। কিন্তু এ শরিয়তে سَجْدَة تَعْظِيْمِيْ সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে সেজদা করা কারো পক্ষে জায়েজ নয়। (এ হাদীসটি বিশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত)।

اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা আদমকে সেজদা কর।' 'সেজদা' শব্দের অর্থ নতশির হওয়া, আনুগত্য স্বীকার করা, বিশেষ প্রণিপাত ইত্যাদি। ইসলামি বিধান অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়। এ কারণেই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে তাফসীর কারকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।
কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাদের প্রতি হযরত আদম (আ.)-কে যে সেজদা দানের আদেশ করেছিলেন, সেই সেজদা ইবাদত নয়; বরং তা ছিল سَجْدَة تَعْظِيْم বা সম্মান প্রদর্শন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়।

প্রাচীন মুফাস্সিরগণ বলেন, ফেরেশ্তা হযরত আদম (আ.)-কে 'কিবলা'স্বরূপ সম্মুখে রেখে মূলতঃ আল্লাহ তা'আলাকেই সেজদা করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করেছিলেন। সুতরাং এতে কোনো অসুবিধা নেই। উল্লেখ্য যে, কোনো মানুষের সম্মানার্থে নতশির বা সেজদা করা পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য বৈধ ছিল। যেমন, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর ভ্রাতাগণ সেজদা করেছিলেন। আমাদের শরিয়তে এটা রহিত করা হয়েছে।

اِبْلِيْس শব্দটি اِبْلَاس থেকে নির্গত, যার অর্থ– দূরীভূত, নিরাশ অথবা বিতাড়িত। এ আয়াতে اِبْلِيْس দ্বারা অভিশপ্ত শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। اِبْلِيْس জিন ছিল, না ফেরেশ্তা ছিল, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, শয়তান অগ্নি থেকে সৃষ্ট জিন সম্প্রদায়ের ইমাম ছিল। কিন্তু বহুকাল একাগ্র চিত্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে করতে সে ফেরেশতা পদে উন্নীত হয়। কথিত আছে যে, এ ধরাধামে ইবলীসের মতো কেউ-ই এতো ইবাদত

করতে পারেনি। কিন্তু সে অহংকার করে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা না করায় আল্লাহ তা'আলার আদেশ লঙ্ঘনপূর্বক অভিশপ্ত শয়তান হয়ে যায়। ইবলীস ফেরেশতা ছিল না। যেহেতু সে ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল, সেহেতু مَعَهُمُ الْمَلَائِكَةِ পদে উন্নীত হওয়ার কারণে فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ বলা হয়েছে। মহান রাব্বুল আ'লামীন যখন হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার জন্য ইবলীসকে আদেশ করলেন, তখন সে সরাসরি এ যুক্তি দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করল যে, আমি হলাম আগুনের তৈরি আর আদম (আ.) হলো মাটির তৈরি। আগুনের ধর্ম হলো উপরের দিকে উঠা। আর মাটির ধর্ম হলো নিচের দিকে নামা। সুতরাং উপরের বস্তু নিচের বস্তুকে কিরূপ সেজদা করতে পারে। এটাই ছিল ইবলীসের হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা না করার কারণ। তাই আল্লাহ তাকে চির অভিশপ্ত করে ছেড়ে দিয়েছেন।

هٰذِهِ الشَّجَرَةَ -এর পরিচয় : নিষিদ্ধ বৃক্ষটির সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো নেই। তবে কেউ কেউ বলেন, সেটা ছিল আঙ্গুর লতা; কেউ বলেন, ডুমুর গাছ। আবার কেউ বলেন, এ গাছের ফল ভক্ষণে মানবিক প্রয়োজন তথা প্রসাব-পায়খানা দেখা দিত, যা বেহেশতের অনুপযুক্ত। এজন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে এ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন।

اُسْكُنْ একবচন কিন্তু كُلَا দ্বিবচন ব্যবহারের কারণ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা اُسْكُنْ একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ তারপরে كُلَا দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর রহস্য ব' হিকমত সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বলেন, এ ভঙ্গিতে আয়াতের শব্দ চয়নের দ্বারা নারী-পুরুষের পরস্পরের অধিকার নির্ণয় করা উদ্দেশ্য। اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সংসার নির্বাহ ও পরিচালনার দিক হতে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান নয়; বরং নারী পুরুষের পরিচালনাধীন থাকবে। পরিচালনা ও নির্বাহের দায়িত্ব পুরুষের, এজন্য সম্বোধন সরাসরি اَنْتَ তথা আদমকে করা হয়েছে। আর তার পরেই স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে।
তবে ভোগের ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ব্যাপারে নারী-পুরুষ সমানভাবে ভোগ করবে এবং সমান সুযোগ প্রাপ্ত হবে। তাই كُلَا দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

رَغَدًا -এর অর্থ : আরবি অভিধানানুযায়ী সে সব নিয়ামত ও আহার্য বস্তুকে। رَغَدًا বলা হয়, যা লাভ করতে কোনো শ্রম বা সাধনার প্রয়োজন পড়ে না এবং এত পর্যাপ্ত ও ব্যাপক পরিমাণে লাভ হয় যে, তাতে হ্রাসপ্রাপ্তি বা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কাই থাকে না। আদম ও হাওয়াকে বলা হলো যে, তোমরা জান্নাতের ফলমূল পর্যাপ্ত পরিমাণে ভক্ষণ করতে থাক। এগুলো লাভ করতে হবে না এবং তা হ্রাস পাবে কিংবা শেষ হয়ে যাবে এমন কোনো চিন্তাও করতে হবে না।

اسكن -এর অর্থ : সকল মুফাস্সিরের ঐকমত্যে শয়তান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে একমাত্র তার কুফরির কারণে। সে বেহেশত থেকেও বহিষ্কৃত হয়েছে। এরপর আল্লাহ আদমকে বলেন, اُسْكُنْ অর্থাৎ এখানে প্রশান্তিতে থাক। এটা প্রশান্তির স্থান। ইহা বাবে نَصَرَ থেকে। اَلسَّكَنُ বলা হয় যেখানে প্রশান্তি পাওয়া যায়, নড়া-চড়ার প্রয়োজন হয় না। اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ-এর মধ্যে اَنْتَ অতিরিক্ত নেওয়ার কারণ ঃ মূলতঃ اُسْكُنْ وَزَوْجُكَ বললেই হতো, মাঝখানে اَنْتَ নেওয়া হয়েছে তাকিদের জন্য। কেননা اسم ظاهر-কে ضمير مرفوع متصل-এর উপর عطف করা বৈধ নয়। مرفوع متصل-এর উপর عطف কাতে হলে সমার্থক একটি ضمير مرفوع منفصل -তাকিদ হিসেবে নিতে হয়।

আয়াতে لَا تَاكُلَا না বলে لَا تَقْرَبَا (নিকট বর্তী হয়ো না) বলার রহস্য : আলোচ্য আয়াতে لا تاكلا অর্থাৎ, 'তোমরা ভক্ষণ করো না' না বলে لَا تَقْرَبَا বলা হয়েছে। অথচ মূলতঃ নিষিদ্ধ হলো ভক্ষণ করা। আর ভক্ষণ করা, নিকটবর্তী হওয়া এক কথা নয়। তা সত্ত্বেও এরূপ বলার রহস্য হলো–পৃথিবীতে বসবাসের নির্দিষ্ট স্থানে খলিফা হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে তাদেরকে পরীক্ষা ও তাদের ঝোঁক প্রবণতা যাচাই করার নিমিত্তে কিছু সময়ের জন্য বেহেশতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু নিকটবর্তী হলেই যে বস্তুর উপর আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং আগ্রহ জাগা ও পরে তাতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই مُقَدِّمَةُ الْقَبِيْحِ قَبِيْحٌ হিসেবে গাছের নিকটে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তাদের মধ্যে ভক্ষণের আগ্রহ উদয় না হয়।

قوله الظّٰلِمِيْنَ -এর মর্মার্থ : ظَالِمِيْنَ শব্দটি ظَالِمٌ শব্দের বহুবচন। اَلظُّلْمُ ধাতু থেকে গঠিত। ظُلْم হচ্ছে وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّه তথা বস্তুকে তার অপাত্রে প্রতিস্থাপন করা। সহজ ভাষায় অন্যের অধিকারের অস্বীকৃতিকে জুলুম বলে। আর অন্যের অধিকার অস্বীকারকারীকে ظَالِمٌ বলে। ظُلْم -এর সর্বোর্ধ্ব স্তর হচ্ছে كُفْر। অত্র আয়াতে ظَالِمٌ দ্বারা আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা গাছটির ফল ভক্ষণ করলে আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং বেহেশতে অবস্থানের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে।

মাধ্যমসমূহ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় : لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ; অর্থাৎ, 'এ গাছের ধারে কাছেও যেও না।' এ নিষেধাজ্ঞার ফলে এ কথা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে বৃক্ষের ফল না খাওয়া ছিল এই নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু সাবধানতা-সূচক নির্দেশ ছিল এই যে, সে গাছের কাছেও যেও না এর দ্বারাই ফিকহশাস্ত্রের কারণ উপকরণের নিষিদ্ধতার মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোনো বস্তু নিজ স্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশঙ্কা থাকে যে, ঐ বস্তু গ্রহণ করলে অন্য কোনো হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তখন ঐ বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া আর ফল-ফসল খাওয়ার কারণও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একে ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় উপকরণের নিষিদ্ধতা বলা হয়।

নবীগণ নিষ্পাপ হওয়া : এ বর্ণনার দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আ.)-এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, নবীগণের যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা এবং লিখিত ও বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত। চার ইমাম ও উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ ছোট-বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কারণ নবীগণ (আ.)-কে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি তাদের দ্বারা আল্লাহর পাকের ইচ্ছার পরিপন্থি ছোট বড় কোনো পাপ কাজ সম্পন্ন হতো, তবে নবীগণের বাণী ও কার্যাবলির উপর আস্থা ও বিশ্বাস উঠে যেত। যদি নবীগণের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তবে দীন ও শরিয়তের স্থান কোথায়? অবশ্য কুরআন পাকের বহু আয়তে অনেক নবী (আ.) সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এজন্য তাঁদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনাও এ শ্রেণিভুক্ত।

এ ধরনের ঘটনাবলি সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কোনো ভুল বুঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবীদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে কোনো নবী (আ.) জেনে শুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ পাকের হুকুমের পরিপন্থি কোনো কাজ করেননি। এ ত্রুটি ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত এবং তা ক্ষমার যোগ্য। শরিয়তের পরিভাষায় একে পাপ বলা চলে না এবং এ ধরনের ভ্রান্তিজনক ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সেসব বিষয়ে হতেই পারে না, যার সম্পর্ক শিক্ষা-দীক্ষা এবং শরিয়তের প্রচারের সাথে রয়েছে; বরং তাঁদের ব্যক্তিগত কাজ-কর্মে এ ধরনের ভুলত্রুটি হতে পারে।

কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের দরবার নবীগণের স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে এবং যেহেতু মহান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ক্ষুদ্র ত্রুটি বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়, সেহেতু কুরআন হাকীমে এ ধরনের ঘটনাবলিকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়।

হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বহু কারণ বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১. হযরত আদম (আ.)-কে যখন নিষেধ করা হয়েছিল, তখন এক নির্দিষ্ট গাছের প্রতি ইঙ্গিত করেই তা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে শুধুমাত্র সে গাছটিই উদ্দেশ্য ছিল না; বরং সে জাতীয় যাবতীয় গাছই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক খণ্ড রেশমী কাপড় ও একখণ্ড স্বর্ণ হাতে নিয়ে ইরশাদ করলেন, এ বস্তু দুটি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। এ কথা সুস্পষ্ট যে, ঐ বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের ব্যবহারই শুধু হারাম ছিল না, যে দুটি হুজুর ﷺ -এর হাতে ছিল; বরং যাবতীয় রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ সম্পর্কেই ছিল এ হুকুম। কিন্তু এখানে হয়তো এ ধারণাও হতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক সেই বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেগুলো সে সময় তাঁর হাতে ছিল। অনুরূপভাবে যে গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে নিষেধ করা হয়েছিল, এ নিষেধের সম্পর্ক ঐ বিশেষ গাছটিতেই সীমাবদ্ধ। শয়তান এ ধারণা তাঁর অন্তরে সঞ্চার করে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল এবং কসম খেয়ে খেয়ে বিশ্বাস জন্মালো যে, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তোমাদেরকে এমন কোনো কাজের পরামর্শ দিচ্ছি না, যা তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। যে গাছ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে সেটি অন্য গাছ।'

তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, শয়তান এ প্রবঞ্চনা তাঁর অন্তঃকরণে সঞ্চারিত করেছিল যে, এ গাছ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আপনার সৃষ্টির সূচনা পর্বের সাথে সম্পৃক্ত ছিল যেমন, সদ্যজাত শিশুকে জীবনের প্রথম পর্যায়ে শক্ত ও গুরুপাক আহার থেকে রবিরত রাখা হয়। কিন্তু সময় ও শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সব ধরনের আহার্য গ্রহণেরই অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং আপনি এখন শক্ত-সমর্থ হয়েছেন; এখন সে বিধি-নিষেধ কার্যকর নয়।

আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, শয়তান যখন হযরত আদম (আ.)-কে সে গাছের উপকারিতা ও গুণাবলির বর্ণনা দিচ্ছিল, যেমন সে গাছের ফল খেলে আপনি অনন্তকাল নিশ্চিন্তে জান্নাতের নিয়ামতাদি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করতে পারবেন, তখন তাঁর সৃষ্টির প্রথম পর্বে সে গাছ সম্পর্কে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কথা তাঁর মনে ছিল না। কুরআন মাজীদে فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا [অর্থাৎ আদম (আ.) ভুলে গেলেন এবং আমি তাঁর মধ্যে [সংকল্পের] দৃঢ়তা পাইনি।] আয়াতও এ সম্ভাব্যতা সমর্থন করে।

যাহোক, এ ধরনের বহু সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে সারকথা এই যে, হযরত আদম (আ.) বুঝে শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে এ হুকুম অমান্য করেননি; বরং তাঁর দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছিল বা ইজতেহাদগত বিচ্যুতি ঘটেছিল, যা প্রকৃতপক্ষে কোনো পাপ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আ.)-এর শানে নবুয়ত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচ্যুতিকেও যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছিল। আর কুরআন মাজীদ সেজন্যই একে পাপ বলে অভিহিত করেছে। অবশ্য আদম (আ.)-এর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর তা মাফ করে দেওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

تَلَقّٰى শব্দের অর্থ আগ্রহ ও উৎসাহসহ কাউকে সংবর্ধনা জানানো এবং তাকে গ্রহণ করা। এর মর্ম এই যে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে তওবার বাক্যগুলো শিখিয়ে দেওয়া হলো, তখন হযরত আদম (আ.) যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্বসহ তা গ্রহণ করলেন।

كَلِمَات তথা যে সব বাক্য হযরত আদমকে তওবার উদ্দেশ্যে বলে দেওয়া হয়েছিল, তা কি ছিল? এ সম্পর্কে মুফাসসির সাহাবাগণের কয়েক ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কুরআন মাজীদের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে। رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব।

تَوْبَة - تَابَ [তওবা] এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা। যখন তওবার সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গে হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি : ১. কৃত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। ২. পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। ৩. ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করা।

এ তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটির ভাব থাকলে তওবা হবেনা। সুতরাং মৌখিকভাবে 'আল্লাহ তওবা' বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা নাজাত লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। فَتَابَ عَلَيْهِ এর মধ্যে তওবার সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে। এর অর্থ তওবা গ্রহণ করা।

প্রথম যুগের কোনো কোনো মনীষীর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কারো দ্বারা পাপ সংঘটিত হলে সে কি করবে? উত্তরে বলা হয়েছিল যে, তাই করবে যা আদি পিতা-মাতা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ.) নিবেদন করেছিলেন رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ [হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি আমার নফসের উপর অত্যাচার করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন,] হযরত ইউনুস (আ.) পদস্খলনের পর নিবেদন করেন– لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি অতি পবিত্র। আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।

তওবা গ্রহণের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। খ্রিস্টান ও ইহুদিগণ এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলে পড়ে আছে। তারা পাদ্রী পুরোহিতদের কাছে কিছু হাদিয়া উপঢৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তার মাফ দিলেই আল্লাহর নিকটে মাফ হয়ে যায়। বর্তমান বহু মুসলমানও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে। অথচ কোনো পীর বা আলেম কারো পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না; তাঁর বড়জোর দোয়া করতে পারেন।

তওবার অর্থ ঃ تَوْبَة -এর প্রকৃত অর্থ ফিরে আসা। যখন তওবার নিসবত মানুষের দিকে হয় তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি। যথা–(১) কৃত পাপকে মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। (২) পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। (৩) ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করা। এ তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটির অভাব থাকলে তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং মৌখিকভাবে "তওবা" বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ নাজাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। فَتَابَ عَلَيْهِ - এর মধ্যে تَوْبَة -এর সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে হয়েছে-এর অর্থ তওবা গ্রহণ করা।

তায়েব ও তাওয়াব-এর মধ্যে পার্থক্য : আল্লামা ইমাম কুরতুবীর মতে تَوْبَة শব্দের নিসবত মানুষের সঙ্গেও হতে পারে। যেমন– اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তওবাকারীদের পছন্দ করেন।

আবার আল্লাহর সাথেও হতে পারে। যেমন– هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ তিনিই মহান, তওবা কবুলকারী, অতীব দয়ালু। যখন শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় পাপ থেকে পুণ্য ও আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। আর যখন আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ হয় তওবা কবুল করা। অর্থাৎ- তওবাকারীর প্রতি দয়াপরবশ হওয়া। সমার্থবোধক অপর تَائِبٌ -এর ব্যবহার আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে জায়েজ নয়, যদিও আভিধানিক অর্থে ভুল নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে শুধু গুণবাচক শব্দ ও উপাধির ব্যবহারই বৈধ, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য শব্দ যদিও অর্থগতভাবে ঠিক কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জন্য তার ব্যবহার বৈধ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلَمْ اَقُلْ : সীগাহ لم اقل واحد متكلم বহছ نفى جحد بلم معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি কি বলিনি?

اَعْلَمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ– অধিক জ্ঞাত।

تُبْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْدَاءُ মূলবর্ণ–(ب ـ د ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ তোমরা প্রকাশ কর।

تَكْتُمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মূলবর্ণ–(ك ـ ت ـ م) মাসদার اَلْكَتْمُ জিনস صحيح অর্থ– তোমরা গোপন কর।

قُلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف ; বাবে نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনসে اجوف واوى অর্থ– আমরা হুকুম দিয়েছি।

اسْجُدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّجُوْدُ মূলবর্ণ (س ـ ج ـ د) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সেজদা কর।

فَسَجَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (س ـ ج ـ د) মাসদার اَلسُّجُوْدُ জিনস صحيح অর্থ– তারা সেজদা করল।

اِبْلِيْسَ : শয়তানের নাম; اِبْلَاسٌ হতে গঠিত। অর্থ, হতাশাগ্রস্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যেহেতু সে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে গিয়েছে, এজন্য তার নাম দেওয়া হয়েছে ইবলীস। তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে, এটা আরবি ভাষার শব্দ নয়। তাই غير منصرف। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, ইবলীসের সিংহাসন হলো মহাসাগরে। সে প্রত্যেহ তার সেনা পাঠায় মানুষকে কুকর্ম ও পাপে লিপ্ত করার জন্য। যে যত বেশি কুকর্ম করতে পারে, সে তার কাছে তত মর্যাদা পায়।

اَبٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মূলবর্ণ (ا ـ ب ـ ى) মাসদার اِبَاءٌ জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء و ناقص يائى অর্থ– সে অস্বীকার করল।

اسْتَكْبَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ–(ك ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– সে অহংকার করল।

كُلَا : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ فعل امر বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ– (أ ـ ك ـ ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক।

شِئْتُمَا : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلشَّيْءُ অর্থ– তোমরা দুজন চেয়েছিলে।

لَاتَقْرَبَا : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْقُرْبُ মূলবর্ণ– (ق ـ ر ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কাছে যেয়ো না।

اهْبِطُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْهُبُوْطُ মূলবর্ণ (ه ـ ب ـ ط) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা নিচে নাম।

مُسْتَقَرٌّ : মাসদারে মীমী হলো অর্থ হবে, অবস্থান করা আর জরফ হলে অর্থ হবে, অবস্থানস্থল। বাব اِسْتِفْعَالٌ থেকে মাসদার اِسْتِقْرَاءٌ

مَتَاعٌ : উপকৃত হওয়া। উপকৃত হওয়ার সমাগ্রী। প্রত্যেক এমন সামগ্রী যার দ্বার সামান্য উপকৃত হওয়া যায়। অতঃপর তা ধ্বংস হয়ে যায়। মাসদার হিসেবে উপকৃত হওয়া কিংবা উপকৃত হওয়ার সামগ্রী। বহুবচন اَمْتِعَةٌ ;

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ : এখানে اِذْ উহ্য ফে'লের مفعول به, قَالَ ফে'ল, رَبُّكَ মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে فاعل আর لِلْمَلَائِكَةِ হলো متعلق আর اِنِّيْ جَاعِلٌ বাক্যটি مفعول। অতএব, ফে'ল-ফা'য়েল মফعول ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ : এখানে نَحْنُ হলো مبتدأ, تَسَبِّحُ ফে'ল ফা'য়েল, আর بِحَمْدِكَ হলো متعلق অতএব ফে'ল ও ফা'য়েল ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে খবর এখন মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

قوله قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ : এখানে قَالَ ফে'ল ফা'য়েল, আর اِنِّيْ اَعْلَمُ الخ হলো مفعول به مفعوله অতঃপর ফে'ল ফা'য়েল ও مفعول به মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا : এখানে عَلَّمَ ফেল ফা'য়েল, اٰدَمَ প্রথম مفعول আর اَلْاَسْمَاءَ كُلَّهَا দ্বিতীয় مفعول অতএব, ফে'ল ফা'য়েল ও উভয় مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ : এখানে اُسْكُنْ ফে'ল فاعل আর اَنْتَ যমীরে تاكيد মা'তুফ আলাই, واو হলো حرف عطف আর زَوْجُكَ মুযাফ ও مضاف اليه মিলে معطوف এখন معطوف عليه ও معطوف মিলে فاعل-এর تاكيد হয়েছে। আর اَلْجَنَّةَ হলো مفعول فيه অতঃপর ফে'ল ও فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ : এখানে لَا تَقْرَبَا হলো فعل আর الف হলো فاعل আর هٰذِهِ الشَّجَرَةَ হলো مفعول অতঃপর ফে'ল ও فاعل ও মাফউল মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ : এখানে فا، হলো حرف عطف আর تَلَقّٰى ফে'ল اٰدَمُ হলো ফা'য়েল تَلَقّٰى হলো مِنْ رَّبِّهٖ ফে'লের متعلق আর كَلِمَاتٍ হলো مفعول به অতঃপর ফে'ল, ফা'য়েল, متعلق ও مفعول به মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٣٨)

অনুবাদ : (৩৮) বললাম, নিচে নেমে যাও তোমরা সকলে জান্নাত হতে, অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আসে আমার পক্ষ হতে কোনো হেদায়েত, তবে যারা অনুসরণ করবে আমার ঐ হেদায়েত, তাদের উপর কোনো ভয় আসবে না এবং তারা সন্তপ্তও হবে না।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٣٩)

(৩৯) আর যারা কুফরি করবে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে আমার আহকামকে, তারা হবে দোজখী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ (٤٠)

(৪০) হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর আমার সেই ইহসানগুলো যা আমি তোমাদের প্রতি করেছিলাম এবং তোমরা পূর্ণ কর আমার অঙ্গীকার, আমি পূর্ণ করব তোমাদের অঙ্গীকার, আর শুধু আমাকেই ভয় কর।

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ (٤١)

(৪১) আর ঈমান আন ঐ কিতাবের প্রতি যা আমি নাজিল করেছি এমনভাবে যে, তা সত্যতা প্রমাণকারী ঐ কিতাবের যা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে, আর হয়ো না তোমরা সকলের মধ্যে ঐ কুরআনের সর্বপ্রথম অবিশ্বাসী, আর গ্রহণ করো না আমার আহকামের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় এবং আমাকেই পূর্ণরূপে ভয় কর।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٤٢)

(৪২) আর মিশ্রিত করো না সত্যকে অসত্যের সাথে এবং গোপন করো না সত্যকে যখন তোমরা অবগতও আছ।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৮) قُلْنَا বললাম اهْبِطُوْا নিচে নেমে যাও তোমরা جَمِيْعًا সকলে مِنْهَا জান্নাত হতে فَاِمَّا অতঃপর যদি يَاْتِيَنَّكُمْ তোমাদের নিকট আসে مِّنِّيْ আমার পক্ষ হতে هُدًى কোনো হেদায়েত, فَمَنْ তবে যারা تَبِعَ অনুসরণ করবে هُدَايَ আমার ঐ হেদায়েত فَلَا خَوْفٌ কোনো ভয় আসবে না عَلَيْهِمْ তাদের উপর وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং তারা সন্তপ্তও হবে না।

(৩৯) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কুফরি করবে وَكَذَّبُوْا এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে بِاٰيٰتِنَآ আমার আহকামকে اُولٰٓئِكَ তারা হবে اَصْحٰبُ النَّارِ দোজখী هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

(৪০) يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল! اذْكُرُوْا স্মরণ কর نِعْمَتِيَ আমার সেই ইহসানগুলো الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ যা আমি করেছিলাম عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি وَاَوْفُوْا এবং তোমরা পূর্ণ কর بِعَهْدِيْٓ আমার অঙ্গীকার اُوْفِ আমি পূর্ণ করব بِعَهْدِكُمْ তোমাদের অঙ্গীকার وَاِيَّايَ আর শুধু আমাকেই فَارْهَبُوْنِ ভয় কর।

(৪১) وَاٰمِنُوْا আর ঈমান আন ঐ কিতাবের প্রতি بِمَآ اَنْزَلْتُ যা আমি নাজিল করেছি এমনভাবে যে, مُصَدِّقًا তা সত্যতা প্রমাণকারী لِّمَا مَعَكُمْ ঐ কিতাবের যা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে وَلَا تَكُوْنُوْٓا আর হয়ো না তোমরা اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ সকলের মধ্যে ঐ কুরআনের সর্বপ্রথম অবিশ্বাসী وَلَا تَشْتَرُوْا আর গ্রহণ করো না بِاٰيٰتِيْ আমার আহকামের পরিবর্তে ثَمَنًا قَلِيْلًا তুচ্ছ বিনিময় وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ এবং আমাকেই পূর্ণরূপে ভয় কর।

(৪২) وَلَا تَلْبِسُوا আর মিশ্রিত করো না الْحَقَّ সত্যকে بِالْبَاطِلِ অসত্যের সাথে وَتَكْتُمُوا এবং গোপন করো না الْحَقَّ সত্যকে وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যখন তোমরা অবগতও আছ।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৪৩) আর তোমরা কায়েম কর নামাজ এবং দাও জাকাত, আর বিনয় প্রকাশ কর বিনয়ীদের সাথে।	وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (٤٣)
(৪৪) কি আশ্চর্য! আদেশ কর অন্যকে সৎকাজের আর নিজেদের সম্বন্ধে বেখবর অথচ তোমরা কিতাব [তাওরাত] পাঠ করে থাক; তবে কি তোমরা এতটুকুও বুঝ না?	اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٤٤)
(৪৫) আর সাহায্য নাও ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা এবং নিশ্চয় নামাজ কঠিন কাজ; কিন্তু খুশুওয়ালাদের [বিনয়ী লোকদের] জন্য নয়।	وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ (٤٥)
(৪৬) খুশুওয়ালা তারাই যারা ধারণা করে যে, নিশ্চয় তারা সাক্ষাতকারী স্বীয় প্রভুর সাথে আর এটাও ধারণা করে যে, তারা আপন প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।	الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (٤٦)
(৪৭) হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর– তোমরা আমার ঐ নিয়ামত যা আমি তোমাদের পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছি আর এটাও যে, আমি তোমাদেরকে ফজিলত দান করেছি সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর।	يٰبَنِىْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٤٧)
(৪৮) আর সে দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো পক্ষ হতে কোনো দাবি পরিশোধ করতে পারবে না এবং কবুল হবে না কোনো ব্যক্তি হতে কোনো সুপারিশও এবং গৃহীত হবে না কোনো ব্যক্তি হতে কোনো বিনিময়ও আর তাদের প্রতি চলতে পারবে না কোনো পক্ষপাতিত্বও।	وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ (٤٨)

রুকু ৫

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৩) وَاَقِيْمُوا আর তোমরা কায়েম কর الصَّلٰوةَ নামাজ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং দাও জাকাত وَارْكَعُوْا আর বিনয় প্রকাশ কর مَعَ الرّٰكِعِيْنَ বিনয়ীদের সাথে।

(৪৪) اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ কি আশ্চর্য! আদেশ কর অন্যকে بِالْبِرِّ সৎকাজের وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ আর নিজেদের সম্বন্ধে বেখবর وَاَنْتُمْ অথচ তোমরা تَتْلُوْنَ পাঠ করে থাক الْكِتٰبَ কিতাব [তাওরাত] اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবে কি তোমরা এতটুকুও বুঝ না?

(৪৫) وَاسْتَعِيْنُوْا আর সাহায্য নাও بِالصَّبْرِ ধৈর্য وَالصَّلٰوةِ ও নামাজ দ্বারা وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ এবং নিশ্চয় নামাজ কঠিন কাজ; اِلَّا কিন্তু عَلَى الْخٰشِعِيْنَ খুশুওয়ালাদের [বিনয়ী লোকদের] জন্য নয়।

(৪৬) الَّذِيْنَ খুশুওয়ালা তারাই يَظُنُّوْنَ যারা ধারণা করে যে اَنَّهُمْ নিশ্চয় তারা مُّلٰقُوْا সাক্ষাতকারী رَبِّهِمْ স্বীয় প্রভুর সাথে وَاَنَّهُمْ আর এটাও ধারণা করে যে, তারা اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ আপন প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।

(৪৭) يٰبَنِىْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল! اذْكُرُوْا স্মরণ কর– তোমরা نِعْمَتِىَ আমার ঐ নিয়ামত الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ যা আমি তোমাদের পুরস্কারস্বরূপ দিয়েছি وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ আর এটাও যে, আমি তোমাদেরকে ফজিলত দান করেছি عَلَى الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর।

(৪৮) وَاتَّقُوْا يَوْمًا আর সে দিনকে ভয় কর যেদিন لَّا تَجْزِىْ পরিশোধ করতে পারবে না نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ কেউ কারো পক্ষ হতে شَيْـًٔا কোনো দাবি وَّلَا يُقْبَلُ এবং কবুল হবে না مِنْهَا কোনো ব্যক্তি হতে شَفَاعَةٌ কোনো সুপারিশও وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا এবং গৃহীত হবে না কোনো ব্যক্তি হতে عَدْلٌ কোনো বিনিময়ও وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ আর তাদের প্রতি চলতে পারবে না কোনো পক্ষপাতিত্বও। [তারা কোনো রকম সাহায্যও পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৪৪- قوله أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** ইহুদিরা মানুষকে দান খয়রাত করার আদেশ করত; কিন্তু এ কাজ তারা নিজেরা করত না। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[বায়জাবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, ইহুদি আলেমগণ তাদের আত্মীয় মুসলমানদেরকে বলত, তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ধর্মের উপর বহাল থাক। কারণ এটা সত্য ধর্ম। অথচ তারা ঈমান গ্রহণ করত না। তাদের এ আচরণ সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল- ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আলোচ্য আয়াত মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই যে, তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি নিজ শ্বশুরকে বলেছিল কিংবা তার কোনো নিকট আত্মীয়কে বলেছিল যে, তোমরা যে ধর্ম মেনে চলছ তাতে অটল থেক এবং এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিবেন, তা অতি সত্য। তারা ঈমান গ্রহণ না করে অন্যদেরকে সৎ উপদেশ দান করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর- ১ : ৭৯]

আসবাবুননুযূল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে আল্লামা ওয়াহিদী বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত ওলামায়ে ইয়াহুদ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা নিজেদের মুসলমান স্বজনদেরকে বলত যে, তোমরা দীনে মুহাম্মদীর উপর অটল থাক। তা অতি সত্যধর্ম। তাদের এহেন উপদেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে জালালাইন : ৯]
হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন যে, আমি মেরাজের রজনীতে একদল লোককে দেখতে পেলাম, আগুনের কেঁচি দ্বারা তাদের ঠোঁট কর্তন করা হচ্ছে। যখনই তাদের ঠোঁটগুলো কর্তন করা হয়, সাথে সাথেই তা পূর্বাবস্থায় হয়ে যায়। তখন আমি হযরত জিবরাঈল (আ.) -কে জিজ্ঞিস করলাম, ওরা কারা? হযরত জিবরাঈল জবাবে বললেন যে, ওরা হচ্ছে আপনার উম্মতের বক্তা বা ওয়ায়েজগণ। এরা মানুষদেরকে সদুপদেশ করেছিল, কিন্তু নিজেদের ব্যাপারে তারা ছিল উদাসীন। সে আমলহীন বক্তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[ফাতহুল কাদীর- ১ : ৮০]

হযরত আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণ শাস্তিস্বরূপ নয় : قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا [তোমরা জান্নাত থেকে নেমে যাও।]-এর পূর্ববর্তী আয়াতেও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল। এখানে পুনরায় এর উল্লেখ করার মাঝে সম্ভবত এ উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে যে, প্রথম আয়াতে পৃথিবীতে অবতরণের হুকুম ছিল শাস্তিমূলক। সেজন্যই তার সাথে সাথে মানবের পারস্পরিক শত্রুতারও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ বিশেষ উদ্দেশ্যে নিহিত রয়েছে। আর তা হলো বিশ্বে খোদায়ী খেলাফতের পূর্ণতা সাধন। এজন্য এর সাথে হেদায়েত প্রেরণের উল্লেখও রয়েছে, যা খোদায়ী খেলাফতের সম্বন্ধীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এতে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে অবতরণের প্রথম নির্দেশটি যদিও শাস্তিমূলক ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হলো, তখন অন্যান্য মঙ্গল ও হেকমতসমূহের বিবেচনায় পৃথিবীতে প্রেরণের হুকুমের রূপ পরিবর্তন করে মূল হুকুম বহাল রাখা হলো এবং তাদের অবতরণ হলো বিশ্বের শাসক খলীফা হিসেবে।

শোক-সন্তাপ থেকে শুধু তারাই মুক্তি পেতে পারে যারা আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত : فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে; তাদের আশঙ্কা নেই এবং কোনো চিন্তাও করতে হবেনা।] এ আয়াতের আসমানি হেদায়েতের অনুসারীগণের জন্য দু'ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমতঃ তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়ঃ তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

خَوْفٌ আগত দুঃখ-কষ্টজনিত আশঙ্কার নাম। আর حُزْنٌ বলা হয়, কোনো উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে। লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এ দুটি শব্দে যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করে দেওয়া হয়েছে যে, স্বাচ্ছন্দ্যের একবিন্দুও এর বাইরে নেই। অতঃপর এ দুটি শব্দের মধ্যে তত্ত্বগত ব্যবধানও রয়েছে। এখানে فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ এর ন্যায় لَا حُزْنَ عَلَيْهِمْ না বলে ক্রিয়াবাচক শব্দ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ এর ব্যবহারের মধ্যে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, কোনো উদ্দেশ্য সফল না হওয়া জনিত গ্লানি ও দুশ্চিন্তা থেকে শুধু তাঁরাই মুক্ত থাকতে পারেন। যাঁরা আল্লাহর ওলীর স্তরে পৌঁছতে পেরেছেন। যাঁরা আল্লাহর প্রদত্ত হেদায়েতসমূহের পূর্ণ অনসুরণকারী, তাঁরা ব্যতীত অন্য কোনো মানুষ এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তা সে সারা বিশ্বের রাজাধিরাজই হোক, বা সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তিই হোক। কেননা এদের মধ্যে

কেউই এমন নয়, যার স্বভাব এ ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোনো অবস্থার সম্মুখীন হবে না এবং সেজন্য দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হবে না। অপরপক্ষে আল্লাহর ওলীগণ নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহর ইচ্ছার মাঝে বিলীন করে দেন। এজন্য কোনো ব্যাপারে তাঁরা সফলকাম না হলে মোটেও বিচলিত হন না। কুরআন মাজীদের অন্যত্র একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, বিশিষ্ট জান্নাতবাসীগণের অবস্থা হবে এই যে, তাঁরা জান্নাতে পৌঁছার পর আল্লাহর সেসব নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করবেন, যার দ্বারা তিনি তাঁদের সন্তাপ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।

আয়াতে هُدًى -এর অর্থ ঃ আয়াতে هُدًى বলতে কি বুঝানো হয়েছে, এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

(১) ইমাম সুদ্দী বলেন, هُدًى বলতে কিতাবুল্লাহ উদ্দেশ্য। (২) কেউ কেউ বলেন, هُدًى অর্থ হলো হেদায়েতের তাওফীক প্রদান করা। (৩) একদলের মতে هُدًى বলে সে দূতসমূহকে বুঝানো হয়েছে, যে দূত আদমের কাছে ফেরেশতা এবং তাঁর সন্তানদের কাছে মানব হিসেবে আগমন করেছে। –[কুরতুবী]

خَوْف এবং حُزْن -এর মধ্যে পার্থক্য : জ্ঞাতব্য যে, অতীতের কোনো কাজ করার পরিণতির কথা ভেবে মনে ভবিষ্যতের জন্য যে দুর্বলতার সৃষ্টি এবং শাস্তি ভোগের চিন্তা হয় তাকে خَوْف বলা হয়। আর ভবিষ্যতের ব্যাপারে মনে যে চিন্তা ও অনুসূচনা হয় তাকে حُزْن বলা হয়।

اٰيٰت -এর অর্থ : اٰيٰت শব্দটি বহুবচন, একবচন اٰيَةٌ; এর অর্থ এমন চিহ্ন বা নিদর্শন যা বিশেষ কোনো জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে। কুরআনে এ শব্দটি চারটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন–(১) কোথাও এর অর্থ হচ্ছে চিহ্ন বা নিদর্শন। (২) কোথাও প্রাকৃতিক দিকদর্শনসমূহকে আল্লাহ তা'আলার আয়াত বলা হয়েছে। (৩) কোথাও নবীদের মু'জিযাসমূহকে আয়াত বলা হয়েছে। (৪) কোনো কোনো স্থানে কুরআনের বাণীখণ্ডকে আয়াত বলা হয়েছে। আয়াত অর্থ কোথায় কি নিতে হবে তা সর্বত্র প্রত্যেকটি ভাষণের পূর্বাপর অবস্থা হতে সহজেই বুঝা যায়। এখানে আসমানি সকল কিতাব এবং নবীদের মু'জিযার কথা বুঝানো হয়েছে।

হেদায়েত অনুসরণের প্রভাব : পৃথিবীতে মানব আগমনের সূচনার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা অনাগত ভবিষ্যতের মানবকুলকে এ কথা বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, তোমাদের নিকট যখন আমার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হেদায়েত আসবে, তখন তোমরা তা অনুসরণ করবে। যারা অনুসরণ করবে ইহ-পরকালে তাদের কোনোই ভয়ভীতি ও দুঃখ-চিন্তা থাকবে না। কিন্তু যারা আমাকে এবং নবী রাসূলকে অস্বীকার করবে বা আমার সাথে কাউকে শরিক করবে এবং আমার প্রদত্ত হেদায়েতের অনুসরণ থেকে বিরত থাকবে তারা জঘন্যতর অপরাধে অপরাধী হবে। তাদের শাস্তি হলো তারা চিরকাল আগুনের জ্বালাময়ী শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহর এ ঘোষণা চিরন্তন। এটা পৃথিবীতে মানুষের আগমন লগ্নের ঘোষণা।

اَصْحٰبُ النَّارِ -এর পরিচয় : উপরিউক্ত আয়াতে চিরন্তন জাহান্নামী হওয়ার কথাটি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাদের অন্তঃকরণে আদৌ ঈমানের লেশমাত্র থাকবে না। তবে যেসব ঈমানদার লোকদের জাহান্নামে শাস্তি ভোগের কথা বলা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এ ঘোষণা প্রযোজ্য নয়; বরং তারা নিজেদের অপরাধ মাফিক শাস্তি ভোগ করার পর অথবা নবী অলীদের সুপারিশে কিংবা আল্লাহর ক্ষমার কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে ঈমানের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা চিরন্তন জাহান্নামী হবে না।

বনী ইসরাঈলের পরিচিতি : اِسْرَائِيْل শব্দটি হিব্রু ভাষার। এর অর্থ- عَبْدُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বান্দা। এটা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর অপর নাম। তিনি এ নামেই পরিচিত ছিলেন। ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে মহানবী (সা.) ব্যতীত অন্য কোনো নবীর একাধিক নাম নেই। কেবল হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর দুটি নাম রয়েছে। ইয়াকূব এবং ইসরাঈল। আর তার বংশধরদেরকেই বনী ইসরাঈল বলা হয়। পবিত্র কুরআনে এ ক্ষেত্রে তাঁর বংশধরকে بَنِىْ يَعْقُوْب বলে সম্বোধন না করে بَنِىْ اِسْرَائِيْل ব্যবহার করেছে। এর তাৎপর্য এই যে, স্বয়ং নিজেদের নাম ও উপাধি থেকেই যেন বুঝতে পারে তারা আব্দুল্লাহ –আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর বংশধর এবং তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত। হযরত ইয়াকূব (আ.) ছিলেন হযরত ইসহাক (আ.)-এর পুত্র এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৌত্র। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর এক পুত্রের নাম ছিল 'ইয়াহুদ'। তার নামানুসারে বনী ইসরাঈল ইহুদি নামেও খ্যাত হতে থাকে। এই বংশে হযরত মূসা, হারুন, দাউদ, সুলাইমান (আ.) সহ আরো অসংখ্য নবী রাসূল জন্মগ্রহণ করেন। –[হাক্কানী, ইবনে কাছীর]

نِعْمَة **দ্বারা উদ্দেশ্য :** نِعْمَة দ্বারা পার্থিব সুখ সমৃদ্ধি, উন্নতি, পারলৌকিক কল্যাণ, মর্যাদা ইত্যাদি বুঝায়। এগুলো সাধারণ নিয়ামত, সবার জন্যই উন্মুক্ত। তারা বিশেষ যে নিয়ামত পেয়েছিল। তা হলো, কঠিন মরু প্রান্তরে পাথরের মধ্য হতে ঝর্ণা প্রবাহিত করা, মান্না ও সালওয়ার অবতারণ, ফেরাউনের জুলুম থেকে নিষ্কৃতি। তাদের বংশ থেকে নবী রাসূল প্রেরণ। তাদেরকে রাজত্ব ও বাদশাহী প্রদান। চলার সময় মেঘের ছায়া প্রদান ইত্যাদি।

বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার : এ আয়াতে বলা হয়েছে, وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ "এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর।" হযরত কাতাদাহ (র.) -এর মতে, তাওরাতে বর্ণিত সে অঙ্গীকারের কথাই কুরআনের এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآئِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মাঝ থেকে (১২) বার জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়ে ছিলাম– (সূরা মায়েদাহ ৩য় রুকূ)। সকল রাসূলগণের উপর ঈমান আনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদের মধ্যে আমাদের নবী করীম ﷺ ও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

এছাড়া নামাজ, জাকাত এবং অন্যান্য সদকা খায়রাতও এ অঙ্গীকারাভুক্ত। যার মূল মর্ম হলো রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর ঈমান ও তার পুরোপুরি অনুসরণ। এজন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, অঙ্গীকারের মূল অর্থই হলো মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণ।

اَلْعَهْدُ **-এর হুকুম :** এ আয়াতের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, অঙ্গীকার ও চুক্তির শর্তাবলি পালন করা আবশ্যক আর তা লঙ্ঘন করা হারাম। আল্লাহ অন্যত্র বলেন– اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -তোমরা কৃত চুক্তি পূর্ণ কর। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের নির্ধারিত শাস্তির পূর্বে এ শাস্তি দেওয়া হবে যে, হাশরের ময়দানে যখন পূর্ববর্তী সকল মানবজাতি সমবেত হবে তখন অঙ্গীকার লঙ্ঘনকারীদের মাথার উপর নির্দশন স্বরূপ একটা পতাকা উত্তোলন করে দেওয়া হবে এবং যত বড় অঙ্গীকার ভঙ্গকারী হবে তা ততো উঁচু হবে, এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও অপমানিত করা হবে।

ثَمَنًا قَلِيْلًا **-এর অর্থ :** ثَمَنًا قَلِيْلًا -এর অর্থ হচ্ছে সামান্য মূল্য। এর দ্বারা নগণ্য পার্থিব স্বার্থ ও সুবিধার কথা বলা হয়েছে যা পাবার জন্য আল্লাহ তা'আলার বিধি নিষেধ অমান্য ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অথচ পার্থিব জগত ও রিপুর ইচ্ছা বাসনা হচ্ছে হীন তুচ্ছ।

হযরত হাসান (র.)-এর কাছে ثَمَنًا قَلِيْلًا সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এর দ্বারা দুনিয়া এবং তার বস্তুসমূহের কথা বুঝানো হয়েছে।

সাঈদ ইবনে যুবায়ের বলেন, بِاٰيٰتِيْ দ্বারা তাদের প্রতি নাজিলকৃত কিতাবসমূহ এবং ثَمَنًا قَلِيْلًا দ্বারা দুনিয়া ও রিপুর ইচ্ছা কামনা বাসনার কথা বুঝানো হয়েছে।

কুরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ : এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ ঠিক ঠিকভাবে শিক্ষা দিয়ে বা ব্যক্ত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সঙ্গত কিনা? এই প্রশ্নটির সম্পর্ক উল্লিখিত আয়াতের সঙ্গে নয়। স্বয়ং এ মাসআলাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও পর্যালোচনা সাপেক্ষ। কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? এ সম্পর্কে ফিকহশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল জায়েজ বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখ কয়েকজন ইমাম তা নিষেধ করেছেন। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ কুরআনকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করতে বারণ করেছেন।

অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, পূর্বে কুরআনের শিক্ষকমণ্ডলীর জীবনযাপনের ব্যয়ভার ইসলামি বায়তুলমাল [ইসলামি ধনভাণ্ডার] বহন করত, কিন্তু বর্তমানে ইসলামি শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমণ্ডলী কিছুই লাভ করতে পারে না। ফলে যদি তাঁরা জীবিকার অন্বেষণে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলেমেয়েদের কুরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামতি, আজান, হাদীস ও ফিকহ শিক্ষাদান প্রভৃতি যে সব কাজের উপর দীন ও শরিয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও কুরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজন মতো এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পরিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। –[দুররে মুখতার, শামী]

ঈসালে ছওয়াব উপলক্ষে খতমে-কুরআনের বিনিময় পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েজ : আল্লামা শামী 'দুররে মুখতারের শরাহ' এবং 'শিফাউল আলীল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলিলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরিয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক। এ জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই গুনাহগার হবে বস্তুতঃ যে পড়েছে সেই যখন কোনো ছওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে? কবরের পাশে কুরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম করানো রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন, এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ'আত।

সত্য গোপন করা এবং তাতে সংযোজন ও সংমিশ্রণ হারাম : وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ [সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না।] এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। অনুরূপভাবে কোনো ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম।

জ্ঞাতব্য : সাধারণ ধৈর্য ধারণ করার জন্য কেবল অপ্রয়োজনীয় কামনা বাসনাগুলোই পরিহার করতে হয়। কিন্তু নামাজের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হয় এবং বহু বৈধ কামনাও সাময়িকভাবে বর্জন করতে হয়। যেমন– পানাহার, কথাবার্তা, চলাফেরা এবং অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজনাদি যেগুলো শরিয়তানুসারে বৈধ ও অনুমোদিত, সেগুলোও নামাজের সময় বর্জন করতে হয়। তাও নির্ধারিত সময়ে দিন রাতে পাঁচবার করতে হয়। এ জন্য কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পন্ন করা এবং নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় বৈধ ও অবৈধ বস্তু থেকে ধৈর্য ধারণ করার নাম নামাজ।

মানুষ অপ্রয়োজনীয় কামনাসমূহ বর্জন করতে সংকল্পবদ্ধ হলে কিছু দিন পর তার স্বাভাবিক চাহিদাও লোপ পেয়ে যায়, কোনো প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা থাকে না। কিন্তু নামাজের সময়সূচির অনুসরণ এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন এবং এসব প্রয়োজনীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি মানব স্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও আয়াসসাধ্য। এজন্য এখানে সন্দেহের উদ্ভব হতে পারে যে, ঈমানকে সহজলব্ধ করার জন্য ধৈর্য ও নামাজরূপ ব্যবস্থাপত্রের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তার অনুশীলন কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে নামাজ সম্পর্কিত শর্তাবলি ও নিয়ামবলি পালন ও অনুসরণ করা নামাজ সংক্রান্ত এসব জটিলতার প্রতিবিধান প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে, নিঃসন্দেহে নামাজ কঠিন ও আয়াসসাধ্য কাজ। কিন্তু যাদের অন্তঃকরণে বিনয় বিদ্যমান, তাদের পক্ষে এটা মোটেও কঠিন কাজ নয়। এতে নামাজকে সহজসাধ্য করার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।

নামাজ কঠিন বোধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। আর মানুষের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মনেরই অনুসরণ করে। কাজেই যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনেরই অনুসরণে মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। নামাজ এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। না বলা, না হাসা, না খাওয়া, না চলা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্যবাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং মনের অনুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ থেকে কষ্ট বোধ করতে থাকে।

সারকথা : নামাজের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তি বোধের একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার অবাধ বিচরণ। এর প্রতিবিধান মনের স্থিরতার দ্বারাই হতে পারে। خُشُوْع বা বিনয়ের অর্থ মূলতঃ سُكُوْن قَلْب বা মনের স্থিরতা। কাজেই বিনয়কে নামাজ সহজসাধ্য হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, মনের স্থিরতা অর্থাৎ বিনয় কিভাবে লাভ করা যায়? একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার অন্তরে বিচিত্র চিন্তাধারা ও নানাবিধ কল্পনাকে তার মন থেকে সরাসরি দূরীভূত করতে চায়, তবে এতে সফলতা লাভ করা প্রায় অসম্ভব; বরং এর প্রতিবিধান এই যে, মানবমন যেহেতু একই সময়ে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে পারে না, সুতরাং যদি তাকে একটি মাত্র চিন্তায় মগ্ন ও নিয়োজিত করে দেওয়া যায়। তবে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা আপনা থেকেই বেরিয়ে যাবে। এজন্য خُشُوْع বা বিনয়ে বর্ণনার পর এমন এক চিন্তার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে নিমগ্ন থাকলে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা প্রদমিত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এগুলো দমে যাওয়ার ফলে হৃদয়ের অস্থিরতা দূর হয়ে স্থিরতা জন্মাবে। স্থিরতার দরুন নামাজ অনায়াসলব্ধ হবে এবং নামাজের উপর স্থায়িত্ব লাভ হবে। আর নামাজের নিয়মানুবর্তিতা দরুন গর্ব অহঙ্কার ও যশ-খ্যাতির মোহও হ্রাস পাবে। তদুপরি ঈমানের পথে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে, তা দূরীভূত হয়ে পূর্ণ ঈমান লাভ সম্ভব হবে।

قوله وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ : صَلٰوة-এর শাব্দিক অর্থ প্রার্থনা বা দোয়া। শরিয়তের পরিভাষায় সে বিশেষ ইবাদত, যাকে নামাজ বলা হয়। কুরআন কারীমে যতবার নামাজের তাকিদ দেওয়া হয়েছে- সাধারণতঃ اِقَامَتْ শব্দের মাধ্যমেই হয়েছে। এজন্য اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ [নামাজ প্রতিষ্ঠা]-এর ধর্ম অনুধাবন করা উচিত। اِقَامَتْ -এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা। সাধারণতঃ যেসব খুঁটি দেয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাঁড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। এজন্য اِقَامَتْ স্থায়ী ও স্থিতিশীলতাকরণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় اِقَامَتْ صَلٰوة অর্থ, নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলি রক্ষা করে নামাজ আদায় করা। শুধু নামাজ পড়াকে اِقَامَتْ صَلٰوة বলা হয় না। নামাজের যত গুণাবলি, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কুরআন হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই اِقَامَتْ صَلٰوة [নামাজ প্রতিষ্ঠা] -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত : যেমন- কুরআন কারীমে আছে- اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ [নিশ্চয় নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।]

নামাজের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটাবে, যখন নামাজ উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এজন্য অনেক নামাজিকে অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা তারা নামাজ পড়েছে বটে; কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেনি।

قوله وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ: আভিধানিকভাবে জাকাতের অর্থ দু'রকম পবিত্র করা ও বর্ধিত হওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় সম্পদের সে অংশকে জাকাত বলা হয়, যা শরিয়তের নির্দেশানুসারে সম্পদ থেকে বের করা এহং এবং শরিয়ত মোতাবেক খরচ করা হয়।

যদিও এখানে সমসাময়িকভাবে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয়না যে, নামাজ ও জাকাত ইসলাম পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলদের উপরই ফরজ ছিল। কিন্তু সূরা মায়েদায় বর্ণিতঃ "নিশ্চয় আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন দলপতি মনোনীতি করে প্রেরণ করলাম। আর আল্লাহ পাক বললেন, যদি তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা কর এবং জাকাত আদায় কর, তবে নিশ্চয় আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাঈলের উপর নামাজ ও জাকাত ফরজ ছিল। অবশ্য তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন।

قوله وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ : رُكُوْع রুকূর শাব্দিক অর্থ ঝুঁকা বা প্রণত হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সেজদার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা সেটাও ঝুঁকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝোঁকাকে রুকূ' বলা হয়, যা নামাজের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অর্থ এই যে, রুকূকারীগণের সাথে রুকূ কর।' এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, নামাজের সমগ্র অঙ্গ প্রতঙ্গের মধ্যে রুকূকে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো? উত্তর এই যে,এখানে নামাজে একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদের এক জায়গায় وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ [ফজর নামাজের কুরআনের পাঠ] বলে সম্পূর্ণ ফজরের নামাজকে বুঝানো হচ্ছে। তাছাড়া হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে সেজদা শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাকাত বা গোটা নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, নামাজিগণের সাথে নামাজ পড়া। কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নামাজের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিশেষভাবে রুকূ'র উল্লেখের তাৎপর্য কি?

উত্তর এই যে, ইহুদিদের নামাজে সেজদাসহ অন্যান্য সব অঙ্গই ছিল, কিন্তু রুকূ' ছিল না। রুকূ মুসলমানদের নামাজের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। এজন্য رَاكِعِيْن শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর নামাজিগণকে বুঝানো হবে, যাতে রুকূও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোমরাও উম্মতে মুহাম্মদীর নামাজিগণের সাথে নামাজ আদায় কর। অর্থাৎ প্রথমে ঈমান গ্রহণ কর, পরে জামাতের সাথে নামাজ আদায় কর।

নামাজের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলি : নামাজের হুকুম এবং তা ফরজ হওয়া তো وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ শব্দের দ্বারাই বুঝা গেল। এখানে مَعَ الرّٰكِعِيْنَ [রুকূ'কারীদের সাথে] শব্দের দ্বারা নামাজ জামাতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ হুকুমটি কোন ধরনের? এ ব্যাপারে ওলামা ও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহাবা (রা.), তাবেয়ীন এবং ফকিহগণের মধ্যে একদল জামাতকে ওয়াজিব বলেছেন এবং তা পরিত্যাগ করাকে কঠিন পাপ বলে অভিহিত করেছেন। কোনো কোনো সাহাবা (রা.) তো শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত জামাতহীন নামাজ জায়েজ নয় বলেও মন্তব্য করেছেন। যারা জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা এ আয়াতটি তাঁদের দলিল।

অধিকাংশ ওলামা, ফুকাহা, সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মতে জামাত হলো সুন্নতে মোয়াক্কাদা। কিন্তু ফজরের সুন্নতের ন্যায় সর্বাধিক তাকিদপূর্ণ সুন্নত। ওয়াজিবের একেবারে নিকটবর্তী।

আমলহীন উপদেশ প্রদানকারীর নিন্দা : أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

[তোমরা অন্যকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ নিজেদেরকে ভুলে বস।] এ আয়াতে ইহুদি আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, তারা তো নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণ করতে এবং ইসলামের উপর স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়। [এ থেকে বুঝা যায়, ইহুদি আলেমগণ দীন ইসলামকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করত। নিজেরা প্রবৃত্তির কামনার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করতে কখনো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যারাই অপরকে পুণ্য ও মঙ্গলের প্রেরণা দেয়, অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা কার্যে পরিণত করে না, এ শ্রেণির লোকদের সম্পর্কে হাদীসে করুণ পরিণতি ও ভয়ঙ্কর শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেন, মি'রাজের রাতে আমি এমন কিছুসংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। আমি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা আপনার উম্মতের পার্থিব স্বার্থপূজারী উপদেশদানকারী– যারা অপরকে তো সৎকাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের খবর রাখত না। –[কুরতুবী]

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কপিতপয় জান্নাতবাসী কতক নরকবাসীকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা কিভাবে দোজখে প্রবেশ করলে, অথচ আল্লাহর কসম, আমরা তো সেসব সৎকাজের দৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, যা তোমাদেরই কাছে শিখেছিলাম? দোজখবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম কিন্তু নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না।

পাপী ওয়ায়েজ উপদেশ প্রদান করতে পারে কিনা? উল্লিখিত বর্ণনা থেকে একথা যেন বুঝা না হয় যে, কেনো আমলহীন বিরুদ্ধাচারীর পক্ষে অপরকে উপদেশ দান করা জায়েজ নয় এবং কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পাপে লিপ্ত থাকে, তবে সে অপরকে উক্ত পাপ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে পারে না। কারণ সৎকাজের জন্য ভিন্ন নেকী ও সৎকাজের প্রচার-প্রসারের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র নেকী। আর এটা সুস্পষ্ট যে, এক নেকী পরিহার করলে অপর নেকীও পরিহার করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যেমন, কোনো ব্যক্তি নামাজ না পড়লে অপরকেও নামাজ পড়তে বলতে পারবে না, এমন কথা নয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি নামাজ না পড়লে রোজাও রাখতে পারবে না, এমন কোনো কথা নেই। তেমনিভাবে কোনো অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন পাপ এবং নিজের অধীনস্থ লোকদেরকে ঐ অবৈধ কাজ থেকে বারণ না করা পৃথক পাপ। একটি পাপ করেছে বলে অপর পাপও করতে হবে এমন কোনো বাধ্য বাধকতা নেই।

যদি প্রত্যেক মানুষ নিজে পাপী বলে সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বাধাদান করা ছেড়ে দেয় এবং বলে যে, যখন সে নিজে নিষ্পাপ হতে পারবে, তখনই অপরকে উপদেশ দিবে, তাহলে ফল দাঁড়াবে এই যে, কোনো তাবলীগকারই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা এমন কে আছে, যে পরিপূর্ণ নিষ্পাপ? হযরত হাসান (র.) ইরশাদ করেছেন– শয়তান তো তাই চায় যে, মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাবলীগের দায়িত্ব পালন না করে বসে থাক।

মূলকথা এই যে, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ [তোমরা কি অপরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে বস?] আয়াতের অর্থ এই যে, উপদেশদানকারী [ওয়ায়েজকে] আমলহীন থাকা উচিত নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ওয়ায়েজ কিংবা ওয়ায়েজ নয় এমন কারো পক্ষেই যখন আমলহীন থাকা জায়েজ নয়, তাহলে এখানে বিশেষভাবে ওয়ায়েজের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি? উত্তর এই যে, বিষয়টি উভয়ের জন্য নাজায়েজ, কিন্তু ওয়ায়েজ বহির্ভূতদের তুলনায় ওয়ায়েজের অপরাধ অধিক মারাত্মক। কেননা ওয়ায়েজ অপরাধকে অপরাধ মনে করে জেনে শুনে করছে। তার পক্ষে এ ওজর গ্রহণযোগ্য নয় যে, এটা যে অপরাধ তা আমার জানা ছিল না। অপরপক্ষে ওয়ায়েজ বহির্ভূত মূর্খদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ছাড়া ওয়ায়েজ ও আলেম যদি কোনো অপরাধ করে, তবে তা হয় ধর্মের সাথে এক প্রকারের পরিহাস। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক অশিক্ষিত লোকদেরকে যত ক্ষমা করবেন, শিক্ষিতদেরকে তত ক্ষমা করবেন না।

দুটি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার : সম্পদ-প্রীতির ও যশ-খ্যাতির মোহ এমন ধরনের দুটি মানসিক ব্যাধি যদ্দরুন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনই নিষ্প্রভ ও অসার হয়ে পড়ে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবেতিহাসে এ যাবৎ যতগুলো মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং যত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করেছে, সেগুলোর উৎপত্তিই হয়েছিল উল্লিখিত এ দুটি ব্যাধি থেকে।

সম্পদ প্রাপ্তির পরিণতি ও ফলাফল :

১. অর্থগৃধ্নুতা ও কৃপণতার অন্যতম জাতীয় ক্ষতির দিক হলো এই যে, তার সম্পদ জাতির কোনো উপকারে আসে না। দ্বিতীয় ক্ষতিটি তার ব্যক্তিগত। এ প্রকৃতির লোককে সমাজে কখনো সু-নজরে দেখা হয় না।

২. **স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা :** তার সম্পদলিপ্সা পূরণার্থে জিনিসে ভেজাল মেশানো, মাপে কম দেওয়া , মজুদদারী, মুনাফাখোরী, প্রবঞ্চনা-প্রতারাণা প্রভৃতি ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন তার মজ্জাগত হয়ে যায়। স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সে অপরের রক্ত নিংড়ে নিতে চায়। পরিশেষে পুঁজিপতি ও মজুরদের পারস্পরিক বিবাদের উপৎপত্তি হয়।

৩. এমন লোক যত সম্পদই লাভ করুক, কিন্তু আরো অধিক উপার্জনের চিন্তা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, অবকাশ ও অবসর বিনোদনের সময়েও তার একই ভাবনা থাকে যে, কিভাবে তার পুঁজি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে যে সম্পদ তার সুখ-সাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে পরিণত হতে পারত, তা পরিণামে তার জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

৪. সত্য কথা যত উজ্জ্বল হয়েই সামনে উদ্ভাসিত হোক না কেন, তার এমন কোনো কথা মেনে নেওয়ার সৎসাহস থাকে না, যাকে সে তার উদ্দেশ্য সাধন ও সম্পদলাভের পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। এসব বিঘ্ন পরিশেষে গোটা সমাজের শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত করে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে যশ–খ্যাতির মোহের অবস্থাও প্রায় একই রকম বলে পরিলক্ষিত হবে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ অহঙ্কার, স্বার্থান্বেষা, অধিকার হরণ, ক্ষমতা লিপ্সা এবং পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও অনুরূপ আরো অগণিত অমানবিক সমাজবিরোধী ও নৈতিকতা বিবর্জিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপৎপত্তি ঘটে, যা পরিণামে গোটা বিশ্বকে নরকে পরিণত করে দেয়। এই উভয় ব্যাধির প্রতিকার কুরআন পাক এভাবে উপস্থাপন করেছে– বলা হয়েছে– وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ [তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর] অর্থাৎ, ধৈর্য ধারণ করে ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বশীভূত করে ফেল। তাতে সম্পদপ্রীতি হ্রাস পাবে। কেননা সম্পদ বিভিন্ন আস্বাদ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই ধন-প্রেমের উদ্ভব হয়। যখন এসব আস্বাদ ও কামনা বাসনার অন্ধ অনুসরণ পরিহার করতে দৃঢ় সংকল্প হবে, তখন প্রাথমিক অবস্থায় খানিকটা কষ্ট বোধ হলেও ধীরে ধীরে এসব কামনা যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ন্যায় ও মধ্যমপন্থা তোমাদের স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন আর সম্পদের প্রাচুর্যের কোনো আবশ্যকতা থাকবে না। সম্পদের প্রাচুর্যের কোনো আবশ্যকতা থাকবে না। সম্পদের মোহও এতে প্রবল হবে না যে, নিজস্ব লাভ-ক্ষতির বিবেচনা ও নেশা তোমাকে অন্ধ করে দিবে।

আর নামাজ দ্বারা যশ–খ্যাতির আকর্ষণও দমে যাবে। কেননা নামাজের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সব ধরনের বিনয় ও নম্রতাই বিদ্যমান। তখন সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের সামনে নিজের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার ধারণা বিরাজ করতে থাকবে। ফলে অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা ও মান মর্যাদার মোহ হ্রাস পাবে।

বিনয়ের নিগুঢ় তত্ত্ব : اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ : [কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষে মোটেও কঠিন নয়] কুরআন ও সুন্নাহয় যেখানে خُشُوْعٌ বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা ও অপরাগতাজনিত সেই মানসিক অবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ পাকের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। এর ফলে ইবাদত উপাসনা সহজতর হয়ে যায়। কখনো এর লক্ষণাদি দেহেও প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সে শিষ্টাচারসম্পন্ন বিনম্র ও কোমলমন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে খোদাভীতি ও নম্রতা না থাকে, মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিনম্র হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয় নয়।

হযরত ওমর (রা.) একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'মাথা উঠাও, বিনয় হৃদয়ে অবস্থান করে।'

হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (র.) বলেন, মোটা কাপড় পরা, মোটা খাওয়া নত করে থাকার নামই বিনয় নয়।

خُشُوْعٌ বা বিনয় অর্থ حَقٌّ বা অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর–ভদ্র নির্বিশেষে সবার সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ পাক তোমার উপর যা ফরজ করে দিয়েছেন তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে শুধু তার জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রিভূত করে নেওয়া।

সারকথা ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণা মাত্র। আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ক্ষমার্হ।

জ্ঞাতব্য : خُشُوْع -এর সাথে সাথে অপর একটি শব্দ خُضُوْع ও ব্যবহৃত হয়। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় তা রয়েছে। এ শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক। কিন্তু خُشُوْع শব্দ মূলত কণ্ঠ ও দৃষ্টির নিম্নমুখিতা ও বিনয় প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়- যখন তা কৃত্রিম হবে না; বরং অন্তরের ভীতি ও নম্রতার ফলশ্রুতিস্বরূপ হবে। কুরআন কারীমে আছে- وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ [শব্দ নীচু হয়ে গেল] এবং خُضُوْع শব্দে দৈহিক ও বাহ্যিক বিনয় ও ক্ষুদ্রতাকে বুঝায়। কুরআন কারীমে আছে فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ [অতঃপর তাদের কাঁধ তার সামনে ঝুঁকিয়ে দিল।]

নামাজে বিনয়ের ফিকহগত মর্যাদা :নামাজে خُشُوْع বিনয়ের তাকিদ বার বার এসেছে। ইরশাদ হয়েছে وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ [আমার স্মরণে নামাজ প্রতিষ্ঠা কর]। এবং একথা স্পষ্ট যে, غَفْلَتْ অমনোযোগিতা স্মরণের পরিপন্থি। যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে غَافِلْ [অমনোযোগী] সে আল্লাহকে স্মরণ করার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নয়। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ [এবং অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।] রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– নামাজ বিনয় ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। অন্য কথায়, অন্তরে বিনয় ও ক্ষুদ্রতাবোধ না থাকলে তা নামাজই নয়। অপর এক হাদীসে আছে যার নামাজ তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত না রাখে, সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আর গাফেল বা অমনোযোগীর নামাজ তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ থেকে বুঝা গেল, যে লোক অন্যমনস্ক হয়ে নামাজ পড়ে, সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ইমাম গাযালী (র.) উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহ এবং অন্যান্য প্রমাণাদির উদ্ধৃতি দিয়ে ইরশাদ করেছেন, এগুলোর দ্বারা বুঝা যায়, خُشُوْع বা বিনয় নামাজের শর্ত এবং নামাজের বিশুদ্ধতা এরই উপর নির্ভরশীল। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) সুফিয়ান ছাওরী ও হাসান বসরী (রা.) প্রমুখের অভিমত এই যে, খুশু বা বিনয় ব্যতীত নামাজ আদায় হয় না; বরং তা ভঙ্গ হয়ে যায়।

কিন্তু ইমাম চতুষ্টয় এবং অধিকাংশ ফকীহগণের মতে 'খুশু' নামাজের শর্ত না হলেও তাঁরা একে নামাজের রূহ বা আত্মা বলে মন্তব্য করে এ শর্ত আরোপ করেন যে, তাকবীরে তাহরীমার সময় বিনয়সহ মনের একাগ্রতা বজায় রেখে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামাজের নিয়ত করতে হবে। পরে যদি খুশু বিদ্যমান না থাকে তবে যদিও সে নামাজের অতটুকু অংশের ছওয়াব লাভ করবে না যে অংশে খুশু উপস্থিত ছিল না। তবে ফিকহ অনুযায়ী তাকে নামাজ পরিত্যাগকারীও বলা চলবে না এবং নামাজ পরিত্যাগকারীর উপর যে শাস্তি প্রযোজ্য, তার জন্য সে শাস্তিবিধানও করা যাবে না।

খুশুহীন নামাজও সম্পূর্ণ নিরর্থক নয় : সবশেষে 'খুশু' র এ অসাধারণ গুরুত্ব সত্ত্বেও মহান পরওয়ারদেগারের দরবারে আমাদের এই কামনা যে অন্যমনস্ক ও গাফেল নামাজিও সম্পূর্ণভাবে নামাজ পরিত্যাগকারীর পর্যায়ভুক্ত না হয়। কেননা যে অবস্থায়ই হোক সে অন্ততঃ ফরজ আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সামান্য সময়ের জন্য হলেও অন্তরকে যাবতীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রতি নিয়োজিত করেছে। কমপক্ষে নিয়তের সময় শুধু সে আল্লাহ পাকের ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। এ ধরনের নামাজে অন্ততঃ এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে যে, তাদের নাম অবাধ্য ও বেনামাজিদের তালিকা-বহির্ভূত থাকবে।

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো কিয়ামতের দিন। দাবি আদায় করে দেওয়ার অর্থ– যেমন, কেউ নামাজ-রোজা সংক্রান্ত হিসাবের সম্মুখীন হলে, তখন অপর কেউ যদি বলে যে, আমার নামাজ-রোজার বিনিময়ে তাকে হিসাবমুক্ত করে দেওয়া হোক, তবে তা গৃহীত হবে না। বিনিময় অর্থ, টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদের বিনিময়ে দায়মুক্ত করে দেওয়া। এ দুটির কোনোটিই গ্রহণ করা হবে না। ঈমান ব্যতীত সুপরিশ গৃহীত না হওয়ার কথা কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও বুঝা যায় প্রকৃত প্রস্তাবে এদের পক্ষে কোনো সুপারিশই হবে না। ফলে তা গ্রহণ করার কোনো প্রশ্নই উঠবে না।

মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে ঈমান ব্যতীত সেগুলোর কোনোটিই আখেরাতে কার্যকর হবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ

جَمِيْعًا : অর্থ– সকলে, সবাই। جَمْعٌ হতে مَجْمُوْعٌ অর্থে। جَمِيْعٌ এবং جَمِيْعًا উভয়ভাবে পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় ব্যবহার হয়েছে।

هُدًى : মাসদার। এখানে اسم فاعل তথা هَادٍ এর অর্থে এসেছে। হেদায়েতকারী, পথ প্রদর্শনকারী। বাব ضَرَبَ অর্থ– পথ প্রদর্শন করা।

يَحْزَنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحُزْنُ মূলবর্ণ (ح ـ ز ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– না তারা চিন্তিত হবে, না তাদের কোনো ভয় থাকবে।

كَذَّبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْذِيْبُ মূলবর্ণ (ك ـ ذ ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা অস্বীকার করল, মিথ্যারোপ করল।

اَصْحٰبُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَاحِبٌ ; কখনো কখনো মালিককে صَاحِبٌ বলা হয়।

النَّارِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন نِيْرَانٌ অর্থ– আগুন।

خٰلِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُلُوْدُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ د) জিনস صحيح অর্থ– চিরস্থায়ীগণ, যারা সর্বদা বর্তমান।

وَاَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) মাসদার اَلْاِيْفَاءُ জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পুরা কর।

عَهْدِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন عُهُوْدٌ অর্থ– দৃঢ় অঙ্গীকার। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

ارْهَبُوْنِ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرَّهْبُ মূলবর্ণ (ر ـ ه ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اٰمِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ا ـ م ـ ن) মাসদার اَلْاِيْمَانُ জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা ঈমান আন

اَنْزَلْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ل) মাসদার اَلْاِنْزَالُ জিনস صحيح অর্থ– আমি নাজিল করেছি।

مُصَدِّقًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلصِّدْقُ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– যে সত্য বলে, স্বীকৃতিদানকারী।

لَاتَشْتَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ى) মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ জিনস ناقص يائى অর্থ তোমরা ক্রয় করো না।

اٰيٰتِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اٰيَةٌ অর্থ– আয়াত, নিদর্শন, নিশান, আহকাম।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ– (و ـ ق ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اَقِيْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) মাসদার اَلْاِقَامَةُ জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা কায়েম কর।

اٰتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) মাসদার اَلْاِيْتَاءُ জিনস مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তোমরা আদায় কর, দাও।

اِرْكَعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মূলবর্ণ– (ر ـ ك ـ ع) মাসদার اَلرُّكُوْعُ জিনস صحيح অর্থ– তোমরা রুকূ কর, ঝুঁকে পড়, মাথা নত কর।

رٰكِعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّكُوْعُ মূলবর্ণ (ر ـ ك ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– রুকূকারীগণ, কাকুতি-মিনতি কারীগণ।

اِسْتَعِيْنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعَانَةُ মূলবর্ণ (ع.و.ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা সাহায্য কামনা কর।

لَكَبِيْرَةٌ : كَبِيْرَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচন اكبر। অর্থ– বড়, মহান।

يَظُنُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلظَّنُّ মূলবর্ণ (ظ.ن.ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বিশ্বাস রাখে।

مُلٰقُوْا : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব مفاعلة মাসদার اَلْمُلَاقَاةُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সাক্ষাতকারীগণ

لَاتَجْزِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج.ز.ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে পরিশোধ করতে পারবে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ : এখানে اَوْفُوْا ফে'ল فاعل আর بِعَهْدِىْ হলো متعلق অতঃপর ফে'ল فاعل ও متعلق মিলে شرط আর اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ হলো جواب شرط অতঃপর উভয় মিলে جملة شرطية হয়েছে।

قوله وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ : এখানে اَقِيْمُوا ফে'ল ফা'য়েল আর الصَّلٰوةَ হলো مفعول অতঃপর ফে'ল فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَةَ فِعْلِيَّة হয়ে معطوف عليه, واو হলো حرف عطف আর وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ হলো معطوف তৎপর معطوف عليه আর معطوف মিলে جُمْلَةَ عَاطِفَة হলো।

قوله وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ : এখানে واو حاليه, اَنْتُمْ হলো مُبْتَدَا, تَتْلُوْنَ হলো ফে'ল ও ফা'য়েল, আর اَلْكِتَابَ হলো مفعول به অতঃপর ফে'ল-ফা'য়েল ও মাফউল মিলে جملة فعلية হয়ে خبر হলো اَنْتُمْ-এর। অতঃপর مبتدا ও خبر মিলে جُمْلَةَ اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়ে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে।

قوله وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل, هُمْ যমীর اسم ان, আর اِلَيْهِ হলো متعلق مقدم পরবর্তী رَاجِعُوْنَ শিবহে ফে'লের। অতঃপর رَاجِعُوْنَ স্বীয় متعلق مقدم মিলে خَبَر اَنَّ। অতঃপর ان স্বীয় اسم ও خَبَرْ মিলে جُمْلَةَ اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (٤٩)

অনুবাদ : (৪৯) আর যখন তোমাদেরকে মুক্তি দিলাম ফেরাউনের দল হতে যারা তোমাদেরকে কঠোর যন্ত্রণা দেওয়ার মানসে থাকত, হত্যা করত তোমাদের পুত্র-সন্তানদের এবং জীবিত রাখত তোমাদের মেয়ে-সন্তানদেরকে এবং এতে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে অতি বড় পরীক্ষা ছিল।

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (٥٠)

(৫০) আর যখন আমি বিভক্ত করেছিল তোমাদের জন্য দরিয়া শূরকে [লোহিত সাগর] অনন্তর তোমাদেরকে উদ্ধার করলাম, আর ডুবিয়ে দিলাম ফেরাউনের দলকে আর তোমরা প্রত্যক্ষ করছিলে।

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ (٥١)

(৫১) আর যখন আমি ওয়াদা করেছিলাম মূসার সাথে চল্লিশ রাত্রির, অনন্তর তোমরা স্থির করলে বাছুর-পূজা মূসার [তূরে যাওয়ার] পর, আর তোমরা ছিলে সীমালঙ্ঘনে দৃঢ়।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٥٢)

(৫২) তবুও তেমাদের ক্ষমা করলাম এত বড় ব্যাপারের পরেও, যাতে তোমরা শোকর করবে।

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (٥٣)

(৫৩) আর যখন আমি প্রদান করলাম মূসাকে কিতাব এবং মীমাংসার বস্তু, যাতে তোমরা ঠিক পথে চলবে।

শাব্দিক অনুবাদ

৪৯. وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ আর যখন তোমাদেরকে মুক্তি দিলাম مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের দল হতে يَسُوْمُوْنَكُمْ যারা তোমাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ার মানসে থাকত سُوْٓءَ الْعَذَابِ কঠোর যন্ত্রণা يُذَبِّحُوْنَ হত্যা করত اَبْنَآءَكُمْ তোমাদের পুত্র-সন্তানদের وَيَسْتَحْيُوْنَ এবং জীবিত রাখত نِسَآءَكُمْ তোমাদের মেয়ে-সন্তানদেরকে وَفِيْ ذٰلِكُمْ এবং তোমাদের জন্য এতে ছিল بَلَآءٌ পরীক্ষা مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে عَظِيْمٌ অতি বড়।

৫০. وَاِذْ فَرَقْنَا আর যখন আমি বিভক্ত করেছিলাম بِكُمُ তোমাদের জন্য الْبَحْرَ দরিয়া শূরকে [লোহিত সাগর] فَاَنْجَيْنٰكُمْ অনন্তর তোমাদেরকে উদ্ধার করলাম وَاَغْرَقْنَآ আর ডুবিয়ে দিলাম اٰلَ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের দলকে وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ আর তোমরা প্রত্যক্ষ করছিলে।

৫১. وَاِذْ وٰعَدْنَا আর যখন আমি ওয়াদা করেছিলাম مُوْسٰٓى মূসার সাথে اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً চল্লিশ রাত্রির ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ অনন্তর তোমরা স্থির করলে الْعِجْلَ বাছুর-পূজা مِنْۢ بَعْدِهٖ মূসার [তূরে যাওয়ার] পর وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ আর তোমরা ছিলে সীমালঙ্ঘনে দৃঢ়।

৫২. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ তবুও তেমাদের ক্ষমা করলাম مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ এত বড় ব্যাপারের পরেও لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আশা ছিল তোমরা শোকর করবে।

৫৩. وَاِذْ اٰتَيْنَا আর যখন আমি প্রদান করলাম مُوْسَى মূসাকে الْكِتٰبَ কিতাব وَالْفُرْقَانَ এবং মীমাংসার বস্তু لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ আশা ছিল তোমরা ঠিক পথে চলবে।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (٥٤)

অনুবাদ : (৫৪) আর যখন মূসা বলল, নিজ কওমকে, হে আমার কওম! নিশ্চয় তোমরা নিজেদের ভয়ানক ক্ষতি করলে এই বাছুর [পূজা] সাব্যস্ত করণ দ্বারা, সুতরাং এখন তোমরা তওবা কর নিজেদের স্রষ্টার সমীপে, তৎপর তোমরা হত্যা কর একে অন্যকে; এটা তোমাদের জন্য হিতকর হবে তোমাদের স্রষ্টার সমীপে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের তওবা কুবল করলেন; নিশ্চয় তিনি এরূপই যে, তওবা কবুল করে থাকেন এবং করুণা বর্ষণ করেন।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (٥٥)

(৫৫) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা কখনো ঈমান আনব না তোমার কথায়, যাবৎ না আল্লাহকে দেখতে পাই প্রকাশ্যে, অতঃপর তোমাদের উপর বাজ পড়ল এবং তোমরা দেখছিলে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٥٦)

(৫৬) অনন্তর তোমাদের জীবিত করলাম তোমাদের মৃত্যুর পর, যাতে তোমরা শোকর করবে।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٥٧)

(৫৭) আর ছায়া স্বরূপ করলাম তোমাদের উপর মেঘকে এবং পাঠালাম তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া; তোমরা খাও, তার উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ হতে যা কিছু আমি তোমাদেরকে দান করেছি; আর তারা আমার কোনো অনিষ্ট করেনি পরন্তু নিজেদেরই অনিষ্ট করছিল।

শাব্দিক অনুবাদ

৫৪. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى আর যখন মূসা বলল لِقَوْمِهٖ নিজ কওমকে يٰقَوْمِ হে আমার কওম! اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ নিশ্চয় তোমরা ভয়ানক ক্ষতি করলে اَنْفُسَكُمْ নিজেদের بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ এই বাছুর [পূজা] সাব্যস্ত করণ দ্বারা فَتُوْبُوْٓا সুতরাং এখন তোমরা তওবা কর اِلٰى بَارِئِكُمْ নিজেদের স্রষ্টার সমীপে فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ তৎপর তোমরা হত্যা কর একে অন্যকে ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ এটা তোমাদের জন্য হিতকর হবে· عِنْدَ بَارِئِكُمْ তোমাদের স্রষ্টার সমীপে فَتَابَ عَلَيْكُمْ অতঃপর আল্লাহ তোমাদের তওবা কুবল করলেন اِنَّهٗ নিশ্চয় هُوَ التَّوَّابُ তিনি এরূপই যে, তওবা কবুল করে থাকেন الرَّحِيْمُ এবং করুণা বর্ষণ করেন।

৫৫. وَاِذْ قُلْتُمْ আর যখন তোমরা বললে, يٰمُوْسٰى হে মূসা! لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ আমরা কখনো ঈমান আনব না তোমার কথায় حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ যাবৎ না আল্লাহকে দেখতে পাই جَهْرَةً প্রকাশ্যে فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ অতঃপর তোমাদের উপর বাজ পড়ল وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ এবং তোমরা দেখছিলে।

৫৬. ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ অনন্তর তোমাদের জীবিত করলাম مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ তোমাদের মৃত্যুর পর لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আশা ছিল যে, তোমরা শোকর করবে।

৫৭. وَظَلَّلْنَا আর ছায়া স্বরূপ করলাম عَلَيْكُمُ তোমাদের উপর الْغَمَامَ মেঘকে وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ এবং পাঠালাম তোমাদের নিকট الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى মান্না ও সালওয়া كُلُوْا তোমরা খাও مِنْ طَيِّبٰتِ তার উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ হতে مَا رَزَقْنٰكُمْ যা কিছু আমি তোমাদেরকে দান করেছি; وَمَا ظَلَمُوْنَا আর তারা আমার কোনো অনিষ্ট করেনি وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ পরন্তু নিজেদেরই অনিষ্ট করছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اٰلِ فِرْعَوْنَ -এর পরিচয় : আমালেকা বংশোদ্ভূত এককালীন মিসরীয় নৃপতিদের فِرْعَوْن উপাধি ছিল। যেমন রোমের বাদশার উপাধি কায়সার, পারস্যের বাদশার উপাধি কিসরা, ইয়েমেনের বাদশাহের উপাধি তুব্বা এবং হাবশার বাদশাহের উপাধি ছিল নাজ্জাশী। দ্বিতীয় রেসিসিস ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর সমসাময়িক ফেরাউন। আরবীয়দের কাছে সে ওয়ালীদ ইবনে মাস'য়াব ইবনে রাইয়ান নামে পরিচিত ছিল। কেউ কেউ বলেন, সাম'য়াব ইবনে রাইয়ান। এখানে فِرْعَوْن দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কালীন ফেরাউনসহ তার প্রজাপুঞ্জকে বুঝানো হয়েছে। এখানে اٰلَ فِرْعَوْنَ উক্তিতে فِرْعَوْن অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত। –[ইবনে কাছীর]

কেউ কেউ বলেন, اٰلَ فِرْعَوْنَ -এর অর্থ شَخْصِيَّة তথা ফিরাউনের নিজ ব্যক্তিত্ব। এ ক্ষেত্রে তার কথা উল্লেখের স্থলে তার অনুসারীদের উল্লেখ করণকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। –[বায়যাবী]

قوله يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা : হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে ইসরাঈল বংশের চরম অবনতি ঘটেছিল। ফেরাউন গোষ্ঠী তাদেরকে দাসরূপে পরিণত করেছিল। তদুপরি একদা ফেরাউন স্বপ্নে দেখে যে, বায়তুল মাকদিসের দিক হতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে মিশরের প্রত্যেক কিবতীদের ঘরে প্রবেশ করছে কিন্তু ইসরাঈল বংশের কারো ঘরে তা প্রবেশ করছে না। তার স্বপ্নটির এরূপ তাবীর করা হয়েছিল যে, ইসরাঈল বংশে একে মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন যাঁর হাতে তার প্রভুত্ব ও অহংকারের অবসান ঘটবে। তিনি তার 'খোদা' দাবির উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। তাই অভিশপ্ত ফেরাউন অধ্যাদেশ জারি করে যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যেসব মহিলা গর্ভবতী হবে তাদের সরকারিভাবে দেখাশোনা করা হবে। যদি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করতে হবে। আর কন্যা সন্তান জন্মালে তাকে জীবিত রাখতে হবে। তার আদেশ অনুসারে বনী ইসরাঈলের ১২০০ শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল। ফেরাউনের এটাও আদেশ ছিল যে, বনী ইসরাঈলকে বিনা পারিশ্রমিকে কঠিন কাজে নিযুক্ত করতে হবে; দুঃসাধ্য কাজ তাদের উপর চাপিয়ে দিতে হবে।

আল্লামা সুয়ূতীসহ আরো অনেকের মতে এমন মহান ব্যক্তিত্বের জন্মের সংবাদ ফেরাউনকে কতক জ্যোতিষী দিয়েছিল।

হযরত মূসা (আ.)-এর জন্ম : বনী ইসরাঈলদের ভীষণ দুর্দিনে হযরত মূসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইমরান ইবনে মা'ছান অথবা ইমরান ইবনে কামাত। মাতার নাম ইউকাবাদ। তাঁর বংশ পরম্পরা ৫ম পুরুষে গিয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.) -এর সাথে মিলিত হয়। তাঁর জন্মের পর তিন মাস পর্যন্ত তিনি আপন মাতা কর্তৃক গোপনে লালিত পালিত হন। অতঃপর ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে একটি বাক্সে পুরে নদীতে ভাসিয়ে দেন। মহান আল্লাহর অপার মহিমায় বাক্সটি স্রোতের তালে তাল মিলিয়ে ফেরাউনের প্রসাদ সম্মুখস্থ নদীর ঘাটে গিয়ে উপনীত হয়। ফেরাউনের স্ত্রী মহিয়সী আছিয়া বা তার পরিবারস্থ কেউ হযরত মূসা (আ.)-কে বাক্স থেকে উদ্ধার করে সযত্নে প্রতিপালন করেন। ঘটনাক্রমে হযরত মূসার মাতাই তাঁর ধাত্রী নিযুক্ত হন। ফেরাউনের প্রাসাদেই হযরত মূসা (আ.) প্রতিপালিত ও বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর অন্তরে স্বজাতি প্রীতি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। একদা মূসা জনৈক কিবতীকে কোনো এক ইসরাঈলীর প্রতি অত্যাচার করতে দেখে উত্তেজিত হয়ে কিবতীকে চপেটাঘাত করেন, এতে হতভাগ্য কিবতী মৃত্যুবরণ করে। আরেক দিন অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে হযরত মূসা ইসরাঈলী ব্যক্তিটিকে প্রথমে ভর্ৎসনা করে অতঃপর কিবতীর প্রতি হাত বাড়াতেই ইরাঈলী ব্যক্তিটি মনে করল যে, মূসা হয়তো বিরক্ত হয়ে আজ আমাকেই হত্যা করবে। তাই সে ভয়ে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে যে, তুমি আমায় হত্যা করো না, যেমনটি কাল এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে। ফেরাউনের দরবারের এক শুভাকাঙ্ক্ষী পদস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে মূসা (আ.) তাঁর প্রাণ দণ্ডের আদেশ শুনে লোকটির পরামর্শ মোতাবেক মিসর ত্যাগ করে মাদইয়ান শহরে হিজরত করেন। তথায় হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কন্যা হযরত সফুরাকে বিবাহ করে দশ বছর সেখানে অবস্থান করেন। –[কাসাসুল কুরআন]

হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি ও পরবর্তী ঘটনা

হযরত মূসা (আ.) মাদইয়ান থেকে মিসর প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে তূরে সাইনা পর্বত চূড়ায় খোদায়ী জ্যোতি দর্শন পূর্বক আল্লাহর প্রত্যক্ষ বাণী ও করুণা লাভ করে আপন সহোদর ভ্রাতা হারূনসহ নবুয়ত লাভ করেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে ফেরাউন গোষ্ঠীর নির্যাতন থেকে ইসরাঈল জাতির মুক্তির জন্য মিসর প্রত্যাগমন করেন . অতঃপর ভ্রাতা হারূনকে নিয়ে ফেরাউনের দরবারে উপস্থিত হয়ে সত্য ধর্মের দাওয়াত প্রদান করেন এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্তি প্রদানের দাবি পেশ করেন; কিন্তু তা গৃহীত না হওয়ায় তিনি আল্লাহর প্রত্যাদেশানুযায়ী নবুয়তের মু'জিযা স্বরূপ নিজ হাতের আলোক প্রতিফলনের অলৌকিক শক্তি এবং বিস্ময়কর শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতি প্রদর্শন করেন। ফেরাউন তা দর্শনে চমৎকৃত হয়ে এটাকে জাদুচক্র মনে করতঃ মিসরের প্রধান জাদুকরদেরকে একত্র করে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিযোগিতা করার আহবান জানায়। হযরত মূসা (আ.) নবুয়তী শক্তির মাধ্যমে জাদুকরদের প্রদর্শিত খেলা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিলে সমস্ত জাদুকর তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং সত্যধর্ম গ্রহণ করে। এতে ফেরাউনের হিংসা ও আক্রোশ আরো বৃদ্ধি পায়। সে ইসরাঈল সম্প্রদায়ের প্রতি আরো কঠোর হয়। তখন হযরত মূসা (আ.) অলৌকিক শক্তি বলে ফেরাউনের সাথে অত্যাচারী মিসরিদের শাস্তি প্রদান করেন। সে শাস্তি ছিল অতি বিস্ময়কর। কখনো মিসরের নদ-নদী ও জলাশয়সমূহে রক্তস্রোত বয়ে যেত, কখনো ব্যাঙ, জোঁক, মশা, মাছি প্রভৃতি নানা জাতীয় ছোট জীব ও কীট পতঙ্গের উপদ্রবে দেশবাসী অস্থির হয়ে উঠত। কখনো নানা রোগ ব্যাধিতে মিসরের জনগণ আক্রান্ত হয়ে পড়ত। তথাপিও ফেরাউনের ধর্মদ্রোহীতা কমলো না। বনী ইসরাঈলকে দাসত্ব হতে মুক্তি দিতেও সে রাজি হলো না। তারপর আরো ভয়াবহ শাস্তি অবতীর্ণ হতে লাগল-বিষাক্ত ধূলিঝড়, গাঢ় অন্ধকার, বজ্র বিদ্যুৎ, শিলা বৃষ্টি, ব্যাপক হারে আকস্মিক মৃত্যু, সংক্রামক ব্যাধি পরিবেশকে বিভীষিকাময় করে তুলল। কিন্তু বনী ইসরাঈল এ সকল বিপদ থেকে নিশ্চিতভাবে নিরাপদে ছিল। উপর্যুপরি বিপদে যখন মিসর রাজ্য ধ্বংসের-সম্মুখীন, তখন দেশবাসীর অভিযোগ ও ফরিয়াদে ফেরাউন হযরত মূসা (আ.) কে বনী ইসরাঈলসহ মিসর ত্যাগ করার আদেশ জারি করে। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করে কেনানের দিকে যাত্রা করলে ফেরাউনের অন্তরে প্রতি হিংসার দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং স্বসৈন্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

বনী ইসরাঈলের মুক্তি ও ফেরাউনের ধ্বংস : আমর ইবনে মাইমূন আওদী (র.) বলেন, যখন হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে ফেরাউনের জুলুম হতে আত্মরক্ষার জন্য কিনানের উদ্দেশ্যে বের হন এবং এ সংবাদ ফেরাউন জানতে পারে, তখন সে ঘোষণা করে দেয় যে, প্রত্যুষে যখন মোরগ ডাকবে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সকলে বের হয়ে তাদেরকে ধরে হত্যা করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় সেদিন ভোর পর্যন্ত মোরগ ডাকে নি। রাত্রি শেষে মোরগের আওয়াজ শোনার পর ফেরাউন একটি বকরি জবাই করে, ঘোষণা করল যে, আমার এ বকরির কলিজা খাওয়া শেষ হওয়ার পূর্বে অস্ত্র-সজ্জিত ছয় লক্ষ্য কিবতী সৈন্য আমার নিকট উপস্থিত হওয়া চাই। কথামতো সৈন্য হাজির হয়। এ বিরাট বাহিনীসহ ফেরাউন শান-শওকতে বের হয়। তারা নীল নদ বা জর্দান নদীর তীরে বনী ইসরাঈলের কাছাকাছি পৌছে যায়। তখন বনী ইসরাঈলের জন্য বিরাট সংকট। পশ্চাদপসরণ করলে ফিরাউনের তলোয়ারের আঘাতে মরতে হবে: সামনে অগ্রসর হলে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।

তখন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ওহীর মাধ্যমে আদশে এলো যে, তুমি স্বীয় লাঠি দ্বারা নদী পৃষ্ঠে আঘাত হান। লাঠি দ্বারা আঘাত হানা মাত্র নদীর তলদেশ দিয়ে বারটি রাস্তা হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) তাঁর অনুসারীদেরসহ সেই পথ ধরে পার হয়ে গেলেন। ফেরাউন ও তাঁর অনুসারীরা যখন তাদেরকে পার হতে দেখল তারা সে পথে ঘোড়া চালিয়ে দিল। যখন তারা মাঝপথে আসল, আল্লাহ তা'আলা পানিকে মিলিত হয়ে যাওয়ার হুকুম করলেন, তখন সেখানে তাদের সবার সলিল-সমাধি ঘটলো। বনী ইসরাঈল আল্লাহর কুদরতের এ দৃশ্য কিনারায় দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত হলো। আল্লাহ তা'আলার فَأَنْجَيْنٰكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ এ ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করে। –[হাক্কানী, ইবনে কাসীর]

قوله وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ -এর ব্যাখ্যা : পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা মহা হৃদয় বিদারক কাজ। এর মধ্যে রয়েছে বিরাট ধৈর্যের পরীক্ষা। পাশাপাশি যখন কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখা হয় তখন তাতে থাকে ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষার পরীক্ষা। বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে তারা তখন সতীত্ব রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর বিপদ-মসিবত থেকে মুক্তি দান মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ ও নিয়ামত। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরীক্ষা।

مَعْنَى الْبَلَاءِ (بَلَاءٌ)-এর অর্থ : بَلَاءٌ শব্দটি একবচন, বহুবচন بَلَايَا। আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, بَلَاءٌ শব্দের অর্থ পরীক্ষা। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুজাহিদ, ইবনে আবূ আলিয়া এবং সুদ্দী (র.) বলেন, এ আয়াতে بَلَاءٌ শব্দের অর্থ নিয়ামত প্রদান, মেহেরবানি, অনুগ্রহ। আল্লামা বায়যাভী (র.) বলেন, ذٰلِكُمْ ইসমে ইশারা দ্বারা যদি ফেরাউন সম্প্রদায়ের নির্যাতনমূলক কাজের দিকে ইঙ্গিত করা হয় তখন তার অর্থ হবে পরীক্ষা। আর যদি نجاة - এর দিকে ইঙ্গিত করা হয় তখন উহার অর্থ হবে নিয়ামত তথা অনুগ্রহ।

قوله وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিলেন, আর ফেরাউন বংশধরকে ডুবিয়ে মারলেন। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার আদেশে স্বীয় দলসহ সাগরের পানি ফাঁকাকৃত রাস্তা দিয়ে পর হয়ে গেলেন। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ফেরাউন তার দলসহ উক্ত পথে নেমে পড়লে উভয়দিক থেকে পানি এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দিল।

قوله وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً -এর ব্যাখ্যা : যখন আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন সম্প্রদায়কে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে বনী ইসরাঈলকে তার কবল থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে আসমানি গ্রন্থ তাওরাত দানের অঙ্গীকার প্রদান করেন এবং এর জন্য একটি সময়ও নির্ধারণ করেন। তা ছিল পূর্ণ জিলকাদ মাস ও জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন। মোট চল্লিশ দিন। অধিকাংশ তাফসীর বিশারদ وٰعَدْنَا শব্দকে বাব مُفَاعَلَةٌ থেকে পড়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে কিতাব প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন, হযরত আর মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে তূর পাহাড়ে ৪০ দিন অবস্থানের অঙ্গীকার করেছিলেন।

আর আয়াতে أَرْبَعِينَ لَيْلَةً দ্বারা পূর্ণ চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি উদ্দেশ্য। আরবি মাসের প্রারম্ভ রাত্রি হতে ধরা হয় এ কারণে أَرْبَعِينَ يَوْمًا না বলে أَرْبَعِينَ لَيْلَةً বলা হয়েছে। –[বায়যাবী]

قوله اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে অবস্থান কালে সামেরী কতৃক গো-বৎস তৈরিকরণ ও জাতির পক্ষ থেকে উহার পূজা-অর্পণের ঘটনার প্রতি আয়াতটি ইঙ্গিত করে। তবে এখানে সমস্ত বনী ইসরাঈল উদ্দেশ্য নয়, বরং হযরত হারূন (আ.)-এর বার হাজার সঙ্গী অথবা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে যে ৭০ জন তূর পাহাড়ে গিয়েছিলেন তারা ব্যতীত অন্যান্য বনী ইসরাঈল উদ্দেশ্য। –[রূহুল মা'আনী]

গো-বৎসের ঘটনা : যখন হযরত মূসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) এক মাসের ওয়াদা করে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট স্বীয় ভাই হযরত হারূন (আ.)-কে স্থলাভিষিক্ত করে 'তূরে সীনা' যান। হযরত মূসা (আ.) এক মাসের মধ্যে ফিরে না আসায় ক্ষীণ বিশ্বাসী ইহুদিরা বিচলিত হয়ে পড়ে। এ সুযোগ 'সামিরী' নামক জনৈক গো-বৎস পূজারী সুকৌশলে ইহুদিদের নিকট থেকে সোনা-গয়না সংগ্রহ করে সেগুলো দ্বারা সুদর্শনীয় গো-বৎস প্রতিমূর্তি তৈরি করে। সে একজন সুনিপুণ স্বর্ণকার হিসেবে এ কাজটি অনায়াসে ও চমৎকাররূপে সম্পাদন করে। কথিত আছে যে, উক্ত 'সামিরী' হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পদদলিত সামান্য মৃত্তিকা পূর্ব থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিল। সেগুলো উক্ত গো-বৎস প্রতিমূর্তির ভেতর ঢুকিয়ে দিলে সেটা হাম্বা-হাম্বা ডাকতে থাকে। তখন সে ইহুদিদেরকে এই বলে প্ররোচিত করে যে, উক্ত গো-বৎসের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আবির্ভূত হয়েছেন। আর এদিকে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ পাননি এবং তিনি তথায় ইন্তেকাল করেছেন। ফলে ইহুদিরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং হযরত হারূন (আ.)-এর বাধা উপেক্ষা করে গো-বৎস পূজা আরম্ভ করে দিল।

অতঃপর হযরত মূসা (আ.) চল্লিশ দিন পর মহান রাব্বুল আলামীনের আদেশে 'তাওরাত' গ্রন্থ লাভ করে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসেন। হযরত মূসা (আ.) নিজের সম্প্রদায়ের গো-বৎস পূজা দেখে রাগান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি গো-বৎসটি আগুনে পুড়িয়ে সেটার ছাই নদীতে ভাসিয়ে দেন। এতে বনী ইসরাঈল লজ্জিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

বনী ইসরাঈলকে ক্ষমা ঘোষণা : হযরত মূসা (আ.) সমগ্র জাতির মধ্য হতে ৭০ ব্যক্তিকে বেছে নেন এবং বলেন, 'তোমরা গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে নাও, আমি তোমাদেরসহ আল্লাহর নিকট যাব এবং তোমাদের আবেদন তাঁর নিকটই পেশ করব।' তারা হযরত মূসার সাথে তূর পর্বতে গমন করার পর তিনি আল্লাহর নিকট আরজ করেন– 'হে আল্লাহ! বনী ইসরাঈলরা গো-বৎস পূজা হতে তওবা করেছে, আপনি তাদের ঐ গুনাহের শাস্তি ঠিক করে দিন।' হুকুম হলো–'একে অপরকে হত্যা করতে হবে।' গো-বৎস পূজারীগণ এবং যারা নীরব ছিল, তারা ঘর হতে বের হয়ে একটি মাঠে গর্দান পেতে দিল। যারা গো-পূজা হতে নিষেধ করেছিল তারা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াল; কিন্তু এতে আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে একে অন্যকে হত্যা করতে পারছিল না।

এ জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অন্ধকার নেমে এলো, যাতে একে অন্যকে দেখতে না পায়। তখন পিতা পুত্রকে, ভাই ভাইকে হত্যা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার লোক নিহত হয়ে গেল। তখন বনী ইসরাঈলের বিবি, বাচ্চা এবং হযরত মূসা ও হারূন (আ.) সবাই ক্রন্দন করতে আরম্ভ করেন, আর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিহতদের ক্ষমা করে দেন এবং বাকিদের তওবা কবুল করে নেন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قوله وَأَنتُمْ ظٰلِمُونَ -এর মধ্যকার ظُلْم দ্বারা উদ্দেশ্য : وَاَنْتُمْ ظَالِمُوْنَ বাক্যে ظُلْم দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য। কেননা বনী ইসরাঈল গো-বৎস পূজার মাধ্যমে ইবাদতকে যথাস্থান থেকে পরিবর্তন করেছিল। আর ظُلْم বলা হয় وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهٖ তথা কোনো বস্তুকে অপাত্রে রাখা।

কারো মতে সামেরীর কাজে তাদের বাধা প্রদান না করাকেই আয়াতে ظُلْم বলা হয়েছে।

فُرْقَانْ ও كِتَابْ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে كِتَابْ দ্বারা তাওরাত কিতাব উদ্দেশ্য। আর فُرْقَانْ দ্বারা কি উদ্দেশ্য, তা নিয়ে তাফসীরবিশারদদের একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন, فُرْقَانْ দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য। তাওরাতকে কিতাব ও ফুরকান বলা হয়েছে। কেননা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত গ্রন্থ যা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী উজ্জ্বল প্রমাণ।

২. ইবনে বারা বলেন, এর দ্বারা হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী শরিয়ত উদ্দেশ্য।

৩. মুজাহিদ (র.) বলেন, فُرْقَانْ দ্বারা হক ও বাতিল অথবা কুফর ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ উদ্দেশ্য।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সাহায্য উদ্দেশ্য যদ্দারা শত্রু এবং বন্ধুর মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়। এ জন্যই বদরের দিনকে يَوْمَ الْفُرْقَانِ বলা হয়েছে।

৫. কেউ কেউ বলেন, কুরআন উদ্দেশ্য।

৬. কারো কারো মতে এখানে مُحَمَّدًا শব্দটি উহ্য রয়েছে, মূল ইবারত ছিল এরূপ– اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَمُحَمَّدًا الْفُرْقَانَ

قوله فَتُوْبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ -এর ব্যাখ্যা : তওবা মৌলিকভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারেই হয়ে থাকে। তদুপরি اِلٰى بَارِئِكُمْ বলার কারণ হচ্ছে, তওবার মধ্যে একাগ্রতার সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করা যে, তিনি তোমাদেরকে নিষ্কলুষভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং অবস্থা ও আকৃতির মধ্যে পরস্পরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। কেননা بَارِئْ শব্দটি بَرَاءٌ থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ নিষ্কলুষ করা, সুঠাম আকৃতিতে তৈরি করা। এ শব্দটি দ্বারা রিয়া তথা লৌকিকতার ভাব থেকে তওবাকে মুক্ত রাখার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা তওবার মধ্যে রিয়া থাকা তওবার পরিপন্থি। –[বায়যাবী]

قوله فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** বনী ইসরাঈল গো-বৎস পূজা করে যে পাপে নিমজ্জিত হয়েছিল তা থেকে তওবা প্রসঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসল যে, তোমরা নিজেদেরকে নিজেরাই হত্যা করো। কেননা বনী ইসরাঈলের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে একে অপরকে হত্যা করাই ছিল তওবা।

কারো মতে এখানে বাস্তবিক হত্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং আমিত্ব নষ্ট করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়া এবং কু প্রবৃত্তির দাসত্ব পরিত্যাগ করা উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, যারা গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়নি তাদেরকে পূজারীদের হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

كَيْفِيَّةُ الْقَتْلِ **(হত্যার ধরন) :** আল্লামা বায়যাবী বলেন, বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈল আল্লাহর নির্দেশানুসারে পরস্পরকে হত্যা করার জন্য মাঠে একত্রিত হয়েছিল; কিন্তু একে অন্যকে দেখে আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে হত্যা করতে পারছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঘনঘটার অন্ধকারে তাদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিলেন, যেন তারা পরস্পরকে দেখতে না পায়। অতঃপর তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গেল। অবশেষে হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর দোয়ার বরকতে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেল এবং তাদের তওবা কবুল হলো। এদিন তাদের সত্তর হাজার লোক নিহত হয়েছিল।

ইমাম যুহরী (র.) বলেন, তারা দু'সারিতে দাঁড়িয়ে এক সারি অন্য সারিকে হত্যা করা শুরু করেছিল।

কেউ কেউ বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর সত্তর জন সাথী তাদেরকে হত্যা করেছিল।

دَفْعُ التَّعَارُضِ بَيْنَ اَرْبَعِيْنَ وَثَلٰثِيْنَ **(ত্রিশ ও চল্লিশের দ্বন্দ্ব নিরসন):** وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً কালামটি প্রমাণ করে যে, সর্বপ্রথম ওয়াদা চল্লিশ দিনের ছিল। অথচ সূরা আ'রাফে ইরশাদ হয়েছে– وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ এ ভাষ্যটি প্রমাণ করে যে, সর্বপ্রথম ওয়াদা ছিল ত্রিশ দিনের, সুতরাং এ পরস্পর বিরোধ নিরসন হবে কিরূপে?

এর উত্তরে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, প্রাথমিকভাবে ওয়াদা মূলত ত্রিশ দিনেরই ছিল, পরে আবার দশ দিনের ওয়াদা করা হয়েছে। অতএব, উভয় ওয়াদা একত্রিতভাবে চল্লিশ দিনেরই হয়ে যায়। যেমন হয়েছে–

ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

قوله لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً **আয়াতের ঘটনা :** হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বত হতে তাওরাত আনয়ন করে বনী ইসলাঈলের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, 'এটা আল্লাহর অবতারিত কিতাব'। তাদের মধ্য হতে কোনো কোনো দুষ্টলোক তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'যদি আল্লাহ স্বয়ং না বলে তাবে আমরা এটা মেনে নেব না, তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বলেন, তোমরা তূর পর্বতে চল, তোমাদের এ বাসনাও পূর্ণ হবে। বনী ইসরাঈল এ কাজের জন্য ৭০ জন লোক নির্বাচন করে, তাদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তূর পর্বতে পাঠায়। তারা তথায় আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে। কিন্তু তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বলতে লাগল যে, আমাদের তো বাণী শ্রবণে তৃপ্তি লাভ হয় না, কে বলছে তা আমরা জানি না; যদি আল্লাহকে দেখতে পাই তবে নিঃসন্দেহে মেনে নেব।'

যেহেতু পার্থিব জগতের আল্লাহকে দেখার সামর্থ্য কারো নেই। কাজেই এ ধরনের ধৃষ্টতা প্রদর্শনের জন্য তাদের উপর বজ্রপাত হলো এবং তারা সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তখন হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন– "হে আল্লাহ! আমি বনী ইসরাঈলের নিকট কি জবাব দেব? এরা তো তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়, যদি আপনার এ ইচ্ছাই ছিল, তবে তাদের পূর্বে আমাকে ধ্বংস করতেন। হে আল্লাহ! আহমকদের অন্যায়ের কারণে আমাকে অভিযুক্ত করবেন না।" তাঁর এ প্রার্থনা কবুল করা হয় এবং তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এরাও মূলত গো-বৎস পূজকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের শাস্তি হয়ে গেল। তারপর তাদেরকে পরপর একের সামনে অপরকে জীবিত করলেন। এ ঘটনার প্রতিই উপরিউক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (বায়ানুল কুরআন, ইবনে কাছীর)

বর্ণিত ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এটা গো-বৎস পূজাজনিত অপরাধের তওবায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের পূর্বেকার ঘটনা। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এটা কতলের পরবর্তী ঘটনা। অর্থাৎ যারা নিহত হয়নি তারাই আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল, ফলে হযরত মূসা (আ.) তাদের বিশেষ বিশেষ সত্তর জনকে তূর পর্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে আয়াতে এমন কোনো নির্দিষ্ট ইঙ্গিত নেই যে, ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল এবং উল্লিখিত সত্তর জন গো-বৎস পূজারী ছিল কি-না। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ সত্তর জনের মৃত্যুর সাথে হযরত মূসা (আ.) -এর মৃত্যু হয়নি। দুটি কারণে–
(১) আল্লাহ এবং মূসা (আ.)- মুখোমুখি কথাবার্তা হচ্ছিল। (২) মূসা (আ.) সম্পর্কে فَلَمَّآ اَفَاقَ বলা হয়েছে। আর ইফাকাহ অর্থ বক্তৃতা অবস্থা থেকে হুঁশে ফিরে আসা, মৃত্যুবরণ থেকে নয়।

اَلصَّاعِقَةُ-এর মর্মার্থ : صَاعِقَةٌ শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে–
(১) হযরত ইবনে জারীর (র.) রবী ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেন যে, صَاعِقَةٌ অর্থ হচ্ছে– জিবরাঈল (আ.)-এর হুঙ্কার ধ্বনি।
(২) ইবনে জারীর (র.) সা'দী থেকে বর্ণনা করেন, আকাশ হতে যে অগ্নি অবতারিত হয়ে বনী ইসরাঈলের সত্তর জনকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল একেই صَاعِقَةٌ বলা হয়েছে। –[বায়যাবী]

لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ এ কথা কারা কাকে বলেছিল? প্রসিদ্ধ মতানুসারে বাক্যটি ঐ সত্তরজন লোকের যারা তাওরাত গ্রহণের সময় মূসা (আ.)-এর সাথে তূর পাহাড়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর স্বগোত্রে ফিরে আসার পর, এমনকি গো-বৎস পূজকদের হত্যা ও গো-বৎসকে জ্বালিয়ে দেওয়ার পর কতিপয় ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল। কারো কারো মতে এ উক্তিকারকদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। কেউ কেউ বলেন, সকল বনী ইসরাঈলই এ উক্তি করেছিল। –[রূহুল মা'য়ানী]

قوله ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ -এর ব্যাখ্যা : এ উক্তিটির সরলার্থ হচ্ছে, "আমি তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করেছি।" এখানে مَوْتٌ শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা বজ্রপাতের ফলে মৃত্যুবরণ করেছিল। পুনরায় জীবিত করার ঘটনা এই যে, বনী ইসলাঈলের প্রেরিত ৭০ জন প্রতিনিধি বজ্রপাতে মৃত্যুবরণ করার পর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন যে, "হে আল্লাহ! আমার জাতি এমনিতেই আমার প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে আসছে। এখন তো তারা বলবে যে, আমি তাদের প্রতিনিধিদেরকে কোথাও নিয়ে কোনো উপায়ে ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং আমাকে তাদের এ অপবাদ হতে পরিত্রাণ প্রদান করুন।" আল্লাহ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে তাদেরকে এক এককে অপরের সামনে জীবিত করে দিলেন। এটাকেই আয়াতে بَعْثٌ বলা হয়েছে। এ উক্তি দ্বারা কিয়ামতের পুনরুত্থান উদ্দেশ্য নয়। কোনো কোনো সময় بَعْثٌ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়াকেও বলা হয়। যেমন আসহাবে কাহফের ব্যাপারে নিদ্রোত্থিত হওয়াকে বলা হয়েছে।

سَبَبُ الصَّاعِقَةِ (বজ্রপাতের কারণ) : বনী ইসরাঈলের প্রতিনিধি দল যখন হযরত মূসা (আ.) কে বলেছিল, আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা ব্যতীত আপনার আনীত এ কিতাবকে বিশ্বাস করতে পারি না। অথচ আল্লাহকে প্রত্যক্ষ দেখা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। অন্যদিকে মু'জিযা প্রদর্শনের পর বিশ্বাস করা ফরজ হয়ে গিয়েছিল। তাদের এ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে অবতারিত অগ্নিবান অথবা জিবরাঈল (আ.)-এর ভয়ংকর হুঙ্কার দ্বারা তাদেরকে সাময়িকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ -এর সংশ্লিষ্ট ঘটনা : এ আয়াতটি দ্বারা তীহ প্রান্তরের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী ইসরাঈলের আদি বাস ছিল শাম, বর্তমান সিরিয়া অঞ্চল। এ সময় 'আমালেকা' নামক এক শক্তিশালী জাতি শাম অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। ফেরাউনের থেকে মুক্তিদানের পর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের আদি নিবাস পবিত্র ভূমি শামকে আমালেকাদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার আদেশ প্রদান করেন। এ উদ্দেশ্যে তারা শামের দিকে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তারা যখন শামের উপকণ্ঠে পৌঁছে, তখন ১২ জন প্রতিনিধির মাধ্যমে তারা আমালেকা সম্প্রদায়ের শৌর্য বীর্য ও বীরত্বের কথা শ্রবণ করে মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং জিহাদের অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করত হযরত মূসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলে, "তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আমরা

এখানে অবস্থান করছি।" আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে তীহ প্রান্তরে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর আত্মভোলা ও দিকভ্রান্ত অবস্থায় অতিবাহিত করার শাস্তি নাজিল করেন। তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ। এ প্রান্তরে তাদের বিশোর্ধ্ব বয়সের সমস্ত লোক ইন্তেকাল করে। হযরত মূসা এবং হারুন (আ.) ও এখানেই ইন্তেকাল করেন। সেখানে কোনো ছায়া ছিল না। ফলে মেঘমালার দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে ছায়া দান করেছিলেন। وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

تِيْهٌ-এর পরিচয় : তীহ শব্দের অর্থ– জ্ঞান বুদ্ধিহীন, দিশাহারা ও দিকভ্রম হওয়া। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় যে মরুপ্রান্তরে দিকভ্রম অবস্থায় পতিত হয়েছিল, উহাকেই তীহ প্রান্তর বলা হয়। তা সিরিয়া ও সিনাই অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এ প্রান্তরে তারা প্রখর রৌদ্র-তাপের অভিযোগ করলে আল্লাহ তা'আলা একটি হালকা মেঘ খণ্ড দ্বারা তাদেরকে ছায়া দানের ব্যবস্থা করেন। রাতের বেলায় অন্ধকারের অভিযোগ করলে আকাশ হতে একটি উজ্জ্বল অগ্নি পিণ্ড অন্ধকার দূর করার জন্য চলে আসত। এ প্রান্তরে তাদের পরিহিত বস্ত্র পুরাতন হয়নি; বরং সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ছিল।

অতঃপর তাদের ক্ষুধা অনুভূত হলে আল্লাহ তা'আলা লতা-পাতার উপর তুরঞ্জবীন (মান্না) উৎপন্ন করে দেন, যা সুবহে সাদেক থেকে ফজর পর্যন্ত বরফের মতো অবতরণ করত। তারা তা কুড়িয়ে আনত এবং ভরত (সালওয়া) পাখিসমূহ তাদের নিকট সমবেত হতো। এ দু'জাতীয় উৎকৃষ্ট খাদ্য তারা তৃপ্তিসহকারে ভক্ষণ করত। তাদের প্রতি এ নির্দেশ ছিল যে, "তোমরা এগুলো প্রয়োজন মতো গ্রহণ করবে; ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে না।" কিন্তু তারা লোভের বশবর্তী হয়ে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে। ফলে সঞ্চিত গোশত পঁচতে থাকে। এ কর্মকাণ্ডকে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিজেদের জন্য অনিষ্টকর বলে ঘোষণা করেন।

غَمَامٌ-এর অর্থ : غَمَامٌ শব্দটি غَمَامَةٌ -এর বহুবচন। মেঘ আকাশকে ঢেকে ফেলে বিধায় غَمَامٌ বলা হয়। আর غَمَامٌ সাদা মেঘকে বলা হয়। তীহ প্রান্তরে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে এ মেঘ দ্বারা ছায়া দান করেছিলেন। অতএব তারা প্রখর রোদের তাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। –[ইবনে কাসীর]

اَلْمَنَّ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْمَنَّ -এর অর্থ নিরূপণে তাফসীরকারদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায়। যেমন–

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে গাছের উপর বনী ইসরাঈলের জন্য মান্না অবতীর্ণ হতো এবং তারা তা নিয়ে ইচ্ছা মতো ভক্ষণ করতো তাকে اَلْمَنَّ বলা হয়।

সুদ্দীর মতে বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিল যে, এখানে আমরা কোথায় খাদ্য পাব? তখন তাদের জন্য আদা গাছের উপর مَنّ অবতীর্ণ করা হয়।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন যে, মান্না তাদের ঘরের উপর বরফের ন্যায় পতিত হতো যা ছিল দুধের চেয়ে শুভ্র ও মধুর চেয়ে মিষ্টি। ভোর থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত তা নাজিল হতো। প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনানুযায়ী আহরণ করতো।

আব্দুর রহমান ইবনে আসলাম বলেন, মান্না হলো মধু। মূলত মুফাসরিরীনদের বক্তব্যানুযায়ী বুঝা যায় যে, কারো মতে মান্না এক প্রকার খাদ্য। কারো মতে পানীয়। তবে এটা এমন এক ঐশী নিয়ামত যা বিনা কষ্টে পাওয়া যেত। পানি ছাড়া ভক্ষণ করলে হতো খাদ্য, আর পানি মিশ্রিত করলে হতো পানীয়। –[ইবনে কাছীর]

সালওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা এক প্রকার পাখি যা তারা ভক্ষণ করত।

হযরত কাতাদাহ্ বলেন, লাল রং-এর পাখী। দক্ষিণা বাতাস এগুলোকে এনে তাদের কাছে একত্রিত করতো। প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজন মতো তা জবাই করে খাওয়ার ব্যবস্থা করতো, প্রয়োজনের বেশি নিতে চাইলে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো।

ইমাম সুদ্দী বলেন, বনী ইসরাঈল যখন তীহ প্রান্তরে গিয়েছিল তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিল, এখানে আল্লাহ তা'আলা مَنّ অবতীর্ণ করেন, যা আদা গাছের উপর পড়ত। আর سَلْوٰى যা ছিল পাখীর ন্যায়, তারা উক্তি পাখী থেকে মোটাগুলো জবাই করতো।

ইবনে জুরাইজ বলেন, কোনো লোক যদি একদিনে দুই দিনের খাদ্য গ্রহণ করতো তাহলে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো। তবে শুধু শুক্রবারে দু'দিনের খাদ্য গ্রহণ করা হতো। কেননা শনিবার ইবাদতের দিন ছিল। –[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ

نَجَّيْنٰكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ অর্থ আমরা নাজাত দিয়েছি, আমরা রক্ষা করেছি। এখানে كُمْ টি ضمير منصوب متصل

اَبْنَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اِبْنٌ অর্থ সন্তানগণ।

يَسْتَحْيُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তারা জীবিত ছেড়ে দিত।

نِسَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اِمْرَأَةٌ এ বহুবচনকে جَمْعٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظ বলে। অর্থ– নারীগণ, স্ত্রীগণ।

فَرَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفَرْقُ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– আমরা বিদীর্ণ করে দিলাম।

التَّوَّابُ : এটি فَعَّالٌ-এর ওজনে মোবালাগার সীগাহ।। বাব نَصَرَ মাসদার تَوْبَةٌ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– অধিক তওবা কবুলকারী, ক্ষমাশীল تَوَّابٌ আল্লাহর মোবারক নাম।

نَرَى : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبت فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– আমরা দেখতে পাব।

جَهْرَةً : শব্দটি বাব فَتَحَ এর মাসদার। অর্থ– প্রকাশ্য।

الصّٰعِقَةُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন صَوَاعِقُ অর্থ– বিজলী, বিদ্যুৎ।

تَنْظُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ن ـ ظ ـ ر) মাসদার اَلنَّظْرُ জিনস صحيح অর্থ– তোমরা দেখছ।

ظَلَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيل মূলবর্ণ (ظ ـ ل ـ ل) মাসদার اَلتَّظْلِيْلُ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমরা তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করে দিয়েছি।

الْغَمَامَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন غَمَامَةٌ অর্থ– মেঘ।

كُلُوْا : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ– (أ ـ ك ـ ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা খাও।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ : এখানে نَجَّيْنَا ফে'ল এবং ফা'য়েল كُمْ যমীর مفعول . আর مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ হলো متعلق অতঃপর ফে'ল ও ফা'য়েল, مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ : এখানে بَلَاءٌ শব্দটি মওসূফ عَظِيْمٌ হলো তার صفت। অতঃপর مبتدأ مؤخر আর فِىْ ذٰلِكُمْ হলো خبر مقدم, অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية.

قوله فَتُوْبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ : এখানে تُوْبُوْا ফে'ল+ফা'য়েল, اِلٰى হলো حرف جار আর بَارِئِكُمْ হলো مجرور অতঃপর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো تُوْبُوْا এর সাথে। অতঃপর ফে'ল+ফা'য়েল ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ : এখানে واو হালিয়া, اَنْتُمْ হলো مبتدأ, আর ظٰلِمُوْنَ হলো خبر অতঃপর مبتدأ এবং خبر মিলে جملة اسمية অতঃপর এ জুমলাটি اِتَّخَذْتُمْ হতে حال হয়ে محلا منصوب হয়েছে।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ (٥٨)

অনুবাদ : (৫৮) আর যখন আমি বললাম, প্রবেশ কর এই জনপদে অতঃপর খেতে থাক তা হতে স্বচ্ছন্দে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা হয় এবং দ্বারদেশে প্রবেশ কর নতশিরে আর বলতে থাক, "তওবা", [ক্ষমা চাই] আমি মাফ করে দিব তোমাদের ভুল ভ্রান্তিসমূহ এবং অতিসত্বরই তদতিরিক্ত আরো দান করব আন্তরিকতার সাথে নেক আমলকারীদেরকে।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (٥٩)

(৫৯) অনন্তর পরিবর্তন করল এই জালেমরা তাদের প্রতি আদিষ্ট শব্দটি তার বিপরীত অপর একটি শব্দ দ্বারা, অতএব আমি নাজিল করেছি সে জালেমদের প্রতি এক আসমানি বিপদ, এজন্য যে, তারা হুকুম অমান্য করছিল।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٦٠)

(৬০) আর যখন মূসা পানি প্রার্থনা করল নিজ কওমের জন্য, তখন আমি বললাম, আঘাত কর তোমার লাঠি দ্বারা অমুক পাথরটিতে; তখনই বের হলো তা হতে বারটি প্রস্রবণ; প্রত্যেকেই জেনে নিল নিজ নিজ পান করার স্থান; খাও এবং পান কর আল্লাহর রিজিক হতে এবং সীমালঙ্ঘন করো না দুনিয়াতে ফ্যাসাদ করে।

ع

শাব্দিক অনুবাদ

৫৮. وَاِذْ قُلْنَا আর যখন আমি বললাম ادْخُلُوْا প্রবেশ কর هٰذِهِ الْقَرْيَةَ এই জনপদে فَكُلُوْا مِنْهَا অতঃপর খেতে থাক তা হতে حَيْثُ شِئْتُمْ যেখানে তোমাদের ইচ্ছা হয় رَغَدًا স্বচ্ছন্দে وَّادْخُلُوْا এবং প্রবেশ কর الْبَابَ দ্বারদেশে سُجَّدًا নতশিরে وَّقُوْلُوْا আর বলতে থাক حِطَّةٌ "তওবা" [ক্ষমা চাই] نَّغْفِرْ لَكُمْ আমি মাফ করে দিব خَطٰيٰكُمْ তোমাদের ভুল ভ্রান্তিসমূহ وَسَنَزِيْدُ এবং অতিসত্বরই তদতিরিক্ত আরো দান করব الْمُحْسِنِيْنَ আন্তরিকতার সাথে নেক আমলকারীদেরকে।

৫৯. فَبَدَّلَ অনন্তর পরিবর্তন করল الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এই জালেমরা قَوْلًا তাদের প্রতি আদিষ্ট শব্দটি غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ তার বিপরীত অপর একটি শব্দ দ্বারা فَاَنْزَلْنَا অতএব আমি নাজিল করেছি عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا সে জালেমদের প্রতি رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ এক আসমানি বিপদ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ এজন্য যে, তারা হুকুম অমান্য করছিল।

৬০. وَاِذِ اسْتَسْقٰى আর যখন মূসা পানি প্রার্থনা করল لِقَوْمِهٖ নিজ কওমের জন্য فَقُلْنَا তখন আমি বললাম اضْرِبْ আঘাত কর بِّعَصَاكَ তোমার লাঠি দ্বারা الْحَجَرَ অমুক পাথরটিতে فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ তখনই বের হলো তা হতে اثْنَتَا عَشْرَةَ বারটি عَيْنًا প্রস্রবণ قَدْ عَلِمَ জেনে নিল كُلُّ اُنَاسٍ প্রত্যেকেই مَّشْرَبَهُمْ নিজ নিজ পান করার স্থান كُلُوْا وَاشْرَبُوْا খাও এবং পান কর مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ আল্লাহর রিজিক হতে وَلَا تَعْثَوْا এবং সীমালঙ্ঘন করো না فِى الْاَرْضِ দুনিয়াতে مُفْسِدِيْنَ ফ্যাসাদ করে।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ (٦١)

অনুবাদ : (৬১) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা একই রকমের খাদ্যের উপর কখনো থাকব না আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করুন, যেন পয়দা করেন আমাদের জন্য এমন খাদ্য যা জমিনে উৎপন্ন হয়– শাক, কাঁকুড়, গম, মসূর এবং পেঁয়াজ, তিনি বললেন, তোমরা কি নিতে চাও নিকৃষ্ট বস্তুসমূহকে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহের বদলে? অবতরণ কর কোনো শহরে, অবশ্য পাবে তোমরা তোমাদের প্রার্থিত দ্রব্যগুলো, আর স্থায়ী হলো তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অধঃপতন, আর যোগ্য হয়ে পড়ল তারা আল্লাহর গজবের; তা এজন্য যে, তারা অমান্য করে যাচ্ছিল আল্লাহর হুকুমসমূহ এবং হত্যা করেছিল নবীগণকে অন্যায়ভাবে; আর তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং বারংবার সীমালঙ্ঘন করেছিল।

শাব্দিক অনুবাদ

৬১. وَاِذْ قُلْتُمْ আর যখন তোমরা বললে يٰمُوْسٰى হে মূসা! لَنْ نَّصْبِرَ আমরা কখনো থাকব না عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ একই রকমের খাদ্যের উপর فَادْعُ لَنَا আপনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন رَبَّكَ আপনার প্রভুর নিকট يُخْرِجْ لَنَا যেন পয়দা করেন আমাদের জন্য এমন খাদ্য مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ যা জমিনে উৎপন্ন হয়– مِنْۢ بَقْلِهَا শাক وَقِثَّآئِهَا কাঁকুড় وَفُوْمِهَا গম وَعَدَسِهَا মসূর وَبَصَلِهَا এবং পেঁয়াজ قَالَ তিনি বললেন اَتَسْتَبْدِلُوْنَ তোমরা কি নিতে চাও الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى নিকৃষ্ট বস্তুসমূহকে بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহের বদলে? اِهْبِطُوْا অবতরণ কর مِصْرًا কোনো শহরে فَاِنَّ لَكُمْ অবশ্য পাবে তোমরা مَّا سَاَلْتُمْ তোমাদের প্রার্থিত দ্রব্যগুলো وَضُرِبَتْ আর স্থায়ী হলো عَلَيْهِمُ তাদের উপর الذِّلَّةُ লাঞ্ছনা وَالْمَسْكَنَةُ ও অধঃপতন وَبَآءُوْ আর যোগ্য হয়ে পড়ল তারা بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহর গজবের ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ তা এজন্য যে তারা كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ অমান্য করে যাচ্ছিল بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুমসমূহ وَيَقْتُلُوْنَ এবং হত্যা করেছিল النَّبِيّٖنَ নবীগণকে بِغَيْرِ الْحَقِّ অন্যায়ভাবে ذٰلِكَ بِمَا আর তা এ কারণে যে عَصَوْا তারা অবাধ্য হয়েছিল وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ এবং বারংবার সীমালঙ্ঘন করেছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জ্ঞাতব্য : শাহ আব্দুল কাদের (র.) -এর বক্তব্যানুসারে এ ঘটনা তীহ উপত্যকায় বসবাসকালে সংঘটিত হয়েছিল। যখন বনী ইসরাঈলের একটানা 'মান্না ও সালওয়া' খেতে খেতে বিস্বাদ এসে গেল এবং স্বাভাবিক খাবারের জন্য প্রার্থনা করল, [যেমন, পরবর্তী চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে], তখন তাদেরকে এমন এক নগরীতে প্রবেশ করতে হুকুম দেওয়া হলো, যেখানে পানাহারে জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পাওয়া যাবে। সুতরাং এ হুকুমটি সে নগরীতে প্রবেশ করা সম্পর্কিত। এখানে নগরীতে প্রবেশকালে কর্মজনিত ও বাক্যজনিত দুটি আদবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ['তওবা তওবা' বলে প্রবেশ করার মধ্যে বাক্যজনিত এবং প্রণত মস্তকে প্রবেশ করার মধ্যে কার্যজনিত আদব]। এ প্রসঙ্গে বড় জোর একথা বলা যাবে যে, ঘটনার পরের অংশটি আগে এবং আগের অংশটি পরে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জটিলতা তখনই হতো, যখন কুরআন মাজীদের ঘটনাই মূখ্য উদ্দেশ্য হতো। কিন্তু যখন ফলাফল বর্ণনাই মূল লক্ষ্য, তখন যদি একটি ঘটনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রত্যেক অংশের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং ফলাফলগুলোর কোনো প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করা হয়, তবে এতে কোনো অংশকে পরে এবং পরের অংশকে আগে বর্ণনা করা হয়, তবে এতে কোনো দোষের কারণ নেই এবং কোনো আপত্তিরও কারণ থাকতে পারে না।

অন্যান্য তাফসীরকারদের মতে এ হুকুম ঐ নগরী সংক্রান্ত ছিল, যেখানে তাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তীহ উপত্যকায় তাদের অবস্থানকাল শেষ হওয়ার পর আবার সেখানে জিহাদ সংঘটিত হয়েছিল এবং সে নগরীর উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় হযরত ইউশা (يُوشَعْ) (আ.) নবী ছিলেন। সে নগরীতে জিহাদের হুকুমটি তাঁরই মাধ্যমে এসেছিল।

প্রথম অভিমত অনুসারে 'মান্না' ও 'ছালওয়া' বর্জন করে সাধারণ খাবার সংক্রান্ত বনী ইসরাঈলের আবেদনকেও পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত। তখন মর্ম দাঁড়াবে এই যে, আবেদনটি তো ধৃষ্টতাপূর্ণই ছিল, কিন্তু তবুও তারা যদি এ শিষ্টাচার [আদব] ও নির্দেশ পালন করেন, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এই উভয় অভিমত অনুযায়ী এ ক্ষমা সকল বক্তার জন্য তো সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে। তদুপরি যারা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে সৎকার্যাবলি সম্পন্ন করবে, তাদের জন্য এছাড়াও অতিরিক্ত পুরস্কার থাকবে।

বাক্যের শব্দগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান : এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, বনী ইসরাঈলকে উক্ত নগরীতে حِطَّةٌ বলতে বলতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা দুষ্টামী করে সে শব্দের পরিবর্তে حِنْطَةٌ বলতে থাকে। ফলে তাদের উপর আসমানি শাস্তি অবতীর্ণ হলো। এই শব্দগত পরিবর্তন এমন ছিল– যাতে শুধু শব্দই পরিবর্তিত হয়ে যায়নি; বরং অর্থও সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গিয়েছিল। حِطَّةٌ অর্থ তওবা ও পাপ বর্জন করা। আর حِنْطَةٌ অর্থ গম। এ ধরনের শব্দগত পরিবর্তন, তা নিঃসন্দেহে এবং সর্ববাদিসম্মতভাবে হারাম। কেননা এটা এক ধরনের تَحْرِيْف তথা শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতিসাধন।

এখন রইল এই যে, অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি রক্ষা করে নিছক শব্দগত পরিবর্তন সম্পর্কে কি হুকুম? ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, কোনো কোনো বাক্যাংশে বা বক্তব্যে শব্দই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মর্ম ও ভাব প্রকাশের জন্য শব্দই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের উক্তি ও বাণীর ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনও জায়েজ নয়। যেমন, আজানের জন্য নির্ধারিত শব্দের স্থলে সমার্থবোধক অন্য কোনো শব্দ পাঠ করা জায়েজ নয়। অনুরূপবাবে নামাজের মাঝে নির্দিষ্ট দোয়াসমূহ। যেমন, ছানা, আত্তাহিয়্যাতু, দোয়ায়ে কুনূত, ও রুকূ-সেজদার তাসবীহসমহ। এগুলোর অর্থ সম্পূর্ণভাবে ঠিক রেখেও কোনো রকম শব্দগত পরিবর্তন জায়েজ নয়। তেমনিভাবে সমগ্র কুরআন মাজীদের শব্দাবলিরও একই হুকুম। অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের সঙ্গে যেসব হুকুম সম্পর্কযুক্ত, তা শুধু ঐ শব্দাবলিতেই তেলাওয়াত করতে হবে, যাতে কুরআন নাজিল হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি এসব শব্দাবলির অনুবাদ অন্য এমন সব শব্দের দ্বারা করে পাঠ করতে থাকে, যাতে অর্থ পুরোপুরিই ঠিক থাকে, তবে একে শরিয়তের পরিভাষায় কুরআন তেলাওয়াত বলা যাবে না। কুরআন পাঠ করার জন্য যে ছওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে, তাও লাভ করতে পারবে না। কারণ কুরআন শুধু অর্থের নাম নয়; বরং অর্থের সাথে সাথে যে শব্দাবলিতে তা নাজিল হয়েছে, তার সমষ্টির নামই কুরআন। আলোচ্য আয়াতের ভাষ্যে দৃশ্যতঃ বুঝা যায় যে, তাদেরকে তওবার উদ্দেশ্যে যে শব্দটি বাতলে দেওয়া হয়েছিল, তার উচ্চারণও করণীয় ছিল; সেগুলোতে পরিবর্তন সাধন ছিল পাপ। আর তারা যে পরবর্তন করেছিল তা ছিল শব্দের সাথে সাথে অর্থেরও পরিপন্থি। কাজেই তারা আসমানি আজাবের সম্মুখীন হয়েছিল।

কিন্তু যে উক্তি ও বাক্যাংশে অর্থই মূল উদ্দেশ্য শব্দ নয়, যদি সেগুলোতে শব্দগত এমন পরিবর্তন করা হয় যাতে অর্থের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহার মতে এ পরিবর্তন জায়েজ। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম আযম (র.)-থেকে ইমাম কুরতুবী উদ্ধৃত করেন যে, হাদীসের অর্থভিত্তিক বর্ণনা জায়েজ, কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই যে, বর্ণনাকারীকে আরবি ভাষায় পারদর্শী হতে হবে এবং হাদীস বর্ণনার স্থান-কাল পাত্র সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকতে হবে– যাতে তার ভুলের কারণে অর্থের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি না হয়।

উল্লিখিত ৬০ তম আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত মূসা (আ.) নিজ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে পানির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ পাক পানির ব্যবস্থা করে দিলেন। পাথরের উপর লাঠির আঘাতের সাথে সাথে প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এতে বুঝা গেল যে, এস্তেস্কা [পানির জন্য প্রার্থনা]-এর মূল হলো দোয়া করা। এ দোয়া কোনো কোনো সময়ে ইস্তেস্কার নামাজের আকারেও করা হয়েছে। যেমন এস্তেস্কার নামাজের উদ্দেশ্যে হুজুর ﷺ-এর ঈদগাহতে তশরিফ নেওয়া এবং সেখানে

নামাজ, খুৎবা ও দোয়া করার কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। আবার কখনো নামাজ বাদ দিয়ে শুধু বাহ্যিক অর্থে দোয়া করেই ক্ষান্ত করেছেন। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর ﷺ জুমার খুৎবায় পানির জন্য দোয়া করেন- ফলে আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

এ কথা সর্ববিধিসম্মত যে, এস্তেসকা নামাজের আকারে হোক বা দোয়া রূপে হোক তা ক্রিয়াশীল ও গুরুত্ববহ হওয়ার জন্য পাপ থেকে তওবা, নিজের দীনতা-হীনতা ও দাসত্বসুলভ আচরণের অভিব্যক্তি একান্ত আবশ্যক। পাপে অটল এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় অনড় থেকে দোয়া করলে তা ক্রিয়াশীল হবে বলে আশা করার অধিকার কারো নেই।

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ এ আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা : এ আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা 'তীহ' প্রান্তে সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী ইসরাঈলরা যখন অত্যধিক পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে, তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট পানির জন্য আবেদন করে। তখন হযরত মূসা (আ.) এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করার জন্য নির্দেশ দেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) উক্ত পাথরে আঘাত করার সাথে সাথে বারোটি প্রস্রবণ সৃষ্টি হয়। বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক ঝরনা সৃষ্টি করা হয়। এটা মহান রাব্বুল 'আলামীনের অফুরন্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশ। আর হযরত মূসা (আ.)-এর জীবন্ত মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা। এরূপ ঘটনাকে মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা বলে। এরূপ ঘটনাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। পর্যটকদের মুখ থেকে শোনা যায় যে, এ পাথরটি এখনো 'সিনাই' উপদ্বীপে রয়েছে. পাথরের গায়ে এখনো প্রস্রবণের উৎস মুখের গর্তগুলো পরিলক্ষিত হয়।

اَلْحَجَرُ-এর পরিচয় : اَلْحَجَرُ একবচন, বহুবচন اَلْأَحْجَارُ অর্থ- পাথর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা একটা চৌকোণা পাথর ছিল, যা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে ছিল। হযরত মূসা (আ.) এর উপর মহান রাব্বুল আলমীনের হুকুমে আঘাত করেছিলেন। এটা এক হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া ছিল। কোনো কোনো মুফাস্সির বলেন, ঐ পাথর ছিল, যার উপর কাপড় রেখে হযরত মূসা (আ.) গোসল করতেন। অথবা যে কোনো পাথর।

আল্লামা যামাখ্শারী (র.) বলেন, নির্দেশ ছিল যে কোনো একটি পাথরের উপর আঘাত করার। নির্দিষ্ট কোনো পাথরের উপর আঘাত করা নয়। কাযী বায়যাবী (র.) বলেন, এ পাথরটি হযরত আদম (আ.) বেহেশত হতে সাথে করে করে নিয়ে এসেছিলেন। কালের পর কাল হাত পরিবর্তন হতে হতে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। অথবা হযরত মূসা (আ.) গোসল করার জন্য যে পাথরের উপর দিগম্বর হয়ে কাপড় রাখতেন। আর আল্লাহর নির্দেশ হযরত মূসা (আ.) প্রতি ইহুদিদের আরোপিত অণ্ডকোষ স্ফীতির অপবাদ দূর করার জন্য পাথরটি তার কাপড় নিয়ে পলায়ন করেছিল এটা সেই পাথর।

قوله لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ -এর সংশ্লিষ্ট ঘটনা : এখানেও বনী ইসরাঈলদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা 'তীহ' প্রান্তরে সংঘটিত হয়েছিল। মহান রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ স্বরূপ বনী ইসরাঈলদের প্রতি প্রেরিত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' ভক্ষণ করতে করতে ইহুদিরা যখন সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল, তখন তারা নিজেদের প্রকৃতিগত অবাধ্যতা অবলম্বন করে হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, একই প্রকার খাদ্যে আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না। অতএব, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট বলুন, তিনি যেন আমাদের জন্য মিশরবাসীদের খাদ্যের ন্যায় নানাপ্রকার খাদ্য উৎপাদন করেন। উত্তরে হযরত মূসা (আ.) বলেন, উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে নিকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ যদি তোমাদের লোভনীয় হয়, তবে কোনো শহরে চলে যাও। সেখানে তোমাদের পার্থিব দ্রব্যসমূহ পাবে। অনন্তর ইহুদিরা সেখানে গিয়ে অবাধ্যতা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি অবতীর্ণ হয়।

মান্না-সালওয়া এবং তাদের যাচিত বস্তুর মধ্যে মর্যাদার পর্যালোচনা :

এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, مَنّ ও سَلْوٰى বনী ইসরাঈলদের যাচিত বস্তু থেকে অনেক উত্তম। কেননা কুরআনের ভাষ্যে বলা হয়েছে- أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ

নিম্নে মান্না ও সালওয়ার মর্যাদার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো-

(১) মান্না-সালওয়া ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন উত্তম নিয়ামত, যা লাভ করতে কোনো কষ্ট করতে হতো না। লাঙ্গল, জোয়াল চালানো, কৃষি কাজ ও শ্রমের প্রয়োজন ছিল না।

(২) এটা ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু।

(৩) মান্না-সালওয়াতে আল্লাহর নির্দেশ পালন হতো, তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো, যা পরকালের পুণ্য হিসেবে জমা হতো।

(৪) যেহেতু উহা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হতো, সেহেতু তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ ছিল না। কিন্তু চাষাবাদের মাধ্যমে যা উৎপন্ন হয়, তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়। কেননা বীজ এবং জমিন ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। তাতে কিয়ৎ পরিমাণ হলেও হের-ফের থাকতে পারে। একে অন্যের নিকট হতে জবর দখলেরও সম্ভাবনা থাকতে পারে। –[কুরতুবী]

تَسْتَبْدِلُوْنَ কথাটি কাকে বলেছিলেন? এ বাক্যটি جملة مستانفة যা উহ্য প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে। প্রশ্নটি হলো "বনী ইসরাঈলদের কৃষিজাত পণ্য সরবরাহের আবেদনের জবাবে হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে কি বললেন?" তখন উত্তরে বলা হলো اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الخ। এ বাক্যটির قَائِلْ তথা প্রবক্তা হলেন স্বয়ং আল্লাহ, তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে এ বক্তব্য পেশ করেন।

অথবা, হযরত মূসা (আ.) নিজেই এর প্রবক্তা। আয়াতের বাচনভঙ্গি দ্বারা এটাই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। [বায়যাবী]

مصر দ্বারা উদ্দেশ্য : مِصْر বলতে এখানে অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো নগর বা লোকালয়কে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে ফেরাউনের মিসর অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে ইহুদিদেরকে মিসরের অধিকারী করে দিয়েছেন। কেউ বলেন, এ অঞ্চলটির পূর্ব নাম ছিল مصرائيم (মিসরাতাম) আরবিতে একে مصر বলা হয়েছে। –[বায়যাবী]

قوله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ -এর ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের চিরন্তন শাস্তি ইহকাল ও পরকালে তাঁর গজবের কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ– তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোকনা কেন, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যারা তাদের সংস্পর্শে আসবে, তারাই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখবে।

اَلْمَسْكَنَةُ ও اَلذِّلَّةُ -এর অর্থ : اَلذِّلَّةُ শব্দের অর্থ– অপমান, লাঞ্ছনা। হযরত হাসান বসরী (র.) এবং হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন– اَلذِّلَّةُ হলো জিযিয়া, কর নির্ধারণ। اَلْمَسْكَنَةُ শব্দের অর্থ– দরিদ্রতা। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, নম্রতা ও অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করা। এটা اَلسُّكُوْنُ থেকে গৃহীত।

يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যা : এখানে اٰيٰتِ اللّٰهِ বলতে আল্লাহ তা'আলার কিতাব উদ্দেশ্য। অথবা, নবীগণের মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা উদ্দেশ্য। বনী ইসরাঈল বিভিন্নভাবে এগুলোর সাথে কুফরি করেছে– (১) মহান রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত শিক্ষাবলি হতে যে বিষয়টি নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী পেয়েছে, তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। (২) কোনো বিষয় আল্লাহ তা'আলার বাণী জানার পরও পূর্ণ দাম্ভিকতা, নির্লজ্জতা ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব সহকারে এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের কোনো পরোয়া করেনি। (৩) মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীর অর্থ ও উদ্দেশ্য ভালোভাবে জানা ও বুঝার পরও নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী এতে পরিবর্তন করেছে।

قوله وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ দ্বারা উদ্দেশ্য : বনী ইসরাঈলরা কোনো এক সকালে তিনশত নবীকে হত্যা করেছিল এবং বিকেলে স্বাচ্ছন্দ্যে তরি-তরকারির হাট বাজার করেছিল। উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন জঘন্যতম কাজের বর্ণনা দিয়ে তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা দেন।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ইহুদিরা হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.)-কে অনর্থক অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল। তা ছাড়া বনী ইসরাঈল একদিনে ৪০ জন নবীকে হত্যা করেছিল। পরবর্তীকালে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ইহুদিরা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী ও অভিশপ্ত জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। –[তাফসীরে হাক্কানী, কাশশাফ]

بِغَيْرِ الْحَقِّ **উল্লেখের ফায়দা :** এ কথা নিশ্চিত পরিজ্ঞাত যে, নবীদেরকে হত্যা করা অন্যায়, তথাপি بِغَيْرِ الْحَقِّ বলার প্রয়োজন এজন্য যে, মানুষ কখনো না জেনে বা সন্দেহ হওয়ার কারণে অন্যায় করে বসে, আবার কখনো অন্যায় জেনেও তা করে থাকে। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত মারাত্মক। নবীদের হত্যা করা জঘন্য অন্যায় এটা জেনেও তারা নবীদের হত্যা করেছে।

ইহুদিদের চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অর্থ, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের ফলে, উদ্ভূত সন্দেহ ও তার উত্তর : উল্লিখিত আয়াতসমূহ ইহুদিদের শাস্তি, ইহকালে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গজব ও রোষের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের বর্ণনানুসারে ওদের স্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনার প্রকৃত অর্থ, কুরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে কাছীরের ভাষায় : "তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যার সংস্পর্শে আসবে সেই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে।"

বিশিষ্ট তাফসীরকার ইমাম যাহ্হাকের ভাষায় এ লাঞ্ছনা-অবমাননার অর্থ- ইহুদিরা সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে।

একই মর্মে সূরা 'আলে ইমরানের' এক আয়াতে রয়েছে : ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ "আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত, তারা যেখানে যাবে সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে।" আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যমের অর্থ এই যে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও উপাসক যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না, তারা নিরাপদে থাকবে। আর মানবপ্রদত্ত মাধ্যম অর্থ শান্তিচুক্তি। যার একটি রূপ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে জিযিয়া কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু কুরআনের আয়াতে مِنَ النَّاسِ বলা হয়েছে مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ বলা হয়নি। সুতরাং এমন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্যান্য অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে সাময়িক শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

সারকথা, ইহুদিরা উপরিউক্ত দু অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সর্বদাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। ১. আল্লাহর প্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে, যার ফলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি, নারী প্রভৃতি এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে অব্যাহতি পাবে। কিংবা ২. শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পারবে। এ চুক্তি মুসলমানদের সাথেও হতে পারে। কিংবা অন্যান্য মুসলিম জাতির সাথেও হতে পারে।

এমনিভাবে সূরা 'আলে ইমরানের' আয়াত দ্বারা সূরা বাকারা আয়াতের বিশদ বিশ্লেষণ হয়ে যায়। অধুনা ফিলিস্তীনে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে সন্দেহের অবতারণা হয়েছে, এ দ্বারা তাও দূরীভূত হয়ে যায়। তা এই যে, কুরআনের আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, ফিলিস্তীনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তর সুস্পষ্ট- কেননা, ফিলিস্তীনে ইহুদিদের বর্তমান রাষ্ট্রের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত, তারা ভালোভাবেই জানেন যে, এ রাষ্ট্র প্রকৃত প্রস্তাবে ইসরাঈলের নয়; বরং আমেরিকা ও বৃটেনের একটি ঘাঁটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে একমাসও টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান শক্তি ইসলামি বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝখানে ইসরাঈল নাম দিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ রাষ্ট্র আমেরিকা-ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে একটা অনুগত আজ্ঞাবহ ষড়যন্ত্র কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্ব বহন করে না। এ যেন কুরআনের বাণী بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এরই বাস্তব রূপ। পাশ্চাত্য শক্তিবলয়, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রীড়নক রূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাও অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননার ভিতর দিয়ে। সুতরাং বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরুন কুরআনের কোনো আয়াত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না।

শব্দ বিশ্লেষণ

اسْتَسْقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِسْقَاءُ মূলবর্ণ (س ق ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- পানি চাইলেন [তার জাতির জন্য]

انْفَجَرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفِجَارُ মূলবর্ণ- (ف ج ر) জিনস صَحِيْحٌ অর্থ-পানি বের হলো।

مَشْرَبَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف বাব سَمِعَ মাসদার اَلشُّرْبُ মূলবর্ণ (ش ر ب) জিনস صحيح অর্থ- পানি পানের স্থান।

وَلَا تَعْثَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ ও سمع মাসদার اَلْعَثْىُ মূলবর্ণ- (ع ث ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা ফ্যাসাদ করো না।

لَنْ نَّصْبِرَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل معروف বাব ضرب মাসদার اَلصَّبْرُ মূলবর্ণ (ص ب ر) জিনস صحيح অর্থ- আমরা কখনো ধৈর্যধারণ করব না।

وَاحِدٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَحْدَةُ মূলবর্ণ (و ح د) জিনস مثال واوى অর্থ- একক, একা।

ادْعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د ع و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তুমি চাও, প্রার্থনা কর, দোয়া কর।

يُخْرِجْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ- (خ ر ج) জিনস صحيح অর্থ- সে বের করেছে।

تُنْبِتُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْبَاتُ মূলবর্ণ- (ن ب ت) জিনস صحيح অর্থ- সে উপৎন্ন করেছে।

بَقْلِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন بُقُوْلٌ ; অর্থ- তরকারি।

قِثَّائِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قِثَّاءَةٌ; অর্থ- কাকড়ি।

فُوْمِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فُوْمَانٌ ; অর্থ- গম।

عَدَسِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন عَدَسَةٌ; অর্থ- ডাল, মসুরী।

بَصَلِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন بُصُوْلٌ ; অর্থ- পেঁয়াজ।

تَسْتَبْدِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِبْدَالُ মূলবর্ণ (ب د ل) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা পরিবর্তন করে নিবে।

اهْبِطُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهُبُوْطُ মূলবর্ণ (ه ب ط) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা নেমে যাও।

ضُرِبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّرْبُ মূলবর্ণ (ض ـ ر ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের উপর লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা আরোপ করা হলো।

بَآءُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَوْءُ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف واوى অর্থ– তারা ফিরল।

كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা অস্বীকার করছিল।

كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সীমালঙ্ঘন করছিল।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ : এখানে اُدْخُلُوْا ফে'ল, ফা'য়েল, আর هٰذِهِ হলো اسم اشارة, আর الْقَرْيَةَ হলো مشار اليه, অতঃপর اسم اشاره ও مشار اليه মিলে مفعول, অতঃপর ফে'ল, ফায়েল, ও مفعول মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا : এখানে اُدْخُلُوْا ফে'ল, ضمير হচ্ছে ذو الحال; الْبَابَ হলো مفعول আর سُجَّدًا হলো حال এখন ذو الحال ও حال মিলে হচ্ছে فاعل অতঃপর ফে'ল, ফা'য়েল ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ : এখানে لَنْ نَّصْبِرَ ফে'ল ও ফা'য়েল عَلٰى হরফে জার, طَعَامٍ হলো موصوف আর واحد হলো صفة, অতঃপর موصوف ও صفت মিলে مجرور, তারপর جار ও مجرور মিলে متعلق অতঃপর ফে'ল ফা'য়েল ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৬২) সুনিশ্চিত যে, মুসলমান, ইহুদি, নাসারা এবং সাবেয়ীন সম্প্রদায় যারা বিশ্বাস রাখে আল্লাহর এবং কিয়ামতের প্রতি আর নেককাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কারও রয়েছে তাদের প্রভুর নিকট, তাদের কোনো প্রকার ভয়ও নেই, তারা শোকান্বিতও হবে না।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢)
(৬৩) আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিলাম এবং তূর পাহাড়কে উঠিয়ে ধরলাম তোমাদের উপর [এবং বলেছিলাম] গ্রহণ কর যে কিতাবটি আমি তোমাদেরকে দান করেছি, দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রাখ যে, সমস্ত হুকুম তাতে রয়েছে, আশা করা যায় যে, তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٦٣)
(৬৪) অতঃপর তোমরা ফিরে গেলে সেই অঙ্গীকারের পরেও, তখন যদি তোমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত না হতো, তবে অবশ্যই তোমরা বিনাশপ্রাপ্ত হতে।	ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٤)
(৬৫) আর তোমরা অবগতই আছ ঐ সমস্ত লোকের অবস্থা যারা তোমাদের মধ্যে হতে শনিবার সম্বন্ধীয় আদেশ অমান্য করেছিল, সুতরাং আমি তাদেরকে বলে দিলাম, তোমরা হয়ে যাও লাঞ্ছিত বানর।	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٥)

শাব্দিক অনুবাদ

৬২. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا সুনিশ্চিত যে, মুসলমান وَالَّذِينَ هَادُوا ইহুদি وَالنَّصَارَىٰ নাসারা وَالصَّابِئِينَ এবং সাবেয়ীন সম্প্রদায় مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ যারা বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْآخِرِ এবং কিয়ামতের প্রতি وَعَمِلَ صَالِحًا আর নেককাজ করে فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ তাদের জন্য পুরস্কারও রয়েছে عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রভুর নিকট وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ তাদের কোনো প্রকার ভয়ও নেই وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ তারা শোকান্বিতও হবে না।

৬৩. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিলাম وَرَفَعْنَا এবং উঠিয়ে ধরলাম فَوْقَكُمُ তোমাদের উপর الطُّورَ তূর পাহাড়কে خُذُوا [এবং বলেছিলাম] গ্রহণ কর مَا آتَيْنَاكُمْ যে কিতাবটি আমি তোমাদেরকে দান করেছি بِقُوَّةٍ দৃঢ়ভাবে وَاذْكُرُوا এবং স্মরণ রাখ مَا فِيهِ যে সমস্ত হুকুম তাতে রয়েছে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ আশা করা যায় যে, তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।

৬৪. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ অতঃপর তোমরা ফিরে গেলে مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ সেই অঙ্গীকারের পরেও فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ তখন যদি আল্লাহর দয়া না হতো عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর وَرَحْمَتُهُ ও তাঁর রহমত لَكُنْتُمْ তবে অবশ্যই তোমরা হতে مِنَ الْخَاسِرِينَ বিনাশপ্রাপ্ত।

৬৫. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ আর তোমরা অবগতই আছ الَّذِينَ اعْتَدَوْا ঐ সমস্ত লোকের অবস্থা যারা অমান্য করেছিল مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে হতে فِي السَّبْتِ শনিবার সম্বন্ধীয় আদেশ فَقُلْنَا لَهُمْ সুতরাং আমি তাদেরকে বলে দিলাম كُونُوا তোমরা হয়ে যাও قِرَدَةً বানর خَاسِئِينَ লাঞ্ছিত।

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ (٦٦)

(৬৬) অনন্তর আমি তাকে করলাম একটি শিক্ষণীয় বিষয় তৎকালীনদের জন্যও এবং পরবর্তীদের জন্যও আর উপদেশ স্বরূপ করলাম মুত্তাকীদের জন্য।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (٦٧)

(৬৭) আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ আদেশ করতেছেন তোমাদের একটি বলদ জবাই কর: তারা বলল, আপনি কি আমাদেরকে উপহাস্য বানাচ্ছেন? মূসা বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি এরূপ মুর্খ লোকদের ন্যায় কাজ করা হতে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ (٦٨)

(৬৮) তারা বলল, আপনি প্রার্থনা করুন, আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট তিনি যেন আমাদেরকে বলে দেন তা কি কি গুণবিশিষ্ট হওয়া চাই: মূসা বললেন, আল্লাহ বলতেছেন যে, তা এমন বলদ হওয়া চাই যা একেবারে বৃদ্ধও নয় একেবারে বাচ্চাও নয়: এতদুভয়ের মধ্যবর্তী জোয়ান, অতএব, এখন আদেশ অনুযায়ী করে ফেল।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ (٦٩)

(৬৯) তারা বলল, প্রার্থনা করুন, আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট তিনি যেন আমাদেরকে বলে দেন তার রং কি? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেন, তা একটি হলদে রঙ্গের বলদ, তীব্র হলদে তার রং দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।

শাব্দিক অনুবাদ

৬৬. فَجَعَلْنٰهَا অনন্তর আমি তাকে করলাম نَكَالًا একটি শিক্ষণীয় বিষয় لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا তৎকালীনদের জন্যও وَمَا خَلْفَهَا এবং পরবর্তীদের জন্যও وَمَوْعِظَةً আর উপদেশ স্বরূপ করলাম لِّلْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকীদের জন্য।

৬৭. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى আর যখন মূসা বললেন لِقَوْمِهٖ স্বীয় সম্প্রদায়কে اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ আল্লাহ আদেশ করতেছেন তোমাদের اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً একটি বলদ জবাই কর قَالُوْا তারা বলল اَتَتَّخِذُنَا আপনি কি আমাদেরকে বানাচ্ছেন? هُزُوًا উপহাস্য قَالَ মূসা বললেন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ এরূপ মুর্খ লোকদের ন্যায় কাজ করা হতে।

৬৮. قَالُوْا তারা বলল ادْعُ لَنَا আপনি প্রার্থনা করুন আমাদের জন্য رَبَّكَ আপনার প্রভুর নিকট يُبَيِّنْ لَّنَا তিনি যেন আমাদেরকে বলে দেন مَا هِيَ তা কি কি গুণবিশিষ্ট হওয়া চাই قَالَ মূসা বললেন اِنَّهٗ يَقُوْلُ আল্লাহ বলতেছেন যে اِنَّهَا بَقَرَةٌ তা এমন বলদ হওয়া চাই لَّا فَارِضٌ যা একেবারে বৃদ্ধও নয় وَّلَا بِكْرٌ একেবারে বাচ্চাও নয় عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ এতদুভয়ের মধ্যবর্তী জোয়ান فَافْعَلُوْا অতএব, কাজ করে ফেল مَا تُؤْمَرُوْنَ আদেশ অনুযায়ী

৬৯. قَالُوْا তারা বলল ادْعُ لَنَا প্রার্থনা করুন আমাদের জন্য رَبَّكَ আপনার প্রভুর নিকট يُبَيِّنْ لَّنَا তিনি যেন আমাদেরকে বলে দেন مَا لَوْنُهَا তার রং কি? قَالَ তিনি বললেন اِنَّهٗ يَقُوْلُ আল্লাহ বলেন اِنَّهَا بَقَرَةٌ তা একটি বলদ صَفْرَآءُ হলদে রঙ্গের فَاقِعٌ لَّوْنُهَا তীব্র হলদে তার রং تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى الخ ٦٢ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হওয়ার পূর্বে যেসব দীনদারদের সাথে মিলিত হয়েছিলাম, তাদের নামাজ-রোজা সম্পর্কে হুজুর ﷺ-এর নিকট বর্ণনার পর বলেছিলাম যে, এ সমস্ত নামাজি ও রোজাদারগণ আপনার আগমনের বিশ্বাসী। তখন নবী করীম ﷺ বলেন, তারা জাহান্নামী। এতে হযরত সালমান (রা.) দুঃখিত হন। তখন উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[ইবনে কাছীর]

শানে নুযূল– ২ : হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর সঙ্গী-সাথীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদা তিনি জনাব নবী করীম ﷺ-এর সাথে আলোচনা করছিলেন। এই মধ্যে যখন তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তখন তিনি তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, তারা নামাজ আদায় করত, রোজা রাখত, আপনার প্রতি তাদের বিশ্বাসও ছিল, এবং তারা সাক্ষী প্রদান করত যে, আপনি নবী হয়ে প্রেরিত হবেন। অতঃপর সালমান ফারসী (রা.) তাদের বৈশিষ্ট্যতা বর্ণনা করে শেষ করার পর নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, হে সালমান! তারা হাবে জাহান্নামী। একথা হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক অনুভব হলো এবং তার পদতল হতে মাটি সরে যাচ্ছিল বলে অনুভব করেছিলেন। তখন সে হতাশাগ্রস্থ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.) বললেন যে, এ আয়াত শুনে আমি বর্ণনাতীত আনন্দিত হলাম। –[ইবনে কাছীর– ১ :১০৩]

قوله وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ الخ -٦٥ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত মূসা (আ.) ইবাদতের জন্য জুমার দিন নির্দিষ্ট করেন; কিন্তু বনী ইসরাঈল তাঁর বিরোধিতা করে এবং শনিবার দিন ইবাদতের জন্য পছন্দ করে। তারা যুক্তি দেখিয়ে বলল, আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, শনিবার দিন কোনো কাজ করেননি। আমরাও ঐ দিন কোনো কাজ করব না। কাজেই তাদেরকে বলা হলো ঠিক আছে তোমরা ঐ দিন ইবাদত করবে, কোনো কাজ করবে না, এমনকি মাছও শীকার করবে না। ঐ সকল লোক যেহেতু ঈলা নামক চরের নদীর তীরে বাস করতো। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে শনিবার দিন ঐ নদীর কিনারায় সকল প্রকার মাছ ভিড় করত। শেষ পর্যন্ত তারা কৌশল অবলম্বন করে, নদীর তীরে গর্ত খোদাই করে নদীর নালার সাথে নালা করে দেয়, এতে শনিবার মাছ একত্রিত হতো, আর রবিবার দিন তারা সে মাছ শিকার করতো। আর বলত আমরা শনিবার দিন মাছ শিকার করিনি। সে ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يَهُودِيّ ، نَصَارَى ও صَابِئِين -এর পরিচয় **:** يَهُودِيّ (ইহুদি) : 'ইহুদি' হচ্ছে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বড় পুত্র 'ইয়াহুদ'-এর বংশধর। আর এজন্যই এদেরকে 'ইহুদি' বলা হতো। কেউ কেউ বলেন, এসব লোক তাওরাত পড়ার সময় হেলত-দুলত, এজন্যই এদেরকে 'ইহুদি' বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, هَادُوْا শব্দের অর্থ– প্রত্যাবর্তন করল। যেহেতু ইহুদিরা গো-বৎস পূজা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল, সেহেতু এদেরকে يَهُودِيّ বলা হয়।

نَصَارَى **(নাসারা) :** যখন হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তের সময় আসে, তখন বনী ইসরাঈলদের উপর তার নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর আদেশের আনুগত্য ওয়াজিব হয়, তখন তাদের নাম نَصَارَى (নাসারা) রাখা হয়। কেননা তারা পরস্পর সাহায্য-সযোগিতাও করেছিল। কেউ কেউ বলেন, এসব লোক যে স্থানে বাস করতো, তার নাম ছিল নাসেরা, তাই তাদেরকে نَصَارَى বলা হতো।

اَلصَّابِئِيْنَ **(সাবি'য়ীন) :** এটা বহুবচন, একবচন صَابِئَةٌ , অর্থ– যে নিজের দীন ত্যাগ করে অন্য দীন গ্রহণ করে। তৎকালে প্রচলিত দীনসমূহ হতে তাদের পছন্দ মতো কিছু কিছু বিষয় তারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। তারা তারকারাজি ও ফেরেশতাদের পূজা ও উপাসনা করতো। হযরত ওমর (রা.) এদের কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

قوله وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ প্রদত্ত 'তাওরাত' কিতাব 'তূর' পর্বত থেকে গ্রহণ করার সময় বনী ইসরাঈলদের ৭০ জন নির্বাচিত লোককে সাক্ষীরূপে নিয়েছিলেন। তারা সিরিয়া এসে কওমের নিকট সাক্ষ্য

প্রদান করবে যে, আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, তোমরা যতটুকু পার, আমল করো এবং যা না পার, তা ক্ষমার যোগ্য। ইহুদিরা তাদের স্বভাবগত দুষ্টুমিবশত এবং নির্বাচিত লোকদের মিথ্যা সংযোগের কারণে সুযোগ পেয়ে পরিষ্কার বলে দিল, 'আমরা কিছুতেই এ কিতাব অনুযায়ী আমল করতে পারব না। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে 'তূর' পাহাড়ের একাংশ তাদের মাথার উপর ধরতে বলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা মেনে নিল। এটাই হলো 'তূর' পাহাড় উত্তোলনের ঘটনা।

يَوْمُ السَّبْتِ-এর ঘটনা : ইহুদি ধর্মে সপ্তাহের শনিবার দিন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এ দিনে দুনিয়ার কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল। এর অমান্যকারীর শাস্তি ছিল হত্যা। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী 'ঈলা' নামক স্থানের অধিবাসীরা এ দিনে মৎস শিকার করে আল্লাহ তা'আলার আদেশ লঙ্ঘন করায় আল্লাহ তা'আলা এদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলেন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইহুদিদের ইবাদত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা শনিবার দিনকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। মূলত এ দিনে সমুদ্রে মৎস শিকার করা তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন শুরু করে তারা শনিবার দিন জালে মাছ আটকিয়ে পরদিন সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে ভক্ষণ করতো এ ব্যাপারে ধার্মিক ও আল্লাহভীরু লোকদের বাঁধাদানে ভ্রুক্ষেপ করতো না। শেষ পর্যন্ত ধার্মিক লোকেরা তাদের এহেন আল্লাহদ্রোহী আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের সমাজচ্যুত করে বস্তির মধ্যখানে দেয়াল নির্মাণ করে তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বসবাস করতো এবং দেয়ালে একটি মাত্র ফটক রাখে। একদিন ভোরবেলায় আল্লাহভীরু লোকেরা লক্ষ্য করল, বেলা অনেক হয়ে গেছে, অথচ এরা এখনো দরজা খোলেনি। তখন তাঁরা দরজা খুলে দেখতে পেল যে, এরা সবাই বানরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এদের প্রত্যেককে যথারীতি চেনা যাচ্ছে। এভাবে তিনদিন কেটে যাওয়ার পর এরা সবাই মৃত্যুবরণ করে। ঐশী আদেশ না মানার কারণে এভাবে এদের ধ্বংস হয়েছে।

قوله كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ দ্বারা যারা সম্বোধিত : বনী ইসরাঈলের এ ঘটনাটি হযরত দাউদ (আ.)-এর আমলে সংঘটিত হয়। তারা ছিল আয়লা নগরীর অধিবাসী, আল্লাহর নির্দেশ পালনে অবাধ্যতা প্রদর্শনের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের আকৃতি বিকৃতির শাস্তি প্রদান করেন। অতএব, كُوْنُوْا যে'লে আমর দ্বারা আয়লা নগরীর অবৈধ মাছ শিকারিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

قِرَدَةً দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, قِرَدَةً দ্বারা প্রকৃত বানর উদ্দেশ্য নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে রূপান্তরিত করেছেন। তাদের ধ্যান-ধারণা সব কিছু বানরের ধ্যান-ধারণায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদরেকে বানরের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমলবিহীন আলিমকে গাধার সাথে তুলনা দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে– كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا।

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে قِرَدَةً দ্বারা প্রকৃত বানরই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রকৃত বানরেই রূপান্তরিত করেছিলেন। তিন দিন পর এরা সবাই মৃত্যুবরণ করে।

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে আর বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়েছিল। তারা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারতো। তাদের কাছে এসে অশ্রু বিসর্জন করতো। কাপড় নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকত। আত্মীয়রা বলত, পূর্বে কি আমরা তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? বানররা ও শূকররা তখন মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিতো।

মুক্তিপ্রাপ্ত দল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দল : পবিত্র কুরআনের আলোকে বুঝা যায় যে, ঐ ঘটনায় বনী ইসরাঈলরা তিন দলে বিভক্ত ছিল। একটি দল যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ লঙ্ঘন করে শনিবারে মাছ ধরেছিল। দ্বিতীয় দল যারা এ কাজে বাধা দিয়েছিল। এমনকি তৃতীয় দল দ্বিতীয় দলকে বলেছিল, এদেরকে নিষেধ করে কোনো লাভ নেই। আল্লাহ এদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিবেন তাই করবেন।

এ তিন দলের মধ্যে দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ অতএব, তারা মুক্তি পেয়েছে। আর প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে। اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অতএব, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর তৃতীয় দল সম্পর্কে কিছু বলা

হয়নি। যেহেতু তারা ভালো কাজ করেনি, যা দ্বারা প্রশংসারযোগ্য হতে পারে। আবার খারাপ কাজও করেনি যা দ্বারা তিরস্কারের যোগ্য হতে পারে। এতদসত্ত্বেও তৃতীয় দল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এরা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর কেউ কেউ বলেন, এরা ধ্বংস হয়নি।

قوله بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا **দ্বারা উদ্দেশ্য :** بَيْنَ يَدَيْهَا দ্বারা চেহারা রূপান্তরিত লোকদের সমসাময়িক অন্যান্য পৃথিবীবাসী উদ্দেশ্য। আর وَمَا خَلْفَهَا দ্বারা তাদের পরবর্তী সকল লোক উদ্দেশ্য।

অথবা, بَيْنَ يَدَيْهَا দ্বারা আয়লা নগরীর অধিবাসী, যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, তারা উদ্দেশ্য। আর وَمَا خَلْفَهَا দ্বারা যারা উপস্থিত ছিল না, তারা উদ্দেশ্য।

অথবা, আয়াতটির অর্থ হচ্ছে لِأَجْلِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَمَا تَأَخَّرَ مِنْهَا অর্থাৎ তাদের পূর্বাপর গুনাহসমূহের কারণে এ শাস্তিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ করা হয়েছে। –[বায়যাবী]

মুত্তাকীন দ্বারা উদ্দেশ্য ও তাদেরকে বিশেষিত করার কারণ : অত্র আয়াতে مُتَّقِيْنَ তথা খোদাভীরু বলতে চেহারা রূপান্তরিতদের গোত্রীয় মুত্তাকীগণকে বুঝানো হয়েছে। অথবা যে সমস্ত মুত্তাকীরা এ ঘটনা শ্রবণ করেছেন, তারা উদ্দেশ্য। –[বায়যাভী]

উপদেশকে মুত্তাকীদের সাথে খাস করার কারণ সম্পর্কে ইমাম মাওয়ারদী বলেন, যেহেতু উপদেশ গ্রহণে মুত্তাকীরাই এগিয়ে আসে, সেহেতু তাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

فَجَعَلْنٰهَا **-এর মধ্যকার** هَا **এর** مَرْجِعْ : (১) هَا সর্বনাম قِرَدَةً -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। অর্থাৎ, আমি ঐ বানরকে নসিহতের দৃষ্টান্ত বানিয়েছি। (২) অথবা, তা حِيْتَانٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত, অর্থাৎ ঐ মাছগুলো। (৩) অথবা, তা عُقُوبَةٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত, অর্থাৎ ঐ শাস্তিকে। (৪) অথবা, তা قَرْيَةٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত, অর্থাৎ ঐ বস্তিকে আমি তাদের সমসাময়িক এবং পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছি। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, هَا সর্বনামকে قَرْيَةٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত করাই সহীহ।

বনী ইসরাঈল ও ইহুদির মাঝে পার্থক্য : এ যাবৎ আলোচনা চলে আসছিল বনী ইসরাঈল নামের এক বিশেষ বংশ-গোষ্ঠী সম্পর্কে। তাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এখন তাদের ধর্মমত এবং আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এই প্রথমবারের মতো الَّذِيْنَ هَادُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বনী ইসরাঈল একটা বংশগত নাম। একটি গোত্র-বংশ বা একটি জাতির নাম। উচ্চ বংশ মর্যাদার জন্য তারা গর্ব করতো। নিজেদের পূর্বপুরুষ সাধু-সজ্জন ছিল বলে তারা মহা আনন্দিত ছিল। ইতিহাস পুনরাবৃত্তিকালে এ বংশগত নাম নেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। এখন তাদের ধর্মমত ও তাদের বিশ্বাসগত অবস্থার আলোচনা শুরু করা হচ্ছে। এখন এমন নাম নেওয়া প্রয়োজন, যাতে কোনো গুণ-পরিচয় প্রকাশ পায় যাতে বংশ গোত্র পরিবারের পরিবর্তে ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। الَّذِيْنَ هَادُوْا সে প্রয়োজন পূরণ করছে। কুরআনে আলংকারিক বৈশিষ্ট্যের কার্যকারণ অসংখ্য-অগণিত। সেগুলোর মধ্যে একটি এই যে, প্রায় কাছাকাছি কিন্তু একে অপর থেকে ভিন্ন অর্থের জন্য কুরআন মাজীদ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে শব্দদ্বয়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখে।

আরবে এমন অনেক গোত্র ছিল, যারা জন্মগত এবং বংশগতভাবে ইহুদি ছিল না; বরং তারা ছিল আরব বা বনী ইসমাঈল হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর। কিন্তু ইহুদিদের সংসর্গ-সান্নিধ্যে প্রভাবিত এবং তাদের জ্ঞান-গরিমা দ্বারা চমৎকৃত হয়ে তারা প্রথমে ওদের আচার-আচরণ এবং পরে আকিদা-বিশ্বাস অবলম্বন করে নেয়। আর এভাবে ধীরে ধীরে তারাও ইহুদি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। اَلْيَهُوْدُ না বলে الَّذِيْنَ هَادُوْا বলার একটা সূক্ষ্ম রহস্য এই যে, এতে তাদের আকিদা-বিশ্বাস যে মৌলিক নয়; বরং পরবর্তীকালে গ্রহণ করা, সে কথা ভালোভাবে বুঝা যায়।

قَوْلُهُ النَّصَارٰى : বহুবচন, একবচন نَصْرَانِيٌّ শাম দেশে বর্তমান ফিলিস্তীনে Nazareth বা নাছেরা নামে একটা গোত্র আছে। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ৭০ মাইল উত্তরে রোম সাগরের ২০ মাইল পূর্বে গ্যালিলী অঞ্চলে। হযরত ঈসা (আ.)-এর নিবাস এ অঞ্চলে অবস্থিত। এ কারণে তাকে ইয়াসূ নাছেরী বলা হয়। আরবি উচ্চারণে নাসেরাকে নাসরানও বলা হয়। এ অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে নাসরানী বলা হয়।

ইমাম রাগেব (র.) سُمُّوْا بِذَالِكَ اِنْتِسَابًا اِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا نَصْرَانُ (رَاغِبْ) সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও নাসারাদের নামকরণের কারণ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা পাওয়া যায়-

سُمِّيَتِ النَّصَارٰى لِاَنَّ قَرْيَةَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ كَانَتْ تُسَمّٰى نَصِرَةً وَكَانَ اَصْحَابُ يُسَمَّوْنَ النَّاصِرِيْنَ (اِبْنُ جَرِيْرٍ)

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন- سُمُّوْا بِذَالِكَ الْقَرْيَةِ تُسَمّٰى نَصْرَةَ كَانَ يَنْزِلُهَا عِيْسٰى فَلَمَّا يُنْسَبُ اَصْحَابُهُ اِلَيْهِ قِيْلَ النَّصَارٰى (قُرْطُبِيْ)

কেউ কেউ একে আরবি শব্দ মনে করে তা نَصَرْتُ থেকে নিষ্পন্ন বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, যেহেতু তারা বলেছিল- نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ তাই তাদেরকে নাসারা বলা হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত উক্তিই ঠিক। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১২৩]

قَوْلُهُ الصَّابِئِيْنَ : সাবী-এর শাব্দিক অর্থ হলো- যে কেউ নিজের দীন ত্যাগ করে অপরের দীন গ্রহণ করে, বা অপরের দীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পরিভাষায় صَابِئُوْنَ [Sabians] নামে একটা ধর্মীয় ফেরকা ছিল, যারা আরবের উত্তর-পূর্ব দিকে শাম ও ইরাকের সীমান্তে বসবাস করতো। এরা তাওহীদ-রিসালাতে বিশ্বাসী ছিল। কারণ মূলত আহলে কিতাব ছিল। এরা নিজেদেরকে নাসারা-ই ইয়াহইয়া বলতো। যেমন এরা ছিল হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর উম্মত। হযরত ওমর (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ খলিফা এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতো সত্যসন্ধানী সাহাবীও সাবেয়ীদেরকে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। আর হযরত ওমর (রা.) তো তাদের জবাই করা পশু হালাল মনে করতেন।

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ هُمْ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَقَالَ عُمَرُ تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ مِثْلَ ذَبَائِحِ اَهْلِ الْكِتٰبِ (مَعَالِمُ)

বেশ বড় বড় কয়েকজন তাবেয়ীও তাদেরকে আহলে কিতাব বা তাওহীদবাদী মনে করতেন। যেমন ইবনে জারীর (র.) বলেন- هُمْ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ (اِبْنُ جَرِيْرٍ عَنِ السُّدِّيْ)

ইবনে যায়েদ (র.) তাদেরকে তাওহীদবাদী মনে করতেন। হযরত কাতাদাহ এবং হাসান বসরী (র.) থেকে তো এও বর্ণিত আছে যে, তারা কিতাবধারী এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতো -[ইবনে জারীর]। আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিজেও ছিলেন ইরাকী। এ কারণে সাবেয়ীদের সম্পর্কে সরাসরি জানার তার সুযোগ ছিল। তার ফতোয়া এই যে, তাদের হাতে জবাই করা পশু হালাল এবং এদের নারীদের সাথে বিয়েও জায়েজ।

গাভী জবাইয়ের ঘটনা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অন্যান্য মুফাস্সিরগণের মতে, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, যার বর্ণনায় উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

ঘটনার বিবরণ ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে 'আদিল' নামে বিপুল সম্পদের অধিকারী ও ধনী ব্যক্তি ছিল। তার কোনো পুত্র-সন্তান ছিল না। একমাত্র কন্যা ও এক ভাতিজা ছিল। ভাতিজা স্বত্ব পাওয়ার লালসায় এবং একমাত্র কন্যাকে বিয়ের উদ্দেশ্য তাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করে এবং হত্যার রক্তপণ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাই একদিন সুযোগ মতো চাচাকে হত্যা করে রাস্তার মোড়ে রেখে আসে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসে বলল যে, কে তাদের চাচাকে হত্যা করেছে, তারা জানে না। অথবা, মৃতদেহের নিকটস্থদের নিকট থেকে রক্তমূল্য দাবি করে। তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাদেরকে একটি গরু জবাই করতে আদেশ দিলেন এবং জবাইকৃত গরুর একাংশ মতান্তরে লেজ বা মেরুদণ্ড কিংবা রান মৃত ব্যক্তির গায়ে স্পর্শ করলে সে জীবিত হয়ে বলে দেবে, কে তাকে হত্যা করেছে। তারা যে কোনো একটি গরুকে জবাই করে সেটার অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যেতো। কিন্তু তাদের চিরাচরিত অভ্যাস ও প্রকৃতি অনুযায়ী নানাপ্রকার বাদানুবাদের অবতারণা করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা শর্ত করে দিলেন যে, নিখুঁত, নির্মল, কাজে অব্যবহৃত, গাঢ় রংয়ের একটি মধ্যবয়সী গরু জবাই করতে

হবে। অবশেষে তারা এরূপ একটি গরু বহুমূল্যে ক্রয় করে জবাই করে তার একাংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তির দেহে স্পর্শ করলে সে জীবিত হয়ে বলে দিল যে, তার ভাতিজা ধন-সম্পদের লোভে বা কন্যাকে বিয়ের লালসায় তাকে হত্যা করেছে। এতটুকু বলে সে আবার মৃত্যুমুখে পতিত হলো। ফলে হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেল এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও এড়ানো সম্ভব হলো।

গাভী জবাইয়ের ঘটনাটি বর্ণনার কারণ : আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে গাভী জবাইয়ের এ ঐতিহাসিক ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দু'টি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

১. এ ঘটনাটি পরলোক অবিশ্বাসীদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে সংঘটিত এ ঘটনাটি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করণের উপর একটি ঐতিহাসিক সাক্ষী রূপে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তখন মৃতদেরকে জীবিত করে যেভাবে নিজের কুদরত প্রদর্শন করেছেন, তোমরা বুঝে লও যে, কেয়ামতের দিনও এরূপে মৃতকে তিনি জীবিত করবেন। وَكَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى

২. এ ঘটনার মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে একথা জানিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অর্থাৎ তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এত অধিক সংখ্যায় স্বীয় কুদরত প্রদর্শন করেছেন যে, যদি অন্য কোনো কাওমের সম্মুখে এসব কুদরত প্রদর্শন করা হতো, তবে তারা চিরতরে আল্লাহ তা'আলার ফরমাবরদার হয়ে যেতো। তাদের অন্তরে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর নাফরমানির কল্পনা উদিত হতো না। কিন্তু তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে তো এর কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। আর যদি হয়েই থাকে তাহলে তা নিতান্ত অস্থায়ী ও নিষ্ক্রিয়ই প্রমাণিত হয়েছে। আজও যদি তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরোধিতা করো, তবে তা হবে তোমাদের জন্মগত ও স্বভাবগত একগুয়েমী এবং মুর্খতারই ফল।

গাভীটি নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট : কারো কারো মতে নির্দিষ্ট গাভী জবাই করার নির্দেশ ছিল। তবে তা ছিল অস্পষ্ট। আবার কারো মতে গাভী নির্দিষ্ট ছিল না, যে কোনো একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ ছিল। অনুরূপ কারণেই তারা প্রকৃত ব্যাপার জানতে পারতো; কিন্তু তারা হঠকারিতা প্রদর্শনের কারণে আল্লাহ পাক তাদের উপর কাঠিন্য আরোপ করেন।

اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا বলার কারণ : বনী ইসরাঈল মূসা (আ.)-এর নিকট নিহত ব্যক্তির হন্তা নির্ধারণের আবেদন করেছিল, এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গাভী জবাইয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের নিবেদিত বিষয় আর গরু জবাইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় তারা ধারণা করেছিল যে, তিনি তাদের সাথে বিদ্রূপাচরণ করছেন। অথচ গাভী জবাই করে উহার কিছু অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করলে সে জীবিত হয়ে হত্যাকারীর কথা বলে দেবে এ কথা তিনি তাদেরকে বলেননি। তাই তারা ধরে নিয়েছিল যে, এ আদেশটি বিদ্রূপাত্মক।

অথবা, মূল কথাটি বলার পরেও তা তাদের অতি আশ্চর্যের বিষয় মনে হওয়ায় তারা এ মন্তব্য করে।

قوله اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ -এর মর্মার্থ : হযরত মূসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে গাভী জবাইয়ের আদেশ দিলে তারা তাকে বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? তখন তাদের জবাবে মূসা (আ.) বললেন, উপহাস করা মূর্খদের কাজ, আমি উপহাস করে মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। বিদ্রূপ করা মূর্খতা বলেই মূসা مِنَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ না বলে مِنَ الْجٰهِلِيْنَ বলেছেন। অথবা কখনো কখনো স্বয়ং বিদ্রূপকেই মূর্খতা বলা হয়। তাই তিনি مِنَ الْجٰهِلِيْنَ বলেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَوْدُ মূলবর্ণ (ه ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা ইহুদি হলো। হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারীদেরকে ইহুদি বলা হয়।

وَالنَّصٰرٰى : শব্দটি বহুবচন, একবচন نَصْرَانٌ বা نَصْرَانِىٌ অর্থ– নাসারা। হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদেরকে নাসারা বলা হয়।

وَالصّٰبِـِٔيْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَابِئَةٌ অর্থ– এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে প্রত্যাবর্তনকারী। ইবনে খাত্তাব ও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, صَابِئِيْنَ আহলে কিতাবের একটি গোত্র। হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, صَابِئِيْنَ বলা হয়, যারা ফেরেশতাদের ইবাদত করেন, যাবূর তেলাওয়াত করে এবং কেবলামুখি হয়ে নামাজ পড়ে। –[মাযহারী]

خُذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ– (ا ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা লও। তোমরা ধর।

اذْكُرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذِّكْرُ মূলবর্ণ– (ذ ـ ك ـ ر)জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্মরণ কর।

تَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর, তোমরা ভয় করতে থাক, তোমরা বিরত থাক।

تَوَلَّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। তোমরা বিমুখ হয়েছ।

اعْتَدَوْا : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা সীমালঙ্ঘন করল।

قِرَدَةً : শব্দটি বহুবচন, একবচনে قِرْدٌ অর্থ– বানর।

الْخٰسِـِٔيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَسْئُ মূলবর্ণ (خ ـ س ـ أ) জিনস مهموز لام অর্থ– লাঞ্ছিত।

مُتَّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– পরহেজগারগণ, মুত্তাকীগণ।

تَذْبَحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلذَّبْحُ মূলবর্ণ (ذ ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জবাই কর।

بَقَرَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন بَقَرَاتٌ অর্থ– গরু।

تَتَّخِذُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (ا ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز ف‍ ء অর্থ– আপনি আমাদের সাথে উপহাস করছেন।

اُدْعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ– (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি চাও, প্রার্থনা কর, দোয়া কর।

يُبَيِّنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূবর্ণ (ب ـ ى ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– স্পষ্টভাবে বিবৃত করে।

فَارِضٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فَوَارِضُ অর্থ– বৃদ্ধ।

بِكْرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَبْكَارٌ ; অর্থ– কুমারী।

عَوَانٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন عون ; অর্থ– মধ্য বয়স্ক, বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়স।

تُؤْمَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَمْرُ মূলবর্ণ (ا ـ م ـ ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ: এখানে فاء টি হরফে আতফ, قُلْنَا ফে'ল তার نَحْنُ যমীর ফা'য়েল, لَهُمْ জার ও মাজরুর মিলে متعلق ; অতঃপর فعل ও فاعل এবং متعلق মিলে জুমলা হয়ে قول আর كُوْنُوْا ফে'লে নাকিস, اَنْتُمْ যমীরে ইসমে নাকিস, قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ শব্দদ্বয় صفت ও موصوف মিলে خبر হয়েছে। তৎপর فعل ناقص তার اسم ও خبر মিলে জুমলা হয়ে مقولة হয়েছে। এক্ষণে قول ও مقولة মিলে جملة فعلية قولية গঠিত হয়েছে।

قوله فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا: এখানে جَعَلْنَا ফে'ল, যমীরে نَحْنُ তার ফা'য়েল, هَا যমীরটি مفعول اول আর نَكَالًا শব্দটি مفعول ثانى অতঃপর فعل ও فاعل এবং উভয় مفعول মিলে جملة فعلية خبرية গঠিত হয়েছে।

قوله : وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ এখানে رَفَعْنَا ফে'ল, ফা'য়েল, فَوْقَكُمْ হলো مضاف اليه ও مضاف মিলে ظرف, আর اَلطُّوْرَ হলো مفعول به অতঃপর ফে'ল ও ফা'য়েল, ظرف এবং مفعول به মিলে جملة فعلية خبرية গঠিত হয়েছে।

قوله : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ এখানে اَعُوْذُ ফে'ল, ফা'য়েল, بِاللّٰهِ হলো متعلق , আর اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ, جملة হয়ে مفعول হয়েছে, অতঃপর ফে'ল, ফা'য়েল, متعلق মিলে جملة فعلية خبرية গঠিত হয়েছে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠)

অনুবাদ : (৭০) তারা বলল, আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন আপনার প্রভুর নিকট তিনি যেন বলে দেন তা কি কি গুণসম্পন্ন হওয়া চাই, কেননা এ বলদ সম্বন্ধে আমাদের সংশয় হচ্ছে; এবং নিশ্চয় আমরা ইনশাআল্লাহ ঠিক বুঝতে পারব।

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (٧١)

(৭১) মূসা বললেন, আল্লাহ বলেন, তা এমন বলদ যা না জমি কর্ষণে ব্যবহৃত হয়, না কৃষি ক্ষেতে পানি সেচনে, নিখুঁত, তাতে কোনো দাগ থাকবে না, তারা বলল, এখন আপনি পূর্ণ বর্ণনা দিলেন, অনন্তর তা জবাই করল; কিন্তু করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢)

(৭২) আর যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে খুন করলে এবং তার জন্য একে অন্যকে দায়ী করতে লাগলে আর আল্লাহ এই বিষয়টি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিলেন যা তোমরা গোপন রাখতে চেয়েছিলে।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٣)

(৭৩) অনন্তর আমি বললাম, তাকে এর কোনো একে টুকরা দ্বারা স্পর্শ কর, এরূপেই আল্লাহ জীবিত করবেন মৃতকে এবং তোমাদেরকে দেখান স্বীয় নিদর্শন এই আশায় যে, তোমরা বুদ্ধি প্রয়োগ করবে।

শাব্দিক অনুবাদ

৭০. قَالُوا তারা বলল ادْعُ لَنَا আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন رَبَّكَ আপনার প্রভুর নিকট يُبَيِّن لَّنَا তিনি যেন বলে দেন مَا هِيَ তা কি কি গুণসম্পন্ন হওয়া চাই إِنَّ الْبَقَرَ কেননা এ বলদ সম্বন্ধে تَشَابَهَ عَلَيْنَا আমাদের সংশয় হচ্ছে; وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ এবং নিশ্চয় আমরা ইনশাআল্লাহ لَمُهْتَدُونَ ঠিক বুঝতে পারব।

৭১. قَالَ মূসা বললেন إِنَّهُ يَقُولُ আল্লাহ বলেন إِنَّهَا بَقَرَةٌ তা এমন বলদ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ যা না জমি কর্ষণে ব্যবহৃত হয় وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ না কৃষি ক্ষেতে পানি সেচনে مُسَلَّمَةٌ নিখুঁত لَّا شِيَةَ فِيهَا তাতে কোনো দাগ থাকবে না قَالُوا তারা বলল الْآنَ এখন جِئْتَ بِالْحَقِّ আপনি পূর্ণ বর্ণনা দিলেন فَذَبَحُوهَا অনন্তর তা জবাই করল وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ কিন্তু করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

৭২. وَإِذْ قَتَلْتُمْ আর যখন তোমরা খুন করলে نَفْسًا এক ব্যক্তিকে فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا এবং তার জন্য একে অন্যকে দায়ী করতে লাগলে وَاللَّهُ مُخْرِجٌ আর আল্লাহ এই বিষয়টি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিলেন مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ যা তোমরা গোপন রাখতে চেয়েছিলে।

৭৩. فَقُلْنَا অনন্তর আমি বললাম اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا তাকে এর কোনো একে টুকরা দ্বারা স্পর্শ কর كَذَٰلِكَ এরূপেই يُحْيِي اللَّهُ আল্লাহ জীবিত করবেন الْمَوْتَىٰ মৃতকে وَيُرِيكُمْ এবং তোমাদেরকে দেখান آيَاتِهِ স্বীয় নিদর্শন لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ এই আশায় যে, তোমরা বুদ্ধি প্রয়োগ করবে।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤)

অনুবাদ : (৭৪) এমন এমন ঘটনার পর তোমাদের হৃদয় তবুও শক্তই রয়ে গেল, তার দৃষ্টান্ত পাথরের ন্যায় বা আরো বেশি কঠিন, আর কতক পাথর তো এমন আছে, যা হতে নহরসমূহ উথলিয়ে প্রবাহিত হয়, আর তার মধ্যে কতক এমনও আছে যা ফেটে যায় এবং তা হতে পানি বের হয়, আর তাদের কতক এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে উপর হতে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে; এবং আল্লাহ বে-খবর নন তোমাদের কার্য সম্বন্ধে।

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُّؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥)

(৭৫) তোমরা কি এখনো আশা রাখ যে, তোমাদের কথায় তারা ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যে কতক এমন লোকও গত হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কালাম শুনত, অতঃপর তাকে বিকৃত করত তাকে বুঝবার পর অথচ তারা জানত।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اٰمَنُوا قَالُوٓا اٰمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٦)

(৭৬) আর যখন তারা মিলিত হয় মুমিনদের সাথে, বলে– আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন গোপনে যায় তাদের কেউ ইহুদির নিকট, তখন তারা বলে, তোমরা কি মুসলমানদের বলে দাও আল্লাহ তোমাদের নিকট যা প্রকাশ করেছেন, পরিণামে তারা তোমাদেরকে তর্কে পরাজিত করবে [এই বলে] যে, এই বিষয়টি আল্লাহর নিকট [হতে তোমাদের কিতাবে] রয়েছে; তোমরা কি বুঝ না?

শাব্দিক অনুবাদ

৭৪. ثُمَّ قَسَتْ তবুও শক্তই রয়ে গেল, قُلُوبُكُمْ তোমাদের হৃদয় مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ এমন এমন ঘটনার পর فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ তার দৃষ্টান্ত পাথরের ন্যায় أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً বা আরো বেশি কঠিন وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ আর কতক পাথর তো এমন আছে لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰرُ যা হতে নহরসমূহ উথলিয়ে প্রবাহিত হয় وَإِنَّ مِنْهَا আর তার মধ্যে কতক এমনও আছে لَمَا يَشَّقَّقُ যা ফেটে যায় فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ এবং তা হতে পানি বের হয় وَإِنَّ مِنْهَا আর তাদের কতক এমনও আছে لَمَا يَهْبِطُ যা উপর হতে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ আল্লাহর ভয়ে وَمَا اللّٰهُ بِغٰفِلٍ এবং আল্লাহ বে-খবর নন عَمَّا تَعْمَلُونَ তোমাদের কার্য সম্বন্ধে।

৭৫. أَفَتَطْمَعُونَ তোমরা কি এখনো আশা রাখ أَنْ يُّؤْمِنُوا لَكُمْ যে তোমাদের কথায় তারা ঈমান আনবে وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ অথচ তাদের মধ্যে কতক এমন লোকও গত হয়েছে يَسْمَعُونَ যারা শুনত كَلٰمَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার কালাম ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ অতঃপর তাকে বিকৃত করত مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ তাকে বুঝবার পর وَهُمْ يَعْلَمُونَ অথচ তারা জানত।

৭৬. وَإِذَا لَقُوا আর যখন তারা মিলিত হয় الَّذِينَ اٰمَنُوا মুমিনদের সাথে قَالُوٓا বলে– اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি وَإِذَا خَلَا আর যখন গোপনে যায় بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ তাদের কেউ ইহুদির নিকট قَالُوٓا তখন তারা বলে أَتُحَدِّثُونَهُمْ তোমরা কি মুসলমানদের বলে দাও بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ আল্লাহ তোমাদের নিকট যা প্রকাশ করেছেন لِيُحَآجُّوكُمْ بِهٖ পরিণামে তারা তোমাদেরকে তর্কে পরাজিত করবে [এই বলে] যে, عِنْدَ رَبِّكُمْ এই বিষয়টি আল্লাহর নিকট [হতে তোমাদের কিতাবে] রয়েছে; أَفَلَا تَعْقِلُونَ তোমরা কি বুঝ না?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৭৫- قوله أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** নবী করীম ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামগণ আশা করতেন যে, ইহুদিরা মহানবী (সা.)-এর উপদেশ শুনে সত্যধর্ম গ্রহণ করবে, কিন্তু বাস্তবে হেদায়েত হলো আল্লাহর হাতে, আল্লাহ-ই ভালো জানেন কার তাকদীরে হেদায়েত আছে আর কার তাকদীরে নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নিরাশ করে বলছেন– যখন তারা এরূপ বড় বড় নিদর্শন দেখে নিজেদের অন্তঃকরণ কঠিন পাথরের মতো করে নিয়েছে, আল্লাহর কালাম শুনে বুঝে তাকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃত করেছে তাদের কাছে তোমরা কি আশা করতে পার? এ প্রসঙ্গেই বর্ণিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

শানে নুযূল– ২ : যে সকল আনসারী সাহাবী ইহুদিদের বন্ধু ছিল এবং তাদের পরস্পরের মাঝে দুগ্ধতা ও আত্মীয়তা সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। আর তারা তাদের ইসলাম গ্রহণ করার প্রতি অভিলাষীও ছিলেন।

শানে নুযূল–৩ : আবার কেউ কেউ বলেন যে, নবী করীম ﷺ ও মুমিনগণের সাথে যে সকল ইহুদি সন্তান-সন্ততি চলাফেরা করতো, তারা ঈমান গ্রহণ করে নিক। তাই ছিল সাহাবাগণের কামনা। কারণ তারা ছিল পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব ও শরিয়তের অধিকারী। তা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করত। আর মুসলমানেরা তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বতাশূলভ আচরণ করত একমাত্র তাদের ঈমান গ্রহণ করার কামনা করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–৪ : কারো মতে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে যে সত্তর জন ইহুদি আল্লাহর কালাম শ্রবণ করার জন্য তূর পাহাড়ে ছিল, তাদের যে সকল বংশধর নবী করীম ﷺ-এর সময়ে ছিল। অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুম মান্য করেনি; বরং তাদের গোত্রের প্রতি অর্পিত নির্দেশে তারা পরিবর্তন করে বলেছিল যে, আমরা শুনতে পেয়েছি, আল্লাহ বলেছেন, তোমরা যদি সামর্থবান হও, তাহলে এ সকল দায়িত্ব পালন করবেন। আর যদি ইচ্ছা কর, তাহরে তা পালন না-ও করতে পার। তাদের এহেন হঠকারী ও মিথ্যাচারী সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল–৫ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে ওলামায়ে ইহুদি সম্পর্কে। যারা নিজ প্রবৃত্তির তাড়নায় তাওরাত বিকৃত করে ফেলেছিল, হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল বলে প্রকাশ করেছে। নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ তাদের ঈমানের কামনা করেছিলেন, তাদের ঈমান কামনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৬ : কারো মতে নবী করীম ﷺ ঘোষণা দিলেন যে, আমাদের মদিনা নগরীতে মুমিন ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পাবে না। তখন কা'ব বিন আশরাফ ও ওহাব বিন ইহুযা এবং অন্যান্য নেতারা বলল যে, তোমরা গিয়ে যারা মুমিন তাদের তথ্যানুসন্ধান কর। আর তাদেরকে তোমরা বলবে যে, আমরা ঈমান গ্রহণ করেছি আর যখন ফিরে আসবে তখন কুফরি করবে। আল্লাহর বাণী বিকৃতকারী ইহুদি চক্রের বিভ্রান্তিকর এ কার্য-কলাপের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল–৭ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে সে সকল ইহুদিদের সম্পর্কে, যারা কোনো কোনো মুমিনকে লক্ষ্য করে বলত যে, আমরা ঈমান আনব এ মর্মে যে, তিনি [মুহাম্মদ ﷺ] নিশ্চয় নবী, কিন্তু তিনি আমাদের নবী নন। তিনি নবী হলেন একমাত্র তোমাদের। অতঃপর তারা যখন ফিরে যেত, তখন একে অপরকে বলত যে, তোমরা কি তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে স্বীকার করে নিয়েছ? অথচ আমরা পূর্ব থেকেই তাঁর মধ্যস্থতায় বিজয় কামনা করে আসছিলাম, সুতরাং তিনি হলেন সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা ইলম দ্বারা প্রাধান্যতা দান করেছেন। তারা সত্যকে অস্বীকার করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৮ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে ঐ সকল ইহুদি সম্প্রদায় সম্পর্কে, যারা ওহী শ্রবণ করত অতঃপর তা বুঝে নেওয়ার পর তাকে বিকৃত করে দিত। তাদের কর্তৃক আল্লাহর কালাম বিকৃত করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহতি– ১ : ৪৩৮]

٧٦- قوله وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১** : কোনো কোনো মুনাফিক ইহুদি মুসলমানদের খবরাখবর পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য কপটভাবে ইসলাম গ্রহণ করত। তারা সকালে ইসলামের দাবি করার পর মুসলমানদের সাথে মিলিত হতো এবং নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির মানসে তাওরাত খুলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসা দেখাত। সন্ধ্যা বেলা ফিরে এলে মনুষ্য শয়তান ইহুদি নেতা উবাই, কা'ব ইবনে আশরাফ প্রমূখদের নিকট বসত। তখন তারা তাদেরকে নিন্দা করে বলত, আহমকের দল! তোমরা কেন নিজেদের জ্ঞান ও কিতাব দ্বারা মুসলমানদের প্রমাণ দিচ্ছ? এগুলো দ্বারা মুসলমানগণ কিয়ামত দিবসে ঝগড়া করবে যে, তারা আমাদের নবীর প্রশংসা তাওরাতে দেখিয়েছিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কাবীর]

শানে নুযূল– ২ : একবার রাসূল ﷺ কুরাইজা দুর্গ অবরোধকালে দূর্গের নিচে দাঁড়িয়ে ইহুদিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বানরের সন্তানেরা! যেহেতু কোনো এক সময় ইহুদিরা বানর হয়ে গিয়েছিল। আর এই ইহুদিরা ছিল তাদেরই বংশধর। তাই রাসূল ﷺ তাদেরকে বানরের সন্তান বলেছেন। নবীজির মুখে এরকম গালি শুনে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, আমাদের পূর্ব পুরুষের এই কলংকের খবর কেউ জানে না, তাহলে মুহাম্মদ ﷺ জানলো কি করে? নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউ এই গোপন তথ্য গোমর ফাঁস করে দিয়েছে। তাই তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল তোমরা এই ঘনাটি বলে দিচ্ছ নাকি? তাহলে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়।

গাভীর যে অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল : নিহত ব্যক্তিকে গরুর কোন অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, নিহত ব্যক্তিকে গরুর জিহবা দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল। কেউ বলেন, গরুর রান দ্বারা আর কেউ বলেন মেরুদণ্ড দ্বারা, আবার কেউ কেউ বলেন, গরুর কোনো একটি অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, গরুর কোন অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।

قوله وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ **-এর বিশ্লেষণ** : মহান রাব্বুল আ'লামীন এ আয়াতে জড় পদার্থ পাথরের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন– (১) পাথর হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া (২) পাথর বিদীর্ণ হয়ে উহা হতে স্বল্প পানি নির্গত হওয়া। (৩) আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নিচে গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় অবস্থাটি কারো কারো অজানা থাকতে পারে। কারণ পাথরের কোনোরূপ জ্ঞান অনুভূতি নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, ভয় করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। জন্তু-জানোয়ারের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি প্রত্যক্ষ করি। তবে চেতনার প্রয়োজনও অবশ্য আছে। জড় পদার্থের মধ্যে এতটুকু প্রাণ নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। কারণ চেতনা প্রাণের উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম প্রাণ আছে যা আমরা অনুভব করতে পারি না। উদাহরণ বহু পণ্ডিত মস্তিষ্কের চেতনা শক্তি অনুভব করতে পারে না। তারা একমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা। সুতরাং ধারণা প্রসূত প্রমাণাদির চেয়ে কুরআনি আয়াতের যৌক্তিকতা কোনো অংশে কম নয়। সুতরাং নিচে গড়িয়ে পড়ার অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তা'আলার ভয়।

قوله فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً **-এর ব্যাখ্যা** : আল্লাহ তা'আলা বনী ইরাঈলীদের অন্তরকে জড় পদার্থ পাথরের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা পাথর কোনো কথা শুনেনা, তার উপর কোনো কিছুর প্রভাব পড়ে না। কারো আনুগত্য তার মধ্যে নেই। এমনিভাবে বনী ইসরাঈলীদের অন্তর এত কঠিন হয়ে গিয়েছে যে, কোনো হক বা সত্য তারা গ্রহণ করতে পারে না; কোনো উপদেশ-ধমক তাদের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের অন্তরকে জড় পদার্থ পাথরের সাথে তুলনা করেছেন।

إِدَّارَأْتُمْ -এর অর্থ : إِدَّارَأْتُمْ শব্দটির কয়েকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

(১) তোমরা নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে পরস্পর মতবিরোধ ও ঝগড়া করছিলে। (২) তোমাদের প্রত্যেকেই হত্যার ব্যাপারে নিজেকে মুক্ত রেখে অন্যকে দোষারোপ করছিলে। (৩) তোমরা একে অপরের প্রতি অপবাদ আরোপ করছিলে।

قوله وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰرُ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা এখানে বনী ইসরাঈলের হঠকারিতা কঠিন অন্তরের অধিকারী হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। পাথর শক্ত ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও মানুষের উপকার করে। এটা থেকে ঝর্ণা ধারার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইসরাঈলীদের অন্তর এমন যে, তারা না সত্য গ্রহণ করে, না তাদের অন্তর একটু বিগলিত হয়, না তাদের দ্বারা মানবকুলের কোনো উপকার সাধিত হয়।

قوله وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈল জাতির অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, তাদের অন্তরগুলো কিছুমাত্রও বিগলিত হয় না। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ উপদেশে তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র প্রভাব সৃষ্টি করে না। অথচ কঠিন প্রস্তর আল্লাহর ভয়ে ফেটে যায় এবং তা হতে পানি প্রবাহিত হয়। তারা পাথরের চেয়ে নিকৃষ্টতর।

قوله وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য : বনী ইসরাঈল যে পাথরের চেয়ে কঠিন এবং সত্য পরিত্যাগে অনড় এখানে তার বর্ণনা রয়েছে। অনেক পাথর এমন আছে যে, আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উপর থেকে নিচে পড়ে যায়। জড় পদার্থ হলেও আল্লাহর ভয় তাদের মাঝে বিদ্যমান। কিন্তু বনী ইসরাঈল বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা পাথরের চেয়েও নিকৃষ্ট এবং অবাধ্য।

পাথর কর্তৃক আল্লাহভীতির ধরন : প্রস্তর মহান আল্লাহর এক কঠিন সৃষ্টি। তাদের জ্ঞান নেই, অনুভূতি নেই, নেই তাদের ভাব প্রকাশ করার কোনো ক্ষমতা। কিভাবে সে আল্লাহকে ভয় করে? এর উত্তরে বলা যায়, ভয় করতে কোনো জ্ঞানের দরকার হয় না। বিবেকহীন জ্ঞানহীন প্রাণীর মধ্যেও সাধারণ ভয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। তবে ভয় করার জন্য অনুভূতির প্রয়োজন রয়েছে। আর অনুভূতির জন্য জীবনের প্রয়োজন। অতএব এমনও হতে পারে যে, পাথরের মধ্যে বৃক্ষরাজির ন্যায় এক সূক্ষ্ম জীবন রয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

এখানে তিন রকমের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাবলীল ভঙ্গিতে এদের শ্রেণিবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তাদ্বারা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রুসজল হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম নরম হয়। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথর অপেক্ষাও বেশি শক্ত।

কতক পাথরের মধ্যে উপরিউক্তরূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, আল্লাহর ভয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর উপরিউক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় অধিক দুর্বল। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এর দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত।

أَفَتَطْمَعُونَ দ্বারা সম্বোধন : تَطْمَعُونَ দ্বারা সেসব লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা ঈমানদার। মূলতঃ আয়াতটি এভাবে ছিল : أَفَتَطْمَعُونَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ -হে মুমিনগণ তোমরা কি আশা কর? কারো মতে, সকল সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, রাসূল ﷺ -এবং তাঁর সকল সাথী উদ্দেশ্য।

يُحَرِّفُونَ -এর অর্থ : تَحْرِيفٌ অর্থ- বিকৃত করা। এর দ্বারা আয়াতে উদ্দেশ্য হলো বনী ইসরাঈলের তরফ থেকে তাওরাতের হুকুম আহকাম পরিবর্তন করা। অর্থাৎ কোনো কোনো বাক্য অথবা ব্যাখ্যা অথবা উভয়টিকে ইহুদিরা পরিবর্তন করেছিল। পরিবর্তনের ধরন এমনও হতে পারে– স্বগোত্রের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এরূপ বর্ণনা করা যে, আল্লাহ তা'আলা উপসংহারে বলে দিয়েছেন, তোমরা যে সব আদেশে নিষেধ পালন ও বর্জন করতে সমর্থ না হও তবে তা মাফ।

অথবা, নিজেদের ইচ্ছামত হালাল হারাম ও বৈধ অবৈধের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বিকৃত করেছে। যেমন মুহাম্মদ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিগুলো এবং তাদের মধ্যে বড় লোকদের উপর থেকে শাস্তির আইন রহিতকরণ উল্লেখযোগ্য।

قوله لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا **দ্বারা কারা উদ্দেশ্য :** এখানে ইহুদিদের ঐ সম্প্রদায় উদ্দেশ্য, যারা নবী করীম (সা.)-এর যুগে অবস্থান করছিল। কারো মতে, ইহুদিদের মধ্য হতে যারা মুনাফিক ছিল তারাই উদ্দেশ্য।

قوله لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ **দ্বারা কারা উদ্দেশ্য :** يُحَاجُّوْكُمْ -এর অর্থ হলো– তাহলে তারা এটা নিয়ে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে বিতর্ক করবে। অর্থাৎ ইহুদি নেতারা কপট বিশ্বাসীদের বলছে যে, তোমরা তাওরাত খুলে মুসলমানদের সুযোগ করে দিচ্ছ। মুসলমানরা তোমাদেরকে বলবে যে, মুহাম্মদ ও তার আনীত দীনকে সত্য বলে জেনেও তোমরা কুফরি করছ। –[কুরতুবী]

অথবা, তারা বলে যে, আমাদের মহান গ্রন্থাবলিতে উল্লিখিত যে সব আয়াত ও হেদায়েতের দ্বারা আমাদের বর্তমান ভূমিকার দোষ প্রমাণিত হয় তা মুসলমানদের নিকট প্রকাশ কর না। অন্যথায় তারা তোমাদের আল্লাহর নিকট তোমাদেরই বিরুদ্ধে এসব কথা প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে।

عِنْدَ رَبِّكُمْ **-এর অর্থ :** এর অর্থ–তোমাদের প্রতিপালকের সামনে। এটা হবে কিয়ামত দিবসে। যেমন অন্য আয়াতে আছে– ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ কেউ কেউ বলেন–عِنْدَ رَبِّكُمْ -অর্থ عِنْدَ ذِكْرِ رَبِّكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালকের কথা স্মরণ করার সময়। কারো মতে, عِنْدَ অর্থ فِىْ অর্থাৎ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ তাহলে তারা তোমাদের রবের ব্যাপারে বিতর্ক করবে। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ

لَاتَسْقِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّقْىُ মূলবর্ণ– (س ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে পানি সেচে।

مُسَلَّمَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْلِيْمُ মূলবর্ণ (س ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ– সুস্থ,সবল।

لَاشِيَةَ : এর মধ্যে لا হচ্ছে لانى نفى جنس ; شِيَةٌ তার ইসম। অর্থ নিষ্কলঙ্ক।

مَاكَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব كَرُمَ আর كَادَ يَكَادُ যা فَعُلَ يَفْعَلُ এর ওজনে, মাসদার اَلْكَوْدُ মূলবর্ণ– (ك ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– না করতে পারার নিকটবর্তী হয়েছিল, তারা নিকটবর্তী হয়নি।

فَادّٰرَءْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মূলবর্ণ (د ـ ر ـ ء) মাসদার اَلتَّدَارُءُ জিনস مهموز لام অর্থ– অতঃপর তোমরা একে অপরের উপর অপবাদ দিতে লাগলে। একে অপরকে অভিযুক্ত করলে। فَادّٰرَءْتُمْ মূলতঃ تَدَارَءْتُمْ ছিল। ت কে د দিয়ে পরিবর্তন করে ইদগাম করা হয়েছে এবং শুরুতে একটি همزة وصل যুক্ত করা হয়েছে।

يُحْىِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) মাসদার اَلْاِحْيَاءُ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আল্লাহ তা'আলা জীবিত করবেন।

وَيُرِيكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– আল্লাহ তা'আলা দেখান।

يَشَّقَّقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّشَقُّقُ মূলবর্ণ–(ش . ق . ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে [পাথর] ফেটে বিদীর্ণ হয়।

لَقُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَللِّقَاءُ মূলবর্ণ–(ل . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা মোলাকাত করে। সাক্ষাৎ করে।

خَلَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْوَةُ মূলবর্ণ (خ . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পরস্পরে নিভৃতে মিলিত হয়।

لِيُحَاجُّوكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُحَاجَّةُ মূলবর্ণ (ح . ج . ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা যুক্তি দিয়ে তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ : এখানে ثم হলো حرف عطف আর قَسَتْ ফে'ল আর قُلُوبُكُمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে قَسَتْ ফে'য়েলের فاعل অতঃপর بَعْدَ ذٰلِكَ হলো ظرف সুতরাং ফে'ল, ফা'য়েল ও ظرف মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ : এখানে اَللّٰهُ হলো مبتدأ আর مُخْرِجٌ مَّا الخ হলো خبر অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية এ বাক্যটি এখানে جملة معترضة হয়েছে।

قوله وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ : এখানে مَا হলো لَيْسَ এর অর্থে اَللّٰهُ হলো مَا এর اسم আর بِغَافِلٍ এর হরফে জার অতিরিক্ত। غافل হলো مَا খবর আর عَمَّا تَعْمَلُونَ এটা جملة হয়ে غَافِلٍ-এর সাথে متعلق, অতঃপর স্বীয় اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৭৭) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ সবই অবগত আছেন যা তারা গুপ্ত রাখে এবং তাও যা প্রকাশ করে।	اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (٧٧)
(৭৮) আর তাদের মধ্যে বহু মূর্খ আছে যারা মনভুলানো কথা ভিন্ন কিতাবের আর কিছুরই জ্ঞান রাখে না, তারা আর কিছুই নয়- শুধু অলীক কল্পনাসমূহ রচনা করে থাকে।	وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ (٧٨)
(৭৯) অতএব, অত্যন্ত অমঙ্গল হবে তাদের যারা লিখে নেয় কিতাব নিজেদের হাতে, অতঃপর বলে, এটা আল্লাহর তরফ হতে , উদ্দেশ্য এটা দ্বারা সামান্য অর্থ উপার্জন করবে, সুতরাং তাদের ভীষণ সর্বনাশ হবে তাদের হাত যাকিছু লিখে নিত তদ্দরুন, তাদের আরো ভীষণ সর্বনাশ হবে যা কিছু তারা উপার্জন করত তদ্দরুন।	فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ (٧٩)
(৮০) আর ইহুদিরা বলল, কখনো অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না গণনীয় কয়েক দিন ব্যতীত; আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ হতে কোনো ওয়াদা নিয়েছ? যাতে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করবেন না। অথবা আল্লাহর উপর এমন বাক্য আরোপ করছ যার কোনো জ্ঞান-প্রসূত প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই।	وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٨٠)
অনুবাদ : (৮১) হ্যাঁ, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দুষ্কার্য করে এবং তাকে তার পাপসমূহ ঘিরে ফেলে, বস্তুত এরূপ লোকই দোজখী হয়, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।	بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٨١)

শাব্দিক অনুবাদ

৭৭. اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ তারা কি জানে না যে, اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ আল্লাহ সবই অবগত আছেন مَا يُسِرُّوْنَ যা তারা গুপ্ত রাখে وَمَا يُعْلِنُوْنَ এবং তাও যা প্রকাশ করে।

৭৮. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ আর তাদের মধ্যে বহু মূর্খ আছে لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ যারা কিতাবের কিছুরই জ্ঞান রাখে না اِلَّآ اَمَانِيَّ মনভুলানো কথা ভিন্ন وَاِنْ هُمْ তারা আর কিছুই নয়- اِلَّا يَظُنُّوْنَ শুধু অলীক কল্পনাসমূহ রচনা করে থাকে।

৭৯. فَوَيْلٌ অতএব অত্যন্ত অমঙ্গল হবে তাদের لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ যারা লিখে নেয় الْكِتٰبَ কিতাব بِاَيْدِيْهِمْ নিজেদের হাতে ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ অতঃপর বলে هٰذَا এটা مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লাহর তরফ হতে لِيَشْتَرُوْا بِهٖ উদ্দেশ্য এটা দ্বারা উপার্জন করবে ثَمَنًا قَلِيْلًا সামান্য অর্থ فَوَيْلٌ لَّهُمْ সুতরাং তাদের ভীষণ সর্বনাশ হবে مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ তাদের হাত যা কিছু লিখে নিত তদ্দরুন وَوَيْلٌ لَّهُمْ তাদের আরো ভীষণ সর্বনাশ হবে مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ যা কিছু তারা উপার্জন করত তদ্দরুন।

৮০. وَقَالُوْا আর ইহুদিরা বলল لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ কখনো অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً গণনীয় কয়েক দিন ব্যতীত قُلْ আপনি বলুন اَتَّخَذْتُمْ তোমরা কি নিয়েছ? عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহ হতে عَهْدًا কোনো ওয়াদা فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ যাতে আল্লাহ খেলাফ করবেন না عَهْدَهٗ তাঁর ওয়াদা । اَمْ تَقُوْلُوْنَ অথবা এমন বাক্য আরোপ করছ عَلَى اللّٰهِ আল্লাহর উপর مَا لَا تَعْلَمُوْنَ যার কোনো জ্ঞান-প্রসূত প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই।

৮১. بَلٰى হ্যাঁ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দুষ্কার্য করে وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـئَتُهٗ এবং তাকে তার পাপসমূহ ঘিরে ফেলে فَاُولٰٓئِكَ বস্তুত এরূপ লোকই اَصْحٰبُ النَّارِ দোজখী হয় هُمْ فِيْهَا তারা তথায় خٰلِدُوْنَ অনন্তকাল থাকবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٨٢)

অনুবাদ : (৮২) আর যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে এই শ্রেণির লোকই জান্নাতবাসী হয়, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٨٣)

(৮৩) আর যখন আমি নিলাম প্রতিশ্রুতি বনী ইসরাঈল হতে যে, [কারো] ইবাদত করো না আল্লাহ ব্যতীত। আর উত্তমরূপে মাতা-পিতার খেদমত করবে এবং আত্মীয়দেরও, এতিমদেরও, মিসকিনদেরও, আর সর্বসাধারণের সাথে সুন্দররূপে কথা বলবে, আর কায়েম করবে নামাজ ও আদায় করতে থাকবে জাকাত, অনন্তর তোমরা সকলেই তা ভঙ্গ করলে অল্প কয়েজন ব্যতীত, আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তো তোমাদের চিরাচরিত অভ্যাস।

শাব্দিক অনুবাদ

৮২. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান আনে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করে اُولٰٓئِكَ এই শ্রেণির লোকই اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ জান্নাতবাসী হয় هُمْ فِيْهَا তারা তথায় خٰلِدُوْنَ অনন্তকাল থাকবে।

৮৩. وَاِذْ اَخَذْنَا আর যখন আমি নিলাম مِيْثَاقَ প্রতিশ্রুতি بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈল হতে যে لَا تَعْبُدُوْنَ [কারো] ইবাদত করো না اِلَّا اللّٰهَ আল্লাহ ব্যতীত। وَبِالْوَالِدَيْنِ আর মাতা-পিতার খেদমত করবে اِحْسَانًا উত্তমরূপে وَذِي الْقُرْبٰى এবং আত্মীয়দেরও وَالْيَتٰمٰى এতিমদেরও وَالْمَسٰكِيْنِ মিসকিনদেরও وَقُوْلُوْا আর কথা বলবে لِلنَّاسِ সর্বসাধারণের সাথে حُسْنًا সুন্দররূপে وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আর কায়েম করবে নামাজ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ও আদায় করতে থাকবে জাকাত ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ অনন্তর তোমরা সকলেই তা ভঙ্গ করলে اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ অল্প কয়েজন ব্যতীত وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তো তোমাদের চিরাচরিত অভ্যাস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৭৮- قوله وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায়, উপরোল্লিখিত ইহুদি সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। কারো মতে মাজুস বা অগ্নিপূজারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.)ও এ মতে একমত পোষণ করেছেন। কারো মতে আলোচ্য আয়াত ইহুদি ও মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল – ২ : ইকরিমা ও যাহহাক (র.) বলেন, আরবের আনসারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে, যারা লেখাপড়া জানত না। কারো মতে আহলে কিতাবদের একটি দল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা তাদের কৃত গুনাহের জন্য কিতাব উত্তোলন করেছিল বিধায় তারা উম্মি হয়ে যায়।

শানে নুযূল- ৩ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত এমন এক জাতি সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে, যারা কোনো কিতাব ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনি। সুতরাং তারা নিজেরাই কিতাব লিখে বলেছিল যে, এটা আল্লাহর কিতাব। ফলে তারা কিতাবকে অস্বীকার করার কারণে, তাদেরকে উম্মি বলে আখ্যা দেওয়া হয়। বস্তুতঃ তারা হলো একটি নির্বোধ জাতি, প্রথমোক্ত মতামতই স্থান বিশেষে অধিক প্রযোজ্য।-[বাহরে মুহীত : ৪৪২]

৭৯- قوله فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আলোচ্য আয়াত ইহুদি পণ্ডিতদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, ইহুদিদের মধ্য থেকে একটি দল, যারা তাদের কিতাবসমূহে রাসূল ﷺ -এর বর্ণিত গুণাবলি ও চরিত্রের বর্ণনাসমূহকে পরিবর্তন করে ফেলে, রাসূল ﷺ -এর গঠন-আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁকে লম্বাকৃতিতে একজন আদম সন্তান রূপে পরিচিতি দান করে। অতঃপর তাদের অনুসারীদেরকে বলত যে, দেখ সর্বশেষে যে আদর্শে নবী আগমন করবেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর মাঝে সে চরিত্র ও গুণ নেই। এমন কি ইহুদি পণ্ডিতদের ভয় ছিল যে, নবীর গুণাবলি ও পরিচিতি বর্ণনা যদি যথাস্থানে থেকে যায়, তাহলে তাদের হাদিয়া তোহফা বন্ধ হয়ে যাবে। সে জন্য নবীর গুণাবলির বর্ণনা পরিবর্তন করে দেয়। তাদের পক্ষ থেকে সত্যকে গোপন করার ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে যে সকল মানুষেরা কোনো নবীর কিতাবের প্রতি ঈমান আনেনি; বরং তারা স্বহস্তে কিতাব রচনা করে তাতে তাদের ইচ্ছানুযায়ী হালাল ও হারাম বিষয়াবলি নির্ধারণ করে বলে দিত যে, এ হচ্ছে আল্লাহর গ্রন্থ আসমানি কিতাব। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

আবূ সালেক বলেন যে, বনূ আমের নিলুই (মৃত্যু ৩৭ হিঃ) গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবূ সুরাহ আল কুরাইশী নবী করীম ﷺ -এর সাথে সন্ধি করেছিল, অতঃপর সে নিজেই তা ভঙ্গ করে মুরতাদ বা ধর্মদ ত্যাগী হয়ে যায়। তার এহেন হঠকারিতামূক কাজের পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ারি করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহিত : ৪৪৩/১, ইবনে কাছীর : ১১৭/১]

আয়াতে أُمِّيُّوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : أُمِّيُّوْنَ শব্দটি أُمِّيٌّ -এর বহুবচন। أُمٌّ বা أُمَّةٌ -এর প্রতি নিসবাত করে أُمِّيٌّ বলা হয়। أُمِّيٌّ হলো– মানুষ তো মাতৃগর্ভ থেকে লেখাপড়াবিহীন আসে, এ অবস্থায় যারা সারা জীবন বহাল থাকে, তারা না লেখা জানে আর না পড়া জানে। যেমন নবী করীম ﷺ বলেন– اَنَا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ

আবূ উবায়দার মতে, اُمُّ الْكِتَابِ -এর প্রতি নিসবত করে أُمِّيٌّ বলা হয়ে থাকে। আর্থাৎ তাদের উপর কিতাব নাজিল হয়েছিল বিধায় তাদেরকে أُمِّيٌّ বলা হয়েছে।

أُمِّيٌّ দ্বারা উদ্দেশ্য : أُمِّيٌّ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যে না কোনো কিতাবের স্বীকৃতি দেয়, না কোনো রাসূলের উপর বিশ্বাস করে। অন্য তাফসীরকার বলেন, যে লেখতে এবং পড়তে জানে না তাকে উম্মী বলে। আয়াতে দ্বিতীয় অর্থটি প্রযোজ্য। কেননা ইহুদিরা কিতাব ও রাসূলের স্বীকৃতি দিত। তদুপরি আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন যে, نَحْنُ اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ -আমরা উম্মী জাতি লিখতে জানি না। اُمَّةٌ শব্দের প্রতি নিসবত করে اُمِّيَّةٌ ব্যবহৃত হয়েছে। ইকরামা ও দাহহাক বলেন, তারা হলো আরবের খ্রিস্টান সম্প্রদায়। হযরত আলী (রা.) বলেন, তারা হলো অগ্নিপূজক। –[কুরতুবী]

اِلَّا اَمَانِيَّ এর অর্থ : اماني শব্দটি اُمْنِيَّةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– তেলাওয়াত। তখন আয়াতের অর্থ হবে, তারা কিতাব সম্পর্কে জানে না, জানে শুধু তেলাওয়াত।

অথবা اَمَانِيُّ অর্থ– اَكَاذِيْبُ তথা ভ্রান্ত, মিথ্যা ও বানোয়াট বক্তব্য অর্থাৎ তারা মনগড়া কিছু প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছে। কিতাব সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, বরং কিছু মিথ্যা বানোয়াট বক্তব্য উপস্থাপন করছে মাত্র।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, এর অর্থ এমন আশা যা তাদের জন্য নয়। অতএব তারা আল্লাহর কাছে এমন কিছুর আশা করে যা লাভের যোগ্য তারা নয়। কেউ কেউ বলেন, নির্ধারিত কিছুকে اَمَانِيُّ বলা হয়।

হাত দিয়ে কিতাব লেখার অর্থ : ইহুদিরা নিজের হস্তে কিতাব লিখে, এর অর্থ হলো তারা কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলে। যেখানে মহানবী ﷺ -এর আলোচনা ছিল, সেখানেই তারা কলম ধরে বিকৃত বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে লোকসমাজে প্রচার করে যে, এটাই আল্লাহর কিতাব। এখানে সঠিক ও নিখুঁতভাবে লেখার কথা বলা হয়নি।

قوله ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ -এর তাৎপর্য : মূলতঃ তাওরাতে বিশদভাবে নবী করীম ﷺ-এর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে; কিন্তু ইহুদি জ্ঞানপাপীরা এতে পরিবর্তন করে। মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলি লোক চক্ষুর আড়ালে রাখার জন্য তারা অবিকৃত কপি গোপন করে হস্তলিখিত কপি প্রকাশ করে বলে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত তাওরাত কিতাব।

কিভাবে তারা স্বল্প মূল্যে ক্রয় করল? ইহুদিরা কিতাব বিকৃত করার মাধ্যমে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ তথা নেতৃত্ব ও অন্যান্য ভোগ বিলাসের প্রত্যাশী হয়েছে। যদিও তা অনেক বড়। কিন্তু পরকালের কঠিন শাস্তির মোকাবিলায় তা অত্যন্ত নগণ্য। তারা স্থায়ী শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে।

وَيْلٌ কি? : وَيْلٌ-এর অর্থ নিরূপণে তাফসীরকারদের মতভেদ দেখা যায়। হযরত উসমান (রা.) মহানবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, وَيْلٌ হলো আগুনের পাহাড়। হযরত আবূ সাঈদ বর্ণনা করেন, وَيْلٌ হলো জাহান্নামে অবস্থিত দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা যাতে পতিত ব্যক্তি ৪০ বছর পর্যন্ত অবিরত পড়তেই থাকবে।

সুফিয়ান ইবনে আতা ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে উল্লিখিত وَيْلٌ বলতে ঐ স্থানকে বুঝায়, যা জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে হবে এবং ঐ স্থান দিয়ে জাহান্নামীদের পূঁজ প্রবাহিত হবে। যাহরাভী বলেন যে, وَيْلٌ হলো জাহান্নামের একটি দরজা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, وَيْلٌ হলো কষ্টদায়ক শাস্তি। খলীল বলেন, জঘন্য খারাপকে وَيْل বলা হয়।

কলম দ্বারা প্রথম লেখক : হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত। সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লিখেছেন হযরত ইদ্রীস (আ.)। কেউ বলেন, হযরত আদম (আ.)-কে লেখার শক্তি দান করা হয়েছে। তার নিকট থেকে বনী আদম লেখার উত্তরাধিকারী হয়। -[কুরতুবী]

بِاَيْدِيْهِمْ বলার উদ্দেশ্য : একথা সর্বজনবিদিত যে, মানুষ হাত দ্বারা লিখে, তথাপি আল্লাহ তা'আলা بِاَيْدِيْهِمْ উল্লেখ করেছেন, তাকিদের জন্য। যেমন- وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ কেউ কেউ বলেন, এটা দ্বারা আল্লাহর সাথে হঠকারিতা এবং প্রকাশ্যে অন্যায় করাকে বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, স্বয়ং হাত দ্বারা গর্হিত কাজ করে। তাদের এ অন্যায়ের মধ্যে কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ নেই। তারা একে স্বাভাবিক মনে করে। -[কুরতবী]

এখানে عَهْد দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতে عَهْد বলে وَعْد উদ্দেশ্য। وَعْد -এর স্থলে عَهْد ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে আল্লাহর এই عَهْد শুনিয়ে নিশ্চিত করা।

اَيَّامٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : তাফসীরকারগণ اَيَّامٌ -এর দু'টি তাফসীর করেন যেমন-

ক. اَيَّامٌ তিন থেকে দশের ভেতরের সংখ্যাকে বুঝায়। দশের বাইরের সংখ্যাকে বুঝায় না। অতএব خَمْسَةَ اَيَّامٍ বলা যায় না। একদল মুফাস্‌সির বলেন- اَيَّامٌ বলতে সাত দিন বুঝানো হয়েছে।

খ. তাফসীরে কাবীরের গ্রন্থকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, اَيَّامٌ দ্বারা চল্লিশ দিন উদ্দেশ্য। কেননা, তিনি বলেন- বনী ইসরাঈল চল্লিশ দিন গো-বৎস পূজা করেছিল।

قوله وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـئَتُهٗ -এর মর্মার্থ : اَحَاطَتْ শব্দের অর্থ হলো, ঘিরে ফেলা। অতএব, আয়াতাংশের অর্থ হলো তাকে তার পাপসমূহ ঘিরে ফেলেছে। অর্থাৎ তার কোনো পুণ্য নেই। এ অর্থ কেবলমাত্র কাফেরদের বেলায় প্রযোজ্য। কেননা কুফরির কারণে তাদের কোনো ভালো কাজ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং কুফরির পূর্বে কোনো নেক আমল থাকলেও তা পণ্ড হয়ে গেছে। এজন্য কাফেরদের আমলনামায় কেবল পাপই অবশিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে ঈমানদারদের মূল ঈমানই একটি শ্রেষ্ঠতম সম্পদ ও সৎকাজ। তদুপরি বহুমুখী শাখাবিশিষ্ট অন্যান্য আমল তাদের আমলনামায় শামিল করা হয়। এজন্যই ঈমানদারগণ সম্পূর্ণ নেকীশূন্য হতে পারে না, অতএব মুমিনদের ক্ষেত্রে اِحَاطَةٌ শব্দটি উপরিউক্ত অর্থে প্রযোজ্য নয়। -[বয়ানুল কুরআন]

قوله اَصْحٰبُ النَّارِ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَصْحٰبُ النَّارِ বলে এখানে কাফেরদের ব্যাপারে এমন একটি চিরন্তন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে যদ্দারা তাদের চির আবাস দোজখ হবে বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। হযরত মূসা (আ.)-কে ইহুদিরা নবী মানে, কিন্তু তাঁর পরের দু'জন নবীকে তারা নবী মান্য করে না। তাই তারা কাফের ও চিরদিনের জন্য জাহান্নামী। কাজেই তাদের অল্প কয়েক দিন মাত্র দোজখের শাস্তি ভোগ করার দাবি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে।

শাস্তির আয়াতের পর পুরস্কারের আয়াত উল্লেখের কারণ : কুরআনে কারীমের যেখানেই শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে সেখানেই পাশাপাশি পুরস্কারের কথাও উল্লেখ হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা– (১) এটা আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচারের নমুনা। কাফেরদের চরম চূড়ান্ত শাস্তির পাশাপাশি মুমিনদের চূড়ান্ত নাজাত-এর ঘোষণা দেওয়াই ইনসাফ-এর কথা। (২) ভয় আর আশা তথা আশা নিরাশার মাঝে অবস্থান করাই উত্তম। মুমিনদের ভয় আর প্রত্যাশা হবে সমান শাস্তির আয়াত দ্বারা ভয় আর পুরস্কারের আয়াত দ্বারা প্রত্যাশা এ দু' জিনিসের মাঝেই মুমিন জীবনের ভারসাম্যতা। (৩) পুরস্কার দ্বারা আল্লাহর পূর্ণ রহমত আর শাস্তি দ্বারা তাঁর হিকমতের পূর্ণতা প্রকাশ পায়। –[কাবীর]

سَيِّئَةً দ্বারা উদ্দেশ্য : سَيِّئَةً বলতে সকল প্রকার কবীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, شِرْك উদ্দেশ্য। কেননা আয়াতের শেষের দিকে চিরকাল জাহান্নামে থাকার কথা বলা হয়েছে। কবীরা গুনাহ দ্বারা চিরস্থায়ী শাস্তি হবে না; বরং তাদেরকে শাস্তির পর বেহেশতে নিয়ে আসা হবে।

قوله مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ-এর বর্ণনা : বনী ইসরাঈল থেকে যে সব অঙ্গীকার আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলো নিম্নরূপ– (ক) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। (খ) মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে। (গ) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। (ঘ) এতিম মিসকিনদের সাথেও আচরণ করতে হবে। (ঙ) সর্বস্তরের মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। (চ) সম্মিলিতভাবে সালাতের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। (ছ) জাকাত প্রদান করবে। (জ) নিজেদের মধ্যে পরস্পর রক্তপাত করবে না। (ঝ) অন্যকে ঘর-বাড়ি হতে বিতাড়িত করবে না।

আল্লাহর ইবাদতের পর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখের কারণ : আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বনী ইসরাঈল থেকে তাঁর ইবাদত করার অঙ্গীকার নিয়েছেন। অতঃপর পিতামাতার সাথে সদাচরণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, এর কারণ নিম্নরূপ–

১. আল্লাহর অনুগ্রহ অসীম, সদা বর্ষিত ও সর্বোৎকৃষ্ট বিধায় সকল শুকরিয়ার পূর্বে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তাঁর অনুগ্রহের পরেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি তদীয় পিতা-মাতার অনুগ্রহ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হচ্ছেন সন্তানের মূল উৎস ও অস্তিত্ব লাভের মাধ্যম।

২. মানব অস্তিত্বে আসার আসল এবং মূল প্রভাবশালী হলেন আল্লাহ, আর বাহ্যিক হলেন পিতা-মাতা।

৩. আল্লাহ বান্দা থেকে তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহের বিনিময় চান না। তদ্রূপ পিতা-মাতাও সন্তান থেকে তাঁদের অনুগ্রহের বিনিময় চান না।

৪. বান্দা অপরাধ করলেও আল্লাহ তদীয় নিয়ামত থেকে বান্দাকে বঞ্চিত করেন না। তদ্রূপ পিতা-মাতাও শত অপরাধ সত্ত্বেও সন্তান থেকে বাৎসল্য প্রত্যাহার করেন না।

قوله قَلِيْلًا দ্বারা যাদের বুঝানো হয়েছে : যারা তাওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত قَلِيْلًا দ্বারা কেবল তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তাওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর আনীত শরিয়তের পুরোপুরি অনুসারী ছিল। আর তাওরাত রহিত হওয়ার পর তারা ইসলামি শরিয়তের অনুসারী হয়ে যায়।

يَتِيْم-এর অর্থ : يَتِيْم শব্দটি একবচন, বহুবচন يَتَامٰى ও اَيْتَامٌ -যে সন্তানের পিতা মারা যায়, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তাকে يَتِيْم বলা হয়, তবে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর এতিম বলা হয় না। তবে যার মাতা মারা যায় তাকে এতিম বলা হয় না। ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, এ নীতি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্য জীবের কোনো বাচ্চার মা মারা গিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলে তাকেও يَتِيْم বলা হয় না। একই ঝিনুকে একটি মাত্র মুক্তা সৃষ্টি হলে তাকে دُرٌّ يَتِيْم বলে।

তালহা ইবনে ওমর (র.) বলেন, আমি হযরত আতা (র.)-কে বললাম, আমার কাছে ভ্রান্ত লোকেরা আসা যাওয়া করে; কিন্তু আমার মেজায কঠোর, এ ধরনের লোক আমার কাছে আসলে আমি তাদের তাড়িয়ে দেই, আতা (র.) বললেন, এরূপ করবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন যে, قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا অর্থাৎ মানুষের সাথে মার্জিত কথা বলবে। ইহুদি খ্রিস্টানরাও এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। সুতরাং মুসলমান অতি মন্দ হলেও সে এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞাতব্য : তাফসীরবিদগণ ইহুদিদের এ বক্তব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হলো এই যে, ঈমানদার ব্যক্তি গুনাহগার হলে গুনাহ পরিমাণে দোজখ ভোগ করবে। কিন্তু ঈমানের ফলস্বরূপ চিরকাল দোজখে থাকবে না। কিছুকাল পরই তা থেকে মুক্তি পাবে।

অতএব, ইহুদিদের দাবির সারমর্ম এই যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) প্রচারিত ধর্ম রহিত হয়নি। কাজেই তারা ঈমানদার। হযরত ঈসা (আ.) ও হুজুরে আকরাম ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকার করার পরও তারা কাফের নয়। সুতরাং যদি কোনো পাপের কারণে তারা দোজখে চলেও যায়, কিন্তু কিছু দিন পরই মুক্তি পাবে। বলাবাহুল্য, এ দাবিটি একটি সত্যের উপর অসত্যের ভিত্তি বৈ নয়। কেননা হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম চিরকালের জন্য– এরূপ দাবিই অসত্য। অতএব, হযরত ঈসা (আ.) ও হুজুরে আকরাম (সা.)-এর নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে ইহুদিরা কাফের। কাফেরও কিছুদিন পর দোজখ থেকে মুক্তি পাবে, এমন কথা কোনো আসমানি গ্রন্থে নেই– যা আলোচ্য আয়াতে অস্বীকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইহুদিদের দাবিটি যুক্তিহীন; বরং যুক্তিবিরুদ্ধ।

গুনাহগার দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে; কারণ কুফরের কারণে কোনো সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য থাকে না। কুফরের পূর্বে কিছু সৎকর্ম করে থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই কাফেরদের মধ্যে আপাদমস্তক গুনাহ ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করা যায় না। ঈমানদারদের অবস্থা কিন্তু তা নয়। প্রথমতঃ তাদের ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য নেক আমল তাদের আমলনামায় লেখা হয়। সে জন্য ঈমানদার সৎকর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। সুতরাং উল্লিখিত বেষ্টনী তাদের বেলায় অবান্তর।

জ্ঞাতব্য : 'অল্প কয়েকজন' অর্থ তারাই যারা তাওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত, তাওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা হযরত মূসা (আ.) প্রবর্তিত শরিয়তের অনুসারী ছিল এবং তাওরাত রহিত হওয়ার পর ইসলামি শরিয়তের অনুসারী হয়ে যায়। আয়াত দৃষ্টে বুঝা যায় যে, একাত্মবাদে ঈমান এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন এতিম বালক-বালিকা ও দীন-দরিদ্রের সেবাযত্ন করা, মানুষের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা, নামাজ পড়া এবং জাকাত দেওয়া ইসলামি শরিয়তসহ পূববর্তী শরিয়তসমূহেও ছিল।

শিক্ষা ও প্রচার ক্ষেত্রে কাফেরের সাথেও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ নয়

قوله وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا : আয়াতে এমন কথাকে বুঝানো হয়েছে, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত। এর অর্থ এই যে, যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রভাবে হাসিমুখে ও খোলা মনে বলবে– যার সাথে কথা বলবে, সে সৎ হোক বা অসৎ, সুন্নী হোক বা বিদআতী। তবে ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা কারো মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে নবুয়ত দান করে ফেরাউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا অর্থাৎ তোমরা উভয়েই ফেরাউনকে নরম কথা বলবে। আর যারা অন্যের সাথে কথা বলে, তারা হযরত মূসা (আ.)-এর চাইতে উত্তম নয় এবং যার সাথে কথা বলে, সেও ফেরাউন অপেক্ষা বেশি মন্দ ও পাপিষ্ঠ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

أُمِّيُّوْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন أُمِّيٌّ অর্থ- নিরক্ষর লোক। এখানে মূর্খ ইহুদিরা উদ্দেশ্য।

اَمَانِىَّ : শব্দটি বহুবচন, একবচন اُمْنِيَّةٌ অর্থ আশা আকাঙ্ক্ষা।

يَظُنُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلظَّنُّ মূলবর্ণ (ظ . ن . ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ তারা বিশ্বাস করে।

وَيْلٌ : শব্দটি اِسْمٌ অর্থ- দোজখের একটি উপত্যকার নাম। আজাবের কষ্ট।

يَشْتَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা বিনিময় লাভ করতে পারে।

اتَّخَذْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (ا . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা অঙ্গীকার করেছ।

اَحَاطَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح . و . ط) জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা বেষ্টন করে নিয়েছে।

مِيْثَاقَ : শব্দটি একবচন, বহুবচন مَوَاثِيْقُ অর্থ- অঙ্গীকার, শপথ, কথা, ওয়াদা।

حُسْنًا : সীগাহ واحد مؤنث বহছ فعل تفضيل অর্থ- ভালো উত্তম।

اَقِيْمُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা কায়েম কর। তোমরা প্রতিষ্ঠিত কর।

تَوَلَّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তোমরা পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছ।

مُعْرِضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْرَاضُ মূলবর্ণ (ع . ر . ض) জিনস صحيح অর্থ- বিমুখ লোকজন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ : এখানে مِنْهُمْ শব্দটি خبر مقدم আর اُمِّيُّوْنَ হলো موصوف আর لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ বাক্য হয়ে صفة, এবার موصوف ও صفت মিলে مبتدأ مؤخر তারপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية গঠিত হয়ে গেছে।

قوله وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ : এখানে اَخَذْنَا ফে'ল ও ফা'য়েল مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَاۤئِيْلَ মাফউল। ফে'ল, ফা'য়েল ও মাফউল মিলে جملة فعلية গঠিত হয়েছে। قوله اِحْسَانًا পদটি উহ্য اَحْسِنُوْا এর মাফউল হেতু মানসূব হয়েছে। قوله حُسْنًا পদটি উহ্য قَوْلًا -এর সিফাত আর قَوْلًا হলো قُوْلُوْا -এর মাফউলে মুতলাক।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ (٨٤)

অনুবাদ : (৮৪) আর যখন আমি তোমাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিলাম যে, তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না এবং বিতাড়িত করবে না স্বগোত্রীয় লোকদেরকে নিজ দেশ হতে, অতঃপর তোমরা অঙ্গীকারও করলে এবং অঙ্গীকারও এরূপ যেন তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (٨٥)

(৮৫) অতঃপর তোমাদের অবস্থা হলো এই– পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছ এবং বের করে দিতেছ একদল অন্য দলকে নিজেদের দেশ হতে, ঐ সমস্ত স্বজনদের বিরুদ্ধে সহায়তা করছ পাপ ও অন্যায়মূলক; আর যদি তাদের মধ্য হতে কেউ তোমাদের নিকট বন্দী হয়ে আসে, তবে মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করিয়ে দাও, অথচ তাদেরকে নিজ দেশ হতে বিতাড়িত করাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ; তবে কি তোমরা ঈমান রাখ কিতাবের কোনো কোনো অংশের প্রতি এবং অবিশ্বাস কর কোনো কোনো অংশকে? সুতরাং কি শাস্তি হতে পারে তার যে তোমাদের মধ্য হতে এরূপ করে, পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামত দিবসে ভীষণ আজাবে নিক্ষিপ্ত হওয়া ব্যতীত? আর আল্লাহ তা'আলা বে-খবর নন, তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে।

শাব্দিক অনুবাদ

৮৪. وَاِذْ اَخَذْنَا আর যখন আমি নিলাম مِيْثَاقَكُمْ তোমাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি যে لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না وَلَا تُخْرِجُوْنَ এবং বিতাড়িত করবে না اَنْفُسَكُمْ স্বগোত্রীয় লোকদেরকে مِّنْ دِيَارِكُمْ নিজ দেশ হতে ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ অতঃপর তোমরা অঙ্গীকারও করলে وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ এবং অঙ্গীকারও এরূপ যেন তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ।

৮৫. ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ অতঃপর তোমাদের অবস্থা এই হলো تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত আছ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا এবং বের করে দিচ্ছ একদল অন্য দলকে مِّنْ دِيَارِهِمْ নিজেদের দেশ হতে تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ ঐ সমস্ত স্বজনদের বিরুদ্ধে সহায়তা করছ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ পাপ ও অন্যায়মূলক وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ আর যদি তাদের মধ্য হতে কেউ তোমাদের নিকট আসে اُسٰرٰى বন্দী হয়ে تُفٰدُوْهُمْ তবে মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করিয়ে দাও وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ অথচ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ اِخْرَاجُهُمْ তাদেরকে নিজ দেশ হতে বিতাড়িত করাও اَفَتُؤْمِنُوْنَ তবে কি তোমরা ঈমান রাখ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ কিতাবের কোনো কোনো অংশের প্রতি وَتَكْفُرُوْنَ এবং অবিশ্বাস কর بِبَعْضٍ কোনো কোনো অংশকে فَمَا جَزَآءُ সুতরাং কি শাস্তি হতে পারে তার مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ যে এরূপ করে مِنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে اِلَّا خِزْيٌ লাঞ্ছনা ব্যতীত فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ এবং কিয়ামত দিবসে يُرَدُّوْنَ নিক্ষিপ্ত হওয়া اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ভীষণ আজাবে وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আর আল্লাহ তা'আলা বে-খবর নন عَمَّا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٨٦)

অনুবাদ : (৮৬) এরাই তারা যারা দুনিয়াকে গ্রহণ করেছে আখেরাতের বদলে, সুতরাং তাদের আজাবও কম হবে না, কেউ তাদের সহায়তাও করতে পারবে না।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (٨٧)

(৮৭) আর আমি দান করলাম মূসাকে কিতাব এবং তাঁর পর ক্রমান্বয়ে পাঠালাম বহু পয়গম্বর, আর দান করলাম ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রকাশ্য দলিলসমূহ আর তাঁকে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করলাম। এটা কি বিস্ময়কর নয় যে, যখনই তোমাদের নিকট আনলেন কোনো রাসূল তোমাদের অবাঞ্ছিত আহকাম [তখনই] তোমরা অহংকার করতে লাগলে, ফলে কাউকেও মিথ্যাবাদী বললে, আর কাউকেও তো হত্যাই করে ফেলতে।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (٨٨)

(৮৮) আর তারা বলে, আমাদের অন্তঃকরণ সংরক্ষিত; বরং তাদের কুফরির কারণে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত রয়েছে এবং তারা অতি সামান্য পরিমাণেই ঈমান রাখে।

শাব্দিক অনুবাদ

৮৬. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ এরাই তারা যারা اشْتَرَوُا গ্রহণ করেছে الْحَيَاةَ الدُّنْيَا দুনিয়াকে بِالْآخِرَةِ আখেরাতের বদলে فَلَا يُخَفَّفُ সুতরাং কম হবে না عَنْهُمُ তাদের الْعَذَابُ আজাবও وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ কেউ তাদের সহায়তাও করতে পারবে না।

৮৭. وَلَقَدْ آتَيْنَا আর আমি দান করলাম مُوسَى الْكِتَابَ মূসাকে কিতাব وَقَفَّيْنَا এবং ক্রমান্বয়ে পাঠালাম مِنْ بَعْدِهِ তাঁর পর بِالرُّسُلِ বহু পয়গম্বর وَآتَيْنَا আর দান করলাম عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে الْبَيِّنَاتِ প্রকাশ্য দলিলসমূহ وَأَيَّدْنَاهُ আর তাঁকে সাহায্য করলাম بِرُوحِ الْقُدُسِ রূহুল কুদুস দ্বারা أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ এটা কি বিস্ময়কর নয় যে, যখনই তোমাদের নিকট আনলেন رَسُولٌ কোনো রাসূল بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ তোমাদের অবাঞ্ছিত আহকাম اسْتَكْبَرْتُمْ [তখনই] তোমরা অহংকার করতে লাগলে فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ফলে কাউকেও মিথ্যাবাদী বললে وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ আর কাউকেও তো হত্যাই করে ফেলতে।

৮৮. وَقَالُوا আর তারা বলে قُلُوبُنَا غُلْفٌ আমাদের অন্তঃকরণ সংরক্ষিত; بَلْ বরং لَعَنَهُمُ اللَّهُ তাদের উপর আল্লাহর লা'নত بِكُفْرِهِمْ তাদের কুফরির কারণে فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ এবং তারা অতি সামান্য পরিমাণেই ঈমান রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮৪- قوله وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ১. পরস্পর খুনাখুনি করবে না। ২. কেউ কাউকে বহিষ্কার করবে না। ৩. নিজেদের মধ্যে কেউ বন্দি হলে তাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনবে। এই তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম দুটি তারা লঙ্ঘন করত। কিন্তু তৃতীয়টি মানার ব্যাপারে ছিল তৎপর। ঘটনাটির মূল বিবরণ হলো এই মদিনাতে দুটি আনসার গোত্র বাস করত আউস এবং খাজরাজ। আউস এবং খাজরাজের মাঝে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। কখনো কখনো এ দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পর্যায়ে চলে যেত। পাশাপাশি সেখানে দুটি ইহুদি গোত্র বাস করত। বনী কুরাইজা ও বনী নজীর। বনী কুরাইজা ছিল আউসের বন্ধু আর বনী নজীর ছিল খাজরাজের বন্ধু। ফলে আউস এবং খাজরাজের লড়াই যখন শুরু হতো, তখন বনী কুরাইজা ও বনী নজীরও তাদের বন্ধুদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত, তাতে আউস এবং খাজরাজের লোক যেমন মারা যেত তেমনি বনী নজীর ও বনী কুরাইজার লোকও মারা যেত। একে অপরকে দেশান্তর করত; কিন্তু তাদের একটি আচরণ ছিল অদ্ভুত। যখন তাদের কেউ প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হতো তখন মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনত। তাদের এহেন দৃষ্টান্তপূর্ণ আচরণ -এর জবাবে আল্লাহ পাক এই আয়াতগুলো নাজিল করেন। আর তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হতো আপনারা বন্দীদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনেন কেন? তখন তারা বলে এটা আল্লাহর নির্দেশ। তাহলে যুদ্ধ করেন কেন? আমাদের মিত্ররা হেরে যাবে এই লজ্জায়।

٨٧- قوله وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উল্লিখিত আয়াতে বনী ইসরাঈলদের গর্ব-অহংকার ইচ্ছা ও কামনাপূজারী হওয়ার বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। তারা তাওরাত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর পরে অপরাপর যত নবী আগমন করেছিলেন তাদের বিরোধিতা করেছিল। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতা শেষ হয় হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে। তিনি আসমানি কিতাব ইঞ্জিল প্রাপ্ত হন : যার কোনো কোনো আহকাম তাওরাতের বিপরীত ছিল। তাকে নতুন নতুন মু'জিযাও প্রদান করা হয়েছিল। যেমন মৃতকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করা, মাটির তৈরি পাখির মধ্যে ফুঁক দিয়ে আল্লাহর হুকুমে উড়িয়ে দেওয়া, রুগীকে ফুঁক দ্বারা আল্লাহর হুকুমে আরোগ্য করা, গায়েব অবগত করা ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও তাঁকে রূহুল কুদুস অর্থাৎ, হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈলের মিথ্যা প্রতিপাদন ও অহংকার আরো বেড়ে চলে। তাদের সে পুরনো ইতিহাস স্মরণ করিয়ে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ **দ্বারা সম্বোধন :** وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ বাক্য দ্বারা যদিও মহানবী (সা.)-এর সমসাময়িক ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাদের পূর্ব-পুরুষদের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ তুলে ধরে তাদের ঘটনা স্মরণ করিয়ে উপদেশ দেওয়া উদ্দেশ্য। ৮৪ নং আয়াতে অঙ্গীকারের বিষয়বস্তু উল্লেখ করে পরবর্তী আয়াতসমূহে তাদের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ যে সে অঙ্গীকারের বিপরীত কর্ম তা বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব তাদের কর্ম দ্বারা অঙ্গীকার ভঙ্গ হচ্ছে। কেননা তখন আল্লাহ তো বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতে ইহুদিদের জন্যই অঙ্গীকার পেশ করেছিলেন। আর তারাই অঙ্গীকার করেছিল সকল ইহুদিদের পক্ষে। সুতরাং মহানবীর সমসাময়িক ইহুদিরাও অঙ্গীকারের মধ্যে শামিল এবং তারাই নিজ অঙ্গীকারের বিপরীত কর্ম করে যাচ্ছে।

পূর্ববর্তীদের সম্বোধন এবং পরবর্তীদের তিরস্কার করা হয়েছে। অতএব, وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ -এর অর্থ হবে– اَمَرْنَاكُمْ وَاَكَّدْنَا الْاَمْرَ فَاَقْرَرْتُمْ بِلُزُوْمِهٖ وَوُجُوْبِهٖ অর্থাৎ আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি আর সে নির্দেশকে অবশ্য পলনীয় করেছি, অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই পালনীয় করবে বলে স্বীকৃতি দিয়েছ। –[কাবীর]

قَوْلُهٗ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ الخ **-এর বিশ্লেষণ :** এ স্থানে ইহুদিদের দু'টি শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি পার্থিব অবমাননা ও লাঞ্ছনা। তাদের এই শাস্তি হুজুর ﷺ-এর জীবিতকালেই মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধে বনী কুরাইযা ধৃত ও নিহত হয়, আর বনী নাযীর অপরিসীম লাঞ্ছনার সাথে শাম দেশের দিকে বর্তমান সিরিয়ার দিকে বিতাড়িত হয়। আর দ্বিতীয় শাস্তি আখেরাতের আজাব। –[বয়ানুল কুরআন]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জিযিয়া কর প্রদান এবং অপমানিত হওয়া। এ মতটি দুর্বল। কেননা তাদের শরিয়তে জিযিয়া কর ছিল কিনা তা পরিষ্কার নয়, তবে যদি তা মহানবী (সা.)-এর সময়কার ধরা হয় তাহলে কোনো অসুবিধা হয় না।

কঠোর তিরস্কার এবং চরম অবমাননা ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্ধারিত হবে, যারা যে কোনো যুগে এবং যে কোনো অবস্থাতে আল্লাহর নির্দেশের কিছু মানবে আর কিছু প্রত্যাখ্যান করবে। এ মতটিই গ্রহণযোগ্য। –[কাবীর]

قَفَّيْنَا **দ্বারা উদ্দেশ্য :** قَفَّيْنَا সীগাহটি تَقْفِيَةٌ হতে নির্গত। এর অর্থ– পর্যায়ক্রমে আসা। একটি অপরটি অনুকরণ করা। تَقْفِيَةٌ মূলতঃ اَلْقَفَا হতে নির্গত। যার অর্থ ঘাড়ের পেছনের অংশ। যখন কারো পেছন থেকে আসা হয় তখন বলা হয়, اِسْتَقْفَيْتُهٗ। এ ছাড়া যখন কাব্যে একটির সাথে অপরটির ছন্দ মিল ও অর্থ মিল পরিলক্ষিত হয় তখন বলা হয়, قَافِيَةُ الشِّعْرِ -এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর পর অনেক রাসূল প্রেরণ করেছেন। যারা তাঁর অনুসরণ অনুগমন করেছেন, তারা ছিল বনী ইসরাঈলের নবী। –[ফাতহুল কাদীর]

بَيِّنَاتٌ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** بَيِّنَاتٌ দ্বারা এখানে مُعْجِزَةٌ উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, بَيِّنَاتٌ হলো মৃতকে জীবিত করা, শ্বেত (ধবল) রোগ মুক্ত করা, অদৃশ্যের সংবাদ দান, হযরত জিবরাঈলকে দিয়ে সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।

কাফেরদের অহংকারের ধরন : নবী ও রাসূলগণের সাথে অহংকারের অর্থ হলো–তাদের ডাকে সাড়া না দেওয়া এবং তাদের রিসালাত প্রাপ্তিকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া। সমাজের এতিম, অসহায় ব্যক্তি হতে পারে না, আল্লাহ তার রিসালাত প্রদানের জন্য ভালো লোক কি খুঁজে পাননি? এ সকল উক্তিই তাদেরকে অহংকারী বানিয়ে দিয়েছে।

ইহুদিদের ঈমানের অর্থ : কয়েকটি বিষয়ে অন্যদের বিশ্বাসের সাথে ইহুদিদের বিশ্বাসের মিল রয়েছে। যেমন–আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা, কিয়ামতকে বিশ্বাস করা। এসব তারাও স্বীকার করে, কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত ও কুরআনকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না। এ আংশিক ঈমানকে আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমান বলা হয়েছে। যার অর্থ– সাধারণ বিশ্বাস। শরিয়তের পরিভাষায় একে ঈমান বলা যায় না। শরিয়তে ঐ ঈমানই স্বীকৃত, যা شَارِعْ তথা শরিয়ত প্রবর্তক বর্ণিত সকল বিষয়কে বিশ্বাস করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

অস্বীকৃত ও নিহত নবী : বনী ইসরাঈল একদল নবীকে অস্বীকার করেছে আর একদলকে হত্যা করেছে। অস্বীকৃত নবীগণের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং নিহত নবীদের মধ্যে হযরত ইয়াহইয়া ও যাকারিয়া (আ.) উল্লেখযোগ্য।

قوله قُلُوبُنَا غُلْفٌ -এর মর্মার্থ : এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন– (১) غُلْف শব্দটি اَغْلَفُ -এর বহুবচন اَغْلَفُ তাকে বলা হয় যা غِلَافٌ বা আবরণীর ভেতরে থাকে। অর্থাৎ আমাদের অন্তর পর্দা দিয়ে ঘেরা, সেখানে তোমার দাওয়াত পৌঁছবে না। (২) কোনো কোনো মুফাস্সির বলেন যে, আমাদের অন্তর বিদ্যা (عِلْم) দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ, অতএব মুহাম্মদের শরিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। (৩) অথবা, আমাদের অন্তর খালি গিলাফের মতো। ভেতরে কিছুই নেই। অন্তর পরিষ্কার, কারো জন্য কোনো শত্রুতা নেই।

قوله فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ -এর ব্যাখ্যা : তাফসীরকারগণ এর তিনটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। যথা– (১) قَلِيْل শব্দটি مُؤْمِنٌ -এর সিফাত। অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে অত্যন্ত কম সংখ্যক লোকই মু'মিন হবে, বিশ্বাস করবে। (২) قَلِيْل শব্দটি مُؤْمِنٌ এর সিফাত অর্থাৎ তারা কিছু বিষয়ে ঈমান আনে। কেননা তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কিন্তু রাসূল ﷺ-কে বিশ্বাস করে না। (৩) তারা মূলেই ঈমান আনে না। না কম - না বেশি।

لعنت শব্দের অর্থ : لَعْنٌ শব্দের মূল অর্থ– তাড়ানো বা দূরে নিক্ষেপ করা। আল্লাহর লা'নত অর্থ তার রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়া। করুণা হতে বঞ্চিত হলে গজবের উপযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

قوله بِرُوحِ الْقُدُسِ -এর মর্ম : আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ.)-কে رُوحُ الْقُدُسِ দ্বারা সাহায্য করেছেন। এখানে "রূহুল কুদুস" দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয় উদ্দেশ্য। যথা–(ক) তাঁর পবিত্র আত্মা যা স্বয়ং আল্লাহর কালিমা। (খ) ওহীর জ্ঞান। (গ) ইসমে আযম যদ্দ্বারা তিনি মৃতকে জীবিত করতেন এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা করতেন। (ঘ) কিংবা ইঞ্জিল কিতাব। (ঙ) হযরত জিবরাঈল।

সর্বশেষ মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ অপরাপর যাবতীয় বিষয় اَلْبَيِّنٰتُ -এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

- اَقْرَرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْرَارُ মূলবর্ণ (ق . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা স্বীকার করেছ।
- تَشْهَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلشَّهَادَةُ মূলবর্ণ (ش . ه . د) অর্থ– তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ।
- تَقْتُلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَتْلُ মূলবর্ণ (ق . ت . ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা হত্যা কর, করবে।
- وَتُخْرِجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ (خ . ر . ج) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বের কর, বের করে দাও, বের করে দিবে।
- وَالْعُدْوَانِ : জুলুম, অবিচার। نَصَرَ বাব عَدَا يَعْدُوْا عَدْوًا হতে অর্থ– অন্যায় করা। অবিচার করা।
- اُسٰرٰى : শব্দটি বহুবচন, একবচন اَسِيْرٌ। অর্থ– কয়েদীগণ।
- تُفٰدُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُفَادَاةُ মূলবর্ণ (ف . ى . د) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা মালের বিনিময়ে তাদের মুক্ত করেছ।

مُحَرَّمٌ : সীগাহ جمع مذكر اسم مفعول বহছ বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْرِيْمُ মূলবর্ণ (ح . ر . م) জিনস صحيح অর্থ- আল্লাহর পক্ষ হতে যা হারাম করা হয়েছে।

تُؤْمِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ا . م . ن) জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা ঈমান আনবে।

تَكْفُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك . ف . ر) অর্থ- তোমরা কুফরি কর, তোমরা কুফরি করবে।

خِزْيٌ : এটি মাসদার, অর্থ- অবমাননা, জিল্লতি, লাঞ্ছনা।

اَلْحَيٰوةِ : এটি মাসদার, অর্থ- জীবন, বেঁচে থাকা।

الدُّنْيَا : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّانِيَةُ মূলবর্ণ (د . ن . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- দুনিয়া, পৃথিবী, জগত, বহু নিকট, খুব নিকৃষ্ট।

كَذَّبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْذِيْبُ মূবর্ণ (ك . ذ . ب) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা অস্বীকার করেছ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ : এখানে اَنْتُمْ হচ্ছে মুবদাতা আর এটার خبر এর মধ্যে তিনটি নিয়ম আছে।

১. تَقْتُلُوْنَ পদ خبر এই অবস্থায় هؤلاء -এর মধ্যে দু'টি অবস্থা হতে পারে। একটি হলো هٰؤُلَاءِ পদ اَعْنِىْ উহ্য ফে'ল-এর مفعول হিসেবে منصوب হবে। আর দ্বিতীয়টি হলো هٰؤُلَاءِ পদটি ياء হরফে নেদা-এর মোনাদা। আর হরফে নেদা হওয়ার প্রক্রিয়াটি سيبويه নাবহীর মতে জায়েজ নেই। কেননা, هٰؤُلَاءِ পদটি مُبْهَمْ এর সাথে উহ্য থাকতে পারে না।

২. অথবা هٰؤُلَاءِ পদটি اَلَّذِيْنَ -এর অর্থে হয়ে خبر হবে। আর تَقْتُلُوْنَ অর্থ هٰؤُلَاءِ اَلَّذِيْنَ এর صلة তারকীবের এই প্রক্রিয়াটিও দুর্বল। কেননা بصريين এর মাযহাব হচ্ছে هٰؤُلَاءِ পদটি اَلَّذِيْنَ এর স্থলে হতে পারে না। আর كوفيين এটা জায়েজ রাখে।

৩. এখানে هٰؤُلَاءِ পদটি مِثْل পদ উহ্য مضاف এর مضاف اليه এখন مضاف এবং مضاف اليه মিলিত হয়ে - انتم এর خبر হবে। আর এই অবস্থায় تَقْتُلُوْنَ পদটি حال যার উপর আমল করবে معنى تشبيه ;

قوله وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ : واو টি হরফে আতফ يَوْمَ الْقِيَامَةِ মাফউলে ফীহি মুকাদ্দাম يُرَدُّوْنَ ফে'ল তার যমীর নায়েব ফা'য়েল, اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ তার মুতায়াল্লিক। ফে'ল, নায়েব ফায়েল ও মুতায়াল্লাক মিলে جملة فعلية গঠিত হলো।

قوله وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ: اتينا ফে'ল ও ফা'য়েল مُوْسٰى প্রথম মাফউল, اَلْكِتَابَ দ্বিতীয় মাফউল। ফে'ল ফা'য়েল ও উভয় মাফউল মিলে جملة فعلية গঠিত হয়েছে।

قوله وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ: قَفَّيْنَا ফে'ল ও ফা'য়েল مِنْ بَعْدِهٖ তার মুতাআল্লিক بِالرُّسُلِ মাফউল, ফে'ল, ফা'য়েল, মুতাআল্লেক ও মাফউল মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ : قَالُوْا ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে جملة হয়ে قول হলো قُلُوْبُنَا মুবতাদা غُلْف খবর, বাক্য হয়ে মাকুলা।

قوله لَعَنَهُمُ اللّٰهُ : لعن ফে'ল هُمْ মাফউল اَللّٰه ফা'য়েল। ফে'ল ফা'য়েল ও মাফউল মিলিত হয়ে جملة فعلية হয়েছে।

قوله فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ : এর قَلِيْلًا পদটি উহ্য اِيْمَانٌ এর সিফাত হেতু منصوب হয়েছে।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۡ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (٨٩)

(৮৯) আর যখন তাদের নিকট এমন কিতাব আসল আল্লাহর পক্ষ থেকে যা তাদের সঙ্গীয় কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী; অথচ ইতঃপূর্বে তারা তার বর্ণনা করত কাফেরদের নিকট, অতঃপর যখন তাদের নিকট আসল সেই পরিচিত কিতাব, তখন তারা তাকে অস্বীকার করে বসল, সুতরাং আল্লাহর লা'নত হোক এরূপ কাফেরদের উপর।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (٩٠)

(৯০) নিতান্ত জঘন্য সেই অবস্থাটি যা অবলম্বন করে তারা নিজেদের মুক্ত করতে চায় অর্থাৎ অমান্য করে এমন জিনিস যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন, শুধু [এই] হঠকারিতায় যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় তাঁর বাঞ্ছিত বান্দার উপর [কিছু] নাজিল করেন, সুতরাং তারা গজবের উপর গজবের যোগ্য হয়েছে; আর কাফেরদের জন্য আছে লাঞ্ছনাময় শাস্তি।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٩١)

(৯১) আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা ঈমান আন ঐ সব কিতাবের উপর যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন, তখন বলে, আমরা ঈমান আনব [শুধু] আমাদের প্রতি অবতারিত কিতাবের উপর, তদ্ব্যতীত আর সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে, অথচ সেগুলোও [বাস্তবিকপক্ষে] সত্য, অধিকন্তু তাদের সঙ্গীয় কিতাবের সত্যতাও প্রমাণকারী; আপনি বলুন, তবে কেন হত্যা করছিলে আল্লাহর নবীগণকে ইতঃপূর্বে যদি তোমরা মুমিন ছিলে?

শাব্দিক অনুবাদ

৮৯. وَلَمَّا جَآءَهُمْ আর যখন তাদের নিকট আসল كِتٰبٌ কিতাব مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে مُصَدِّقٌ যা সত্যতা প্রমাণকারী لِّمَا مَعَهُمْ তাদের সঙ্গীয় কিতাবের وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ অথচ ইতঃপূর্বে তারা يَسْتَفْتِحُوْنَ তার বর্ণনা করত عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেরদের নিকট فَلَمَّا جَآءَهُمْ অতঃপর যখন তাদের নিকট আসল مَّا عَرَفُوْا সেই পরিচিত কিতাব كَفَرُوْا بِهٖ তখন তারা তাকে অস্বীকার করে বসল فَلَعْنَةُ اللّٰهِ সুতরাং আল্লাহর লা'নত হোক عَلَى الْكٰفِرِيْنَ এরূপ কাফেরদের উপর।

৯০. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ নিতান্ত জঘন্য সেই অবস্থাটি যা অবলম্বন করে মুক্ত করতে চায় তারা اَنْفُسَهُمْ নিজেদের اَنْ يَّكْفُرُوْا অমান্য করে এমন জিনিস بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন بَغْيًا শুধু [এই] হঠকারিতায় যে اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন مِنْ فَضْلِهٖ নিজ দয়ায় عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ তাঁর বাঞ্ছিত বান্দার উপর فَبَآءُوْ সুতরাং তারা যোগ্য হয়েছে بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ গজবের উপর গজবের وَلِلْكٰفِرِيْنَ আর কাফেরদের জন্য আছে عَذَابٌ مُّهِيْنٌ লাঞ্ছনাময় শাস্তি।

৯১. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন তাদের বলা হয় اٰمِنُوْا তোমরা ঈমান আন بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ঐ সব কিতাবের উপর যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন قَالُوْا তখন বলে, نُؤْمِنُ আমরা ঈমান আনব بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا [শুধু] আমাদের প্রতি অবতারিত কিতাবের উপর وَيَكْفُرُوْنَ তারা অস্বীকার করে بِمَا وَرَآءَهٗ তদ্ব্যতীত আর সবগুলোকে وَهُوَ الْحَقُّ অথচ সেগুলোও সত্য مُصَدِّقًا অধিকন্তু সত্যতাও প্রমাণকারী لِّمَا مَعَهُمْ তাদের সঙ্গীয় কিতাবের قُلْ আপনি বলুন فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ তবে কেন হত্যা করছিলে اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ আল্লাহর নবীগণকে مِنْ قَبْلُ ইতঃপূর্বে اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা মুমিন ছিলে?

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ (٩٢)

(৯২) আর মূসা আনলেন তোমাদের নিকট জ্বলন্ত প্রমাণসমূহ, তবুও তোমরা তাঁর পর বাছুরকে সাব্যস্ত করলে, আর তোমরা ছিলে অনাচারী।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٩٣)

(৯৩) আর যখন তোমাদের ওয়াদা নিলাম এবং তুলে ধরলাম তোমাদের উপর তূর পর্বত; গ্রহণ কর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিতেছি সাহসের সাথে এবং শোন, তারা বলল, শুনলাম; কিন্তু আমল করতে পারব না, আর মিশে গিয়েছিল, তাদের হৃদয়ে সেই বাছুর তাদের কুফরির কারণে; আপনি বলুন, অত্যন্ত নিন্দনীয় যা কিছু আদেশ করতেছে তোমাদের ঈমান, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯২) وَلَقَدْ جَآءَكُمْ আর আনলেন তোমাদের নিকট مُوْسٰى মূসা بِالْبَيِّنٰتِ জ্বলন্ত প্রমাণসমূহ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ তবুও তোমরা সাব্যস্ত করলে الْعِجْلَ বাছুরকে مِنْۢ بَعْدِهٖ তাঁর পর وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ আর তোমরা ছিলে অনাচারী।

(৯৩) وَاِذْ اَخَذْنَا আর যখন নিলাম مِيْثَاقَكُمْ তোমাদের ওয়াদা وَرَفَعْنَا এবং তুলে ধরলাম فَوْقَكُمُ তোমাদের উপর الطُّوْرَ তূর পর্বত। خُذُوْا গ্রহণ কর مَآ اٰتَيْنٰكُمْ যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিতেছি بِقُوَّةٍ সাহসের সাথে। وَاسْمَعُوْا এবং শোন। قَالُوْا তারা বলল سَمِعْنَا শুনলাম وَعَصَيْنَا কিন্তু আমল করতে পারব না। وَاُشْرِبُوْا আর মিশে গিয়েছিল فِيْ قُلُوْبِهِمُ তাদের হৃদয়ে الْعِجْلَ সেই বাছুর بِكُفْرِهِمْ তাদের কুফরির কারণে; قُلْ আপনি বলুন بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖ অত্যন্ত নিন্দনীয় যা কিছু আদেশ করছে اِيْمَانُكُمْ তোমাদের ঈমান اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮৯ قوله وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মদিনার আনসারদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে, ঘটনার বিবরণ হচ্ছে যে, ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীর আসেম বিন ওমর বিন কাতাদাহ আনসারীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের বড়রা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ সম্পর্কে আমাদের অপেক্ষা কোনো আরবিই বেশি জানত না। এর কারণ ছিল, আমাদের সাথে একত্রে অধিবাসী ছিল ইহুদিদের, ওরা ছিল আহলে কিতাব। আর আমরা ছিলাম মূর্তিপূজারী। আমাদের দ্বারা তারা যখনই কোনো আঘাত পেত, তখন তারা বলত যে, নবী তো এ যুগেই আগমন করবেন, তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করে তোমাদেরকে আ'দ ছামূদের ন্যায় ধ্বংস করে দিব। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন প্রেরিত হলেন, তখন আমরা তাঁর অনুসরণ করলাম, আর তারা তাঁকে অমান্য করল। সুতরাং রাসূল ﷺ আমাদের পক্ষেই আছেন। এ সকল আনসারীদের সাফল্য এবং ইহুদিদের দাম্ভিকতা পূর্ণ পিঠ টান দেওয়ার স্বরূপ বর্ণনা এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা দান সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ১১৩/১, দুররে মানছুর : ৮৭/১, ইবনে কাছীর : ১২৪/১]

জ্ঞাতব্য : কুরআনকে তাওরাতের 'মুসাদ্দিক' [সত্যায়নকারী] বলা হয়েছে। এ কারণ এই যে, তাওরাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর আবির্ভাব ও কুরআন অবতরণের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, কুরআনের মাধ্যমেও সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যারা তাওরাতকে স্বীকার করে, তারা কিছুতেই কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার করতে পারে না। তা করতে গেলে প্রকারান্তে তাওরাতকেই অস্বীকার করা হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তারা যখন সত্যকে সত্য বলেই জানত, তখন তাদেরকে ঈমানদার বলাই উচিত, কাফের বলা হলো কেন?

এর উত্তর এই যে, শুধু জানাকেই ঈমান বলা যায় না। শয়তানের সত্যজ্ঞান সবার চাইতে বেশি। তাই বলে সে ঈমানদার হয়ে যাবে কি? জানা সত্ত্বেও অস্বীকার করার কারণে কুফরের তীব্রতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের শত্রুতাকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এখানে এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে। এ জন্যই ক্রোদের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। শাস্তির সাথে অপমানজনক শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা পাপী ঈমানদারকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা হবে, তাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বুঝা যায়।

'আমরা শুধু তাওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না, ইহুদিদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উক্তি 'যা [তাওরাতে] আমাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে।' এ থেকে প্রতিহিংসা বুঝা যায়। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাজিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ তা'আলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন।

প্রথমতঃ অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলিলের মধ্যে কোনো আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে দূর করে নিতে পারত। অহেতুক অস্বীকারের কোনো অর্থ হয় না

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কুরআন মাজীদ, যা তাওরাতেরও সত্যায়ন করে। সুতরাং কুরআন মাজীদকে অস্বীকার করলে তাওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ সকল খোদায়ী গ্রন্থের মতেই পয়গম্বরদের হত্যা করা কুফর। তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন পয়গম্বরকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তাওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করছ। এভাবে কি তোমরা তাওরাতের সাথেই কুফরি করনি? সুতরাং তাওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবি অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, কোনো দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পরবর্তী আয়াতে আরো কতিপয় যুক্তি দ্বারা ইহুদিদের দাবি খণ্ডন করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে তাওরাত অবতরণের পূর্বে। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যেসব যুক্তি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আয়াতে بَيِّنٰتٌ বলে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, লাঠি, জ্যোতির্ময় হাত, সাগর দ্বি-খণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি।

ইহুদিদের দাবির খণ্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের দাবি কর, অন্যদিকে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হও। ফলে শুধু হযরত মূসা (আ.)-কেই নয়, আল্লাহকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছ। কুরআন অবতরণের সময় হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আমলে যেসব ইহুদি ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য; কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল। অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের লক্ষ্য।

আয়াতে বর্ণিত কারণ ও ঘটনাসমূহের সারমর্ম এই যে, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার পর তারা একটি কুফরি বাক্য উচ্চারণ করে। পরে হযরত মূসা (আ.)-এর শাসানোর ফলে যদিও তওবা করে নেয়, কিন্তু তওবারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। উচ্চস্তরের তওবার অভাবে তাদের অন্তরে কুফরের কালিমা থেকেই যায়। পরে সেটাই বেড়ে গিয়ে গোবৎস পূজার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোনো কোনো টীকাকারের বর্ণনা মতে গোবৎস পূজা থেকে তওবা করতে গিয়ে তাদের কিছু লোককে হত্যা বরণ করতে হয় এবং কিছু লোক ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। এদের তওবাও সম্ভবতঃ দুর্বল ছিল। এছাড়া যারা গোবৎস পূজায় জড়িত ছিল না, তারাও অন্তরে গোবৎস পূজারীদের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণা পোষণ করতে পারেনি। ফলে তাদের অন্তরে শিরকের প্রভাব কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল। মোটকথা, তওবার দুর্বলতা ও শিরকের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণার অভাব এতদুভয়ের প্রতিক্রিয়ায় তাদের অন্তরে ধর্মের প্রতি শৈথিল্য দানা বেঁধে উঠেছিল। এ কারণেই অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য তূর পর্বতকে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়।

قوله وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ -এর মর্ম : এখানে قِيْلَ لَهُمْ -এর মধ্যে لَهُمْ দ্বারা আখেরী নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়কার ইহুদিদের বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনার কথা বললে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে।

قوله لِمَ تَقْتُلُوْنَ **-এর ব্যাখ্যা :** বনী ইসরাঈলের লোকেরা অনেক নবীকে হত্যা করেছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সময়ে যে সকল ইহুদিরা ছিল, তারা মূলতঃ হত্যাকারী নয় হত্যাকারী ছিল তাদের পূর্বপুরুষেরা। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, لِمَ تَقْتُلُوْنَ বলে হত্যাকারী নয় এমন ইহুদিদের উদ্দেশ্য করার কারণ কি? এর উত্তরে মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন যে, এ সময়কার ইহুদিরা তাদের পূর্ব পুরুষদের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল এবং তাদের পূর্ব পুরুষরা নবীগণকে যে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, তা তারা অপরাধ মনে করেনি। ফলে তারাও তাদের পূর্ব পুরুষদের মতোই হিংস্র ও পাপী। তাই তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে لِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ আলোচ্য আয়াতে। اٰمَنُوْا দ্বারাও তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

قوله بِالْبَيِّنٰتِ **-এর মর্ম :** অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এখানে اَلْبَيِّنٰتُ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ উদ্দেশ্য। যেমন, কপট জাতির উপর আপতিত পঙ্গপাল, তাঁর হাতের লাঠি, বনী ইসরাঈলের জন্য সমুদ্রের জলরাশির মাঝে পথ তৈরি, মান্না সালওয়া অবতারণ, ব্যাঙ, রক্ত ও উকুনের ভয়ানক উপদ্রব সৃষ্টি করা, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলা, হাতের শুভ্রতা, বনী ইসরাঈলের উপর তূর পাহাড় উত্তোলন এবং পাহাড় থেকে পানির ঝরনা বের হওয়া ইত্যাদি। কারো কারো মতে, তাওরাতও اَلْبَيِّنٰتُ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

قوله بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ **-এর মর্ম :** এখানে بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

ক. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, اَلْقُرْاٰنُ উদ্দেশ্য।

খ. কতিপয়ের মতে, مَا শব্দটি عُمُوْم-এর অর্থে আসে, কাজেই এখানে بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ দ্বারা সকল আসামানি কিতাব উদ্দেশ্য। কারণ, ঈমান সকল কিতাবের উপর আনাই আবশ্যক।

قوله وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহর বাণী وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ-এর মধ্যে هُوَ যমীর দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

(১) اَلْقُرْاٰنُ যেহেতু পবিত্র কুরআনই তাদের কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী।

(২) نَبِيُّ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ ﷺ [আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ] কেননা, তিনি পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী। –[কাবীর]

قوله سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে যখন বললেন, خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا তখন উত্তরে তারা বলেছিল, سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا অর্থাৎ শুনলাম এবং অমান্য করলাম। আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেন, ইহুদিরা سَمِعْنَا বলেছিল; তারা عَصَيْنَا বলেনি। তবে কুরআনের বাহ্যিক ভাষ্য দেখে মনে হয় তারা سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا উভয়টিই বলেছিল। প্রকৃত কথা হলো, আল্লাহর কথার প্রেক্ষিতে তারা سَمِعْنَا বললেও কার্যতঃ তা ছিল عَصَيْنَا বলারই নামান্তর। কারণ তারা মুখে سَمِعْنَا বললেও বাস্তবে তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে যাচ্ছিল। কাজেই তারা মুখে মুখে যতই বলুকনা কেন سَمِعْنَا উক্তিতে মূলতঃ তাদের অবস্থা ছিল عَصَيْنَا বলার বাস্তব নমুনা। তাই তাদের বাস্তবানুগ অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা سَمِعْنَا উক্তির সাথে عَصَيْنَا শব্দ জুড়ে দিয়েছেন। –[আত্‌তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন]

قوله وَاُشْرِبُوْا فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ **-এর মর্ম :** اَلْعِجْلَ শব্দের অর্থ– গরুর বাচ্চা। গরুর বাচ্চা কঠিন বস্তু বিধায় তা পান করানো যায় না। অথচ আয়াতের সরল অনুবাদ দাঁড়ায়–"তাদের অন্তরে গো-বৎস পান করানো হয়েছিল, যা বাস্তবানুগ নয়। তবে এর রূপক অর্থ হবে, তাদের অন্তরে গো-বৎস মোহ এমনভাবে সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল যেমন মদ্যপায়ীর মনে মদের মোহ সৃষ্টি করা হয়, তারাও গো-বৎস পূজার প্রতি মদ্যপায়ীর মদের প্রতি মোহাবিষ্ট হওয়ার মতো দারুণভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল।

ঈমাম সুদ্দী থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, হযরত মূসা (আ.) গো-বৎস মূর্তিটি ঘৃণাভরে পানিতে ফেলে দেন এবং পূজারীদের তিরস্কার স্বরূপ বলেন, এর ধোয়া পানি পান কর। অতঃপর তারা সেই পানি পান করে। এদিকেই আয়াতের মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনেকের মতে এ বর্ণনাটির কোনো ভিত্তি নেই। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী

মৃত্যু কামনার নির্দেশের কারণ : ইহুদিরা দাবি করত যে, পরকালের সুখ ভোগে তাদেরই একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। এরই সত্যতা প্রমাণের নিমিত্তে আল্লাহ তা'আলা তাদের মৃত্যু কামনা করতে বলেন। কেননা তাদের কৃত দাবি পরকালের ব্যাপারে আন্তরিকই যদি হয়, তবে মৃত্যু কামনার ব্যাপারে তারা ইতস্ততঃ করবে না। কারণ মৃত্যু ব্যতীত তাদের পরকালে প্রবেশের কোনো পথ নেই। পরকালে গিয়ে আল্লাহর নৈকট্য বা মুক্তির আশায় ইহুদিদেরই সর্বাগ্রে মৃত্যু কামনা করা উচিত ছিল; কিন্তু তারা তা না করায় একথা প্রমাণিত হয় যে, তাদের দাবি আন্তরিক নয়।

মৃত্যু কামনা করার বিধান : মৃত্যু কামনা করা শরিয়তে বৈধ নয়। হাদীস শরীফে মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আয়াতে মৃত্যু কামনার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। অতএব বলা হবে মূলতঃ এখানে মৃত্যু কামনার নির্দেশ নয়; বরং এখানে দলিল পেশ করাই উদ্দেশ্য এবং তারা যে তাদের দাবিতে মিথ্যাবাদী একথা প্রমাণই উদ্দেশ্য।
যে সকল হাদীসে মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেস্থলে কোনো বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ হওয়াই বুঝায়।
قوله قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ- **এর মর্মার্থ :** অর্থাৎ প্রকৃত তথ্যে বলা যায় যে, তোমরা তাওরাতের প্রতি ঈমানদার নও। যদিও তোমরা বলে থাক আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি। অথচ এ কথার পেছনে কুফরি লুক্কায়িত আছে। তাই তারা বলেছিল শুনলাম, মানলাম না।
যদি তোমরা সত্যিকাররূপে তাওরাতের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হতে তাহলে তোমরা তাওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী কৃত শেষনবী ও তার আনীত আল-কুরআনকে অমান্য করতে পারতে না, বরং তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে বর্বরোচিত আচরণ এবং অবাধ্যতার প্রতিই উদ্বুদ্ধ করে। তাই মনে হয় তোমরা তাওরাতকেও প্রকৃতভাবে মান্য করছ না। দাবি যা করছ তা হলো শঠতাপূর্ণ দাবি। ঈমানের দাবি যা করছ তা মৌখিক মাত্র।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُصَدِّقٌ : সীগাহ اسم فاعل বহছ واحد مذكر বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّصْدِيْقُ মূলবর্ণ (ص . د . ق) জিনস صحيح অর্থ– সত্যবাদী, সমর্থনকারী।

كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاحُ মূলবর্ণ (ف . ت . ح) জিনস صحيح অর্থ– তারা মীমাংসা কামনা করছিল।

اِشْتَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش . ر . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা ক্রয় করল, তারা বিক্রয় করল।

يَكْفُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك . ف . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা অস্বীকার করেছে।

بَغْيًا : বাব ضرب-এর মাসদার, অর্থ হঠকারিতা বশতঃ, জিদের কারণে,

يُنَزِّلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّنْزِيْلُ মূলবর্ণ (ن . ز . ل) জিনস صحيح অর্থ– তিনি অবতীর্ণ করেন, নাজিল করেন।

بَاءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَوْءُ মূলবর্ণ (ب . و . ء) জিনস مهموز لام ও اجوف واوى অর্থ– তারা অর্জন করেছে।

اُشْرِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلشُّرْبُ মূলবর্ণ (ش . ر . ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের পান করানো হয়েছিল।

يَأْمُرُكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَمْرُ মূলবর্ণ (ا . م . ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– সে আদেশ করে। সে আদেশ দান করে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ : لَمَّا হরফে শর্ত, جَاءَ ফে'ল هُمْ মাফউল كِتَابٌ মাওসূফ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ প্রথম সিফাত مُصَدِّقٌ দ্বিতীয় সিফাত। এটা সম্পূর্ণ মিলে ফা'য়েল হয়ে শর্ত আর জাযাটি উহ্য অর্থাৎ قوله كَفَرُوْا বাক্যটি بَغْيًا পদটি مفعول له হেতু منصوب হয়েছে।

قوله وَهُوَ الْحَقُّ : বাক্যটি হলা قوله مُصَدِّقًا দ্বিতীয় হালে মুয়াক্কাদা, وقوله وَرَفَعْنَا الخ বাক্যটিও হাল।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৯৪) আপনি বলে দিন, যদি শুধুমাত্র তোমাদেরই জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে পরজগতের উপভোগ আল্লাহর নিকট অন্য কারো অংশ গ্রহণ ব্যতীত, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করে দেখিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।	قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٩٤)
(৯৫) আর নিশ্চয় তারা কখনো তা কামনা করবে না তাদের স্বহস্তকৃত আমলসমূহের দরুন, আর আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবগত আছেন এ সমস্ত জালেম সম্বন্ধে।	وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ (٩٥)
(৯৬) আর অবশ্যই আপনি তাদেরকে পাবেন [পার্থিব] জীবনের প্রতি অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক লালায়িত এবং মুশরিকদের চেয়েও, তাদের এক একজন এই লালসায় রয়েছে যে, তার আয়ু যেন সহস্র বৎসরের হয়ে যায়, আর এটা তাকে তো আমার আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। অর্থাৎ দীর্ঘায়ু হলেও, আর আল্লাহর দৃষ্টিগোচরে রয়েছে তাদের আমলসমূহ।	وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ (٩٦)
(৯৭) আপনি বলুন, যে ব্যক্তি শত্রুতা রাখে জিবরাঈল-এর সাথে [সে রাখুক], তিনি পৌঁছিয়েছেন এই কুরআনকে আপনার অন্তঃকরণ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমে, যে অবস্থায় তা স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে। আর হেদায়েত করছে ও সুসংবাদ দিচ্ছে মুমিনদেরকে।	قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٩٧)

শাব্দিক অনুবাদ

৯৪. قُلْ আপনি বলে দিন اِنْ كَانَتْ لَكُمُ যদি শুধুমাত্র তোমাদেরই জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে الدَّارُ الْاٰخِرَةُ পরজগতের উপভোগ عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ অন্য কারো অংশ গ্রহণ ব্যতীত فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করে দেখিয়ে দাও اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

৯৫. وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا আর নিশ্চয় তারা কখনো তা কামনা করবে না بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ তাদের স্বহস্তকৃত আমলসমূহের দরুন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবগত আছেন بِالظّٰلِمِيْنَ এ সমস্ত জালেম সম্বন্ধে।

৯৬. وَلَتَجِدَنَّهُمْ আর অবশ্যই আপনি তাদেরকে পাবেন اَحْرَصَ النَّاسِ অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক লালায়িত عَلٰى حَيٰوةٍ [পার্থিব] জীবনের প্রতি وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا এবং মুশরিকদের চেয়েও يَوَدُّ اَحَدُهُمْ তাদের এক একজন এই লালসায় রয়েছে যে لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ তার আয়ু যেন সহস্র বৎসরের হয়ে যায় وَمَا هُوَ আর এটা بِمُزَحْزِحِهٖ তাকে তো রক্ষা করতে পারবে না مِنَ الْعَذَابِ আমার আজাব হতে اَنْ يُّعَمَّرَ দীর্ঘায়ু হলেও وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ আর আল্লাহর দৃষ্টিগোচরে রয়েছে بِمَا يَعْمَلُوْنَ তাদের আমলসমূহ।

৯৭. قُلْ আপনি বলুন مَنْ كَانَ عَدُوًّا যে ব্যক্তি শত্রুতা রাখে لِّجِبْرِيْلَ জিবরাঈল-এর সাথে فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ তিনি পৌঁছিয়েছেন এই কুরআনকে عَلٰى قَلْبِكَ আপনার অন্তঃকরণ পর্যন্ত بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুমে مُصَدِّقًا যে অবস্থায় তা সত্যতা প্রমাণ করছে لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের وَهُدًى আর হেদায়েত করছে وَّبُشْرٰى ও সুসংবাদ দিচ্ছে لِلْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদেরকে।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ (٩٨)

অনুবাদ : (৯৮) যে ব্যক্তি শত্রু হয় আল্লাহর এবং তাঁর ফেরেশতাগণের, তার রাসূলগণের, জিবরাঈলের এবং মিকাঈলের, আল্লাহ এরূপ কাফেরদের শত্রু।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ (٩٩)

(৯৯) আর আমি তো আপনার প্রতি বহু স্পষ্ট প্রমাণ নাজিল করেছি এবং এটা কেউই অবিশ্বাস করে না হুকুম অমান্যে অভ্যস্তগণ ব্যতীত।

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٠٠)

(১০০) তবে কি, আর যখনই তারা যে কোনো অঙ্গীকার করে থাকে, তাকে তাদের মধ্যে কোনো না কোনো দল প্রত্যাখ্যান করে থাকে? পরন্তু তাদের মধ্যে বেশির ভাগই তো ঈমান রাখে না।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (١٠١)

(১০১) আর যখন তাদের নিকট একজন রাসূল আসলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি সত্যতাও প্রমাণ করতেছেন ঐ কিতাবের যা তাদের নিকট আছে, তখন ফেলে দিল আহলে কিতাবদের একদল আল্লাহর এ কিতাবকেই তাদের পিছনের দিকে, যেন তারা কিছুই জানে না।

শাব্দিক অনুবাদ

৯৮. مَنْ كَانَ عَدُوًّا যে ব্যক্তি শত্রু হয় لِّلّٰهِ আল্লাহর وَمَلٰٓئِكَتِهٖ এবং তাঁর ফেরেশতাগণের وَرُسُلِهٖ তার রাসূলগণের وَجِبْرِيْلَ জিবরাঈলের وَمِيْكٰلَ এবং মিকাঈলের فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ আল্লাহ শত্রু لِّلْكٰفِرِيْنَ এরূপ কাফেরদের।

৯৯. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ আর আমি তো নাজিল করেছি اِلَيْكَ আপনার প্রতি اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ বহু স্পষ্ট প্রমাণ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ এবং এটা কেউই অবিশ্বাস করে না اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ হুকুম অমান্যে অভ্যস্তগণ ব্যতীত।

১০০. اَوَكُلَّمَا তবে কি, আর যখনই عٰهَدُوْا عَهْدًا তারা যে কোনো অঙ্গীকার করে থাকে نَّبَذَهٗ তাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ তাদের মধ্যে কোনো না কোনো দল بَلْ اَكْثَرُهُمْ পরন্তু তাদের মধ্যে বেশির ভাগই তো لَا يُؤْمِنُوْنَ ঈমান রাখে না।

১০১. وَلَمَّا جَآءَهُمْ আর যখন তাদের নিকট আসলেন رَسُوْلٌ একজন রাসূল مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লাহর তরফ থেকে مُصَدِّقٌ যিনি সত্যতাও প্রমাণ করছেন لِّمَا مَعَهُمْ ঐ কিতাবের যা তাদের নিকট আছে نَبَذَ তখন ফেলে দিল فَرِيْقٌ একদল مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাবদের كِتٰبَ اللّٰهِ আল্লাহর এ কিতাবকেই وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ তাদের পিছনের দিকে كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ যেন তারা কিছুই জানে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৯৪- قوله قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** –হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ইহুদিরা যখন দাবি করতে থাকে যে, তারাই একমাত্র আল্লাহর প্রিয় পাত্র হিসেবে বেহেশত লাভের একক হকদার ও উত্তরাধিকারী তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন– আচ্ছা তোমরা যদি তোমাদের দাবি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ এবং সত্যবাদী হও তবে আস, আমরা উভয়ে একত্রে আল্লাহর নিকট দোয়া করি, যেন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তাদের ধ্বংস করে দেন। কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহর ﷺ-এর এ প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। কারণ তারা ভালো করেই জানত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য, সত্যই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। বস্তুতঃ তারা যদি মহানবী ﷺ-এর উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দোয়ার জন্য জমায়েত হতো তবে আল্লাহ তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতেন এবং দুনিয়ার বুকে একজন ইহুদিও বেঁচে থাকত না; এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতগুলো নাজিল করেন অথবা বেহেশতে ইহুদিরা ভিন্ন অন্য কেউ যেতে পারবে না। তাদের এ দাবি খণ্ডনে অত্র আয়াতগুলো নাজিল হয়।

৯৫. قوله وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : পূর্ববর্তী আয়াত নাজিল হবার পর রাসূল ﷺ ইহুদিদের লক্ষ্য করে বললেন যে, তোমাদের [ইহুদি ও নাসারাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত] দাবিতে তোমরা যদি সত্যবাদি হয়ে থাক, তাহলে তোমরা আল্লাহর নিকট এভাবে প্রার্থনা করবে, হে আল্লাহ! যার হাতে আমার প্রাণ, তুমি আমাদের মৃত্যু দান কর। তোমাদের থেকে কেউই এ প্রার্থনা করবেনা; বরং একজন তাকে থুথু দেয় ফলে সেখানেই সে মৃত্যু বরণ করে ফলে তারা এমনভাবে প্রার্থনা করতে অপছন্দ ও অস্বীকার করল। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[দুররুল মানছুর ৯৮/১]

৯৮. قوله مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : আয়াত দু'টি নাজিলের কারণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহ পাওয়া যায়। ১. বর্ণিত আছে যে, একদা ইহুদি পণ্ডিত ইবনে সূরিয়া রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, আপনার নিকট কে ওহী নিয়ে আসে? রাসূল ﷺ বললেন, জিব্রাঈল ওহী নিয়ে আসেন। তখন সে বলল, জিবরাঈল আমাদের শত্রু। বহুবার আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। সব চেয়ে বেদনাদায়ক শত্রুতা ছিল এই যে, একদা আমাদের সমকালীন নবীর কাছে ওহী আসল যে, মেসোপটেমিয়ার অধিপতি নেবুজরদ এক সময় বায়তুল মাকদাস নগরী ধ্বংস করে দিবে। তখন আমাদের পূর্ব পুরুষরা তাকে হত্যা করার জন্য এক গুপ্ত ঘাতক পাঠায়; কিন্তু জিবরাঈল তাকে ধরে দিয়ে নেবুজরদকে বাঁচিয়ে দেয়। অতঃপর নেবুজরদ পবিত্র নগরী ধ্বংস করে ৭০ হাজার ইহুদিকে হত্যা করে এবং ৭০ হাজারকে বন্দী করে নিয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত দু'টি নাজিল হয়।

২. অন্য বর্ণনায় আছে, একদা হযরত ওমর (রা.) ইহুদিদের মাদরাসায় গমন করে তাদের শিক্ষকদের কাছে হযরত জিবরাঈল সম্পর্কে জানতে চান। তারা বলল, জিবরাঈল আমাদের শত্রু। সে মুহাম্মদ ﷺ-কে আমাদের সব গোপন কথা বলে দেয় এবং আমাদের সব আজাব সেই আনতো; বরং মীকাঈল আমাদের বন্ধু। হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা কেমন? তখন তারা বলল, জিবরাঈল আল্লাহর ডানে বসে এবং মীকাঈল বামে বসে। তবে তারা পরস্পর ঘোর শত্রু। হযরত ওমর (রা.) বললেন, যদি তাদের অবস্থান এমনি হয়, তবে তারা শত্রু হতে পারে না। হযরত ওমর (রা.) তাদের কাছ থেকে ফিরে আসার আগেই হযরত জিবরাঈল এ আয়াত দু'টি নিয়ে হাজির হন।

৩. একদা ইবনে সূরিয়ার নেতৃত্বে একদল ইহুদি রাসূল ﷺ-এর নিকট তিনটি প্রশ্নের উত্তর চাইল এবং বলল, আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারলে আমরা ঈমান আনব। তাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল, হযরত ইয়াকূব (আ.) তাঁর নিজের জন্য কি কি জিনিস হারাম করে ছিলেন?

উত্তরে নবীজী বললেন, হযরত ইয়াকূব (আ.) "ইরকুন্নিসা" নামক এক প্রকার মারাত্মক রোগে ভোগছিলেন; এই রোগ থেকে মুক্তির জন্য তিনি মানত করেছিলেন, 'আল্লাহ যদি আমাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দেন তাহলে আমি আমার প্রিয় খাদ্য 'উটের গোশত, চর্বি, দুধ খাব না।' এ মানতের পর তিনি রোগমুক্তি লাভ করেন এবং বাকি জীবন আর উটের গোশত, চর্বি ও দুধ খাননি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে, স্ত্রী ও পুরুষের বীর্যের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কখন পুত্র সন্তান হয়, আর কখন কন্যা সন্তান হয়?

মহানবী ﷺ বললেন, পুরুষের বীর্য সাদা ও গাঢ় হয়, আর স্ত্রীদের বীর্য খানিকটা লালচে ও হালকা হয়ে থাকে। যৌন মিলনের পর ডিম্বকোষে স্ত্রীর বীর্য প্রাধান্য পেলে কন্যা এবং পুরুষের বীর্য প্রাধান্য পেলে ছেলে সন্তান হয়ে থাকে।

তাদের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, তাওরাতে যে উম্মী নবীর ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তাঁর বিশেষত্ব কি এবং তাঁর নিকট কোন্ ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসে?

নবী কারীম ﷺ বললেন, তিনি যখন নিদ্রা যান তখন তার অন্তর জাগ্রত থাকে, আর জিব্রাঈল ফেরেশতা তাঁর নিকট ওহী নিয়ে আসেন, যে ফেরেশতা সকল নবীদের নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।

একথা শুনার পর তারা বলল, আপনার সব উত্তরই সঠিক; তবে যেহেতু জিবরাঈল আমাদের শত্রু; সে শাস্তি, নির্মমতা, হত্যা ইত্যাদি নিয়ে আসে তাই আমরা তাকে মানি না। একই কারণে আমরা আপনাকেও মানব না। হাঁ, হযরত মীকাঈল আমাদের বন্ধু। তিনি রহমতের বৃষ্টি, রিজিক ইত্যাদি নিয়ে আসেন। তিনি যদি আপনার নিকট ওহী নিয়ে আসতেন তবে আমরা আপনার উপর ঈমান আনতাম। এই বলে তারা চলে গেলে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করেন।

৯৯. قوله وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : একদা ইবনে সূরিয়া নামের এক ইহুদি পণ্ডিত হুযূর (সা.)-এর দরবারে এসে বলতে থাকে, হে মুহাম্মদ! তাওরাতের মাধ্যমে নবীর যে সমস্ত নিদর্শন আমাদের জানা রয়েছে সেগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি নিদর্শনও তোমার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না এবং আল্লাহ তা'আলাও তোমার নবী হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ পেশ করেননি। তখন উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قوله وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ الخ -১০০ **আয়াতের শানে নুযূল :** তাওরাত ও ইনজীলে নবী করীম ﷺ -এর আগমনের পর ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নবীজীর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ ইহুদি সর্দার মালেক ইবনে সায়েফকে তাওরাতের সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে দেন। তখন সে শপথ করে অস্বীকার করে, আর বলে, মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে আমাদের নিকট হতে কোনো ওয়াদা নেওয়া হয়নি। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যে সত্যধর্ম, তা প্রমাণ করার জন্য এ ঘটনাটি যথেষ্ট। এখানে আরো দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য :

প্রথমতঃ নবী করীম ﷺ -এর আমলে বিদ্যমান ইহুদিদের সঙ্গে উপরিউক্ত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল। যারা তাঁকে নবী হিসেবে চেনার পরেও শত্রুতা ও হঠকারিতাবশতঃ অস্বীকার করেছিল, সকল যুগের ইহুদিদের সঙ্গে নয়।

দ্বিতীয়তঃ এখানে এরূপ সন্দেহ করা ঠিক নয় যে, মন ও জিহ্বা উভয়টি দ্বারাই কামনা হতে পারে। ইহুদিরা সম্ভবত মনে মনে মৃত্যুর কামন করেছে, উত্তর এই যে, প্রথমতঃ আল্লাহর উক্তি وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ [কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না] এ সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ তারা মনে মনে মৃত্যু কামনা করে থাকলে, তা অবশ্যই মুখেও প্রকাশ করত। কারণ, এতে তাদেরই জয় হতো এবং নবী করীম ﷺ কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার একটা সুযোগ পেয়ে যেত।

এরূপ সন্দেহও অমূলক যে, বোধ হয় তারা কামনা করেছে, কিন্তু তার প্রচার হয়নি। কারণ, সর্বযুগেই ইসলামের শত্রু ও সমালোচকদের সংখ্যা ইসলামের মিত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যার চাইতে বেশি ছিল। এরূপ কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে তারা কি একে ফলাও করে প্রচার করত না যে, দেখ, তোমাদের নির্ধারিত সত্যের মাপকাঠিতেও আমরা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছি।

আরবের মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের মতে বিলাস-ব্যসন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই ছিল পার্থিব। একারণে তারা দীর্ঘায়ু কামনা করলে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহুদিরা শুধু পরকালে বিশ্বাসীই ছিল না; বরং তাদের ধারণা মতে পারকালের যাবতীয় আরাম আয়েম ও নিয়ামতরাজি তাদেরই প্রাপ্য ছিল। এরপরও তাদের পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু কামনা করা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি?

সুতরাং পরকালে বিশ্বাস সত্ত্বেও তাদের দীর্ঘায়ু কামনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারলৌকিক নিয়ামত সম্পর্কিত তাদের দাবি সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূণ্য। প্রকৃত ব্যাপার তাদেরও ভালোভাবে জানা রয়েছে যে, সেখানে পৌঁছলে জাহান্নামই হবে তাদের আবাসস্থল। তাই যতদিন বেঁচে থাকা যায়, ততদিনই মঙ্গল।

قوله وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا الخ **এর ব্যাখ্যা :** যেহেতু ইহুদিরা ইহজীবনে বহুবিধ অন্যায় অবিচারে লিপ্ত আছে এবং তজ্জন্য তাদের পরিণতি কি হতে পারে তাও তারা অবহিত নয়। তাই তারা যদিও মুখে দাবি করে বেড়াচ্ছে যে, তারাই একমাত্র বেহেশতের একক উত্তরাধিকারী কিন্তু মনে মনে খোদায়ী শাস্তিকে ভয় করে এবং সে কারণে মৃত্যুকে অত্যাধিক ভয় করে। তা হতে বেঁচে থাকতে চায়। অথচ আল্লাহ তাদের এ সকল স্বজ্ঞান পাপাচারিতা সম্পর্কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত হেতু একদিন তাদেরকে স্বীয় কৃত-কর্মের চরমদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের যাবতীয় পাপাচারিতার যথার্থ প্রতিফল দিবেন।

وَمَا هُوَ **-এর মধ্যকার** هُوَ **-এর প্রত্যাবর্তনস্থল :** وَمَا هُوَ -এর মধ্যকার هُوَ কোন্ দিকে ফিরেছে- এ ব্যাপারে তিনটি মত ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা–(১) পেছনে উল্লিখিত اَحَدُهُمْ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। (২) সামনে উল্লিখিত يُعَمَّرُ -এর মাসদারের প্রতি প্রত্যাবর্তিত। এমতাবস্থায় اَنْ يُّعَمَّرَ -এর মাসদার (تَعْمِيْر) হতে بَدَلْ হয়েছে। (৩) অথবা, هُوَ -কে যমীরে মুবহাম বলা যায়। اَنْ يُّعَمَّرَ সে মুবহামকে বর্ণনা করে দিয়েছে। –[কাবীর]

قوله وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ الخ : আয়াতে عَلٰى حَيٰوةٍ বলা হয়েছে এর অর্থ কোনো না কোনো ভাবে বেঁচে থাকা, তা যে কোনো ধরনের বেঁচে থাকা হোক না কেন, সম্মানের ও মর্যাদার বা লাঞ্ছনা অবমানার জীবনই হোক না কেন তার প্রতিই ইহুদিদের লোভ।

قوله نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ **-এর মর্মার্থ :** এর অর্থ "সে আপনার অন্তরে ওহী নাজিল করেছে" এ উক্তিটি থেকে বুঝা যায় যে, জিব্রাঈল রাসূলকে ওহী শুধু পড়ে শুনাতেন না হৃদয়ের মাঝে ঢেলেও দিতেন। আর হৃদয় যা ধারণ করে তা শব্দ নয়; অর্থ। তাহলে কি একথা বলা হবে যে, ওহী শুধু অর্থের নাম, শব্দ ওহী নয়? এর জবাবে হযরত আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন, অন্তর যেমন অর্থ বুঝে, তেমন শব্দও বুঝে। অন্তর মূলত উপলব্ধির কেন্দ্রস্থল, অন্যান্য অঙ্গ তার সাহায্যকারী মাত্র। যেমন– চোখে চশমার ভূমিকা, যদিও চশমার দেখার কোনো ক্ষমতা নেই। বিশেষ করে ওহী নাজিলের সময় বাহ্য-চেতনা শূন্যতা বশত পঞ্চেন্দ্রিয় অকেজো হয়ে পড়লে তখন ওহী সরাসরি অন্তরে প্রবেশ করে। কারণ রাসূল ﷺ -এর অন্তর ঘুমে, জাগরণে সর্বাবস্থায় সচেতন ছিল। এ কারণেই বলা হয়েছে نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ –[বায়ানুল কুরআন]

جِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ -এর পরিচয় : আল্লাহ তা'আলা الْمَلٰۤئِكَةُ তথা সকল ফেরেশতা উল্লেখ করার পর আবার পৃথকভাবে জিবরাঈল ও মীকাঈলের নাম উল্লেখ করার কারণ কি? অথচ তারাও মালাইকা শব্দের মধ্যে শামিল। এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কিরামের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ-

- জিবরাঈল ও মিকাঈল যেহেতু ফেরেশতাদের মধ্যে প্রধান ও অধিক মর্যদার অধিকারী, তাই তাঁদেরকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তাঁদের বিশেষ মর্যদার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। উসূলে ফিকহের ভাষায় একে ذِكْرُ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ বলা হয়।
- মূল আলোচনাটাই যেহেতু জিবরাঈল ও মিকাঈলকে কেন্দ্র করে সেহেতু তাদের নাম পৃথকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। নতুবা বিষয়টি কেমন যেন অস্পষ্ট থেকে যায়।

قوله مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ الخ উক্তিটির মর্মার্থ : ইহুদিরা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন ছিল। কারণ ইহুদি গোষ্ঠীর উপর প্রাচীন কাল থেকে যত আজাব নাজিল হয়েছিল, সবই আল্লাহর আদেশ জিবরাঈলের মাধ্যমে হয়েছিল। অথচ জিবরাঈল ছিলেন একজন আদিষ্ট ফেরেশতা, তাঁর অন্যথা করার উপায় ছিল না। কিন্তু এ আহমকরা তা বুঝতে চেষ্টা করত না, অনর্থক শত্রুতা পোষণ করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, যারা জিব্রাঈলকে শত্রু ভাববে, তারা তাদের ক্ষোভ নিয়ে মরুক। এটা তাদের একটি হেঁয়ালী কাজ কারবার।

জিব্রাঈল মীকাঈল থেকে উত্তম : কয়েকটি দিক থেকে জিব্রাঈল (আ.)-এর ফজিলত দেখা যায়। যথা-

- আয়াতে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
- তিনি ওহী, কুরআন ও ইলম নিয়ে আসেন, যা অন্তরের খোরাক, আর মীকাঈল বৃষ্টি নিয়ে আসেন যা শরীরের খোরাক।
- কুরআনে হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে- مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ : -[কাবীর]

جِبْرِيْل -এর উচ্চারণের কয়েকটি নিয়ম : جِبْرِيْل শব্দে দশটি নিয়ম দেখা যায়। যথা- (১) আহলে হিজায- جِيْم -কে যের দিয়ে। (২) ইবনে কাছীর جَبْرِيْل (بفتح الجيم) جِبْرِيْل (بكسر الجيم) -কে যবর সহকারে। (৩) আহলে কূফা, جَبْرَئِيْل জীমে যবর এবং رَا -এর পর হামযাহ। (৪) আসেম (র.) جَبْرَئِلُ জীমে যবর কিন্তু হামযার পরে يَاءْ নেই। (৫) ইয়াহিয়া ইবনে ইয়া'মূর ৪নং-এর মতো, তবে ل -এর মধ্যে তাশদীদ। যেমন- جَبْرَئِلَّ (৬) ইকরামা جَبْرَائِيْلُ অর্থাৎ رَا -এর পরে الف ও همزة সহ। (৭) جَبْرَائِيْلُ হামযার পর يَاءْ যুক্ত করে। (৮) جَبْرَئِيْيل দুটি يَاء যুক্ত করে। (৯) جَبْرَئِيْنُ জীমে যবর এবং শেষে নূন যোগে। (১০) جِبْرِيْنُ জীমে যের এবং হামযা বাদ দিয়ে।

مِيْكَالَ -এর মধ্যে বিভিন্ন কেরাত : এখানে ছয়টি কেরাত দেখা যায়। যথা- (১) كَافْ -এর পরে هَمْزَهْ যোগ করে। যেমন- مِيْكَائِيْلُ পড়েন। (২) نَافِعْ দুই يَاءْ দ্বারা مِيْكَائِيْلُ পড়েন। (৩) হিজাযবাসী مِيْكَالُ হামযাহ ও يَاء ছাড়া পড়েন। (৪) ইবনে মুহাইসেন مِيْكَئِيْلُ অর্থাৎ كَاف -এর পড়ে الف ছাড়া পড়েন। (৫) আ'মাশ مِيْكَائِلُ হামযার উপর যবর দিয়ে পড়েন। (৬) مِيْكَائِلُ হামযার পরে يَاء বাদ এবং হামযার মধ্যে যের সহকারে পড়া।

الْفَرْقُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْفِسْقِ (কুফর ও ফিস্কের মধ্যকার পার্থক্য) : اَلْكُفْرُ -এর আভিধানিক অর্থ- ঢেকে রাখা, গোপন করা, অস্বীকার করা ইত্যাদি। আর اَلْفِسْقُ -এর আভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘন করা, পাপ করা ইত্যাদি।

- আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল, তাঁর কিতাব ও তাঁর কোনো গুণাবলির প্রতি অবিশ্বাস, কিংবা অস্বীকার করার নাম কুফর। আর কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়াই فِسْقٌ (ফিসক)।
- اَلْكُفْرُ শব্দটি عَامٌ এবং فِسْقٌ শব্দটি خَاصٌ কাজেই বলা হবে كُلُّ كَافِرٍ فَاسِقٌ কিন্তু لَيْسَ كُلُّ فَاسِقٍ بِكَافِرٍ; ফাসেক তার ঈমানের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে, তবে কাফের অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

قوله فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ : এখানে ، যমীর দুটির مرجع : فَإِنَّهُ -এর মধ্যে ، -এর مرجع জিবরাঈল এবং نَزَّلَهُ -এর ، -এর مرجع কুরআন কিংবা ওহী। বাক্যটি এমন হবে– فَإِنَّ جِبْرِيلَ نَزَّلَ الْقُرْآنَ أَوِ الْوَحْيَ কারো মতে فَإِنَّهُ -এর ، -এর যমীরের مرجع হবে اللّٰه বাক্যটি এমন হবে فَإِنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْقُرْآنَ তবে প্রথম অভিমত অধিক যুক্তিযুক্ত। –[কাশশাফ]

مُصَدِّقًا. هُدًى. بُشْرَى -এর মহল্লে ই'রাব : তিনটি শব্দই مَنْصُوبٌ হয়েছে। কারণ– (ক) এগুলো نَزَّلَهُ -এর ، যমীর থেকে حال হয়েছে। (খ) অথবা ، থেকে مُصَدِّقًا শব্দটি حال হয়েছে এবং هُدًى ও بُشْرَى শব্দ দুটি যেহেতু مُصَدِّقًا -এর উপর عطف হয়েছে। তাই তারাও منصوب কারণ معطوف ও معطوف عليه -এর একই اعراب হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَتَمَنَّوُا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّمَنِّيْ মূলবর্ণ (م . ن . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা মৃত্যু কামনা কর।

لَتَجِدَنَّهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ لام تاكيد با نون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوُجْدَانُ মূলবর্ণ (و . ج . د) জিনস مثال واوى অর্থ– তুমি নিশ্চয় পাবে।

يُعَمَّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْمِيْرُ মূলবর্ণ (ع . م . ر) জিনস صحيح অর্থ– তাদের দেওয়া হয়।

مُزَحْزِحٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার اَلْمُزَحْزَحَة মূলবর্ণ (ز . ح . ز . ح) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– রক্ষাকারী, দূর কারী।

فٰسِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفِسْقُ মূলবর্ণ (ف . س . ق) জিনস صحيح অর্থ– ফাসেকগণ।

عٰهَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُعَاهَدَةُ মূলবর্ণ- (ع . ه . د) জিনস صحيح অর্থ– তারা অঙ্গীকার করেছে।

ظُهُوْرِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন ظَهْرٌ : অর্থ– পিঠসমূহ।

বাক্য বিশ্লেষণ

مُصَدِّقًا. هُدًى ও بُشْرَى পূর্বে উল্লিখিত نَزَّلَهُ -এর ، যমীর থেকে حال হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে।

قوله أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ এখানে أَكْثَرُ হলো مضاف আর هُمْ যমীর مضاف اليه অতঃপর مضاف ও مضاف اليه মিলে مبتدأ আর لَا يُؤْمِنُوْنَ ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে جملة হয়ে خبر হয়েছে। সুতরাং مبتدأ এবং خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (١٠٢)

অনুবাদ : (১০২) আর তারা অনুসরণ করল এমন কাজের যার চর্চা করত শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বকালে, আর সুলাইমান কুফরি করেননি, কিন্তু শয়তানরা [জাদু মন্ত্রের কথায় ও কাজে] কুফরি করছিল, মানুষকেও জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছিল, আর [অনুসরণ করল] ঐ জাদুরও যা নাজিল করা হয়েছে বাবেলে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর, আর তারা শিক্ষা দিতেন না কাউকেও যে পর্যন্ত না বলে দিতেন যে, আমাদের অস্তিত্ব পরীক্ষামূলক, সুতরাং তোমরা কাফের হয়ো না; অতঃপর লোকে শিখত তাদের থেকে এমন জাদুবিদ্যা যা দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটাত কোনো পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে; বস্তুত তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তা দ্বারা কারও আল্লাহর হুকুম ব্যতীত, আর শিখত এমন বিষয় যা তাদের জন্য ক্ষতিকর মঙ্গলজনক নয়, আর তারা অবশ্যই জানে, যে ব্যক্তি এটা অবলম্বন করবে, আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই; আর নিশ্চিত মন্দ তা যার বিনিময়ে তারা নিজেদের প্রাণ দিচ্ছে, হায়! যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকত।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (١٠٣)

(১০৩) আর যদি তারা ঈমান আনত এবং পরহেজগারী করত, তবে আল্লাহর তরফ হতে ছওয়াব উৎকৃষ্ট ছিল। হায়, যদি তাদের বুদ্ধি থাকত।

শাব্দিক অনুবাদ

১০২. وَاتَّبَعُوْا আর তারা অনুসরণ করল এমন কাজের مَا تَتْلُو الشَّيٰطِيْنُ যার চর্চা করত শয়তানরা عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ সুলাইমানের রাজত্বকালে وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ আর সুলাইমান কুফরি করেননি وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا কিন্তু শয়তানরা [জাদু মন্ত্রের কথায় ও কাজে] কুফরি করেছিল يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ মানুষকেও শিক্ষা দিচ্ছিল السِّحْرَ জাদুবিদ্যা وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ আর ঐ জাদুরও যা নাজিল করা হয়েছে ফেরেশতাদ্বয়ের উপর بِبَابِلَ বাবেলে هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ হারূত ও মারূত وَمَا يُعَلِّمٰنِ আর তারা শিক্ষা দিতেন না مِنْ اَحَدٍ কাউকেও حَتّٰى يَقُوْلَآ যে পর্যন্ত না বলে দিতেন যে اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ আমাদের অস্তিত্ব পরীক্ষামূলক فَلَا تَكْفُرْ সুতরাং তোমরা কাফের হয়ো না فَيَتَعَلَّمُوْنَ অতঃপর লোকে শিখত مِنْهُمَا তাদের থেকে مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ এমন জাদুবিদ্যা যা দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটাত بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ কোনো পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ বস্তুত তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তা দ্বারা مِنْ اَحَدٍ কারও اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুম ব্যতীত وَيَتَعَلَّمُوْنَ আর শিখত مَا يَضُرُّهُمْ এমন বিষয় যা তাদের জন্য ক্ষতিকর وَلَا يَنْفَعُهُمْ মঙ্গলজনক নয় وَلَقَدْ عَلِمُوْا আর তারা অবশ্যই জানে لَمَنِ اشْتَرٰىهُ যে ব্যক্তি এটা অবলম্বন করবে مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ আর নিশ্চিত মন্দ তা যার বিনিময়ে তারা দিচ্ছে اَنْفُسَهُمْ নিজেদের প্রাণ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ হায়! যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকত।

১০৩. وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا আর যদি তারা ঈমান আনত وَاتَّقَوْا এবং পরহেজগারী করত لَمَثُوْبَةٌ তবে ছওয়াব مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে خَيْرٌ উৎকৃষ্ট ছিল لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ হায়, যদি তাদের বুদ্ধি থাকত।

(১০৪) হে মুমিনগণ! তোমরা 'রায়েনা' বলো না; বরং 'উনযুরনা' বলো এবং শুনে নাও, কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٠٤)

(১০৫) মোটেই পছন্দ করে না এই কাফেররা কিতাবীই হোক আর মুশরিক হোক, তোমাদের উপর অবতারিত হওয়া তোমাদের প্রভুর তরফ হতে কোনো কল্যাণ; আর আল্লাহ নির্দিষ্ট করে নেন তাঁর রহমতের সাথে যাকে ইচ্ছা; আর আল্লাহ মহা করুণাময়।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (١٠٥)

শাব্দিক অনুবাদ

১০৪. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا তোমরা 'রায়েনা' বলো না; وَقُوْلُوا انْظُرْنَا বরং 'উনযুরনা' বলো وَاسْمَعُوْا এবং শুনে নাও وَلِلْكٰفِرِيْنَ আর কাফেরদের জন্য রয়েছে عَذَابٌ اَلِيْمٌ যন্ত্রণাময় শাস্তি।

১০৫. مَا يَوَدُّ মোটেই পছন্দ করে না الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এই কাফেররা مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ কিতাবীই হোক وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ আর মুশরিক হোক اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর অবতারিত হওয়া مِّنْ خَيْرٍ কোনো কল্যাণ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে; وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ আর আল্লাহ নির্দিষ্ট করে নেন بِرَحْمَتِهٖ তাঁর রহমতের সাথে مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَاللّٰهُ আর আল্লাহ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ মহা করুণাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০২) قوله وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বকালে জিনেরা জাদুর প্রক্রিয়া সম্বলিত একটি গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে দিল। হযরত সুলায়মান (আ.) উক্ত গ্রন্থটি একটি সিন্দুকে আবদ্ধ করে মাটিতে পুঁতে ফেলেন। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর পর জিনেরা তা বের করে লোক সমাজে বলতে থাকে, সুলায়মান এ কিতাবের বলে রাজত্ব করেছেন। ফলে ইহুদিরা সুলায়মান (আ.)-কে জাদুকর বলতে থাকে। নবী করীম (সা.) যখন সুলায়মান (আ.)-কে নবী হিসেবে সম্মানের সাথে নামোল্লেখ করেন, তখন তারা বলতে থাকে, মুহাম্মদ তো সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত করে ফেলেছেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল - ২ : আবূ হাতেম বলেন, আসেফ ছিলেন সুলাইমান (আ.)-এর কেরানী। তিনি ইসমে আজম জানতেন। তিনি সব কিছুই সুলাইমান (আ.)-এর আদেশক্রমে লিখতেন। আবার তা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর আদেশক্রমে লিখতেন। আর তা সুলাইমান (আ.)-এর সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখতেন। পরবর্তীতে সুলাইমান (আ.) যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন শয়তানেরা তা বের করে প্রতি দু'লাইনে লেখার ফাঁকে ফাঁকে জাদু ও কুফরি বাক্য লিখে রাখে। আর তারা বলতে লাগল যে, সুলাইমান যা আমল করতেন তাহলো এগুলো। তখন অজ্ঞ ও মূর্খ মানুষেরা তাঁকে কুফরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং তাঁকে ভর্ৎসনাও করে। সে সাথে তাদের ওলামারাও একসাথে তাল মিলায়। সুতরাং অজ্ঞ ইহুদিরা হযরত সুলাইমান (আ.)-কে ভর্ৎসনা করতে থাকে। তাদের অপকৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে শয়তানের চক্রান্ত এবং হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নিষ্কলুষতা লোক সমাজে বর্ণনা করার পক্ষে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[ফাতহুল কাদীর : ১২২/১]

الشَّيٰطِيْنُ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** الشَّيٰطِيْنُ দ্বারা দুষ্ট প্রকৃতির জিন ও মানব জাতি উভয়ই হতে পারে। এখানে আয়াতে উভয়ের কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ সরল পথ থেকে বিভ্রান্তকারী সকলকেই শয়তান বলা হয়।

হযরত সুলায়মান (আ.) সংক্রান্ত ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকট একটি আংটি ছিল। যখন তিনি পায়খানা প্রস্রাবখানায় যেতেন তখন উক্ত আংটি তাঁর স্ত্রী যুবায়দার নিকট রেখে যেতেন। এক সময় যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষার সময় উপস্থিত হলো তখন এক জিন শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করে যুবায়দার নিকট এসে তা চেয়ে নিয়ে যায়, সে আংটিটি হাতে পরে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর তখতে বসে পড়ে এবং যথারীতি রাজত্ব শুরু করে দেয়। এদিকে হযরত সুলায়মান (আ.) ফিরে এসে স্ত্রীর নিকট আংটি চাইলে স্বয়ং সুলায়মান (আ.) আংটিটি নিয়েছেন স্ত্রী কর্তৃক এই উত্তর শুনে তাঁর বুঝতে বাকি রইলো না যে, এটি একটি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। সেই সময় শয়তানরা জাদু-মন্ত্র, জ্যোতি-বিজ্ঞান, কাব্য-কবিতা ও গায়েবের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক লিখে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর তখতের নিচে পুঁতে রাখে। খোদায়ী পরীক্ষার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে তিনি আংটিটি ফিরে পান ও পুনরায় তখতে সমাসীন হন। বার্ধক্যে পৌঁছলে তিনি ইন্তেকাল করেন। অতঃপর শয়তানরা সেই পুস্তকের কথা জনসাধারণের নিকট প্রচার করে এবং আরো প্রচার করে যে, এর সাহায্যেই তিনি মানব দানবসহ সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেহেতু জিনেরা তখতে সুলায়মানের নিকট যেতে পারতো না, তাই কিছু লোক গিয়ে তখতের নিচে খোদাই করে তা উদ্ধার করে আনে। তখন লোকেরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়ত অস্বীকার করে বসে এবং তাঁকে একজন জাদুকর হিসেবে বিশ্বাস করে। মহানবী ﷺ তাদের এসব ভ্রান্ত চিন্তা ধারার অপনোদন করেন এবং আল্লাহর ঘোষণা অবতীর্ণ হয় যে, যাদু-মন্ত্র শয়তান কর্তৃক শিক্ষা প্রদত্ত ও প্রচারিত, হযরত সুলায়মান (আ.) তা থেকে মুক্ত ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন।

হারূত ও মারূতের ঘটনা

হারূত ও মারূত দু'জন ফেরেশতার নাম। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন। তাদের সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. এক সময় বাবেল শহরে জাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে। জাদুবিদ্যা এতটা উৎকর্ষিত হয়েছিল যে, লোকেরা মু'জিযা ও জাদুর মধ্যে তফাত করতে পারত না। ফলে অনেক জাদুকরকেও তারা নবী মনে করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা হারূত ও মারূত নামের দুই ফেরেশতাকে মানুষের পরীক্ষার জন্য পৃথিবীতে বাবেল শহরে প্রেরণ করেন। তারা পৃথিবীতে এসে মানুষকে জাদু শিক্ষা দেওয়ার কথা ঘোষণা দিলে লোকেরা তাদের কাছে জড়ো হয়। তখন লোকদের উদ্দেশ্যে তারা বলে, "দেখ জাদু শিক্ষা করা কুফরি। আর আল্লাহ আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য। কাজেই তোমরা জাদু শিখে কুফরি করো না।" এ কথা বলার পরও যারা জাদু শিখতে চাইতো, তারা তাদেরকে জাদু শিখাত। তবে তারা মানুষের কোনো ক্ষতি করতো না।

২. ইমাম ইবনে কাসীর এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হযত আদম (আ.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানগণ পৃথিবীর নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তারা ধন সম্পদ ও নারী ভোগের কুহকে পড়ে খুনখারাবি শুরু করে। ফলে ফেরেশতাদের কেউ কেউ বলে উঠল, 'দেখো, আদম সন্তানরা কত নাফরমান, আল্লাহর নাফরমানি করছে। আমরা যদি তাদের মর্যাদার থাকতাম তাহলে আদৌ এমনটি করতাম না। এই মন্তব্য শুনে ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের কথাই যদি সত্যি হয় তবে তোমাদের মধ্য হতে দু'জনকে নির্বাচন করো। আমি তাদের মাঝে মানুষের মতো যাবতীয় জৈবিক চাহিদা দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করি। তারপর তোমরা দেখো, তারা সেখানে গিয়ে কি করে।' কথামতো হারূত ও মারূত নামে দুই ফেরেশতাকে নির্বাচিত করা হয়। পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে আল্লাহ তাদেরকে ৩টি উপদেশ প্রদান করেন। যথা– (১) আমি তোমাদের সম্পর্কে বলছি যে, পৃথিবীতে গিয়ে তোমরা আমার সাথে কাউকেও শরিক করো না, (২) জেনা করো না, (৩) এবং মদ্যপান করো না।

বাবেলে আসার পর কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা যোহরা নামের এক সুন্দরী রমণীর ফাঁদে পা দেয়। আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করার জন্য এই রমণীকে তাদের সাহচর্যে প্রেরণ করেন। তারা এই সুন্দরীকে দেখে অবিচল থাকতে পারেনি। তারা তাকে যৌন সম্ভোগের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মহিলা শর্ত জুড়ে দেয়। সে বলে, "তোমরা যদি শিরক করতে পারো, তাহলে আমি এই প্রস্তাবে রাজি আছি।" এ শর্তে তারা অস্বীকৃতি জানালে সে চলে যেতে থাকে এবং আবার ফিরে এসে বলে, "তোমরা যদি ঐ ছেলেটাকে হত্যা করতে পার, তবে আমি রাজি আছি। এ শর্তেও তারা রাজি হলো না। ফলে সেই রমণী বলল, 'তোমরা যদি মদ পান করো তবে আমি তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি। এ শর্তে তারা রাজি হয়ে যায়। তারা মদ পানকে ছোট অপরাধ মনে করে এতে সম্মত হয়। মদ পান করে তারা মত্ত অবস্থায় ঐ রমণীর সাথে জেনা করে এবং ঐ ছেলেটিকেও হত্যা করে। চেতনা ফিরে এলে ঐ রমণী তাদেরকে বলল, তোমরা যা করতে অস্বীকার করেছিলে এখনতো তাও করলে।" তখন তারা তাদের কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। আল্লাহ তাদেরকে ইহকাল, কিংবা পরকালে শাস্তি গ্রহণের ইখতিয়ার প্রদান করেন। তারা ইহকালের শাস্তিকেই বেছে নেয়। –[ইবনে কাসীর]

তবে আল্লামা বায়যাবী (র.) তার তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরিউক্ত উপাখ্যানটিকে পৌরাণিক কাহিনী এবং ইসরাঈলী বর্ণনা বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ, এই ঘটনার কোনো নির্ভরযোগ্যতা নেই। –[তাফসীরে বায়যাবী]

জাদুর বিবরণ : اَلسِّحْرُ শব্দের বাংলা জাদু, ইংরেজিতে তাকে magic বলা হয়। ম্যাজিক অর্থ সম্মোহন, যা এক প্রকার অদৃশ্য ক্রিয়ার প্রভাব মাত্র। দার্শনিকদের মতে اَلسِّحْرُ-এর কার্যকারণ একটি সূক্ষ্ম বিষয়। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ শয়তানের সাহচর্যের মাধ্যমে অন্তরের নোংড়ামি প্রসূত বিষয়। যেমন কোনো বিশেষ মন্ত্র পড়লে এরূপ জাদু সংঘটিত হয়ে থাকে। ব্যাপারটি বহিরাগত কোনো শক্তির প্রভাবও হতে পারে। যেমন দূর থেকে জিন ও শয়তানের প্রভাব। তবে এটা প্রচণ্ড কল্পনা শক্তির প্রভাবও হতে পারে যাকে মেসমেরিজম বলা হয়।
ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, اَلسِّحْرُ হচ্ছে ধোঁকাবাজি।
সর্বসাধারণের চোখে যে সকল কাজ মানুষের সাধ্যের বাইরে, বিশেষ কোনো কৌশলে তা সাধন করে প্রদর্শন করাকেই اَلسِّحْرُ বলা হয়। হ্যাঁ, এই প্রকার কাজ যদি নবীদের থেকে ঘটে তবে তাকে মু'জিযা এবং ওলীদের থেকে প্রকাশিত হলে তাকে কারামত বলা হয়
ইংরেজি অভিধানে اَلسِّحْرُ এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– The art of warking by poewr over the hidden forces of nature. অর্থাৎ, প্রকৃতিতে লুক্কায়িত অতিন্দ্রীয় শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো কিছু সংঘটিত করার শিল্পকে জাদু বলে।

জাদুর বিধান : জাদু যদি ভেল্কিবাজি হয়, কিংবা কুফরি কালামের সাহায্যে হয় তবে এ প্রকার জাদু মানুষের কল্যাণকর হোক, আর ক্ষতিকর হোক সর্বাবস্থায় হারাম।
আর যদি তা শরিয়ত সম্মত মন্ত্রের মাধ্যমে হয় এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর না হয় তবে বৈধ। একে জাদু বলা হয় না, বরং এটাকে আযীমত বা তাবীলাত বলা হয়। –[বায়ানুল কুরআন]

জাদুকরের বিধান : পবিত্র কুরআনের ভাষায় জাদু করা কুফরি। কাজেই কেউ যদি জেনে বুঝে জাদু করে তবে তো সে কুফরি করল। জাদুকরের শাস্তির ব্যাপারে দু'রকম কথা পাওয়া যায়।

১. কোনো মুমিন যদি কুফরি কালামের সাহায্যে জাদু করে; কিংবা অন্য মুমিনের ক্ষতি সাধনের নিমিত্তে জাদু করে, তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না, তাকে হত্যা করতে হবে। তবে এ দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারের।
   ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ, আবূ ছাওর, ইসহাক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এই মতকে সমর্থন করেন। তাঁদের দলিল হলো, নবীজীর বাণী– حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ অর্থাৎ "জাদুকরের দণ্ড বিধান হলো, তাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা।"
২. আর যদি জাদুতে কুফরি কালাম না থাকে, তবে জাদুকরকে হত্যা করা যাবে না। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করেন যে, "হযরত আয়েশা (রা.) একজন জাদুকর দাসী হত্যা না করে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।"
৩. তবে জাদু কুফরি কালামের দ্বারা হোক, আর বৈধ মন্ত্রের দ্বারাই হোক, জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি মারা গেলে অবস্থাবেধে জাদুকরের কাছ থেকে قِصَاصٌ বা دِيَةٌ গ্রহণ করা হবে। –[কুরতুবী]

قوله بِبَابِلَ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা হারুত মারূতকে বাবেল শহরে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বাবেল শহর কোনটি তা নিয়ে মতভেদ আছে। যেমন–(১) হীরা রাজ্য ও তৎকালীন কূফা নগরীর অদূরবর্তী একটি নগরী। কেননা ইবনে মাসউদ কূফাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "তোমরা হীরা ও বাবেলের মধ্যবর্তী অঞ্চলের লোক।" এ কথাটি দ্বারা বাবেল নগরী কূফার অদূরে বুঝায়। (২) কেউ কেউ বলেন : বাবেল বলে, ইরাক ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। (৩) কেউ কেউ বলেছেন, বাবেল বলতে নাহওয়ান্দ পর্বত উদ্দেশ্য। (৪) কেউ কেউ মনে করেন বাবেল বলে ঐতিহাসিক বেবিলন নগরীকে বুঝানো হয়েছে যা এক সময় নেনেভা রাজ্যের রাজধানী ছিল। নমরূদ এ রাজ্যের অধিশ্বর, এটাকে মেসোপটেমিয়াও বলা হয়। –[তাফসীরে কুরতুবী ও অন্যান্য]

উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর ও শানে নুযূল প্রসঙ্গে অনেক অসমর্পিত ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়। সেসব রেওয়ায়েত পাঠ করে অনেক পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) সুস্পষ্ট ও সহজভঙ্গিতে এসব প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। তাঁর বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করে এখানে হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম।

১. নির্বোধ ইহুদিরাই হযরত সুলায়মান (আ.)-কে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করত, তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াতের মাঝখানে তাঁর নিষ্কলুষতাও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

২. বর্ণিত আয়াতসমূহে ইহুদিদের নিন্দা করাই উদ্দেশ্য। কারণ তাদের মধ্যে জাদুবিদ্যার চর্চা ছিল। এসব আয়াত সম্পর্কে পরামাসুন্দরী যোহরার একটি মুখরোচক কাহিনীও সুবিদিত রয়েছে। কাহিনীটি কোনো নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত নয়। শরিয়তের নীতি বিরুদ্ধ মনে করে অনেক আলেম কাহিনীটিকে নাকচ করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ একে সদর্থে ব্যাখ্যা করা শরিয়ত বিরুদ্ধ মনে না করে নাকচ করেননি। বাস্তবে কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা, এখানে তা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা ঠিক যে, আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কাহিনীর উপর নির্ভরশীল নয়।

৩. সবকিছু জানা সত্ত্বেও ইহুদিরা আমল বা কাজ করত, 'ইলম' বা জানার বিপরীতে এবং এ ব্যাপারে তারা মোটেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত না। তাই আয়াতে প্রথমে তাদের জানার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এবং পরিশেষে 'যদি তারা জানত।' বলে না জানার কথাও বলা হয়েছে। কারণ, যে জানার সাথে তদনুরূপ কাজ ও বিচক্ষণতা যুক্ত হয় না, তা না জানারই শামিল।

৪. ঠিক কখন, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলেও এক সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ করে বাবেল শহরে জাদু বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। জাদুর অত্যাশ্চার্য ক্রিয়া দেখে মূর্খ লোকদের মধ্যে জাদু ও পয়গম্বরগণের মু'জিযার স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে, কেউ কেউ জাদুকরদেরও সজ্জন এবং অনুসরণ যোগ্য মনে করতে থাকে, এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত নামে দুজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল জাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা– যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং জাদুর আমল ও জাদুকরদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকতে পারে। পয়গম্বরগণের নবুয়তকে যেমন মু'জিযা ও নির্দশনাদি দ্বারা প্রমাণ করে দেওয়া হয়, তেমনি হারুত ও মারুত যে ফেরেশতা তার উপর যুক্তি প্রমাণ খাড়া করে দেওয়া হলো, যাতে তাদের নির্দেশাবলি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

এ কাজে পয়গম্বরগণকে নিযুক্ত না করার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এতে পয়গম্ব ও জাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এদিক দিয়ে তারা যেন ছিলেন একটি পক্ষ। কাজেই উভয়পক্ষকে বাদ দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে বিচারক নিযুক্ত করাই বিধেয়।

দ্বিতীয়তঃ জাদুর বাক্যাবলি মুখে উচ্চারণ ও বর্ণনা ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। যদিও 'কুফরে'র বর্ণনা কুফর নয়, এই স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী পয়গম্বরগণ তা করতে পারতেন, তথাপি হেদায়েতের প্রতীক হওয়ার কারণে এ কাজে তাঁদের নিযুক্তি সমীচীন মনে করা হয়নি। সুতরাং এ কাজের জন্য ফেরেশতাই মনোনীত হন। কারণ সৃষ্টি জগতে ফেরেশতাদের দ্বারা এমন কাজও নেওয়া হয়, যা সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে ভালো, কিন্তু অনিষ্টের কারণে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মন্দ। যেমন, কোনো হিংস্র ও ইতর প্রাণীর লালন-পালন ও দেখাশুনা করা। সৃষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে এ কাজ সঠিক ও প্রশংসনীয়, কিন্তু জাগতিক কল্যাণ আইনের দৃষ্টিতে অঠিক ও নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে পয়গম্বরগণকে শুধু জাগতিক কল্যাণমূলক আইন তদারকের কাজেই নিযুক্ত করা হয়– যা সাধারণতঃ ভালো কাজেই হয়ে থাকে। উপরিউক্ত জাদুর উচ্চারণ ও বর্ণনা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে জাগতিক কল্যাণমূলক কাজ হলেও জাদুর আমলে লিপ্ত হয়ে পড়ার [যেমন, বাস্তবে হয়েছে] ক্ষীণ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বগরগণকে এ থেকে দূরে রাখাই পছন্দ করা হয়েছে।

জাদু ও মু'জিযার পার্থক্য : পয়গম্বরদের মু'জিযা ও ওলীদের কারামত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশ পায়, জাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার।

বলাবাহুল্য, প্রকৃত সত্তার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সত্তার পার্থক্য এই যে, জাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলিও কারণের আওতাবহির্ভূত নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে। যেখানে কারণ দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয় এবং ঘটনাকে মোটেই বিস্ময়কর মনে করা হয় না; কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক 'কারণ' না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে। অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার মতো। কোনো দূরপ্রাচ্য থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শকমাত্রই সেটাকে অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে। অথচ জিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা এই যে, জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ঘটনাবলিও প্রাকৃতিক কারণের অধীন। তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরুন মানুষ অলৌকিকতার বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

মু'জিযার অবস্থা এর বিপরীত। মু'জিযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণে কোনো হাত নেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য নমরূদের জ্বালানো আগুনকে আল্লাহ তা'আলাই আদেশ করেছিলেন, 'ইবরাহীমের জন্য সুশীতল হয়ে যাও।' কিন্তু এতটুকু শীতল নয় যে, হযরত ইবরাহীম কষ্ট অনুভব করে।' আল্লাহর এই আদেশের ফলে আগুন শীতল হয়ে যায়।

ইদানিং কোনো কোনো লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভিতরে চলে যায়। এটা মু'জিযা নয়; বরং ভেষজের প্রতিক্রিয়া। তবে ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে অলৌকিক বলে ধোকা খায়।

স্বয়ং কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'জিযা সরাসরি আল্লাহর কাজ। বলা হয়েছে– وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ অর্থাৎ আপনি যে একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ এক মুষ্টি কঙ্কর যে সমবেত সবার চোখে পৌঁছে গেল, এতে আপনার কোনো হাত ছিল না। এটা ছিল একান্তভাবেই আল্লাহর কাজ এই মু'জিযাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন যা সবার চোখেই পড়েছিল।

মু'জিযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর কাজ, আর জাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মু'জিযা ও জাদুর স্বরূপ বুঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বুঝার জন্যও আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন।

প্রথমতঃ মু'জিযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাঁদের আল্লাহভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহর জিকির হতে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জিযা ও জাদুর প্রার্থক্য বুঝতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মু'জিযা ও নবুয়ত দাবি করে জাদু করতে চায়, তার জাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অবশ্য নবুয়তের দাবি ছাড়া জাদু করলে, তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পয়গম্বরগণের উপর জাদু ক্রিয়া করে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হবে 'ইতিবাচক। কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। পয়গম্বগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। এটা নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থি নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পয়গম্বরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন। তেমনিভাবে জাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর জাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং জাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর জাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া কুরআনেই উল্লিখিত রয়েছে– يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ এবং فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ জাদুর কারণেই হযরত মূসা (আ.)-এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল।

(১০৩) قوله وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াতে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর প্রতি ইহুদিদের আরোপিত কুফরির অভিযোগ থেকে তাঁর নিষ্কলুষ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতাংশ নাজিল করেন। বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন যে, সুলাইমান (আ.) কে যখন নবীগণের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হলো, তখন এক শ্রেণির ইহুদিরা বলতে লাগল, তোমরা মুহাম্মদের প্রতি লক্ষ্য কর! তিনি হযরত সুলাইমানকে নবীগণের মধ্যে গণ্য করেছেন অথচ তিনি ছিলেন কেবল মাত্র একজন জাদুকর। ইহুদিদের এহেন মিথ্যা অভিযোগ থেকে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নিষ্কলুষতার বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ অবতীর্ণ করেন। –[বাহরে মুহিত : ৪৯৫/১, জালালাইন : ১৫]

(১০৪) قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** নবী করীম ﷺ-এর সাথে সালাম বিনিময় ও কতাবার্তা ইত্যাদিতে ইহুদিরা সম্ভাব্য সকল উপায়ে দুর্ব্যবহারের চেষ্টা চালাত। তাই তারা নবী করীম ﷺ-কে কখনো "একটু থামুন, কথাটিগুলো আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে দিন।" বলার প্রয়োজন হলে তারা বলত "রায়িনা"। এ কথাটির স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে– আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন বা আমাদের কথা শুনুন; কিন্তু এর আরো কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন– হিব্রু ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে "শোন তুই বধির হয়ে যা" হিব্রু ভাষায় এর অপর অর্থ হতে পারে– নির্বোধ ও মূর্খ। এ শব্দটি কথা বার্তার মাঝে বলা হলে তার অর্থ হয়, "তুমি যদি আমাদের কথা শোনো তবে আমরাও তোমাদের কথা শুনব"। তাছাড়া এই শব্দ উচ্চারণের সময় খানিকটা দীর্ঘ করা হলে "রায়েনার" পরিবর্তে "রায়িনা উচ্চারণ হয় যার অর্থ হয়, "হে আমাদের রাখাল"। ইহুদিদের মুখে শব্দটি শুনে মুসলমানরা এর স্বাভাবিক অর্থ লক্ষ্য করে শব্দটি প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতেন, এ সম্পর্কে ইহুদিদের দুষ্ট মনোভাব সম্পর্কে মুসলমানরা বেখবর ছিলেন। ইহুদিদের দুষ্ট ভাবধারা থাকার কারণে মুসলমানদেরকে এ শব্দটি ব্যবহার করতে একেবারেই নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এর পরিবর্তে "উনজুরনা" বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ– "আমাদের দেখুন। আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন বা আমাদের কথা বলার সুযোগ দিন।" এ শব্দটিতে অন্য কোনো অর্থের অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাজিল হয়। ফলে ইহুদিদের 'রায়িনা' বলার আর কোনো সুযোগ রইল না।

لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا বলার কারণ : আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে رَاعِنَا বলতে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে رَاعِنَا শব্দটি গঠনগতভাবে দ্ব্যর্থবোধক অর্থাৎ এ শব্দটি ভালো এবং মন্দ উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে যেমন– رَاعِنَا শব্দটি যদি مُرَاعَاةٌ মাসদার থেকে اَمْرٌ-এর সীগাহ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে অর্থ হবে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। আবার رَاعِنَا শব্দটি যদি رَعْىٌ মাসদার থেকে اسم فاعل হিসেবে ব্যবহার করা হয় তবে এর অর্থ হবে, হে আমাদের রাখাল! আর رَاعِنَا শব্দটি যদি رَعُوْنَةٌ মাসদার থেকে اسم فاعل রূপে গ্রহণ করা হয়, তবে উহার অর্থ হবে– হে আমাদের কুলক্ষণের ব্যক্তিটি! এরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ আল্লাহর রাসূলের শানে মানায় না। সুযোগ বুঝে এ শব্দটি নোংড়া অর্থে ব্যবহার করে ইহুদিরা নবীজীকে খাটো করার চেষ্টা করত। তাই সাহাবীগণ যদি رَاعِنَا বলা থেকে বিরত থাকে তবে ইহুদিরাও এই শব্দটি ব্যবহার করতে সাহস পাবে না। এ সকল কারণে আল্লাহ মু'মিনদের رَاعِنَا বলতে নিষেধ করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَبِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ– তারা অনুসরণ করল।

تَتْلُوْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে পাঠ করে।

مَا يُعَلِّمَانِ : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْلِيْمُ মূলবর্ণ (ع . ل . م) জিনস صحيح অর্থ– তারা শিখাতেন না।

فِتْنَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فِتَنٌ অর্থ– পরীক্ষা।

يُفَرِّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّفْرِيْقُ মূলবর্ণ (ف . ر . ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা পৃথক করত, তারা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করত।

الْمَرْءِ : শব্দটি একবচন, বহুবচন "رِجَالٌ" مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ অর্থ– লোক, পুরুষ।

زَوْجٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন ازواج অর্থ– স্ত্রী।

ضَارِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلضَّرُّ মূলবর্ণ (ض . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ক্ষতিকারকগণ।

مَثُوْبَةٌ : ছওয়াব, প্রতিদান, বিনিময়।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله لَمَثُوْبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ : এখানে لام টি তাকীদের জন্য এসেছে مَثُوْبَةٌ হলো مبتدأ আর مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ জার মাজরুর হয়ে مَثُوْبَةٌ এর সাথে متعلق আর خير হলো خبر অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا : এখানে لَا تَقُوْلُوْا ফে'ল اَنْتُمْ যমীরে মুসতাতির فاعل অতঃপর فعل ও فاعل মিলে قول হয়েছে। তৎপর رَاعِ ফে'ল اَنْتَ যমীর فاعل এবং نَا মাফউলে বিহী, এবার فعل এবং فاعل ও مفعول به মিলে جملة فعلية হয়ে مقولة হয়েছে। পরিশেষে قول ও مقوله মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : এখানে و হরফে আতফ اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, ذُوْ মুযাফ, اَلْفَضْلِ الْعَظِيْمِ মাওসূফ ও সিফাত মিলে مضاف اليه এবার مضاف ও مضاف اليه মিলে خبر পরিশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

অনুবাদ : (১০৬) আমি কোনো আয়াতের হুকুম রহিত করলে কিংবা আয়াতটিকেই বিস্মৃত করে দিলে তদপেক্ষা উত্তম বা তদানুরূপ আনয়ন করি; তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সকল বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾

(১০৭) তুমি কি জান না যে, আসমানসমূহ ও জমিনের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহরই; আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো বন্ধুও নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾

(১০৮) তোমরা কি চাও যে, তোমাদের রাসূলের নিকট আবেদন করবে যেমন ইতঃপূর্বে [হঠকারিতাবশতঃ এরূপ বহু নিরর্থক] আবেদন করা হয়েছিল মূসার নিকট, আর যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরি অবলম্বন করে, নিশ্চয় সে সঠিক পথ হতে দূরে সরে পড়ে।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِیَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾

(১০৯) কায়মনে চায় কিতাবীদের মধ্য হতে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনয়নের পর আবার তোমাদেরকে কাফের করে ফেলে, শুধু তাদের অন্তরে নিহিত হিংসার দরুন, তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর, যা হোক ক্ষমা করতে থাক, উপেক্ষা করতে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁর হুকুম পাঠান; নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ

১০৬. مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ আমি কোনো আয়াতের হুকুম রহিত করলে اَوْ نُنْسِهَا কিংবা আয়াতটিকেই বিস্মৃত করে দিলে نَاْتِ আনয়ন করি بِخَيْرٍ مِّنْهَآ তদপেক্ষা উত্তম اَوْ مِثْلِهَا বা তদানুরূপ; اَلَمْ تَعْلَمْ তুমি কি জান না যে, اَنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ সকল বিষয়ের উপরই قَدِيْرٌ ক্ষমতাবান।

১০৭. اَلَمْ تَعْلَمْ তুমি কি জান না যে, اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ একমাত্র আল্লাহরই مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের আধিপত্য وَمَا لَكُمْ আর তোমাদের নেই مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত مِنْ وَّلِیٍّ অন্য কোনো বন্ধুও وَّلَا نَصِيْرٍ এবং সাহায্যকারীও নেই।

১০৮. اَمْ تُرِيْدُوْنَ তোমরা কি চাও যে, اَنْ تَسْـَٔلُوْا আবেদন করবে رَسُوْلَكُمْ তোমাদের রাসূলের নিকট كَمَا سُئِلَ যেমন আবেদন করা হয়েছিল مُوْسٰى মূসার নিকট مِنْ قَبْلُ ইতঃপূর্বে وَمَنْ আর যে ব্যক্তি يَّتَبَدَّلِ অবলম্বন করে الْكُفْرَ কুফরি بِالْاِيْمَانِ ঈমানের পরিবর্তে, فَقَدْ ضَلَّ নিশ্চয় সে দূরে সরে পড়ে سَوَآءَ السَّبِيْلِ সঠিক পথ হতে।

১০৯. وَدَّ কায়মনে চায় كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ কিতাবীদের মধ্য হতে অনেকেই لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ আবার তোমাদেরকে করে ফেলে, مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ তোমাদের ঈমান আনয়নের পর كُفَّارًا কাফের حَسَدًا শুধু হিংসার দরুন مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ তাদের অন্তরে নিহিত مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর فَاعْفُوْا যা হোক ক্ষমা করতে থাক وَاصْفَحُوْا উপেক্ষা করতে থাক حَتّٰى يَاْتِیَ اللّٰهُ যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা পাঠান بِاَمْرِهٖ তাঁর হুকুম اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ প্রত্যেক বস্তুর উপর قَدِيْرٌ ক্ষমতাবান

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (١١٠)

(১১০) এবং যথারীতি নামাজ পড় ও জাকাত দাও; আর যে নেক কাজই নিজ কল্যাণের জন্য সঞ্চয় করতে থাকবে তা আল্লাহর নিকট পাবে; কেননা আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখছেন।

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۚ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۚ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١١١)

(১১১) আর ইহুদি, নাসারাগণ বলে বেহেশতে কেউই কখনো যেতে পারবে না তারা ব্যতীত যারা ইহুদি কিংবা নাসারা হয়েছে; এটা তাদের আত্ম-সান্ত্বনামূলক উক্তি; আপনি বলে দিন, নিজ নিজ দলিল আন- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۠ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (١١٢)

(১১২) নিশ্চয় অন্যরাও যাবে, যে কোনো ব্যক্তিই নিজের চেহারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকাবে এবং সে অকপটও হয়, তবে এরূপ ব্যক্তি তার বিনিময় পাবে তার প্রতিপালকের নিকট পৌছে, আর না তাদের কোনো ভয় আছে এবং না তারা চিন্তান্বিতও হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

১১০. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এবং যথারীতি নামাজ পড় وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ও জাকাত দাও; وَمَا تُقَدِّمُوْا আর যে সঞ্চয় করতে থাকবে لِاَنْفُسِكُمْ নিজ কল্যাণের জন্য مِنْ خَيْرٍ নেক কাজই تَجِدُوْهُ তা পাবে; عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট اِنَّ اللّٰهَ কেননা আল্লাহ بِمَا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের সকল কৃতকর্মের প্রতি بَصِيْرٌ দৃষ্টি রাখছেন।

১১১. وَقَالُوْا আর ইহুদি, নাসারাগণ বলে لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ বেহেশতে কেউই কখনো যেতে পারবে না اِلَّا مَنْ كَانَ তারা ব্যতীত যারা হয়েছে هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ইহুদি কিংবা নাসারা تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ এটা তাদের আত্ম-সান্ত্বনামূলক উক্তি; قُلْ আপনি বলে দিন, هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ নিজ নিজ দলিল আন– اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১১২. بَلٰى নিশ্চয় অন্যরাও যাবে, مَنْ اَسْلَمَ যে কোনো ব্যক্তিই ঝুঁকাবে وَجْهَهٗ নিজের চেহারা لِلّٰهِ আল্লাহর দিকে وَهُوَ مُحْسِنٌ এবং সে অকপটও হয়, فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ তবে এরূপ ব্যক্তি তার বিনিময় পাবে عِنْدَ رَبِّهٖ তার প্রতিপালকের নিকট পৌছে, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ আর না তাদের কোনো ভয় আছে وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং না তারা চিন্তান্বিতও হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০৬) قوله مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا الخ আয়াতের শানে নুযূল-১ : যখন কেবলা পরিবর্তন হলো তখন ইহুদিরা তিরস্কার করে বলতে লাগল, মুহাম্মদ অস্থিরমনা মানুষ আজ তার সাথীদেরকে এক নির্দেশ দেয় আবার আগামীকাল তা থেকে নিষেধ করে। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল-২ : কুরআন শরীফের এক আয়াত অপর আয়াত দ্বারা রহিত হওয়া দেখে ইহুদিরা অভিযোগ আরোপ করল যে, পূর্ববর্তী আয়াত ও তার হুকুমের মধ্যে খারাপ ও সঙ্গত দিক কোনটি দেখা দিল, পূর্ববর্তী আয়াত যাদ্বরূণ রহিত করা হলো। পূর্ববর্তী নির্দেশে যদি কোনো প্রকারের অসঙ্গত ছিলই, তাহলে সে নির্দেশ দেওয়া হলো কেন যাকে রহিত কতে হলো? কোনো কোনো সময় এমন হতো যে, রাতে ওহী নাজিল হতো ভোর বেলায় তা রহিত হয়ে যেত। ফলে ইহুদিরা বিভিন্ন প্রকারের সমালোচনা করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[নূরুল কুলূব]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর উপর রাতের বেলায় যে ওহী নাজিল হতো। দিনের বেলায় কোনোংশ ভুলিয়ে দেওয়া হতো, তখন এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। -[ফাতহুল কাদীর : ১২৭/১]

(১০৮) قوله اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল–২ : একবার মক্কার কাফেররা রাসূলে কারীম (সা.)-কে বললেন, আমাদের জন্য ওহুদ পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দিন। রাসূল ﷺ প্রতিউত্তরে বললেন, আমি স্বর্ণ বানাতে পারি, তবে শর্ত হলো এরপর যদি তোমরা নাফরমানি কর তাহলে তোমাদের উপর আজাব আসবে। ঐ আজাব আসবে যা বনী ইসরাঈলের উপর এসেছিল। একথা বলার পর তারা হুজুর ﷺ-এর কাছে থেকে চলে গেল। কুরাইশদের অযৌক্তিকভাবে এ দাবি করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে ইহুদি ও কতিপয় মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, তাদের কারো এ দাবি ছিল আসমান থেকে পূর্ণ কিতাব এক সাথে নিয়ে আস। হযরত মূসা (আ.) যেমনভাবে একসাথে পূর্ণ তাওরাত নিয়ে এসেছিলেন। কারো দাবি ছিল যে, আসমান থেকে আমাদের নিকট একটি পত্র নিয়ে আস, যাতে লিখা থাকবে রাব্বুল আলামীনের নিকট থেকে আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়ার প্রতি। আমি মুহাম্মদকে মানুষের প্রতি রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছি। কারো দাবি ছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের মুখামুখি আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে উপস্থিত করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার প্রতি আমরা ঈমান আনব না। এ সকল উদ্ভট দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

(১০৯) قوله وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল–১ : ইসলামের চির শত্রু আখতারের দুই ছেলে ইহুদি নেতা হুআই এবং আরেক ভাই সব সময় প্রাণপণে চেষ্টা করত মুসলমানদেরকে কুফরির দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। তাদের এই নোংরা চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল –২ : নাহাস বিন আযূরা, যায়েদ বিন কায়েস ও ইহুদিদের একটি জামাত, হুযাইফা ও আম্মারকে ধর্মান্তরিত করতে চেষ্টা করে। তাদের এহেন চক্রান্তের প্রতি মুসলমানদের সচেতন ও সতর্ক করার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[বাহরে মুহীত : ৫১৭-১৮/১]

(১১১) قوله وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى الخ আয়াতের শানে নুযূল : একবার হুজুর ﷺ-এর দরবারে নাজরানের কিছু খ্রিস্টান এবং মদিনার কিছু ইহুদি উপস্থিত হলো। তারা এক পর্যায়ে উভয় গ্রুপ তর্কে লিপ্ত হলো। ইহুদিরা দাবি করতে লাগল যে, জান্নাতে একমাত্র ইহুদিরাই প্রবেশ করবে। আর নাসারাও দাবি করলো যে, জান্নাতে একমাত্র নাসারাই প্রবেশ করবে। তাদের এই হাস্যকর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا –এই আয়াতে কুরআনি আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে। অভিধানে 'নস্‌খ' শব্দের অর্থ হলো দূর করা, লিখা। সমস্ত মুসলিম টীকাকার এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে 'নসখ' শব্দ দ্বারা বিধি-বিধান দূর করা– অর্থাৎ, রহিত করাকে বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস ও কুরআনের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নস্‌খ' বলা হয়। 'অন্য বিধানটি' কোনো বিধানের বিলুপ্তি ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক বিধানের পরিবর্তে অপর বিধান প্রবর্তনও হতে পারে।

আল্লাহর বিধানে নস্‌খের স্বরূপ : জগতের রাষ্ট্র ও আইন আদালতে এক নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ জারি করার ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। রচিত আইনে 'নস্‌খ' বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে।

১. ভুল ধারণার উপর নির্ভর করে প্রথমে স্বরূপ উদঘাটিত হলে পূর্বেকার আইন পরিবর্তন করা হয়। ২. ভবিষ্যত অবস্থার গতি-প্রকৃতি জানা না থাকার কারণে কোনো কোনো সময় সাময়িক আইন জারি করা হয়। পরে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সে আইনও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের নস্‌খ আল্লাহর আইনে হতে পারে বলে ধারণাও করা যায় না।

তৃতীয় প্রকার 'নসখ' এরূপ : আইন রচয়িতা আগেই জানে যে, অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন এই আইন আর উপযোগী থাকবে না' অন্য আইন জারি করতে হবে। এরূপ জানার পর সাময়িকভাবে এই আইন জারি করে দেন, পরে পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনও পরিবর্তন করেন। উদাহরণতঃ রোগীর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন। তিনি জানেন যে, এই ঔষধ দু'দিন সেবন করার পর রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন অন্য ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে। অবস্থার এহেন পরিবর্তন জানার ফলেই চিকিৎসক প্রথম দিন এক ঔষধ এবং পরে অন্য ঔষধ দেন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথম দিনেই পরিবর্তনসহ চিকিৎসার পূর্ণ প্রোগ্রাম কাগজে লিখে দিতে পারে যে, দুদিন এই ঔষধ, তিনি দিন অন্য ঔষধ এবং এক সপ্তাহ পর অমুক ঔষধ সেব্য। কিন্তু এরূপ করা হলে রোগীর পক্ষে জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এতে ভুল বুঝাবুঝির কারণে ত্রুটিরও আশঙ্কা থাকে। তাই ডাক্তার প্রথম দিনেই পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন না।

আল্লাহর আইনে এবং আসমানি গ্রন্থসমূহে শুধুমাত্র তৃতীয় প্রকার নসখই হতে পারে এবং হয়ে থাকে। প্রতিটি নবুয়ত ও প্রতিটি আসমানি গ্রন্থ পূর্ববর্তী নবুয়ত ও আসমানি গ্রন্থের বিদান নসখ তথা রহিত করে নতুন বিধান জারি করেছে। এমনিভাবে একই নবুয়ত ও শরিয়ত এমন রয়েছে যে, এক বিধান কিছু দিন প্রচলিত থাকার পর আল্লাহর হেকমত অনুযায়ী সেটি পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ –অর্থাৎ এমন নবুয়ত কখনও ছিল না, যাতে নসখ ও পরিবর্তন করা হয়নি।–[কুরতুবী] [বিধান পরিবর্তন সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য উসূলে ফিকহ দ্রষ্টব্য]

এখানে 'অন্যায় আবদার' বলার কারণ এই যে, প্রতিটি কাজেই আল্লাহ তা'আলার হেকমত ও উপযোগিতা নিহিত থাকে। তাতে পন্থা নির্দেশ করার কোনো অধিকার বান্দার নেই যে, সে বলবে, একাজটি এভাবে করা হোক।

জ্ঞাতব্য : তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। পরবর্তীকালে আল্লাহ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং জিহাদের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইহুদিদের প্রতি আইন বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্টদের হত্যা, নির্বাসন, জিযিয়া আরোপ ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পারস্পরিক মতবিরোধের উল্লেখ করে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মতবিরোধের কুফল বর্ণনা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আসল সত্য উদঘাটন করেছেন। এসব ঘটনায় মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত [পথনির্দেশ] নিহিত রয়েছে যা পরে বর্ণিত হবে।

খ্রিস্টান ও ইহুদি উভয় সম্প্রাদয়ই ধর্মের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে ধর্মের নাম ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতি ও আল্লাহর প্রিয় পাত্র বলে দাবি করত এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য সমস্ত জাতিকে জাহান্নামী ও পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করত।

এ অযৌক্তিক মতবিরোধের ফলশ্রুতিতেই মুশরিকরাএকথা বলার সুযোগ পেল যে, খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদিধর্ম উভয়টিই মিথ্যা ও বানোয়াট এবং ওদের মূর্তি পূজাই একমাত্র সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম।

আল্লাহ তা'আলা উভয় সম্প্রদায়ের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এরা উভয় জাতিই জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন, তারা শুধু ধর্মের নাম ভিত্তিক জাতীয়তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ ইহুদি-খ্রিস্টান অথবা ইসলাম যে কোনো ধর্ম হোক, সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে দু'টি বিষয়ঃ

এক. বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে। তাঁর আনুগত্যকেই নিজের মত ও পথ মনে করবে। এ উদ্দেশ্যটি যে ধর্মে অর্জিত হয় তা-ই প্রকৃত ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে পিছনে ফেলে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদের ধ্বজা ধরে থাকা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

দুই. যদি কেউ মনে প্রাণে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু আনুগত্য ও ইবাদত নিজ খেয়াল খুশিমতো মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এক্ষেত্রেও আনুগত্য ও ইবাদতের সে পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছেন।

প্রথম বিষয়টি بَلٰى مَنْ أَسْلَمَ বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি وَهُوَ مُحْسِنٌ বাক্যাংশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এতে জানা গেল যে, পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য আনুগত্যের সংকল্পই যথেষ্ট নয়; বরং সৎকর্মও প্রয়োজন। বস্তুতঃ কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও পন্থাই সৎকর্ম।

مَا مَعْنَى النَّسْخِ বা 'নসখ' অর্থ কি? اَلنَّسْخُ শব্দটি বাব فَتَحَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ–

- বিদূরিত করা, রহিত করা। যেমন– نَسَخَتِ الرِّيْحُ اٰثَارَ الدِّيَارِ অর্থাৎ ঝড় বাড়ি-ঘরের চিহ্ন বিদূরিত করেছে।
- বাতিল করে দেওয়া। যেমন– বলা হয় نَسَخَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ অর্থাৎ বিচারক তাঁর সিদ্ধান্ত বাতিল করলেন।
- মিটিয়ে দেওয়া। যেমন– نَسَخَ الشَّيْبُ الشَّبَابَ অর্থাৎ যৌবন বার্ধক্যকে মিটিয়ে দিয়েছে।
- ইংরেজিতে نَسْخٌ মানে To cancel. To abrogate ইত্যাদি।

اَلنَّسْخُ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : اَلنَّسْخُ هُوَ اِنْتِهَاءُ التَّعَبُّدِ بِقِرَاءَةِ الْاٰيَةِ اَوِ الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْهَا اَوْ بِهِمَا অর্থাৎ কোনো আয়াতের পঠন, অথবা এর বিধান, অথবা উভয়ের ইবাদত স্বরূপ আমলের পরিসমাপ্তি ঘটাকে نَسْخٌ حَقِيْقًا বলে অর্থাৎ, কোনো আয়াতের বিধান বহাল থেকে পঠন পরিসমাপ্ত হওয়া, অথবা পঠন বহাল থেকে বিধান পরিসমাপ্ত হওয়া অথবা পঠন ও বিধান উভয় পরিসমাপ্ত হওয়াকে نَسْخٌ বলা হয়

কোনো আয়াতের পঠন বা বিধান যে আয়াতের মাধ্যমে নসখ করা হয় তাকে نَاسِخ বলে এবং যে ঘোষিত আয়াতকে নসখ করা হয় তাকে مَنْسُوخ বলে। চাই এ مَنْسُوخ টা مَنْسُوخُ التِّلَاوَةِ হোক কিংবা مَنْسُوخُ الْحُكْمِ হোক।

যেমন- لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ এ আয়াতটির বিধান- আল্লাহর বাণী قوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ দ্বারা مَنْسُوخ হয়ে গেছে। সুতরাং প্রথম আয়াতটি مَنْسُوخ এবং দ্বিতীয়টি نَاسِخ হয়েছে।

أَقْسَامُ النَّسْخِ **(নসখের প্রকারভেদ)** : নাসেখ ও মানসূখের বিচারে শরিয়তে প্রচলিত نَسْخ প্রধানত ৪ প্রকার যথা- (১) نَسْخُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ অর্থাৎ কুরআন দ্বারা কুরআনের অন্য আয়াতের বিধান বা পঠন রহিত করা। যেমন- উপরের দৃষ্টান্তটি। (২) نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ অর্থাৎ কুরআন দ্বারা হাদীসের হুকুম রহিত করা। যেমন- নবীজী প্রথমে খেজুর গাছের তা'বীর করতে নিষেধ করেন, কিন্তু পরে এ হুকুম রহিত করে তা'বীরের অনুমতি প্রদান করেন। (৩) نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ অর্থাৎ হাদীস দ্বারা হাদীসের হুকুম রহিত করা। যেমন- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ كَانَ اٰخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ অর্থাৎ, হুজুর ﷺ-এর শেষ আমল ছিল আগুনে স্পর্শ করা জিনিস আহার করার পর অজু না করা। হুজুর ﷺ প্রথমে অজুর হুকুম দিয়েছিলেন পরে তা রহিত করে দিয়েছেন। (৪) نَسْخُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ অর্থাৎ হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের বিধানকে রহিত করা। অনেকেই বলেছেন যে, নিকটাত্মীয় তথা পিতা-মাতার জন্য অসিয়তের আয়াতটি নবীজীর বাণী- لَا وَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ দ্বারা مَنْسُوخ হয়ে গেছে। তবে ইমাম শাফেয়ীসহ আরো অনেকের মতে ৪র্থ প্রকার نَسْخ জায়েজ নেই। এতে কিতাবুল্লাহর উপর সুন্নাতে নববীর প্রাধান্য এসে যায়, যা বৈধ নয়।

كَيْفِيَّةُ النَّسْخِ **(রহিত করার পদ্ধতি)** : তাফসীরের কিতাব থেকে জানা যায়, তিন পদ্ধতিতে نَسْخ তথা রহিতকরণ হতে পারে। যথা- (১) আয়াত ও হুকুম উভয়ই রহিত হওয়া। যেমন- رَضَاعَتْ-এর আয়াত সংশ্লিষ্ট হযরত আয়েশার পঠিত عَشْرُ رَضَعَاتٍ অংশটি। (২) হুকুম রহিত, তবে তেলাওয়াত বাকি থাকা। যেমন- فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ এ আয়াতটির তেলাওয়াত বাকি আছে; কিন্তু হুকুম রহিত।

(৩) তেলাওয়াত রহিত, কিন্তু হুকুম বহাল থাকা। যেমন- বৃদ্ধা ও বৃদ্ধের জেনার শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا এ আয়াতটির তেলাওয়াত রহিত; কিন্তু হুকুম বহাল।

নসখের হিকমত : মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। কাজেই বান্দার জন্য কোথায়, কখন, কোন ব্যক্তির জন্য কি প্রয়োজন, তা তিনিই ভালো জানেন। যেমন- শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য ডাক্তারগণ দুধ খেতে বলেন, কিন্তু সে একই লোক যদি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় তখন একই ডাক্তার তাকে দুধ খেতে বারণ করেন। ঠিক এমনিভাবে একই জাতির জন্য এবং তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটি বিধান সর্বাবস্থায় সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এ জন্যই তিনি হুকুমের রদবদল করে থাকেন। এটাই نَسْخ-এর মূল রহস্য। যেমন- আল্লাহ "মদ" একবারে হারাম করতে পারতেন। কিন্তু বান্দার জন্য তা মান্য করা হতো ভীষণ কঠিন। তাই তিনি মদের হুকুম সময়ান্তরে অবস্থাভেদে পুনঃ পুনঃ রদ-বদল করে ৪র্থ বারে সম্পূর্ণ হারাম করেছেন। এটা তাঁর অজ্ঞাত নয়; বরং এটা তাঁর চরম বিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

হাসাদ শব্দের অর্থ : اَلْحَسَدُ শব্দের বাংলা হলো, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ইত্যাদি। ইংরেজিতে اَلْحَسَدُ -কে বলা হয় To envy. To hate. কাজেই اَلْحَسَدُ-এর সংজ্ঞায় বলা যায়- اَلْحَسَدُ رَجَاءُ الْمَرْءِ هَلَاكَ الْغَيْرِ وَضَرَرَهُ مَا لَا أَوْ حَالًا سَوَاءٌ كَانَ قَصَدَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا.

অর্থাৎ, اَلْحَسَدُ হলো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের সম্পদ অথবা তার অবস্থা ধ্বংস হওয়া কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কামনা করা। এতে সে কিছু আশা করুক আর নাই করুক। এ প্রকারের حَسَد সম্পূর্ণ হারাম।

أَقْسَامُ الْحَسَدِ : হালাল হারামের বিচারে حَسَد-কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(ক) حَسَدٌ مَذْمُومٌ **(শরিয়ত নিন্দিত হিংসা)** : এটা হলো অন্যের উন্নতি ও কল্যাণ দেখে গা জ্বালা করলে তার ধ্বংস কামনা করা। এতে হিংসুক নিজে কিছু পাক আর না-ই পাক, এ প্রকারের হিংসা مَذْمُوم এবং হারাম। যেমন-

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا (১)

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ الخ (২)

(খ) حَسَدٌ مَحْمُوْدٌ (প্রশংসনীয় ঈর্ষা) : আরবিতে এই প্রকারের حَسَدٌ অর্থে গ্রহণ করা হয় না, বরং এটা দ্বারা غِبْطَةٌ উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন হাদীসে নববীতে এসেছে-

لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَا لًا فَهُوَ يُنْفِقُهٗ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

অর্থাৎ দু'টি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে ঈর্ষা করা যাবে না। বিষয় দু'টি হলো-

১. কোনো ব্যক্তি, আল্লাহ তাকে কুরআন প্রদান করেছেন, আর সে সকাল-সন্ধ্যা কুরআন অনুযায়ী চলে।
২. কোনো ব্যক্তি, আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তাই সে সকাল-সন্ধ্যা এই মাল (আল্লাহর রাহে) খরচ করে। মোট কথা হলো অন্যের অনিষ্ট কামনা করা যাবে না। -[কুরতুবী]

হিংসার কারণসমূহ : দার্শনিক ইমাম গাযালী (র.) হিংসার কতগুলো কার্যকর কারণ বর্ণনা করেছেন। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।
শত্রুতা : কোনো কারণে কারোর শত্রুতা জন্মালে ঐ শত্রুতা থেকে জন্ম নেয় حَسَدٌ বা হিংসা।

- كُوْنُوْا مُكْرَمًا فِيْ عُيُوْنِ الْعَامَّةِ কোনো ব্যক্তি সর্ব সাধারণের চোখে সম্মানিত হওয়া তাঁর সমসাময়িকরা চায় না সে তাদের ওপরে উঠে যাক, ফলে হিংসার শুরু হয়।
- خَادِمًا لِلْاُمَّةِ জাতীয় সেবক হওয়া। কারণ সেবার ফলে সবাই তাকে ভালোবাসবে। কিন্তু উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ আদৌ চায় না যে, লোকেরা তাকে ভালোবাসুক। তাই হিংসার সৃষ্টি হবে।
- مَانِعًا فِيْ حُصُوْلِ الْمَقْصَدِ উদ্দেশ্য হাসিলে বাধা হয়ে দাঁড়ানো। কেউ যদি কোনো কিছু পেতে চায় এবং সেখানে অন্য কেউ হাত দেয়, তবেই জন্ম নেয় হিংসা।
- حِرْصُ السِّيَادَةِ নেতৃত্বের লোভ। এটা হিংসার একটি অন্যতম উৎস। তাছাড়াও ছোট-খাটো অনেক কারণ রয়েছে যেগুলো থেকে হিংসা নামক নাশকতামূলক চরিত্র জন্ম নেয়। এই চরিত্র যে ব্যক্তি কিংবা সমাজে ঢুকে, ওটাকে খান খান করে নিঃশেষ করে দেয়। আমরা এই নাশক পোকার আক্রমণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

تِلْكَ দ্বারা উদ্দেশ্য : تِلْكَ দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত পরিলক্ষিত। যথা-

ক. ইতঃপূর্বে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মনের অবাস্তব বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা উল্লিখিত হয়েছে। সব কটির দিকে تِلْكَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঐ গুলোর মধ্য হতে একটি হলো তারা ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর একটি হলো ৪০ দিনের বেশি তারা দোজখে থাকবে না।
খ. কারো মতে تِلْكَ দ্বারা শুধু তাদের একটি বাসনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা উক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আর তা হলো তারা ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

اَمَانِيُّ এর অর্থ : اَمَانِيُّ শব্দটি اُمْنِيَّةٌ এর বহুবচন। اُمْنِيَّةٌ-এর অর্থ- তেলাওয়াত। অর্থাৎ এটা তাদের মুখে উচ্চারণ করা পাঠমাত্র। اَمَانِيُّ-এর অন্য অর্থ اَكَاذِيْبُ তথা মিথ্যা বক্তব্য। যেমন হযরত উসমান (রা.) বলেন- مَا تَمَنَّيْتُ مُنْذُ اَسْلَمْتُ অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর আমি মিথ্যা বলিনি। হযরত কাতাদা বলেন, তার জন্য যা নয় তা কামনা করাটাই اُمْنِيَّةٌ -[কুরতুবী]

هُوْدًا-এর উদ্দেশ্য : هُوْدًا বলতে ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অতিরিক্ত হরফ বাদ দেওয়া হয়েছে। অথবা, هُوْدًا শব্দটি هَائِدٌ-এর বহুবচন।

قوله هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : এর অর্থ "তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো" এ কথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চান যে, কেউ কোনো কিছুর দাবি পেশ করুক বা কোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করুক উভয়াবস্থাতেই দলিল উপস্থাপন করতে হবে। দলিল ব্যতীত কোনো কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এ কথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অন্ধ অনুসরণকে চরমভাবে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন। -[কাবীর]

قوله بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ -এর ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন হুশিয়ারী সত্ত্বেও অনেক মুসলমান ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত আকীদার শিকার হয়ে পড়ছে। তারা আল্লাহ তা'আলা, রাসূল, ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বংশগত মুসলমান হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতে শুরু করছে। কুরআন ও হাদীসের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে যে সব অঙ্গীকার করা হয়েছে তারা নিজেদেরকে সেগুলোর যোগ্য হকদার মনে করে– সেগুলো পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করছে। অতঃপর সেগুলো পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখতে না পেয়ে কুরআন ও হাদীসের অঙ্গীকার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তারা লক্ষ্য করে না যে, পবিত্র কুরআন নিছক বংশগত মুসলমানদের সাথে কোনো অঙ্গীকার করেনি– যতক্ষণ না তারা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর ইচ্ছার অধীন করে দেয়। এই হলো بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যা বা সারমর্ম।

শব্দ বিশ্লেষণ

نُنْسِهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْسَاءُ মূলবর্ণ (ن . س . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ভুলিয়ে দেওয়া, বিস্মৃতি ঘটানো।

نَأْتِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ء . ت . ى) জিনস মোরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– আমরা আসি, আমরা আনয়ন করি।

يَتَبَدَّلِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّبَدُّلُ মূলবর্ণ (ب . د . ل) জিনস صحيح অর্থ– সে পরিবর্তন করে।

اُعْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَفْوُ মূলবর্ণ (ع . ف . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা মাফ কর।

اِصْفَحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلصَّفْحُ মূলবর্ণ (ص . ف . ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ক্ষমা কর।

تُقَدِّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّقْدِيْمُ মূলবর্ণ (ق . د . م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সামনে অগ্রসর হবে। তোমরা সামনে পাঠাবে।

تَجِدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِجْدَانُ মূলবর্ণ– (و . ج . د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা পাবে।

هَاتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মোরাক্কাব; مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তোমরা নিয়ে আস।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ : এখানে وَدَّ ফে'ল, كَثِيْرٌ হলো فاعل আর مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ অংশটি জার মাজরূর হয়ে এর সাথে متعلق অতঃপর فعل فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل আর اَللّٰهَ শব্দটি হলো اسم ان আর ب হলো حرف جار ও مَا মাওসুল ও সেলা একত্রিত হয়ে مجرور হলো, অতঃপর جار ও مَجْرُور মিলে تَعْمَلُوْنَ -এর সাথে متعلق হলো بَصِيْرٌ -এর সাথে। আর بَصِيْرٌ স্বীয় فاعل ও متعلق মিলে خبر ان অতঃপর اسم ان ও مقدم خبر ان মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۠ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

অনুবাদ : (১১৩) আর ইহুদিরা বলে, নাসারাগণ কোনো ভিত্তির উপরই নয়, আর নাসারাগণ বলে, ইহুদিরা কোনো ভিত্তির উপর নয়, অথচ তারা সকলে কিতাব পাঠ করে, এরূপ যারা মূর্খ ও নিরক্ষর তাদের ন্যায় উক্তি করে, আল্লাহ ফয়সালা করে দিবেন তাদের মধ্যে কিয়ামত দিবসে। ঐ সমস্ত বিষয়ের যা নিয়ে তারা পরস্পর মতবিরোধ করছে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

(১১৪) আর কে অধিক জালিম হবে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম জিকির করতে বাধা সৃষ্টি করে এবং ঐগুলো বিরাণ হওয়ার চেষ্টা করে? এদের তো কখনো নির্ভীকভাবে ঐগুলোতে পা রাখাই উচিত ছিল না; এদের জন্য দুনিয়াতেও লাঞ্ছনা হবে আর আখেরাতেও এদের ভীষণ শাস্তি হবে।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

(১১৫) আর আল্লাহর আধিপত্যে পূর্ব এবং পশ্চিমও অতঃপর তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান; কেননা আল্লাহ তা'আলা [সর্বদিক] পরিবেষ্টনকারী- পূর্ণ জ্ঞানবান।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾

(১১৬) আর তারা বলে আল্লাহর সন্তান আছে, সুবহানাল্লাহ! বরং একমাত্র তাঁরই আধিপত্যে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে আছে, সমস্তই তাঁর আজ্ঞাধীন।

শাব্দিক অনুবাদ

১১৩. وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ আর ইহুদিরা বলে لَيْسَتِ النَّصٰرٰى নাসারাগণ নয় عَلٰى شَيْءٍ কোনো ভিত্তির উপর وَقَالَتِ النَّصٰرٰى আর নাসারাগণ বলে لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ ইহুদিরা নয় عَلٰى شَيْءٍ কোনো ভিত্তির উপর وَهُمْ অথচ তারা يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ সকলে কিতাব পাঠ করে كَذٰلِكَ এরূপ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ যারা মূর্খ ও নিরক্ষর তারা উক্তি করে مِثْلَ قَوْلِهِمْ তাদের ন্যায় فَاللّٰهُ يَحْكُمُ আল্লাহ ফয়সালা করে দিবেন بَيْنَهُمْ তাদের মধ্যে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে। فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ঐ সমস্ত বিষয়ের যা নিয়ে তারা পরস্পর মতবিরোধ করছে।

১১৪. وَمَنْ اَظْلَمُ আর কে অধিক জালিম হবে مِمَّنْ مَّنَعَ ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে বাধা সৃষ্টি করে مَسٰجِدَ اللّٰهِ আল্লাহর মসজিদসমূহে اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ তাঁর নাম জিকির করতে وَسَعٰى এবং চেষ্টা করে فِيْ خَرَابِهَا ঐগুলো বিরাণ হওয়ার اُولٰٓئِكَ এদের তো مَا كَانَ لَهُمْ উচিত ছিল না اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ কখনো নির্ভীকভাবে ঐগুলোতে পা রাখা لَهُمْ فِي الدُّنْيَا এদের জন্য দুনিয়াতেও হবে خِزْيٌ লাঞ্ছনা وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ আর আখেরাতেও এদের হবে عَذَابٌ عَظِيْمٌ ভীষণ শাস্তি।

১১৫. وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ আর আল্লাহর আধিপত্যেই পূর্ব এবং পশ্চিমও فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا অতঃপর তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান اِنَّ اللّٰهَ কেননা আল্লাহ তা'আলা وَاسِعٌ [সর্বদিক] পরিবেষ্টনকারী عَلِيْمٌ পূর্ণ জ্ঞানবান।

১১৬. وَقَالُوْا আর তারা বলে اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا আল্লাহর সন্তান আছে, سُبْحٰنَهٗ সুবহানাল্লাহ! بَلْ لَّهٗ বরং একমাত্র তাঁরই আধিপত্যে রয়েছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে আছে, كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ সমস্তই তাঁর আজ্ঞাধীন।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (١١٧)

(১১৭) তিনি আবিষ্কর্তা আসমানসমূহ এবং জমিনের, আর যখন কোনো কাজ সমাধা করতে চান, শুধু তাকে বলেন, 'হয়ে যাও' তখনই তা হয়ে যায়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (١١٨)

(১১৮) আর মূর্খরা বলে- কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না আল্লাহ; অথবা আমাদের নিকট কোনো অন্য প্রমাণ আসে না; এরূপ তাদের পূর্ববর্তীগণও তাদের ন্যায় উক্তি করে আসতেছিল; তাদের সকলের অন্তরই পরস্পর সদৃশ; আমি তো বহু স্পষ্ট দলিল বর্ণনা করেছি দৃঢ় বিশ্বাসকামীদের জন্য।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ (١١٩)

(১১৯) আমি আপনাকে একটি সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছি যেন সুসংবাদ শুনাতে থাকেন এবং ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন, অনন্তর আপনার নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে না দোজখীদের সম্বন্ধে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৭) بَدِيْعُ তিনি আবিষ্কর্তা السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ এবং জমিনের وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا আর যখন কোনো কাজ সমাধা করতে চান فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ তখন শুধু তাকে বলেন, كُنْ 'হয়ে যাও' فَيَكُوْنُ তখনই তা হয়ে যায়।

(১১৮) وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ আর মূর্খরা বলে- لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ আল্লাহ; কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ অথবা আমাদের নিকট অন্য কোনো প্রমাণ আসে না كَذٰلِكَ قَالَ এরূপ উক্তি করে আসতেছিল الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্তীগণও مِّثْلَ قَوْلِهِمْ তাদের ন্যায় تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ তাদের সকলের অন্তরই পরস্পর সদৃশ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ আমি তো বহু স্পষ্ট দলিল বর্ণনা করেছি لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ দৃঢ় বিশ্বাসকামীদের জন্য।

(১১৯) اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ আমি আপনাকে পাঠিয়েছি بِالْحَقِّ একটি সত্য ধর্ম দিয়ে بَشِيْرًا যেন সুসংবাদ শুনাতে থাকেন وَّنَذِيْرًا এবং ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন وَّلَا تُسْـَٔلُ অনন্তর আপনার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হবে না عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ দোজখীদের সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১১৩) قوله وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** ইহুদি সম্প্রদায় তাওরাত এবং খ্রিস্টানরা ইঞ্জীল পাঠ ও আলোচনা করে উভয় কিতাবের মধ্যেই উভয় কিতাবের এবং উভয় রাসূলের সত্যতামূলক বর্ণনা রয়েছে। অথচ ইহুদি সম্প্রদায় বলে, নাসারাদের ধর্ম কোনো ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়, অনুরূপভাবে নাসারাও বলে ইহুদিদের ধর্ম কোনো ভিত্তির ওপর স্থাপিত নয়। কিতাবীদের পরস্পরের এরূপ উক্তি শ্রবণ করে আরবদের কাফেররাও নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশ করতে বলত, ইহুদি ও নাসারাদের উভয় ধর্মই ভিত্তিহীন, বরং আমরা সত্যের উপর রয়েছি। তাদের এহেন উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল - ২ : অপর বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত নাজরানের খ্রিস্টান ও ইহুদি নেতাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাজরানের নাসারা গোষ্ঠী যখন রাসূল ﷺ -এর নিকট আসল, তখন তাঁর কাছে ইহুদি দলপতিরাও আসল। ফলে তারা পরস্পরে রাসূল (সা.)-এর সামনেই তর্কে লেগে গেল। সুতরাং রাফে' বিন হারমালা বলল, তোমরা তো কোনো ধর্মেই নেই। এমনকি হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত এবং তাওরাতকেও অস্বীকার করল। অথচ ইহুদিদের কিতাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর সমর্থন এবং নাসারাদের কিতাবে হযরত মূসা (আ.)-এর সমর্থন যে রয়েছে, সে সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[ফাতহুল কাদীর : ১৩০/১, ইবনে কাছীর : ১৫৫/১]

(১১৪) قوله وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে দু'ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

১. ইহুদিরা যখন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করল তখন খ্রিস্টানরা তার বদলা নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগল। এক পর্যায়ে তারা ইরাকের অগ্নিপূজক বাদশাহর নেতৃত্বে সিরিয়ার বাদশাহ তাইতাশের নেতৃত্বাধীনদের উপরে আক্রমণ করল। তারা বহু ইহুদিদেরকে হত্যা করল এমন কি মসজিদে আকসার উপরও আক্রমণ করল। মসজিদে আকসার ভিতরে শুকর ও আবর্জনা ফেলে মসজিদকে নাপাক করে দিল। তাদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাজিল হয়।

২. কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতটির সম্পর্ক হুদায়বিয়ার সাথে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ যখন ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামের কাফেলা নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হন তখন কাফেররা হুদায়বিয়া নমক স্থানে রাসূল ﷺ -কে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেন। যার বিস্তারিত ঘটনা হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত আছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাজিল হয়।

(১১৫) قوله وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল–১ :** এ আয়াতটি সম্পর্কে মুফাসসিরগণ লিখেন, যখন রাসূল ﷺ মক্কাতে ছিলেন, তখন বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে ফিরে নামাজ পড়তেন. ইহুদিরা মনে প্রাণে চাইতো রাসূল ﷺ যেন মসজিদে আকসার দিকে ফিরে নামাজ পড়েন। কেননা আকসা ইহুদিদের কেবলা। কিছুদিন পর রাসূল ﷺ হিজরত করে মদিনায় ফিরে যান তখন আল্লাহর নির্দেশে ষোল কিংবা সতের মাস মসজিদে আকসার দিকে ফিরে নামাজ পড়েন। তাতে ইহুদিরা খুব আনন্দিত হলো আর পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মদ যখন আমাদের কেবলা অনুসরণ করেছেন। নিশ্চয় কিছুদিন পর আমাদের ধর্মও অনুসরণ করবেন। কিন্তু রাসূল ﷺ মনে প্রাণে চাইতেন যাতে রাসূল ﷺ -এর কেবলা বায়তুল্লাহর দিকে করে দেওয়া হয়। পরে ষোল সতের মাস পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিলেন। যখন কেবলা পরিবর্তন হয়ে গেল তখন ইহুদিরা তিরস্কার করে বলতে লাগল মুহাম্মদ ﷺ -এর কেবলারই ঠিক নেই। তাদের এই তিরস্কারের জওয়াবে এই আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল– ২ : আসেম বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন রাবি'আ বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা অবন্ধকার রজনীতে আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে ছিলাম। ফলে আমরা কোনো এক স্থানে অবস্থান করলাম। তখন এক ব্যক্তি পাথর রেখে একটি মসজিদের আকৃতি বানায় এতে নামাজ আদায় করা হয়। অতঃপর যখন ভোর হলো তখন কেবলা ছাড়া অন্য দিকে নামাজ আদায় করেছি বলে বুঝতে পেলাম। সুতরাং আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো কেবলা ছাড়া অন্য দিকে নামাজ আদায় করেছি। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ১৩২/১, ইবনে কাছীর : ১৫৮/১]

(১১৮) قوله وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইহুদি খ্রিস্টান বা মুশরিকরা নবী করীম ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণকারী সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রত্যক্ষ করার পরও তাঁর প্রতি ঈমান আনায় অনীহা প্রদর্শন করে এবং তাদের স্বভাবগত হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে তারা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সরাসবি আমাদেরকে বলে দিতেন যে, আপনি তার রাসূল। তবে আমাদের আপনাকে মান্য করতে আপত্তি থাকতো না। কিংবা তিনি যদি আমাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ নিদর্শন প্রেরণ করতেন, তবে আমরা আপনাকে মান্য করতাম। আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন মূর্খতাপূর্ণ আবদারের উত্তরে উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

(১১৯) قوله اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কাফের মুশরিকদের ঈমান আনয়নে অনীহা ও দীনে হকের বিরোধিতার কারণে রাসূল (সা.) বিশেষভাবে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, হে রাসূল! আমি আপনাকে সত্য দীনসহ হেদায়েতের পথযাত্রীদের প্রতি বেহেশতের সুসংবাদদাতা ও হেদায়েত বিমূখ কাফেরদের প্রতি দোজখের ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি। এ হেদায়েত পৌঁছে দেওয়াই আপনার দায়িত্ব। কে হেদায়েত গ্রহণ করছে বা করছে না তার হিসেব রাখা আপনার দায়িত্ব নয়। আর দোজখবাসীদের ব্যাপারে আপনি জিজ্ঞাসিতও হবেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একবার রাসূল ﷺ নিজ পরলোকগত পিতা-মাতা সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকেন যে, তারা কোথায় অবস্থান করছেন, বেহেশতে না দোজখে? এ বিষয়ে তিনি বেশ দুশ্চিন্তার শিকার হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে তাকে এরূপ চিন্তা করতে বারণ করে দেন।

قوله وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتٰبَ **-এর ব্যাখ্যা :** ইহুদি নাসারারা পরস্পর বিপরীত বক্তব্য পেশ করছে। অথচ তাদের অবস্থা হলো এই যে, তাদের নিকট ইলম রয়েছে এবং তারা কিতাব পাঠ করছে। তাওরাত এবং ইনজীলের অনুসারীদের জন্য দায়িত্ব হলো তারা নিজেদের কিতাবদ্বয়ের প্রত্যেকটি পরস্পরের স্বীকৃতি দানকারী এবং উভয়টিতে মৌলিক বক্তব্য একই ধরনের। তাওরাত হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত এবং ইনজীল হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যায়ন করে। তাই উভয়টির সত্যতা প্রদান করাই সকল ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কর্তব্য ছিল।

قوله قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ **-এর উদ্দেশ্য :** আলোচ্য আয়াতাংশটি দ্বারা ঐ সকল আহলে কিতাব উদ্দেশ্য যারা আলেম পর্যায়ের ছিল না। তারা উত্তরাধিকারসূত্রে ইহুদি এবং খ্রিস্টান তথা আহলে কিতাব বলে দাবি করত। মূলত কিতাবের কোনো জ্ঞান তাদের ছিল না। মা বাবা আহলে কিতাব বলেই তারা আহলে কিতাব। বর্তমানে যারা নিজেদেরকে ইহুদি নাসারা তথা আহলে কিতাব বলে পরিচয় দেয় তারা সবাই এই শ্রেণিভুক্ত।

قوله فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ **-এর অর্থ :** আল্লাহ তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। এ বাক্যটির চারটি অর্থ হতে পারে, যথা–

১. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন– আল্লাহ সবাইকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে জাহান্নামে পাঠাবেন।

২. আল্লাহ মিথ্যাবাদী জালিম থেকে মাজলুমের ন্যায্য হক ও অধিকার দিয়ে দেবেন।

৩. তিনি এটা দেখিয়ে দেবেন যে, কে সরাসরি বেহেশতে প্রবেশ করছে, আর কে দোজখে প্রবেশ করছে।

৪. তিনি হক ও বাতিলের দাবিদারদের মধ্যে মতানৈক্যের বিষয়াদি ফয়সালা করবেন। –[কবীর, রুহুল মা'আনী]

قوله مِثْلَ قَوْلِهِمْ **-এর উদ্দেশ্য :** আল্লাহর বাণী– مِثْلَ قَوْلِهِمْ-এর هُمْ দ্বারা ঐ সকল আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা ছিল তাওরাত ও ইনজীলের আলেম। অথচ তাদের একদল বলতো ইহুদিরা সঠিক দীনের উপর নেই। আর ইহুদিরা বলত, খ্রিস্টানরা সঠিক দীনের উপর নেই। قَوْلِهِمْ দ্বারা আসলে আহলে কিতাবীদের এই বক্তব্যই উদ্দেশ্য।

قوله مِمَّنْ مَّنَعَ الخ **-এর মর্মার্থ :** আল্লাহর বাণী– وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ -এর মধ্যে مِمَّنْ-এর مَنْ দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। যথা–

ক. নবীজীর আগমনের পূর্বে অত্যাচারী বাদশাহ বুখতে নসর বায়তুল মাকদাস ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইহুদিদেরকে সেখানে ইবাদত করতে দেয়নি। এখানে مَنْ দ্বারা তাকেই বুঝানো হয়েছে।

খ. অথবা, সিরিয়ার অগ্নিপূজক বাদশাহ তাইতাসকে বুঝানো হয়েছে। সে ইহুদিদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে অবিচারে হত্যা করে এবং বায়তুল মাকদাসে ময়লা নিক্ষেপ পূর্বক সেখানে শূকর ছেড়ে দেয়। –[মা'আরিফুল কুরআন]

গ. অথবা, মক্কার কাফেররা উদ্দেশ্য। কারণ মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে নবীজী তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে কা'বা ঘরে ওমরা পালনে এলে তারা মুসলমানদের কা'বা এলাকায় ঢুকতে বাধা দেয় এবং সেখানে ওমরা ও যাবতীয় কার্যকলাপ করতে বারণ করে দেয়।

ঘ. বর্তমান কালের ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে مَنْ দ্বারা এমন প্রত্যেক ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে মসজিদে ইবাদত করতে বাধা দেয়। তা অতীতে, বর্তমানে, কিংবা ভবিষ্যতে যখনই হোকনা কেন। আয়াতটি যদিও একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে তথাপি এর হুকুম সর্বকালীন।

قوله مَسٰجِدَ اللّٰهِ **-এর উদ্দেশ্য :** এখানে مَسَاجِدَ (মাসজিদ) দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

ক. বায়তুল মাকদিস। নবীজীর আগমনের পূর্বে তা ধ্বংস করা হয়েছিল।

খ. কারো মতে মসজিদে নববী ও মসজিদে হারাম উদ্দেশ্য।

গ. কারো মতে মসজিদে আবূ বকর (রা.) উদ্দেশ্য, যা হিজরতের পূর্বে মক্কাতে ছিল। মুশরিকরা তা ভেঙ্গে ফেলে।

ঘ. বর্তমানের আলেমগণের মতে مَسَاجِدَ দ্বারা পৃথিবীর সকল মসজিদ উদ্দেশ্য। যদিও আয়াতটি বিশেষ প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে

حُكْمُ دُخُوْلِ الْكُفَّارِ فِى الْمَسْجِدِ **: কাফেররা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে কিনা?** এ ব্যাপারে ইমামগণ মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। যেমন– (ক) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কাফেরদের মসজিদে প্রবেশ করা না জায়েজ নয়। (খ) ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, জায়েজ নেই। (গ) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, হেরেম শরীফ ও মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যসব মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। (ঘ) এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হলো–

١. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ. الخ

٢. اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوْهَا الخ

٣. مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ.

তবে কথা হলো, কাফেরদের মসজিদে প্রবেশ সমীচীন নয়। হ্যাঁ, একান্ত যদি প্রবেশ না করলেই নয় তাহলে প্রবেশ করতে পারবে। هٰذَا مِنْ عِنْدِكَ وَعِنْدَ اللّٰهِ الصَّوَابُ

মহল্লে ই'রাবের বর্ণনা : اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ এ বাক্যটি مَنَعَ ফে'ল -এর مَفْعُوْلٌ بِهٖ হিসেবে মহল্লান مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ এ বাক্যটির প্রথমে وَاوْ বর্ণটি حَالِيَّةْ পুরো বাক্যটি পূর্বোক্ত الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى হতে হাল হিসেবে মহল্লান مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং বিধানও প্রমাণিত হয়।

প্রথমত : শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল মাকদিস, মসজিদে হারাম ও মসজিদ নববীর অবমাননা যেমনি বড় জুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত মসজিদে হারামে এক রাকাত নামাজের ছওয়াব এক লক্ষ রাকাত নামাজের সমান এবং মসজিদে নববী ও বায়তুল মাকদিসে পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাজের সমান এই তিন মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে সেখানে পৌঁছা বিরাট ছওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোনো মসজিদে নামাজ পড়া উত্তম মনে করে দূর দূরান্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদে জিকির ও নামাজে বাধা দেওয়ার মতো যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামাজ ও তেলাওয়াত করতে পরিষ্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশে-পাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামাজ ও জিকিরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

এমনিভাবে নামাজের সময় যখন মুসল্লিরা নফল নামাজ, তাসবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকেন, তখন মসজিদে সরবে তেলাওয়াত ও জিকির করা এবং নামাজিদের নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও বাধা প্রদানেরই নামান্তর। এ কারণেই ফিকহবিদগণ একে না-জায়েজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে, মসজিদে যখন মুসল্লি না থাকে, তখন সরবে জিকির অথবা তেলাওয়াত করায় কোনো দোষ নেই।

এ থেকে আরো বুঝা যায় যে, যখন মুসল্লিরা নামাজ, তাসবীহ, ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে, তখন মসজিদে নিজের জন্যে অথবা কোনো ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাও নিষিদ্ধ।

তৃতীয়তঃ মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমনি এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে নামাজ পড়ার জন্য কেউ আসে না কিংবা নামাজির সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পায়।

মোটকথা, وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ আয়াতটিতে কেবলামুখী হওয়ার পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য [নাউযুবিল্লাহ] বায়তুল্লাহ অথবা বায়তুল মাকদিসের পূজা করা নয়, কিংবা এ দুটি স্থানের সাথে আল্লাহর পবিত্র সত্তাকে সীমিত করে নেওয়াও নয়। তাঁর সত্তা সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং সর্বত্রই তাঁর মনোযোগ সমান। এরপরও বিভিন্ন তাৎপর্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়ছে।

আয়াতের এই বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও অন্তরে বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত হুজুরে আকরাম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে হিজরতের প্রথম দিকে ষোল সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার আদেশ দেওয়া হয়। এভাবে কার্যতঃ বলে দেওয়া হয় যে, আমার মনোযোগ সর্বত্র রয়েছে। নফল নামাজসমূহের এক পর্যায়ে এই নির্দেশ অব্যাহত রাখা হয়েছে। সফরে কোনো ব্যক্তি উট, ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহনে সওয়ার হয়ে পথ চললে তাকে তদবস্থায় ইশারায় নফল নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তার জন্য যানবাহন যেদিকে চলে সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট।

কোনো কোনো মুফাসসির فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ আয়াতকে এই নফল নামাজেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ি, সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল নামাজেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে। তবে নামাজরত অবস্থায় রেলগাড়ি অথবা জাহাজের দিক পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অবকাশ না থাকলে তদবস্থায়ই নামাজ পূর্ণ করবে।

এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে নামাজির জানা না থাকলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেওয়ার লোক না থাকলে সেখানেও নামাজি অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে নামাজ আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রান্তও প্রমাণিত হয়, তবুও তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। পুনরায় পড়তে হবে না।

জ্ঞাতব্য : ১. বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত করা ; যেমন, বৃষ্টিবর্ষণ ও রিজিক পৌছানো ইত্যাদি কোনো না কোনো রহস্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন উপকরণ ও শক্তিকে কাজে লাগানোও তেমনি। এর কোনোটিই এজন্য নয় যে, মানুষ এগুলোকে ক্ষমতাশালী স্বীকার করে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে।

২. ইমাম বায়যাভী (র.) বলেন, পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে আদি কারণ হওয়ার দরুন আল্লাহকে পিতা বলা হতো। একেই মূর্খেরা জন্মদাতা অর্থে বুঝে নিয়েছে। ফলে এরূপ বিশ্বাস করা অথবা বলা কুফর সাব্যস্ত হয়েছে . অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ করার লক্ষ্যে বর্তমানেও এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের অনুমতি নেই ;

জ্ঞাতব্য : ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ছিল আসমানি কিতাবের অধিকারী। তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল ; তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, প্রচুর অকাট্য ও শক্তিশালী নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও সেগুলো অস্বীকার মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন।

حُكْمُ الصَّلَاةِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ নামাজের সময় কেবলার প্রতি মুখ করে দাঁড়ানো ফরজ। ইচ্ছা করে যদি কেউ কেবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে উম্মতে মুসলিমাহ একমত। তবে কেউ যদি ভুল বশতঃ কিংবা কোনো অসুবিধার কারণে অন্য দিকে ফিরে নামাজ পড়ে ফেলে তাহলে তার নামাজ হবে কি না এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়। যথা–(ক) ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা.) বলেন, এমতাবস্থায় তার নামাজ শুদ্ধ হবে ; পুনরায় পড়তে হবে না। (খ) ইমাম মালেকের মতে, সময় থাকলে নামাজ পুনরায় পড়ে নেওয়া মোস্তাহাব। (গ) ইমাম শাফেয়ীর মতে, নামাজ পুনরায় পড়তে হবে। কারণ, কিবলামুখী হওয়া ফরজ . –[কুরতুবী]

قوله وَجْهُ اللهِ -এর উদ্দেশ্য : এখানে وَجْهُ اللّٰهِ -এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা–

(ক) হাকীকী : وَجْهٌ অর্থ মুখমণ্ডল ; তখন মুখমণ্ডল বলে আল্লাহর অস্তিত্ব উদ্দেশ্য হবে। এটাকে মানতেকের ভাষায় تَسْمِيَةُ الْجُزْءِ بِإِرَادَةِ الْكُلِّ বলে এখন প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তো নিরাকার, তাহলে তাঁর মুখমণ্ডল হবে কি করে? এর উত্তর হলো, আল্লাহ নিরাকার নয়। তাঁর আকার অবশ্যই আছে। তবে তা আমরা জানিনা যে, তাঁর আকার কিরূপ। এমনিভাবে তাঁর وَجْهٌ আছে ; এ ব্যাপারে সালফে সালেহীনদের বক্তব্যই যুক্তিযুক্ত ; তারা বলেন– اَلْوَجْهُ لَهُ مَعْلُوْمٌ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُوْلٌ وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَالْاِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ۔

(খ) মাজাযী : অর্থাৎ وَجْهُ اللّٰهِ অর্থ হবে رِضَى اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি . তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে তোমরা যে দিকেই ফিরে নামাজ পড়না কেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে।

قوله وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ ... كُلٌّ لَهُ قَانِتُوْنَ : বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা বলত, হযরত ওযায়ের (আ.) ছিলেন اِبْنُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর পুত্র। খ্রিস্টানরা বলত, ঈসা (আ.) ছিলেন اِبْنُ اللّٰهِ তথা 'আল্লাহর পুত্র'। অন্য দিকে একদল বর্বর মুশরিক মনে করত ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি জন্মগ্রহণও করেন নি। জন্ম দেওয়া নেওয়া থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। এ কথার স্বপক্ষে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় . –[রূহুল মা'আনী]

قوله بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে بَدِيْعٌ শব্দটি خَالِقٌ বা خَلِيْقٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। بَدِيْعٌ মূলতঃ بَدْعٌ ক্রিয়ামূল থেকে اِسْمُ فَاعِلٍ-এর সীগাহ। بَدْعٌ অর্থ সৃষ্টি করা ; এমন সৃষ্টিকে بَدْعٌ বলা হয় যার পূর্বে কোনো অস্তিত্বই ছিল না। মূলতঃ আসমান ও জমিনের কোনো আকার আয়তন কিছুই ছিল না ; আল্লাহ তা'আলা এসব সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহকে بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ বলা হয়েছে ; তেমনিভাবে দীনে ইসলামিতে যদি কেউ এমন কোনো ইবাদত প্রচলিত করে যার নমুনা ইতঃপূর্বে ছিল না তাকে مُبْتَدِعٌ এবং ইবাদতটিকে بِدْعَةٌ বলা হয়। –[কুরতুবী ও অন্যান্য

قوله وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا-এর ব্যাখ্যা : قَضَى শব্দের লুগাতী অর্থ মীমাংসা করল, মিটমাট করল। শব্দটি أَمَرَ 'আদেশ দিয়েছেন' অর্থে পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ কিন্তু এখানে শব্দটি ২টি অর্থে ব্যবহারের সম্ভাবনা রাখে। যথা–(ক) قَصَدَ অর্থ ইচ্ছা করলেন, সংকল্প করলেন। (খ) عَزَمَ অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

أَمْرٌ শব্দের নানান প্রেক্ষাপটে প্রায় ২০টির মতো অর্থ হয়ে থাকে। তবে আলোচ্য আয়াতে "ব্যাপার" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُمُوْرِ دِيْنِكُمْ এখানে أُمُوْرٌ শব্দটি أَمْرٌ-এর বহুবচন। অর্থ– তোমাদের দিনের বিষয়ে। সুতরাং, আয়াতাংশটির অর্থ দাঁড়ায় "যখন তিনি (আল্লাহ তা'আলা) কোনো ব্যাপারে কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি বিষয়টিকে লক্ষ্য করে বলেন, "হও" অতঃপর তা হয়ে যায়।

قوله وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ... لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ : হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর বর্ণনা মতে, একদা মক্কার কাফেররা নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে দু'টি দাবি পেশ করে। তারা বলে–

* হে মুহাম্মদ! তুমিতো সত্য নবী! তবে আল্লাহকে বল তিনি যেন তোমার নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন,
* তিনি যেন আমাদের উদ্দেশ্যে এমন একটি নিদর্শন প্রেরণ করেন যার মাধ্যমে আমরা তোমার নবুয়তের সত্যতা বুঝতে পারব। তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনতে পারি।
* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উল্লিখিত কথাগুলো মদীনার ইহুদি নেতা রাফে' ইবনে খোযাইমার।
* মুজাহিদ বলেন, উল্লিখিত বক্তব্য খ্রিস্টানদের। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীর]

قوله إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ : অনেক দলিল প্রমাণ পেশ করার পরও কাফের, মুশরিক, ইহুদি ও নাসারাগণ নবীজীর প্রতি ঈমান আনেনি। অধিকন্তু নবীজীকে নানান অবান্তর প্রশ্ন করে তাদের কুফরিকে আরো বৃদ্ধি করেছে। ফলে নবীজী আশঙ্কা করেন যে, কিয়ামত দিবসে হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এ ভেবে তিনি অনেক বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

قوله الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ-এর উদ্দেশ্য : আল্লাহর বাণী– وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ-এর মধ্যে لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যথা–

ক. ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর দ্বারা ইহুদিরা উদ্দেশ্য।
খ. মুজাহিদ (র.) বলেন, এর দ্বারা খ্রিস্টানরা উদ্দেশ্য।
গ. ইমাম সুদ্দী ও কাতাদাহ বলেন, এরা হলো মক্কার কাফের।
ঘ. তবে আয়াতের শানে নুযূল ও পূর্বাপর আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা ঐ সকল আহলে কিতাবদের বুঝানো হয়েছে যাদের কোনো কিতাবের জ্ঞান ছিল না। যারা মূর্খ ছিল, তবুও তারা বংশগতভাবে নিজেদেরকে আহলে কিতাব বলে পরিচয় দিত।

قوله تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের অন্তর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার সাথে ইহুদি নাসারাগণ যেমন হঠকারিতামূলক আচরণ করছে, তাদের পূর্বপুরুষরাও এমনি ছিল। তারাও তাদের নবীদের সাথে এরূপ আচরণই করেছে। তাদের অন্তরে রয়েছে কুটিলতা, যেমন ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের অন্তরে। এদিক থেকে তাদের অন্তর পূর্ববর্তীদের অন্তরের সাথে সাদৃশ্যময়। –[তাফসীরে কাবীর]

قوله بِالْحَقِّ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে اَلْحَقُّ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

ক. دِيْنُ الْإِسْلَامِ অর্থাৎ, ইসলাম ধর্ম। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে– أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِدِيْنِ الْحَقِّ
খ. اَلْقُرْاٰنُ তখন আয়াতের অর্থ হবে إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْقُرْاٰنِ الخ –(তাফসীরে মা'আরিফ)

শব্দ বিশ্লেষণ

يَتْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نصر মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ- (ت . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তারা তেলাওয়াত করে, পাঠ করে।

سَعٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাবে سَمِعَ মাসদার اَلسَّعْىُ মূলবর্ণ (س . ع . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে চেষ্টা করেছে।

يَدْخُلُوْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ (د . خ . ل) জিনস صحيح অর্থ- তারা প্রবেশ করে।

خَآئِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ . و . ف) জিনস اجوف واوى অর্থ- ভয়কারীগণ।

خِزْىٌ : বাব ضرب-এর মাসদার অর্থ- অবমাননা, লাঞ্ছনা।

مَغْرِبُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ ظرف زمان ومكان অর্থ- সূর্যাস্তের স্থান এবং সূর্যাস্তের সময়, সূর্যাস্তের দিক।

تُوَلُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তোমরা যে দিকেই মুখ কর।

عَلِيْمٌ : علم মাসদার হতে مبالغة-এর সীগাহ। শব্দটি একবচন, বহুবচন عُلَمَاءُ অর্থ- জ্ঞানী।

قٰنِتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقُنُوْتُ মূলবর্ণ- (ق . ن . ت) জিনস صحيح অর্থ- তারা সকলেই তাঁর আজ্ঞাধীন।

تَشَابَهَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّشَابُهُ মূলবর্ণ (ش . ب . ه) জিনস صحيح অর্থ- তাদের অন্তর একে অপরের সাদৃশ্য হয়ে গেছে।

قَدْ بَيَّنَّا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى قريب معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب . ي . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- আমরা বয়ান করে দিয়েছি।

يُوْقِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব افعالٌ মাসদার اَلْاِيْقَانُ মূলবর্ণ (ى . ق . ن) জিনস مثال يائى অর্থ- তারা বিশ্বাস করে।

بَشِيْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه অর্থ- সুসংবাদদাতা। [রাসূল (সা.)-এর একটি গুণবাচক নাম।]

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ : এখানে واو হলো حالية আর هُمْ হলো مبتدأ এবং يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ জুমলা হয়ে خبر অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : এখানে لَهُمْ ও فِى الْاٰخِرَةِ উভয়টি ثابت উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে خبر مقدم আর عذاب হলো مبتدأ مؤخر ও صفت মিলে موصوف এবং عَظِيْمٌ হলো তার صفت। موصوف অতঃপর خبر مقدم ও مبتدأ مؤخر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ : এখানে لِلّٰهِ জার মাজরুর মিলে خبر مقدم আর اَلْمَشْرِقُ হলো معطوف عليه এবং المغرب হলো معطوف : معطوف عليه ও معطوف মিলে مبتدأ مؤخر এবং অতঃপর مبتدأ مؤخر ও خبر مقدم মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে

قوله اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর لفظ اللّٰهَ হলো اِنَّ এর اسم এবং وَاسِعٌ عَلِيْمٌ হলো خبر ن অতঃপর ان স্বীয় اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (١٢٠)

অনুবাদ : (১২০) আর কখনো আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না ইহুদিরাও এবং নাসারারাও যাবৎ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসারী হবেন, আপনি বলুন! বস্তুত আল্লাহর নির্দেশিত রাস্তাই হেদায়েতের রাস্তা; আর যদি আপনি অনুসরণ করেন তাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে আপনার জন্য আল্লাহ হতে রক্ষাকারী কোনো বন্ধুও থাকবে না, কোনো সাহায্যকারীও না

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (١٢١)

(১২১) যাদেরকে আমি দান করেছি কিতাব আর তারা তা তেলাওয়াত করতেছে যথোচিতভাবে; এরূপ লোকই তার প্রতি ঈমান আনে, আর যারা তা অমান্য করবে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (١٢٢)

(১২২) হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই নিয়ামতগুলো স্মরণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, আর এটাও যে, আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তোমাদেরকে বহু লোকের উপর।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ (١٢٣)

(১২৩) আর তোমরা এমন দিনকে ভয় কর– যেদিন আদায় করতে পারবে না কেউ কারো পক্ষ হতে কোনো দাবি আর না কারো পক্ষ হতে কোনো বিনিময় গৃহীত হবে আর না কারো পক্ষে কোনো সুপারিশও ফলপ্রদ হবে, আর না তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে।

শাব্দিক অনুবাদ

১২০. وَلَنْ تَرْضٰى আর কখনো সন্তুষ্ট হবে না عَنْكَ আপনার উপর الْيَهُوْدُ ইহুদিরাও وَلَا النَّصٰرٰى এবং নাসারারাও حَتّٰى যাবৎ না تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ আপনি তাদের ধর্মের অনুসারী হবেন قُلْ আপনি বলুন! اِنَّ هُدَى اللّٰهِ বস্তুত আল্লাহর নির্দেশিত রাস্তাই هُوَ الْهُدٰى হেদায়েতের রাস্তা وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ আর যদি আপনি অনুসরণ করেন اَهْوَآءَهُمْ তাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর مَا لَكَ তবে আপনার জন্য থাকবে না مِنَ اللّٰهِ আল্লাহ হতে রক্ষাকারী مِنْ وَّلِيٍّ কোনো বন্ধুও, وَّلَا نَصِيْرٍ আর কোনো সাহায্যকারীও না।

১২১. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ যাদেরকে আমি দান করেছি الْكِتٰبَ কিতাব يَتْلُوْنَهٗ আর তারা তা তেলাওয়াত করতেছে حَقَّ تِلَاوَتِهٖ যথোচিতভাবে; اُولٰٓئِكَ এরূপ লোকই يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ তার প্রতি ঈমান আনে وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ আর যারা তা অমান্য করবে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১২২. يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ হে বনী ইসরাঈল! اذْكُرُوْا স্মরণ কর نِعْمَتِيَ আমার সেই নিয়ামতগুলো الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ আর এটাও যে, আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তোমাদেরকে عَلَى الْعٰلَمِيْنَ বহু লোকের উপর।

১২৩. وَاتَّقُوْا يَوْمًا আর তোমরা এমন দিনকে ভয় কর– لَّا تَجْزِيْ যেদিন আদায় করতে পারবে না نَفْسٌ কেউ عَنْ نَّفْسٍ কারো পক্ষ হতে شَيْـًٔا কোনো দাবি وَّلَا يُقْبَلُ আর না কারো পক্ষ হতে গৃহীত হবে عَدْلٌ কোনো বিনিময় وَّلَا تَنْفَعُهَا আর না কারো পক্ষে কোনো ফলপ্রদ হবে شَفَاعَةٌ সুপারিশও وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ আর না তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ (١٢٤)	(১২৪) আর যখন পরীক্ষা করলেন, ইবরাহীমকে তাঁর প্রভু কয়েকটি বিষয়ে, তিনি তা পূর্ণরূপে সমাধা করলেন। আল্লাহ বললেন, আমি আপনাকে মানুষের ইমাম বানাব, তিনি বললেন, আর আমার বংশধরগণ হতেও, আল্লাহ বললেন, আমার [এই] পদ অবাধ্য লোকেরা পাবে না।
وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ (١٢٥)	(১২৫) আর যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের ইবাদতের স্থান এবং নিরাপত্তার স্থান করলাম এবং [বললাম] মাকামে ইবরাহীমকে নামাজ পড়ার স্থান বানিয়ে নাও; আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম আমার ঘরটিকে খুব পবিত্র রেখ বহিরাগত ও স্থানীয় লোকদের জন্য এবং রুকূ' ও সেজদাকারীদের জন্য।
وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (١٢٦)	(১২৬) আর যখন ইবরাহীম বললেন, হে প্রভু! এটাকে একটি নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীর মধ্যে তাদেরকে ফলাদি দ্বারা অনুগৃহীত করুন যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে। আল্লাহ বললেন, আর যে কাফের তাকেও, বস্তুত এরূপ ব্যক্তিকে তো অল্পদিন খুব আরাম দান করব, অতঃপর তাকে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে দোজখের আজাবে পৌঁছিয়ে দিব, আর সেই পৌঁছার স্থান তো অত্যন্ত মন্দ।

শাব্দিক অনুবাদ

১২৪. وَاِذِ ابْتَلٰٓى আর যখন পরীক্ষা করলেন اِبْرٰهٖمَ ইবরাহীমকে رَبُّهٗ তাঁর প্রভু بِكَلِمٰتٍ কয়েকটি বিষয়ে فَاَتَمَّهُنَّ তিনি তা পূর্ণরূপে সমাধা করলেন قَالَ আল্লাহ বললেন اِنِّىْ جَاعِلُكَ আমি আপনাকে বানাব لِلنَّاسِ اِمَامًا মানুষের ইমাম, قَالَ তিনি বললেন وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ আর আমার বংশধরগণ হতেও قَالَ আল্লাহ বললেন لَا يَنَالُ পাবে না عَهْدِى আমার [এই] পদ الظّٰلِمِيْنَ অবাধ্য লোকেরা।

১২৫. وَاِذْ جَعَلْنَا আর যখন আমি করলাম الْبَيْتَ কাবা গৃহকে مَثَابَةً لِّلنَّاسِ মানুষের ইবাদতের স্থান وَاَمْنًا এবং নিরাপত্তার স্থান وَاتَّخِذُوْا এবং বানিয়ে নাও مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ মাকামে ইবরাহীমকে مُصَلًّى নামাজ পড়ার স্থান; وَعَهِدْنَآ আর আমি আদেশ করলাম اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে اَنْ طَهِّرَا খুব পবিত্র রেখ بَيْتِىَ আমার ঘরটিকে لِلطَّآئِفِيْنَ বহিরাগত وَالْعٰكِفِيْنَ ও স্থানীয় লোকদের জন্য وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ এবং রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্য।

১২৬. وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ আর যখন ইবরাহীম বললেন رَبِّ হে প্রভু! اجْعَلْ هٰذَا পরিণত করুন এটাকে بَلَدًا اٰمِنًا একটি নিরাপত্তাময় শহরে وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ এবং এর অধিবাসীর মধ্যে তাদেরকে অনুগৃহীত করুন مِنَ الثَّمَرٰتِ ফলাদি দ্বারা مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ যারা ঈমান রাখে بِاللّٰهِ আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি قَالَ আল্লাহ বললেন وَمَنْ كَفَرَ আর যে কাফের তাকেও فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا বস্তুত এরূপ ব্যক্তিকে তো অল্পদিন খুব আরাম দান করব ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ অতঃপর তাকে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়েপৌঁছিয়ে দিব اِلٰى عَذَابِ النَّارِ দোজখের আজাবে وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আর সেই পৌঁছার স্থান তো অত্যন্ত মন্দ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১২০) قوله وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصٰرٰى الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরগণ লিখেন, মদিনার ইহুদি ও নাজরানের নাসারাগণ মনে প্রাণে চাইতো যে, রাসূল ﷺ যেন তাদের কেবলা অনুসরণ করেন। যখন বায়তুল্লাহকে কেবলা বানিয়ে দেওয়া হলো তখন তাদের মন ভেঙ্গে গেল। তারা যে আশা করেছিল রাসূল আমাদের ধর্ম অনুসরণ করবেন সে আশাও ভেঙ্গে গেল তখনই এই আয়াত নাজিল হলো।

শানে নুযূল– ২ : ইহুদি ও খ্রিস্টানরা রাসূল ﷺ -এর সাথে কোনো কোনো বিষয়ে সমঝোতা করতে চেয়েছিল। তাদের কামনা ছিল তিনি যদি তাদের মতাদর্শ মেনে নেয়, তাহলে তারাও কিছু কিছু বিষয়ে মেনে নিবে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সেই ধর্ম নিরপেক্ষা তার দিকে নবী করীম ﷺ -কে দাওয়াত দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ১৩৬/১, মা'আরেফুন নুযূল : ৯৭/১]

(১২১) قوله الَّذِينَ آتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতটি নাজিল হয় নাজ্জাশীর কিছু সাথীদের ব্যাপারে যারা মূলত আহলে কিতাবী ছিল। তারা হাবশা থেকে রাসূল ﷺ -এর দরবারে আসেন এবং মুসলমান হয়ে যান। তাদের ব্যাপারে এই আয়াতটি নাজিল হয়।

(১২৫) قوله وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, জাফর বিন আবূ তালেবের সাথে নৌকায় আরোহণ করে আগত নাসারাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তারা ৩২ জন ছিল আবিসিনিয়ার [বর্তমান ইথিওপিয়া] অধিবাসী এবং সিরিয়ার ৮ জন সংসার ত্যাগি রাহেব। মতান্তরে তাদের কতিপয় নাজরান অধিবাসী, কতিপয় আবেসিনিয়া এবং কতিপয় ছিল রোমীয়। আর ৮ জন ছিল নৌকার মাঝি মাল্লা। তারা সকলেই জাফর বিন আবূ তালেবের সাথে এসেছিল। যাহ্হাক বলেন, তারা হলেন, সে সকল ইহুদি, যারা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন আব্দুল্লাহ বিন সালাম, ইবনে সূরিয়া ও ইবনে ইয়ামিন প্রমূখ। এ সকল ঈমানদারগণের ফাজায়েল ও মর্যাদা বর্ণনা করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : এই আয়াত সম্পর্কে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রা.) একদা রাসূল ﷺ -কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাকামে ইবরাহীম কে নামাজের স্থান বানিয়ে নিলে ভালো হতো তখন এই আয়াত নাজিল হয়। তাই তো হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমার তিনটি সিদ্ধান্ত আল্লাহর তিনটি সিদ্ধান্তের সাথে মিলে গেছে। ১. আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের স্থান বানানোর আবেদন করেছিলাম। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের স্থান ঘোষণা করেন। ২. আমি রাসূল ﷺ -কে বলেছিলাম, আপনার বিবিদের কাছে ভালোমন্দ উভয় ধরনের লোক যায়। অতএব তাদেরকে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার নির্দেশ দিলে ভালো হয় তখন এই পর্দার আয়াত নাজিল হয়। ৩. যখন রাসূল ﷺ -এর বিবি আত্মমর্যাদার দাবি করল তখন আমি বললাম عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ তখন আল্লাহ হুবহু আমার একথাটি নাজিল করেন।

قوله وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী। ইহুদি নাসারাদের খেয়ালিপনার অনুসরণ তিনি করতে পারেন না। এতদসত্ত্বেও তাঁকে وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ বলে ধমক দেওয়ার হেতু কি? এর দু'টি উত্তর হতে পারে। যথা– (ক) এখানে যদিও اتَّبَعْتَ বলে রাসূল ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে, তবুও এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র উম্মতকে সতর্ক করা। (খ) অথবা, যেহেতু নবীজী ﷺ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছার পক্ষে রায় প্রদান করেছেন, তাদেরকে দীনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য। মূলতঃ এমনটি করা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হয়নি; ফলে আল্লাহ তা'আলা এ কর্ম থেকে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, সতর্ক করার পর যেন এমনটি আর কখনো না হয়। যদি হয় তাহলে আল্লাহর কোনো সাহায্য সহযোগিতা তার জন্য থাকবে না। কাজেই এই সতর্কবাণী নবীজীর ক্ষেত্রেও হতে পারে। –[তাফসীরে বায়যাবী]

قوله الَّذِينَ آتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهُ **-এর উদ্দেশ্য :** আল্লাহর বাণী– 'আমরা যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি' এ বাক্যে اَلَّذِيْنَ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–(ক) মুমিনগণ, কারণ তাদেরকে কুরআন দেওয়া হয়েছে। তারা যথাযথভাবে তা পাঠ করে এবং এর প্রতি ঈমান রাখে। (খ) অথবা, ঐ সকল আহলে কিতাব যারা ঈমান এনেছিল। কারণ পূর্ব থেকেই আহলে কিতাবদের আলোচনা চলে আসছে। –[তাফসীরে কাবীর]

قوله الْكِتٰبَ **-এর উদ্দেশ্য :** আলোচ্যাংশে اَلْكِتٰبَ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–(ক) আল-কুরআন, অথবা, (খ) তাওরাত ও ইঞ্জিল। তখন يُؤْمِنُوْنَ -এর , যমীর দ্বারা রাসূল ﷺ উদ্দেশ্য হবে। ইবারত এভাবে হতে পারে– اُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِالرَّسُوْلِ কারণ পূর্ববর্তী এই কিতাবে নবীজীর নবুয়তের প্রমাণাদি বর্ণিত ছিল। আর যারা যথার্থভাবে তা পাঠ করেছে তারাই নবীজীর প্রতি ঈমান এনেছে।

قوله حَقَّ تِلَاوَتِهٖ **-এর ব্যাখ্যা :** حَقَّ تِلَاوَتِهٖ দ্বারা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা– (ক) অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করা, (খ) পড়ে আমল করা, (গ) তাজভিদসহ তেলাওয়াত করা, (ঘ) তাহরীফ না করে পড়া, এর সব কটি অর্থই একসাথে উদ্দেশ্য হতে পারে

বনী ইসরাঈল কারা ? بَنِيْ শব্দটি মূলে ছিল بَنُوْنَ ইযাফতের কারণে ن বর্ণটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। শব্দটি مُنَادٰى مُضَافٌ হওয়াতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। তাই بَنِيْ হয়ে গেছে; অর্থ পুত্রগণ। এখানে বংশধর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اِسْرَائِيْلَ শব্দের অর্থ আল্লাহর বান্দা। আর ইসরাঈল দ্বারা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে।

قوله اِتَّقُوْا يَوْمًا **-এর উদ্দেশ্য :** সকল মুফাসসির একমত যে, এখানে يَوْمًا দ্বারা يَوْمُ الْحِسَابِ তথা বিচার দিবস উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পুণরুত্থানের পর যেদিন আল্লাহ বলবেন, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ "হে পাপিষ্ঠের দল তোরা আজ পৃথক হয়ে যা," সেদিনকে يَوْمَ الْحِسَابِ –ও বলা হয়। পবিত্র কুরআনে উহাকে يَوْمَ الْقِيَامَةِ ও বলা হয়েছে। সেদিন প্রত্যেকে তার পাপ পুণ্যের হিসেব হাতের কাছে পাবে। তখন আল্লাহ বলবেন, اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا সেদিন যার পাপের বোঝা ভারি হবে তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ وَمَا اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ এসব কারণেই আল্লাহ অত্র দিবসের ব্যাপারে সর্তক থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পয়গম্বর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তাঁর সাফল্য এবং পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। হযরত খলীলুল্লাহ যখন স্নেহপরবশ হয়ে স্বীয় সন্তান-সন্ততির জন্যও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার লাভের জন্য একটি নিয়ম-নীতিও বলে দেওয়া হলো, এতে হযরত খলীলুল্লাহর প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার বংশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও জালেম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না।

হযত খলীলুল্লাহর পরীক্ষাসমূহ ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু : এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই সাধারণত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। কারো কোনো অবস্থা অথবা গুণ-বৈশিষ্ট্যই তাঁর অজানা নয়। এমতাবস্থায় এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল?

দ্বিতীয়তঃ কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে?

তৃতীয়তঃ কি ধরনের সাফল্য হয়েছে?

চতুর্থতঃ কি পুরস্কার দেওয়া হলো?

পঞ্চমতঃ পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। এই পাঁচটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর আলোচনা করা হলো।

প্রথমতঃ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল? কুরআনের একটি শব্দ رَبُّهٗ [তার পালনকর্তা] এ প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ পরীক্ষার পরীক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। আর তার 'আসমায়ে হুসনার' মধ্য থেকে এখানে 'রব' [পালনকর্তা] নামটি ব্যবহার করে রবুবিয়্যাতের [পালনকর্তৃত্বের] দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ কোনো বস্তুকে ধীরে ধীরে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌছানো।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই পরীক্ষা কোনো অপরাধের সাজা হিসেবে কিংবা অজ্ঞাত যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং এর উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাঁকে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌছানো। অতঃপর আয়াতে কর্মকে পূর্বে এবং কারককে পরে উল্লেখ করে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মহত্ত্বকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে? এ সম্পর্কে কুরআনে শুধু كَلِمٰتٍ [বাক্যসমূহ] শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কেউ খোদায়ী বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশি অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোনো বিরোধ নেই; বরং সবগুলোই ছিল হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পরীক্ষার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত তাফসীরকার ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীরের অভিমতও তাই।

আল্লাহর কাছে সূক্ষ্মদর্শিতার চাইতে চারিত্রিক দৃঢ়তার মূল্য বেশি : পরীক্ষার এসব বিষয়বস্তু পাঠশালায় অধীত জ্ঞান-অভিজ্ঞতার যাচাই কিংবা তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ছিল না; বরং তা ছিল চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়তা যাচাই করা। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহর দরবারে যে বিষয়ের মূল্য বেশি, তা শিক্ষাবিষয়ক সূক্ষ্মদর্শিতা নয়; বরং কার্যগত ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব।

এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তু মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূণ বিষয় এই—

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.) কে স্বীয় বন্ধুত্বের বিশেষ মূল্যবান পোশাক উপহার দেওয়া। তাই তাঁকে বিভিন্ন রকম কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। সমগ্র জাতি, এমন কি তাঁর আপন পরিবারের সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিপরীত একটি সনাতন ধর্ম তাঁকে দেওয়া হয়; জাতিকে এ ধর্মের দিকে আহ্বান জানানোর গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পণ করা হয়। তিনি পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তি পূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। সমগ্র জাতি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ নমরূদ ও তার পরিষদবর্গ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহর খলীল প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এসব বিপদাপদ সত্ত্বেও হাসিমুখে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপের জন্য পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আগুনকে নির্দেশ প্রদান করলেন।

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

অর্থাৎ আমি হুকুম দিলাম : হে অগ্নি! ইবরাহীমের উপর সুশীতল ও নিরপত্তার কারণ হয়ে যাও।

নমরূদের আগুন সম্পর্কিত এ নির্দেশের মধ্যে ভাষা ছিল ব্যাপক। বস্তুতঃ কোনো বিশেষ স্থানের আগুনকে নির্দিষ্ট করে এ নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এ কারণে সমগ্র বিশ্বে যেখানেই আগুন ছিল, এ নির্দেশ আসা মাত্রই স্ব স্ব স্থানে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নমরূদের আগুনও এর আওতায় পড়ে শীতল হয়ে গেল।

কুরআনে। بَرْدًا [শীতল] শব্দের সাথে سَلٰمًا [নিরাপদ] শব্দটি যুক্ত করার কারণ এই যে, কোনো বস্তু সীমাতিরিক্ত শীতল হয়ে গেলে তাও বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক; বরং মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। سَلٰمًا বা না হলে আগুন বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়কও হয়ে যেতে পারত।

এ পরীক্ষা সমাপ্ত হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বগোত্র ও মাতৃভূমিকেও হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন। মাতৃভূমি ও স্বজাতি ত্যাগ করে সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এল, বিবি হাজেরা (রা.) ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত ইসমাঈল (আ.) কে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তর গমন করুন। –[ইবনে কাসীর]

হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং তাঁদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোনো শস্যশ্যামল বনানী আসলেই হযরত খলীল (আ.) বলতেন, এখানে অবস্থান করানো হোক। হযরত জিবরাঈল (আ.) বলতেন, এখানে অবস্থানের নির্দেশ নেই, গন্তব্যস্থল সামনে রয়েছে। চলতে চলতে যখন শুষ্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর এসে গেল। [যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ নির্মাণ ও মক্কা নগরী আবাদ করা লক্ষ্য ছিল,] তখন সেখানেই তাঁদের থামিয়ে দেওয়া হলো। আল্লাহর বন্ধু স্বীয় পালনকর্তার মহব্বতে মত্ত হয়ে এই জনশূন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরেই বসবাস আরম্ভ করলেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ হলো না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) নির্দেশ পেলেন যে, বিবি হাজেরা ও শিশুকে এখানে রেখে নিজে সিরিয়ায় ফিরে যাও। আল্লাহর বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আমি চলে যাচ্ছি' বিবিকে এতটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরিও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হযরত হাজেরা তাঁকে চলে যেতে দেখে কয়েকবার ডেকে অবশেষে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ জন-মানবহীন প্রান্তরে আমাদের একা ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) নির্বিকার—কোনো উত্তর নেই। অবশ্য হাজেরাও ছিলেন খলিলুল্লাহর সহধর্মিনী ব্যাপার বুঝে গেলেন ডেকে বললেন, আপনি কি আল্লাহর কোনো নির্দেশ পেয়েছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, হ্যাঁ! খোদায়ী নির্দেশের কথা জানতে পেরে হযরত হাজেরা খুশিমনে বললেন, যান। যে প্রভু আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দিবেন না।

অতঃপর হযরত হাজেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালাতিপাত করতে থাকেন। এক সময় দারুন পিপাসা তাকে পানির খোঁজে বের হতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে বার বার ওঠানামা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোনো মানুষ দৃষ্টিগোচর হলো না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। সাত বার ছোটাছুটি করার পর তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ

ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যেই 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাত বার দৌড়ানো কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হজের বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হযরত হাজেরা যখন দৌড়াদৌড়ি শেষ করে নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহর রহমত নাজিল হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং শুষ্ক মরুভূমিতে পানির একটি ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। বর্তমানে এ ধারার নামই যমযম। পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জীব-জন্তু আগমন করল। জীব-জন্তু দেখে মানুষও এসে সেখানে আস্তানা গাড়ল। এভাবে মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্রও সংগৃহীত হলো।

হযরত ইসমাঈল (আ.) নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজ-কর্মের উপযুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে এসে বিবি হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন এবং পিতার স্নেহ-বাৎসল্য থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এমতাবস্থায় পিতা খোলাখোলি নির্দেশ পেলেন, এ ছেলেকে নিজ হাতে জবাই করে দাও। কুরআনে বলা হয়েছে–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى - قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ-

'বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠল, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল! তোমার কি অভিপ্রায়? পিতৃভক্ত বালক আরজ করলেন, পিতা! আপনি যে আদেশ পেয়েছেন, তা পালন করুন। আপনি আমাকেও ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে ধৈর্যশীল পাবেন।'

এর পরবর্তী ঘটনা সবাই জ্ঞাত আছেন যে, হযরত খলীল (আ.) পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশ্যে মিনা প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহর আদেশ পালনে নিজের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা পুরোপুরিই সম্পন্ন করলেন। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে উদ্দেশ্য পুত্রকে জবাই করানো ছিল না; বরং পুত্রবৎসল পিতার পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্নের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নে 'জবাই করে দিয়েছেন' দেখেননি; বরং জবাই করেছেন, অর্থাৎ জবাই করার কাজটি দেখেছেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) তা-ই বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে কাজটি দেখানো হয়েছে। এ কারণেই قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا বলা হয়েছে অর্থাৎ স্বপ্নে যা দেখেছিলেন আপনি তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বেহেশত থেকে এর পরিপুরক নাজিল করে তা কুরবানি করার আদেশ দিলেন। এ রীতিটিই পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে।

এগুলো ছিল বড়ই কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন হযরত খলীলুল্লাহকে করা হয়। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ এবং বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতাও তাঁর উপর আরোপ করা হলো। তন্মধ্যে দশটি কাজ খাসায়েলে ফিতরত [প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান] নামে অভিহিত। এগুলো হলো শারীরিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত। ভবিষ্যত উম্মতের জন্যও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর তাকিদ দিয়েছেন।

ইবনে কাসীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে, সমস্ত ইসলাম ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে দশটি সূরা বারাআতে, দশটি সূরা আহযাবে এবং দশটি সূরা মু'মিনূনে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সূরা বারাআতে মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমানের দশটি বিশেষ লক্ষণ ও গুণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

"তারা হলেন তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোজাদার, রুকূ-সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজে বাধা-দানকারী, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার হেফাজতকারী– এহেন ঈমানদারদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।"

সূরা মুমিনুনে বর্ণিত দশটি গুণ হলো এই–

"নিশ্চিতরূপেই ঐসব মুসলমান কৃতকার্য, যারা নামাজে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, যারা অনর্থক বিষয় থেকে দূরে সরে থাকে, যারা নিয়মিত জাকাত প্রদান করে, যারা স্বীয় লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু আপন স্ত্রী ও যাদের উপর বিধিসম্মত অধিকার রয়েছে তাদের ব্যতীত। কারণ, এ ব্যাপারে তাদের অভিযুক্ত করা হবে না। যারা এদের ছাড়া অন্যকে তালাশ করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। যারা স্বীয় আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যারা নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামাজ পড়ে, এমন লোকেরাই উত্তরাধিকারী হবে। তারা হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তারা অনন্তকাল বাস করবে।"

সূরা আহযাবে বর্ণিত দশটি গুণ হলো–

"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীলা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনয় অবলম্বনকারী পুরুষ ও বিনয় অবলম্বনকারিনী নারী, খয়রাতকারী পুরুষ ও খয়রাতকারিনী নারী, রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার নারী, লজ্জাস্থানের রক্ষণা-বেক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের রক্ষণা-বেক্ষণকারিনী নারী, অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারিণী নারী, তাদের সবার জন্য আল্লাহ তা'আলা মাগফেরাত ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

কুরআনের তাফসীর বিশারদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উপরোল্লিখিত উক্তির দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলমানদের জন্য যেসব জ্ঞান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কুরআনোক্ত كَلِمٰتٍ যেসব বিষয়ে হযরত খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ আয়াতের ইঙ্গিতও এসব বিষয়ের দিকেই।

এ পর্যন্ত আয়াত সম্পর্কিত পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে দু'টির উত্তর সম্পন্ন হলো।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এ পরীক্ষায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাফল্যের প্রকার ও শ্রেণি সম্পর্কে। এর উত্তর এই যে, স্বয়ং কুরআনই বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁকে সফল্যের স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করেছে:

وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى আর ইবরাহীম পরীক্ষায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। অর্থাৎ, প্রতিটি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ ও একশ' ভাগ সাফল্যের ঘোষণা আল্লাহ দিয়েছেন।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, এই পরীক্ষার পুরস্কার কি পেলেন? এরও বর্ণনা এই আয়াতেই রয়েছে– বলা হয়েছে : اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا পরীক্ষার পর আল্লাহ বলেন– "আমি তোমাকে মানব সমাজের নেতৃত্বদান করব।"

এ আয়াত দ্বারা একদিকে ইঙ্গিত করা গেল যে, হযরত খলীল (আ.)-কে সাফল্যের প্রতিদান মানবসমাজের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে মানবসমাজের নেতা হওয়ার জন্য যে পরীক্ষা দরকার, তা পার্থিব পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। পার্থিব পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণকেই সাফল্যের মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় আয়াতে বর্ণিত ত্রিশটি নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি গুণান্বিত হওয়া শর্ত। কুরআনের অন্য এক জায়গায় বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

"যখন তারা শরিয়তবিরুদ্ধ কাজে সংযমী হলো এবং আমার নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাসী হলো, তখন আমি তাদেরকে নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।"

এই আয়াতে صَبْر [সংযম] ও يَقِيْن [বিশ্বাস] শব্দদ্বয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত ত্রিশটি গুণ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। صَبْر হলো শিক্ষাগত ও বিশ্বাসগত পূর্ণতা আর يَقِيْن কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা।

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল এই যে, পাপাচারী ও জালেমকে নেতৃত্বলাভের সম্মান দেওয়া হবে না বলে ভবিষ্যত বংশধরদের নেতৃত্বলাভের জন্য যে বিধান ব্যক্ত হয়েছে, তার অর্থ কি?

এর ব্যাখ্যা এই যে, নেতৃত্ব এক দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব। আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে এ পদ দেওয়া যায় না। এ কারণেই আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে স্বেচ্ছায় নেতা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত না করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

হযরত খলীলুল্লাহর মক্কায় হিজরত ও কা'বা নির্মাণের ঘটনা : এই আয়াতে কা'বা গৃহের ইতিহাস, হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)কর্তৃক কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ, কা'বা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। এ বিষয়টি কুরআনের অনেক আয়াতে বিভিন্ন সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে।

হরম সম্পর্কিত মাসায়েল

১. مَثَابَةً শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কা'বা গৃহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানবজাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে থাকবে এবং মানুষ বরাবর তার দিকে ফিরে যেতে আকাঙ্ক্ষী হবে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন لَا يَقْضِيْ اَحَدٌ مِّنْهَا وَطَرًا অর্থাৎ কোনো মানুষ কা'বা গৃহের জেয়ারত করে তৃপ্ত হয় না; বরং প্রতিবারই জেয়ারতের অধিকতর বাসনা নিয়ে ফিরে আসে। কোনো কোনো আলেমের মতে কা'বা গৃহ থেকে ফিরে আসার পর আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ্জ কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রথমবার কা'বাগৃহ জিয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ থাকে দ্বিতীয়বার তা আরো বৃদ্ধি পায় এবং যতবারই জিয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই বেড়ে যেতে থাকে। এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা'বারই বৈশিষ্ট্য। নতুন জগতের শ্রেষ্ঠতম

মনোরম দৃশ্যও এক দু'বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। পাঁচ সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই থাকে না; অথচ এখানে না আছে কোনো মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌঁছা সহজ এবং না আছে ব্যবসায়িক সুবিধা, তা সত্ত্বেও এখানে পৌঁছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা ব্যয় করে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌঁছার জন্য মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

২. এখানে أَمْنًا শব্দের অর্থ مَأْمَنٌ অর্থাৎ শান্তির আবাসস্থল। بَيْتَ শব্দের অর্থ শুধু কা'বাগৃহ নয়; বরং সম্পূর্ণ হরম। অর্থাৎ কা'বা গৃহের পবিত্র প্রাঙ্গন। কুরআনে بَيْتُ اللّٰهِ ও كَعْبَةَ শব্দ বলে যে সম্পূর্ণ হরমকে বুঝানো হয়েছে, তার আরো বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এক জায়গায় বলা হয়েছে– هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ এখানে كَعْبَةَ বলে সমগ্র হরমকে বুঝানো হয়েছে। কারণ এতে কুরবানির কথা আছে। কুরবানি কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে হয় না এবং যেখানে কুরবানি করা বৈধও নয়। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, 'আমি কা'বার হরমকে শান্তির আলয় করেছি।' শান্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেওয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তিজনিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। –[ইবনে আরাবী]

৩. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى –এখানে মাকামে ইবরাহীমের অর্থ– ঐ পাথর, যাতে মু'জিযা হিসেবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। কা'বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। –[সহীহ বুখারী] হযরত আনাস (রা.) বলেন, ঐ পাথরে আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন দেখেছি জেয়ারতকারীদের উপর্যুপরি স্পর্শের দরুন চিহ্নটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। –[কুরতুবী]
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে মাকামে ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে যে, সমগ্র হরমটিই মাকামে ইবরাহীম। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, তওয়াফের পর যে দু'রাকাত নামাজ মাকামে ইবরাহীমে পড়ার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হরমের যে কোনো অংশে পড়লেই চলে। অধিকাংশ ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ এ ব্যাপারে একমত।

৪. আলোচ্য আয়তে মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তওয়াফের পর কা'বা গৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মাকামে ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى অতঃপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়লেন যে, কা'বা ছিল তাঁর সম্মুখে এবং কা'বা ও তাঁর মাঝখানে ছিল মাকামে ইবরাহীম। –[সহীহ মুসলিম] এ কারণেই ফিকহ্শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন– যদি কেউ মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সংলগ্ন স্থানে জায়গা না পায়, তবে মাকামে-ইবরাহীম ও কা'বা উভয়টিকে সামনে রেখে যে কোনো দূরত্বে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে নির্দেশ পালিত হবে।

৫. আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাত নামাজ ওয়াজিব। –[জাস্সাস, মোল্লা আলী ক্বারী] তবে এ দু' রাকাত নামাজ বিশেষভাবে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়া সুন্নত। হরমের অন্যত্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) এ দু' রাকাত নামাজ কা'বা গৃহের দরজা সংলগ্ন স্থানে পড়েছেন বলেও প্রমাণিত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (আ.) ও তাই করেছেন বলে বর্ণিত আছে। –[জাস্সাস]। মোল্লা আলী ক্বারী মানাসেক গ্রন্থে বলেছেন, এ দু' রাকাত মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়া সুন্নত। যদি কোনো কারণে সেখানে পড়তে কেউ অক্ষম হয়, তবে হরম অথবা হরমের বাইরে যে কোনোখানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

৬. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ এখানে কা'বা গৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহঙ্কার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলূষ থেকেও কা'বা গৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশে بَيْتِيَ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোনো মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ সব মসজিদই আল্লাহর ঘর। কুরআনে বলা হয়েছে– فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ হযরত ফারূকে আজম (রা.) মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন, তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, জান না? [কুরতুবি] অর্থাৎ, মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, এতে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কা'বা গৃহকে যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিত্র করে মসজিদে প্রবশে করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। তিনি ছোট শিশু এবং পাগলদেরও মসজিদে প্রবশে করতে বারণ করেছেন। কারণ তাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৭. لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ আয়াতের শব্দগুলো থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। **প্রথমতঃ** কা'বাগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য তওয়াফ এ'তেকাফ ও নামাজ। **দ্বিতীয়তঃ তওয়াফ** আগে আর নামাজ পরে। [হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর অভিমত তাই]। **তৃতীয়তঃ** বিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে আগমনকারী হাজীদের পক্ষে নামাজের চাইতে তওয়াফ উত্তম। চতুর্থতঃ ফরজ হোক অথবা নফল কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে যে কোনো নামাজ পড়া বৈধ। –[জাস্‌সাস]

مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ-এর পরিচয় : مَقَامٌ শব্দের বাংলা হলো দাঁড়াবার জায়গা; মাকামে ইবরাহীম তথা ইবরাহীম (আ.)-এর দাঁড়াবার জায়গা বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যেমন–

- বর্ণিত আছে যে, কা'বা নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.) একটি পাথরের উপর দাঁড়াতেন। ফলে পাথরটিতে তাঁর উভয় পায়ের চিহ্ন বসে যায়। ঐ পাথরটিকে مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ বলা হয়।
- কেউ কেউ বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর স্ত্রীকে দেখতে আসেন তখন ঘোড়া থেকে অবতরণের সুবিধার্থে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্ত্রী একটি পাথর এগিয়ে দেন এবং ঐ পাথরের উপর হযরত ইবরাহীম (আ.) অবতরণ করেন। ঐ পাথরটিকে مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ বলা হয়েছে।
- অথবা, যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) বিশ্ববাসীকে হজের জন্য আহবান করেছিলেন, সে পাথরকে مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ বলা হয়েছে।
- অথবা, কা'বা গৃহের কাছে যে স্থানে ঐ পাথর আজ অব্দি রাখা আছে সেই স্থানকে مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ বলা হয়েছে। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

মাকামে ইবরাহীমের মাঝে নামাজ পড়া যায় কি? মাকামে ইবরাহীম মূলতঃ একটি ছোট পাথর যার উপর সর্বোচ্চ একজন লোক দাঁড়াতে পারে। এর মাঝে নামাজ পড়া সম্ভব নয়। তবে এখানে مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ বলে যদিও একটি পাথর উদ্দেশ্য তবুও مُصَلًّى বলতে ঐ পাথরের আশ পাশের প্রশস্ত জায়গাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন মসজিদে নববী বললে এর আশ পাশের এলাকাও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত বুঝায়। –[বয়ানুল কুরআন]

কা'বা ঘরের ভিতরে নামাজের বিধান : কা'বা ঘর নামাজের জন্য কিবলা। এর চারপাশে নামাজ আদায় করা হয়। কিন্তু কা'বা ঘরের ভিতরে নামাজ পড়া বৈধ কি না এ ব্যাপারে সালফে সালেহীনদের মাঝে মতানৈক্য দেখা গেছে।

- ইমাম আ'জম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে, কা'বার ভিতরে কি ছাদে, ফরজ কি নফল সকল প্রকার নামাজ পড়া বৈধ হবে।
- ইমাম মালেক (র.) বলেন, কা'বার ভিতরে ফরজ পড়া যাবে না। তবে নফল পড়া যাবে। কেউ যদি ফরজ পড়ে ফেলে তাহলে পুনরায় নামাজ পড়তে হবে।
- ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কা'বা ঘরের ভিতরে যদি কেউ দেয়ালের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে তবে শুদ্ধ হবে। আর যদি কা'বার খোলা দরোজার দিকে মুখ করে কিংবা ছাদে উঠে নামাজ পড়ে তাহলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। কারণ তার নামাজ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ হয়নি।

উল্লেখ্য, এখানে ইমাম আজমের কথাই অধিক যুক্তিযুক্ত। –[কুরতুবী]

قوله اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ -এর মর্ম : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমরা আমার ঘরকে পবিত্র কর।" এই কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা–

- মুশরিকদের রাখা মূর্তি মুক্ত করা,
- তাতে নিক্ষেপিত ময়লা-আবর্জনা থেকে পাক-সাফ করা।
- উলঙ্গ নারী-পুরুষের তওয়াফ থেকে মুক্ত করা।
- অপবিত্রা নারীদের প্রবেশ থেকে মুক্ত রাখা।
- সব রকমের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করা। –[রূহুল মা'আনী]

قوله قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ -এর উদ্দেশ্য : প্রশ্ন হলো قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ বাক্যে قَالَ -এর قَائِلْ কে? এর দু'টি উত্তর পাওয়া যায়। যেমন–

- ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা.)-এর ভাষ্যমতে قَالَ -এর قَائِلْ হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। তখন فَاَمْتِعْهُ ও اَضْطَرُّهٗ এর সীগাহ দু'টি শব্দ ধরা হবে।

৮. উবাই ইবনে কা'ব ও ইবনে ইসহাক বলেন قَالَ -এর قَائِلُ আল্লাহ স্বয়ং; এবং أَضْطَرُّهُ ও فَأُمَتِّعُهُ -এর সীগাহগুলো وَاحِد مُتَكَلِّمْ হবে। -[কুরতুবী]

قوله اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا -এর ব্যাখ্যা : হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করলেন, হে আমার রব, আপনি এই মক্কা নগরীকে নিরাপদ নগরীতে পরিণত করে দিন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন। তবে যারা খোদাদ্রোহী তাদের জন্য পৃথিবীর কোনো স্থানই নিরাপদ নয়। তাই কোনো সীমালঙ্ঘনকারী যদি হেরেমে আশ্রয় গ্রহণ করে তবে, যে কোনো পন্থায় তাকে হেরেমের বাইরে এনে তার ওপর হদ কায়েম করতে হবে। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, মক্কা নগরী কি ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার পর থেকে নিরাপদ হয়েছে না, পূর্ব থেকেই নিরাপদ ছিল? এ ব্যাপারে অনেকেই মতানৈক্য করেছেন।
মক্কা নগরী পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই হারাম বা পবিত্র নগরী ছিল। তাদের দলিল নবী করীম (সা.)-এর এই বাণী-

اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, আসমান ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ এই নগরীকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন, কাজেই কিয়ামত পর্যন্ত এটি পবিত্র নগরী হিসেবে বহাল থাকবে।"
একদল আলেম মনে করেন- এটা ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়ার বরকতে হারাম নগরীতে পরিণত হয়েছে। যেমন- নবীজীর দোয়ার বরকতে মদিনা হারাম নগরীতে পরিণত হয়েছে। তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা তাদের মতের স্বপক্ষে দলিল পেশ করেছেন, قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِاَهْلِهَا
ইবনে আতিয়া বলেন, উভয় মতের মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। প্রথম মতে, মক্কা নগরী হারাম হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহর ইলেমে ছিল, দ্বিতীয় মতের ভিত্তিতে হযরত ইব্রাহীমের দোয়ার বরকতে তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। ইমাম তাবারী অনুরূপ মত পোষণ করেন। -[কুরতুবী]

কা'বা নির্মাণ কাহিনী

কা'বা পৃথিবীর প্রথম ঘর। এর পূর্বে পৃথিবীতে কোনো ঘর ছিল না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا الخ প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ ও ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এ ঘর আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার পূর্বে সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। তখন থেকে অদ্যাবধি এই ঘরের পুনঃনির্মাণ ও পুনঃসংস্কার প্রায় ১০ বার সংঘটিত হয়।

১. প্রথমতঃ স্বয়ং আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে এ ঘর তৈরি করেন। আদম সৃষ্টির প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে এই নির্মাণ কাজ অনুষ্ঠিত হয়। কালক্রমে তা মাটি চাপা পড়ে যায়।
২. তারপর আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণের পর তিনি এই ঘর পুনঃনির্মাণ করেন।
৩. অতঃপর হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানরা এর সংস্কার সাধন করে।
৪. হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে প্লাবনের সময় এ ঘর ধ্বসে যায়। বহুকাল পর আল্লাহর নির্দেশে ইব্রাহীম (আ.) ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আ.) যৌথভাবে এ ঘর পুনঃনির্মাণ করেন।
৫. দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কা'বা ঘর পুনরায় জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়লে আরবের আমালেকা গোত্র তা পুনঃসংস্কার করে।
৬. এর দীর্ঘদিন পর হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর শ্বশুর গোষ্ঠী জুরহাম গোত্রের লোকেরা পুনঃসংস্কার করে।
৭. এরপর কুসাই ইবনে কিলাব গোত্র তা পুনঃসংস্কার করে।
৮. মহানবীর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর কিশোর বয়সে মক্কার কুরাইশগণ কা'বা গৃহকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নতুন করে নির্মাণ করে। মদিনার জিন্দেগীতে নবীজী তা মাকামে ইবরাহীমের উপর পুনঃনির্মাণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেও আর সময় পাননি। ফলে কুরাইশরা যে ভিত্তির উপর কা'বা নির্মাণ করেছিল আজ অব্দি সেই ভিত্তির উপরই রয়ে গেল।
৯. পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর উমাইয়া শাসনামলে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে শ্রুত একটি হাদীস মোতাবেক মাকামে ইবরাহীমী সহ কা'বা গৃহ পুনঃ সংস্কার করেন।
১০. তারপর খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কা'বা গৃহের উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেন। যা আজ পর্যন্ত বহাল আছে।

অতঃপর হিজরি ১৪০ সালে তুর্কী বাদশাহ মুরাদখান কুরাইশদের ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করেন এবং প্রথম কা'বাকে গেলাফ আবৃত করেন। তারপর থেকে সৌদি বাদশাহগণ বিভিন্ন সময় এর সংস্কার সাধন করেছেন। বিশেষ করে বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আব্দুল আজিজের সময়ে এর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মূলতঃ কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজ ফেরেশতা, হযরত আদম, হযরত ইবরাহীম ও কুরাইশ গোত্রের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। বাকিগুলো সব সংস্কার কাজ ছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ- (و . ق . ى) জিনসে لفيف مفروق অর্থ- তোমরা ভয় কর, পরহেজগারী অবলম্বন কর।

تَجْزِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ- (ج . ز . ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- তা যথেষ্ট হবে, তা বদলা হবে, তা কাজে আসবে।

نَفْسٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَنْفُسٌ. نُفُوْسٌ ; অর্থ- প্রাণ, প্রাণী, ব্যক্তি।

اِبْتَلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِلَاءُ মূলবর্ণ- (ب . ل . و) জিনসে ناقص واوى অর্থ- সে লিপ্ত হয়েছে।

لَا يَنَالُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّيْلُ মূলবর্ণ (ن . ى . ل) জিনসে اجوف يائى অর্থ- সে পাবে না।

مَثَابَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم ظرف مؤنث অর্থ- লোকদের জন্য সম্মিলিত স্থান।

اِتَّخِذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনসে مهموز فاء অর্থ- তুমি বানাও, তুমি গ্রহণ কর।

مُصَلًّى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف مكان বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّصْلِيَةُ মূলবর্ণ (ص . ل . ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- নামাজ পড়ার স্থান।

طَائِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلطَّوَافُ মূলবর্ণ (ط . و . ف) জিনসে اجوف واوى অর্থ- তওয়াফকারীগণ।

الرُّكَّعِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন راكع অর্থ- রুকূ' করা। ঝুঁকা।

اُمَتِّعُهٗ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّمْتِيْعُ মূলবর্ণ (م . ت . ع) জিনস صحيح অর্থ- আমি ফায়েদা ভোগ করার সুযোগ দিব।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর ىْ হলো তার اسم আর جَاعِلٌ হলো شبه فعل আর كَ হলো مفعول আর لِلنَّاسِ হলো متعلق আর اِمَامًا হলো مفعول ثانى অতঃপর جَاعِلُكَ জুমলা হয়ে خبر ان অতঃপর اِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ : এখানে لَا يَنَالُ ফে'ল আর عَهْدِىْ শব্দটি مضاف و مضاف اليه মিলে فاعل আর الظّٰلِمِيْنَ হলো مفعول এবং ফে'ল, ফা'য়েল ও مفعول মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ : এখানে اُرْزُقْ ফে'ল ও ফা'য়েল اَهْلَهٗ শব্দটি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول আর مِنَ الثَّمَرَاتِ হলো متعلق অতএব, ফে'ল, ফা'য়েল مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١٢٧)

(১২৭) আর যখন নির্মাণ করছিলেন ইবরাহীম কাবাগৃহের প্রাচীর এবং [সহায়করূপে] ইসমাঈলও [বললেন] হে আমাদের প্রভু! আমাদের পক্ষ হতে কবুল করুন, নিঃসন্দেহে আপনি খুব শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١٢٨)

(১২৮) হে আমাদের প্রভু! আর আমাদেরকে আপনার আরো অধিক অনুগত বানিয়ে নিন এবং আমাদের বংশধর হতেও আপনার অনুগত একদল লোক পয়দা করুন আর আমাদেরকে আমাদের হজের আহকামও বলে দিন এবং আমাদের অবস্থার প্রতি [কৃপা] দৃষ্টি রাখুন, আর প্রকৃতপক্ষে আপনিই বিশেষ যত্নবান এবং মেহেরবান।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۖ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١٢٩)

(১২৯) হে আমাদের প্রভু! তাদের মধ্য হতে এমন এক রাসূল নির্দিষ্ট করে দিন যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ পড়ে শুনাবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন; নিশ্চয় আপনিই প্রবল ক্ষমতাবান পূর্ণ সংবিধানকারী।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ۖ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ (١٣٠)

(১৩০) ইবরাহীমী ধর্ম হতে ঐ ব্যক্তিই মুখ ফিরাবে যে মূলেই নির্বোধ, আর আমি তাকে দুনিয়ায় নির্বাচিত করেছি এবং তিনি আখেরাতে অতি মহৎ লোকদের মধ্যে পরিগণিত।

শাব্দিক অনুবাদ

১২৭. وَاِذْ يَرْفَعُ আর যখন নির্মাণ করছিলেন اِبْرٰهٖمُ ইবরাহীম الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ কাবাগৃহের প্রাচীর وَاِسْمٰعِيْلُ এবং ইসমাঈলও رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু تَقَبَّلْ مِنَّا আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন اِنَّكَ اَنْتَ নিঃসন্দেহে আপনি السَّمِيْعُ খুব শ্রবণকারী الْعَلِيْمُ মহাজ্ঞানী।

১২৮. رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু! وَاجْعَلْنَا আর আমাদেরকে বানিয়ে নিন مُسْلِمَيْنِ لَكَ আপনার আরো অধিক অনুগত وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ এবং আমাদের বংশধর হতেও اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ আপনার অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করুন وَاَرِنَا আর আমাদেরকে বলে দিন مَنَاسِكَنَا আমাদের হজের আহকামও وَتُبْ عَلَيْنَا এবং আমাদের অবস্থার প্রতি [কৃপা] দৃষ্টি রাখুন اِنَّكَ اَنْتَ আর প্রকৃতপক্ষে আপনিই التَّوَّابُ বিশেষ যত্নবান الرَّحِيْمُ এবং মেহেরবান।

১২৯. رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু! وَابْعَثْ فِيْهِمْ নির্দিষ্ট করে দিন رَسُوْلًا مِّنْهُمْ তাদের মধ্য হতে এমন এক রাসূল يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ যিনি তাদেরকে পড়ে শুনাবেন اٰيٰتِكَ আপনার আয়াতসমূহ وَيُعَلِّمُهُمُ এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবেন الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ কিতাব ও হিকমত وَيُزَكِّيْهِمْ এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন اِنَّكَ اَنْتَ নিশ্চয় আপনিই الْعَزِيْزُ প্রবল ক্ষমতাবান الْحَكِيْمُ পূর্ণ সংবিধানকারী।

১৩০. وَمَنْ يَّرْغَبُ আর ঐ ব্যক্তিই মুখ ফিরাবে عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ ইবরাহীমী ধর্ম হতে اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ যে মূলেই নির্বোধ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ আর আমি তাকে নির্বাচিত করেছি فِي الدُّنْيَا দুনিয়ায় وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ এবং তিনি আখেরাতে لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ অতি মহৎ লোকদের মধ্যে পরিগণিত।

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۙ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾

(১৩১) যখন তাঁকে তাঁর প্রভু বললেন, অনুগত হও, তখন তিনি বললেন, আমি অনুগত হলাম বিশ্বপ্রতিপালকের।

وَوَصّٰى بِهَآ إِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ۗ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

(১৩২) আর এরই হুকুম করে গেছেন ইবরাহীম নিজ সন্তানদেরকে এবং ইয়াকূবও, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ এই ধর্মকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা ইসলাম ব্যতীত আর কোনো অবস্থায় মৃত্যু বরণ করো না।

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ۗ قَالُوْا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ اٰبَآئِكَ إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ إِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾

(১৩৩) তোমরা কি স্বয়ং উপস্থিত ছিলে? যখন ইয়াকূবের মৃত্যুকাল উপনীত হয়েছিল, যখন তিনি নিজ সন্তানদের বললেন, তোমরা আমার পরে কিসের ইবাদত করবে? তারা বলল, আমরা তাঁর ইবাদত করব আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক যাঁর ইবাদত করে আসছেন অর্থাৎ, এক ও অদ্বিতীয় মা'বুদের, আর আমরা তাঁরই অনুগত থাকব।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٤﴾

(১৩৪) এটা একটি জামাত ছিল যা অতীত হয়ে গেছে, তাদের কৃত-কর্ম তাদের কাজে আসবে, তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের কাজে আসবে, তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাও তো করা হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

১৩১. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ যখন তাঁকে তাঁর প্রভু বললেন أَسْلِمْ অনুগত হও قَالَ أَسْلَمْتُ তিনি বললেন, আমি অনুগত হলাম لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বপ্রতিপালকের।

১৩২. وَوَصّٰى بِهَآ আর এরই হুকুম করে গেছেন إِبْرٰهِيْمُ ইবরাহীম بَنِيْهِ নিজ সন্তানদেরকে وَيَعْقُوْبُ এবং ইয়াকূবও يٰبَنِيَّ হে আমার সন্তানগণ! إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى আল্লাহ মনোনীত করেছেন لَكُمُ তোমাদের জন্য الدِّيْنَ এই ধর্মকে فَلَا تَمُوْتُنَّ সুতরাং তোমরা মৃত্যুবরণ করো না إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ইসলাম ব্যতীত আর কোনো অবস্থায়।

১৩৩. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ তোমরা কি স্বয়ং উপস্থিত ছিলে? إِذْ حَضَرَ যখন উপনীত হয়েছিল يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ইয়াকূব -এর মৃত্যুকালে إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ যখন তিনি নিজ সন্তানদের বললেন مَا تَعْبُدُوْنَ তোমরা কিসের ইবাদত করবে? مِنْۢ بَعْدِيْ আমার পরে قَالُوْا তারা বলল نَعْبُدُ আমরা তাঁর ইবাদত করব إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ اٰبَآئِكَ আপনি ও আপনার পূর্ব পুরুষ যাঁর ইবাদত করে আসছেন إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক إِلٰهًا وَّاحِدًا এক ও অদ্বিতীয় মা'বুদের وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ আর আমরা তাঁরই অনুগত থাকব।

১৩৪. تِلْكَ أُمَّةٌ এটা একটি জামাত ছিল قَدْ خَلَتْ যা অতীত হয়ে গেছে لَهَا مَا كَسَبَتْ তাদের কৃত-কর্ম তাদের কাজে আসবে, وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ আর তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের কাজে আসবে وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাও তো করা হবে না عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৩০) قوله وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এ আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরগণ লিখেন যে, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) তাঁর দুই ভাতিজা সালামা এবং মুহাজিরকে এই বলে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন দেখ, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সত্য নবী। এবং কুরআন সত্য কিতাব আর তোমরা এটাও জান যে, তাওরাতের মধ্যে শেষ নবীর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। অতএব তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তখন সালামা ইসলাম গ্রহণ করলেন কিন্তু মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করল না। তাদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাজিল হয়।

(১৩৩) قوله أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেন, একবার ইহুদিরা বলতে লাগল যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) ইন্তেকালের সময় তাঁর সন্তানদেরকে ইহুদি হওয়ার অসিয়ত করেছিল। তাদের এই অমূলক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া : رَبِّ শব্দ দ্বারা দোয়া আরম্ভ করেছেন। এর অর্থ- 'হে আমার পালনকর্তা।' তিনি এই শব্দের মাধ্যমে দোয়া করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ এ জাতীয় শব্দ আল্লাহর রহমত ও কৃপা আকৃষ্ট করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও সহায়ক। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম দোয়া এই: "তোমার নির্দেশে আমি এই জনমানবহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে রেখে যাচ্ছি। তুমি একে একটি শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও- যাতে এখানে বসবাস করা আতঙ্কজনক না হয় এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়।"

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বিতীয় দোয়ায় বলা হয়েছে- পরওয়ারদেগার! শহরটিকে শান্তিধাম করে দাও। অর্থাৎ হত্যা, লুণ্ঠন, কাফেরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখ।

হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কবুল হয়েছে। মক্কা মুকাররমা শুধু একটি জনবহুল নগরীই নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবর্তনস্থলও বটে। বিশ্বের চার দিক থেকে মুসলমানগণ এ নগরীতে পৌঁছাকে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে করে। নিরাপদ ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোনো শত্রুজাতি অথবা শত্রুসম্রাট এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। 'আসহাবে-ফীলের' ঘটনা স্বয়ং কুরআনে উল্লিখিত রয়েছে। তারা কা'বা ঘরের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করতেই সমগ্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

এ শহরটি হত্যা ও লুটতরাজ থেকেও সর্বদা নিরাপদ রয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা অগণিত অনাচার, কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বা ঘর ও তার পার্শ্ববর্তী হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। তারা প্রাণের শত্রুকে হাতে পেয়েও হরমের মধ্যে পাল্টা হত্যা অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করত না। এমনকি, হরমের অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতি সমগ্র আরবে প্রচলিত ছিল। এ কারণেই মক্কাবাসীরা বাণিজ্যব্যাপদেশে নির্বিঘ্নে সিরিয়া ও ইয়ামানে যাতায়াত করত। কেউ তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করত না।

আল্লাহ তা'আলা হরমের চতুঃসীমায় জীব-জন্তুকেও নিরাপত্তা দান করেছেন। এই এলাকায় শিকার করা জায়েজ নয়। জীব-জন্তুর মধ্যেও স্বাভাবিক নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা সেখানে শিকারী দেখলেও ভয় পায় না।

হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় দোয়া এই যে, এ শহরের অধিবাসীদের উপজীবিকা হিসেবে যেন ফল-মূল দান করা হয়। মক্কা মুকাররমা ও পার্শ্ববর্তী ভূমি কোনোরূপ বাগ-বাগিচার উপযোগী ছিল না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল না পানির নাম-নিশানা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের দোয়া কবুল করে নিয়ে মক্কার অদূরে 'তায়েফ' নামক একটি ভূখণ্ড সৃষ্টি করে ছিলেন। তায়েফে যাবতীয় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যা মক্কার বাজারেই বেচা-কেনা হয়।

হযরত খলীলুল্লাহ (আ.)-এর সাবধানতা: আলোচ্য আয়াতে মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে এক দোয়ায় যখন হযরত খলীল স্বীয় বংশধরে মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, মুমিনদের পক্ষে এ দোয়া কবুল হলো, জালেম ও মুশরিকদের জন্য নয়। সে দোয়াটি ছিল নেতৃত্ব লাভের দোয়া। হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) ছিলেন আল্লাহর বন্ধুত্বের মহান মর্যাদায় উন্নীত ও খোদাভীতির প্রতীক। তাই এ ক্ষেত্রে সে কথাটি মনে পড়ে গেল এবং তিনি দোয়ার শর্ত যোগ করলেন যে, আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির এ দোয়া শুধু মুমিনদের জন্য করেছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ভয় ও

সাবধানতার মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে: وَمَنْ كَفَرَ অর্থাৎ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমি সমস্ত মক্কাবাসীকেই দান করব, যদিও তারা কাফের, মুশরিক হয়। তবে মুমিনদেরকে ইহকাল ও পরকালসর্বত্রই তা দান করব, কিন্তু কাফেররা পরকালে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

স্বীয় সৎকর্মের উপর ভরসা না করা ও তুষ্ট না হওয়ার শিক্ষা : হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শন ভূখণ্ড ছেড়ে মক্কার বিশুষ্ক পাহাড়সমূহের মাঝখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে এনে রাখেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোনো আত্মত্যাগী সাধকের অন্তরে অহংকার দানা বাঁধতে পারত এবং সে তাঁর ক্রিয়াকর্মকে অনেক মূল্যবান মনে করতে পারত; কিন্তু এখানে ছিলেন আল্লাহর এমন এক বন্ধু যিনি আল্লাহর প্রতাপ ও মহিমা সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত। তিনি জানতেন, আল্লাহর উপযুক্ত ইবাদত ও আনুগত্য কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। তাই আমল যত বড়ই হোক সেজন্য অহংকার না করে কেঁদে কেঁদে এমনি দোয়া করা প্রয়োজন যে, হে পরওয়ারদেগার! আমার এ আমল কবুল কর। কা'বা গৃহ নির্মাণের আমল প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাই বলেছেন, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا হে পরওয়ারদেগার! আমাদের এ আমল কবুল করুন। কেননা, আপনি শ্রোতা, আপনি সর্বজ্ঞ।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ –এ দোয়াটিও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান ও খোদাভীতিরই ফল, আনুগত্যের অদ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করার পরও তিনি এরূপ দোয়া করেন যে, আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর। কারণ মা'রেফাত তথা আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান যার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে সে ততবেশি অনুভব করতে থাকে যে, যথার্থ আনুগত্য তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ – এ দোয়াতেও স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহর প্রেমিক, আল্লাহর পথে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিসর্জন দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত নন। তিনিও সন্তানদের প্রতি কতটুকু মহব্বত ও ভালোবাসা রাখেন। কিন্তু এই ভালোবাসার দাবিসমূহ কয়জন পূর্ণ করতে পারে? সাধারণ লোক সন্তানদের শুধু শারীরিক সুস্থতা ও আরামের দিকেই খেয়াল রাখে। তাদের যাবতীয় স্নেহ-মমতা এ দিকটিকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু আল্লার প্রিয় বান্দারা শারীরিকের চাইতে আত্মিক এবং জাগতিকের চাইতে পারলৌকিক আরামের জন্য চিন্তা করেন অধিক। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করলেন: "আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দলকে পূর্ণ আনুগত্যশীল কর।" সন্তানদের জন্য এ দোয়ার মধ্যে আরো একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে যারা গণ্য মান্য, তাদের সন্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাদের যোগ্যতা জনগণের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। –[বাহরে মুহীত]

হযরত খলীলুল্লাহ (আ.)-এর এ দোয়াটিও কবুল হয়েছে। তাঁর বংশধরের মধ্যে কখনো সত্যধর্মের অনুসারী ও আল্লাহর আজ্ঞাবহ আদর্শ পুরুষের অভাব হয়নি। জাহেলিয়াত আমলে আরবে যখন সর্বত্র মূর্তিপূজার জয়-জয়কার, তখনও ইবরাহীমের বংশধরের মধ্যে কিছু লোক একত্ববাদ ও পরকালে বিশ্বাসী এবং আল্লাহর আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন যায়েদ ইবনে আমর, ইবনে নওফল এবং কুস ইবনে সায়েদা প্রমুখ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, মূর্তিপূজার প্রতি তাঁরও অশ্রদ্ধা ছিল। –[বাহরে মুহীত]

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ –তেলাওয়াতের আসল অর্থ– অনুসরণ করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি কুরআন ও অন্যান্য আসমানি কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ যে লোক এসব কালাম পাঠ করে, এর অনুসরণ করাও তার অবশ্য কর্তব্য। আসমানি গ্রন্থ ঠিক যেভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, হুবহু তেমনিভাবে পাঠ করা জরুরি। নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোনো শব্দ অথবা স্বরচিহ্নটিও পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অনুমতি নেই। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন: "আল্লাহর কালাম ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ অথবা কালাম পাঠ করাকে সাধারণ পরিভাষায় তেলাওয়াত বলা যায় না।"

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ –এখানে কিতাব বলে আল্লাহর কিতাব বুঝানো হয়েছে। 'হিকমত' শব্দটি আরবি অভিধানে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা– সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি। –[কামুস]

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লিখেন : এ শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সকল বস্তুর পূর্ণজ্ঞান এবং সুদৃঢ় উদ্ভাবন। অন্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, বিদ্যমান বস্তুরসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎকর্ম। বিশুদ্ধ জ্ঞান, সৎকর্ম, ন্যায়, সত্য কথা ইত্যাদি। –[কামুস ও রাগেব]

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আয়াতে হেকমতের কি অর্থ? তাফসীরকার সাহাবীগগণ হুজুরে আকরাম ﷺ-এর কাছ থেকে শিখে কুরআনের ব্যাখ্যা করতেন। এখানে হেকমত শব্দের অর্থে তাঁদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোর মর্মই এক। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাহ। ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীর কাতাদাহ থেকে এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করেছেন। হেকমতের অর্থ কেউ কুরআনের তাফসীর, কেউ ধর্মে গভীর জ্ঞান, কেউ শরিয়তের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। নিঃসন্দেহে এসব উক্তির সারমর্ম হলো রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ।

وَيُزَكِّيهِمْ – زَكٰوةٌ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা। বাহ্যিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার পবিত্রতার অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ভবিষ্যত বংশধরের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন– যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের তেলাওয়াত করে শোনাবেন, কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা দিবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। দোয়ায় নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই পয়গম্বর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ প্রথমতঃ এই যে, এটা তাঁর সন্তানদের জন্য গৌরবের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের কল্যাণও নিহিত রয়েছে। কারণ স্বগোত্র থেকে পয়গম্বর হলে তাঁর চাল-চলন ও অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত থাকবে। ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা থাকবে না। হাদীসে বলা হয়েছে: প্রত্যুত্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয় যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে এবং কাঙ্ক্ষিত পয়গম্বরকে শেষ জমানায় প্রেরণ করা হবে।' –[ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য : মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ বলেন: 'আমি আল্লাহর কাছে তখনও পয়গম্বর ছিলাম, যখন হযরত আদম (আ.) ও পয়দা হননি; বরং তাঁর সৃষ্টির জন্য উপাদান তৈরি হচ্ছিল মাত্র। আমি আমার সূচনা বলে দিচ্ছি: আমি পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া, হযরত ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদ এবং স্বীয় জননীর স্বপ্নের প্রতীক। হযরত ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদের অর্থ তাঁর এ উক্তি وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ আমি এক পয়গম্বরের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তাঁর নাম আহমদ। তাঁর জননী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পেট থেকে একটি নুর বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদাসমূহ আলোকজ্জ্বল করে তুলেছে। কুরআনে হুজুর (সা.)-এর আবির্ভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে দু' জায়গায় সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪ তম আয়াতে এবং সূরা জুমায় ইবরাহীমের দোয়ায় উল্লিখিত ভাষারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যে পয়গম্বরের জন্য দোয়া করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ।

পয়গম্বর প্রেরণের অর্থ তিনটি : সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা আলে- ইমরান ও সূরা জুমার বিভিন্ন আয়াতে হুজুর ﷺ সম্পর্কে একই বিষয়বস্তু অভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে মহানবী ﷺ -এর পৃথিবীতে পদার্পণ ও তাঁর রেসালাতের তিনটি লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ কুরআন তেলাওয়াত, দ্বিতীয়তঃ আসমানি গ্রন্থ ও হেকমতের শিক্ষাদান এবং তৃতীয়তঃ মানুষের চরিত্রশুদ্ধি।

প্রথম উদ্দেশ্য কুরআন তেলাওয়াত : এখানে সর্বপ্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, তেলাওয়াতের সম্পর্ক শব্দের সাথে এবং শিক্ষাদানের সম্পর্ক অর্থের সাথে। তেলাওয়াত ও শিক্ষাদান পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়ার মর্মার্থ এই যে, কুরআনে অর্থসম্ভার যেমন উদ্দেশ্য, শব্দসম্ভারও তেমনি একটি লক্ষ্য। এসব শব্দের তেলাওয়াত ও হেফাজত ফরজ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এখানে আরো একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যাঁরা মহানবী ﷺ-এর প্রত্যক্ষ শিষ্য ও সম্বোধিত ছিলেন তাঁরা শুধু আরবি ভাষা সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল ছিলেন না; বরং অলঙ্কার পূর্ণ আরবি ভাষার একজন বাগ্মী কবিও ছিলেন।

তাঁদের সামনে কুরআন পাঠ করাই বাহ্যতঃ তাঁদের শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ছিল, পৃথকভাবে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এমতাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতকে পৃথক উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করার কি প্রয়োজন ছিল? অথচ কার্যক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্যই এক হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়। প্রথম এই যে, কুরআন অপরাপর গ্রন্থের মতো নয়– যাতে শুধু অর্থসম্ভারের উপর আমল করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং শব্দসম্ভার থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে; শব্দে সামান্য পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে গেলেও ক্ষতির কারণ মনে করা হয় না। অর্থ না বুঝে এসব গ্রন্থের শব্দ পাঠ করা একেবারেই নিরর্থক, কিন্তু কুরআন এমন নয়। কুরআনের শব্দের সাথে বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধান সম্পৃক্ত রয়েছে। ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে কুরআনের সংজ্ঞা এভাবে هُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ শব্দ সম্ভার ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমন্বিত গ্রন্থের নামই কুরআন। এতে বুঝা যায়, কুরআনের অর্থসম্ভারকে অন্য শব্দ অথবা অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে কুরআন বলা যাবে না, যদিও বিষয়বস্তু একেবারে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত হয়। কুরআনের বিষয়বস্তুকে পরিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে কেউ নামাজে পাঠ করলে তার নামাজ হবে না। এমনিভাবে কুরআন সম্পর্কিত অপরাপর বিধি-বিধান ও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। এ কারণেই ফিকহশাস্ত্রবিদগণ কুরআনের মূল শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ লিখতে ও মুদ্রিত করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ পরিভাষায় এ জাতীয় অনুবাদকে 'উর্দু কুরআন, বাংলা কুরআন অথবা ইংরেজি কুরআন' বলা হয়। কারণ ভাষান্তরিত কুরআন প্রকৃতপক্ষে কুরআন বলে কথিত হওয়ারই যোগ্য নয়।

অর্থ না বুঝে কুরআনের শব্দ পাঠ করা নিরর্থক নয়– ছওয়াবের কাজ :

একথা বলা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, অর্থ না বুঝে তোতাপাখীর মতো শব্দ পাঠ করা অর্থহীন। বিষয়টির প্রতি বিশেষ জোর দেওয়ার কারণ এই যে, আজকাল অনেকেই কুরআনকে অন্যান্য গ্রন্থের সাথে তুলনা করে মনে করে যে, অর্থ না বুঝে কোনো গ্রন্থের শব্দাবলি পড়া ও পড়ানো বৃথা কালক্ষেপণ বৈ কিছুই নয়। কুরআন সম্পর্কে তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, শব্দ ও অর্থ উভয়টির সমন্বিত আসমানি গ্রন্থের নামই কুরআন। কুরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার বিধি-বিধিন পালন করা যেমন ফরজ ও উচ্চস্তরের ইবাদত, তেমনিভাবে তার শব্দ তেলাওয়াত করাও একটি স্বতন্ত্র ইবাদত ও ছওয়াবের কাজ। কেননা মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ "কুরআন শরীফ তেলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত"।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গ্রন্থ শিক্ষাদান : রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত কারণেই তাঁরা শুধু অর্থ বুঝে ও তা বাস্তবায়ন করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি। বুঝা এবং আমল করার জন্য একবার পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁরা সারা জীবন কুরআন তেলাওয়াতকে 'অন্ধের যষ্টি' মনে করেছেন। কতক সাহাবী দৈনিক একবার কুরআন খতম করতেন, কেউ দু'দিনে এবং কেউ তিন দিনে কুরআন খতমে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে কুরআন খতম করার রীতি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কুরআনের সাত মনজিল এই সাপ্তাহিক তেলাওয়াত রীতিরই চিহ্ন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের এ কার্যধারাই যেমন ইবাদত, তেমনিভাবে শব্দ তেলাওয়াত করাও স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে একটি উচ্চস্তরের ইবাদত এবং বরকত, সৌভাগ্য ও মুক্তির উপায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তব্যসমূহের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যে মুসলমান আপাততঃ কুরআনের অর্থ বুঝে না, শব্দের ছওয়াব থেকেও বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে উচিত নয়। বরং অর্থ বুঝার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরি, যাতে কুরআনের সত্যিকারের নূর ও বরকত প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কুরআন অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। [মা'আযাল্লাহ] কুরআনকে তন্ত্র-মন্ত্র মনে করে শুধু ঝাড়-ফুঁকে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং আল্লামা ইকবালের ভাষায় 'সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে শুধু এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, এ সূরা পাঠ করলে মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মা সহজে নির্গত হয়।'

তৃতীয় উদ্দেশ্য পবিত্রকরণ : মহানবী ﷺ-এর তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে পবিত্রকরণ। এর অর্থ বাহ্যিক ও আত্মিক নাপাকী থেকে পবিত্র করা বাহ্যিক না-পাকী সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানরাও ওয়াকিফহাল। আত্মিক নাপাকী হচ্ছে কুফর, শিরক, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর পুরোপুরি ভরসা করা, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা দুনিয়া প্রীতি ইত্যাদি। কুরআন ও সুন্নাহতে

এসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পবিত্রকরণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো শাস্ত্র পুঁথিগতভাবে শিক্ষা করলেই তার প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জিত হয় না। প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জন করতে হলে গুরুজনের শিক্ষাধীনে থেকে তাঁর অনুশীলনের অভ্যাসও গড়ে তুলতে হয়। সুফীবাদে কামেল পীরের দায়িত্বও তাই। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অর্জিত শিক্ষাকে কার্যক্ষেত্রে অনুশীলন করে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করেন।

হেদায়েত ও সংশোধনের দু'টি ধারা : আল্লাহর গ্রন্থ ও রাসূল : এ প্রসঙ্গে আরো দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম এই যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির আদিকাল থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত মানুষের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য দু'টি ধারা অব্যাহত রেখেছেন। একটি খোদায়ী গ্রন্থসমূহের ধারা এবং অপরটি রাসূলগণের ধারা। আল্লাহ তা'আলা শুধু গ্রন্থ নাজিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেননি, তেমনি শুধু রাসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি; বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহ তা'আলা একটি বিরাট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা এই যে, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য শুধু গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নয়; বরং একদিকে খোদায়ী হেদায়েত ও খোদায়ী সংবিধানেরও প্রয়োজন, যাকে কুরআন বলা হয় এবং অপরদিকে একজন শিক্ষাগুরুরও প্রয়োজন, যিনি স্বীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খোদায়ী হেদায়েতে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। কোনো ফেরেশতা বা গ্রন্থ কখনো গুরু বা অভিভাবক হতে পারে না। তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সহায়ক অবশ্যই হতে পারে।

ইসলামের সূচনা একটি গ্রন্থ ও একজন রাসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ দু'য়ের সম্মিলিত শক্তিই জগতে একটি সুষ্ঠু ও উচ্চস্তরের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও একদিকে পবিত্র শরিয়ত ও অন্যদিকে কৃতি পুরুষগণ রয়েছেন। কুরআনও নানাস্থানে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে : 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।'

সমগ্র কুরআনের সারমর্ম হলো সূরা ফাতেহা। আর সূরা ফাতেহার সারমর্ম হলো সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত। এখানে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান দিতে গিয়ে কুরআনের পথ, রাসূলের পথ অথবা সুন্নাহর পথ বলার পরিবর্তে কিছু প্রভুভক্তের সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান জেনে নাও। বলা হয়েছে–

'সিরাতে মুস্তাকীম হলো তাদের পথ, যাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত বর্ষিত হয়েছে। তাদের পথ নয়, যারা গজবে পতিত ও গোমরাহ হয়েছে।' অন্য এক জায়গায় নিয়ামত প্রাপ্তদের আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

–এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও পরবর্তীকালের জন্য কিছুসংখ্যক লোকের নাম নির্দিষ্ট করে তাদের অুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন– তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে–

'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে– 'আমার পরে তোমরা আবূ বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে।' অন্য এক হাদীসে আছে, 'আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অবলম্বন করা তোমাদের কর্তব্য।'

মোটকথা, কুরআনের উপরিউক্ত নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা থেকে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের হেদায়েতের জন্য সর্বকালেই দু'টি বস্তু অপরিহার্য। ১. কুরআনের হেদায়েত এবং ২. তা হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে ও আমলের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শরিয়ত-বিশেষজ্ঞ ও আল্লাহ-ভক্তদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এ রীতি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার বেলাতেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে কোনো বিদ্যা ও শাস্ত্র নিখুঁতভাবে অর্জন করতে হলে এ রীতি অপরিহার্য। একদিকে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি থাকতে হবে এবং অন্যদিকে থাকতে হবে শাস্ত্রবিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। প্রত্যেক শাস্ত্রের উন্নতি ও পূর্ণতার এ দু'টি অবলম্বন থেকে উপকার লাভের ক্ষেত্রে বহু মানুষ ভুল পন্থার আশ্রয় নেয়; ফলে উপকারের পরিবর্তে অপকার এবং মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই ঘটে বেশি।

কেউ কেউ কুরআনে প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু ওলামা ও মাশায়েখকেই সবকিছু মনে করে বসে। তারা শরিয়তের অনুসারী কি না, তারও খোঁজ নেয় না। এ রোগটি আসলে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের থেকেই সংক্রামিত হয়েছে। কুরআন বলে– اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ অর্থাৎ, 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ওলামা ও মাশায়েখকে

স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।' এটা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরের রাস্তা। লক্ষ লক্ষ মানুষ এ রাস্তায় বের হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক রয়েছে; যারা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য কোনো উস্তাদ ও অভিভাবকের প্রয়োজনই মনে করে না। তারা বলে– 'আল্লাহর কিতাব কুরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট' এটাও আরেক পথভ্রষ্টতা। এর ফল হচ্ছে ধর্মচ্যুত হয়ে মানবীয় প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হওয়া। কেননা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ব্যতিরেকে শাস্ত্র অর্জন মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এরূপ ব্যক্তি অবশ্যই ভুল বুঝাবুঝির শিকারে পরিণত হয়। এ ভুল বুঝাবুঝি কোনো কোনো সময় তাকে ধর্মচ্যুতও করে দেয়।

কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ, 'আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজত করব।'

এ ওয়াদার ফলেই কুরআনের প্রতিটি যের ও যবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুন্নাহর ভাষা যদিও এভাবে সংরক্ষিত নয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সুন্নাহ এবং হাদীসও সংরক্ষিত রয়েছে। যখনই কোনো পক্ষ থেকে এতে কোনো বাধা সৃষ্টি অথবা মিথ্যা রেওয়ায়েত সংমিশ্রিত করা হয়েছে, তখনই হাদীস বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে এসেছেন এবং দুধ ও পানিকে পৃথক করে দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এ কর্মধারা অব্যাহত থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতে কিয়ামত পর্যন্ত সত্যপন্থি এমন একদল আলেম থাকবেন, যারা কুরআন ও হাদীসকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রাখবেন এবং সকল বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটাবেন।

মোটকথা, কুরআন বাস্তবায়নের জন্য রাসূলের শিক্ষা অপরিহার্য। কুরআনের বাস্তবায়ন কেয়ামত পর্যন্ত ফরজ। কাজেই রাসূলের শিক্ষাও কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা অবশ্যম্ভাবী। অতএব, উল্লিখিত আয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত রাসূলের শিক্ষা সংরক্ষিত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের জমানা থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একে হাদীস বিশারদ ওলামা ও বিশুদ্ধ গ্রন্থাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত রেখেছেন। সাম্প্রতিককালে কিছু লোক ইসলামি বিধি-বিধান থেকে গা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে একটি অজুহাত আবিষ্কার করেছে যে, হাদীসের বর্তমান ভাণ্ডার সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য নয়। উপরিউক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের ধর্মদ্রোহিতার স্বরূপই ফুটে উঠেছে। তাদের বুঝা উচিত যে, হাদীসের ভাণ্ডার থেকে আস্থা উঠে গেলে কুরআনের উপরও আস্থা রাখার উপায় থাকে না।

সংশোধনের নিমিত্ত বিশুদ্ধ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, চারিত্রিক প্রশিক্ষণও আবশ্যক : পবিত্রকরণকে একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে যে, শিক্ষা যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুরুব্বীর অধীনে কার্যতঃ প্রশিক্ষণ লাভ না করা পর্যন্ত শুধু শিক্ষা দ্বারাই চরিত্র সংশোধিত হয় না। কারণ শিক্ষার কাজ হলো প্রকৃতপক্ষে সরল ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন। এ কথা সুস্পষ্ট যে, পথ জানা থাকাই গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য যথেষ্ট নয়। এ জন্য সাহস করে পা বাড়াতে হবে এবং চলতেও হবে। সাহসী বুজুর্গদের সংসর্গ ও আনুগত্য ছাড়া সাহস অর্জিত হয় না। যে সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শিক্ষা অর্জন করেছেন, শিক্ষার সাথে সাথে তাঁদের আত্মিক পরিশুদ্ধিও সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে তাঁর প্রশিক্ষণাধীনে সাহাবীগণের যে একটি দল তৈরি হয়েছিল, একদিকে তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির গভীরতা ছিল বিস্ময়কর, বিশ্বের দর্শন তাঁদের সামনে হার মেনেছিল এবং অন্যদিকে তাঁদের আত্মিক পবিত্রতা, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং আল্লাহর উপর ভরসাও ছিল অভাবনীয়। স্বয়ং কুরআন তাদের প্রশংসায় বলে– وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

'যারা পয়গম্বরের সঙ্গে রয়েছে, তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর সদয়। তুমি তাদের রুকূ'-সেজদা করতে দেখবে। তারা আল্লাহর কৃপা ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।' –[সূরা ফাতাহ : ২৯]

এ কারণেই তাঁরা যে দিকে পা বাড়াতেন, সাফল্য ও কৃতকার্যতা তাঁদের পদচুম্বন করত এবং আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন তাঁদের সাথে থাকত। তাঁদের বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ আজও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার মস্তিষ্ককে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। বলাবাহুল্য, এগুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই ফল। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের চিন্তা সবাই করেন। কিন্তু শিক্ষার প্রাণ সংশোধনের দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষক ও শিক্ষাগুরুর চারিত্রিক সংশোধন এবং সংস্কারক সুলভ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয় না। ফলে হাজারো চেষ্টা যত্নের পরও এমন কৃতি পুরুষের সৃষ্টি হয় না, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বলিষ্ঠতা অন্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং অন্যকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষকবর্গ যে ধরনের জ্ঞানগরিমা ও চরিত্রের অধিকারী হবেন, তাদের শিক্ষাধীন ছাত্রসমাজও বেশির চেয়ে বেশি তাদের মতোই হতে পারবে। এ কারণে শিক্ষাকে কল্যাণকর ও উন্নত করতে হলে পাঠ্যসূচির পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চাইতে শিক্ষকদের শিক্ষাগত, কর্মগত ও চরিত্রগত অবস্থার প্রতি অধিক নজর দেওয়া আবশ্যক।

এ পর্যন্ত নবুয়ত ও রিসালাতের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হলো। পরিশেষে সংক্ষেপে আরো জানা প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অর্পিত তিনটি কর্তব্য তিনি কতদুর বাস্তবায়িত করেছেন, এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য কতটুকু হয়েছে? এর জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তাঁর তিরোধানের সময় সমগ্র আরব উপত্যকার ঘরে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত হতো। হাজার হাজার হাফেজ ছিলেন। শত শত লোক দৈনিক অথবা প্রতি তৃতীয় দিনে কুরআন খতম করতেন। কুরআন ও হিকমত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল প্রচুর।

বিশ্বের সমগ্র দর্শন কুরআনের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃত সংকলনসমূহ গল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল, কিন্তু কুরআনের নীতিমালাকে সম্মান ও শিষ্টাচারের মানদণ্ড গণ্য করা হতো। অপরদিকে 'তাযকিয়া' তথা পবিত্রকরণ ও চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এককালের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরাও চরিত্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ গুরুর আসনে আসীন হয়েছিলেন। চরিত্রহীনতার রোগীরা শুধু রোগমুক্তই হয়নি, সফল চিকিৎসকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। যারা দস্যু ছিল তারা পথপ্রদর্শক হয়ে গেল। মূর্তিপূজারীরা মূর্তমান ত্যাগ ও সহানুভূতি হয়ে গিয়েছিল। কঠোরতা ও যুদ্ধলিপ্সার স্থলে নম্রতা ও পারস্পরিক শান্তি বিরাজমান ছিল। এক সময় ডাকাতিই যাদের পেশা ছিল, তারাই মানুষের ধন-সম্পদের রক্ষকে পরিণত হয়েছিল।

মোটকথা, হযরত খলীলুল্লাহ (আ.)-এর দোয়ার ফলে যে তিনটি কর্তব্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অর্পিত হয়েছিল, তাতে তিনি স্বীয় জীবদ্দশায়ই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সহচরগণ এগুলোকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে তথা সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে সন্তানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের প্রতি পয়গম্বরগণের বিশেষ মনোযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত আয়াতে ইবরাহীমী দীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর দৌলতেই ইহকাল ও পরকালে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মান লাভের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এ ধর্ম থেকে বিমুখ হয়, সে নির্বোধদের স্বর্গে বাস করে।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ অর্থাৎ ইবরাহীমী ধর্ম থেকে সে ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, যার বিন্দুমাত্রও বোধশক্তি নেই। কারণ, এ ধর্মটি হুবহু স্বভাব-ধর্ম। কোনো সুস্থস্বভাব ব্যক্তি এ ধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না। পরবর্তী আয়াতে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এতেই এ ধর্মের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এ ধর্মের দৌলতেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ইহকালে সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং পরকালেও। ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্য সারা বিশ্বই প্রত্যক্ষ করেছে। নমরূদের মতো পরাক্রমশালী সম্রাট ও তার পরিষদবর্গ একা এই মহাপুরুষের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, ক্ষমতার যাবতীয় কলা-কৌশল তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে এবং সর্বশেষ ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে তাঁকে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু জগতের যাবতীয় উপাদান ও পরিকল্পনাকে ধুলিস্মাৎ করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা প্রচণ্ড আগুনকেও তাঁর বন্ধুর জন্য পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে দিলেন। ফলে বিশ্বের সমগ্র জাতি তাঁর অপরিসীম মাহাত্ম্যের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হলো। বিশ্বের সমস্ত মুমিন ও কাফের, এমনকি পৌত্তলিকেরাও এ মূর্তিসংহারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। আরবের মুশরিকরা আর যাই হোক, হযরত ইবরাহীমেরই সন্তান-সন্ততি ছিল। এ কারণে মূর্তিপূজা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মান ও মাহাত্ম্য মনে-প্রাণে স্বীকার করত এবং তাঁরই ধর্ম অনুসরণের দাবি করত। ইবরাহীমী ধর্মের কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন তাদের কাজে কর্মেও বিদ্যমান ছিল। হজ, ওমরা, কুরবানি ও অতিথি পরায়ণতা এ ধর্মেরই নিদর্শন। তবে তাদের মূর্খতার কারণে এগুলো বিকৃত হয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, এটা ঐ নিয়ামতেরই ফলশ্রুতি– যার দরুন খলীলুল্লাহ (আ.)-কে 'মানব নেতা' উপাধি দেওয়া হয়েছিল– اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

হযরত ইবরাহীম (আ.)ও তাঁর ধর্মের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য ছাড়াও এ ধর্মের জনপ্রিয়তা ও স্বভাবধর্ম হওয়ার বিষয়টি সারা দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত হয়ে গেছে। ফলে যার মধ্যে এতটুকুও বোধশক্তি ছিল, সে এ ধর্মের সামনে মাথা নত করেছিল। এই ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। পারলৌকিক ব্যাপারটি আমাদের সামনে উপস্থিত নেই, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)এর মর্যাদা কুরআনের সে আয়াতেই ফুটে উঠেছে, যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইহকালে তাঁকে যেমন সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তেমনি পরকালেও তাঁর উচ্চাসন নির্ধারিত রয়েছে।

ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতি আল্লাহর আনুগত্য শুধু মাত্র ইসলামেই সীমাবদ্ধ : অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে ইবরাহীমী ধর্মের ইবরাহীমী মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে- إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ

অর্থাৎ, 'ইবরাহীম (আ.) কে যখন তাঁর পালনকর্তা বললেন, আনুগত্য অবলম্বন কর, তখন তিনি বললেন, আমি বিশ্বপ্রতিপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম।' এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলার أَسْلِمْ আনুগত্য অবলম্বন কর। সম্বোধনের উত্তরে সম্বোধনের ভঙ্গিতে أَسْلَمْتُ لَكَ [আমি আপনার আনুগত্য অবলম্বন করলাম] বলা যেত, কিন্তু হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) এ ভঙ্গি ত্যাগ করে বলেছেন, أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ অর্থাৎ, আমি বিশ্বপ্রতিপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। কারণ প্রথমতঃ এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারো প্রতি অনুগ্রহ করিনি; বরং এমন করাই ছিল আমার জন্য অপরিহার্য। কারণ তিনি রাব্বুল আলামীন তথা সারা জাহানের পালনকর্তা। তাঁর আনুগত্য না করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোনোই গত্যন্তর নেই। যে আনুগত্য অবলম্বন করে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরো জানা যায় যে, ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতির যথার্থ স্বরূপ ও এক 'ইসলাম' শব্দের মধ্যেই নিহিত- যার অর্থ আল্লাহর আনুগত্য। ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের সারমর্মও তাই। ঐসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর এ দোস্ত মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌছেছেন। ইসলাম তথা আল্লাহর আনুগত্যের খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি। এরই জন্য পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানি গ্রন্থসমূহ নাজিল করা হয়েছে। এতে আরো বুঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রাসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহ্বান করেছেন এবং তাঁরা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। কুরআন স্পষ্টভাষায় বলেছে-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

'ইসলামই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম'। 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মান্বেষণ করে, তার পক্ষ থেকে তা কখনো কবুল করা হবে না'।

জগতে পয়গম্বরগণ যত ধর্ম এনেছেন, নিজ নিজ সময়ে সে সবই আল্লাহর কাছে মকবুল ছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে সেসব ধর্মও ছিল ইসলাম- যদিও সেগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। যেমন, হযরত মূসা (আ.)-এর ধম, হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্ম, তথা ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু সবগুলো সরূপ ছিল ইসলাম, যার মর্ম আল্লাহর আনুগত্য। তবে এ ব্যাপারে ইবরাহীমী ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজ ধর্মের নাম 'ইসলাম' রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমা' নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন-

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ অর্থাৎ, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উভয়কে [ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে] মুসলিম [অর্থাৎ, আনুগত্যশীল] কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও এক দলকে আনুগত্যকারী কর।' হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সন্তানদের প্রতি অসিয়ত প্রসঙ্গে বলেছেন- فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 'তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া অন্য ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো না।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁরই প্রস্তাবক্রমে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলমান'। এ উম্মতের ধর্মও 'মিল্লাতে ইসলামিয়াহ' নামে অভিহিত। কুরআনে বলা হয়েছে- مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا 'এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই ইতঃপূর্বে তোমাদের 'মুসলমান' নামকরণ করেছেন এবং এতেও [অর্থাৎ কুরআনেও] এ নামই রাখা হয়েছে।'

ধর্মের কথা বলতে গিয়ে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং আরবের মুশরিকরাও বলে যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা অথবা মিথ্যা দাবি মাত্র। বাস্তবে মুহাম্মদী ধর্মই শেষ যমানায় ইবরাহীমী ধর্ম তথা স্বভাব-ধর্মের অনুরূপ।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, এবং যত আসমানি গ্রন্থ ও শরিয়ত অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা, আল্লাহর আনুগত্য। এ আনুগত্যের সারমর্ম হলো রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হেদায়েতের অনুসরণ করা।

পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা ধর্মের নামেও স্বীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে চায়। কুরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা শরিয়তের পরিচ্ছদকে টেনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের কামনার মূর্তিতে পরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে— যাতে বাহ্যদৃষ্টিতে শরিয়তেরই অনুসরণ করছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ।

গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিকে প্রতারিত করা গেলেও স্রষ্টাকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়; তাঁর জ্ঞান প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদকে পর্যন্ত দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে খাঁটি আনুগত্য ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণীয় নয়।

এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইবরাহীমের ধর্ম বলুন, আর ইসলামই বলুন, তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে যে বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম ও ইয়াকূব (আ.) কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ অসিয়তের মাধ্যমে স্বীয় সন্তানদেরকে যে ইসলামে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ কি?

উত্তর এই যে, এতে বুঝা যায় যে, সন্তানের ভালোবাসা ও মঙ্গলচিন্তা রেসালাত এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থি নয়। আল্লাহর বন্ধু যিনি এক সময় পালনকর্তার ইঙ্গিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কুরবানি করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তাঁর পালনকর্তার দরবারে দোয়াও করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে চান, যা তাঁর দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নিয়ামত অর্থাৎ, ইসলাম। উল্লিখিত আয়াত وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ আর আয়াত اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ এর সারমর্মও তাই। পার্থক্য এতটুকু যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নিয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার ধ্বংসশীল ও নিকৃষ্ট বস্তু নিশ্চয়। অথচ পয়গম্বরগণের দৃষ্টি অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের কাছে প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম।

সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়। আজকাল একজন বিত্তশালী কামনা করে, তার সন্তান মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানি ও রফতানীর বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকুরীজীবী চায়, তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকুরী করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে কামনা করে, তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে স্তানকে সারা জীবনে অভিজ্ঞতালব্ধ কলা-কৌশল বলে দিতে চায়।

এমনিভাবে পয়গম্বর এবং তাঁদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বস্তুকে তাঁরা সত্যিকার চিরস্থায়ী এবং অক্ষয় সম্পদ মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। এজন্যই তাঁরা দোয়া করেন এবং চেষ্টাও করেন। অন্তিম সময়ে এরই জন্য অসিয়ত করেন।

ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা, সন্তানের জন্য বড় সম্পদ : পয়গম্বরগণের এই বিশেষণ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে; বরং তার চাইতেও বেশি তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকার ভালোবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আজাবের কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাঁটা বের করার জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা করবে না।

পয়গম্বরদের কর্মপদ্ধতি থেকে আরো একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গল চিন্তা করা এবং এর পর অন্য দিকে মনেযোগ দেওয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। পিতা-মাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দু'টি রহস্য নিহিত রয়েছে– প্রথমতঃ প্রকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে তারা পিতা-মাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতামাতার সাহায্যকারী হতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ এটাই সত্য প্রচারের সবচেয়ে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এভাবে সত্য প্রচার ও সত্য শিক্ষার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে পরিবারের লোকজনের শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জাতিরও শিক্ষা হয়ে যায়। এ সংগঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কুরআন বলে– يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

'হে মুমিনগণ! নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।'

মহানবী ﷺ ছিলেন সারা বিশ্বের রাসূল। তাঁর হেদায়েত কিয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য ব্যাপক। তাঁকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ, নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন : আরো বলা হয়েছে– وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ, পরিবার-পরিজনকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজেও নামাজ অব্যাহত রাখুন। মহানবী ﷺ ও সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন।

তৃতীয়তঃ আরো একটি রহস্য এই যে, কোনো মতবাদ ও কর্মসূচিতে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী ﷺ -এর প্রচারকার্যের জওয়াবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ পরিবার কোরায়েশকে ঠিক করে নিন; এরপর আমাদের কাছে আসুন। হুজুর ﷺ -এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কুরআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ পেল– يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا অর্থাৎ, মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে।

আজকাল ধর্মহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, পিতামাতা ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী ও ধার্মিক হলেও সন্তানদের ধার্মিক হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন, যাতে আমরা আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের জন্য ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হই।

বাপ-দাদার কৃতকর্মের ফলাফল সন্তানরা ভোগ করবে না : لَهَا مَا كَسَبَتْ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আসে না– যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, যদি তারা সৎকর্মশীল হয়। এতে বুঝা যায় যে, মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সাবালক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে পিতা-মাতার কুফর ও শিরকের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করবে না। এতে ইহুদিদের সে দাবিও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় যে, আমরা যা ইচ্ছা তা'ই করব, আমাদের বাপ-দাদার সৎকর্মের দ্বারাই আমাদের মাগফেরাত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তব তা নয়।

কুরআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে:

'প্রত্যেকের আমলের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।' অন্য এক আয়াতে আছে– 'কিয়ামতের দিন একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "হে বনী হাশেম! এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক নিজ নিজ সৎকর্ম নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে সৎকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব নিয়ে এবং আমি বলব যে, আল্লাহর আজাব থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না। অন্য এক হাদীসে আছে "আমল যাকে পিছনে ফেলে দেয়, বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না।"

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْقَوَاعِدَ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে قاعدة অর্থ- প্রাচীর ।

تَقَبَّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّقَبُّلُ মূলবর্ণ (ق . ب . ل) জিনসে صحيح অর্থ তুমি কবুল কর ।

اَرِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِرَائَةُ মূলবর্ণ (ر . ا . ى) জিনসে মোরাক্কাব, مهموز عين، ناقص يائى অর্থ- আমাদেরকে দেখিয়ে দিন [শিখিয়ে দিন]

اِبْعَثْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبَعْثُ মূলবর্ণ (ب . ع . ث) জিনসে صحيح অর্থ- তুমি পাঠাও ।

اصْطَفَيْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِصْطِفَاءُ মূলবর্ণ (ص . ف . و) জিনসে ناقص واوى অর্থ- আমরা নির্বাচিত করেছি ।

لَا تَمُوْتُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م . و . ت) জিনসে اجوف واوى অর্থ- তোমরা মরো না ।

شُهَدَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন شَهِيْدٌ অর্থ- উপস্থিত, বিদ্যমান ।

كَسَبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَسْبُ মূলবর্ণ (ك . س . ب) জিনসে صحيح অর্থ- সে আমল করল ।

لَا تُسْئَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س . أ . ل) জিনসে مهموز عين অর্থ- তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর كَ হলো اسم এবং اَنْتَ হলো যমীরে فاصل আর السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ হলো اِنَّ এর خبر এভাবে ان স্বীয় اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে ।

قوله وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ : এখানে اِبْعَثْ হলো فعل ও اَنْتَ যমীর فاعل আর فِيْهِمْ হলো জার মাজরূর হয়ে متعلق আর رَسُوْلً হলো مفعول অতএব, فعل - فاعل - مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে ।

قوله وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ : এখানে يُعَلِّمُ হলো ফে'ল ও هُوَ যমীর فاعل আর هُمْ যমীর مفعول এবং اَلْكِتَابَ হলো مفعول ثانى অতএব, فعل , فاعل ও উভয় مفعول মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে ।

قوله اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : এখানে اَسْلَمْتُ ফে'ল ও ফা'য়েল আর ل হলো حرف جار এবং رب হলো مضاف ও العلمين হলো مضاف اليه অতঃপর مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবং جار ও مجرور মিলে متعلق হলো অতঃপর فعل . فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে ।

قوله وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ : এখানে اَنْتُمْ হলো مبتدأ আর مُسْلِمُوْنَ হলো خبر হয়েছে । مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৩৫) আর তারা বলে, তোমরা ইহুদি হও কিংবা নাসারা হও, তোমরাও সৎপথ পাবে, আপনি বলুন, আমরা তো ইবরাহীমী ধর্মের উপর থাকব যাতে বক্রতার নামও নেই; আর ইবরাহীম মুশরিকও ছিলেন না।	وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٣٥)
(১৩৬) [হে মুসলমনাগণ!] বলে দাও যে, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি আর যা আমাদের প্রতি অবতারিত হয়েছে, আর তার [বিধানের] প্রতিও যা নাজিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং তাঁর আওলাদের প্রতি, আর তার প্রতিও যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছে, আর তার উপরও যা অন্যান্য নবীগণকে প্রদান করা হয়েছে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে, এভাবে যে, আমরা তাদের মধ্যে কাউকেও কোনো পার্থক্য করি না, এবং আমরা আল্লাহর অনুগত।	قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (١٣٦)
(১৩৭) অতঃপর তারাও যদি ঐরূপ ঈমান আনে যেরূপ তোমরা এনেছ, তবে তারাও সঠিক পথ পাবে, আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা তো বিরোধিতায় লেগেই আছে, তবে শীঘ্রই আল্লাহ আপনার পক্ষ হতে তাদের সাথে পূর্ণ বুঝাপড়া করবেন, আর আল্লাহ শুনতেছেন, জানতেছেন।	فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١٣٧)

শাব্দিক অনুবাদ

১৩৫. وَقَالُوْا আর তারা বলে كُوْنُوْا তোমরা হও هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ইহুদি কিংবা নাসারা تَهْتَدُوْا তোমরাও সৎপথ পাবে قُلْ আপনি বলুন بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ বরং আমরাই তো ইবরাহীমী ধর্মের উপর থাকব حَنِيْفًا যাতে বক্রতার নামও নেই وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আর ইবরাহীম মুশরিকও ছিলেন না।

১৩৫. قُوْلُوْٓا [হে মুসলমনাগণ!] বলে দাও যে, اٰمَنَّا بِاللّٰهِ আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا আর যা আমাদের প্রতি অবতারিত হয়েছে وَمَآ اُنْزِلَ আর. তার [বিধানের] প্রতিও যা নাজিল হয়েছে اِلٰٓى প্রতি اِبْرٰهٖمَ ইবরাহীম وَاِسْمٰعِيْلَ ইসমাঈল وَاِسْحٰقَ ইসহাক وَيَعْقُوْبَ ইয়াকূব وَالْاَسْبَاطِ এবং তাঁর আওলাদের وَمَآ اُوْتِىَ আর তার প্রতিও যা প্রদান করা হয়েছে مُوْسٰى وَعِيْسٰى মূসা ও ঈসাকে وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ আর তার উপরও যা অন্যান্য নবীগণকে প্রদান করা হয়েছে مِنْ رَّبِّهِمْ তাঁদের রবের তরফ হতে لَا نُفَرِّقُ এভাবে যে, আমরা কোনো পার্থক্য করি না بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ তাদের মধ্যে কাউকেও وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ এবং আমরা আল্লাহর অনুগত।

১৩৭. فَاِنْ اٰمَنُوْا অতঃপর তারাও যদি ঐরূপ ঈমান আনে بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ فَقَدِ اهْتَدَوْا তবে তারাও সঠিক পথ পাবে। وَاِنْ تَوَلَّوْا আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ তবে তারা তো বিরোধিতায় লেগেই আছে فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ তবে শীঘ্রই আল্লাহ আপনার পক্ষ হতে তাদের সাথে পূর্ণ বুঝাপড়া করবেন وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ আর আল্লাহ শুনতেছেন, জানতেছেন।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ (١٣٨)

(১৩৮) আমরা সেই রঙ্গেই থাকব যে রঙ্গে আল্লাহ তা'আলা রঞ্জিত করেছেন, আর এমন কে আছে যার রঞ্জন আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সুন্দর হবে? আর আমরা তাঁরই দাসত্বে দৃঢ় আছি।

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ (١٣٩)

(১৩৯) আপনি বলুন, তোমরা কি তর্ক জুড়েছ আমাদের সাথে আল্লাহর সম্বন্ধে? অথচ তিনি আমাদেরও প্রভু, তোমাদেরও প্রভু, আর আমরা পাব আমাদের কর্মফল এবং তোমরা পাবে তোমাদের কর্মফল, আর আমরা শুধু আল্লাহর জন্য নিজেদেরকে খাঁটি করে রেখেছি।

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (١٤٠)

(১৪০) অথবা তোমরা কি বলছ যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং ইয়াকূবের বংশধর ইহুদি বা নাসারা ছিলেন? আপনি বলে দিন, তোমরাই কি অধিক ওয়াকিফ, না আল্লাহ? আর কে হবে অধিক জালেম সেই ব্যাক্তি হতে যে গোপন করে আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য : আর আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে বে-খবর নন।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٤١)

(১৪১) তা ছিল একটি জামাত, যা অতীত হয়েছে, তাদের কৃত-কর্ম তাদের কাজে আসবে এবং তোমাদের কৃত-কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। আর তাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিতও হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

১৩৮. صِبْغَةَ اللّٰهِ আমরা সেই রঙ্গেই থাকব যে রঙ্গে আল্লাহ তা'আলা রঞ্জিত করেছেন وَمَنْ اَحْسَنُ আর এমন কে আছে অধিক সুন্দর হবে? مِنَ اللّٰهِ আল্লাহ অপেক্ষা صِبْغَةً রাঙ্গানোর বেলায় وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ আর আমরা তাঁরই দাসত্বে দৃঢ় আছি।

১৩৯. قُلْ আপনি বলুন اَتُحَآجُّوْنَنَا তোমরা কি তর্ক জুড়েছ আমাদের সাথে فِى اللّٰهِ আল্লাহর সম্বন্ধে? وَهُوَ رَبُّنَا অথচ তিনি আমাদেরও প্রভু وَرَبُّكُمْ আর তোমাদেরও প্রভু وَلَنَآ اَعْمَالُنَا আর আমরা পাব আমাদের কর্মফল وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ এবং তোমরা পাবে তোমাদের কর্মফল وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ আর আমরা শুধু আল্লাহর জন্য নিজেদেরকে খাঁটি করে রেখেছি।

১৪০. اَمْ تَقُوْلُوْنَ অথবা তোমরা কি বলছ যে, اِنَّ اِبْرٰهٖمَ ইবরাহীম وَاِسْمٰعِيْلَ ইসমাঈল وَاِسْحٰقَ ইসহাক وَيَعْقُوْبَ ইয়াকূব وَالْاَسْبَاطَ এবং ইয়াকূবের বংশধর كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ইহুদি বা নাসারা ছিলেন? قُلْ আপনি বলে দিন ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ তোমরাই কি অধিক ওয়াকিফ اَمِ اللّٰهُ না আল্লাহ? وَمَنْ اَظْلَمُ আর কে হবে অধিক জালেম مِمَّنْ كَتَمَ সেই ব্যাক্তি হতে যে গোপন করে شَهَادَةً সাক্ষ্য عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত: وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আর আল্লাহ বে-খবর নন عَمَّا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে।

১৪১. تِلْكَ اُمَّةٌ তা ছিল একটি জামাত قَدْ خَلَتْ যা অতীত হয়েছে لَهَا مَا كَسَبَتْ তাদের কৃত-কর্ম তাদের কাজে আসবে وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ এবং তোমাদের কৃত-কর্ম তোমাদের কাজে আসবে وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ আর তোমরা জিজ্ঞাসিতও হবে না। عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৩৫) قوله وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** প্রচলিত ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মে শিরক থাকায় তা গ্রহণ যোগ্য নয়। অথচ তারা মিল্লাতে ইব্রাহীম পালনীয় খৎনা, হজ ইত্যাকার কোনো কোনো কাজ করার কারণে নিজেদেরকে মিল্লাতে ইব্রাহীম অনুসারী বলে মনে করত। তেমনিভাবে মুশরিকরাও এ ধরনের কিছু কাজের জন্য নিজেদের ইব্রাহীম (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার দাবি করত। তাই ইহুদি ও নাসারাদের সাথে আরব মুশরিকদেরও প্রতিবাদে বলা হলো তোমাদেরও হযরত ইব্রাহীমের মধ্যে যখন শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য রয়েছে। তখন কেবল কোনো কোনো আনুষ্ঠানিক কার্য পালন করেই তোমরা কি মিল্লাতে ইব্রাহীমের দাবি করতে পার? এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়।

(১৩৮) قوله صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** খ্রিস্টানরা পুত্র– সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিবসে হলুদ বর্ণের পানিতে গোসল করায়। একে তারা বাপ্তাইজম বা বাপ্তাইষ্ট করা বলে। আর বলে সে এবার খাঁটি খ্রিস্টান হয়ে গেছে। খ্রিস্টানদের ঐ কুসংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে অনুষ্ঠানের যথার্থতা কি? কারো যদি রং ধারণ করতে হয়, তবে সে যেন আল্লাহর রং ধারণ করে। এ ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১৩৯) قوله قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইহুদিরা মুসলমানগণকে বলত যে, আমরা প্রথম আহলে কিতাব, আমাদের কিবলাও তোমাদের কিবলা হতে পূর্বের। অতএব, বনী ইসরাঈল ব্যতীত আরবদের মধ্য হতে কোনো নবী হতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ ﷺ যদি নবী হতেন, তবে আমাদের মধ্য হতেই হতেন। তাদের উল্লিখিত ধারণা বাতিল করার জন্য উল্লিখিত আয়াতটি নাজিল হয়।

কুরআন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধরকে أَسْبَاط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এটা سِبْط -এর বহুবচন। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের سِبْط বলার কারণ এই যে, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ঔরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল বার জন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে মিসরে যান, তখন সন্তান ছিল বার জন। পরে ফেরাউনের সাথে মোকাবিলার পর হযরত মূসা (আ.) যখন মিসর থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে বের হলেন, তখন তাঁর সাথে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান দ্বারা হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে একটি গোত্র ছিল। তাঁর বংশে আল্লাহ তা'আলা আরো একটি বরকত দান করেছেন এই যে, দশজন নবী ছাড়া সব নবী ও রাসূল হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধরের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছেন। বনী ইসরাঈল ছাড়া অবশিষ্ট পয়গম্বরগণ হলেন, হযরত আদম (আ.)–এর পর হযরত নূহ, শোয়াইব, হূদ, সালেহ, লূত, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, ইসমাঈল, ও মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ (যদি তারা তদ্রূপ ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ) সূরা বাকরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ঈমানের স্বরূপ কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। কেননা, 'তোমরা ঈমান এনেছ' বাক্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতে তাঁদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -আর সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এর ব্যাখ্যা এই যে, যে সব বিষয়ের উপর তাঁরা ঈমান এনেছেন, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারবে না। তাঁরা যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছেন, তাতেও প্রভেদ থাকতে পারবে না। নিষ্ঠায় পার্থক্য হলে তা 'নিফাক' তথা কপট বিশ্বাসে পর্যবসিত হবে। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ফেরেশতা, নবী রাসূল, আল্লাহর কিতাব ও এ সবের শিক্ষা

সম্বন্ধে যে ঈমান ও বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ অবলম্বন করেছেন, একমাত্র তাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। এ সবের বিপরীত ব্যাখ্যা করা অথবা ভিন্ন অর্থ নেওয়া আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ফেরেশতা ও নবী রাসূগণের যে মর্তবা, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত হয়েছে, তা হ্রাস করা অথবা বাড়িয়ে দেওয়াও ঈমানের পরিপন্থি।

এ ব্যাখ্যার ফলে কতিপয় ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঈমানের ত্রুটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা ঈমানের দাবিদার, কিন্তু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঈমানের মৌখিক দাবি মূর্তিপূজক, মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টানরাও করত এবং প্রতিটি যুগে ধর্মভ্রষ্ট বিপথগামীরাও করেছে। যেহেতু আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, কিয়ামত-দিবস ইত্যাদির প্রতি তাদের ঈমান তেমন নয়, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঈমান, এ কারণে আল্লাহর কাছে তা ধিকৃত ও গ্রহণের অযোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়।

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কোনো কোনো দল পয়গম্বরদের অবাধ্যতা করেছে। এমনকি কোনো কোনো পয়গম্বরকে হত্যাও করেছে। পক্ষান্তরে কোনো কোনো দল পয়গম্বরদের সম্মান ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি করতে গিয়ে তাঁদেরকে 'আল্লাহ' অথবা 'আল্লাহর পুত্র' অথবা আল্লাহর সমপর্যায়ে নিয়ে স্থাপন করেছে। এ উভয় প্রকার ত্রুটি ও বাড়াবাড়িকেই পথভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা হয়েছে– بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ আয়াতে।

ইসলামি শরিয়তে রাসূলের মহত্ত্ব ও ভালোবাসা ফরজ তথা অপরিহার্য কর্তব্য। এর অবর্তমানে ঈমানই শুদ্ধ হয় না। কিন্তু রাসূলকে ইলম, কুদরত ইত্যাদি গুণে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা একান্তই পথভ্রষ্টতা ও শিরক। আজকাল কোনো কোনো মুসলমান রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আলেমুল-গায়েব' 'আল্লাহর মতোই সর্বত্র বিরাজমান' 'উপস্থিত ও দর্শক' [হাজির ও নাজির] বলেও বিশ্বাস করে। তারা মনে করে যে, এভাবে তারা মহানবী ﷺ-এর মহত্ত্ব ও মহব্বত ফুটিয়ে তুলছে। অথচ এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে ও আজীবন সাধনার প্রকাশ্য বিরোধিতা। আলোচ্য আয়াতে এসব মুসলমানের জন্যও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহর কাছে মহানবী (সা.)-এর মহত্ত্ব ও মহব্বত এতটুকু কাম্য যতটুকু সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে তাঁর প্রতি ছিল। এতে ত্রুটি করাও অপরাধ এবং একে বাড়িয়ে দেওয়াও বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা।

নবী ও রাসূলের যেকোনো রকম মনগড়া প্রকারভেদই পথভ্রষ্টতা : এমনিভাবে কোনো কোনো সম্প্রদায় খতমে নবুয়ত অস্বীকার করে নতুন নবীর আগমনের পথ খুলে দিতে চেয়েছে। তারা কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা 'খাতামুন্নাবিয়্যিন' [সর্বশেষ নবী]-কে উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে নবী ও রাসূলের অনেক মনগড়া প্রকার আবিষ্কার করেছে। এসব প্রকারের নাম রেখেছে 'নবী-যিল্লী' [ছায়া-নবী] 'নবী-বুরুযী' [প্রকাশ্য নবী] ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতটি তাদের অবিমৃশ্যকারিতা ও পথভ্রষ্টতার মুখোশটিকেও উন্মোচিত করে দিয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ রাসূলগণের উপর যে ঈমান এনেছেন, তাতে 'যিল্লী-বুরুযী' বলে কোনো নাম-গন্ধও নেই। সুতরাং এটা পরিষ্কার ধর্মদ্রোহিতা।

আখেরাতের উপর ঈমান সম্পর্কে কোনো অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় : কিছুসংখ্যক লোকের মস্তিষ্ক ও চিন্তা-ভাবনা শুধু বস্তু ও বস্তুবাচক বিষয়াদির মধ্যেই নিমজ্জিত। অদৃশ্যজগত ও পরজগতের বিষয়াদি তাদের মতে অবান্তর ও অযৌক্তিক। তারা এসব ব্যাপারে নিজে থেকে নানাবিধ ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয় এবং একে দীনের খেদমত বলে মনে করে। তারা এসব জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে দিয়েছে বলে মনে করে গর্বও করে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ উক্তির পরিপন্থি হওয়ার কারণে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। আখেরাতের অবস্থা ও ঘটনাবলি কুরআন ও হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, বিনা দ্বিধায় ও বিনা ব্যাখ্যায় তা বিশ্বাস করাই প্রকৃতপক্ষে ঈমান। হাশরের দিন পুনরুত্থানের পরিবর্তে আত্মিক পুণরুত্থান স্বীকার করা এবং আজাব, ছওয়াব, আমল, ওজন ইত্যাদি বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বর্ণনা করা সবই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ।

ইখলাসের তাৎপর্য : وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ : বাক্যটিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠা বা ইখলাসের অর্থ হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর বর্ণনা মতে ধর্মে নিষ্ঠাবান হওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না করা এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য সৎকর্ম করা, মানুষকে দেখানোর জন্য অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্য নয়।

قوله وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহর বাণী "তিনি তথা ইবরাহীম মুশরিক ছিলেন না।" এ কথার মাধ্যমে ইহুদিদের একটি দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীমের খাঁটি অনুসারী বলে দাবি করত। অথচ তারা প্রত্যক্ষ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা নবী উযায়িরকে اِبْنُ اللّٰهِ অথবা আল্লাহর পুত্র বলত। অথচ ইবরাহীম (আ.) ছিলেন শিরক মুক্ত। কাজেই তাদের দাবির সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। একথা প্রমাণ করার জন্য বলা হয়েছে– وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অনেকের মতে নাসারা এবং মুশরিকদেরও অনুরূপ বিশ্বাস ছিল।

قوله لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ**-এর ব্যাখ্যা :** মুমিনদের বক্তব্য নবীদের কারোর মাঝে 'আমরা পার্থক্য করি না।' এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

(ক) আমরা সকল নবীকেই নবী মনে করি। ইহুদিরা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে জাদুকর আর হযরত উযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে। আমরা এমনটি করি না।

(খ) আমরা সকল নবীকে সত্য পথের দায়ী মনে করি, এতে কোনো পার্থক্য করি না।

(গ) বংশ বিবেচনা পূর্বক ইহুদি নাসারাদের মতো আমরা নবীদের মর্যাদার ব্যাপারেও কোনো পার্থক্য করি না।

(ঘ) তাছাড়া প্রত্যেক নবী একই দাওয়াত প্রদান করেছেন, এ ব্যাপারেও আমরা দ্বিমত করি না। বরং মূলগতভাবে সবাই মানুষকে আল্লাহর পথেই ডেকেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী– شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ۔

قوله اَتُحَآجُّوْنَنَا**-এর মর্ম :** তোমরা কি আমাদের সাথে ঝগড়া করবে?" এ বাক্যের مخاطِب ও مخاطَب কে ও কারা তা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

➢ বাক্যটি مُخَاطِبْ বা সম্বোধনকারী হলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)।

➢ আলোচ্য বাক্যের مُخَاطَبْ হলো মদিনার ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়। কারণ, ঝগড়াটি ছিল তাদের সাথে।

➢ কারো মতে, مُخَاطَبْ হলো সমুদয় মুশরিক জাতি।

➢ কারো মতে, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিক সকলেই এই বাক্যের مُخَاطَبْ

তবে আয়াতের বাচনভঙ্গি ও বর্ণনার ধরন থেকে মনে হয় প্রথম অভিমত অধিক গ্রহণ যোগ্য। –[তাফসীরে কাবীর]

قوله مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ**-এর ব্যাখ্যা :** ইহুদিরা তাদের হস্তগত আল্লাহর সাক্ষ্যকে গোপন করেছিল বলেই আল্লাহ তাদেরকে اَظْلَمُ অধিক অত্যাচারী বলে তিরস্কার করেছেন। এখানে شَهَادَةً দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

➢ তাওরাতে প্রমাণ ছিল যে, আহমদ নামে আখেরী নবী আসবে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলিও উল্লেখ ছিল। তা তারা গোপন করেছে।

➢ হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব (আ.) প্রমুখ নবী রাসূলগণ যে ইহুদি ছিলেন তার প্রমাণ ও তাদের কাছে ছিল যা তারা গোপন করেছে। সুতরাং বলা যায় যে, شَهَادَةً দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তাওরাত ও ইহুদিদের নিকট সংরক্ষিত পরবর্তীদের অসিয়তসমূহ উদ্দেশ্য হতে পারে।

ঝগড়ার বিষয়

ইহুদিরা যে বিষয়ে ঝগড়া করছিল তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- মুসলমানগণ নয় বরং তারাই হকের উপর আছে।
- অথবা, আরবের মুশরিক অপেক্ষা ইহুদিরাই উত্তম।
- তারা ব্যতীত অন্য কেউ বেহেশতে যাবে না।
- অথবা, ইহুদি ধর্ম বর্তমান থাকতে ইসলাম ধর্মের প্রয়োজন নেই।

ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে ইহুদিদের সাথে মু'মিনদের ঝগড়া হয়েছে বটে, তবে এখানে ঝগড়ার বিষয়বস্তু ছিল নবুয়ত বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য কোনো গোত্র বা সম্প্রদায় থেকে হতে পারে না। -[তাফসীরে কবীর]

قوله صِبْغَةَ اللهِ -এর ব্যাখ্যা : صِبْغَةَ শব্দের অর্থ مَا يُصْبَغُ بِهٖ অর্থাৎ, যার মাধ্যমে রঙ্গিন হয়। صِبْغَةٌ শব্দটি বাব فَتَحَ -এর مَصْدَرٌ অর্থ- রঙ্গিন করা। যেমন- صَبَغَ الثَّوْبَ সে কাপড় রঙ্গিন করল। صِبْغَةٌ -এর বহুবচন صِبَغٌ কিন্তু এখানে صِبْغَةَ اللّٰهِ অর্থ হলো اَلْفِطْرَةُ الَّتِىْ خَلَقَ اللّٰهُ عَلَيْهَا النَّاسَ অর্থাৎ, ঐ দীন বা স্বভাব যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

অথবা صِبْغَةَ اللهِ অর্থ হলো- اَلدِّيْنُ الَّذِيْ شَرَعَهُ اللّٰهُ لَهُمْ (ঐ দীন যা আল্লাহ মানুষের জন্য শরিয়ত করে দিয়েছেন)। কাজেই صِبْغَةَ اللهِ -এর অর্থ দাঁড়াবে আল্লাহর প্রদত্ত দীনের আদর্শে নিজেকে আদর্শবান করা।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَصٰرٰى : শব্দটি একবচন, বহুবচন نَصْرَانٌ، نَصْرَانِىٌّ অর্থ- খ্রিস্টান, ইসায়ী, হযরত ঈসা (আ.) -এর অনুসারী।

تَهْتَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ- (ه . د . ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ- তোমরা হেদায়েত পাবে।

النَّبِيُّوْنَ শব্দটি বহুবচন, একবচন اَلنَّبِىُّ অর্থ- নবীগণ বা পয়গম্বরগণ।

لَانُفَرِّقُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّفْرِيْقُ মূলবর্ণ (ف . ر . ق) জিনসে صحيح অর্থ- আমরা পার্থক্য করি না।

২য় পারা

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٤٢)

অনুবাদ (১৪২) এখন তো নির্বোধেরা বলবেই যে, তারা [মুসলমান] যে দিকে পূর্বে মুখ করত, নিজেদের কেবলা হতে তাদেরকে এখন কিসে ফিরিয়ে দিল? আপনি বলে দিন, মাশরেক এবং মাগরেব আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথ প্রদর্শন করেন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (١٤٣)

(১৪৩) আর এরূপে আমি তোমাদেরকে এমন এক সম্প্রদায় করেছি যারা মধ্য পন্থার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরা অন্য লোকের প্রতিপক্ষে সাক্ষী হও, আর রাসূল হবেন তোমাদের সাক্ষী, আর যে কেবলার দিকে আপনি ছিলেন তা তো শুধু এজন্য ছিল, যেন আমার নিকট প্রকাশ পায়– কে রাসূলকে অনুসরণ করে আর কে পশ্চাৎপদ হয়, আর এই কেবলা পরিবর্তন বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন [তাদের ব্যতীত] আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন, বাস্তাবিকই আল্লাহ মানুষের প্রতি খুবই স্নেহশীল, করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

১৪২. سَيَقُوْلُ এখন তো বলবেই السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ নির্বোধেরা مَا وَلّٰهُمْ তাদেরকে কিসে ফিরিয়ে দিল عَنْ قِبْلَتِهِمُ নিজেদের কেবলা হতে الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا তারা [মুসলমান] যে দিকে পূর্বে মুখ করত قُلْ আপনি বলে দিন لِّلّٰهِ আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ মাশরেক এবং মাগরেব يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন প্রদর্শন করেন اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল পথ।

১৪৩. وَكَذٰلِكَ আর এরূপে جَعَلْنٰكُمْ আমি তোমাদেরকে করেছি اُمَّةً এমন এক সম্প্রদায় وَّسَطًا যারা মধ্য পন্থার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ যেন তোমরা সাক্ষী হও عَلَى النَّاسِ অন্য লোকের প্রতিপক্ষে وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ আর রাসূল হবেন عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا তোমাদের সাক্ষী وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا আর যে কেবলার দিকে আপনি ছিলেন তা তো শুধু এজন্য ছিল اِلَّا لِنَعْلَمَ যেন আমার নিকট প্রকাশ পায়– مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ কে রাসূলকে অনুসরণ করে مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ আর কে পশ্চাৎপদ হয়, وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً আর এই কেবলা পরিবর্তন বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন [তাদের ব্যতীত] وَمَا كَانَ اللّٰهُ আর আল্লাহ এমন নন যে, لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন اِنَّ اللّٰهَ বাস্তাবিকই আল্লাহ بِالنَّاسِ মানুষের প্রতি لَرَءُوْفٌ খুবই স্নেহশীল رَّحِيْمٌ করুণাময়।

অনুবাদ : (১৪৪) আমি আকাশের দিকে বারংবার আপনার মুখমণ্ডল উঠাতে দেখছি, তাই আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিব সেই কেবলার দিকে যা আপনি পছন্দ করেন, তবে আপনার চেহারা [নামাজে] মসজিদে-হারামের [কাবার] দিকে ফিরিয়ে নিন, আর তোমরা যেখানেই থাক স্বীয় চেহারা ঐদিকেই ফিরাও; আর এই আহলে কিতাবরাও দৃঢ়রূপে জানে যে, এটা খুবই সত্য তাদের প্রভুরই পক্ষ থেকে, আর আল্লাহ তাদের এসব কার্যকলাপ হতে মোটেই বেখবর নন।	قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ (١٤٤)
(১৪৫) আর যদি আপনি আহলে কিতাবদের সম্মুখে যাবতীয় প্রমাণাদিও উপস্থিত করেন, তবু তারা আপনার কেবলাকে গ্রহণ করবে না, আর আপনিও তাদের কেবলাকে গ্রহণ করতে পারেন না, এবং তাদের কোনো দলই অন্য দলের কেবলাকে গ্রহণ করে না, আর যদি আপনি তাদের আত্ম-প্রবৃত্তিকে গ্রহণ করেন– আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে নিশ্চয় আপনি জালেমদের মধ্যে পরিগণিত হবেন।	وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ (١٤٥)
(১৪৬) যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা রাসূলকে এরূপ চিনে যেরূপ তারা আপন পুত্রগণকে চিনে থাকে, আর নিশ্চয়, তাদের কেউ কেউ বাস্তব সত্যকে ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও গোপন করছে।	اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (١٤٦)

শাব্দিক অনুবাদ

১৪৪. قَدْ نَرٰى আমি দেখেছি تَقَلُّبَ وَجْهِكَ বারংবার আপনার মুখমণ্ডল উঠাতে فِى السَّمَآءِ আকাশের দিকে فَلَنُوَلِّيَنَّكَ তাই আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিব قِبْلَةً সেই কেবলার দিকে تَرْضٰىهَا যা আপনি পছন্দ করেন فَوَلِّ وَجْهَكَ তবে আপনার চেহারা ফিরিয়ে নিন [নামাজে] شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে-হারামের [কা'বার] দিকে وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ আর তোমরা যেখানেই থাক فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ স্বীয় চেহারা ফিরাও شَطْرَهٗ ঐদিকেই وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আর এই আহলে কিতাবরাও لَيَعْلَمُوْنَ দৃঢ়রূপে জানে যে اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ এটা খুবই সত্য مِنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রভুরই পক্ষ হতে وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আর আল্লাহ মোটেই বেখবর নন عَمَّا يَعْمَلُوْنَ তাদের এসব কার্যকলাপ হতে ।

১৪৫. وَلَئِنْ اَتَيْتَ আর যদি আপনি উপস্থিত করেন الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাবদের সম্মুখে بِكُلِّ اٰيَةٍ যাবতীয় প্রমাণাদিও مَّا تَبِعُوْا তবু তারা গ্রহণ করবে না قِبْلَتَكَ আপনার কেবলাকে وَمَآ اَنْتَ আর আপনিও بِتَابِعٍ গ্রহণ করতে পারেন না قِبْلَتَهُمْ তাদের কেবলাকে وَمَا بَعْضُهُمْ এবং তাদের কোনো দলই بِتَابِعٍ গ্রহণ করে না قِبْلَةَ بَعْضٍ অন্য দলের কেবলাকে وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ আর যদি আপনি গ্রহণ করেন– اَهْوَآءَهُمْ তাদের আত্ম-প্রবৃত্তিকে مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ তবে নিশ্চয় আপনি জালেমদের মধ্যে পরিগণিত হবেন ।

১৪৬. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি يَعْرِفُوْنَهٗ তারা রাসূলকে এরূপ চিনে كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ যেরূপ তারা আপন পুত্রগণকে চিনে থাকে وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ আর নিশ্চয় তাদের কেউ কেউ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ বাস্তব সত্যকে গোপন করছে وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪২) قوله سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উল্লিখিত আয়াত দ্বারা রাসূলে মাকবুল -কে 'গায়েব' সম্পর্কে জানানো হয়েছে। মক্কায় অবস্থান কালে কা'বা শরীফের দিকে ফিরে মুসলমানগণ নামাজ আদায় করতেন। হিজরতের পর বায়তুল মাকদিসের দিকে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়। এভাবে ষোল বা সতের মাস অতিক্রমের পর পুনরায় কা'বা শরীফের প্রতি প্রত্যাবর্তনের হুকুম প্রদান করা হয়। এই শেষ নির্দেশের পর মক্কার ও মদীনার অমুসলিম সমাজ যে নানা ধরনের বিরূপ মন্তব্য করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই তাঁর নবীকে জানিয়ে উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। –[তাফসীরে বায়জাবী, তাফসীরে জালালাইন]

(১৪৩) قوله وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, ইহুদি নেতারা কেবলা পরিবর্তনের পর বিশিষ্ট সাহাবী মু'য়ায ইবনে জাবালকে লক্ষ্য করে বলে, "হে মু'য়ায! আমাদের কেবলা বায়তুল মাকদিস বিগত সকল নবীদের কেবলা। আর মুহাম্মদ এ কথা জানেন যে, আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তবুও সে হিংসা ও বিদ্বেষ বশতঃ আমাদের কেবলা ত্যাগ করেছে। উত্তরে হযরত মু'য়ায (রা.) বললেনে, হে দুর্ভাগা জাতি! সকল জাতির উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো কিভাবে? শ্রেষ্ঠত্ব আর মর্যাদা তো কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য। তখন মহান আল্লাহ মু'য়াযের কথার সমর্থনে উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

(১৪৩) قوله وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কেবলা পরিবর্তনের পর মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে হুয়াই ইবনে আখতাবসহ অন্যান্য ইহুদিরা মুসলমানদের বলতে শুরু করে, "হে মুসলমানগণ! আমাদের কেবলা যদি সঠিক না-ই হয়ে থাকে আর যদি কা'বা ঘরই প্রকৃত কেবলা হয়ে থাকে, তবে ইতোপূর্বে যারা বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামাজ পড়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের পরিণতি কি হবে? তারা কি জান্নাত পাবে, না জাহান্নামে যাবে? তাদের এরূপ প্রশ্নে মুসলমানদের মনেও সংশয় দেখা দেয়। তখন তাদের সংশয় নিরসনের জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশটি অবতীর্ণ করেন।

(১৪৪) قوله قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নবী করীম মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় ইহুদি সম্প্রদায় বাস করত। তাদের কেবলা হলো বায়তুল মাকদিস। আল্লাহ তা'আলা তাদের মন জয় করার লক্ষ্যে নবী করীম -কে সেদিকে ফিরে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেন। অবশ্য তা কুরআন শরীফে বিবৃত হয়নি। মুসলমানরা ষোল বা সতের মাস এভাবে নামাজ আদায় করেন। কিন্তু রাসূল -এর ঐকান্তিক কামনা ছিল কেবলায়ে ইবরাহীমী কা'বা কেবলা হিসেবে পুনঃ নির্ধারণ করা। এ সম্পর্কিত নির্দেশ নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজীর নিকট আগমন করবেন, এই আশায় তিনি বারবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করে এই হুকুম নাজিল করেন, কা'বা শরীফকে সব সময়ের জন্য মুসলিম উম্মাহর কেবলা হিসেবে নির্ধারণ করেন। হিজরি দ্বিতীয় সনের রজব বা শা'বান মাসে এই নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, নবী করীম এই নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় বিন বনূ সালামা গোত্রের হযরত বিশর ইবনে বারারাহ (রা.)-এর ঘরে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর সে এলাকার মসজিদে যুহরের নামাজ আদায়কালে এই নির্দেশ আসে। তখন তাঁরা নামাজের তৃতীয় রাকাতে ছিলেন। নির্দেশ আসার সাথে সাথে রাসূল নামাজের মাঝেই কা'বা শরীফের দিকে ঘুরে যান। এজন্য ঐ মসজিদটিকে 'মসজিদে যুল কিবলাতাইন'বা দুই কিবলার স্মৃতিবাহী মসজিদ' বলা হয়। ইহুদি জ্ঞান-পাপীরা তখন নানা ধরনের কটূক্তি করতে শুরু করে। তারা বলতে থাকে, নবীজী শিরকের প্রতি আসক্তি বশতঃ ও মুশরিকদের সন্তোষ কামনায় কা'বা শরীফকে কেবলা নির্ধারণ করেছেন। এর জবাবে মহান আল্লাহ তা'আলা বলে দেন যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই অন্যায় প্রচারণা চালাচ্ছে। নতুবা নবীজীর কেবলা-পরিবর্তনের বিষয়টি তাদের কিতাবেও উল্লিখিত হয়েছে। তাই, এটি আপত্তি করার বিষয় নয়, বরং নবীজীর সত্যতারই এক সুস্পষ্ট নিদর্শন বৈকি।

(১৪৫) قوله وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, মদিনার ইহুদি ও নাজরানের খ্রিস্টানরা মহানবী -কে বলেছিল, পূর্ববর্তী নবীদের মতো আপনিও নিদর্শন নিয়ে আসুন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। তবে মূলতঃ এই আয়াতটি কিবলা পরিবর্তনের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত, নতুন কোনো কারণে তা অবতীর্ণ হয়নি।

(১৪৬) قوله الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মদিনায় হিজরতের পর যখন নবী করীম ﷺ বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামাজ পড়তে থাকেন, তখন মদিনার ইহুদিরা বলতে থাকে, ইনি নিজেকে শেষ নবী দাবি করেন এবং কা'বা শরীফের পরিবর্তে এখন বায়তুল মাকদিসকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই আমাদের দীন যে সত্য তা প্রমাণিত হলো। আর সে জন্যই তিনি একটু একটু করে আমাদের ধর্মের দিকে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু যখন নবীজী ﷺ আবার কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামাজ পড়তে শুরু করেন, তখন তারা নানা রকম কটু-কাটব্য করতে থাকে। এমন কথা-বার্তা বলতে থাকে যেন তারা রাসূল ﷺ সম্পর্কে কিছু জানেই না। অথচ, তাওরাত ও ইনজীলে নবীজীর যাবতীয় বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, এমনকি কেবলা পরিবর্তনের কথাও বিবৃত হয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করে তাদের চরিত্র সুস্পষ্টভাবে চিত্রায়িত করে দিলেন যে, তারা নবীজীকে নিজ সন্তানের ন্যায় পরিষ্কারভাবে চিনে, কিন্তু তথাপি না চেনার ভান করে সত্যকে গোপন রাখে।

قوله سَيَقُوْلُ **-এর হিকমত :** এখনো কেবলা পরিবর্তিত হয়নি। নির্বোধরাও কোনো প্রকার মন্তব্য করেনি। অথচ আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে এর পূর্বে নির্বোধ লোকেরা কি বলবে তা জানিয়ে দিলেন। এর কতিপয় হিকমত রয়েছে। যথা–(১) নির্বোধদের মনের কথা নবীজী যদি পূর্বেই বলে দেন তাহলে তারা এটাকে মু'জিযা হিসেবে ধরে নিবে যা হবে তাঁর নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্য। (২) কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধদের অশালীন বিদ্রূপাত্মক কথা থেকে নবীজী যেন মনে কষ্ট অনুভব না করেন তাই সেই কথাগুলো আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। (৩) নির্বোধদের অবান্তর প্রশ্নের জবাবে নবীজী কি উত্তর প্রদান করবেন তা আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারেন। –[তাফসীরে কাবীর]

قوله يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ **-এর ব্যাখ্যা :** صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ হলো আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত পথ। মক্কী জীবনে যারা কা'বাকে কেবলা করে নামাজ পড়েছেন তারাই আবার মদিনা জীবনে এসে দীর্ঘ সতের মাস বায়তুল মাকদিসকে কেবলা করে নামাজ পড়েছেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেন তাঁর অনুসরণ করাই তাদের কর্তব্য।

পুনরায় কা'বাকে কেবলা ঘোষণা করে আল্লাহ মূলতঃ পরীক্ষা করতে চেয়েছেন যে, কারা রাসূলের প্রকৃত অনুসারী আর কারা আত্মপূজারী। কাজেই এই পরিবর্তনকে যারা মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে তারাই صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ পেয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকেই صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এ চালিত করেছেন।

قوله وَكَذٰلِكَ **-এর মর্ম :** وَكَذٰلِكَ "আর এমনিভাবে" কথাটির উদ্দেশ্য এই হতে পারে–

- তোমাদের কেবলাকে যেমন পৃথিবীর মধ্যস্থানে করে দিলাম, এমনিভাবে তোমাদেরকে সকল জাতির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী উম্মত করে দিলাম।
- কা'বা যেমন পৃথিবীর মধ্যস্থানে অবস্থিত, তোমরাও তেমনি নবী এবং অন্যান্য উম্মতের মধ্যভাগে অবস্থিত। অর্থাৎ, তোমরা নবীদের নিচে এবং অন্যান্য জাতির উপরে। –[তাফসীরে কুরতুবী]
- অথবা, কথাটির অর্থ এ হতে পারে যে, কা'বাকে পুনরায় কেবলা করে যেমন বিশ্ববাসীর মধ্যমণিতে পরিণত করেছি তেমনি তোমাদেরকেও সকল জাতির মধ্যমপন্থি জাতি বানিয়েছি। কারণ মধ্য বিন্দুকে কেন্দ্র করেই বাকিরা ঘুরে।

قوله اُمَّةً وَّسَطًا **-এর মর্মার্থ :** اُمَّةً وَّسَطًا অর্থ মধ্যমপন্থি জাতি, উত্তম, ন্যায়পরায়ণ জাতি। এর দ্বারা এমন উন্নত ও উৎকৃষ্ট মানব গোষ্ঠীকে বুঝায়, যারা ন্যায় নীতি ও মধ্যমপন্থা অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত, যারা বিশ্বের জাতিসমূহের নেতা, পরিচালক, বিচারক ও কর্তা হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মাদারেক প্রণেতা বলেন, وسط শব্দের অর্থ হলো উত্তম; যেহেতু প্রতিবেশীরা দোষ-ত্রুটি নিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীর কাছে আসে তাই তারা প্রশংসিত ও ন্যায়পরায়ণ। তারা প্রতিবেশীদের মধ্যে কারো পক্ষপাতিত্ব করে না।

অথবা, اُمَّةً وَّسَطًا দ্বারা "মধ্যস্থতাকারী জাতি" অর্থও হতে পারে। কারণ যারা মানুষের মাঝে মধ্যস্থতা করে তারাই সমাজের নেতা, পরিচালক ও বিচারক।

মুসলমানদেরকে أُمَّةً وَسَطًا বলার কারণ : তারা আল্লাহর হুকুম পালনে কমও করে না বেশিও করে না। তারা সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে।

- ইহুদি ও খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। খ্রিস্টানরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলেছে আর ইহুদিরা তাকে অবৈধ সন্তান বলেছে। এক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদী মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ যা হক তাই বলেছে।
- তাছাড়া মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের মাঝে মধ্যস্থতা ও বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ এ সকল কারণে মুসলমানদেরকে أُمَّةً وَسَطًا বলা হয়েছে। أُمَّةً وَسَطًا কেই অন্যত্র خَيْرَ أُمَّةٍ বলা হয়েছে।

মধ্যপন্থার রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও কিছু বিবরণ : (১) মধ্যপন্থার অর্থ ও তাৎপর্য কি? (২) মধ্যপন্থার এত গুরুত্বই বা কেন যে, এর উপরই শ্রেষ্ঠত্বকে নির্ভরশীল করা হয়েছে? (৩) মুসলিম সম্প্রদায় যে মধ্যপন্থি, বাস্তবতার নিরীখে এর প্রমাণ কি? ধারাবাহিকভাবে এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর :

১. اِعْتِدَالٌ [ভারসাম্য]-এর শাব্দিক অর্থ সমান হওয়া। عَدْلٌ মূলধাতু থেকে এর উৎপত্তি, আর عَدْلٌ-এর অর্থও সমান হওয়া।

২. যে গুরুত্বের কারণে ভারসাম্যকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়েছে তা একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। বিষয়টি প্রথমে একটি স্থূল উদাহরণ দ্বারা বুঝুন। ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি যত নতুন ও পুরাতন চিকিৎসা-পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে, সে সবই এ বিষয়ে একমত যে, 'মেজাযে'র বা স্বভাবের ভারসাম্যের উপরই মানবদেহের সুস্থতা নির্ভরশীল। ভারসাম্যের ত্রুটিই মানবদেহে রোগ-বিকার সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির মূলনীতিই মেজায-পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। এ শাস্ত্র মতে মানবদেহ চারটি উপাদান-রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল ও পিত্ত দ্বারা গঠিত। এ চারটি উপাদান থেকে উৎপন্ন চারটি অবস্থা শৈত্য, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা মানবদেহে বিদ্যমান থাকা জরুরি। এ চারটি উপাদানের ভারসাম্যই মানবদেহের প্রকৃত সুস্থতা নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে যে কোনো একটি উপাদান মেজাযের চাহিদা থেকে বেড়ে অথবা কমে গেলেই তা হবে রোগ-ব্যাধি। চিকিৎসা দ্বারা এর প্রতিকার না করলে এক পর্যায়ে তাই মৃত্যুরকারণ হবে।

এই স্থূল উদাহরণের পর এখন আধ্যাত্মিকতার দিকে আসুন। আধ্যাত্মিকতায় ভারসাম্যের নাম আত্মিক সুস্থতা এবং ভারসাম্যহীনতার নাম আত্মিক ও চারিত্রিক অসুস্থতা। এ অসুস্থতার চিকিৎসা করে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা না হলে পরিণামে আত্মিক মৃত্যু ঘটে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, যে উৎকৃষ্টতার কারণে মানুষ সমগ্র সৃষ্টিজীবের সেরা, তা তার দেহ অথবা দেহের উপাদান ও অবস্থার ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তুও মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত; বরং তাদের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষ এসব উপাদান মানুষের চাইতেও বেশি থাকে।

যে বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ 'আশরাফুল–মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা বলে গণ্য হয়েছে, তা নিশ্চিতই তার রক্ত-মাংস চর্ম এবং তাপ শৈত্যের উর্ধ্বে অন্য কোনো বিষয় যা মানুষের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান- অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে ততটুকু নেই। এ বস্তুটি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করাও কোনো সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ নয়। বলাবাহুল্য, তা হচ্ছে মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা বা পরিপূর্ণতা।

আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠাই যখন মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, মানবদেহের মতো মানবাত্মাও যখন ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতার শিকার হয় এবং মানবদেহের সুস্থতা যখন মেজায ও উপাদানের ভারসাম্য আর মানবাত্মার সুস্থতা যখন আত্মা ও চরিত্রের ভারসাম্য, তখন কামেল মানব একমাত্র তিনিই হতে পারেন, যিনি দৈহিক ভারসাম্যের সাথে সাথে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যেরও অধিকারী হবেন। এবং আমাদের রাসূল ﷺ তা সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি সর্বপ্রধান কামেল মানব।

আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর প্রেরণ ও গ্রন্থ অবতরণের রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চারিত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে এবং লেন-দেন ও পারস্পরিক আদান প্রদানে বৈষয়িক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানদণ্ড নাজিল করা হয়েছে। মানদণ্ড অর্থ প্রত্যেক পয়গম্বরের শরিয়ত হতে পারে। শরিয়ত দ্বারা সত্যিকার ভারসাম্য জানা যায় এবং ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, মানবমণ্ডলীকে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই পয়গম্বর ও আসমানি গ্রন্থ প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এটাই মানব মণ্ডলীর সুস্থতা।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বপ্রকার ভারসাম্য নিহিত : মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করেছি। উপরিউক্ত বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায় যে, وَسَطًا শব্দটি উচ্চারণ ও লেখায় একটি সাধারণ শব্দ হলেও তাৎপর্যের দিক দিয়ে কোনো সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তির মধ্যে যত পরাকাষ্ঠা থাকা সম্ভব, সে সবগুলোকে পরিব্যাপ্ত করেছে।

আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থি, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং পয়গম্বর ও আসমানি গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ।

কুরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। সূরা আ'রাফের শেষভাগে এ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ অর্থাৎ, আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং তদানুযায়ী ন্যায়বিচার করে।

এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য বিধৃত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানি গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোনো ব্যাপারে কলহবিবাদ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোনো আশঙ্কা নেই। সূরা আলে ইমরানে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে– كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ অর্থাৎ, তোমরাই সে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ করবে, মন্দকাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে।

অর্থাৎ, মুসলমানরা যেমন সব পয়গম্বরের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর প্রাপ্ত হয়েছে, সব গ্রন্থের সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ও পূর্ণতার গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ মেজায এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারাই সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের সামনে জ্ঞানবিজ্ঞান ও তত্ত্ব-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। ঈমান, আমল ও আল্লাহভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা তাদের ত্যাগের দৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোনো বিশেষ দেশ ও ভৌগলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যাপ্ত। তাদের অস্তিত্বই অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষা ও তাদের বেহেশতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত। أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ বাক্যাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়টি গণ মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষা ও উপকারের নিমিত্তই সৃষ্ট। তাদের কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে সৎকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে।

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় হওয়ার প্রমাণ কি? এখন এ প্রশ্নটি আলোচনাসাপেক্ষ। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হলে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র ও কীর্তিসমূহ যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে–

বিশ্বাসের ভারসাম্য : সর্বপ্রথম বিশ্বাসগত ভারসাম্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা পয়গম্বরগণকে আল্লাহর পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছে– "ইহুদিরা বলেছে ওযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলেছে, মসীহ আল্লাহর পুত্র।" অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে পয়গম্বরের উপর্যুপরি মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও তাদে পয়গম্বর যখন তাদেরকে কোনো ন্যায়যুদ্ধে আহ্বান করেছেন, তখন পরিষ্কার বলে দিয়েছে, "আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব।" আবার কোথাও পয়গম্বরগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদের হাতেই নির্যাতিতও হতে দেখা গেছে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি এমন আনুগত্য ও মহব্বত পোষণ করে যে, এর সামনে জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-আবরু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে রাসূলকে রাসূল এবং আল্লাহকে আল্লাহ মনে করে। এত সব পরাকাষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তারা আল্লাহর দাস ও রাসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখেও প্রকাশ করে। তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভিতরে থাকে।

কর্ম ও ইবাদতের ভারসাম্য : বিশ্বাসের পরই শুরু হয় আমল ও ইবাদতের পালা। এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা শরিয়তের বিধি-বিধানকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ, উৎকোচ নিয়ে আসমানি গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং ইবাদত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, যারা সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা আল্লাহ প্রদত্ত হালাল নিয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং সহ্য করাকেই ছওয়াব ও ইবাদত বলে মনে করে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি জুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধানের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি ও মালিক হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্মনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কোনো বৈরিতা নেই এবং ধর্ম মসজিদ ও খানকায় আবদ্ধ থাকার জন্য আসেনি; বরং হাট-ঘাট, মাঠ-ময়দান, অফিস-আদালত এবং মন্ত্রলায়সমূহে এর সাম্রাজ্য অপ্রতিহত। তাঁরা বাদশাহীর মাঝে ফকিরী এবং ফকিরীর মাঝে বাদশাহী শিক্ষা দিয়েছে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য : এর পর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরওয়াও করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোনো কথাই নেই। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে নিপীড়ন-নির্যাতন, হত্যা ও লুণ্ঠন করাকেই বড় কৃতিত্ব মনে করেছে। জনৈক বিত্তশালীর চারণভূমিতে অপরের উট প্রবেশ করে কিছু ক্ষতিসাধন করায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে কত মানুষ যে নিহত হয়, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। মহিলাদের মানবাধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হতো না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়ার্দ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকা-মাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হতো। জীব-হত্যাকে তো দস্তুর মতো মহাপাপ বলে সাব্যস্ত করা হতো। আল্লাহর হালাল করা প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে মনে করা হতো অন্যায়।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরিয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অপরের অধিকার প্রদানে যত্নবান হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য : এরপর অর্থনীতির প্রতি লক্ষ্য করুন, এটাও বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রেও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি মালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, উভয় অর্থব্যবস্থার সারমর্মই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপাসনা, ধন-সম্পদকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্য যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করা।

মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরিয়ত এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামি শরিয়ত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও কোনো পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি; অপরদিকে সম্পদ বণ্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোনো মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

সাক্ষ্যদানের জন্য ন্যায়ানুগ হওয়া শর্ত : لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা হয়েছে যাতে তারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। এতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়ানুগ নয়, সে সাক্ষ্যদানেরও যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণতঃ 'নির্ভরযোগ্য' করা হয়। এর সম্পূর্ণ শর্ত ফিকহ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রয়েছে।

ইজমা শরিয়তের দলিল : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, ইজমা [মুসলিম ঐকমত্য] যে শরিয়তের একটি দলিল, আলোচ্য আয়াতটি তার প্রমাণ। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ সম্প্রদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে অপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলিল করে দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের ইজমা বা ঐকমত্যও একটি দলিল এবং তা পালন করা ওয়াজিব। সাহাবীগণের ইজমা তাবেয়ীগণের জন্য এবং তাবেয়ীগণের ইজমা তাঁদের পরবর্তীদের জন্যে দলিল স্বরূপ।

তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে– এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের যেসব ক্রিয়াকর্ম সর্বসম্মত, তা আল্লাহর কাছে প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। কারণ যদি মনে করা হয় যে, তারা ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হয়েছে, তবে তাদের নির্ভরযোগ্য সম্প্রদায় বলার কোনো অর্থ থাকে না।

ইমাম জাস্সাস (র.) বলেন– এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক যুগের মুসলমানদের ইজমাই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয়। 'ইজমা শরিয়তের দলিল' এ কথাটি প্রথম শতাব্দী অথবা বিশেষ কোনো যুগের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। কারণ আয়াতে সমগ্র সম্প্রদায়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। যারা আয়াত নাজিলের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁরাই শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নন; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবে, তারা সবাই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং প্রতি যুগের মুসলমানই 'আল্লাহর সাক্ষ্যদাতা'। তাদের উক্তি দলিল। তারা কোনো ভুল বিষয়ে একমত হতে পারে না।

কা'বা শরীফ সর্বপ্রথম কখন নামাজের কেবলা হয় : হিজরতের পূর্বে মক্কা মোকাররমায় যখন নামাজ ফরজ হয়, তখন কা'বা গৃহই নামাজের জন্য কেবলা ছিল, না বায়তুল- মাকদিস ছিল এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– ইসলামের শুরু থেকেই কেবলা ছিল বায়তুল মাকদিস। হিজরতের পরও ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কা'বাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামীনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন যাতে কা'বা ও বায়তুল মোকাদ্দাস উভয়টিই সামনে থাকে। মদিনায় পৌছার পর এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তাঁর মনে কেবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে।–[ইবনে কাসীর]

অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেন– মক্কায় নামাজ ফরজ হওয়ার সময় কা'বা গৃহই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কেবলা। কেননা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর কেবলাও তাই ছিল। মহানবী ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামাজ পড়তেন। মদিনায় হিজরতের পর তাঁর কেবলা বায়তুল মাকদিস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদিনায় ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়েন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ, কা'বাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়।

বনূ-সালামার মুসলমানগণ জোহর অথবা আসরের নামাজ থেকেই কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ কার্যকর করে দেন। কিন্তু কোবার মসজিদে এ সংবাদ পরদিন ফজরের নামাজে পৌছালে তারাও নামাজের মধ্যেই বায়তুল মাকদিসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ করে নেন।–[ইবনে কাসীর, জাস্সাস]

قوله وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ –এখানে ঈমান শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধরা মনে করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না।

কোনো কোনো হাদীসে এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে নামাজ। মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে যেসব নামাজ পড়া হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আ'যেব (রা.) এবং তিরমিযীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, কা'বাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যেসব মুসলমান ইতোমধ্যেই ইন্তেকাল করেছেন, তাঁরা বায়তুল মাকদিসের দিকে নামাজ পড়ে গেছেন– কা'বার দিকে নামাজ পড়ার সুযোগ পাননি, তাঁদের কি হবে? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এতে নামাজকে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সব নামাজই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না।

আলোচ্য ১৪৪ তম আয়াতের প্রথম বাক্যে কা'বার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আকর্ষণ এবং এর বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সবই সম্ভবপর। উদাহরণত মহানবী ﷺ ওহী অবতরণ ও নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোঁকে দীনে ইবরাহীমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কুরআনও তাঁর শরিয়তকে দীনে ইবরাহীমের অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কেবলাও কা'বাই ছিল।

আরো কারণ ছিল এই যে, আরব গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দীনে ইবরাহীমী স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে তার অনুসারী বলে দাবি করত। ফলে কা'বা মুসলমানদের কেবলা হয়ে গেলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারত। সাবেক কেবলা বায়তুল মাকদিস দ্বারা আহলে কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ষোল/সতের মাসের অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ মদিনার ইহুদিরা এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরেই সরে যাচ্ছিল।

মোটকথা, কা'বা মুসলমানদের কেবলা সাব্যস্ত হোক– এটাই ছিল মহানবী ﷺ -এর আন্তরিক বাসনা। তবে আল্লাহর নৈকট্যশীল পয়গম্বরগণ কোনো দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করার অনুমতি আছে বলে, না জানা পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কোনো দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করেন না। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী ﷺ এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বাহ্নেই পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কেবলা পরিবর্তনের দোয়া করেছিলেন এবং তা কবুল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। এ কারণেই তিনি বারবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছে কিনা। আলোচ্য আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দোয়া কবুল করার ওয়াদা করা হয়– فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا অর্থাৎ আমি আপনার চেহারা মোবারক সেদিকেই ফিরিয়ে দিব, যেদিকে আপনি পছন্দ করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সে দিকে মুখ করার আদেশ নাজিল করা হয়, যথা, فَوَلِّ وَجْهَكَ; এর বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক। এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়।

নামাজে কেবলামুখি হওয়ার মাসআলা : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সর্বদিকই সমান। قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ পূর্ব -পশ্চিম আল্লাহরই মালিকানাধীন। কিন্তু উম্মতের স্বার্থে সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য একটি দিককে কেবলা হিসেবে নির্দিষ্ট করে সবার মাঝে ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তবে এ দিকটি বায়তুল মাকদিসও হতে পারত। কিন্তু মহানবী ﷺ -এর আন্তরিক বাসনার কারণে কা'বাকে কেবলা সাব্যস্ত করে আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে فَوَلِّ وَجْهَكَ اِلَى الْكَعْبَةِ অর্থাৎ, 'কা'বার দিকে মুখ করে অথবা বায়তুল্লার দিকে মুখ কর' বলার পরিবর্তে شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [অর্থাৎ মসজিদে হারামের দিকে] বলা হয়েছে। এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথমত : যদিও আসল কেবলা বায়তুল্লাহ তথা কা'বা: কিন্তু কা'বার দিকে মুখ করা সেখান পর্যন্তই সম্ভব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। যারা সেখান থেকে দূরে এবং কা'বা তাদের দৃষ্টিগোচর থাকে, তাঁদের উপরও হুবহু কা'বার দিকে মুখ করার কড়াকড়ি আরোপ করা হলে, তা পালন করা খুবই কঠিন হতো। বিশেষ যন্ত্রপাতি ও অঙ্কের মাধ্যমেও নির্ভুল দিক নির্ণয় করা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে অনিশ্চিত হয়ে পড়তো। অথচ শরিয়ত সহজ-সরল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে বায়তুল্লাহ অথবা কা'বা শব্দের পরিবর্তে মসজিদুল হারাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

বায়তুল্লাহ অপেক্ষা মসজিদুল হারাম অনেক বেশি স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এ বিস্তৃত স্থানের দিকে মুখ করা দূর-দূরান্তের মানুষের জন্যও সহজ।

সংক্ষিপ্ত শব্দ إِلَى -এর পরিবর্তে شَطْرَ শব্দটি ব্যবহার করায় কেবলার দিকে মুখ করার ব্যাপারটি আরো সহজ হয়ে গেছে। شَطْرَ দু অর্থে ব্যবহৃত হয়– বস্তুর অর্ধাংশ ও বস্তুর দিক। আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর দিক। এতে বুঝা যায় যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বা অঞ্চলে বিশেষভাবে মসজিদে হারামের দিকে মুখ করাও জরুরি নয়; বরং মসজিদে-হারাম যেদিকে অবস্থিত সে দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট। –[বাহরে মুহীত]

وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ– আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, খানায়ে কা'বা কিয়ামত পর্যন্ত আপনার কেবলা থাকবে। এতে ইহুদি-নাসারাদের সে মতবাদের খণ্ডন করাই ছিল উদ্দেশ্য যে, মুসলমানদের কেবলার কোনো স্থিতি নেই: ইতঃপূর্বে এদের কেবলা ছিল খানায়ে কা'বা, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল মাকদিস হলো, আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় খানায়ে কা'বা হলো। আবারও হয়তো বদলে বায়তুল মাকদিসকেই কেবলা বানিয়ে নিবে। –[বাহরে মুহীত]

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ এখানে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নিয়ে হুজুর ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য যে, উল্লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার যে, স্বয়ং রাসূলে কারীম -ও যদি এমনটি করেন, [অবশ্য তা অসম্ভব], তবে তিনিও সীমা লঙ্ঘনকারী বলে সাব্যস্ত হবেন।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا الخ : নং আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-কে রাসূল হিসেবে চেনার উদাহরণ সন্তানদের চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এরা যেমন কোনোরকম সন্দেহ-সংশয়হীনভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে জানে, তেমনিভাবে তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ-এর সুসংবাদ, প্রকৃষ্ট লক্ষণ ও নিদর্শনাবলির মাধ্যমে তাঁকেও সন্দেহাতীতভাবেই চেনে। কিন্তু তাদের যে অস্বীকৃতি তা একান্তভাবেই হঠকারিতা ও বিদ্বেষপ্রসূত।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরিপূর্ণভাবে চেনার উদাহরণ পিতা-মাতাকে চেনার সাথে না দিয়ে সন্তান-সন্ততিকে চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবতঃ পিতা-মাতাকেও অত্যন্ত ভালো করেই জানে। এহেন উদাহরণ দেওয়ার কারণ হলো এই যে, পিতা-মাতার নিকট সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতা-মাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশি হয়ে থাকে। কারণ পিতা-মাতা জন্মলগ্ন থেকে সন্তান-সন্ততিকে স্বহস্তে লালন-পালন করেন। তাদের শরীরের এমন কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, যা পিতা-মাতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতা-মাতার গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তানরা কখনো দেখে না।

কা'বার প্রতি রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসার কারণ : কা'বা ঘরকে মুসলমানদের কেবলা করা হোক, এটা নবীজী মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করতেন। এমনকি এ জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দোয়াও করতেন। কা'বার প্রতি নবীজীর এ ভালোবাসার কিছু কারণ অনুমান করা হয়। যথা–

সহজাত প্রবৃত্তি : নবীজী কা'বার পাশে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের পর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে কা'বার ভিতরে নিয়ে যান এবং সেখানেই তার নাম মুহাম্মদ রাখেন। তাছাড়া পরিণত বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রথমত কা'বা-ই ছিল তাঁর কেবলা। এসব আনুসাঙ্গিকতার ফলে কা'বার সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি টান ছিল অনেক।

বংশীয় টান : নবীজীর দাদা আব্দুল মুত্তালিব, চাচা আব্বাস, আবূ তালিব প্রমূখ ছিলেন কা'বার সংস্কারক ও প্রতিনিধি। তাছাড়া নবীজী নিজেও কা'বা সংস্কারে অংশ নিয়েছেন। নিজ হাতে স্থাপন করেছেন মূল্যবান হাজরে আসওয়াদ। এরূপ সংশ্লিষ্টতার কারণে কা'বার প্রতি তাঁর বংশীয় টান কিছুটা বেশি থাকাই স্বাভাবিক।

ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি ভক্তি : নবীজী প্রথম থেকেই মিল্লাতে ইবরাহীমের ভক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনে তাঁকে মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর অটল থাকার পক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কেবলা ছিল কা'বা ঘর। তাই স্বভাবতই তিনি ইবরাহীমের কিবলা তাঁর উম্মতের কিবলা হোক এটাই চাচ্ছিলেন।

মক্কার মুশরিকদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করণ : মক্কার মুশরিকরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসারী বলে দাবি করত এবং কা'বা ঘরকে তারা কেবলা মানত। নবীজী ﷺ ভাবলেন কা'বা কে যদি কেবলা বানানো হয় তবে মুশরিকরা হয়তো খুশি হয়ে ইসলাম ধর্ম মেনে নেবে।

ভৌগলিক কারণ : অবস্থানের দিক দিয়ে বায়তুল মাকদিসের তুলনায় কা'বাঘর ছিল মুসলমাদের জন্য অনুকূলে। সর্বোপরি বলা যায় যে, কা'বাকে কেবলা বানানো আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, তাই নবীজীর মনে-এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল।

مَسْجِد حَرَامْ -এর পরিচয় : "কা'বা"কে সাধারণতঃ بَيْتُ اللّٰهِ বলা হয়। বায়তুল্লাহকে ঘিরে চারপাশে নামাজের জন্য যে বিস্তৃর্ণ জায়গা রয়েছে তাকে مَسْجِد حَرَامْ বলা হয়। بَيْتُ اللّٰهِ মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত। এখানে মসজিদকে হারাম বলার কারণ : (১) حَرَامْ শব্দের অর্থ যদি ধরা হয় নিষিদ্ধ। তবে এর কারণ হবে এই বায়তুল্লাহর সীমানার ভিতর যুদ্ধ বিগ্রহ, উচ্চ-বাচ্য, আচার-বিচার, হত্যা-খুন, গাল-মন্দ, পশু-পাখী শিকার, এমনকি গাছের পাতা ছেড়াও নিষিদ্ধ। তাই এই মসজিদকে মসজিদে হারাম বলা হয়। (২) আর حَرَامْ অর্থ যদি ধরা হয় সম্মানিত। তবে তো কারণ খোঁজার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। সম্মানিত হওয়ার জন্য আল্লাহর ঘর حَرَامْ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়াই যথেষ্ট। তাছাড়া এর বিশেষ সম্মানের কারণেই এর সীমানায় উল্লিখিত অন্যায় আচরণসমূহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কেবলা পরিবর্তনের মূল সময় : কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত উপরিউক্ত আয়াতগুলো হলো মূল প্রত্যাদেশ। দ্বিতীয় হিজরি সালের রজব কিংবা শা'বান মাসে এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন– নবী করীম ﷺ বনূ সালামা গোত্রের বিশর ইবনে বাররাহ ইবনে মারুর-এর গৃহে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, সেখানে সে এলাকার মসজিদে যোহরের নামাজের সময় এ আয়াত নাজিল হয়। সাথে সাথে নবী করীম ﷺ ও সাহাবাগণ বায়তুল মাকদিসের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে কা'বা গৃহের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। এ কারণে এ মসজিদটিকে "মসজিদুল কিবলাতাইন" নামে অভিহিত করা হয়।

বায়তুল মাকদিসের দিকে তাকানো কি ফরজ ছিল? মদিনার জীবনে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করা ফরজ ছিল কিনা ? এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। রাবী ইবনে আনাস (রা.) বলেন– তাঁর জন্য কা'বা এবং বায়তুল মাকদিসকে কেবলা গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীনতা ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস -এর মতে, বায়তুল মাকদিসের দিকে তাকানো ছিল ফরজ।

◈ ইবনে আনাসের দলিল হলো– فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ
◈ ইবনে আব্বাস -এর মতে দলিল হলো– فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا

বার বার আকাশের দিকে তাকানোর কারণ : কা'বা মুসলমানদের কেবলা হোক এটাই ছিল রাসূল ﷺ-এর আন্তরিক কামনা। তবে নবীগণ কোনো দরখাস্ত পেশ করার অনুমতি আছে বলে না জানা পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কোনো দরখাস্ত পেশ করতেন না। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী ﷺ এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বাহ্নেই পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কিবলা পরিবর্তনের জন্য দোয়া করছিলেন এবং তা কবুল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। এ কারণেই তিনি বার বার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতেন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) এ সম্পর্কে কোনো ওহী নিয়ে আসছে কি-না। আলোচ্য আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দোয়া কবুল করার ওয়াদা করা হয়। فَلَنُوَلِّيَنَّكَ অর্থাৎ আমি আপনার চেহারা মোবারক সে দিকেই ফিরিয়ে দেব যে দিকে আপনি পছন্দ করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সেদিকে মুখ করার আদেশ নাজিল করা হয় যে, فَوَلِّ وَجْهَكَ এর বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক। এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়। –[কুরতুবী]

কা'বাকে মসজিদুল হারাম বলা : কা'বা নির্দিষ্টভাবে আল্লাহর ঘরের নাম। কা'বা শব্দটি বায়তুল্লাহর পার্শ্ববর্তী হেরেমকে শামিল করে না। মসজিদে হারাম বললে পূর্ণ হেরেমকে বুঝায়, যেখানে কা'বাও শামিল। যা দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাজে দিক রক্ষা করা ওয়াজিব। হুবহু কা'বাকে সামনে রাখা ওয়াজিব নয়।– আয়াতুল আহকাম

কুরআনে মসজিদে হারাম দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ -এর উল্লেখ কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে রয়েছে। এর দ্বারা কয়েকটি অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন–

(১) اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ অর্থ কা'বা। আল্লাহ বলেন– فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ جِهَةَ الْكَعْبَةِ তথা কা'বার দিকে আপনার চেহারা ফিরিয়ে নিন।

(২) اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ অর্থ পূর্ণ মসজিদ। যেমন নবী করীম ﷺ বলেন,

صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

(৩) তৃতীয় অর্থ– মক্কা শরীফ। যেমন আল্লাহ বলেন–

سُبْحٰنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى

(৪) চতুর্থ অর্থ হলো পূর্ণ হেরেম। যেমন আল্লাহ বলেন–

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا

এখানে অমুসলিমদের হেরেমে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

يَعْرِفُوْنَهٗ -এর ، সর্বনামের প্রত্যাবর্তনস্থল : অধিকাংশ ওলামার মতে ، সর্বনাম দ্বারা রাসূলে আকরাম ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে। তাওরাত ও ইনজীলে রাসূল ﷺ -এর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা হুজুরকে ঠিক তেমনিভাবে চিনতে পেরেছে যেমনভাবে পিতা তার সন্তানকে চিনতে পারে। হাজার ছেলের ভীড়েও পিতা তার ছেলেকে সনাক্ত করতে ও চিনে নিতে মোটেই ভুল করে না। তাদেরও নবী পরিচিতি এ পর্যায়েই ছিল।

ইবনে আব্বাস, কাতাদা, রাবী প্রমুখের মতে ، সর্বনামটি اَمْرُ الْقِبْلَةِ বুঝাতে এসেছে। অর্থাৎ কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি যে সত্য ও আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যাদিষ্ট, এ বিষয়টি নিজ সন্তানকে চেনার ন্যায় সুস্পষ্টভাবে তারা জানে ও বুঝে, যদিও তারা তা স্বীকার করে না।

قَوْلُهٗ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ "তারা حَقَّ গোপন করে।" এখানে حَقَّ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

(ক) মুজাহিদ, কাতাদাহ প্রমুখের মতে اَلْحَقُّ দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তের যাবতীয় নিদর্শন ও প্রমাণাদী উদ্দেশ্য।

(খ) কারো মতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টিকে اَلْحَقُّ বলা হয়েছে। তবে প্রথম অভিমতটি অগ্রগণ্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَلّٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

يَشَاءُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . أ) জিনস মোরাক্কাব اَجْوَف يَائِىْ ও مَهْمُوْز لَامْ অর্থ- সে চাইবে।

صِرَاطٍ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে صُرُطٌ অর্থ- রাস্তা, উদ্দেশ্য দীন ইসলাম।

مُسْتَقِيْمٍ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- সোজা।

يَتَّبِعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- সে অনুসরণ করে।

لَا يُضِيْعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَفْى فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ض . ى . ع) মাসদার اَلْاِضَاعَةُ জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- তিনি নষ্ট করেন না।

قَدْ نَرٰى : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস মোরাক্কাব, مَهْمُوْز عَيْن ও نَاقِص يَائِىْ অর্থ- আমরা দেখতে পাই।

لَنُوَلِّيَنَّكَ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ لَام تَاكِيْد بَا نُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة دَرْ فِعْل مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- অবশ্যই অবশ্যই আমি পরিবর্তন করে দিব।

تَرْضٰهَا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلرِّضْوَانُ মূলবর্ণ (ر . ض . و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- তুমি পছন্দ করবে, তুমি রাজি হবে।

وَلِّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- তুমি মুখ ফিরাও।

وَلُّوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনসে لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- তারা মুখ ফিরিয়ে নিল।

أَتَيْتَ — সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ فِعْلْ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ অর্থ– তুমি এসেছ।

اتَّبَعْتَ — সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাবে اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ– (ت . ب . ع) জিনসে صَحِيْح অর্থ– তুমি অনুসরণ করতে।

বাক্য বিশ্লেষণ

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ : এখানে سَيَقُوْلُ হলো فِعْل আর السُّفَهَاءُ হলো فَاعِلْ তার مِنَ আর النَّاسِ হলো حَرْف جَارّ এবং তার مَجْرُوْر অতএব جَارّ ও مَجْرُوْر মিলে مَحْذُوْف -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে السُّفَهَاءُ থেকে حَالْ হয়েছে। এখন فِعْل তার فَاعِلْ সহ جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا : এখানে مَا অর্থ اَىُّ شَىْءٍ যা مُبْتَدَأْ আর وَلّٰى হলো فِعْل তাতে هُوَ ضَمِيْر টি উহ্য থেকে فَاعِلْ এই ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ হলো مَا আর هُمْ হলো مَفْعُوْل আর عَنْ হলো حَرْف جَارّ আর قِبْلَةِ শব্দটি اَلَّتِىْ আর مَوْصُوْف হয়ে مُرَكَّبْ اِضَافِىْ এই বাক্যটি مُضَافْ اِلَيْهِ হচ্ছে هِمْ ও مُضَافْ হলো حَرْف جَارّ ও عَلٰى হচ্ছে فَاعِلْ এবং ضَمِيْر هُمْ হলো তার فَاعِلْ তাতে فِعْل হলো كَانُوْا এবং اِسْم مَوْصُوْل হলো তার كَانُوْا তার فَاعِلْ এভাবে ; مُتَعَلِّقْ -এর সাথে كَانُوْا মিলে مَجْرُوْر ও جَارّ এখন مَجْرُوْر তার هَا صِفَتْ ও مَوْصُوْف এখন صِفَتْ সহ صِلَة তার اَلَّتِىْ এখন ;صِلَة হয়ে جُمْلَة فِعْلِيَّة মিলে مُتَعَلِّقْ ও مُتَعَلِّقْ -এর সাথে وَلّٰى একত্রিত হয়ে হরফে জারের عَنْ তার مَجْرُوْر এখন ;مَجْرُوْر মিলে حَرْف جَارّ এভাবে وَلّٰى তার فَاعِلْ ও مُتَعَلِّقْ সহ جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে خَبَرْ হয়েছে, مُبْتَدَأْ ও خَبَرْ একত্রিত হয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة اِنْشَائِيَّة হয়েছে।

لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ : এখানে لِلّٰهِ শব্দটি جَار ও مَجْرُوْر মিলে ثَابِتٌ শিবহে فِعْل -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে خَبَر مُقَدَّمْ এবং الْمَشْرِقُ হলো مَعْطُوْف عَلَيْهِ আর وَاوْ হলো حَرْف عَطْف ও الْمَغْرِبُ হলো مَعْطُوْف এখন مَعْطُوْف عَلَيْهِ তার مَعْطُوْف সহ مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ এখন مُبْتَدَأْ ও خَبَرْ একত্রিত হয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ : كَذٰلِكَ -এর মুশাব্বাহ বিহীটি উহ্য, মূল ইবারত হলো

كَمَآ اَنْعَمْنَا عَلَيْكُمْ بِالْهِدَايَةِ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا : বাক্যটিতে جَعَلْنَا ফে'ল ও ফা'য়েল كُمْ প্রথম মাফউল اُمَّةً দ্বিতীয় মাফউল এবং وَّسَطًا হলো حَالْ ; দ্বিতীয় মাফউলটি তার ذُو الْحَالِ ; এবং لِتَكُوْنُوْا -এর لِ এর পর اَنْ উহ্য থেকে নসব দিচ্ছে। তাই تَكُوْنُوْا -এর خَبَر হয়েছে, لِ টি كَىْ -এর অর্থে গৃহীত, তাই মূল বাক্যটি ছিল, لِاَنْ تَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ : تَكُوْنُوْا

وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً : বাক্যাংশে اِنْ প্রকৃতপক্ষে اِنَّ ছিল। তাখফীফ করে اِنْ করা হয়েছে।

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا : বাক্যটিতে يَكُوْنَ ফে'লে নাকেস, الرَّسُوْلُ তার اِسْم ও شَهِيْدًا তার خَبَرْ; এবং جَارّ ও مَجْرُوْر মিলে شَهِيْدًا এর সাথে مُتَعَلِّقْ ;

الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (١٤٧)

অনুবাদ : (১৪৭) এই বাস্তব সত্য আপনার প্রভুর নিকট হতে সুতরাং আপনি কখনো সংশয়ীদের মধ্যে পরিগণিত হবেন না।

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٤٨)

(১৪৮) আর প্রত্যেক [ধর্মাবলম্বী] ব্যক্তির জন্য এক একটি কেবলা রয়েছে যার দিকে সে মুখ করে থাকে, সুতরাং তোমরা নেক কাজের দিকে ধাবিত হও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে হাজির করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ শক্তিমান।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (١٤٩)

(১৪৯) আর যেখান হতে আপনি বাইরে যান স্বীয় চেহারা [নামাজে] মসজিদে হারামের দিকে রাখবেন আর নিশ্চয় এটা সম্পূর্ণ ঠিক আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে, আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্বন্ধে মোটেই বেখবর নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۚ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (١٥٠)

(১৫০) আর যেখান হতেই আপনি বাইরে যান, নিজের চেহারা মসজিদে হারামের দিকে রাখবেন, আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারা এর দিকেই রাখবে যেন লোকের জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার সুযোগ না থাকে, তাদের মধ্যে অবিচারীরা ব্যতীত। অতএব, তোমরা এরূপ লোকদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকে ভয় করতে থাক, আর তোমাদের প্রতি আমার প্রদত্ত নিয়মাত যেন পূর্ণ করে দিতে পারি, আর যেন তোমরা সঠিক পথে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ

১৪৭. اَلْحَقُّ এই বাস্তব সত্য مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রভুর নিকট হতে فَلَا تَكُوْنَنَّ সুতরাং আপনি কখনো পরিগণিত হবেন না مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ সংশয়ীদের মধ্যে।

১৪৮. وَلِكُلٍّ আর প্রত্যেক [ধর্মাবলম্বী] ব্যক্তির জন্য وِّجْهَةٌ এক একটি কেবলা রয়েছে هُوَ مُوَلِّيْهَا যার দিকে সে মুখ করে থাকে فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ সুতরাং তোমরা নেক কাজের দিকে ধাবিত হও اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا তোমরা যেখানেই থাক না কেন يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا আল্লাহ তোমাদের সকলকে হাজির করবেন اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ সর্ববিষয়ে قَدِيْرٌ পূর্ণ শক্তিমান।

১৪৯. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ আর যেখান হতে আপনি বাইরে যান فَوَلِّ وَجْهَكَ স্বীয় চেহারা রাখবেন [নামাজে] شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে হারামের দিকে وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ আর নিশ্চয় এটা সম্পূর্ণ ঠিক مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ আর আল্লাহ মোটেই বেখবর নন عَمَّا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের আমল সম্বন্ধে।

১৫০. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ আর যেখান হতেই আপনি বাইরে যান فَوَلِّ وَجْهَكَ নিজের চেহারা রাখবেন شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে হারামের দিকে وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ আর তোমরা যেখানেই থাক فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ তোমাদের চেহারা রাখবে شَطْرَهٗ এর দিকেই لِئَلَّا يَكُوْنَ যেন না থাকে لِلنَّاسِ লোকের জন্য عَلَيْكُمْ তোমাদের বিরুদ্ধে حُجَّةٌ সমালোচনা করার সুযোগ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ তাদের মধ্যে অবিচারীরা ব্যতীত فَلَا تَخْشَوْهُمْ অতএব, তোমরা এরূপ লোকদেরকে ভয় করো না; وَاخْشَوْنِيْ বরং আমাকে ভয় করতে থাক وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ আর তোমাদের প্রতি আমার প্রদত্ত নিয়মাত যেন পূর্ণ করে দিতে পারি وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ আর যেন তোমরা সঠিক পথে থাক।

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (١٥١)

অনুবাদ : (১৫১) যেমন আমি প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্যে একজন রাসূল তোমাদের মধ্য হতে, তিনি পাঠ করে শুনাচ্ছেন তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ এবং তোমাদেরকে [কুপ্রথা থেকে] নির্মল করছেন, আর তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় শিখাচ্ছেন, আর শিখাচ্ছেন তোমাদেরকে এমন বিষয় যার কিছুই তোমরা জানতে না।

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ (١٥٢)

(১৫২) অতএব, [এ নিয়ামতের দরুন] তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব, আর আমার শোকর কর এবং আমার না-শোকরি করো না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

(১৫৩) হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۚ بَلْ اَحْيَاۤءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

(১৫৪) আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে এরূপ বলো না যে, তারা মৃত; বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫১) كَمَآ اَرْسَلْنَا যেমন আমি প্রেরণ করেছি فِيْكُمْ তোমাদের মধ্যে رَسُوْلًا একজন রাসূল مِّنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে, يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ তিনি পাঠ করে শুনাচ্ছেন তোমাদেরকে اٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহ وَيُزَكِّيْكُمْ আর তোমাদেরকে নির্মল করছেন وَيُعَلِّمُكُمْ এবং তোমাদেরকে শিখাচ্ছেন الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় وَيُعَلِّمُكُمْ আর শিখাচ্ছেন তোমাদেরকে مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ এমন বিষয় যার কিছুই জানতে না।

(১৫২) فَاذْكُرُوْنِيْٓ অতএব, [এ নিয়ামতের দরুন] তোমরা আমাকে স্মরণ কর اَذْكُرْكُمْ আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব وَاشْكُرُوْا لِيْ আর আমার শোকর কর وَلَا تَكْفُرُوْنِ এবং আমার না-শোকরি করো না।

(১৫৩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে মুমিনগণ! اسْتَعِيْنُوْا তোমরা আশ্রয় গ্রহণ কর بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

(১৫৪) وَلَا تَقُوْلُوْا আর এরূপ বলো না যে لِمَنْ يُّقْتَلُ যারা নিহত হয় فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে اَمْوَاتٌ তারা মৃত بَلْ اَحْيَاۤءٌ বরং তারা জীবিত وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।

(১৫৫) আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিঞ্চিৎ ভয় দ্বারা, আর উপবাস দ্বারা এবং ধনের ও প্রাণের ও ফল-শস্যের স্বল্পতা দ্বারা, আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে।	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ (١٥٥)
(১৫৬) যখন তাদের উপর কোনো মসিবত আসে, তখন বলে, আমরা তো আল্লাহরই আয়ত্তে, আর আমরা সকলে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী।	اَلَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (١٥٦)

শাব্দিক অনুবাদ

১৫৫. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ আর আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ কিঞ্চিৎ ভয় দ্বারা وَالْجُوْعِ আর উপবাস দ্বারা وَنَقْصٍ এবং স্বল্পতা দ্বারা مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ ধনের ও প্রাণের وَالثَّمَرَاتِ ও ফল-শস্যের وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে।

১৫৬. اَلَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ যখন তাদের উপর মসিবত আসে قَالُوْٓا তখন বলে إِنَّا لِلّٰهِ আমরা তো আল্লাহরই আয়ত্তে وَإِنَّآ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ আর আমরা সকলে আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫৩) قوله وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** দ্বিতীয় হিজরিতে ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে যে বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মুসলমানদের মাঝে আটজন আনসার ও ছয়জন মুহাজির মোট চৌদ্দজন সাহাবী মারা যান। তখন ইসলামের শত্রুরা বলাবলি করতে শুরু করে, যারা মুহাম্মদের কথায় এভাবে মারা গেল তারা কত দুর্ভাগা ও বোকা! অযথা ধর্মের নামে প্রাণ বিসর্জন দিল! আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, যারা দীনের জন্য এভাবে প্রাণ-বিসর্জন দেয়, তারা দুর্ভাগা নয়; বরং তারা বড়ই ভাগ্যবান এবং তারা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বাক্যটি তিনবার এবং وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ বাক্যটি দু'বার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর একটি সাধারণ কারণ এই যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য তো এক হৈ-চৈয়ের ব্যাপার ছিলই, স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে ছিল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। কাজেই এই নির্দেশটি যদি যথার্থ তাকীদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা না হতো, তাহলে মনের প্রশান্তি অর্জন হয়তো যথেষ্ট সহজ হতো না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, তদুপরি এতে এরূপ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কেবলার এই যে পরিবর্তন, এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এরপর পুনঃপরিবর্তনের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। প্রথমবারের নির্দেশ" :

"অতঃপর তুমি তোমার মুখমণ্ডল মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং যেখানেই তুমি থাক না কেন, এরপর থেকে তুমি তোমার চেহারা সেদিকেই ফিরাবে।" এ নির্দেশটি মুকীম অবস্থায় থাকার সময়ের। অর্থাৎ যখন আপনি আপনার স্থায়ী বাসস্থানে অবস্থান করেন, তখন নামাজে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন। এরপর সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ; নিজের দেশে বা সফরে যেখানেই থাক না কেন, নামাজে বায়তুল্লাহর দিকেই মুখ ফিরাবে, এ নির্দেশ শুধু মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার বেলাতেই নয়; বরং যে কোনো স্থানের লোকেরা নিজ নিজ শহরে যখন নামাজ পড়বে, তখন তারা মসজিদুল হারামকেই কেবলা বানিয়ে নামাজ পড়বে।

এ নির্দেশ দ্বিতীয়বার পুনরুল্লেখ করার পূর্বে وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ অর্থাৎ, "যেখানেই তুমি বের হয়ে যাও না কেন" কথাটা যোগ করে বুঝানো হয়েছে যে, নিজ নিজ বাসস্থানে মুকীম থাকা অবস্থায় যেমন তোমরা মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে, তেমনি কোথাও সফরে বের হলেও নামাজের সময় মসজিদুল হারমের দিকে মুখ করেই দাঁড়াবে।

তৃতীয়বারের পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, বিরোধীরা যাতে এ কথা বলতে না পারে যে, তাওরাত এবং ইঞ্জিলে উল্লিখিত নির্দেশসমূহের মধ্যে আখেরী জমানার প্রতিশ্রুত নবীর কেবলা মসজিদুল হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু রাসূল ﷺ এ কা'বার পরিবর্তে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কেবলা করে নামাজ পড়ছেন কেন?

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا শব্দটিতে وِجْهَةٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু, যার দিকে মুখ করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ কেবলা। এক্ষেত্রে হযরত উবাই ইবনে কা'ব– وِجْهَةٌ -এর স্থলে قِبْلَةٌ ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে।

তাফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই, প্রত্যেক জাতিরই ইবাদতের সময় মুখ করার জন্য একটা নির্ধারিত কেবলা চলে আসছে। সে কেবলা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, অথবা তারা নিজেরাই তা নির্ধারণ করে নিয়েছে। মোটকথা, ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোনো না কোনো দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উম্মতগণের জন্য যদি কোনো একটা বিশেষ দিককে কেবলা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কি আছে?

এ পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তনসংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কেবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

كَمَا أَرْسَلْنَا –বাক্যে উদাহরণসূচক যে, ك (কাফ) বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা তো উল্লিখিত তাফসীরের মাধ্যমেই বুঝা গেছে। এছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেছেন। তা হলো এই যে, 'কাফ' এর সম্পর্ক হলো পরবর্তী আয়াত فَاذْكُرُونِي এর সাথে। অর্থাৎ, আমি যেমন তোমাদের প্রতি কেবলাকে একটি নিয়ামত হিসেবে দান করেছি এবং অতঃপর দ্বিতীয় নিয়ামত দিয়েছি রাসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহর জিকিরও আরেকটি নিয়ামত। এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নিয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে। কুরতুবী (র.) বলেন, এখানে كَمَا أَرْسَلْنَا এর 'কাফ'টির ব্যবহার ঠিক তেমনি, যেমনটি সূরা আনফালের كَمَا أَخْرَجَكَ এবং সূরা হিজরের كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ -এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ এতে 'জিকির' এর অর্থ হলো স্মরণ করা, যার সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। তবে জিহ্বা যেহেতু অন্তরের মুখপাত্র, কাজেই মুখে স্মরণ করাকেও 'জিকির' বলা যায়। এতে বুঝা যায় যে, সে মৌখিক জিকিরই গ্রহণযোগ্য, যার সাথে মনে মনেও আল্লাহর স্মরণ বিদ্যমান থাকবে।

তবে এতদসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো লোক যদি মুখে তাসবীহ জপে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মন যদি অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ, জিকিরে না লাগে, তবুও তা একেবারে ফায়দাহীন নয়। হযরত আবূ উসমান (র.) এর কাছে জনৈক ভক্ত এমনি অবস্থায় অভিযোগ করেছিল যে, মুখে মুখে জিকির করি বটে, কিন্তু অন্তরে তার কোনোই মাধুর্য অনুভব করতে পারি না। তখন তিনি বললেন, তবুও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি তোমার একটি অঙ্গ জিহ্বাকে তো অন্ততঃ তাঁর জিকিরে নিয়োজিত করেছেন। –[কুরতুবী]

জিকিরের ফজিলত : জিকিরের ফজিলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও কম ফজিলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন। হযরত আবূ উসমান মাহদী (র.) বলেছেন যে, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি কেমন করে জানতে পারেন? বললেন, তা এজন্য যে, কুরআনে কারীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোনো মুমিন বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহর স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন।

আর আয়াতের অর্থ হলো এই যে, তোমরা যদি আমাকে আমার হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে ছওয়াব ও মাগফেরাত দানের মাধ্যমে স্মরণ করব।

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র.) 'জিকরুল্লাহ'র তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, জিকিরের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তার বক্তব্য হচ্ছে- "যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহর জিকিরই করে না; প্রকাশ্যে যত বেশি নামাজ এবং তাসবীহই সে পাঠ করুক না কেন।"

জিকিরের তাৎপর্য : মুফাসসির কুরতুবী ইবনে খোয়াইয (র.)-এর আহকামুল কুরআনের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে, যদি তার নফল নামাজ রোজা কিছু কমও হয়, সেই আল্লাহকে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচারণ করে, সে নামাজ রোজা, তাসবীহ-তাহলীল প্রভৃতি বেশি করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকে স্মরণ করে না। হযরত যুননুনে মিসরী (র.) বলেন: "যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহকে স্মরণ করে সে অন্যান্য সব কিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাজত করেন এবং সব কিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।"

হযরত মু'আয (রা.) বলেন, "আল্লাহর আজাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোনো আমলই জিকরুল্লাহর সমান নয়।" হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে-কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।

ধৈর্য ও নামাজ যাবতীয় সংকটের প্রতিকার : اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ "ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর," -এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দু'টি বিষয়ের মধ্যেই নিহিত। একটি 'সবর' বা ধৈর্য এবং অন্যটি সালাত বা 'নামাজ'। বর্ণনারীতির মধ্যে اسْتَعِينُوا শব্দটিকে বিশেষ কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে যে মর্মার্থ দাঁড়ায় তা এই যে, মানব জাতির যে কোনো সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকারই ধৈর্য ও নামাজ। যে কোনো প্রয়োজনেই এ দু'টি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। তাফসীরে মাযহারীতে শব্দ দু'টির ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের তাৎপর্য এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্বতন্ত্রভাবে দু'টি বিষয়েরই তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে।

সবর-এর তাৎপর্য : 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও নফসের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ।

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর' এর তিনটি শাখা রয়েছে। এক. নফসকে হারাম এবং নাজায়েজ বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা। দুই. নফসকে ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং তিন. যে কোনো বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ, যে সব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেওয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোনো কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়, তবে তা 'সবর' -এর পরিপন্থি নয়। -[ইবনে কাসীর, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে]

'সবর'-এর উপরিউক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণতঃ তৃতীয় শাখাকেই সবর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম দুটি শাখা যে এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দু'টি বিষয়ও যে 'সবর' এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কুরআন হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরিউক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, "ধৈর্যধারণকারীরা কোথায়?" এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। 'ইবনে কাসীর' এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, কুরআনের অন্যত্র- إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ, সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসেবে প্রদান করা হবে- এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

নামাজ : মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট দূর করা এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে নামাজ। 'সবর' এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার ইবাদতই সবরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরেও নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, নামাজ এমনই একটি ইবাদত, যাতে 'সবর' তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। কেননা নামাজের মধ্যে একাধারে যেমন নফস তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ

চিন্তা এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। সে মতে নিজের 'নফস' এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার গুনাহ ও অশোভন আচার-আচরণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে 'সবর' এর যে অনুশীলন করতে হয়, নামাজের মধ্যেই তার একটা পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে।

যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভ করার ব্যাপারে নামাজের একটা বিশেষ 'তাছীর' বা প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ রোগে কোনো কোনো ওষধী গুল্ম-লতা ও ডাল-শিকড় গলায় ধারণ করায় বা মুখে রাখায় যেমন বিশেষ ফল লক্ষ্য করা যায়, লোহার প্রতি চুম্বকের বিশেষ আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক; কিন্তু কেন এরূপ হয়, তা যেমন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না, তেমনি বিপদ মুক্তি এবং যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে নামাজের তাছীরও ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যথাযথ আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে নামাজ আদায় করলে যেমন বিপদমুক্তি অবধারিত, তেমনি যেকোনো প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও এতে সুনিশ্চিত ফল লাভ হয়।

হুজুর [illegible]-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখনই নামাজ আরম্ভ করতেন। আর আল্লাহ তা'আলা সে নামাজের বরকতেই তাঁর যাবতীয় বিপদাপদ দূর করে দিতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে– إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ অর্থাৎ, মহনবী [illegible]-কে যখনই কোনো বিষয় চিন্তিত করে তুলত, তখনই তিনি নামাজ পড়তে শুরু করতেন।

আল্লাহর সান্নিধ্য : 'নামাজ' এবং 'সবরে'র মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দু'পন্থায়ই আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়। إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নামাজি এবং সবরকারীগণের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোনো শক্তি কিংবা কোনো সংকটই যে টিকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বান্দা যখন আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মতো শক্তি কারো থাকে না। বলাবাহুল্য, মাকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই হতে পারে।

আলমে-বরযখে নবী এবং শহীদগণের হায়াত : ইসলামি রেওয়ায়েত মোতাবেক প্রত্যেক মৃতব্যক্তি আলমে-বরযখে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আজাব বা ছওয়াব অনুভব করে থাকে। এই জীবন-প্রাপ্তির ব্যাপারে মুমিন কাফের এবং পুণ্যবান ও গুনাগারের কোনো পার্থক্য নেই। তবে বরযখের এ জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রেণির লোকই সমানভাবে শরিক। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রাসূল এবং বিশেষ নেক্কার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যেসব লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। সাধারণভাবে অবশ্য তাঁদের মৃত বলাও জায়েজ। তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তাহলো অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁদের বেশি অনুভূতি দেওয়া হয়। যেমন, মানুষের পায়ের গোঁড়ালী ও হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ, উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে, কিন্তু গোঁড়ালীর তুলনায় আঙ্গুলের অনুভূতি বেশি তীক্ষ্ণ। তেমনি, সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরযখের জীবনে বহুগুণ বেশি অনুভূতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এমনকি শহীদের এ জীবনানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মরদেহেও এসে পৌঁছে থাকে। অনেক সময় তাঁদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না, জীবিত মানুষের দেহের মতোই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাঁদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টিত হয়, তাঁদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে।

এ হায়াতের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ শহীদগণের চাইতেও অনেক বেশি মর্তবার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও বাহ্যিক হুকুম, আহকামে আর কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। যথা, তাঁদের পরিত্যক্ত কোনো সম্পদ বন্টন করার রীতি নেই। তাঁদের স্ত্রীগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারেন না।

মোটকথা, বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রাসূগণ, অতঃপর শহীদগণ এবং তার পর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তিবর্গ। অবশ্য কোনো কোনো হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আউলিয়া এবং নেক্কার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে তাঁরাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অন্যান্য নেক্কার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদায় বেশি।

যদি কোনো শহীদের লাশ মাটিতে নষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, আল্লাহর পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয়তো নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ শহীদের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোনো শহীদের লাশ যদি মাটির নিচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠায় কোনো সন্দেহ নেই, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ এখানে টিকছে না। কেননা মানুষের লাশ যে কেবলমাত্র মাটিতেই বিনষ্ট হয় তাই নয়। অনেক সময় ভূমিস্থ অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোনো কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনষ্ট হওয়া সম্ভব। নবী রাসূল ও শহীদগণের লাশ মাটিতে ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বুঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোনো ধাতু কিংবা রাসায়নিক প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না।

নবী রাসূলগণের পবিত্র দেহও যে সাধারণ মানব দেহের মতো বিভিন্ন উপকরণের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁদের দেহও অস্ত্রের আঘাত কিংবা ওষুধের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবান্বিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নবী রাসূলগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় এবং শহীদগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় বেশি শক্তিসম্পন্ন হতে পারে না। নবী-রাসূলগণের জীবিত দেহে অস্ত্র এবং অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা অন্য কোনো উপাদানের প্রভাবে যদি শহীদের লাশে কোনো প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা 'মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারে না'- এ হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না।

সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদের লাশ অধিককাল পর্যন্ত মাটির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়াকে তাদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দু'অবস্থাতেই হতে পারে। প্রথমতঃ চিরকাল মরদেহ অবিকৃত থাকার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়তঃ অন্যান্যের তুলনায় অনেক বেশিদিন অবিকৃত থাকার মাধ্যমে। যদি বলা হয় যে, তাঁদের দেহও সাধারণ লোকের দেহের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে বেশিদিন অবিকৃত থাকে এবং হাদীসের দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে, তবে তাও অবাস্তব হবে না। যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না, সেহেতু কুরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে لَا تَشْعُرُوْنَ [তোমরা বুঝতে পার না,] বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মতো অনুভূতি তোমাদের হয়নি।

বিপদে ধৈর্যধারণ : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের যে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার তাৎপর্য وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। কোনো বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানি অনেক বেশি হয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। পরীক্ষায় সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে সমষ্টিগতভাবেই তার পুরস্কার দেওয়া হবে; এছাড়াও সবরের পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে।

বিপদে 'ইন্নালিল্লাহ' পাঠ করা : আয়াতে সবরকারীগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে- "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দোয়াটি পাঠ করে। কেননা এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম ছওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি অর্থের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তিলাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَاتَكُوْنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف با نون ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنَ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা কখনো হয়ো না।

مُوَلِّيْهَا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– মুখকারী।

اسْتَبِقُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِبَاقُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অগ্রসর হও, প্রতিযোগিতা কর।

يَأْتِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ অর্থ– সে আসে।

حُجَّةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন حجج অর্থ– দলিল, প্রমাণ।

تَهْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা রাস্তা পাও, পাবে।

يُزَكِّيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْكِيَةُ মূলবর্ণ– (ز ـ ك ـ و) অর্থ– তিনি পবিত্র করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ الخ : আলোচ্য আয়াতাংশে حُجَّةٌ হচ্ছে يَكُوْنَ-এর ইসম ও جار হলো لِلنَّاسِ مجرور ও মিলে তার খবর।

اَمْوَاتٌ : শব্দটি خبر হয়েছে। আর তার مبتدأ হলো উহ্য هُمْ এবং اَحْيَاءٌ শব্দটিও خبر হয়েছে, তার مبتدأ হলো উহ্য هم এবং اَمْوَاتٌ ও اَحْيَاءٌ কে لَا تَقُوْلُوْا-এর معمول বানানো সহীহ নয়।

قوله وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ الخ : আয়াতটিতে لَنَبْلُوَنَّ ফে'ল উহ্য যমীর نَحْنُ হলো فاعل ও كم হলো مفعول আর بِشَيْءٍ টি جار ও مجرور মিলে উহ্য ثابت-এর সাথে متعلق এর- فعل কিন্তু مِنَ الْخَوْفِ টি جار ও مجرور মিলে উহ্য ثابت-এর সাথে متعلق হয়েছে। نَقْصٌ-এর صفة এর- شَيْءٌ শব্দটি ثَابِتٌ আর পরবর্তী مِنَ الْاَمْوَالِ الخ টি جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে। অতঃপর فعل তার فاعل, مفعول ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

অনুবাদ : (১৫৭) তাদের প্রতি [বর্ষিত] হবে বিশেষ বিশেষ করুণাসমূহ তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এবং সাধারণ করুণাও। আর এরাই এমন লোক যারা [তত্ত্বজ্ঞানে] পৌঁছেছে।	أُولَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٧)
(১৫৮) নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর স্মৃতি-নিদর্শনের অর্ন্তভুক্ত, অতএব, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ করে কিংবা ওমরা করে, তার কোনোই গুনাহ নেই, যাতায়াত করতে- এতদুভয়ের মধ্যে, আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো নেক কাজ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সমুচিত মূল্য প্রদান করেন, খুব ভালোরূপে জানেন।	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨)
(১৫৯) নিশ্চয়, যারা গোপন করে আমার অবতারিত বিষয়গুলোকে যা উজ্জ্বল ও সুপথ প্রদর্শনকারী, আমি ঐগুলোকে সর্বসাধারণের জন্য কিতাবে প্রকাশ করে দেওয়ার পর, তাদেরকে লা'নত করেন আল্লাহও, আর লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করেন।	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَٰتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَٰبِ ۙ أُولَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّٰعِنُونَ (١٥٩)
(১৬০) কিন্তু যারা তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, আর ব্যক্ত করে দেয়, তবে তাদের প্রতি আমি দৃষ্টি করি, আর আমি তো তওবা কবুল করায় এবং অনুগ্রহ করায় খুবই অভ্যস্ত।	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٦٠)

শাব্দিক অনুবাদ

১৫৭. أُولَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ তাদের প্রতি [বর্ষিত] হবে صَلَوَاتٌ বিশেষ বিশেষ করুণাসমূহ مِّن رَّبِّهِمْ তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে وَرَحْمَةٌ এবং সাধারণ করুণাও وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ আর এরাই এমন লোক যারা [তত্ত্বজ্ঞানে] পৌঁছেছে।

১৫৮. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ আল্লাহর স্মৃতি-নিদর্শনের অর্ন্তভুক্ত فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ অতএব, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ করে أَوِ اعْتَمَرَ কিংবা ওমরা করে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ তার কোনোই গুনাহ নেই أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا যাতায়াত করতে- এতদুভয়ের মধ্যে وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো নেক কাজ করে فَإِنَّ اللَّهَ তবে আল্লাহ তা'আলা شَاكِرٌ সমুচিত মূল্য প্রদান করেন عَلِيمٌ খুব ভালোরূপে জানেন।

১৫৯. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ নিশ্চয়, যারা গোপন করে مَآ أَنزَلْنَا আমার অবতারিত বিষয়গুলোকে مِنَ الْبَيِّنَٰتِ যা উজ্জ্বল وَالْهُدَىٰ ও সুপথ প্রদর্শনকারী مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ আমি ঐগুলোকে প্রকাশ করে দেওয়ার পর لِلنَّاسِ সর্বসাধারণের জন্য فِي الْكِتَٰبِ কিতাবে أُولَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ তাদেরকে লা'নত করেন আল্লাহও وَيَلْعَنُهُمُ اللَّٰعِنُونَ আর লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করেন।

১৬০. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا কিন্তু যারা তওবা করে وَأَصْلَحُوا এবং সংশোধন করে নেয় وَبَيَّنُوا আর ব্যক্ত করে দেয় فَأُولَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ তবে তাদের প্রতি আমি দৃষ্টি করি وَأَنَا আর আমি তো খুবই অভ্যস্ত التَّوَّابُ তওবা কবুল করায় الرَّحِيمُ এবং অনুগ্রহ করায়।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦١)

অনুবাদ : (১৬১) অবশ্য যারা ইসলাম গ্রহণ করে না এবং এ কাফের অবস্থায় মারা যায়, তাদের প্রতি লা'নত আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং মানবেরও [অর্থাৎ উভয় কুলের লানতকারীরও]।

خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (١٦٢)

(১৬২) তারা অনন্তকাল তাতেই থাকবে, তাদের না আজাব হালকা হবে, আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (١٦٣)

(১৬৩) আর যিনি তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য তিনি তো একই মা'বুদ, তিনি ব্যতীত অন্য কানো মা'বুদ নেই, পরম দয়ালু করুণাময়।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَٰفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَتَصْرِيفِ الرِّيَٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَٰتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٦٤)

(১৬৪) নিশ্চয় আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির আগমনে এবং জাহাজসমূহে যা সমুদ্রে চলাচল করে মানুষের লাভজনক পণ্যদ্রব্য নিয়ে, আর পানিতে যা আল্লাহ আসমান হতে বর্ষণ করেন। অতঃপর সরস সতেজ করেন তা দ্বারা জমিনকে তা অনুর্বর হওয়ার পর, আর সর্বপ্রকারের জীবজন্তু তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর বায়ুরাশির পরিবর্তনে এবং মেঘমালায়– যা আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকে, প্রমাণসমূহ আছে সেই লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬১) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا অবশ্য যারা ইসলাম গ্রহণ করে না وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ এবং এ কাফের অবস্থায় মারা যায় أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ তাদের প্রতি লা'নত আল্লাহর وَالْمَلَٰئِكَةِ ফেরেশতাদের وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ এবং মানবেরও [অর্থাৎ উভয় কুলের লানতকারীরও]।

(১৬২) خَٰلِدِينَ فِيهَا তারা অনন্তকাল তাতেই থাকবে لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ তাদের না আজাব হালকা হবে وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে।

(১৬৩) وَإِلَٰهُكُمْ আর যিনি তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য إِلَٰهٌ وَاحِدٌ তিনি তো একই মা'বুদ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ তিনি ব্যতীত অন্য কানো মা'বুদ নেই الرَّحْمَٰنُ পরম দয়ালু الرَّحِيمُ করুণাময়।

(১৬৪) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ নিশ্চয় আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃজনে وَاخْتِلَٰفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির আগমনে وَالْفُلْكِ এবং জাহাজসমূহে الَّتِي تَجْرِي যা চলাচল করে فِي الْبَحْرِ সমুদ্রে بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ মানুষের লাভজনক পণ্যদ্রব্য নিয়ে وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ আর যা আল্লাহ বর্ষণ করেন مِنَ السَّمَاءِ আসমান হতে مِنْ مَاءٍ পানিতে فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ অতঃপর সরস সতেজ করেন তা দ্বারা জমিনকে بَعْدَ مَوْتِهَا তা অনুর্বর হওয়ার পর وَبَثَّ فِيهَا আর তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ সর্বপ্রকারের জীবজন্তু وَتَصْرِيفِ الرِّيَٰحِ আর বায়ুরাশির পরিবর্তনে وَالسَّحَابِ এবং মেঘমালায়– الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ যা আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকে لَآيَٰتٍ প্রমাণসমূহ আছে لِقَوْمٍ সেই লোকদের জন্য يَعْقِلُونَ যারা জ্ঞান রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫৮) قوله إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** সাফা ও মারওয়া কা'বা ঘরের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়, এ দু'টি পাহাড়ের মাঝে হযরত হাজেরা (আ.) পানি অন্বেষণে দৌড়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার এ দৌড়ানোকে অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাত বার প্রদক্ষিণ করাকে হজ্জ ও ওমরার অংশ নির্ধারণ করে দেন। জাহেলিয়াতের যুগে মক্কার মুশরিকরা সাফা পাহাড়ের চূড়ায় 'ইসাফ' নামের এক নরমূর্তি ও মারওয়ার পাহাড়ের চূড়ায় 'নায়েলা' নামের এক নারীমূর্তি স্থাপন করে তারা নিজস্ব নিয়মে হজ্জ পালনকালে সাফা ও মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করত এবং পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মূর্তিগুলোকে স্পর্শ করত চুম্বন করত এবং এগুলোর পাশে দোয়া করত। তাই ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানগণ দু'টি পাহাড়ের মাঝে প্রদক্ষিণ করাকে গর্হিত ও পরিত্যাজ্য হওয়ার ধারণা করেন। তাদের এ ধারণা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

(১৫৯) قوله إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, একবার সাহাবায়ে কেরামের এক দল ইহুদি পণ্ডিতের নিকট তাওরাতের কয়েকটি বিধান সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা যথাযথ উত্তর প্রদান করেনি। ইহুদিদের মধ্য হতে যারা মুসলমান হয়েছিলেন তারা এবং মুসলমানদের মধ্য হতে যারা তাওরাত পড়তে পারতেন তারা এ ভুল ধরিয়ে দিতে সক্ষম হন।
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাওরাতে বর্ণিত থাকলেও তারা নবীর আত্মপ্রকাশের পর তা রদবদল করে বর্ণনা করতে শুরু করে। অথচ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, আমি তাওরাতে বর্ণিত আলামতের দ্বারা নবীজীকে সঠিকভাবে চিনে নিতে সক্ষম হই, এমনকি আমি আমার ছেলেকে চেনার চেয়েও তাঁকে সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারি।
ইহুদিদের মধ্যে বিবাহিত নর ও নারী ব্যভিচারে ধরা পড়ে। ইহুদিরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে তিনি তাওরাতের শাস্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ দেন। তাওরাতে এর শাস্তি কুরআনের বিধানের অনুরূপ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা, হুজুর ﷺ তা জানতেন। তারা কিতাব এনে বিধান লেখা স্থানটি হাতে ঢেকে পড়তে শুরু করে এবং অন্য বিধান বর্ণনা করার প্রয়াস চালায়। তখন উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে যারা তাওরাত পড়া জানতেন তারা হাতে ঢাকা স্থান হতে হাত সরিয়ে পড়তে বললেন। এমতাবস্থায় তারা তাওরাতের বিধান গোপন রাখতে ব্যর্থ হলো।
উল্লিখিত সবগুলো ঘটনাই এ আয়াতসমূহের শানে নুযূল হতে পারে।

(১৬৪) قوله إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** যখন পূর্ববর্তী আয়াত وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ নাজিল করা হয়, তখন কাফেররা বলতে শুরু করে, এত বিশাল ব্রাহ্মাণ্ডের জন্য এক ইলাহ, কিভাবে তা সম্ভব? নিশ্চয় আরো ইলাহ রয়েছে। তখন মহান আল্লাহ ক্ষমতায় সার্বভৌমত্ব ও একত্ব প্রকাশ করতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।
কুরাইশরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিদর্শন দাবি করত। তারা বলত, যদি এই কাজটি করতে পারেন, তাহলে করে দেখান। কিন্তু তা দেখানোর পর তারা সেটিকে জাদু বা ইত্যাকার কোনো শব্দ দ্বারা বিশেষিত করত, কিন্তু ঈমান আনত না। যেমন একবার এক কুরইশী যুবক এসে নবীজীকে বলে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টিকে স্বর্ণের দ্বারা পরিবর্তন করে দিতে পারেন তাহলে আমাদের দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে। তখন আমরা আপনাকে নবী মেনে নিতে কোনো দ্বিধা করব না। শুনে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট এই মর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আদায় করলেন। এরপর নবীজীর দোয়ার প্রেক্ষিতে হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে হুজুরের সমীপে উপস্থিত হন এবং বলেন, আপনার পক্ষ থেকে এ মু'জিযা দেখাবার পরও তারা ঈমান আনবে না। আর আল্লাহর নিয়ম হলো মু'জিযা দেখানোর পরও যদি ঈমান না আনে, তাহলে তিনি কাফেরদের নির্মূল করে দেন। সেই নিয়মে তিনি আপনার উম্মতকেও নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। এ কথা শুনে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁপে উঠলেন এবং বললেন, "তাদের কাঙ্ক্ষিত মু'জিযা দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আমি দাওয়াত দিতে থাকব, হয়তো তাতেই তারা ঈমান আনতে থাকবে।' তখন এই আয়াত নাজিল হয়। তাতে আল্লাহর নিদর্শন হিসাবে যে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, সত্যান্বেষীদের জন্য তাই কি কম? তাই কি যথেষ্ট নয়? অবশ্যই যথেষ্ট ও অধিক। –[ইবনে কাসীর]

قوله شَعَائِرِ اللهِ **-এর অর্থ :** شَعَائِر শব্দটি شَعِيْرَةٌ-এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ চিহ্ন ও নিদর্শন। شَعَائِرِ اللهِ বলতে সেই সব কাজ কর্ম ও ইবাদতকে বুঝায় যে গুলোকে আল্লাহ তা'আলা দীনের নির্দশন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহর নির্দেশিত সকল নিদর্শন, যেমন আযান, জামাতে নামাজ আদায় করা ইত্যাদি এবং ইবাদতের সকল স্থান যেমন কা'বাঘর, আরাফাত, মুযদালিফা ও মিনার প্রান্তর ইত্যাদিকে شَعَائِرِ اللهِ বলে।

حَجّ ও عُمْرَة-এর অর্থ : حَجّ -এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য স্থির করা ও সংকল্প গ্রহণ করা। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় زِيَارَةُ بَيْتِ اللّٰهِ فِىْ وَقْتِ الْحَجِّ مَعَ اَدَاءِ الْوَاجِبِ بِالطَّرِيْقَةِ الْمَسْنُوْنَةِ ইবাদতের সংকল্প গ্রহণ করে মক্কা নগরীতে গমন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে বিশেষ ধরনের কয়েকটি কার্য সম্পাদন করাকে হজ্জ বলে।

عُمْرَة -এর আভিধানিক অর্থ : জিয়ারত করা, আবাদ করা বা দর্শন করা। শরিয়তের পরিভাষায়, কা'বা ঘর তওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করা এবং এগুলো করার জন্য ইহরাম বাঁধাকে ওমরা বলে। ওমরার শেষে হজ্জের ন্যায় মাথা কামাতে হয়।

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ বলার কারণ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ কথাটি সন্দেহভাজন করতে এভাবে বলা হয়েছে। নয়তো কাজটি পূর্ণতাই ছওয়াবের এবং ইবাদত হিসেবে হজ্জ ও ওমরার অংশ। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) কে হজ্জের যাবতীয় বিধান শিক্ষা দেন। তম্মধ্যে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ (প্রদক্ষিণ) করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু জাহেলী যুগে মক্কার মুশরিকরা সাফা ও মারওয়ার শীর্ষদেশে ইসাফ ও নায়েলা নামের দু'টি প্রতিমা স্থাপন করে এবং সা'ঈ করার সময় এই গুলোকে তারা সম্মান প্রদর্শন করতে থাকে। ফলে ইসলামের প্রথমযুগে মুসলমানদের সন্দেহ জাগে যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা সম্ভবত অনৈসলামিক কাজ এবং তাতে নিশ্চয় ছওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে। এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এ সন্দেহ দূর করার জন্য এ আয়াত নাজিল করেন যে, সা'ঈ করায় কোনো গুনাহ হবে না।

সা'ঈর হুকুম : সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)-এর মতে সুন্নত। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ফরজ এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওয়াজিব।

হজ্জ ও ওমরার ফরজ ও ওয়াজিব : হজ্জের ফরজ তিনটি যথা–(১) ইহরাম বাঁধা, (২) যিলহজ্জের নয় তারিখে আরাফার ময়দানে অবস্থান ও (৩) তওয়াফে জিয়ারত।
হজ্জের ওয়াজিব পাঁচটি যথা–[১] মুযদালিফায় অবস্থান [২] তওয়াফে জিয়ারতের পর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা (প্রদক্ষিণ) [৩] কঙ্কর নিক্ষেপ করা, [৪] মক্কার বাইরের লোকদের জন্য তওয়াফে বিদা এবং [৫] মাথা কামানোর মাধ্যমে ইহরাম ভঙ্গ করা।
ওমরার ফরজ দু'টি যথা–(১) ইহরাম বাঁধা ও (২) কা'বাঘর তওয়াফ করা।
ওমরার ওয়াজিব তিনটি যথা (১) তওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমের নিকটে দু'রাকাত নামাজ আদায় করা। (২) সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার প্রদক্ষিণ করা এবং (৩) মাথা কামিয়ে ইহরাম ভঙ্গ করা।

হজ্জ ও ওমরার মাঝে পার্থক্য : হজ্জ ও ওমরার মাঝে পার্থক্য হলো– (১) হজ্জ ফরজ, কিন্তু ওমরাহ ফরজ নয়। (২) হজ্জ বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে আদায় করতে হয়, কিন্তু ওমরাহ যিলহজ্জের পাঁচ দিন (৯ হতে ১৩ তারিখ) ব্যতীত অন্য যে কোনো দিন আদায় করা যায়।
(৩) ওমরার তুলনায় হজ্জের কাজ অনেক বেশি, ওমরা হতে তওয়াফ ও সা'ঈ করতে হয় হজ্জে এগুলো ছাড়াও আরাফাতে অবস্থান, মুযদালিফায় অবস্থান, মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ ও কুরবানি ইত্যাদি কাজগুলো সম্পাদন করতে হয়।

হজ্জের حُكْم ও তার দলিল : হজ্জ মানব জীবনে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে একবার ফরজ। চাই পুরুষ হোক আর মহিলা হোক। এটা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত সত্য। কুরআন যেমন– وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا হাদীস যেমন– بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ .... الخ আর ইজমা যেমন–সকল ওলামায়ে উম্মত হজকে ফরজ হিসেবে মেনে নিয়েছেন, কেউ এর বিরোধিতা করেননি।

সাফা-মারওয়ার প্রদক্ষিণের হুকুম : ফিকহবিদগণ সাফা-মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ করার হুকুম সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। যেমন– (১) ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদের (র.) একটি মত হলো– এটা হজ্জের রোকন যে সা'ঈ বাদ দেবে তার হজ্জ হবে না।
(২) ইমাম আযম (র.)-এর মতে সা'ঈ ওয়াজিব; রোকন নয়, কেউ যদি বাদ দেয় তাহলে دَمٌ ওয়াজিব হবে।
(৩) ইমাম আহমদের দ্বিতীয় মত হলো–এটা সুন্নত, বাদ পড়লে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

উভয় পক্ষের দলিল : প্রথম পক্ষ নবী করীম -এর হাদীস اِسْعَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْىَ -কে দলিল হিসেবে পেশ করেন। দ্বিতীয় পক্ষ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا অর্থাৎ সা'ঈ করলে কোনো গুনাহ নেই। গুনাহ রহিত করার দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা রোকন নয়। তবে নবী কারীম অন্যান্য কাজের মতো তা আদায় করেছেন বিধায় وَاجِبٌ বলা যায়। তৃতীয় পক্ষ দলিল হিসেবে বলেন, আল্লাহ তা'আলা وَمَنْ تَطَوَّعَ বলেছেন, ওয়াজিব বলেননি।

হজের শর্তসমূহ : হজ কিছু শর্তসাপেক্ষে জীবনে একবার ফরজ। এ শর্তগুলোর অনুপস্থিতে হজ ফরজ হবে না। চাই সে পুরুষ হোক বা নারীই হোক। প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ– (১) মুসলমান (২) বালেগ (৩) বুদ্ধিমান (৪) স্বাধীন হওয়া (৫) রাস্তা নিরাপদ থাকা (৬) اِسْتِطَاعَتْ তথা সক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকা ইত্যাদি।

ইলমে দীনের প্রকাশ ও প্রচার করা ওয়াজিব এবং গোপন করা হারাম : উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর, সমস্ত প্রকৃষ্ট হেদায়েত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজেও লা'নত বা অভিস্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায় :

প্রথমতঃ যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরি, তা গোপন করা হারাম। রাসূলে কারীম **ইরশাদ করেছেন**– 'যে লোক দীনের কোনো বিধানের বিষয় জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দিবেন।' হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা ও আমর ইবনে আস (রা.) থেকে ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

ফিকহবিদগণ বলেছেন, এ অভিসম্পাত আরোপিত হবে তখনই, যখন অন্য কোনো লোক সেখানে উপস্থিত থাকবে না। যদি অন্যান্য আলেম লোকও সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে একথা বলে দেওয়া যেতে পারে যে, অন্য কোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করে নাও। –[কুরতুবী, জাস্সাস]

দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, 'জ্ঞানকে গোপনা করার' অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যা দ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা كِتْمَانِ عِلْم বা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লিখিত আয়াতে مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তেমনিভাবে মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, 'তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমন সব হাদীস শোনাও যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেতনা-ফ্যাসাদেরই সম্মুখীন করবে।–[কুরতুবী]

সহীহ বুখারীতে হযরত আলী (রা.) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে, তিনি বলেছেন, 'সাধারণ মানুষের সামনে ইলমের শুধুমাত্র ততটুকু প্রকাশ করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ধারণ করতে পারে। মানুষ আল্লাহ ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক; তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যেকথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানারকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে।

কোন কোন পাপের জন্য সমগ্র সৃষ্টি লা'নত করে : وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ –আয়াতে কুরআনে কারীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি। তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ ও ইকরিমা (রা.) বলেছেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। এমনকি জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। কারণ তাদের অপকর্মের দরুন সেসব সৃষ্টিরও ক্ষতিসাধিত হয়। হযরত বা'রা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে রাসূলে কারীম বলেছেন, اَللّٰعِنُوْنَ -এর অর্থ হলো সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণশীল সমস্ত প্রাণী। –[কুরতুবী]

কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি লা'নত করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ নয় যতক্ষণ না তার কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণের বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় : وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ –বাক্যাংশের দ্বারা জাসসাস ও কুরতুবী প্রমুখ উদ্ভাবন করেছেন যে, যে কাফের কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারো শেষ পরিণতির [মৃত্যুর] নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোনো উপায় নেই, সেহেতু কোনো কাফেরের নাম নিয়ে তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েজ নয়। বস্তুতঃ রাসূলে কারীম ﷺ যে সমস্ত কাফেরের নামোল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাফের ও জালেমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা জায়েজ।

এতে একথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোনো কাফেরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোনো মুসলমান কিংবা কোনো জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ আমাদের নারী সম্প্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে। তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও অভিসম্পাত বা লা'নত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসূর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। কাজেই কাউকে 'মরদুদ', 'আল্লাহর অভিশপ্ত' প্রভৃতি শব্দে গালি দেওয়াই লা'নতেরই সমপর্যায়ভুক্ত।

আরবের মুশরিকরা যখন নিজেদের বিশ্বাসের পরিপন্থি আয়াত وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ শুনল, তখন বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, সারা বিশ্বেরই কি একজন মাত্র উপাস্য হতে পারে? যদি এ দাবি যথার্থ হয়ে থাকে, তবে তার কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তারই প্রমাণ পেশ করেছেন আলোচ্য আয়াতে।

তাওহীদের মর্মার্থ : وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ বিভিন্নভাবেই আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে। উদাহরণতঃ তিনি একক, সমগ্র বিশ্বে না আছে তাঁর তুলনা, না আছে কোনো সমকক্ষ। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

দ্বিতীয়ত : উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক। অর্থাৎ, তাঁকে ছাড়া অন্য আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়।

তৃতীয়ত : সত্তার দিক দিয়েও তিনি একক। অর্থাৎ, অংশী বিশিষ্ট নন। তিনি অংশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। তাঁর বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না।

চতুর্থত : তিনি তাঁর আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি তখনো বিদ্যমান ছিলেন, যখন অন্য কোনো কিছুই ছিল না এবং তখনো বিদ্যমান থাকবেন যখন কোনো কিছুই থাকবে না। অতএব, তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁকে وَاحِدٌ বা 'এক' বলা যেতে পারে। وَاحِدٌ শব্দটিতে উল্লিখিত যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান রয়েছে। –[জাসসাস]

তারপর আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা ও একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ।

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ তা'আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, একান্ত তরল ও প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পিছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি চলতে পারতো না; তেমনি এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হতো না। এ বিষয়টিই কুরআনে হাকীমে এভাবে উল্লেখ করেছে : إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ অর্থাৎ "আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং তখন এ সমস্ত জাহাজ সাগর পৃষ্ঠে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে যাবে।"

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ : শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানি রফতানি করার মাঝেও মানুষের এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা গণনাও করা যায় না। আর এ উপকারিতার ভিত্তিতেই যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

এমনভিাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোনোকিছুর ক্ষতিসাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোনো মানুষ, জীব-জন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন মতো ছ' মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর কোনোক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ অর্থাৎ, "আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।"

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত খাল-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। তারপর এমন এক ফলগুধারা সমগ্র জমিনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যে কোনোখানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এই পানিরই একটা অংশকে জমাট বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত; অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রকৃতিক ঝর্ণাধারার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সারকথা, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তাওহীদ বা একত্ববাদই প্রমাণ করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَجَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَجُّ মূলবর্ণ (ح . ج . ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ইচ্ছা করা, হজ করা।

اعْتَمَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِمَارُ মূলবর্ণ (ع . م . ر) জিনস صحيح অর্থ– সে ওমরা করে।

يَطَّوَّفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّطَوُّفُ মূলবর্ণ (ط . و . ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে তওয়াফ করে।

تَطَوَّعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّطَوُّعُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে নফল আমল করে।

يَلْعَنُ : সীগাহ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَللَّعْنُ মূলবর্ণ (ل . ع . ن) জিনসে صحيح অর্থ– সে লা'নত করে।

بَيَّنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা বর্ণনা করেছে।

تُوْبُ সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাবে نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি তওবা কবুল করি।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ : বাক্যটিতে الصَّفَا ও الْمَرْوَةَ শব্দ দু'টি إِنَّ এর اسم আর مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ টি جار ও مجرور মিলে إِنَّ এর خبر পরবর্তী বাক্য فَمَنْ حَجَّ الخ শর্ত ও فَلَا جُنَاحَ الخ তার জবাব। তার পরবর্তী বাক্যে مَنْ تَطَوَّعَ টি শর্ত ও فَاِنَّ اللّٰهَ হলো جزاء বিধায় উভয় বাক্যের উপর فاء جزائية এসেছে।

قوله إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الخ : এখানে إِنَّ হচ্ছে حرف مشبهة بالفعل আর الَّذِيْنَ মওসূল يَكْتُمُوْنَ ফে'ল, যমীর هم ফায়েল مَا اَنْزَلْنَا বাক্যটি يَكْتُمُوْنَ এর মাফউল مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى বয়ান مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا মুতা'আল্লাক হলো يَكْتُمُوْنَ-এর সাথে। এ সমস্ত মিলিত হয়ে صلة । موصول ও صلة মিলিত হয়ে ইসমে إِنَّ হলো اُولٰٓئِكَ মুবতাদা يَلْعَنُهُمُ الخ খবর। মুবতাদা ও খবর মিলিত হয়ে খবরে ان।

قوله إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا الخ : এখানে مستثنى متصل নসবের স্থলে অবস্থিত يَلْعَنُهُمْ-এর যমীর هم হলো مستثنى منه এবং الخ كَفَرُوْا الَّذِيْنَ ইসমে إِنَّ আর اُولٰٓئِكَ মুবতাদা عَلَيْهِمْ খবরে মুকাদ্দাম لَعْنَةُ اللّٰهِ মুবতাদা, মুবতাদা খবর মিলিত হয়ে খবরে إِنَّ হয়েছে وَهُمْ كُفَّارٌ হাল।

خٰلِدِيْنَ : হাল হলো عَلَيْهِمْ এর যমীর হতে لَا يُخَفَّفُ হাল হলো خَالِدِيْنَ এর যমীর হতে اِلٰهُكُمْ-এর মধ্যে اِلٰهٌ খবর وَاحِدٌ তার সিফাত।

قوله إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ : এখানে إِنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل আর فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ الخ এর খবর এবং لَاٰيٰتٍ হলো ইসম يَعْقِلُوْنَ বাক্য হয়ে قَوْمٍ-এর সিফাত।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ (١٦٥)

অনুবাদ (১৬৫) আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকেও অংশী সাব্যস্ত করে, তাদেরকেও এমনভাবে ভালোবাসে, যেমন ভালোবাসা আল্লাহর সঙ্গে হওয়া আবশ্যক, আর যারা মুমিন তাদের ভালোবাসা আল্লাহর সঙ্গেই সুদৃঢ় রয়েছে; আর কতই না ভালো হতো যদি এই জালিমরা যখন কোনো বিপদ দেখে তখন এটা বুঝত যে, সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই, আর আল্লাহর আজাব কঠোর হবে।

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ

(১৬৬) যখন মাতাব্বরগণ তাবেদারগণ হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে এবং সকলেই আজাব প্রত্যক্ষ্য করবে এবং তাদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ (١٦٧)

(১৬৭) আর এই তাবেদারগণ বলবে, যদি আমরা একটু [দুনিয়ায়] ফিরে যেতে পারতাম, তবে আমরাও তাদের হতে সম্পূর্ণ পৃথক হতাম যেমন [আজ] তারা আমাদের হতে পরিষ্কার পৃথক হয়ে পড়েছে; আল্লাহ এরূপেই তাদেরকে তাদের কুকর্মগুলো নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষারূপে দেখিয়ে দিবেন। আর তাদের দোজখ হতে বের হওয়া কখনো নছীবে ঘটবে না।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (١٦٨)

(১৬৮) হে মানব! যা জমিনে রয়েছে তা হতে হালাল পবিত্র জিনিসগুলো খাও, আর শয়তানের অনুসরণ করো না, বাস্তবিক সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬৫) وَمِنَ النَّاسِ আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে مَنْ يَّتَّخِذُ যে সাব্যস্ত করে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত অন্যকেও اَنْدَادًا অংশী يُّحِبُّوْنَهُمْ তাদেরকেও এমনভাবে ভালোবাসে كَحُبِّ اللّٰهِ যেমন ভালোবাসা আল্লাহর সঙ্গে হওয়া আবশ্যক وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا আর যারা মুমিন اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ তাদের ভালোবাসা আল্লাহর সঙ্গেই সুদৃঢ় রয়েছে وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا আর কতই না ভালো হতো যদি এই জালিমরা এটা বুঝত যে اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ যখন কোনো বিপদ দেখে তখন اَنَّ الْقُوَّةَ সমস্ত ক্ষমতা لِلّٰهِ আল্লাহরই وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ আর আল্লাহর আজাব কঠোর হবে।

(১৬৬) اِذْ تَبَرَّاَ যখন সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا মাতাব্বরগণ مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا তাবেদারগণ হতে وَرَاَوُا الْعَذَابَ এবং সকলেই আজাব প্রত্যক্ষ্য করবে وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ এবং তাদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

(১৬৭) وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا আর এই তাবেদারগণ বলবে لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً যদি আমরা একটু [দুনিয়ায়] ফিরে যেতে পারতাম فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ তবে আমরাও তাদের হতে সম্পূর্ণ পৃথক হতাম كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا যেমন [আজ] তারা আমাদের হতে পরিষ্কার পৃথক হয়ে পড়েছে كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ আল্লাহ এরূপেই তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন اَعْمَالَهُمْ তাদের কুকর্মগুলো حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষারূপে وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ আর তাদের বের হওয়া কখনো নছীবে ঘটবে না مِنَ النَّارِ দোজখ হতে।

(১৬৮) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে মানব! كُلُوْا খাও مِمَّا فِى الْاَرْضِ যা জমিনে রয়েছে حَلٰلًا طَيِّبًا হালাল পবিত্র জিনিসগুলো وَّلَا تَتَّبِعُوْا আর অনুসরণ করো না خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ শয়তানের اِنَّهٗ لَكُمْ বাস্তবিক সে তোমাদের عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ প্রকাশ্য শত্রু।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦٩)

অনুবাদ : (১৬৯) সে তো তোমাদেরকে তাই শিক্ষা দিবে যা মন্দ ও অশ্লীল, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন উক্তি কর যার কোনো প্রমাণই তোমাদের নিকট নেই।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠)

(১৭০) আর যখন কেউ তাদেরকে বলে, আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী চল, তখন তারা বলে, বরং আমরা তাতেই [ঐ পথেই] চলব যাতে আমাদের পূর্বপুরুষগণকে পেয়েছি, যদিও তাদের পূর্বপুরুষরা কোনো জ্ঞানই রাখত না এবং কোনো হেদায়েতপ্রাপ্তও ছিল না [তবুও?]।

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ۗ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٧١)

(১৭১) আর এ কাফেরদের অবস্থা সেই [জন্তুর] অবস্থার অনুরূপ যে, কেউ এরূপ জন্তুর পিছনে চিৎকার করছে, যে শুধু আহ্বান ও চিৎকার ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পায় না, এই কাফেররা বধির, বোবা ও অন্ধ, সুতরাং কিছুই বুঝে না।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢)

(১৭২) হে মুমিনগণ! যে পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে খাও, আর আল্লাহর শোকরগুজারী কর যদি তোমরা খাছ তাঁরই সঙ্গে গোলামীর সম্পর্ক রেখে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ

১৬৯. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ সে তো তোমাদেরকে তাই শিক্ষা দিবে যা بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ মন্দ ও অশ্লীল وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন উক্তি কর مَا لَا تَعْلَمُونَ যার কোনো প্রমাণই তোমাদের নিকট নেই।

১৭০. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ আর যখন কেউ তাদেরকে বলে اتَّبِعُوا مَآ أَنْزَلَ اللهُ আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী চল قَالُوا তখন তারা বলে بَلْ نَتَّبِعُ বরং আমরা তাতেই [ঐ পথেই] চলব مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا যাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে পেয়েছি أَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ যদিও তাদের পূর্ব পুরুষরা لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا রাখত না কোনো জ্ঞানই وَّلَا يَهْتَدُونَ এবং কোনো হেদায়েতপ্রাপ্তও ছিল না [তবুও?]।

১৭১. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا আর এ কাফেরদের অবস্থা كَمَثَلِ الَّذِي সেই [জন্তুর] অবস্থার অনুরূপ যে يَنْعِقُ কেউ এরূপ জন্তুর পিছনে চিৎকার করছে بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً যে শুধু আহ্বান ও চিৎকার ব্যতীত আর কিছুই শুনতে পায় না صُمٌّ এই কাফেররা বধির بُكْمٌ বোবা عُمْيٌ ও অন্ধ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ সুতরাং তারা কিছুই বুঝে না।

১৭২. يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا হে মুমিনগণ! كُلُوا খাও مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ যে পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ আর আল্লাহর শোকরগুজারী কর إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ যদি তোমরা খাছ তাঁরই সঙ্গে গোলামীর সম্পর্ক রেখে থাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৬৮) قوله يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জারীর হতে বর্ণিত। এই সমস্ত আয়াত ছকীফ, খাযা'য়া, আমের ইবনে ছা'ছা' ও অন্যান্য আরব কাফেরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ষাঁড় ও অন্যান্যের মাংস হারাম মনে করত। -[ইবনে জারীর, রূহুল মা'আনী]

অথবা, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং কয়েককজন নওমুসলিম সাহাবীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মুসলমান হওয়ার পরও উটের গোশ্ত নিজেদের উপর হারাম মনে করত। কেননা ইহুদি ধর্মে তা হারাম ছিল। তাদের প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

অথবা, যে সমস্ত লোক খেজুর, পনির ইত্যাদি সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী নিজেদের উপর হারাম করেছিল, তাদের প্রসঙ্গে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[রূহুল মা'আনী]

(১৭০) قوله وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদের প্রতি ঈমান গ্রহণের আহবান জানালে, ইহুদিদের মধ্য হতে রাফে' ইবনে হারমালা এবং মালেক ইবনে আউফ বলল, আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদের পথেই চলব, তাদের পথ আমরা কখনো ছাড়তে পারব না। তাদের প্রসঙ্গে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[রূহুল মা'আনী]

অথবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার মুশরিকদেরকে তাদের পিতৃ পুরুষদের অবৈধ রীতি-নীতি ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের আহবান জানালে তারা তা প্রত্যাখান করে এবং বলে, আমরা ঐ পথেই চলব, যে পথে আমাদের বাপ-দাদাগণ চলতেন, তখন তাদের প্রসঙ্গে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[বায়যাবী]

أَنْدَادًا -এর অর্থ : أَنْدَادًا শব্দটি نِدٌّ-এর বহুবচন। نِدٌّ অর্থ সমকক্ষ, সমপর্যায় বা শরিক। আয়াতে أَنْدَادًا দ্বারা কি উদ্দেশ্য? সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়-(১) ঐ সকল মূর্তি ও অবতার যেগুলোকে মুশরিকরা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির জন্য মাধ্যম বলে ধারণা করত, তাদের পূজা-অর্চনা করত এবং তাদের পক্ষ থেকে ভালো-মন্দ প্রাপ্তির ভ্রান্ত বিশ্বাস রাখত। অধিকাংশ মুফাসসিরদের এটিই অভিমত। (২) ঐ সকল নেতা, পণ্ডিত ও পুরোহিত, মুশরিক ও কাফেররা যাদের অনুসরণ করে, যারা নিজ মর্জি মাফিক হুকুম-আহকাম প্রচার করে এবং বলে বেড়ায় যে, এগুলোই ধর্মীয় বিধান ও ঐশী নির্দেশ। আর এভাবেই তারা পার্থিব কিছু সম্পদ ও সম্মান অর্জন করে থাকে এটি আল্লামা সুদ্দীর অভিমত। (৩) সুফীদের মতে, যা কিছু মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করে তাই نِدٌّ -

قوله يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ -এর মর্মার্থ : আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ- আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালোবাসে। কাফের মুশরিকরা ইলাহ হিসেবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেগুলোকে গ্রহণ করে তাদের প্রতি তারা কতটুকু ভালোবাসা পোষণ করে, আয়াতাংশে তা-ই উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি কতক লোক দ্বারা মুশরিকদের বিবরণ দেওয়া হয়, তাহলে অর্থ হবে, তারা আল্লাহকে যতটুকু ভালোবাসে অন্য দেব-দেবীকেও ঠিক ততটুকুই ভালোবাসে। কিন্তু যদি কতক লোক দ্বারা কাফের ও নাস্তিক সমাজের কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন হয়, কাফের ও নাস্তিকরা তো আল্লাহকে স্বীকারই করে না, তাই আল্লাহকে ভালোবাসার কথাও তো এখানে অসামঞ্জস্য। তখন তার উত্তরে বলা হয় ঃ (১) হয়তো আয়াতাংশের অর্থ- كَحُبِّ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ মু'মিনদের আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসার সমতুল্য তাদের দেব-দেবীর প্রতি ভালোবাসা। অথবা, (২) আয়াতাংশের অর্থ, كَالْحُبِّ اللَّازِمِ عَلَيْهِمْ لِلَّهِ আল্লাহর প্রতি তাদের যে পরিমাণ ভালোবাসা থাকা সমুচিত সে পরিমাণ ভালোবাসা তারা দেব-দেবীর জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে।

قوله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ الخ -এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'আলা মু'মিনেদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে বলছেন, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তারা আল্লাহর প্রতি যে ভালোবাসা পোষণ করে তা জাগতিক অন্য সকল ভালবাসা থেকে দৃঢ়তম।

এ আয়াতাংশের অর্থ হতে পারে- মু'মিনগণ অন্য সকল কিছুর প্রতি যে পরিমাণ আন্তরিক আকর্ষণ ও ভালোবাসা পোষণ করে যেমন স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদি তার তুলনায় আল্লাহর প্রতি অধিক ভালোবাসা পোষণ করে।

অথবা, আয়াতাংশের অর্থ– অমুসলিম সমাজ নিজ নিজ মনগড়া দেব-দেবী বা নাস্তিক তার নিজ নিজ মনপ্রভুকে যতটুকু ভালোবাসে মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহকে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ ভালবাসে। অমুসলিমদের বিপরীতে মু'মিনদের এই বিবরণই এখানে অধিক সঙ্গত, তাই ওলামায়ে কেরাম এ অর্থটিকেই অধিক পছন্দ করেছেন।

অমুসলিমদের দেব-দেবীর প্রতি বা নেতা, পুরোহিতের প্রতি ভালোবাসা অনেক সময় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে থাকে, অনেক সময় আন্তরিক হলেও তা বিপদাপদের মুহূর্তে উঠে যায়। অপরদিকে মুসলমানদের বিপদাপদে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর প্রেমে সে এতটুকু আত্মহারা থাকে যে, আল্লাহর শত্রুর সাথে মোকাবিলায় নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতেও তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না।

قوله وَلَوْ يَرَى -এর رُؤْيَة -এর মর্মার্থ : وَلَوْ يَرَى -এর رُؤْيَة কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে তাফসীরকারকদের দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. رُؤْيَة অর্থ দেখা ও প্রত্যক্ষ করা। তখন আয়াতের অর্থ হবে– যদি জালিম সম্প্রদায় দুনিয়ায় থাকাকালেই আখেরাতের আজাব প্রত্যক্ষ করত তখন বুঝতে পারত যে সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

২. رُؤْيَة অর্থ জানা। তখন আয়াতাংশের অর্থ হবে– যদি জালিম সম্প্রদায় দুনিয়ায় থাকা কালেই আখেরাতের আজাব সম্পর্কে জানত, তাহলে তারা বুঝতে পারত।

قوله تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ -এর মর্মার্থ : এই আয়াতাংশের অর্থ– তাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। যেহেতু কিয়ামত ও তার পরবর্তী জান্নাত বা জাহান্নামে অবস্থানের যাবতীয় অবস্থা অবশ্যই ঘটবে, তাই এ সকল অবস্থা বর্ণনায় مَاضِي -এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেন অতীতের ন্যায় এগুলো ঘটে গেছে তাই সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নেই। মানুষের একে অপরের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, নতুবা বন্ধুত্বের। এক কামনা বা একই পেশাভুক্ত হওয়ার কারণে এই বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। কিন্তু কিয়ামতের ভীষণ বিচার দিনের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে সেদিন সকল সম্পর্কই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একে অপরের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্কের কথাই স্বীকার করবে না। কারণ এ কথাই অপর এক আয়াতে এভাবে বিবৃত হয়েছে– يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ –যেদিন লোক তার ভাই, মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তান থেকে পালাতে থাকবে। অথচ বন্ধুত্বের চেয়ে আত্মীয়তার সম্পর্কই থাকে দৃঢ়তর। তাই যেদিন আত্মীয়তাই বহাল থাকবে না। সেদিন বন্ধুত্বের সম্পর্ক তো প্রকাশিতই হবে না।

قوله فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ -এর মর্মার্থ : মুশরিক ও ভণ্ড নেতাদের অনুসারীরা বলবে, যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে তারা আল্লাহর নির্দেশের পূর্ণ অনুসরণ করত এবং অনুসৃতদের নিকট থেকে দূরে থাকত। মোদ্দাকথা, এগুলো দ্বারা তাদের আফসোসের মাত্রাই বৃদ্ধি পাবে, কোনো ফায়দা হবে না। –[রুহুল মা'আনী]

قوله كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا দ্বারা উদ্দেশ্য : ভ্রান্ত নেতা ও সমাজপ্রধান এবং তাদের অনুসারীদের পরিণতির কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতগণ যেভাবে ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত হয়ে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, মুসলমানদেরকে তা হতে সতর্ক করে দেওয়া এবং নেতা ও কর্তাদের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেওয়াই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। যেন তারা আল্লাহর দুশমন নেতাদের পশ্চাতে চলতে কোনো সময়ই প্রস্তুত না হয়।

لَوْ -এর জবাব : وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا বাক্যে يَرَى ফে'ল, الَّذِينَ ظَلَمُوا -ফায়েল, অতঃপর বাক্যটি শর্ত আর শর্তের জবাব উহ্য। অর্থাৎ لَعَلِمُوا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ

শব্দ বিশ্লেষণ : حَلَالًا طَيِّبًا - حَلَّ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো গিঠ খোলা। যেসব বস্তু সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেওয়া হয়েছে, তাতে যেন একটা গিঠই খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল– ১. হালাল খাওয়া, ২. ফরজ আদায় করা এবং ৩. রাসূলে কারীম ﷺ -এর সুন্নতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। طَيِّبٌ শব্দের অর্থ পবিত্র। শরিয়তের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তু-সামগ্রীও এরই অন্তর্ভুক্ত।

خُطُوَاتٌ [খুতুওয়াত] خُطْوَةٌ [খুতওয়াতুন]-এর বহুবচন। خُطْوَة বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সুতরাং خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ এর অর্থ হচ্ছে শয়তানি কাজকর্ম।

بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ – سُوْء বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যে কোনো বুদ্ধিমান লোক দুঃখবোধ করে। فَحْشَاء অর্থ– অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে سُوْء এবং فَحْشَاء-এর মর্ম যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ। অর্থাৎ, সাধারন গুনাহ এবং কবিরা গুনাহ। اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ এখানে শয়তানের নির্দেশ দান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। যেমন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আদম-সন্তানদের অন্তরে একাধারে শয়তানি প্রভাব এবং ফেরেশতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। শয়তানি ওয়াসওয়াসার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের এলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্য কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন, দু'টি শব্দে বলা হয়েছে لَا يَعْقِلُوْنَ এবং لَا يَهْتَدُوْنَ এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা পূর্ব-পুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোনো খোদায়ী হেদায়েত। হেদায়েত বলতে সে সমস্ত বিধি-বিধানকে বুঝায়, যা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বুঝানো হয়েছে, যা শরিয়তের প্রকৃষ্ট 'নছ' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়।

অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হলো এই যে, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কোনো বিধি বিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বাণীর পর্যালোচনা-গবেষণা করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করে নেওয়ার মতো কোনো যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোনো আলেমের ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে ইজতেহাদ [উদ্ভাবন]-এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন মুজতাহিদ আলেমের আনুগত্য-অনুসরণ করা জায়েজ। অবশ্য এ আনুগত্য তাঁর ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্য নয়; বরং আল্লাহর এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মানার জন্যই তা হতে হবে। যেহেতু আমরা সরাসরি আল্লাহর সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারি না, সেহেতু কোনো মুজতাহিদ আলেমের অনুসরণ করি, যাতে করে আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করা যায়।

অন্ধ অনুসরণের এবং মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য : উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে মুজতাহিদ ইমামদের অুসরণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন, তারা নিজেরাই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নন।

এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, এ আয়াতে যে পূর্বপুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম হলো ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষের অনুসরণ। যথার্থ ও সঠিক বিশ্বাস এবং সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, সূরা ইউসুফে হযরত ইউনুস (আ.)–এর সংলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ দু'টি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে –

–'আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-এর ধর্মবিশ্বাসের।'

এ আয়াতের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা হারাম, কিন্তু বৈধ ও সৎকর্মের বেলায় তা জায়েজ; বরং প্রশংসনীয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজতাহিদ ইমামগণের আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল এবং অন্যান্য বিধি-বিধানেরও উল্লেখ করেছেন।

হালাল খাওয়ার বরকত ও হারাম খাদ্যের অকল্যাণ : আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ হারাম খেলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও অস্বচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, ইবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দোয়া কবুল হয় না, তেমনিভাবে হালাল খানায় অন্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয়। তা দ্বারা অন্যায় অস্বচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দোয়া কবুল হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রাসূলগণের প্রতি হেদায়েত করেছেন যে– يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا '(হে আমার রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর)।'

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোয়া কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদেগার! ইয়া রব!।' কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছেদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে? –[মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে কাছীর-এর বরাতে]

শব্দ বিশ্লেষণ

بَثَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَثُّ মূলবর্ণ (ب . ث . ث) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ছড়িয়েছে।

يُحِبُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح . ب . ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বন্ধু মনে করে, ভালোবাসে।

اتُّبِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ– যাদের অনুসরণ করা হয়েছে।

وَتَقَطَّعَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّقَطُّعُ মূলবর্ণ (ق . ط . ع) জিনস صحيح অর্থ– সে ছিন্ন হয়ে গেল।

كَرَّةً : এটি বাব نَصَرَ-এর মাসদার অর্থ– প্রত্যাবর্তন করা।

حَسَرٰتٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন حَسْرَةٌ ; অর্থ– আফসোস, দুঃখ, লজ্জা।

لَاتَتَّبِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা অনুসরণ করো না।

السُّوْٓءِ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اسواء। অর্থ– খারাপ কাজ, মন্দ, দোষ, অন্যায়, পাপ।

اَلْفَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْفَاءُ মূলবর্ণ– (ا . ل . ف) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমরা পেয়েছি।

يَنْعِقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ . فَتَحَ মাসদার اَلنَّعْقُ . اَلنَّعِيْقُ . اَلنُّعَاقُ মূলবর্ণ (ن . ع . ق) অর্থ– সে ডেকেছে, সে চিৎকার করেছে।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

(অনুবাদ : (১৭৩) আল্লাহ তো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন শুধু মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত, আর এমন জীব যা গায়রুল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, অবশ্য যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে, ভোগকামী ও সীমা অতিক্রমকারী না হয়, তবে তার কোনো পাপ হবে না; বাস্তবিকই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, করুণাময়।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٤)

(১৭৪) নিঃসন্দেহে, যারা আল্লাহর অবতারিত কিতাব গোপন করে এবং তৎপরিবর্তে নগণ্য সম্পদ আদায় করে, তারা আর কিছুই নয় শুধু নিজেদের পেটে অগ্নি পুরছে, আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না এবং তাদেরকে নির্মলও করবেন না, আর তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٥)

(১৭৫) তারা এমন লোক যারা [দুনিয়াতে] হেদায়েত ত্যাগ করে গোমরাহী আর [আখেরাতে] ক্ষমাপ্রাপ্তি ছেড়ে আজাব গ্রহণ করেছে, সুতরাং তারা দোজখের জন্য কত সাহসী।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦)

(১৭৬) এই শাস্তি এজন্য যে, আল্লাহ ঠিকভাবেই কিতাব নাজিল করেছেন, আর যারা [এই] কিতাব সম্বন্ধে বিপথ অবলম্বন করে- তা সুবিদিত যে, তারা সুদূরপ্রসারী বিরোধিতায় [লিপ্ত] হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৩) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ আল্লাহ তো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন শুধু الْمَيْتَةَ মৃত জীব وَالدَّمَ রক্ত وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ও শূকরের গোশত وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ আর এমন জীব যা গায়রুল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে فَمَنِ اضْطُرَّ অবশ্য যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ভোগকামী ও সীমা অতিক্রমকারী না হয় فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ তবে তার কোনো পাপ হবে না; إِنَّ اللَّهَ বাস্তবিকই আল্লাহ غَفُورٌ বড় ক্ষমাশীল رَحِيمٌ করুণাময়।

(১৭৪) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ নিঃসন্দেহে যারা গোপন করে مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ আল্লাহর অবতারিত কিতাব وَيَشْتَرُونَ بِهِ এবং তৎপরিবর্তে আদায় করে ثَمَنًا قَلِيلًا নগণ্য সম্পদ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ তারা আর কিছুই না পুরছে فِي بُطُونِهِمْ নিজেদের পেটে إِلَّا النَّارَ তবে শুধু অগ্নি وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ আর আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন وَلَا يُزَكِّيهِمْ এবং তাদেরকে নির্মলও করবেন না وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ আর তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।

(১৭৫) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ তারা এমন লোক اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ [দুনিয়াতে] যারা গ্রহণ করেছে গোমরাহী بِالْهُدَىٰ হেদায়েত ত্যাগ করে وَالْعَذَابَ আর [আখেরাতে] আজাব গ্রহণ করেছে بِالْمَغْفِرَةِ ক্ষমাপ্রাপ্তি ছেড়ে فَمَا أَصْبَرَهُمْ সুতরাং তারা কত সাহসী عَلَى النَّارِ দোজখের জন্য।

(১৭৬) ذَٰلِكَ এই শাস্তি بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ এজন্য যে আল্লাহ নাজিল করেছেন الْكِتَابَ কিতাব بِالْحَقِّ ঠিকভাবেই وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا আর যারা বিপথ অবলম্বন করে فِي الْكِتَابِ কিতাব সম্বন্ধে لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ তা সুবিদিত যে, তারা সুদূরপ্রসারী বিরোধিতায় [লিপ্ত] হবে।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (١٧٧)

অনুবাদ (১৭৭) সকল পুণ্য এতেই নয় যে, তোমরা স্বীয় মুখকে পূর্বদিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে; বরং পুণ্য তো এটা যে কোনো ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব এবং নবীগণের প্রতি, আর মাল প্রদান করে আল্লাহর মহব্বতে, আত্মীয়-স্বজনকে এবং এতিমদেরকে এবং মিসকিনদেরকে এবং [রিক্তহস্ত] মুসাফিরদেরকে, আর ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনে, আর নামাজের পাবন্দি করে এবং জাকাতও আদায় করে, আর যারা আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী হয় যখন প্রতিজ্ঞা করে বসে, আর যারা ধীরস্থির থাকে, অভাব-অভিযোগে, অসুখে-বিসুখে এবং ধর্ম-যুদ্ধে; তারাই সত্যিকারের মানুষ এবং তারাই [সত্যিকারের] আল্লাহভীরু।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৭) لَيْسَ الْبِرَّ সকল পুণ্য এতেই নয় যে اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ তোমরা স্বীয় মুখকে কর قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ পূর্বদিকে কিংবা পশ্চিম দিকে وَلٰكِنَّ الْبِرَّ বরং পুণ্য তো এটা যে مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ কোন ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ কিয়ামত দিবসের প্রতি وَالْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাদের প্রতি وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ কিতাব এবং নবীগণের প্রতি وَاٰتَى الْمَالَ আর মাল প্রদান করে عَلٰى حُبِّهٖ আল্লাহর মহব্বতে ذَوِى الْقُرْبٰى আত্মীয়-স্বজনকে وَالْيَتٰمٰى এবং এতিমদেরকে وَالْمَسٰكِيْنَ এবং মিসকিনদেরকে وَابْنَ السَّبِيْلِ এবং [রিক্তহস্ত] মুসাফিরদেরকে وَالسَّآئِلِيْنَ আর ভিক্ষুকদেরকে وَفِى الرِّقَابِ এবং দাসত্ব মোচনে وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি করে وَاٰتَى الزَّكٰوةَ এবং জাকাতও আদায় করে وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ আর যারা আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী হয় اِذَا عٰهَدُوْا যখন প্রতিজ্ঞা করে বসে وَالصّٰبِرِيْنَ আর যারা ধীরস্থির থাকে فِى الْبَاْسَآءِ অভাব-অভিযোগে وَالضَّرَّآءِ অসুখে-বিসুখে وَحِيْنَ الْبَاْسِ এবং ধর্ম-যুদ্ধে; اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا তারাই সত্যিকারের মানুষ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ এবং তারাই [সত্যিকারের] আল্লাহভীরু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭৩) قوله اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। জাহিলি যুগে আরবের লোকেরা বহু হালাল জিনিসকে হারাম মনে করত এবং বহু হারাম বস্তু ভক্ষণ করত, মৃত প্রাণীর গোশ্‌ত, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোশ্‌ত ইত্যাদি ভক্ষণ করত। ইসলামের আবির্ভাব ঘটলে মুসলমানরা নবী করীম ﷺ-কে খাদ্যে বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, তাদের সে বর্বরোচিত কু-সংস্কারের অপনোদনে আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন।

(১৭৪) قوله اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইহুদি পুরোহিতগণ সাধারণ লোকজন হতে মনগড়া ফতোয়া প্রদান করে হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করত। তারা তাওরাত গ্রন্থ পাঠান্তে সত্যিকারভাবে জানত যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-ই সত্য নবী। তারা আশাবাদী ছিল যে, আখেরী নবী তাদের মধ্য হতে আবির্ভূত হবেন, কিন্তু কুরাইশ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করাতে তাদের নেতৃত্ব বিলোপ হওয়া ও হাদিয়া তোহফা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা করে। তাই তারা তাওরাতে মহানবী ﷺ-এর প্রশংসা ও পরিচিতি সম্বলিত বাণীসমূহ সাধারণ লোকদের নিকট হতে গোপন রাখে। তাদের এ ঘৃণিত আচরণের নিন্দা করে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১৭৭) قوله لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। খ্রিস্টানরা পূর্বমুখী হয়ে নামাজ আদায় করত এবং ইহুদিরা পশ্চিমমুখী অর্থাৎ বায়তুল মাকদিসের

দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায় করত। প্রত্যেক দলেই নিজ নিজ কেবলা নিয়ে গর্ব করত এবং কেবলার মধ্যেই সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলে মনে করত। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দেশের লক্ষ্যে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আলোচ্য আয়াতে যে বস্তু সামগ্রীকে হারাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা চার। যেমন, মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যেসব জানোয়ার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। উপরিউক্ত চিহ্নিত চারটি বস্তুর সাথে স্বয়ং কুরআনেরই অন্য আয়াতে এবং হাদীস শরীফে আরো কতিপয় বস্তুর উল্লেখ এসেছে। সুতরাং সেসব নির্দেশ একত্রিত করে চিহ্নিত হারাম বস্তুগুলো সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

মৃত : এর অর্থ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরিয়ত বিধান অনুযায়ী জবাই করা জরুরি, সেসব প্রাণী যদি জবাই ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে যেমন, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে, কিংবা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশত খাওয়া হারাম হবে।

তবে কুরআন শরীফের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হলো।' এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তুর বেলায় জবাই করার শর্ত আরোপিত হয়নি। ফলে এ গুলো জবাই ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদীসে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– আমাদের জন্য দু'টি মৃত হালাল মাছ এবং টিড্ডি। সুতরাং বুঝা গেল, জীব-জন্তুর মধ্যে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গ মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, এ দু'টি জবাই না করেও খাওয়া যাবে। তবে মাছ পানিতে মরে যদি পচে যায় এবং পানির উপর ভেসে উঠে, তবে তা খাওয়া যাবে না –[জাসসাস] অনুরূপ যেসব বন্য জীব-জন্তু ধরে জবাই করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ বলে তীর কিংবা অন্য কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে, এমতাবস্থায়ও শুধু আঘাত দিয়ে মারলে চলবে না, কোনো ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত, যাতে রক্ত বের হয়।

মাসআলা : ইদানিং এক রকম চোখা গুলি ব্যবহৃত হয়, এ ধরনের গুলি সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম মনে করেন যে, এসব ধারালো গুলির আঘাতে মৃত জন্তুর হুকুম তীরের আঘাতে মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত অনুযায়ী বন্দুকের গুলি চোখা এবং ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরপক্ষে বন্দুকের গুলি চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ হয়ে বারুদের বিস্ফোরণ ও দাহিকা শক্তির প্রভাবে জন্তুর মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং এরূপ গুলির দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ারও জবাই করার আগে মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না।

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতে 'তোমাদের জন্য মৃত হারাম' বলাতে মৃত জানোয়ারের গোশ্‌ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে। যাবতীয় অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে সে একই বিধান প্রযোজ্য।

অর্থাৎ, এগুলোর ব্যাবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় কিংবা অন্য কোনো উপায়ে এগুলো থেকে যে কোনোভাবে লাভবান হওয়াও হারাম। এমনকি মৃত জীব-জন্তুর গোশ্‌ত নিজ হাতে কোনো গৃহপালিত জন্তুকে খাওয়ানোও জায়েজ নয়; বরং সেগুলো এমন কোনো স্থানে ফেলে দিতে হবে, যেন কুকুর-বিড়াল খেয়ে ফেলে। নিজ হাতে উঠিয়ে কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ানোও জায়েজ হবে না। –[জাস্‌সাস, কুরতুবী]

মাসআলা : 'মৃত' শব্দটির অন্য কোনো বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করাতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই শামিল। কিন্তু অন্য এক আয়াতে عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার যোগ্য। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যেসব অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলো ব্যবহার করা হারাম নয়; সম্পূর্ণ জায়েজ। কেননা কুরআনের অন্য এক আয়াতে আছে– وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلٰى حِيْنٍ

এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে জবাই করার শর্ত আরোপ করা হয়নি। –[জাস্‌সাস]

চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য মৃত জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাক না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম। কিন্তু পাক করে নেওয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েজ। সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। –[জাস্‌সাস]

মাসআলা : মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তা দ্বারা তৈরি যাবতীয় সামগ্রীই হারাম। এসবের ব্যবহার কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নয়। এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম।

রক্ত : আলোচ্য আয়াতে যেসব বস্তু সামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লিখিত হলেও সূরা আন'আমের এক আয়াতে أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا অর্থাৎ 'প্রবহমান রক্ত' উল্লিখিত রয়েছে। রক্তের সাথে 'প্রবহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা জবাই করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই কলিজা-জকৃত প্রভৃতি জমাট বাঁধা রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পাক ও হালাল।

মাসআলা : যেহেতু শুধুমাত্র প্রবহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, কাজেই জবাই করা জন্তুর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে থেকে যায়, সেটুকু হালাল ও পাক। ফিকহবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীসহ সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। একই কারণে মশা-মাছি ও ছারপোকার রক্ত নাপাক নয়। তবে যদি রক্ত বেশি হয় এবং ছড়িয়ে যায়, তবে তা ধুয়ে ফেলা উচিত। –[জাস্‌সাস]

মাসআলা : রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোনো উপয়ে তা ব্যবহার করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তা দ্বারা অর্জিত লাভালাভও হারাম। কেননা কুরআনের আয়াতে 'রক্ত' শব্দটি অন্য কোনো বিশেষণ ব্যতীতই ব্যবহৃত হওয়ার কারণে রক্ত বলতে যা বুঝায়, তার সম্পূর্ণটাই হারাম প্রতিপন্ন হয়ে গেছে।

রুগীর গায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার মাসআলা : এই মাসআলার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ : রক্ত মানুষের শরীরের অংশ। শরীর থেকে বের করে নেওয়ার পর তা নাপাক। তদনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে একজনের রক্ত অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করানো দু'কারণে হারাম হওয়া উচিত। **প্রথমতঃ** মানুষের যেকোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্মানিত এবং আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত। শরীর থেকে পৃথক করে নিয়ে তা অন্যত্র সংযোজন করা সে সম্মান ও সংরক্ষণ বিধানের পরিপন্থি। **দ্বিতীয়ত :** এ কারণে যে, রক্ত 'নাজাসাতে গলীযা' বা জঘন্য ধরনের নাপাকী। আর নাপাক বস্তুর ব্যবহার জায়েজ নয়।

তবে নিরুপায় অবস্থায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ত যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ রক্ত যদিও মানুষের শরীরেরই অংশ, তথাপি এটা অন্য মানুষের শরীরে স্থানান্তরিত করার জন্য যার রক্ত, তার শরীরে কোনো প্রকার কাটা-ছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না, কোনো অঙ্গ কেটে পৃথক করতে হয় না। সুঁই-এর মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে রক্ত বের করে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তদনুসারে রক্তকে দুধের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা অঙ্গ কর্তন ব্যতিরেকেই একজনের শরীর থেকে বের হয়ে অন্যের শরীরের অংশে পরিগণিত হতে থাকে। শিশুর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলামি শরিয়ত মানুষের দুধকে শিশু খাদ্য হিসেবে নির্ধারিত করেছে এবং স্বীয় সন্তানকে দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করে দিয়েছে।

"ঔষধ হিসেবে স্ত্রীলোকের দুধ পুরুষের পক্ষে নাকে প্রবেশ করানো কিংবা পান করায় দোষ নেই।" –[আলমগীরী]

ইবনে কুদামা রচিত 'মুগনী' গ্রন্থে এ মাসআলা সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। –[মুগনী, কিতাবুস সায়ীদ, ৮ম খ. ২০৬ পৃ.]

রক্তকে যদি দুধের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তা সামঞ্জস্যহীন হবে না। কেননা দুধ রক্তেরই পরিবর্তিত রূপ এবং মানবদেহের অংশ হওয়ার ব্যাপারেও একই পর্যায়ভুক্ত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দুধ পাক এবং রক্ত নাপাক। সুতরাং হারাম হওয়ার প্রথম কারণ অর্থাৎ, মানবদেহের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে তো নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা যুক্তিতে টেকে না। অবশিষ্ট থাকে দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ, নাপাক হওয়া। এক্ষেত্রেও চিকিৎসার বেলায় অনেক ফিকহবিদ রক্ত ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় মানুষের রক্ত অন্যের দেহে স্থানান্তর করার প্রশ্নে শরিয়তের নির্দেশ দাঁড়ায় এই যে, সাধারণ অবস্থায় এটা জায়েজ নয়। তবে চিকিৎসার্থে, নিরুপায় অবস্থায় ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে জায়েজ। 'নিরুপায় অবস্থায়' অর্থ হচ্ছে রোগীর যদি জীবন-সংশয় দেখা দেয় এবং অন্য কোনো ঔষধ যদি তার জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর বলে বিবেচিত না হয়, আর রক্ত দেওয়ার ফলে তার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা যদি প্রবল থাকে, তবে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেওয়া কুরআন শরীফের সে আয়াতের মর্মানুযায়ীও জায়েজ হবে, যে আয়াতে অনন্যোপায় অবস্থায় মৃত জন্তুর গোশত খেয়ে জীবন বাঁচানোর সরাসরি অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আর যদি অনন্যোপায় না হয় এবং অন্য ঔষধ ব্যবহারে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়, তবে সে অবস্থায় রক্ত ব্যবহারের প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো ফিকহবিদ একে জায়েজ বলেছেন এবং কেউ কেউ না-জায়েজ বলেছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের কিতাবসমূহে 'হারাম বস্তুর দ্বারা চিকিৎসা' শীর্ষক আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

শূকর হারাম হওয়ার বিবরণ : আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা হয়েছে, সেটি হলো শূকরের গোশত। এখানে শূকরের সাথে 'লাহম' বা গোশত শব্দ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এর দ্বারা শুধু গোশত হারাম একথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং শূকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ হাড়, গোশত, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি সবকিছুই সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে 'লাহম' তথা গোশত যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায়, তাই এটি জবাই করলেও পাক হয় না। কেননা গোশত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের জবাই করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক হতে পারে। কিন্তু জবাই করার পরেও শূকরের গোশত হারাম তো বটেই, নাপাকও থেকে যায়। কেননা এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 'নাজাসে আইন' বা সম্পূর্ণ নাপাক। শুধুমাত্র চামড়া সেলাই করার কাজে শূকরের পশম দ্বারা তৈরি সূতা ব্যবহার করা জায়েজ বলে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। –[জাস্‌সাস, কুরতুবী]

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নামে যা জবাই করা হয় : আয়াতে উল্লিখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা হয় অথবা উৎসর্গ করা হয়। সাধারণতঃ এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে : প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয় এবং জবাই করার সময়ও সে নাম নিয়েই জবাই করা হয়, যে নামে তা উৎসর্গিত। এমতাবস্থায় জবাইকৃত জন্তু সমস্ত মত-পথের আলেম ও ফিকহবিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এর কোনো অংশের দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। কেননা وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতে যে অবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে এ অবস্থা এর সরাসরি নমুনা, যে ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা জবাই করা হয়, তবে জবাই করার সময় তা আল্লাহর নাম নিয়েই জবাই করা হয়। যেমন, অনেক অজ্ঞ মুসলমান পীর-বুজুর্গগণের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি মান্নত করে তা জবাই করে থাকে। কিন্তু জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিয়েই তা জবাই করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং জবাইকৃত জন্তু মৃতের শামিল।

তবে দলিল গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সুরতটি সম্পর্কে কিছুটা মত পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসির এবং ফিকহবিদ এ সুরতটিকেও আয়াতে উল্লিখিত "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে জবাইকৃত জীবের" বিধানের অনুরূপ বিবেচনা করেছেন। যেমন, তাফসীরে বায়যাবীর টীকায় বলা হয়েছে–

'সে সমস্ত জন্তুই হারাম, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। জবাই করার সময় তা আল্লাহর নামেই জবাই করা হোক না কেন। কেননা আলেম ও ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোনো জন্তুকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নেকট্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোনো মুসলমানও জবাই করে, তবে সে ব্যক্তি 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে এবং তার জবাইকৃত পশুটি মুরতাদের জবাইকৃত পশু বলে বিবেচিত হবে।'

দুররে মুখতার -এর কিতাবুয-যাবায়েহ অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

"যদি কোনো আমীরের আগমন উপলক্ষে তাঁরই সম্মানার্থে কোনো পশু জবাই করা হয়, তবে জবাই কৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা এটাও তেমনি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নামে যা জবাই করা হয়।" এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। যদিও জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিয়েই তা জবাই করা হয়। আল্লামা শামী (র.) ও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। –[দুররে মুখতার, ৫ খণ্ড, ২১৪ পৃ.]

কেউ কেউ অবশ্য উপরিউক্ত সুরতটিকে وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন না। কেননা আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি অনুসারে একেবারে সরাসরি তা বুঝায় না। তবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত দ্বারা 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয়,' সে আয়াতের প্রতি যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ সুরতটিকেও হারাম করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তিই সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও সাবধানতা প্রসূত।

উপরিউক্ত সুরতটি হারাম হওয়ার সমর্থনে কুরআনের অন্য আর একটি আয়াতও দলিল হিসেবে পেশ করা যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ। বাতেলপন্থিরা যেসব বস্তুর পূজা করে থাকে, সেই সবকিছুকে نُصُبٌ বলা হয়। সেমতে আয়াতের অর্থ হয় সে সমস্ত পশু, যেগুলোকে বাতেল উপাস্যের উদ্দেশ্যে জবাই করা হয়েছে।

'আরবদের স্বভাব ছিল, যার উদ্দেশ্যে জবাই করা হতো, জবাই করার সময় তার স্বরে সেই নামই উচ্চারণ করতে থাকতো। ব্যাপকভাবে তাদের মধ্যে এ রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য প্রত্যাশা যা সংশ্লিষ্ট পশু হারাম হওয়ার মূল কারণ, সেটাকে 'এহলাল' অর্থাৎ 'তার স্বরে নামোচ্চারণ' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

ইমাম মুসলিম তাঁর উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার সনদে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসের শেষভাগে রয়েছে, একজন স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আজমী লোকদের মধ্যে আমাদের কিছুসংখ্যক দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাদের মধ্যে সব সময় কোনো না কোনো উৎসব লেগেই থাকে। উৎসবের দিনে কিছু হাদিয়া-তোহফা তারা আমাদের কাছেও পাঠিয়ে থাকে। আমরা তাদের পাঠানো সেসব সামগ্রী খাবো কিনা? জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন–

'সে উৎসব দিবসের জন্যেই যেসব পশু জবাই করা হয়, সেগুলো খেয়ো না, তবে তাদের ফলমূল খেতে পার।' –[তাফসীরে কুরতুবী, ২য় খণ্ড, ২০৭ পৃ.]

মোটকথা দ্বিতীয় সুরতটি, যাতে নিয়ত থাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নৈকট্য লাভ, কিন্তু জবাই করা হয় আল্লাহর নামেই, সেটি হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য অর্জন, এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার দরুন وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতের হুকুম দ্বিতীয় আয়াত وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ -এরও প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত হওয়ায় এ শ্রেণির পশুর গোশ্‌তও হারাম।

তৃতীয় সুরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোনো চিহ্ন অঙ্কিত করে কোনো দেব-দেবী বা পীর-ফকিরের নামে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোনো কাজ নেওয়া হয়না, জবাই করাও উদ্দেশ্য থাকে না; বরং জবাই করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণির পশু আলোচ্য দু'আয়াতের কোনোটিরই আওতায় পড়ে না। এ শ্রেণির পশুকে কুরআনের ভাষায় 'বাহীরা' বা 'সায়েবা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ, কারো নামে কোনো পশু প্রভৃতি জীবজন্তু উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া কুরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম। যেমন– বলা হয়েছে–

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ

"আল্লাহ তা'আলা বাহীরা বা 'সায়েবা' -এর প্রচলন করেননি। তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না; বরং হারাম মনে করাতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয়। তাই এরূপ উৎসর্গকৃত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতোই হালাল।"

শরিয়তের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তারই মালিকানায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরিয়তের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসর্গীকরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর উপর তারই পরিপূর্ণ মালিকানা কায়েম থাকে। সে মতে উৎসর্গকারী যদি সে পশু কারো নিকট বিক্রয় করে কিংবা অন্য কাউকে দান করে, তবে তা ক্রেতা ও দানগ্রহীতার জন্য হালাল। পৌত্তলিক সমাজের অনেকেই মন্দির বা দেব-দেবীর নামে পশু-পাখি উৎসর্গ করে সেগুলো পূজারী বা সেবায়েতদের হাতে তুলে দেয়। সেবায়েতরা সেসব পশু বিক্রয় করে থাকে। এরূপ পশু ক্রয় করা সম্পূর্ণ হালাল।

এক শ্রেণির কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমানকেও পীর-বুজুর্গের মাজারে ছাগল-মুরগি ইত্যাদি ছেড়ে আসতে দেখা যায়। মাজারের খাদেমরাই সাধারণতঃ উৎসর্গীকৃত সেসব জন্তু ভোগ-দখল করে। যেহেতু মূল মালিক খাদেমদের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় এবং এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের পূর্ণ এখতিয়ার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণির জীব-জন্তু ক্রয় করা, জবাই করে খাওয়া, বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হালাল।

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় : এ ক্ষেত্রে কুরআনে কারীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি; বলেছে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ "তাতে তার কোনো পাপ নেই"। এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনও যথারীতি হারামই রয়ে গেছে। কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার অনন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে শরিয়তের হুকুম-আহকাম পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে হারাম ধন-সম্পদ গ্রহণ করে, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে। কারণ এ কাজের পরিণতি তাই। কোনো কোনো বিজ্ঞ আলেমের মতে প্রকৃতপক্ষে হারাম মাল বা ধন-সম্পদ সবই দোজখের আগুন। অবশ্য তা যে আগুন, সে কথা-পার্থিব জীবনে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু মৃত্যুর পর তার এসব কর্মই আগুনের রূপ ধরে উপস্থিত হবে।

মুসলমানদের কেবলা যখন বায়তুল মাকদিসের দিক থেকে পরিবর্তিত করে বায়তুল্লাহর দিকে নির্ধারণ করা হলো, তখন ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি যারা সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে দোষ ত্রুটি তালাশ করার ফিকিরে থাকত, তারা তৎপর হয়ে উঠলো এবং নানাভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের প্রতি অবিরাম নানা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করল। এসব প্রশ্নের জবাব পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য একটি আয়াতে বিশেষ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে এ বিতর্কের ইতি টেনে দেওয়া হয়েছে। যার সারমর্ম হচ্ছে, নামাজের পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে কি পশ্চিমদিকে, এ বিষয় নির্ধারণকেই যেন তোমরা দীনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের যাবতীয় আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে।

মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরিয়তের অন্য কোনো হুকুম-আহকামই যেন আর নেই।

অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলমান, ইহুদি, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে, এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃত পুন্য বা নেকী আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের ভিতরেই নিহিত। যেদিকে মুখ করে তিনি নামাজে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথা দিক হিসেবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। দিকবিশেষের সাথে কোনো পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। পুণ্য-একান্তভাবেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ তা'আলা যতদিন বায়তুল মার্কদিসের প্রতি মুখ করে নামাজ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে মুখ করাই ছিল পুণ্য। আবার যখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে, এখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে।

আলোচ্য ১৭৭তম আয়াত থেকে সূরা বাকারার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তা'লীম ও হেদায়েত প্রদানই মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত এতে বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দেওয়া হয়েছে। সে হিসেবে আলোচ্য এ আয়াতটিকে ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবহ আয়াত বলে অভিহিত করা যায়।

অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচ্য এ আয়াতে এ'তেকাদ বা বিশ্বাস, ইবাদত, মো'আমালাত বা লেনদেন এবং নৈতিকতা ও আখলাক সম্পর্কিত বিধি-বিধানের মূলনীতিসমূহের আলোচনা মোটামুটিভাবে এসে গেছে। প্রথম বিষয়– ই'তেকাদ বা মৌলবিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শীর্ষক আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইবাদত এবং মো'আমালাত সম্পর্কিত। তার মধ্যে ইবাদত সম্পর্কিত আলোচনা وَاٰتَى الزَّكٰوةَ পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর মো'আমালাতের আলোচনা وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ শীর্ষক আয়াতে করা হয়েছে। এরপর আখলাক সম্পর্কিত আলোচনা وَالصّٰبِرِيْنَ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সবশেষে বলা হয়েছে যে, সে সমস্ত লোকই সত্যিকার মুমিন, যারা এসব নির্দেশাবলির পরিপূর্ণ অনুসরণ করে এবং এসব লোককেই প্রকৃত মুত্তাকী বলা যেতে পারে।

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে প্রথমে ধন-সম্পদ ব্যয় করার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ খাত বর্ণনা করে পরে জাকাতের কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এ দু'টি খাত জাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমেই এ দু'টি খাতের কথা বর্ণনা করার পরে জাকাতের কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, সাধারণতঃ মানুষ আলোচ্য দু'টি খাতে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করে, কিন্তু তা উচিত নয়।

মাসআলা : এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরজ শুধুমাত্র জাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, জাকাত ছাড়া আরো বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরজ ও ওয়াজিব হয়ে থাকে। –[জাস্‌সাস, কুরতুবী] যেমন, রুজি-রোজগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোনো দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে জাকাত প্রদান করার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরজ হয়ে পড়ে। অনুরূপ, যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরি করা এবং দীনি শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরজের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, জাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোনো অবস্থায় জাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের বেলায় প্রয়োজন দেখা দেওয়া শর্ত।

অতঃপর পূর্ববর্তী বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে অতীতকাল বাচক শব্দের স্থলে وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ বাক্যটিতে কারক পদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না। কেননা এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফের-গুনাহগাররাও ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না।

তেমনিভাবে মো'আমালাতের বর্ণনায় শুধুমাত্র অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকসমূহের সুষ্ঠুতা ও পবিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল।

এরপরই আখলাক বা মন মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র, 'সবর' এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা সবর এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়-বৃত্তিসহ অভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

بَاغٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অন্যায়কারী, বাড়াবাড়িকারী, বিদ্রোহী।

وَيَشْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش . ر . ى) অর্থ– তারা বিনিময় গ্রহণ করে।

اشْتَرَوُا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش . ر . ى) অর্থ– তারা ক্রয় করেছে।

مَا اَصْبَرَهُمْ : এটি صَبْرٌ মাসদার থেকে مَا اَفْعَلَ-এর ওজনে فعل تعجب অর্থ– তারা কতইনা ধৈর্যশীল।

الْمَلٰٓئِكَةِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَلَكٌ অর্থ– ফেরেশতাগণ।

الْمُوْفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পূর্ণকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : এখানে و টি হরফে আতফ ل টি حرف جار ও هم টি مجرور জার ও মাজরূর মিলে হলো متعلق উহ্য موجود শবহে ফে'ল-এর সাথে, এবার شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে مبتدأ খবর মুকাদ্দাম আর عَذَابٌ শব্দটি موصوف এবং اَلِيْمٌ শব্দটি صفت এবার موصوف ও صفت মিলে مبتدأ مؤخر তারপর মুবতাদা ও খবার মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ : এখানে اِنَّ টি حرف مشبهة بالفعل আর الَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল। اخْتَلَفُوْا ফে'ল এতে هم উহ্য সর্বনামটি তার ফা'য়েল, فِى الْكِتَابِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; এখন فعل ও فاعل আর متعلق মিলে جملة হয়ে صلة এবার موصول তার صلة মিলে ان-এর اسم; অতঃপর ل টি تاكيد এর জন্য হলো فى হলো حرف جار আর شِقَاقٍ بَعِيْدٍ মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো مشغول উহ্য شبه فعل-এর সাথে, شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে ان-এর خبر হলো ان তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : لَيْسَ টি فعل ناقص আর الْبِرَّ হলো ليس-এর خبر এবং ان টি ناصبة, অতঃপর تُوَلُّوْا হলো فعل এতে انتم হলো فاعل , আর وجوهكم টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول به হয়েছে, قِبَلَ হলো مضاف আর الْمَشْرِقِ হলো معطوف عليه ও و টি حرف عطف আর الْمَغْرِبِ হলো معطوف ;এখন معطوف عليه ও معطوف মিলে مضاف اليه ; এখন مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول فيه এখন فاعل . فعل ও উভয় مفعول মিলে ليس এর اسم হয়েছে, ليس তার اسم ও خبر মিলে جملة فعلية হলো।

قوله وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ : এখানে اولئك শব্দটি مبتدأ আর هم টি পুনঃ مبتدأ এবং الْمُتَّقُوْنَ হলো خبر ;এখন مبتدأ ও خبر মিলে বাক্য হয়ে পুনঃ خبر হলো اُولٰٓئِكَ মুবতাদার এর, مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٧٨)

অনুবাদ (১৭৮) হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর কেসাস ফরজ করা হয়েছে নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে, আজাদ ব্যক্তির পরিবর্তে আজাদ ব্যক্তি, গোলামের পরিবর্তে গোলাম এবং নারীর পরিবর্তে নারী, পরন্তু যাকে স্বীয় প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে কিছু মাফ করা হয়, তবে [বাকিটুকু] যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তাগাদা করে এবং [হত্যাকারী যেন] সদ্ভাবে তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সহজ ব্যবস্থা ও অনুগ্রহ, অতঃপর যে ব্যক্তি তার পর সীমালঙ্ঘন করে, তবে তার জন্য কঠিন যন্ত্রণাময় শাস্তি।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٧٩)

(১৭৯) আর হে জ্ঞানীগণ! এই কেসাসে [-র আইনে] তোমাদের জন্য প্রাণ রক্ষার [মহা ব্যবস্থা] রয়েছে, আশা করি, তোমরা [এরূপ শান্তিপূর্ণ আইনের বিরোধিতা হতে] বিরত থাকবে।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖۚ اۨلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ؕ (١٨٠)

(১৮০) তোমাদের উপর ফরজ করা হচ্ছে যে, যখন কারো মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হয়– যদি তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকে, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু অসিয়ত করবে, মুত্তাকীদের জন্য তা অবশ্য কর্তব্য।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭৮) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! كُتِبَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে الْقِصَاصُ কেসাস فِي الْقَتْلٰى নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ আজাদ ব্যক্তির পরিবর্তে আজাদ ব্যক্তি وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ গোলামের পরিবর্তে গোলাম وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى এবং নারীর পরিবর্তে নারী فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ পরন্তু যাকে কিছু মাফ করা হয় مِنْ اَخِيْهِ স্বীয় প্রতিপক্ষের পক্ষ হতে فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ তবে [বাকিটুকু] যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তাগাদা করে وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ এবং [হত্যাকারী যেন] সদ্ভাবে তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। ذٰلِكَ এটা تَخْفِيْفٌ সহজ ব্যবস্থা مِنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে وَرَحْمَةٌ ও অনুগ্রহ فَمَنِ اعْتَدٰى অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে بَعْدَ ذٰلِكَ তার পর فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তবে তার জন্য কঠিন যন্ত্রণাময় শাস্তি।

(১৭৯) وَلَكُمْ আর তোমাদের জন্য রয়েছে فِي الْقِصَاصِ এই কেসাসে [-র আইনে] حَيٰوةٌ প্রাণ রক্ষার [মহা ব্যবস্থা] يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ হে জ্ঞানীগণ! لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আশা করি, তোমরা [এরূপ শান্তিপূর্ণ আইনের বিরোধিতা হতে] বিরত থাকবে।

(১৮০) كُتِبَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর ফরজ করা হচ্ছে যে اِذَا حَضَرَ যখন নিকটবর্তী মনে হয়– اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ কারো মৃত্যু اِنْ تَرَكَ خَيْرًا যদি তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকে اَلْوَصِيَّةُ তবে কিছু অসিয়ত করবে لِلْوَالِدَيْنِ পিতা-মাতা وَالْاَقْرَبِيْنَ ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য بِالْمَعْرُوْفِ ন্যায়সঙ্গতভাবে حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ মুত্তাকীদের জন্য তা অবশ্য কর্তব্য।

فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَمَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٨١)

অনুবাদ (১৮১) অতঃপর যে ব্যক্তি শুনার পর এটা পরিবর্তন করবে, তবে এর পাপ তাদেরই হবে যারা এটাকে পরিবর্তন করে। আল্লাহ তো নিশ্চয় শুনেন জানেন।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٨٢)

(১৮২) হাঁ, তবে যার নিকট সাব্যস্ত হয় অসিয়তকারীর পক্ষ হতে কোনো প্রকার ক্রটি কিংবা কোনো অন্যায় আচরণ, অনন্তর সে ব্যক্তি তাদের পরস্পরের মধ্যে আপস করিয়ে দেয়, তবে তার কোনো পাপ হবে না: বাস্তবিকই আল্লাহ তো ক্ষমাকারী, অনুগ্রহশীল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٨٣)

(১৮৩) হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর, আশা যে, তোমরা মুত্তাকী হবে।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٨٤)

(১৮৪) অল্প কয়েক দিন মাত্র [রোজা রেখ], পরন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি [এরূপ] অসুস্থ [রোজা রাখতে অক্ষম] হয়, কিংবা সফরে থাকে, তবে অন্য সময় গণনা [করে রোজা] রাখবে; আর যারা রোজা রাখতে সক্ষম তাদের জিম্মা ফিদিয়া একজন দরিদ্রের খোরাক [দেওয়া], আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় খায়ের করে [ফিদিয়া বেশি দেয়], তবে তার জন্য আরো উত্তম, আর তোমাদের জন্য রোজা রাখা খুবই উত্তম, যদি তোমরা [রোজার ফজিলতের] খবর রাখ।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮১) فَمَنْ بَدَّلَهٗ অতঃপর যে ব্যক্তি পরিবর্তন করবে بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ এটা শুনার পর فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ তবে এটার পাপ হবে عَلَى الَّذِيْنَ তাদেরই যারা يُبَدِّلُوْنَهٗ এটাকে পরিবর্তন করে। اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ سَمِيْعٌ শুনেন عَلِيْمٌ জানেন।

(১৮২) فَمَنْ خَافَ হাঁ, তবে যার নিকট সাব্যস্ত হয় مِنْ مُّوْصٍ অসিয়তকারীর পক্ষ হতে جَنَفًا কোনো প্রকার ক্রটি اَوْ اِثْمًا কিংবা কোনো অন্যায় আচরণ فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ অনন্তর সে ব্যক্তি তাদের পরস্পরের মধ্যে আপস করিয়ে দেয় فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ তবে তার কোনো পাপ হবে না اِنَّ اللّٰهَ বাস্তবিকই আল্লাহ غَفُوْرٌ ক্ষমাকারী رَّحِيْمٌ অনুগ্রহশীল।

(১৮৩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! كُتِبَ عَلَيْكُمُ তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে الصِّيَامُ রোজা كَمَا كُتِبَ যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্ববর্তীগনের উপর لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আশা যে, তোমরা মুত্তাকী হবে।

(১৮৪) اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ অল্প কয়েক দিন মাত্র [রোজা রেখ] فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ পরন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি مَّرِيْضًا অসুস্থ [রোজা রাখতে অক্ষম] হয় اَوْ عَلٰى سَفَرٍ কিংবা সফরে থাকে فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ তবে অন্য সময় গণনা [করে রোজা] রাখবে وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ আর যারা রোজা রাখতে সক্ষম فِدْيَةٌ তাদের জিম্মা ফিদিয়া طَعَامُ مِسْكِيْنٍ একজন দরিদ্রের খোরাক [দেওয়া] فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় খায়ের করে [ফিদিয়া বেশি দেয়] فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ তবে তার জন্য আরো উত্তম وَاَنْ تَصُوْمُوْا আর তোমাদের জন্য রোজা রাখা خَيْرٌ لَّكُمْ খুবই উত্তম اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা [রোজার ফজিলতের] খবর রাখ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭৮) قوله يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইসলাম ধর্ম প্রচলিত হওয়ার পূর্বে আরবের মধ্যে দুটি গোত্র ছিল। একটি আউস ও দ্বিতীয়টি খাযরাজ। উভয়ের মধ্যে ভীষণ লড়াই হয়েছিল। তাতে বিজয়ী গোত্র পরাজিত গোত্রের বহু দাস ও মহিলাকে হত্যা করেছিল। মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাবের পর তারা উভয় গোত্রই মুসলমান হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে পূর্ববর্তী আক্রোশ পূর্ণ মনোভাব থেকে যায়। কেননা পরাজিত গোত্র অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ বংশীয় হিসেবে গণ্য ছিল। তাই তারা বিজয়ী গোত্রের লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমাদের মধ্য হতে একজন দাসের পরিবর্তে একজন স্বাধীন ব্যক্তি এবং একজন মহিলার পরিবর্তে একজন পুরুষকে হত্যা করব। তাদের এ অতিরঞ্জিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিসাস-এর বিধানের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১৮০) قوله كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** তদানীন্তন জাহেলিয়াতের যুগে নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর সময় অন্যের জন্য নিজের সকল ধন-সম্পদের অসিয়ত করে যাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। ফলে মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি সবাই তার পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ত। ইসলামের আগমনের পর এ বঞ্চনামূলক ব্যবস্থার সংস্কার-সাধনে এ ধরনের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

قوله الْقِصَاصُ : কিসাস এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– সমপরিমাণ বা অনুরূপ করা, অর্থাৎ অন্যায় পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা। শরিয়তের পরিভাষায় কিসাসের অর্থ হলো হত্যা বা আঘাতের সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান করা। হত্যার পরিবর্তে হত্যা করতে হবে, কিন্তু নিহত ব্যক্তিকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে ঠিক সেভাবে হত্যা করতে হবে তা নয়।

কিসাস (প্রতিশোধ গ্রহণ) সম্পর্কীয় বিধান : স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যার পরিবর্তে বিপক্ষের এক জনকে সর্বসম্মতিক্রমে হত্যা করাকে শরিয়তে কিসাস রূপে নির্ধারণ করেছেন। তন্মধ্যে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ক্রীতদাসের পরিবর্তে একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে এবং একজন মহিলার পরিবর্তে একজন পুরুষকে হত্যা করা যাবে না বলে প্রমাণ পেশ করেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রয়োজনে পুরুষকে হত্যা করা যাবে বলে প্রমাণ পেশ করেন। তিনি দলিল পেশ করেন যে, "প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ" ও "মুসলমানের রক্ত পরস্পরের সমান।" তিনি উপরিউক্ত ইমামদ্বয়ের যুক্তির উত্তরে বলেন– "আজাদ লোককে ক্রীতদাসের পরিবর্তে ও পুরুষকে স্ত্রীলোকের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।" এ দলিল দ্বারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং দু'ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন হতে বিরত রাখা এবং উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করাই উদ্দেশ্য। তাঁর (আবূ হানীফার) মাযহাব মোতাবেক হত্যাকারী যে-ই হোকনা কেন; হত্যার দায়ে তাকে প্রাণদণ্ড ভোগ করতেই হবে।

قوله فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ الخ **-এর বিশ্লেষণ :** কিসাসের বিধানের মধ্যে বিরাট জীবন রক্ষার উপায় নিহিত রয়েছে। কারণ হত্যাকারী যখন জানতে পারবে যে, সে হত্যার দায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে, তখন সে হত্যা হতে বিরত থাকবে। ফলে সে নিজেও বাঁচল এবং যাকে হত্যা করবে সেও বাঁচল। কিসাস গ্রহণের আদেশের ফলে এভাবে বহু লোকের জীবন রক্ষা পেল।

قَتْل -এর প্রকারভেদ : قَتْل পাঁচ প্রকার : (১) قَتْل عَمْد বা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যা (২) قَتْل شِبْه عَمْد বা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যার সাদৃশ্য হত্যা (৩) قَتْل خَطَأ বা ভুলক্রমে হত্যা (৪) قَتْل جَارِیْ مَجْرٰی خَطَأ বা ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা (৫) قَتْل سَبَب বা কারণিক হত্যা।

(১) স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যা : কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করে কাউকে অস্ত্র অথবা অস্ত্রের সমতুল্য অন্য কিছু দ্বারা হত্যা করলে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যা বলে।

বিধান : এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের দরুন হত্যাকারী গুনাহগার হবে এবং কিসাস ওয়াজিব হবে। তবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে তার কোনো কাফফারা নেই।

(২) স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যার সাদৃশ্য হত্যা : এমন কোনো জিনিস দ্বারা আঘাত করা, যার আঘাতে সাধারণত নিহত হয় না এ ধরনের হত্যাকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হত্যার সাদৃশ হত্যা বলে।

বিধান : সাহেবাইন -এর মতানুযায়ী এতে গুনাহ ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। এতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। তবে এতে عَاقِلَه قَاتِلْ -এর উপর রক্তপণ ওয়াজিব হবে।

(৩) ভুলক্রমে হত্যা : ইচ্ছায় ভুল অথবা কাজের ভুলবশত হত্যা করা :

ইচ্ছায় ভুল : যেমন– শিকার মনে করে কোনো মানুষের প্রতি তীর অথবা গুলি ছুঁড়া।

কাজের ভুল : যেমন– কোনো লক্ষ্যবস্তুর প্রতি তীর ছুঁড়লে ভুলে তা কোনো মানুষের উপর পড়ে মৃত্যুবরণ করা।

বিধান : এতে রক্তপণ ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। গুনাহ হবে না।

(৪) ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা : যেমন– ঘুমের ঘোরে পড়ে অন্য কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তিকে মেরে ফেলল।

বিধান : এর বিধান ভুলের বিধানের মতোই বর্তাবে।

(৫) কারণিক হত্যা : যেমন– কোনো ব্যক্তি খেতে পানি দেওয়ার জন্য ক্ষেতের কোণায় কূপ খনন করল, তার মধ্যে কেউ পড়ে মারা গেল।

বিধান : হত্যাকারীর উপর রক্তপণ বর্তাবে। কাফ্ফারা ও কিসাস ওয়াজিব হবে না।

دِيَتٌ বা অর্থদণ্ডের বিধান : অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করলে সে জন্য হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা বিধেয় নয়। সে জন্য দিয়ত বা হত্যার বিনিময় প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিহত ব্যক্তির মৃত্যুতে তার উত্তরাধিকারীগণ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা সম্পন্ন করা। আর দিয়তের পরিমাণ হচ্ছে– মধ্যম আকৃতির একশতটি উট অথবা এক হাজার দীনার অথবা দশ হাজার দিরহাম। বর্তমান কালের প্রচলিত ওজন অনুপাতে এক দিরহাম সাড়ে তিন মাসা রৌপ্যের সমপরিমাণ। সে মতে পূর্ণ দিয়ত-এর পরিমাণ হচ্ছে দু'হাজার নয় শত তোলা আট মাসা রৌপ্য।

حُرٌّ কে عَبْد -এর বিনিময়ে এবং মুসলিমকে ذِمِّي -এর বিনিময়ে হত্যার হুকুম : সকল কূফাবাসী, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে আবী লায়লাসহ সকল আহনাফের মতে আজাদ ব্যক্তিকে দাসের বিনিময়ে এবং মুসলিমকে জিম্মির বিনিময়ে হত্যা করা যাবে। কেননা كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى আয়াতে عَامٌ ভাবে বলা হয়েছে। এ ছাড়া জিম্মি, মুসলিমদের সাথে রক্তের দিক থেকে সমান। অধিকাংশের মতে حُرٌّ কে عَبْد -এর বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না। কেননা উভয়ের মাঝে সমতা নেই। দু'জন দু'প্রকারের। এছাড়া দাস বিক্রি করা যায় حُرٌّ -কে বিক্রি করা যায় না। স্বাধীন ব্যক্তি বিক্রি করে আর দাস-বিক্রি হয়।

পিতা পুত্রকে হত্যার বিধান : অধিকাংশ আলিমের মতে পুত্র হত্যার কারণে পিতা হতে কিসাস নেওয়া যাবে না। ইমাম মালেক (র.) বলেন, যদি ইচ্ছা করে হত্যা করে, তবে বিনিময়ে পিতাকে হত্যা করা হবে। আর যদি ছেলে পিতাকে হত্যা করে তবে ছেলেকে হত্যা করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।

একজনের কারণে একদলকে হত্যার হুকুম : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, একজনের বিনিময়ে একদলকে হত্যা করা যাবে না। কেননা একজন আর একদল সমান হয় না। অন্যান্যদের মতে হত্যা করা যাবে।

قوله فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ -এর মর্মার্থ : প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক। এখানে মারূফ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে এ শব্দটি কুরআনের বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষ সাধারণত ও স্বভাবত যেসব সঠিক কাজ ও কর্মনীতির সাথে পরিচিত হয়ে থাকে, যাকে প্রত্যেক নিঃস্বার্থ ব্যক্তিই সত্য ও ইনসাফ এবং সঠিক কর্মনীতি বলে অভিহিত করে, এ শব্দ দ্বারা তাই বুঝানো হয়। সাধারণতঃ প্রচলিত আইনকেও ইসলামি পরিভাষায় উরফ কিংবা মারূফ বলা হয়। আর শরিয়ত যেসব বিষয় ও ব্যাপারে কোনো বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করেনি, সে সব ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হয়।

قوله فَمَنِ اعْتَدٰى -এর মধ্যকার সীমালঙ্ঘন : নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ রক্তের বিনিময় গ্রহণ করার পরও যদি প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে কিংবা হত্যাকারী রক্তের বিনিময় প্রত্যার্পণ করতে টালবাহানা করে এবং হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীগণ তার প্রতি যে নম্র ব্যবহার করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করে, তবে এটাকে বাড়াবাড়ি বলা হবে।

মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার অর্থ : মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার অর্থ হলো মৃত্যুর নিদর্শন হিসেবে উপসর্গাদি দেখা দেওয়া। যেমন– বার্ধক্য, মারাত্মক ব্যাধি, বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইত্যাদি।

আয়াতে خَيْر -এর অর্থ : خَيْر শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো– ধন-সম্পদ। সকল মুফাসসিরের ঐকমত্যে আয়াতে خَيْر দ্বারা ধন-সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। তবে এ ধন-সম্পদের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ আছে যেমন– (ক) সাতশত দিনারের বেশি, (খ) এক হাজার দিনার, (গ) পাঁচশত দিনারের বেশি।

وَصِيَّة -এর অর্থ ও তার حُكْم : শাব্দিক অর্থে যে কোনো কাজ করার নির্দেশ প্রদানকে অসিয়ত বলা হয়। পরিভাষায় ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর পরে কোনো হুকুম সম্পাদন করার জন্য মৃত্যুকালে যে নির্দেশ দেওয়া হয়; তাকেই অসিয়ত বলে।

হুকুম : ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হলো– যার উপর ঋণ, গচ্ছিত সম্পদ বা অন্য কোনো পাওনা রয়েছে সে যেন এ ব্যাপারে অসিয়ত করে যায়। এটা তার উপর ফরজ। অসিয়ত সম্পর্কে তিনটি মূলনীতি রয়েছে। যেমন– (১) মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের কোনো অংশ যেহেতু নির্ধারিত নেই, সুতরাং তাদের হক মৃতব্যক্তির অসিয়তের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।– (২) এ ধরনের নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করা মৃতের উপর ফরজ।–(৩) এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশি অসিয়ত করা জায়েজ নয়।

উপরিউক্ত তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে মিরাশের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মানসূখ হয়ে গেছে। ইবনে কাছীর ও হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে অসিয়ত সম্পর্কিত এ নির্দেশটি মিরাশের আয়াত দ্বারা মানসূখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় নির্দেশটিও একাধারে কুরআনের মিরাশ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। তেমনিভাবে বিদায় হজের সময় রাসূল ﷺ কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশ إِنَّ اللّٰهَ اَعْطٰى لِكُلِّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ فَلَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ -এর মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। আর এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের অসিয়ত সম্পর্কে আলিমদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তার মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ আদায় করা জায়েজ। এমনকি উত্তরাধিকারীগণের অনুমতিক্রমে সমগ্র সম্পত্তিও অসিয়ত করা জায়েজ এবং গ্রহণযোগ্য।

অসিয়তের পরিমাণ : কতটুকু অসিয়ত করতে হবে এ ব্যাপারে আয়াতে কোনো ইঙ্গিত নেই। তবে হাদীস দ্বারা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ অসিয়তের কথা পাওয়া যায়। যেমন হযরত সা'দ (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার যত সম্পদ রয়েছে তার উত্তরাধিকার রয়েছে একমাত্র মেয়ে, আমি আমার সম্পদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ কি অসিয়ত করব? নবী করীম ﷺ বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে অর্ধেক? নবী কারীম ﷺ বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? মহানবী ﷺ বললেন– এক তৃতীয়াংশ, তাহলেও অনেক বেশি হয়ে যায়। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে মানুষের দ্বারে ধর্ণা দেওয়ার অবস্থায় রাখার চেয়ে ধনী অবস্থায় রাখা অনেক উত্তম। কারো মতে এক-চতুর্থাংশ, কারো মতে এক-পঞ্চমাংশ।

মাতাপিতার জন্য অসিয়ত সম্পর্কে মতভেদ : এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। কেননা পিতামাতার জন্য অসিয়তের প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য অংশ নির্ধারিত রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন– لَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ ওয়ারিশদের জন্য কোনো অসিয়ত নেই। একদল ওলামার মতে আয়াতের হুকুম এখনো বাকি আছে। তারা বলেছেন ঐ পিতামাতার জন্য অসিয়ত করতে হবে যারা وَارِثٌ নয়। যেমন– কাফের পিতামাতা।

قَوْلُهُ الصِّيَامُ : صَوْم -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা, আর শরিয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তের সাথে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে صَوْم বা রোজা বলে। দ্বিতীয় হিজরি সনের রমজান মাসে রোজা ফরজ হয়।

পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর রোজার হুকুম : মুসলমানদের প্রতি রোজা ফরজ হওয়ার নির্দেশটি একটি বিশেষ নবীর উল্লেখসহ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোজা শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরজ করা হয়নি; বরং তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরজ করা হয়েছে। তেমনি মুসলমানদের এ মর্মে একটা সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে যে, রোজা একটা কষ্টকর ইবাদত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরজ করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরজ করা হয়েছিল। مِنْ قَبْلِكُمْ বলতে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত

মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল উম্মত এবং শরিয়তকেই বুঝায়। এতে বুঝা যায় যে, নামাজের ইবাদত থেকে যেমন কোনো উম্মত বা শরিয়তই বাদ ছিল না, তেমনই রোজাও সবার জন্য ফরজ ছিল

রুগ্ণ ব্যক্তির রোজা : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا বাক্যে উল্লিখিত রুগণ বলতে সে ব্যক্তিকে বুঝায়, রোজা রাখতে যার কষ্ট হয় অথবা রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমন রোগীর জন্য রোজা ভঙ্গ করার নির্দেশ রয়েছে।

মুসাফিরের রোজা : আয়াতাংশে أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ শব্দ ব্যবহার করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন– বাড়িঘর থেকে বের হয়ে কোথাও গেলেই রোজার ব্যাপারে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না, সেখানে মুসাফিরের শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। হাদীসে রাসূল ও সাহাবীগণের আমলের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং অন্যান্য ফিকহবিদগণের মতে এ সফর কমপক্ষে তিন মনযিল দূরত্বের হতে হবে। অর্থাৎ একজন লোক স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে তিন দিনে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে ততটুকু দূরত্বের সফরকারীকে মুসাফির বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগের আলিমগণ "মাইল" এর হিসেব অনুযায়ী ৪৮ (আটচল্লিশ) মাইল এবং বর্তমানে কিলোমিটার হিসেবে ৭৭ (সাতাত্তর) কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলে এবং ১৫ দিন অথবা তার চেয়ে কম সময় অবস্থানের নিয়ত করলে তাকে মুসাফির বলে।

আর মুসাফিরের প্রতি রোজার ব্যাপারে সফর জনিত অব্যাহতি ততক্ষণই প্রযোজ্য হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সফরের মধ্যে থাকে। সফরের মুদ্দত অতিবাহিত হলে সে ব্যক্তি আর "মুসাফির" এর গণ্ডির মধ্যে থাকে না, ফলে সে রোজার অব্যাহতি পাবে না।

রোজার কাজা : রুগ্ণ ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় আর মুসাফির ব্যক্তি সফর অবস্থায় যে কয়টি রোজা রাখতে পারেনি সে কয়টি রোজা রমজান ব্যতীত অন্য সময়ে পূরণ করে নেওয়া তার উপর ওয়াজিব। রুগী সুস্থ হওয়ার পর এবং মুসাফির বাড়ি ফেরার পর রমজান মাস বহাল থাকলে তা যথাযথ পালন করবে। আর যদি সে সুস্থ হওয়ার বা বাড়ি ফেরার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার কাজা কিংবা ফিদিয়ার জন্য অসিয়ত করা জরুরি নয়। ভাংতি রোজা এক সাথে ধারাবাহিকভাবে রাখা জরুরি নয়; বরং মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রাখলেও চলবে। শুধু সংখ্যাগুলো পূরণ করলেই চলবে।

রোজার ফিদিয়া ও তার পরিমাণ : যারা অতিরিক্ত বার্ধক্য জনিত কারণে রোজা রাখতে অক্ষম অথবা দীর্ঘ কাল রোগ ভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে। সেসব লোকের বেলায় রোজা না রেখে রোজার বদলায় "ফিদিয়া" দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে রোজা রাখতে পারলে তা হবে সব চেয়ে কল্যাণকর। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলায় সের হিসেবে অর্ধ "সা" পৌনে দু'সের পরিমাণ গম অথবা প্রচলিত বাজার মূল্য কোনো মিসকিনকে দান করে দিলে একটি রোজার ফিদিয়া আদায় হয়ে যায়। তবে এক রোজার "ফিদিয়া" একাধিক মিসকিনকে দেওয়া অথবা একাধিক রোজার ফিদিয়া একই সাথে এক ব্যক্তিকে দেওয়া জায়েজ।

রোজা ফরজ হওয়ার সময়কাল ও হুকুম : ইসলামের অন্যান্য হুকুম আহকামের ন্যায় রোজাও ক্রমান্বয়ে ফরজ করা হয়েছে। মহানবী ইসলামের শুরুতে মুসলমানদেরকে প্রত্যেক মাসে শুধু তিন দিন রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ রোজা ফরজ ছিল না। দ্বিতীয় হিজরি সালের রমজান মাসে রোজা রাখার নির্দেশ জারি হয়, কিন্তু তাতেও লোকদের জন্য এতটুকু সুবিধা রাখা হয়েছিল যে, যারা রোজা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রাখতে ইচ্ছা করতো না, তারা প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করলেই রোজার দায়িত্ব হতে মুক্তি পাবে। পরবর্তী বছর দ্বিতীয় হুকুম নাজিল হয়। তাতে এ সাধারণ সুবিধাটি বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু রুগ্ণ, যে রোজা রাখলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে বা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা হয় অথবা শরয়ী মুসাফির ও গর্ভবতী কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশু ধাত্রী মহিলা এবং রোজা রাখার সামর্থ্যহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার এ সুযোগ যথারীতি বহাল রাখা হয়।

রমজানের পূর্বে মুসলমানদের রোজা : أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলমানদের উপর যে রোজা ফরজ হয়েছিল তা ছিল রমজানের দিনগুলোর রোজা। এটা অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত।

হযরত কাতাদা এবং আতা (রা.) বলেন, প্রত্যেক মাসে মুসলমানদের উপর তিনটি করে রোজা ফরজ ছিল। তারপর তাদের উপর রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছিল। তাদের দলিল হলো– وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ কেননা এ আয়াতটি

রোজাকে এমনভাবে واجب করে যা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। রোজা রাখতে পারে অথবা ফিদইয়া দিতে পারে। কিন্তু রমজানের রোজা এমনভাবে ওয়াজিব, যা রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সুতরাং ঐ রোজাগুলো রমজানের রোজা নয়।

অধিকাংশ আলেমের মতে, দলিল হলো– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ আয়াতটি মুজমাল, তাতে এক, দুই বা অনেক দিনের রোজা হতে পারে। তাই أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ দ্বারা এই মুজমালের তাফসীর করা হয়েছে এটা দ্বারাও সপ্তাহ বা মাসের রোজার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর شَهْرُ رَمَضَانَ -এর বর্ণনা এসেছে। অতএব বুঝা যায় যে, মুসলমানদের উপর প্রথম থেকেই রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছে। –[আয়াতুল আহকাম, ছাবূনী]

রোজা ভঙ্গের অনুমোদিত রোগের পরিমাণ : আল্লাহ তা'আলা রোগীর জন্য রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি দিয়েছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট করুণা; কিন্তু কতটুকু রোগ হলে রোজা ভঙ্গ করা যাবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আহলে জাওয়াহেরের মতে সাধারণত রোগ হলেই রোজা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে। যেমন– আঙ্গুলের ব্যথা
কারো নিকট এমন রোগ গ্রহণযোগ্য যাতে রোজা রাখলে কষ্ট বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।

চার ইমামের মতে মারাত্মক রোগ যা রোজার কারণে বৃদ্ধি হতে পারে, অথবা মৃত্যুর ভয় আছে, অথবা সুস্থতা আসতে বিলম্ব ঘটতে পারে, তখন রোজা ভঙ্গ করা যাবে।

দলিল : আহলে জাওয়াহের দলিল হিসেবে فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا আয়াতকে পেশ করেন। এখানে مَرَضٌ -কে সাধারণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, বেশি-কমের কথা বলা হয়নি।

জমহুর ওলামা يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -আয়াতকে পেশ করেন। কেননা এর দ্বারা বুঝা যায় যে, অনুমতি কষ্ট এড়ানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। অতএব, রোগ কম হলে কষ্ট অনুপস্থিত থাকে।

রোজা না রাখার অনুমোদিত সফরের পরিমাণ : সকল ফকীহ এ কথায় একমত যে, সফর দূরে হতে হবে। কিন্তু ঐ দূরত্ব কতটুকু তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন–

- আওযায়ীর মতে একদিনের পথ হতে হবে।
- ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে দু'দিন ও দু'রাতের পথ হতে হবে। এ হিসেবে ষোল ফরসখ বা ৪৮ মাইল হয়
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সুফিয়ান সাওরীর মতে তিন দিন ও তিন রাত্রির পথ হতে হবে। এ হিসেবে ২৪ ফরসখ অর্থাৎ ৭২ মাইল হয়। –[আয়াতুল আহকাম]

রোজা রাখা বা ভাঙ্গার মধ্যে কোনটি উত্তম : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে শক্তি থাকলে রোজা রাখাই উত্তম। আর শক্তিহীন দুর্বল ব্যক্তির জন্য রোজা না রাখাই উত্তম। কেননা শক্তিমানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ আর শক্তিহীন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ বলেন– يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

ইমাম আহমদের মতে রোজা না রাখা উত্তম। কেননা আল্লাহ এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করাই উত্তম। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) -এর মতে যা সহজ তা গ্রহণ করাই উত্তম। রোজা রাখতে সক্ষম হলে রোজা রাখাই উত্তম, আর না রাখা সহজ হলে না রাখাই উত্তম।

গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়িনীর হুকুম : গর্ভবতী এবং দুগ্ধদায়িনী মহিলা যদি নিজের জীবনের ভয় করে, অথবা সন্তানের ব্যাপারে ভয় করে, তবে রোজা ভাঙ্গতে পারবে, এমতাবস্থায় তারা রোগীর ন্যায়। তবে কাজার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফার মতে শুধু কাজা করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে ফিদইয়াসহ কাজা করতে হবে।

রোজার ফিদিয়া : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ আয়তের স্বাভাবিক অর্থ– দাঁড়ায়, যেসব লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়; বরং রোজা রাখার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোজা রাখতে চায় না, তাদের জন্যও রোজা না রেখে রোজার বদলায় 'ফিদিয়া' দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেওয়া হয়েছে যে, وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ, রোজা রাখাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

উপরিউক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে রোজায় অভ্যস্ত করে তোলা। এরপর অবতীর্ণ আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -এর দ্বারা প্রাথিমিক এ নির্দেশ সুস্থ-সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তবে যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোজা রাখতে অপারগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুন

দুর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের বেলায় উপরিউক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই। –[জাসসাস, মাযহারী]

বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রমুখ হাদীসের সমস্ত ইমামগণই সাহাবী হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.)-এর সে বিখ্যাত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে, যখন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ শীর্ষক আয়াতটি নাজিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে রোজা রাখতে পারে এবং যে রোজা রাখতে না চায়, সে ফিদিয়া দিয়ে দিবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ নাজিল হলো, তখন ফিদিয়া দেওয়ার এখতিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ-সমর্থ লোকদের উপর শুধুমাত্র রোজা রাখাই জরুরি সাব্যস্ত হয়ে গেল।

ফিদিয়ার পরিমাণ এবং আনুষাঙ্গিক মাসআলা : একটি রোজার ফিদিয়া অর্ধ সা' গম অথবা তার মূল্য। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলা সের হিসেবে অর্ধ সা' একসের সাড়ে বার ছটাক হয়। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী তার মূল্য কোনো মিসকিনকে দান করে দিলেই একটি রোজার ফিদিয়া আদায় হয়ে যায়। ফিদিয়া কোনো মসজিদ বা মাদরাসায় কার্যরত কোনো লোকের খেদমতের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া জায়েজ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْحُرُّ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَحْرَارٌ অর্থ– আজাদ, মুক্ত।

اِعْتَدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– সে সীমালঙ্ঘন করে।

مُوْصٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْصَاءُ মূলবর্ণ (و . ص . ى) জিনসে لفيف مفروق অর্থ– অসিয়তকারী।

مَعْدُوْدَاتٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَعْدُوْدَةٌ অর্থ– গণিত, যা গণনা করা হয়। গণনা করা কয়েকটি দিন।

مَرِيْضًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَمْرَاضٌ ; অর্থ– রোগী, অসুস্থ।

تَطَوَّعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّطَوُّعُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনসে اجوف واوى অর্থ– স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ : এখানে و টি হরফে আতফ। আর لَ টি হরফে জার كُمْ টি মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো موجود উহ্য شبه فعل এর সাথে। شبه فعل তার متعلق মিলে হলো خبر مقدم فِى الْقِصَاصِ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق হলো حَيٰوةٌ শিবহে ফে'ল এর সাথে شبه فعل তার متعلق মিলে হলো ; অতঃপর مبتدأ مؤخر ও خبر مقدم মিলে হলো جملة اسمية।

يٰاُولِى الْاَلْبَابِ : এখানে يا টি حرف نداء আর اُولِى الْاَلْبَابِ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে হলো منادى, এখন نداء ও منادى মিলে جُمْلَةٌ نِدَائِيَّةٌ হয়েছে।

قوله لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ : এখানে لَعَلَّ শব্দটি حرف مشبهة بالفعل আর كُمْ টি لَعَلَّ-এর اسم এবং تَتَّقُوْنَ শব্দটি لعل -এর خبر অতঃপর لعل তার اسم ও خبر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (١٨٥)

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۗ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ (١٨٦)

অনুবাদ (১৮৫) রমজান মাস, এ মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, এ কুরআন মানুষের জন্য হেদায়েত [-এর উপকরণ] ও উজ্জ্বল বিবরণদায়ক ঐ কিতাবসমূহের, যা হেদায়েত এবং মীমাংসাকারী, সুতরাং তোমাদের যে ব্যক্তি বর্তমান থাকে এই মাসে, তাকে অবশ্যই এই মাসে রোজা রাখতে হবে এবং যে ব্যক্তি পীড়িত বা মুসাফির হয়, তবে অন্য সময় গণনা [করে রোজা] রাখবে; আল্লাহ তোমাদের সাথে আছানির ইচ্ছা করেন এবং তোমাদের সাথে কঠোরতার ইচ্ছা করেন না, আর যেন তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করতে পার, এবং তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর- তোমাদেরকে হেদায়েত করার দরুন, আর যেন তোমরা শোকর কর।

(১৮৬) আর যখন আমার বান্দা আমার সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি তো নিকটেই আছি; আমি মঞ্জুর করি আবেদনকারীর আবেদন যখন আমার নিকট আবেদন করে, তাদেরও উচিত আমার বিধান মেনে নেওয়া আর আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা, আশা যে, তারা সুপথ লাভ করতে পারবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৫) شَهْرُ رَمَضَانَ রমজান মাস الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ এ মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে هُدًى لِّلنَّاسِ এ কুরআন মানুষের জন্য হেদায়েত [-এর উপকরণ] وَبَيِّنٰتٍ ও উজ্জ্বল বিবরণদায়ক ঐ কিতাবসমূহের مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ যা হেদায়েত এবং মীমাংসাকারী فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ সুতরাং তোমাদের যে ব্যক্তি বর্তমান থাকে এই মাসে فَلْيَصُمْهُ তাকে অবশ্যই এই মাসে রোজা রাখতে হবে وَمَنْ كَانَ এবং যে ব্যক্তি হয় مَرِيْضًا পীড়িত اَوْ عَلٰى سَفَرٍ বা মুসাফির فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ তবে অন্য সময় গণনা [করে রোজা] রাখবে; يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহ ইচ্ছা করেন بِكُمُ তোমাদের সাথে الْيُسْرَ আছানির وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ এবং তোমাদের সাথে কঠোরতার ইচ্ছা করেন না وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ আর যেন তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করতে পার وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ এবং তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর- عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ তোমাদেরকে হেদায়েত করার দরুন وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর যেন তোমরা শোকর কর।

(১৮৬) وَاِذَا سَاَلَكَ আর যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عِبَادِيْ আমার বান্দা عَنِّيْ আমার সম্বন্ধে فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ তবে আমি তো নিকটেই আছি اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ আমি মঞ্জুর করি আবেদনকারীর আবেদন اِذَا دَعَانِ যখন আমার নিকট আবেদন করে فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ তাদেরও উচিত আমার বিধান মেনে নেওয়া وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ আর আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ আশা যে, তারা সুপথ লাভ করতে পারবে।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ
لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ
كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ ۖ فَالْئٰنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ
لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ
أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عٰكِفُونَ فِي الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

অনুবাদ : (১৮৭) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে রোজার রাত্রিতে স্বীয় স্ত্রীদের সঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া; কেননা তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের আবরণস্বরূপ; আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতার পাপে নিজেদেরকে লিপ্ত করছিলে; যা হোক তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের পাপ মোচন করেছেন, সুতরাং এখন তাদের সঙ্গে মেলামেশা কর এবং যা [অনুমতি প্রদানে] আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, [অবাধে] তার প্রস্তুতি কর, আর খাও ও পান কর, যে পর্যন্ত না তোমাদের নিকট সুবহে সাদেকের সাদা রেখা পৃথক হয়ে যায় কালো রেখা হতে, অতঃপর রোজা পূর্ণ কর রাত্রি পর্যন্ত; আর পত্নীদের সঙ্গে স্বীয় শরীরও মিলতে দিওনা যখন তোমরা ইতেকাফকারী হও মসজিদে, এগুলো আল্লাহর বিধান, সুতরাং তা লঙ্ঘনের কাছেও যেয়োনা, তদ্রূপ আল্লাহ স্বীয় বিধানসমূহ মানুষের জন্য বর্ণনা করেন, আশা, তারা মুত্তাকী হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৭) أُحِلَّ لَكُمْ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে لَيْلَةَ الصِّيَامِ রোজার রাত্রিতে الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ স্বীয় স্ত্রীদের সঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ কেননা তারা তোমাদের আবরণ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ এবং তোমরা তাদের আবরণস্বরূপ عَلِمَ اللّٰهُ আল্লাহ জানতেন যে, أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ তোমরা বিশ্বাসঘাতকতার পাপে নিজেদেরকে লিপ্ত করছিলে; فَتَابَ عَلَيْكُمْ যা হোক তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন وَعَفَا عَنْكُمْ এবং তোমাদের পাপ মোচন করেছেন فَالْئٰنَ সুতরাং এখন بَاشِرُوهُنَّ তাদের সঙ্গে মেলামেশা কর وَابْتَغُوا এবং তার প্রস্তুতি কর مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ যা [অনুমতি প্রদানে] আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন وَكُلُوا وَاشْرَبُوا আর খাও ও পান কর, حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ যে পর্যন্ত না তোমাদের নিকট পৃথক হয়ে যায় الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ সাদা রেখা مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ কালো রেখা হতে مِنَ الْفَجْرِ সুবহে সাদেকের ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ অতঃপর রোজা পূর্ণ কর إِلَى الَّيْلِ রাত্রি পর্যন্ত وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ আর পত্নীদের সঙ্গে স্বীয় শরীরও মিলতে দিওনা وَأَنْتُمْ عٰكِفُونَ فِي الْمَسٰجِدِ যখন তোমরা ইতেকাফকারী হও মসজিদে تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ এগুলো আল্লাহর বিধান فَلَا تَقْرَبُوهَا সুতরাং তা লঙ্ঘনের কাছেও যেয়োনা كَذٰلِكَ তদ্রূপ يُبَيِّنُ اللّٰهُ আল্লাহ বর্ণনা করেন اٰيٰتِهِ স্বীয় বিধানসমূহ لِلنَّاسِ মানুষের জন্য لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ আশা, তারা মুত্তাকী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮৬) قوله وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কতিপয় লোক মহানবী [illegible]-কে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদের প্রভু নিকটে না দূরে। যদি নিকটে হন তাহলে তাকে আমরা চুপি চুপি ডাকব। আর যদি দূরে হন তাহলে তাকে আমরা উচ্চ আওয়াজে ডাকব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করেন।

(১৮৭) قوله أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, ইসলামের সূচনা লগ্নে নিয়ম ছিল ইফতারের পর শয্যা গ্রহণের আগ পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া এবং স্ত্রী মিলন বৈধ। আর ঘুমানোর পর খাওয়া দাওয়া ও স্ত্রী মিলন নিষেধ ছিল পরের দিন ইফতার পর্যন্ত। তাতে অনেক সাহাবায়ে কেরাম ভীষণ সমস্যায় পতিত হলেন। একদিনের ঘটনা-হযরত কায়স ইবনে সিরমাহ (রা.) সারাদিন কাজ করে ইফতারের সময় বাড়ি

ফিরলেন স্ত্রীর নিকট খাবারের কিছু আছে কিনা জানতে চাইলে না সূচক জবাব দিয়ে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। দেখি কোনো ব্যাবস্থা করতে পারি কিনা। এই বলে তিনি খাবার তালাশ করতে বের হলেন। এদিকে কায়স ইবনে সিরমাহ (রা.) সারা দিন কর্মজনিত ক্লান্তির কারণে ঘুমিয়ে পড়লেন স্ত্রী এসে তাকে ঘুমন্ত দেখে অবাক হয়ে বলেন তুমি একি কাজ করলে। এভাবে তিনি সারাদিন না খেয়ে পরের দিন রোজা রাখলেন দুপুর বেলায় তিনি ক্ষুধায় কাতর হয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। অনুরূপভাবে অনেক সাহাবী ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রী মেলামেশা করে মানসিক কষ্টে পতিত হতেন। –[ইবনে কাছীর]

আরেক দিনের ঘটনা, একদিন হযরত ওমর (রা.) হুজুর ﷺ -এর দরবার থেকে বাড়িতে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে দেখে বিবি সাহেবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি সহবাস করতে চাইলে বিবি বলে আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছি। হযরত ওমর (রা.) বলেন, তুমি ঘুমিয়ে আছ আমি তো ঘুমাইনি। এই বলে তিনি সহবাস করলেন পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে তিনি হুজুর ﷺ -এর কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করেন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়। –[ইবনে কাছীর]

(১৮৭) قوله وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইসলামের সূচনালগ্নে ইতেকাফরত অবস্থায় স্ত্রী মেলামেশা বৈধ ছিল পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করে তা নিষিদ্ধ করে দেন।

কুরআন অবতীর্ণ প্রসঙ্গে : কুরআনে কারীমের অন্য এক আয়াতে রয়েছে যে, আমি কুরআন মাজীদকে "শবে ক্বদরে" নাজিল করেছি। আর আলোচ্য আয়াতে রমজানে নাজিল করার কথা বলছেন। অতএব, সে শবে ক্বদর রমজান মাসেই ছিল। তাই আয়াতদ্বয়ে কোনো বিরোধ নেই। সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফূয হতে একবারেই রমজানের ক্বদর রাত্রে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়েছিল। তারপর দুনিয়ার আসমান হতে ক্রমান্বয়ে তেইশ বৎসর ব্যাপী সমুদয় কুরআন মাজীদ প্রয়োজন অনুপাতে এক সূরা, দু'সূরা, এক আয়াত দু'আয়াত করে হুজুর ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়।

ইমাম আহমদ ও তাবারানী ওয়াসেলা ইবনুল আসকা'র বর্ণনায় হুজুর ﷺ-এর যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাগুলো রমজানের প্রথম রাত্রে, তাওরাত ষষ্ঠ রাত্রে, ইনজীল ত্রয়োদশ রাত্রে এবং কুরআন শরীফ চব্বিশতম রাত্রে নাজিল করা হয়েছিল।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, অন্যান্য আসমানি গ্রন্থগুলো একসাথে এককালীন অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু কুরআন মাজীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যদিও শবে ক্বদরে একবারে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়, তবে তা পরে তেইশ বৎসরে রাসূলের নিকট প্রেরিত হয়।

মাহে রমজানের ফজিলত : পবিত্র কুরআন মাজীদ ও আসমানি অন্যান্য গ্রন্থসমূহ এই রমজান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে মাহে রমজানের ফজিলত ও মর্যাদা অপরিসীম। পবিত্র কুরআনের সঙ্গে রমজান মাসের সুলভ ঘনিষ্ঠতা ও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই এ মাসে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য পবিত্র কুরআনের খেদমত, তেলাওয়াত ইত্যাদিতে আত্মনিয়োগ করা পরম সৌভাগ্য ও মহান কর্তব্য।

রমজানের অর্থ : رَمَضَانُ الصَّائِمِ থেকে رَمَضَانُ শব্দটি নেওয়া হয়েছে। মারাত্মক ক্ষুধা তৃষ্ণায় পেট পুড়ে গেলে বলা হয় رَمَضَانُ الصَّائِمِ; আবার প্রচণ্ড গরমকে اَلرَّمْضَاءُ বলা হয়। জাওহারী বলেন, ভাষাবিদগণ যখন পুরাতন ভাষা থেকে মাসের নামসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন তখন সময় এবং ঘটনাপ্রবাহকে সাক্ষী রেখেই মাসসমূহের নামকরণ করেছিলেন। রমজান মাসের নাম নির্ধারণ করার সময় প্রচণ্ড গরম থাকায় উক্ত নামই প্রযোজ্য হয়েছে।

কারো মতে এ মাসকে রমজান বলা হয়েছে এ কারণে যে, اِنَّهٗ يَرْمِضُ الذُّنُوْبَ –অর্থাৎ এ মাস পাপকে জ্বালিয়ে দেয়। এ মাসের সৎকাজের প্রভাব এত বেশি যে, এতে পাপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

قوله فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসে উপস্থিত থাকবে সে যেন এ মাসের রোজা রাখে। জমহুরের মতে, যখন ব্যক্তি সফরে থাকবে তখন তার জন্য রোজা না রাখার সুযোগ রয়েছে। আর যদি মুকীম অবস্থায় থাকে, তবে রোজা রাখতেই হবে, ছেড়ে দেওয়া কোনো প্রকারেই বৈধ হবে না।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ বাক্যটি ছিল সংক্ষিপ্ত। তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ আয়াতে যে, সে কতিপয় দিন হলো রমজান মাসের দিনগুলো। আর এর ফজিলত হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা এ মাসটিকে স্বীয় ওহী এবং আসমানি কিতাব নাজিল করার জন্য নির্বাচিত করেছেন কুরআনও [প্রথম] এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহিফা রমজান মাসের ১লা তারিখে নাজিল হয়েছিল। আর রমজানের ৬ তারিখে তাওরাত, ১৩ তারিখে ইঞ্জিল, এবং ২৪ তারিখে কুরআন নাজিল হয়েছে। হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, 'যাবূর' রমজানের ১২ তারিখে এবং ইঞ্জিল ১৮ তারিখে নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

উল্লিখিত হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অবতরণ সম্পর্কিত যেসব তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব তারিখে সেসব কিতাব গোটাই নাজিল করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা সম্পূর্ণভাবে রমজানের কোনো এক রাতে লওহে মাহফুজ থেকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ করে দেওয়া হলেও হুজুর আকরাম -এর উপর ধীরে ধীরে তেইশ বছরে তা অবতীর্ণ হয়। فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এই একটি মাত্র বাক্যে রোজা সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। شَهِدَ শব্দটি شُهُوْدٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ উপস্থিত ও বর্তমান থাকা। আরবি অভিধানে اَلشَّهْرُ অর্থ মাস। এখানে অর্থ হলো রমজান মাস। কাজেই বাক্যটির অর্থ দাঁড়াল এই যে, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি রমজান মাসে উপস্থিত থাকবে, অর্থাৎ বাড়িতে বর্তমান থাকবে, তার উপর গোটা রমজান মাসের রোজা রাখা কর্তব্য। ইতঃপূর্বে রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া দেওয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল এ বাক্যের দ্বারা তা মানসূখ বা রহিত করে দিয়ে রোজা রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেওয়া হয়েছে।

মাসআলা : এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার জন্য রোজার যোগ্য অবস্থায় রমজান মাসের উপস্থিতি একটি শর্ত। এমতাবস্থায় যে লোক পূর্ণ রমজান মাসকে পাবে, তার উপর গোটা রমজান মাসের রোজা ফরজ হয়ে যাবে। যে লোক এ অবস্থায় কিছু কম সময় পাবে, তার উপর ততদিনই ফরজ হবে। কাজেই রমজান মাসের মাঝে যদি কোনো কাফের ব্যক্তি মুসলমান হয়, কিংবা কোনো নাবালেগ যদি বালেগ হয়, তবে তার উপর পরবর্তী রোজাগুলোই ফরজ হবে; বিগত দিনগুলোর রোজা কাজা করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য উন্মাদ ব্যক্তি মুসলমান ও বালেগ হওয়ার প্রেক্ষিতে যেহেতু ব্যক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী হয়, সেহেতু সে যদি রমজানের কোনো অংশে সুস্থ হয়ে উঠে, তবে এ রমজানের বিগত দিনগুলোর কাজা করাও তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে হায়েজ-নেফাসগ্রস্তা স্ত্রীলোক যদি রমজানের মাঝে পাক হয়ে যায় অথবা কোনো অসুস্থ লোক যদি সুস্থ হয়ে উঠে কিংবা কোনো মুসাফির যদি মুকিম হয়ে যায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোজা কাজা করা তার পক্ষে জরুরি হবে।

মাসআলা : যেসব দেশে রাত ও দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হয়ে থাকে সেসব দেশে ব্যহতঃ মাসের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় না। অর্থাৎ, রমজান মাসের প্রকাশ্য আগমন ঘটে না। কাজেই সে দেশের অধিবাসীদের উপর রোজা ফরজ না হওয়াই উচিত। হানাফী মাযহাব অবলম্বী ফিকহবিদগণের মধ্যে হালওয়ানী, কেবালী প্রমুখ নামাজের ব্যাপারেও এমনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, তাদের উপর নিজেদের দিন-রাত অনুযায়ী নামাজের হুকুম বর্তাবে। অর্থাৎ, যে দেশে মাগরিবের সাথে সাথেই সুবহে-সাদেক হয়ে যায়, সেদেশে এশার নামাজ ফরজ হয় না। –[শামী]

এর তাকাযা হলো এই যে, যে দেশে ছয় মাসের দিন হয় সেখানে শুধু পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হবে। রমজান আদৌ আসবে না। হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-ও 'ইমদাদুল ফতোয়া' গ্রন্থে রোজা সম্পর্কে এ মতই গ্রহণ করেছেন।

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ –আয়াতে রুগ্ণ কিংবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে যে, সে তখন রোজা না রেখে; বরং সে সুস্থ হওয়ার পর অথবা সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের রোজা কাজা করে নিবে, এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া দেওয়ার ঐচ্ছিকতাকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয়তো রুগ্ণ কিংবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে; সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে রমজানের হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে রোজা ও ই'তেকাফের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এখানে মাঝখানে বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়াতটিকে বান্দাদের অবস্থার প্রতি মহান পরওয়ারদেগারের অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও কবুল করার বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ রোজা-সংক্রান্ত ইবাদতে অবস্থাবিশেষে অব্যাহতি দান এবং বিভিন্ন সহজতা সত্ত্বেও কিছু কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। এ কষ্টকে সহজ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, যখনই তারা আমার কাছে কোনো বিষয় প্রার্থনা বা দোয়া করে, আমি তাদের সে দোয়া কবুল করে নিই এবং তাদের বাসনা পূরণ করে দেই।

এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহকাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত কর্তব্য। তাতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা সহ্য করা উচিত। ইমাম ইবনে কাছীর দোয়ার প্রতি উৎসাহদান সংক্রান্ত এই মধ্যবর্তী বাক্যটির তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এ আয়াতের দ্বারা রোজা রাখার পর দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্যই রোজার ইফতারের পর দোয়ার ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত। মহানবী ইরশাদ করেছেন– لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ
অর্থাৎ, রোজার ইফতার করার সময় রোজাদারের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। –[আবূ দাউদ]

সে জন্যই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ইফতারের সময় বাড়ির সবাইকে সমবেত করে দোয়া করতেন।

মাসআলা : এ আয়াতে فَإِنِّي قَرِيبٌ [আমি নিকটেই রয়েছি] বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ধীরে-সুস্থে ও নীরবে দোয়া করাই উত্তম, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা পছন্দনীয় নয়।

সাহরী খাওয়ার শেষ সময়সীমা : حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে রোজার শুরু এবং খানাপিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়সীমার মধ্যে বেশ-কম হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেজন্য حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ শব্দটিও যোগ করে দেওয়া হয়েছে এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুবহে সাদেক দেখা দেওয়ার আগেই খানা-পিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুবহে সাদেকের আলো ফুটে উঠার পরও খানাপিনা করতে থাকবে; বরং খানা-পিনা এবং রোজার মধ্যে সুবহে সাদেকের উদয় সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা বন্ধ করা জরুরি মনে করা যেমন জায়েজ নয়, তেমনি সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার ব্যাপারে একিন হয়ে যাওয়ার পর খানা পিনা করাও হারাম এবং রোজা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুবহে সাদেক উদয় সম্পর্কে একীন হওয়া পর্যন্তই সাহরীর শেষ সময়।

মাসআলা : উপরিউক্ত আলোচনাগুলো শুধুমাত্র, সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের নিজের চোখে 'সুবহে সাদেক' দেখে সময় নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে এবং সময় সম্পর্কেও যদি তাদের সঠিক জ্ঞান থাকে। কিন্তু যাদের তেমন সুযোগ নেই অর্থাৎ, আকাশ ঠিকমতো দেখার সুযোগ নেই, সুবহে সাদেকের উদয় সম্পর্কে সঠিক ধারাণাও নেই, কিংবা আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে সেসব লোকের পক্ষে অন্যান্য লক্ষণ কিংবা জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য নিয়ে সাহরী-ইফতারের সময় নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য এসব হিসেবের মধ্যেও এমন সময় আসতে পারে, যে সময় সীমার মধ্যে সুবহে সাদেকের উদয় হওয়ার ব্যাপারে একিন বা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছা যায় না। এমতাবস্থায় সন্দেহযুক্ত সময়ে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে ইমাম জাস্‌সাস 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন– এরূপ ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে খানাপিনা না করাই কর্তব্য। তবে এরূপ সন্দেহপূর্ণ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ, সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণে যদি কেউ প্রয়োজন বশত খানাপিনা করে ফেলে তবে সে গুনাহগার হবে না। কিন্তু পরে তাহকীক বা যাচাই করে যদি দেখা যায়, যে সময় সে খানা-পিনা করেছে সে সময় সুবহে সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তবে তার পক্ষে সেদিনের রোজার কাজা করা ওয়াজিব হবে। যেমন, রমজানের এক তারিখে চাঁদ না দেখার কারণে লোকেরা রোজা রাখল না, কিন্তু পরে জানা গেল যে, ২৯ শে শাবানেই রমজানের চাঁদ উদিত হয়েছিল। তবে এমতাবস্থায় যারা সে দিনটিকে ৩০শে শাবান মনে করে রোজা রাখেনি, তারা গুনাগাহার হবে না, তবে তাদের এ দিনের রোজা সকল ইমামের মতেই কাজা করতে হবে। অনুরূপভাবে মেঘলা দিনে কেউ সূর্য অস্ত গেছে মনে করে ইফতার করে ফেলল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি গুনাহগার হবে না সত্য, তবে তার উপর ঐ রোজা কাজা করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম জাস্‌সাসের উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি ঘুম ভাঙ্গার পর শুনতে পায় যে, ফজরের আজান হচ্ছে, তখন তার পক্ষে সুবহে সাদেক উদয় হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহে একীন হয়ে যায়। এরপরও যদি সে জেনে শুনে কিছু খেয়ে নেয়, তবে সে গুনাহগারও হবে এবং তার উপর সে রোজা কাজা করাও ওয়াজিব হবে। অপরপক্ষে যদি সে সন্দেহযুক্ত সময়ে খায় এবং পরে সুবহে সাদেক এ সময়েই উদিত হয়েছিল, বলে জানতে পারে, তবে তার উপর থেকে গুনাহ রহিত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু রোজার কাজা করতে হবে।

ই'তিকাফ : ই'তিকাফ-এর শাব্দিক অর্থ কোনো একস্থানে অবস্থান করা। কুরআন সুন্নাহর পরিভাষায় কতগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারতি সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়। فِي الْمَسَاجِدِ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, ই'তিকাফ যে কোনো মসজিদেই হতে পারে। কেননা এখানে মসজিদ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শুধুমাত্র যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাত হয়, সেসব মসজিদেই ই'তিকাফ করা বৈধ। অন্যান্য মসজিদ যেখানে নিয়মিত জামাত হয় না, সেগুলোতে ই'তিকাফ না হওয়ার ব্যাপারে ফিকহবিদগণ যে শর্ত আরোপ করে থাকেন, তা 'মসজিদ' শব্দের সংজ্ঞা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা যেখানে নিয়মিত জামাতে নামাজ হয়, তাকেই কেবল মসজিদ বলা যেতে পারে। বাসস্থান বা দোকানপাট সর্বত্রই বিচ্ছিন্নভাবে নামাজ পড়া জায়েজ এবং তা হয়েও থাকে, কিন্তু তাই বলে সেগুলোকে মসজিদ বলা হয় না।

মাসআলা : ই'তিকাফের অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণ রোজাদারদের প্রতি প্রযোজ্য নির্দেশেরই অনুরূপ তবে স্ত্রী-সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, ই'তিকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েজ নয় এ আয়াতে সে নির্দেশই ব্যক্ত হয়েছে।

রোজার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ : সর্বশেষ আয়াত تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا বলে ইশারা করা হয়েছে যে, রোজার মধ্যে খানা-পিনা এবং স্ত্রী-সহবাস সম্পর্কিত যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে-কাছেও যেয়ো না। কেননা কাছে গেলেই সীমালঙ্ঘনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। একই কারণে রোজা অবস্থায় কুলি করতে বাড়াবাড়ি করা, যদ্দরুন গলার ভিতরে পানি প্রবেশ করতে পারে, মুখের ভিতর কোনো ঔষধ ব্যবহার করা, স্ত্রীর অতিরিক্ত নিকটবর্তী হওয়া প্রভৃতি মাকরূহ। তেমনিভাবে সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা আগেই সাহরী খাওয়া শেষ করে দেওয়া এবং ইফতার গ্রহণে দু'চার মিনিট দেরি করা উত্তম। এসব ব্যাপারে অসাবধানতা এবং শৈথিল্য প্রদর্শন আল্লাহর এই নির্দেশের পরিপন্থি।

শব্দ বিশ্লেষণ

أُجِيْبُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ معروف مضارع বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِجَابَةُ মূলবর্ণ (ج . و . ب)– জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি দোয়া কবুল করি।

دَعْوَةَ : এটি বাব نَصَرَ-এর মাসদার। অর্থ– ডাকা, আহ্বান করা।

يَسْتَجِيْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِجَابَةُ মূলবর্ণ (ج . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক, তারা যেন আমার হুকুম কবুল করে।

كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِيَانُ মূলবর্ণ (خ . و . ن) জিনসে اجوف واوى অর্থ– তোমরা খেয়ানত করছিলে।

حُدُوْدُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে حَدٌّ অর্থ– সীমারেখা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ : এখানে شَهْرُ رَمَضَانَ হলো مضاف ও مضاف اليه মিলে موصوف হয়েছে, الَّذِىْ হলো اسم موصول আর اُنْزِلَ হলো فعل مجهول ও فِيْهِ উভয়টি মিলে مجرور ও جار হলো, متعلق হলো اَلْقُرْاٰنُ হলো ذو الحال আর هُدًى لِّلنَّاسِ হলো شبه فعل ও مِّنَ আর شبه فعل মিলে متعلق হলো بَيِّنٰتٍ আর حرف عطف টি واو এবং : معطوف عليه হরফে জার الْهُدٰى মা'তূফ আলাইহি وَ হরফের আতফ الْفُرْقَانِ মা'তূফ এখন মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো بينت-এর সাথে। শিবহে ফে'ল তার মুতা'আল্লিক মিলে মা'তূফ এখন معطوف عليه ও معطوف মিলে حال হয়েছে, অতঃপর ذو ও حال মিলে نائب فاعل হয়েছে। এবার فعل مجهول ـ نائب فاعل ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে صلة : তারপর اسم موصول ও صلة মিলে صفت হয়েছে شَهْرُ رَمَضَانَ মওসূফের। এবার موصوف ও صفت মিলে উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। অতঃপর موصوف ও صفت মিলে উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে।

قوله اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ : এখানে اُحِلَّ হলো فعل مجهول ও لكم টি جار ও مجرور মিলে متعلق হলো اُحِلَّ ফে'ল-এর সাথে। لَيْلَةَ الصِّيَامِ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول فيه হলো الرَّفَثُ। আর اِلٰى হলো حرف جار ও نِسَآئِكُمْ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور হলো। এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হলো الرفث শিবহে فعل-এর সাথে। অবশেষে فعل مجهول তার نائب فاعل মিলে نائب فاعل এবং متعلق ও شبه فعل ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٨٨)

অনুবাদ : (১৮৮) আর তোমরা একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না, এবং তা [-র মিথ্যা মকদ্দমা] -কে বিচারকদের নিকট দায়ের করো না এই উদ্দেশ্যে যে, [তার সাহায্যে] আত্মসাৎ করবে মানুষের সম্পত্তির অংশবিশেষ অন্যায়ভাবে অথচ তোমরা জানও।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (١٨٩)

(১৮৯) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে চন্দ্রের [প্রাকৃতিক] অবস্থা সম্বন্ধে; আপনি বলে দিন, এই চন্দ্র সময়-নির্ধারক যন্ত্রবিশেষ, মানুষের [বিভিন্ন বিষয়ের] জন্য এবং হজের জন্য; আর তা কোনো পুণ্যের কাজ নয় যে, ঘরসমূহে তার পশ্চাৎ দিক হতে প্রবেশ কর; বরং হারাম কাজ হতে বিরত থাকাতেই পুণ্য, আর তোমরা ঘরসমূহে প্রবেশ কর তার দরজা দিয়েই, এবং আল্লাহকে ভয় কর, আশা, তোমরা সফলকাম হবে।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (١٩٠)

(১৯০) আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর তাদের সঙ্গে, যারা [চুক্তি ভঙ্গ করে] তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং সীমালঙ্ঘন করো না নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৮) وَلَا تَأْكُلُوْٓا আর তোমরা আত্মসাৎ করো না اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ একে অন্যের মাল بِالْبَاطِلِ অন্যায়ভাবে وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ এবং তাকে বিচারকদের নিকট দায়ের করো না لِتَأْكُلُوْا এই উদ্দেশ্যে যে, আত্মসাৎ করবে فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ মানুষের সম্পত্তির অংশবিশেষ بِالْاِثْمِ অন্যায়ভাবে وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অথচ তোমরা জানও।

(১৮৯) يَسْـَٔلُوْنَكَ তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عَنِ الْاَهِلَّةِ চন্দ্রের [প্রাকৃতিক] অবস্থা সম্বন্ধে; قُلْ আপনি বলে দিন هِيَ এই চন্দ্র مَوَاقِيْتُ সময়-নির্ধারক যন্ত্রবিশেষ لِلنَّاسِ মানুষের [বিভিন্ন বিষয়ের] জন্য وَالْحَجِّ এবং হজের জন্য وَلَيْسَ الْبِرُّ আর তা কোনো পুণ্যের কাজ নয় بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ যে ঘরসমূহে প্রবেশ কর مِنْ ظُهُوْرِهَا তার পশ্চাৎ দিক হতে وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى বরং হারাম কাজ হতে বিরত থাকাতেই পুণ্য وَاْتُوا الْبُيُوْتَ আর তোমরা ঘরসমূহে প্রবেশ কর مِنْ اَبْوَابِهَا তার দরজা দিয়েই وَاتَّقُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহকে ভয় কর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ আশা, তোমরা সফলকাম হবে।

(১৯০) وَقَاتِلُوْا আর তোমরা তাদেরকে সঙ্গে যুদ্ধ কর فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ যারা [চুক্তি ভঙ্গ করে] তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় وَلَا تَعْتَدُوْا এবং সীমালঙ্ঘন করো না اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ (١٩١)

অনুবাদ : (১৯১) আর তাদের হত্যা কর যেখানে পাও অথবা তাদেরকে বহিষ্কৃত কর যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল, আর দুষ্কৃতি হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর, এবং তাদের সঙ্গে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত না তারা তথায় তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, যদি তারাই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর, এই প্রকৃতির কাফেরদের এরূপই শাস্তি।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٩٢)

(১৯২) অতঃপর যদি তারা বিরত থাকে [এবং ইসলাম গ্রহণ করে] তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন, অনুগ্রহ করবেন।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (١٩٣)

(১৯৩) এবং তাদের সঙ্গে ঐ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তাদের ভ্রান্ত-বিশ্বাসের অবসান হয় এবং [তাদের] ধর্ম [খাঁটিভাবে] আল্লাহরই হয়ে যায়; অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে কারো প্রতি কঠোরতা করা হয় না অনাচারীদের ব্যতীত।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯১) وَاقْتُلُوْهُمْ আর তাদের হত্যা কর حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ যেখানে পাও وَاَخْرِجُوْهُمْ অথবা তাদেরকে বহিষ্কৃত কর مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল وَالْفِتْنَةُ আর দুষ্কৃতি اَشَدُّ গুরুতর مِنَ الْقَتْلِ হত্যা অপেক্ষা وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো না عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে হারামের নিকট حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ যে পর্যন্ত না তারা তথায় তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ যদি তারাই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় فَاقْتُلُوْهُمْ তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর كَذٰلِكَ এরূপই جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ এই প্রকৃতির কাফেরদের শাস্তি

(১৯২) فَاِنِ انْتَهَوْا অতঃপর যদি তারা বিরত থাকে فَاِنَّ اللّٰهَ তবে আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ ক্ষমা করবেন رَّحِيْمٌ অনুগ্রহ করবেন।

(১৯৩) وَقٰتِلُوْهُمْ এবং তাদের সঙ্গে ঐ পর্যন্ত যুদ্ধ কর حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ যে পর্যন্ত না তাদের ভ্রান্ত-বিশ্বাসের অবসান হয় وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ এবং [তাদের] ধর্ম [খাঁটিভাবে] আল্লাহরই হয়ে যায় فَاِنِ انْتَهَوْا অতঃপর যদি তারা বিরত হয় فَلَا عُدْوَانَ তবে কারো প্রতি কঠোরতা করা হয় না اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ অনাচারীদের ব্যতীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮৮) قوله وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবদান ইবনে আশওয়া ইবনে হাযরামী নামের এক ব্যক্তি ইমরাউল কায়েস ইবনে আমের-এর উপর একটি জমির মালিকানার দাবি জানায়, অথচ তার কোনো সাক্ষী ছিল না। তখন রাসূল ﷺ বলেন, এমতাবস্থায় বিবাদীর শপথের উপর সিদ্ধান্ত নাও। তখন ইমরাউল কায়েস শপথ করার জন্য উদ্যত হলে উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন– আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ। তোমাদের মধ্যে অনেক আছে ছল-চাতুর ব্যক্তি। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার নিকট বানোয়াট দাবি নিয়ে ধোঁকা দ্বারা মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রমাণ করবে, তাহলে আমি প্রকাশ্য প্রমাণানুযায়ী রায় দিব; কিন্তু তার জন্য তা হবে আগুনের টুকরা। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। [বুখারী, মুসলিম, রূহুল মা'আনী]

(১৮৯) قوله يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) ও হযরত সা'লাবা (রা.) উভয়ে আনসারী সাহাবী ছিলেন। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আকাশে নতুন চাঁদ উদিত হলে প্রথমে সূতার ন্যায় চিকন দেখা যায়, অতঃপর তা বৃদ্ধি হতে হতে পূর্ণ গোলাকার হয়, আবার তা হ্রাস পেতে পেতে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এমন অবস্থা হওয়ার কারণ কি? তাদের প্রশ্নের জবাবে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[রূহুল মা'আনী]

(১৮৯) قوله وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, জাহিলিয় যুগে অধিকাংশ গোত্রের মধ্যে এমন প্রথা ছিল যে, তারা সফরে বের হলে, কোনো কারণে সফর অসমাপ্ত থাকলে তারা বাড়ি ফিরে ঘরের সম্মুখের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত না; বরং ঘরের পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করতো। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করে জাহিলিয় প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী (র.) হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। জাহিলিয় যুগের লোকেরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ঘরের পিছন দিক দিয়ে ঘরে ঢুকে তাদের স্ত্রীদের সাথে দেখা করে চলে যেত, সামনের দিক দিয়ে ঘরে ঢুকত না। এ ধরনের কু-প্রথাকে চিরতরে বন্ধ করার লক্ষ্যে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১৯০) قوله وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আবুল আলীয়া হতে বর্ণিত এ আয়াতটিই প্রথম আয়াত, যা মদিনার জীবনে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল। এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর যারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত তাদের বিরুদ্ধে তিনিও যুদ্ধ করতেন। যারা বিরত থাকত তিনিও তাদের থেকে বিরত থাকতেন। এ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত সূরায়ে তওবার আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

(১৯২) قوله فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ الاية **আয়াতের শানে নুযূল :** সপ্তম হিজরি সনে যখন নবী করীম হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির শর্তানুযায়ী বিগত বছরের ওমরার কাজা আদায়ের নিয়তে সাহাবীগণসহ মক্কাভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তারা জানতেন যে, কাফেরদের কাছে চুক্তির কোনো মূল্যই নেই। এমনও হতে পারে তারা সন্ধির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবীদের মনে এ আশঙ্কার উদ্ভব হয় যে, এতে হেরেম শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। অপর আয়াতে সাহাবীগণের এ আশঙ্কার জবাব দেওয়া হয়েছে। হেরেম শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলমানদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু তারা যদি সেখানে আক্রান্ত হয়, তবে তার মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করা জায়েজ।

সাহাবীদের মনে এ সন্দেহ ছিল যে, এটা জিলকদ মাস এবং এটা সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে আশহুরে হুরুম বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এ মাসসমূহে কোথাও কারো সাথে যুদ্ধ করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে তবে আমরা এখানে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করব। তাদের এ দ্বিধা দূর করার জন্যই এ আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতঃপূর্বে সূরা বাকারারই ১৬৮ তম আয়াতে হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী সে আয়াতে বলা হয়েছিল। "হে মানবমণ্ডলী! জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুসমূহ খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

অনুরূপ সূরা নাহলে ইরশাদ হয়েছে–

"তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে পবিত্র ও হালাল রুজি দান করেছেন, তা থেকে খাও এবং আল্লাহর নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই উপাসক হয়ে থাক।"

প্রথম আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ -এর প্রতি সম্ভ্রম ও সমীহ বোধের কারণে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। তাঁরা এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী জমানার উম্মতদের ব্যতিক্রম ছিলেন। পূর্ববর্তী উম্মতগণ এ আদবের প্রতি সচেতন ছিল না। তারা সব সময় নানা অবান্তর প্রশ্ন করত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সাহাবীগণের যেসব প্রশ্নের উল্লেখ কুরআন মাজীদে বিদ্যমান রয়েছে, তা সংখ্যায় মাত্র চৌদ্দটি। এ চৌদ্দটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ [যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে আপনার কাছে প্রশ্ন করে! দ্বিতীয় প্রশ্নটি আলোচ্য আয়াতে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত। এই দু'টি প্রশ্ন ছাড়াও সূরা বাকারায় আরো ছয়টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। বাকি ছয়টি প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন সূরায় বিদ্যমান।

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আহিল্লাহ' বা নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ চাঁদের আকৃতি-প্রকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি ধারণ করে অতঃপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ গোলকের মতো হয়ে যায়। এরপর পুনরায় ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই হ্রাস বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। এই দুই প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তাতে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। যদি প্রশ্নই এই হয়ে থাকে যে, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত রহস্য জানার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের স্বভাববিরুদ্ধ, তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মৌল-তত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোনো বিষয়ই এই জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা ও জবাব এই যে, চন্দ্রের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উদায়াস্তের মধ্যে আমাদের কোন কোন মঙ্গল নিহিত? সেজন্য আল্লাহ তা'আলা প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত তা এই যে, এতে তোমাদের কাজ-কর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজের দিনগুলোর হিসেব জেনে রাখা সহজতর হবে।

উত্তর প্রশ্নের অনুকূল নয় : উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম বিশ্বনবী ﷺ-কে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন দু'ধরনের হতে পারে। যথা– (১) চন্দ্র ছোট বড় হয় কেন? (২) চন্দ্রের উদ্দেশ্য কি?

যদি তাঁদের প্রশ্ন প্রথমটি হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন ও জবাবের মধ্যে মিল পাওয়া যায় না। তখন উত্তর এই হবে যে, এটা দ্বারা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজির মৌলিক দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোনো বিষয়ই এ জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা অবান্তর। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রশ্নের উত্তরে মহানবী ﷺ-কে বলেছিলেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত, তা হলো এতে তোমাদের কাজ-কর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজের দিনগুলোর হিসেব জেনে রাখা সহজতর হবে। আর যদি দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্নের সাথে জবাবের পূর্ণ মিল দেখা যায়। –[মা'আরিফুল কুরআন]

اَهِلَّة -এর অর্থ : اَلْاَهِلَّةُ শব্দটি اَلْهِلَالُ -এর বহুবচন। প্রত্যেক মাসের চাঁদকে এক একটি মনে করে এখানে বহুবচনের শব্দ নেওয়া হয়েছে। মাসের প্রথমে এবং শেষে আকাশে প্রকাশিত সরু চাঁদকে هِلَالْ বলা হয়। আসমায়ীর মতে পূর্ণ রূপে গোলাকার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চন্দ্রকে هِلَالْ বলা হয়। কারো মতে আকাশকে পূর্ণরূপে আলোকিত করার পূর্ব পর্যন্ত চন্দ্রকে هِلَالْ বলা হয়। আর এ অবস্থা থাকে সাত দিন।

هلال -এর নামকরণ : চন্দ্রকে هِلَالْ বলা হয়, هِلَالْ অর্থ– উচ্চ শব্দ করা। যেহেতু নতুন চাঁদ দেখার সময় মানুষ সাধারণত উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করতে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চিৎকার দিলে আরবিতে বলা হয়– اِسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ

قوله مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ -এর অর্থ : একথা দ্বারা চাঁদের হ্রাস ও বৃদ্ধির হিকমত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। مَوَاقِيْتُ শব্দটি مِيْقَاتٌ - এর বহুবচন। এর অর্থ– وَقْتٌ বা সময়। মানুষ নিজেদের ইবাদত ও লেনদেনের সময় ঠিক রাখার জন্য চন্দ্রকে ব্যবহার করে থাকে। যেমন– রোজা, ফিতর, হজ, গর্ভধারণের সময়, ইদ্দত, বাড়ি ভাড়া, কসম ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন– لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ

قوله وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا দ্বারা উদ্দেশ্য : এ আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায়, সকল প্রকার বিদ'আত, অপকর্ম, কুসংস্কার ইত্যাদি পরিহার করাই যথেষ্ট নয়; বরং সাথে সাথে ভালো কাজ এবং শরিয়ত নির্দেশিত কাজকে আমলে আনতে হবে।

কিতাল সম্পর্কিত বক্তব্য : ওলামায়ে কেরামের মতে হিজরতের পূর্বে কিতাল নিষিদ্ধ ছিল। সেখানে আল্লাহর নির্দেশ ছিল– فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا তারপর যখন মহানবী ﷺ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, তখন দ্বিতীয় হিজরিতে আল্লাহ কিতালের নির্দেশ দিয়ে আয়াত অবতীর্ণ করেন। তা হলো– اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

وَلَا تَعْتَدُوْا -এর ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের অর্থ– "আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না"–এখানে সীমালঙ্ঘন বলতে নিম্নোক্ত বিষয় উদ্দেশ্য। যথা–

ক. অগ্রণী হয়ে অথবা বিনা কারণে হেরেমের সীমানায় বা অন্য কোথাও কাফেরদের উপর আক্রমণ করা।

খ. সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ গোত্রের লোকদের হত্যা করা।

গ. কাফেররা যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার পরও তাদেরকে হত্যা করা।

ঘ. নারী, শিশু ও যুদ্ধে অপারগ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের হত্যা করা।

ঙ. আল্লাহ যেমনটি করতে বলেছেন তার চেয়ে বেশি করা।

উল্লিখিত সবগুলো কাজই নৈতিক বিচারে সীমালঙ্ঘন। আল্লাহ তা'আলা এ সীমালঙ্ঘন না করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

কিতালের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের স্বরূপ : যাদেরকে হত্যা না করতে বলা হয়েছে, তাদেরকে হত্যা করলে সীমালঙ্ঘন হবে। যেমন– মহিলা, ছোট শিশু এবং বৃদ্ধদের হত্যা করা, যুদ্ধস্থলের আশপাশের ফলদার গাছ কাটা, গাছপালায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া, অকারণে বাড়ি-ঘরে আগুন দেওয়া সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত।

قوله مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** যেহেতু কাফেররা মহানবী ﷺ-কে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল তাই এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফেরদেরকে সে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইবনে জারীর বলেন, এখানে মুহাজিরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যেহেতু তারা তোমাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল, সেহেতু তোমরাও তাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দাও। আল্লাহর নবী তার প্রতিপালকের এই নির্দেশ পালন করেছিলেন যাতে একদিন মক্কা কাফের থেকে পবিত্র হয়ে গিয়েছিল। –[ফাতহুল কাদীর]

اَلْفِتْنَةُ **-এর অর্থ :** ফেতনা শব্দের অর্থ হলো– পরীক্ষা, যাচাই। এ পরীক্ষা মানুষের জীবনে বিভিন্নভাবে আসে। কোনো সময় অধিক সুখ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, আবার কখনো দুঃখের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। এতে মানুষ তাদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার উদাহরণ পেশ করে থাকে। অপর পক্ষে দিশেহারা মানুষ এতে অকৃতকার্য হয়ে আখেরাতের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

اَلْفِتْنَةُ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে فِتْنَة দ্বারা كُفْر ও شِرْك উদ্দেশ্য। কেননা তাদের উদ্দেশ্য ছিল মু'মিনগণ আবার কুফরির দিকে ফিরে যাক। এ কুফরির দিকে ফিরে যাওয়া হত্যা থেকেও মারাত্মক।

কারো মতে মসজিদে হারাম থেকে মানুষকে বিরত রাখাই হলো বড় ফিতনা। আর এটা হত্যা থেকেও মারাত্মক। কারো মতে এখানে ফিতনা দ্বারা দীনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উদ্দেশ্য। আবূ মুসলিম খোরাসানীর মতে এখানে فِتْنَة অর্থ– ظُلْم বা অপরাধ।

قوله وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ **-এর মর্মার্থ :** হিজরতের পূর্বে মুসলমানদেরকে কাফেরদের মোকাবিলা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং সর্বত্র ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কাজেই এ আয়াত অবতীর্ণের পর সাহাবীদের মধ্যে এই ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাফেরদের হত্যা করাও নিষিদ্ধ ও দূষণীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদন কল্পে ইরশাদ হচ্ছে– وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ অর্থাৎ এ কথাতো সর্বজনবিদিত ও সত্য যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম। কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরি ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদের ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করাকেই বুঝানো হয়েছে। –[কুরতুবী]

মসজিদে হারামে কিতালের হুকুম : এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। একদল আলেমের মতে, আয়াতটি মুহকাম, তাই মসজিদে হারামে কিতাল অবৈধ। তবে যদি কেউ সেখানে কিতালে লিপ্ত হয়ে যায় তাকে প্রতিহত করা যাবে। অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের মতে আয়াতটির হুকুম রহিত হয়ে গেছে। মসজিদে হারামে কিতাল করা বৈধ। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইবনে খাতালকে বায়তুল্লাহর গিলাফের সাথে ঝুলিয়ে থাকার পরও হত্যা করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ মূলত প্রথম বক্তব্যটিকে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এটাই ঠিক। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার পূর্বেই মসজিদে হারামে কিতাল হারাম ছিল। আমাকে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিতালের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পরে পূর্বের হুকুম বহাল থেকে যায়। আয়াতটি যদিও عَامٌ (আ'ম), কিন্তু হাদীস দ্বারা তা খাছ করা যায়। এভাবে বলা যায় যে– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ اِلَّا الْحَرَمَ

শরিয়তের দৃষ্টিতে চন্দ্র ও সৌর হিসেবের গুরুত্ব : এ আয়াতে এতটুকু বুঝা গেল যে, চন্দ্রের দ্বারা তোমরা তারিখ ও মাসের হিসেব জানতে পারবে, যার উপর তোমাদের লেন দেন আদান-প্রদান এবং হজ্জ প্রভৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গটিই সূরা ইউনুসে বিবৃত হয়েছে– وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চন্দ্রের পরিক্রমণের উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা বর্ষ, মাস ও তারিখের হিসেব জানা যায়, কিন্তু সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে বর্ষ, মাস ও দিন-ক্ষণের হিসেব যে সূর্যের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তাও বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে–

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

অর্থাৎ "অতঃপর আমি রাতের চিহ্ন তিরোহিত করে দিনের চিহ্নকে দর্শনযোগ্য করলাম, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের দান রুজি-রোজগারের অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষপঞ্জী ও দিন-ক্ষণের হিসাব অবগত হতে পার।" -[বনী ইসরাঈল]

এই তৃতীয় আয়াত দ্বারা যদিও প্রমাণিত হলো যে, বর্ষ, মাস ইত্যাদির হিসেব সূর্যের আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি দ্বারাও নির্ণয় করা যায়। কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে কুরআন যে ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি শরিয়তে চন্দ্রমাসের হিসেবই নির্ধারিত। রমজানের রোজা, হজের মাস ও দিনসমূহ, মহররম, ঈদ, শবে-বরাত ইত্যাদির সঙ্গে যেসব বিধি-নিষেধ সম্পৃক্ত, সেগুলো সবই 'রুইয়াতে হেলাল' বা নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। কেননা এই আয়াতে هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ 'এটি মানুষের হজ ও সময় নির্ধারণের উপায়' বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও এই হিসেব সূর্যের দ্বারাও অবগত হওয়া যায়, তবুও আল্লাহর নিকট চন্দ্রমাসের হিসেবই নির্ভরযোগ্য।

ইসলামি শরিয়ত কর্তৃক চন্দ্রমাসের হিসেব গ্রহণ করার কারণ এই যে, প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই আকাশে চাঁদ দেখে চন্দ্রমাসের হিসেব অবগত হতে পারে। পণ্ডিত, মূর্খ, গ্রামবাসী, মরুবাসী, পার্বত্য উপজাতি ও সভ্য-অসভ্য নির্বিশেষে সবার জন্যই চান্দ্রমাসের হিসেব সহজতর। কিন্তু সৌরমাস ও সৌরবৎসর এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর হিসেব জ্যোতির্বিদদের ব্যবহার্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং ভৌগলিক, জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যার সূত্র ও নিয়ম-কানুনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই হিসেব প্রত্যেকের পক্ষে সহজে অবগত হওয়া সম্ভব নয়; তাছাড়া ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে চন্দ্রমাসের হিসেব বাধ্যতামূলক করা হলেও সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এ হিসেবেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চাঁদ ইসলামি ইবাদতের অবলম্বন। চাঁদ এক হিসেবে ইসলামের প্রতীক বা শে'আরে ইসলাম। ইসলাম যদিও সৌরপঞ্জী ও সৌর হিসেবকে এই শর্তে নাজায়েজ বলেনি, তবুও এতটুকু সাবধান অবশ্যই করেছে, যেন সৌর হিসেব এত প্রাধান্য লাভ না করে, যাতে লোকেরা চন্দ্রপঞ্জী ও চন্দ্রমাসের হিসাব ভুলেই যায়; কারণ এরূপ করাতে রোজা, হজ ইত্যাদি ইবাদতে ত্রুটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

মাসআলা : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ['ঘরের পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাতে তোমাদের জন্য কোনো পুণ্য নেই'] এই আয়াত দ্বারা এই মাসআলা জানা গেল যে, যে বিষয়কে ইসলামি শরিয়ত প্রয়োজনীয় বা ইবাদত বলে মনে করে না, তাকে নিজের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় বা ইবাদত মনে করা জায়েজ নয়। এমনিভাবে যে বিষয় শরিয়তে জায়েজ রয়েছে, তাকে পাপ মনে করাও গুনাহ। মক্কার কাফেররা তাই করছিল। তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা শরিয়তসম্মতভাবে জায়েজ থাকা সত্ত্বেও না-জায়েজ মনে করত এবং পাপ বলে গণ্য করত, ঘরের পিছন দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে বা বেড়া কেটে বা সিঁধ কেটে ঘরে প্রবেশ করাকে [শরিয়তে যার কোনো আবশ্যকতাই ছিল না] নিজেদের জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করেছিল। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।
'বিদআত'-এর নাজায়েজ হওয়ার বড় কারণই এই যে, এতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে ফরজ-ওয়াজিবের মতোই অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় অথবা কোনো কোনো জায়েজ বস্তুকে না-জায়েজ ও হারাম বলে গণ্য করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ শরিয়ত-বহির্ভূত নিয়মে জায়েজকে না-জায়েজ মনে করা অথবা হারামকে হালাল মনে করা বা 'বিদআত'-এর প্রচলন করার নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

জিহাদ বা ন্যায়ের সংগ্রাম : গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, মদিনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও কিতাল' তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কুরআন মাজীদের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়। রবী' ইবনে আনাস (রা.)-এর উক্তি অনুসারে মদিনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরিউক্ত আয়াতটি নাজিল হয়।

এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলানগণ কেবলমাত্র সে সব কাফেরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসারত্যাগী, উপাসনারত সন্ন্যাসী-পাদরী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজদুরি করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরিক হয় না– সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েজ নয়। কেননা আয়াতের নির্দেশে কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণির লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফিকহশাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোনো নারী, বৃদ্ধ অর্থ ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোনো প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েজ। কারণ তারাও اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ 'যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' এই আয়াতের আওতাভুক্ত। –[মাযহারী, কুরতুবী ও জাস্সাস] যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ দেওয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে وَلَا تَعْتَدُوْا [এবং সীমা অতিক্রম করো না]–বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ –[আর তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর, এবং যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও।] হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-সহ সে ওমরার কাজা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়ত করেন, আগের বছর মক্কার কাফেররা যে ওমরা উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফেররা হয়তো তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাঁদেরকে বাধা দেয়, তবে তাঁরা কি করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমরাও তার সমুচিত জবাব দেওয়ার অনুমতি থাকলো।

পুরো মক্কী জিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বাধা দান করা হয়েছিল এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাহাবীগণের ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাফেরদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ও দূষণীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদনকল্পে ইরশাদ হলো– وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ –[এবং ফেতনা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও কঠিন অপরাধ]। অর্থাৎ, একথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরি ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদেরকে ওমরা ও হজের মতো ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হলো। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত فِتْنَة [ফেতনা] শব্দটির দ্বারা কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বুঝানো হয়েছে। –[জাস্সাস, কুরতুবী]

অবশ্য এ আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরিয়তসিদ্ধ। আয়াতে এই ব্যাপকতাকে পরবর্তী বাক্যে এই বলে সীমিত করা হয়েছে– وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ অর্থাৎ, 'মসজিদুল হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় তথা পুরো হরমে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়।

মাসআলা : হরমে-মক্কার বা মক্কার সম্মানিত এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোনো হিংস্র পশু হত্যা করাও জায়েজ নয়। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তার প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েজ। এই মর্মে সমস্ত ফিকহবিদগণ একমত।

মাসআলা : এ আয়াত দ্বারা আরো বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথম অভিযান আক্রমণ বা আগ্রাসন কেবলমাত্র মসজিদুল হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা 'হরমে মক্কায়'-ই নিষিদ্ধ। অপরাপর এলাকায় যেমন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ অপরিহার্য, তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েজ।

সপ্তম হিজরি সনে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিগত বছরের ওমরার কাজা আদায় করার নিয়তে সাহাবীগণ (রা.) সহ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন হযরত ﷺ-এর সাহাবীগণ জানতেন যে, কাফেরদের চুক্তি ও সন্ধির কোনোই মর্যাদা নেই। এমনও হতে পারে, তারা সন্ধির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মনে এই আশঙ্কার উদ্ভব হয় যে, এতে করে হরম শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। উপরের আয়াতে সাহাবীগণের এ আশঙ্কার জবাব দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– মক্কার হরম শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলমানদের অবশ্যই অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু যদি কাফেররা হরম–শরীফের এলাকায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার মোকাবিলায় মুসলমানদের পক্ষেও যুদ্ধ করা জায়েজ।

সাহাবীগণের মনে দ্বিতীয় সন্দেহ এই ছিল যে, এটা জিলকদ মাস এবং সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো 'আশহুরে-হারাম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এই মাসসমূহে কোথাও কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে আমরা এই মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করব ; তাঁদের এই দ্বিধা দূর করার জন্যই আয়াতটি নাজিল করা হয়েছে। অর্থাৎ, মক্কার হরম শরীফের সম্মানার্থে শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরিয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসে [সম্মানিত মাসেও] যদি কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُدْلُوا : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِدْلَاءُ মূলবর্ণ (د . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা যাও।

يَسْئَلُوْنَكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س . أ . ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তারা প্রশ্ন করে।

مَوَاقِيْتُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مِيْقَاتٌ অর্থ– নির্ধারিত সময়।

ظُهُوْرِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন ظَهْرٌ অর্থ- পিঠসমূহ।

لَاتَعْتَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।

ثَقِفْتُمُوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلثَّقْفُ মূলবর্ণ (ث . ق . ف) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা পাও।

فِتْنَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন فِتَن অর্থ– ফেতনা।

اَشَدُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلشِّدَّةُ মূলবর্ণ (ش . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বেশি কঠিন।

عُدْوَانَ : এটি বাব نَصَرَ-এর মাসদার। অর্থ– জুলুম, অত্যাচার, জবরদস্তি।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ : এখানে يَسْئَلُوْنَ ফে'ল, এতে هُمْ উহ্য সর্বনামটি ফা'য়েল, ك টি مفعول ; عَنِ الْاَهِلَّةِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো। সর্বশেষে ফে'ল, ফা'য়েল ও متعلق মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিলফি'ল। اللهَ শব্দটি ইসমে ইন্না لَا يُحِبُّ ফে'ল, এতে هُوَ উহ্য সর্বনামটি তার ফা'য়েল, اَلْمُعْتَدِيْنَ মাফঊল। ফে'ল, ফা'য়েল ও মাফঊল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে একক হিসেবে খবর। ইন্না তার ইসম ও খবর মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ : এখানে اَلْفِتْنَةُ শব্দটি মুবতাদা, اَشَدُّ শিবহে ফে'ল, مِنَ الْقَتْلِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; শিবহে ফে'ল ও متعلق মিলে خبر হয়েছে, مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

قوله فَاِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبهة بالفعل আর اللهَ টি اِنَّ এর اسم হয়েছে। غَفُوْرٌ ও رَحِيْمٌ প্রত্যেকটি اِنَّ এর خبر অবশেষে ان তার اسم ও خبر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾

অনুবাদ (১৯৪) সম্মানিত মাস সম্মানিত মাসের বিনিময়ে আর এই সমস্ত সম্মান তো পারস্পরিক বিনিময়ের বস্তু; সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করে, তোমরাও তার প্রতি উৎপীড়ন করবে, যেরূপ সে তোমাদের প্রতি উৎপীড়ন করেছে, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা আল্লাহভীরুদের সঙ্গে থাকেন।

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۹۵﴾

(১৯৫) আর তোমরা [জ্ঞানের সঙ্গে মালও] ব্যয় কর আল্লাহর পথে এবং [এই উভয় কাজ ত্যাগ করে] নিজেদেরকে নিজেরা ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করো না, আর কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন কর, নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন উত্তমরূপে কাজ সম্পাদনকারীদেরকে।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۚ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ

অনুবাদ : (১৯৬) আর হজ ও ওমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পূর্ণরূপে পালন কর, অতঃপর যদি [শত্রু-ভীতির বা অসুস্থতাহেতু] তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে কুরবানির জীব যা সহজসাধ্য হয় [যথারীতি জবাই করবে], এবং স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করো না যে পর্যন্ত না পৌঁছে যায় কুরবানির জীব তার জবাইয়ের স্থানে; অবশ্য যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় অথবা তার মাথায় তাকলীফ থাকে, তবে ফিদিয়া দিবে রোজা অথবা সদকা অথবা জবাই দ্বারা,

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯৪) اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ সম্মানিত মাস بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ সম্মানিত মাসের বিনিময়ে وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ আর এই সমস্ত সম্মান তো পারস্পরিক বিনিময়ের বস্তু; فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করে فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ তোমরাও তার প্রতি উৎপীড়ন করবে بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ যেরূপ সে তোমাদের প্রতি উৎপীড়ন করেছে وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক وَاعْلَمُوْٓا এবং বিশ্বাস রাখ যে, اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ আল্লাহ তা'আলা আল্লাহভীরুদের সঙ্গে থাকেন।

(১৯৫) وَاَنْفِقُوْا আর তোমরা [জ্ঞানের সঙ্গে মালও] ব্যয় কর فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ এবং নিজেদেরকে নিজেরা নিক্ষেপ করো না اِلَى التَّهْلُكَةِ ধ্বংসের পথে وَاَحْسِنُوْا আর কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন কর اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন الْمُحْسِنِيْنَ উত্তমরূপে কাজ সম্পাদনকারীদেরকে।

(১৯৬) وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ আর হজ ও ওমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পূর্ণরূপে পালন কর فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ অতঃপর যদি [শত্রু-ভীতির বা অসুস্থতাহেতু] তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ তবে কুরবানির জীব যা সহজসাধ্য হয় وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ এবং স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করো না حَتّٰى যে পর্যন্ত না يَبْلُغَ الْهَدْىُ পৌঁছে যায় কুরবানির জীব مَحِلَّهٗ তার জবাইয়ের স্থানে فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا অবশ্য যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ অথবা তার মাথায় তাকলীফ থাকে فَفِدْيَةٌ তবে ফিদিয়া দিবে مِّنْ صِيَامٍ রোজা اَوْ صَدَقَةٍ অথবা সদকা اَوْ نُسُكٍ অথবা জবাই দ্বারা

فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (١٩٦)

অনুবাদ : তারপর যখন তোমরা নিরাপদে থাক, তখন যে ব্যক্তি ওমরাকে হজের সাথে একত্রিত করে লাভবান হয়, তবে কুরবানির যে জীব সহজলভ্য হয় [জবাই করবে], অনন্তর যার জন্য কুরবানির জীব সহজলভ্য না হয়, তবে [সে] রোজা রাখবে তিন দিন হজের সময় আর সাত দিন [রোজা রাখবে] যখন হজ হতে তোমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় আসবে; এই দশ পূর্ণ হলো, এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যার পরিজনবর্গ মসজিদে হারামের নিকট অবস্থান না করে, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ؗ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ (١٩٧)

(১৯৭) হজের মাসগুলো সুবিদিত, অতএব, যে ব্যক্তি এই মাসগুলোর মধ্যে হজ করা স্থির করে নেয়, অতঃপর হজে না অশ্লীলতা আছে এবং না অসৎ কাজ এবং না ঝগড়া-বিবাদ, আর তোমরা যে নেককাজ করবে আল্লাহ তা অবগত হন, আর পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে নিও, কেননা পাথেয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা [ভিক্ষাবৃত্তি হতে] বেঁচে থাকা, আর হে জ্ঞানীগণ! আমাকে ভয় করতে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ

فَاِذَآ اَمِنْتُمْ তারপর যখন তোমরা নিরাপদে থাক فَمَنْ تَمَتَّعَ তবে যে ব্যক্তি লাভবান হয় بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ ওমরাকে হজের সাথে একত্রিত করে فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ তবে কুরবানির যে জীব সহজলভ্য হয় [জবাই করবে] فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ অনন্তর যার জন্য কুরবানির জীব সহজলভ্য না হয় فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ তবে [সে] রোজা রাখবে তিন দিন فِى الْحَجِّ হজের সময় وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ আর সাত দিন যখন হজ হতে তোমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় আসবে تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ এই দশ পূর্ণ হলো ذٰلِكَ এটা لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ ঐ ব্যক্তির জন্য যার পরিজনবর্গ না করে حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে হারামের নিকট অবস্থান وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক وَاعْلَمُوْٓا এবং জেনে রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

(১৯৭) اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ হজের মাসগুলো সুবিদিত فَمَنْ فَرَضَ অতএব, যে ব্যক্তি স্থির করে নেয় فِيْهِنَّ الْحَجَّ এই মাসগুলোর মধ্যে হজ করা فَلَا رَفَثَ অতঃপর না অশ্লীলতা আছে وَلَا فُسُوْقَ এবং না অসৎ কাজ وَلَا جِدَالَ এবং না ঝগড়া-বিবাদ فِى الْحَجِّ হজে وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ আর তোমরা যে নেককাজ করবে يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ আল্লাহ তা অবগত হন وَتَزَوَّدُوْا আর পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে নিও فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ কেননা পাথেয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা [ভিক্ষাবৃত্তি হতে] التَّقْوٰى বেঁচে থাকা واتقون আর আমাকে ভয় করতে থাক يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ হে জ্ঞানীগণ!।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৯৪) اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হুদাইবিয়ার সন্ধি স্থাপন হওয়ার পরের বৎসর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ওমরাহ-এর কাজা আদায় করতে মক্কায় যান তখন এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, কাফেরগণ মুসলমানদেরকে ওমরাহ আদায় করতে বাধা প্রদান করবে। তখন মুসলমানগণ এতে বিচলিত হয়ে পড়েন যে, কিভাবে নিষিদ্ধ মাসে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহ করবে? তখন উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(১৯৫) وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا إِلَى التَّهْلُكَةِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের পর যখন আরবের সর্বত্র ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয় এবং দিকে দিকে শিরক ও কুফর উৎখাত হয়ে ঈমানের জয় জয়কার ধ্বনি উত্থিত হয় তখন একদা তিনি আত্মতৃপ্তিতে বলেন, "এক্ষণে মহান আল্লাহ ইসলামকে সর্বত্র বিজয়ী করেছেন, ফলে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আমরা শঙ্কাহীন হয়ে পরিবার-পরিজনের কাছে গৃহে ফিরে এসেছি। এমতাবস্থায় আমরা নির্বিঘ্নে গৃহে অবস্থান করতে পারব এবং এতদিনের অনুপস্থিতিতে এলোমেলো সংসার গুছিয়ে নিতে সুযোগ পাব"। এ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

(১৯৬) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। ষষ্ঠ হিজরিতে নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে হজ পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর মক্কার কাফেররা তাদেরকে বাঁধা প্রদান করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[কাশশাফ, বায়যাবী]

(১৯৭) اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمٰتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** একসময়ে একটি ইয়েমেনী কাফেলা হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে এবং নিজেদেরকে আল্লাহর উপর ভরসাকারী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে পথের খরচ ও পাথেয় ছাড়াই চলতে শুরু করে। মক্কায় পৌঁছে তারা যখন প্রয়োজনীয় কার্যাদি ও খাদ্য পানীয়ের অভাব মিটাতে চাইল, আর টাকার অভাবে তা করতে না পেরে ওরা লোকজনের কাছে হাত পাততে শুরু করল, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাজিল করেন। বলা হলো যে, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! তোমরা পাথেয় অর্জন করে প্রয়োজনীয় সম্বল সাথে নিয়ে হজের জন্য বের হবে, যাতে কারো গলগ্রহ হতে না হয়। অন্যথা তোমাদেরকে পরের নিকট হাত পাততে হবে, যা রীতিমতো تَقْوٰى -এর পরিপন্থি কাজ।

জিহাদে অর্থ ব্যয় : وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ [এবং তোমরা আল্লাহর পথে খরচ কর]– এই আয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে প্রয়োজন মতো ব্যয় করা মুসলমানদের প্রতি ফরজ করা হয়েছে। এই আয়াত থেকে ফিকহশাস্ত্রবিদ আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলমানদের উপর ফরজ জাকাত ব্যতীত আরো এমন কিছু দায়-দায়িত্ব ও ব্যয় খাত রয়েছে, যেগুলো ফরজ; কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোনো খাত নয় বা সেগুলোর জন্য কোনো নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই; বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। আর যদি প্রয়োজন না হয়; তবে কিছুই ফরজ নয়। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত।

قوله وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [এবং স্বহস্তে নিজেকের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না] আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো যে, "ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা" বলতে এক্ষেত্রে কি বুঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যাদাতাগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ইমাম জাসসাস ও ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোনো বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাজিল হলো। এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, 'ধ্বংসে'র দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সেজন্যই হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হুযায়ফা (রা.), কাতাদা (রা.) এবং মুজাহিদ ও যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেছেন– পাপের কারণে আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। এজন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম।

ইমাম জাসসাস (র.)-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরিউক্ত সমস্ত নির্দেশই এ আয়াত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ –এই বাক্যে প্রত্যেক কাজই সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কুরআন 'ইহসান' إِحْسَانٌ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছে। ইহসান দু'রকম : ১. ইবাদতে ইহসান, ও ২. দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহসান। ইবাদতের ইহসান সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাদীসে জিবরাঈল' –এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এমনভাবে ইবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ। আর যদি সে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে [মু'আমালাত ও মু'আশারাত] ইহসানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের জন্য যাকিছু পছন্দ কর, অন্যান্য লোকদের জন্যও তাই পছন্দ কর। আর যা তোমরা নিজেদের জন্য না-পছন্দ কর, অন্যের জন্যও তা না-পছন্দ করবে।" –[মাযহারী]

হজ সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুকন, এবং ইসলামের ফারায়েজ বা অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। কুরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকীদ ও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে হিজরি তৃতীয় বছর, যে বছর ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে বছরই সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াতের মাধ্যমে হজ ফরজ করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

এ আয়াতেই হজ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ এবং মর্মার্থ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ না করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আটটি আয়াতের প্রথম আয়াত وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ মুফাসসিরীনের ঐকমত্য অনুযায়ী হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যা ৬ষ্ঠ হিজরি সালে সংঘটিত হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হজ ফরজ হওয়ার বিষয় বাতলানো নয়, তা পূর্বেই বাতলে দেওয়া হয়েছে; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো হজ ও ওমরার কিছু বিশেষ নির্দেশ বর্ণনা করা।

ওমরার আহকাম : সূরা আলে ইমরানের যে আয়াতের মাধ্যমে হজ ফরজ করা হয়েছে তাতে যেহেতু শুধুমাত্র হজের কথাই বলা হয়েছে, ওমরার কোনো আলোচনাই করা হয়নি, আর এই আয়াতে যাতে শুধু ওমরার কথাই আলোচনা করা হয়েছে, এর ফরজ কিংবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনো কথাই বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে যে, কোনো লোক যদি ইহরামের মাধ্যমে হজ অথবা ওমরা আরম্ভ করে, তাহলে তার পক্ষে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন– সাধারণ নফল নামাজ-রোজার ব্যাপারে এই হুকুম যে, তা আরম্ভ করলে সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। কাজেই এই আয়াতের দ্বারা ওমরা ওয়াজিব কিনা তা বুঝায় না; বরং আরম্ভ করলে শেষ করতে হবে, তাই বুঝায়।

ইবনে কাছীর হযরত জাবের (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হুজুর! ওমরা কি ওয়াজিব? তিনি বলেছিলেন, ওয়াজিব নয়, তবে যদি কর, খুবই ভালো। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ ও হাসান। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) প্রমূখ ওমরাকে ওয়াজিব বলেননি; সুন্নত বলে গণ্য করেছেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ অথবা ওমরা শুরু করলে তা আদায় করা ওয়াজিব। তবে প্রশ্ন উঠে, যদি কোনো ব্যক্তি ওমরা শুরু করার পর কোনো অসুবিধায় পড়ে তা আদায় করতে না পারে, তাহলে কি হবে? এর উত্তর পরবর্তী فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ বাক্যে দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতটি হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রাসূল ﷺ এবং সাহাবীগণ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে হরমের সীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তাঁরা ওমরা আদায় করতে পারেননি। তখন আদেশ হলো, ইহরামের ফিদিয়াস্বরূপ একটি করে কুরবানি কর। কুরবানি করে ইহরাম ভেঙ্গে ফেল। কিন্তু সাথে সাথে পরবর্তী আয়াতে وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ -এ বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইহরাম খোলার শরিয়তসম্মত ব্যবস্থা মাথা মুড়ানো ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ নয়, যতক্ষণ না ইহরামকারীর কুরবানি নির্ধারিত স্থানে পৌঁছবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে হরমের এলাকায় পৌঁছে কুরবানির পশু জবাই করা। তা নিজে না পারলে, অন্যের দ্বারা জবাই করাতে হবে। এ আয়াতে অপারগতা অর্থ হচ্ছে– রাস্তায় কোনো শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য কোনো কোনো ইমাম অসুস্থতাকেও অপারগতার আওতাভুক্ত করেছেন। তবে রাসূল ﷺ-এর আমল দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরবানি করেই ইহরাম ছাড়তে হবে। কিন্তু বাতিলকৃত হজ বা ওমরা কাজা করা ওয়াজিব। যেমন হুজুর ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম হুদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী বছর উল্লিখিত ওমরার কাজা আদায় করেছিলেন।

এ আয়াতে মাথা মুণ্ডনকে ইহরাম ভঙ্গ করার নিদর্শনা বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা অথবা কাটা নিষিদ্ধ। এ হিসেবে পরবর্তী নির্দেশে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি হজ্জ ও ওমরা আদায় করতে গিয়ে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন নাও হয়, কিন্তু অন্য কোনো অসুবিধার দরুন মাথা মুণ্ডন করতে বা মাথার চুল কাটাতে বাধ্য হয়, তবে তাকে কি করতে হবে?

ইহরাম অবস্থায় কোনো কারণে মাথা মুণ্ডন করলে কি করতে হবে? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ –আয়াতে বলা হয়েছে, যদি কোনো অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোনো স্থানের চুল কাটতে হয়, অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোনো স্থানের লোম কাটা জায়েজ। কিন্তু এর ফিদিয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে রোজা রাখা বা সদকা দেওয়া বা কুরবানি করা। কুরবানির জন্য হরমের সীমরেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু রোজা রাখা বা সদকা দেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোনো স্থানে আদায় করা চলে। কুরআনের শব্দের মধ্যে রোজার কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোনো পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবী কা'ব ইবনে ওজরার এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেছেন– তিনটি রোজা এবং ছয়জন মিসকিনকে মাথাপিছু অর্ধ সা' গম দিতে হবে। –[বুখারী]

হজ্জ মৌসুমে হজ্জ ও ওমরা একত্রে আদায় করার নিয়ম : ইসলাম পূর্বযুগে আরববাসীদের ধারণা ছিল, হজ্জের মাস আরম্ভ হয়ে গেলে অর্থাৎ, শাওয়াল মাস এসে গেলে হজ্জ ও ওমরা একত্রে আদায় করা অত্যন্ত পাপ।

এ আয়াতে তাদের এ ধারণার নিরসন করে বলা হয়েছে যে, মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য এ সময়ের মধ্যে হজ্জ ও ওমরা একত্রে সমাধা করা নিষেধ। কারণ তাদের পক্ষে হজ্জের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ওমরার জন্য দ্বিতীয়বার মীকাতে গমন করা তেমনি অসুবিধার ব্যাপার নয়। কিন্তু এ সীমারেখার বাইরে থেকে যারা হজ্জ করতে আসে, তাদের জন্য দুটিকেই একত্রে আদায় করা জায়েজ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এত দূর-দূরান্ত থেকে ওমরার জন্য পৃথকভাবে ভ্রমণ করা খুবই কঠিন ও অসুবিধাজনক। সে সমস্ত নির্ধারিত স্থানসমূহকে মীকাত বলা হয়, যা সারা বিশ্বের হজ্জ যাত্রীগণ যিনি যেদিক থেকে আগমন করেন, সেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি স্থান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। যখনই মক্কায় আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে, তখন হজ্জ অথবা ওমরার নিয়তে ইহরাম করা আবশ্যক। ইহরাম ব্যতীত নির্ধারিত এ স্থান অতিক্রম করা গুনাহর কাজ। যেমন, বলা হয়েছে– لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এর অর্থ তাই। অর্থাৎ যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের সীমরেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে না, তাদের জন্য হজ্জ ও ওমরা হজ্জের মাসে একত্রে করা জায়েজ।

অবশ্য যারা হজ্জের মৌসুমে হজ্জ ও ওমরাকে একত্রে আদায় করে, তাদের উপর এ দুটি ইবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে, কুরবানি করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে, তারা বকরি, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয় তা থেকে কোনো একটি পশু কুরবানি করবে। কিন্তু যাদের কুরবানি করার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই তারা দশটি রোজা রাখবে। হজ্জের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি আর হজ্জ সমাপনের পর সাতটি রোজা রাখতে হবে। এ সাতটি রোজা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে। হজ্জের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি রোজা পালন করতে না পারে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীর মতে তাদের জন্য কুরবানি করাই ওয়াজিব। যখন সামর্থ্য হয়, তখন কারো মাধ্যমে হরম শরীফে কুরবানি আদায় করবে

তামাত্তু' ও কেরান : হজ্জের মাসে হজ্জের সাথে ওমরাকে একত্রিকরণের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরার জন্য একত্রে ইহরাম করা। শরিয়তের পরিভাষায় একে 'হজ্জে কেরান' বলা হয়। এর ইহরাম হজ্জের ইহরামের সাথেই ছাড়তে হয়, হজ্জের শেষদিন পর্যন্ত তাকে ইহরাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু ওমরার ইহরাম করবে। মক্কা আগমনের পর ওমরার কাজ-কর্ম শেষ করে ইহরাম খুলবে এবং ৮ই জিলহজ্জ তারিখে মিনা যাওয়ার প্রাক্কালে হরম শরীফের মধ্যেই ইহরাম বেঁধে নিবে। শরিয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় 'হজ্জে তামাত্তু' কিন্তু فَمَنْ تَمَتَّعَ এ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

হজ্জ ও ওমরার আহকামের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাতে গাফলতি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ : শেষ আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যার অর্থ এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত, সতর্ক ও ভীত থাকা বুঝায়। অতঃপর বলা হয়েছে– /

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জেনে শুনে আল্লাহর নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজকাল হজ ও ওমরাকারীগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা প্রথমতঃ হজ ও ওমরার নিয়মাবলি জানতেই চেষ্টা করে না। আর যদিও বা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকেই দায়িত্বজ্ঞানহীন মোয়াল্লেম ও সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে অনেক ওয়াজিবও পরিত্যাগ করে। আর সুন্নত ও মোস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন।

হজসংক্রান্ত ৮টি আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় আয়াত ও তার মাসআলাসমূহ : اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ 'আশহুরুন' শব্দটি শাহরুন শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, মাস। পূববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা হজ অথবা ওমরা করার নিয়তে ইহরাম বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দুটির মধ্যে, ওমরার জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোনো সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, হজের ব্যাপারটি ওমরার মতো নয়। এর জন্য কয়েকটি মাস রয়েছে সেগুলো প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত এ মাসগুলোই হজের মাসরূপে গণ্য হয়ে আসছে। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজের দশ দিন। হযরত আবূ উমামাহ ও ইবনে ওমর (রা.) থেকে তাই বর্ণিত হয়েছে। -[মাযহারী]

হজের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজের ইহরাম বাঁধা জায়েজ নয়। কোনো কোনো ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজের ইহরাম করলে হজ আদায়ই হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে হজ অবশ্য আদায় হবে, কিন্তু মাকরূহ হবে।-[মাযহারী]

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ – এ আয়াতে হজের ইহরামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য ও ওয়াজিব তা হচ্ছে 'রাফাস' 'ফুসূক' ও 'জিদাল'। رَفَثٌ 'রাফাস' একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ত্রী-সহবাস ও তার আনুষাঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত। ইহরাম অবস্থায় এ সবই হারাম। অবশ্য আকার-ইঙ্গিত দূষণীয় নয়।

فُسُوْقٌ 'ফুসূক'-এর শাব্দিক অর্থ বের হওয়া। কুরআনের ভাষায় নির্দেশ লঙ্ঘন বা নাফরমানি করাকে 'ফুসূক' বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই 'ফুসূক' বলে। তাই অনেকে এ স্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) 'ফুসূক' শব্দের অর্থ করেছেন- সে সকল কাজ-কর্ম যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। স্থান অনুসারে এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সাধারণ পাপ ইহরামের অবস্থাতেই শুধু নয়; বরং সব সময়ই নিষিদ্ধ।

যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে না-জায়েজ ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু ইহরামের জন্য নিষেধ ও না-জায়েজ- তা হচ্ছে- ছয়টি-

১. স্ত্রী-সহবাস ও এর আনুষাঙ্গিক যাবতীয় আচরণ, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা। ২. স্থলভাগের জীবজন্তু শিকার করা বা শিকারীকে বলে দেওয়া। ৩. নখ বা চুল কাটা। ৪. সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার। এ চারটি বিষয় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য ইহরাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ।

অবশিষ্ট দু'টি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। ৫. সেলাই করা কাপড় পরিধান করা। ৬. মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। অবশ্য মুখমণ্ডল আবৃত করা স্ত্রীলোকদের জন্যও না-জায়েজ।

আলোচ্য ছ'টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস যদিও 'ফুসূক' শব্দের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি একে 'রাফাস' শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে এজন্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইহরাম অবস্থায় এ কাজ হতে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর কোনো ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। কোনো কোনো অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হজই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য অন্যান্য কাজগুলোর কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করলে হজ ফাসেদ হয়ে যাবে। গাভী বা উট দ্বারা এর কাফফারা দিয়েও পর বছর পুনরায় হজ করতেই হবে। এজন্যই فَلَا رَفَثَ শব্দ ব্যবহার করে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

جِدَالٌ শব্দের অর্থ একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা। এজন্যই বড় রকমের বিবাদকে جِدَالٌ বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক। কোনো কোনো মুফাসসির এ শব্দের ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করেছেন, আবার অনেকে হজ ও ইহরামের সম্পর্কে হেতু এখানে 'জিদাল' এর অর্থ করেছেন যে, জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা অবস্থানের স্থান নিয়ে মতানৈক্য করত; কেউ কেউ আরাফাতে অবস্থান করাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করত, আবার কেউ কেউ মুযদালিফায় অবস্থানকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করত। তারা আরাফাতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করত না। পথিমধ্যে অবস্থিত একটি স্থানকেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নির্ধারিত অবস্থানস্থল বলে মনে করত। এমনিভাবে হজের সময় সম্পর্কেও তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করত। কেউ কেউ জিলহজ মাসে হজ করত, আবার কেউ কেউ জিলকদ মাসে। এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকতো এবং এ জন্য একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করত। তাই কুরআনে কারীম وَلَا جِدَالَ বলে এসব বিবাদের মূলোৎপাটন করেছে। আর আরাফাতে অবস্থানকে ফরজ এবং মুযদালিফায় অবস্থানকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এটাই হক ও সঠিক। উপরন্তু জিলহজ মাসের নির্ধারিত দিনগুলোতেই হজ আদায় করতে হবে, এ ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে ঝগড়া করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ এ স্থলে 'ফুসূক ও জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, 'ফুসূক' ও 'জিদাল' সর্বক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু ইহরামের অবস্থায় এর পাপ গুরুতর। পবিত্র দিনসমূহে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্য আগমন করা হয়েছে এবং 'লাব্বাইক লাব্বাইক' বলা হচ্ছে। ইহরামের পোশাক তাদেরকে সব সময় একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা এখন ইবাদতে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায় ও চরমতম নাফরমানির কাজ।

কুরআনের ভাষালঙ্কার : فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ আয়াতের শব্দগুলো নেতিবাচক। হজের মধ্যে এসব বিষয় নেই, অথচ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সকল বিষয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা; যার জন্য لَا تَرْفُثُوْا وَلَا تَفْسُقُوْا وَلَا تُجَادِلُوْا শব্দ ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু এখানে নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হজের মধ্যে এসব বিষয়ের কোনো অবকাশ নেই। এমনকি এ সবের কল্পনাও হতে পারে না। وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ইহরামকালে নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্ণনা করার পর উল্লিখিত বাক্যে হেদায়েত করা হচ্ছে যে, হজের পবিত্র সময়ে ও পুতঃ স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহর জিকির ও ইবাদত এবং সৎকাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। তুমি যে কাজই কর না কেন, তা আল্লাহ তা'আলা জানেন; আর এতে তোমাদেরকে অতি উত্তম বখশিশও দেওয়া হবে।

قوله وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى : এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যক্তির সংশোধনী পেশ করা হয়েছে যারা হজ ও ওমরা করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। অথচ দাবি করে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করছি। পক্ষান্তরে পথে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে এবং অন্যকেও পেরেশান করে। তাদেরই উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হজের উদ্দেশ্যে সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নেওয়া বাঞ্ছনীয়, এটা তাওয়াক্কুলের অন্তরায় নয়; বরং আল্লাহর উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত আসবাবপত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা করে নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা। হুজুর ﷺ থেকে তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। নিঃস্বতার নাম তাওয়াক্কুল বলা মুর্খতারই নামান্তর।

হজের অর্থ ও তার প্রকারভেদ :

হজের সংজ্ঞা : হজের আভিধানিক অর্থ-দৃঢ়সংকল্প করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় বাইতুল্লাহ শরীফ ও অন্যান্য নির্দিষ্ট স্থানসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী ইহরামের সাথে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জেয়ারত করাকে হজ বলে।

হজ তিন প্রকার– (১) হজ্জে ইফরাদ (২) হজ্জে তামাত্তু' (৩) হজ্জে কিরান।

(১) হজ্জে ইফরাদ : নির্ধারিত স্থান (মীকাত) হতে শুধুমাত্র হজের নিয়তে ইহরাম বেঁধে, মক্কা শরীফে উপস্থিত হয়ে হজের যাবতীয় কার্যাবলি নির্ধারিত নিয়মে, নির্দিষ্ট স্থানে সমাধা করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে। সাধারণত বদলী হজ যারা করেন, তাঁদেরকে ইফরাদ হজের নিয়ত করতে হয়। তবে হজে কিরান বা হজে তামাত্তু' করতে হলে যিনি হজ করাচ্ছেন বা অসিয়তকারীর অনুমতিক্রমে করতে পারেন। ইহ্রাম অর্থ–হারাম করা, নিষিদ্ধ করা। হাজীগণ যখন হজ

বা ওমরা অথবা উভয়ের দৃঢ় নিয়ত করে তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকে তখন তার উপর কতিপয় হালাল ও মোবাহ বস্তু ও ইহরামের কারণে হারাম হয়ে যায়। যেমন নামাজের মধ্যে ও তাকবীরে তাহ্‌রীমা দ্বারা কতিপয় হালাল জিনিস ও হারাম হয়ে যায়। এ জন্য ইহরামকে ইহরাম বলা হয়।

(২) **হজ্জে তামাত্তু'** : তামাত্তু' -এর আভিধানিক অর্থ– উপকৃত হওয়া, লাভবান হওয়া, সুবিধা ভোগ করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় হজের মাসসমূহের মধ্যে (অর্থাৎ শাওয়াল, যুলকাদাহ ও যুলহাজ্জার ১ম দশ দিনের মধ্যে) মীকাত হতে শুধু ওমরার ইহরাম বেঁধে ওমরার কার্যাবলি সমাধা করার পর মক্কা মুকাররামাহ পুনরায় হজের জন্য ইহরাম বেঁধে হজের কার্যাদি সম্পন্ন করাকে হজ্জে তামাত্তু' বলে।

(৩) **হজ্জে ক্বিরান** : হজ ও ওমরা উভয়টির একসঙ্গে ইহরাম বেঁধে প্রথমত ওমরার কার্যাবলি সমাধা করাকে হজ্জে ক্বিরান বলে। এখানে মীকাতের ব্যাখ্যা হতে জানা যায় যে, ক্বিরান হজ ও তামাত্তু'কারী বহিরাগত হবে, মক্কাবাসী হবে না। কেননা মক্কাবাসীদের জন্য ক্বিরান হজ ও তামাত্তু' হজ নেই।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হজ্জে ক্বিরানই সবচেয়ে উত্তম হজ। তারপর তামাত্তু', অতঃপর ইফরাদ।

হজের ফরজসমূহ : হজের ফরজ তিনটি : (১) ইহরাম বাঁধা। (২) ৯ই যিলহিজ্জাহ তারিখের দ্বি-প্রহরের পর হতে পরবর্তী সুবহে সাদেকের মধ্যে আরাফার ময়দানে কিছু সময় অবস্থান করা। (৩) তওয়াফে জিয়ারত করা।

হজের ওয়াজিবসমূহ : হজের ওয়াজিব ৫টি ঃ (১) মুযাদালিফাহ নামক স্থানে অবস্থান করা। (২) রমী করা বা শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। (৩) দমে শোকর বা হজের কুরবানি আদায় করা। (৪) মাথা মুণ্ডন করা বা মাথার চুল কাটা। (৫) সাফা ও মারওয়াহ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সায়ী করা।

ওমরার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ :

ওমরার সংজ্ঞা : ওমরা শব্দের অর্থ–মনস্থ করা, উপাসনা করা, ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কার্যাবলির দ্বারা অনির্দিষ্ট সময়ে মীকাত হতে ইহ্‌রাম বেঁধে যথারীতি তওয়াফ, সা'ঈ ও মাথা মুণ্ডন করাকে ওমরা বলে। সক্ষম ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার ওমরা পালন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

ওমরার প্রকার : ওমরাহ দু'প্রকার ঃ (১) হজের ওমরা এবং (২) নফল ওমরা।

ওমরার ফরজ : ওমরার ফরজ দু'টি ঃ (১) মীকাত হতে ইহরাম বাঁধা ও (২) ওমরা করার নিয়ত করা।

ওমরার ওয়াজিব : ওমরার ওয়াজিব দু'টি ঃ (১) সাফা ও মারওয়াহ পাহাড়দ্বয়ে সাত বার সা'ঈ করা। (২) মাথা মুণ্ডন করা বা চুল কাটা।

হজ ও ওমরার মধ্যে পার্থক্য :

(১) হজ أَمْرٌ مُطْلَقٌ -এর দ্বারা ফরজে আইন, পক্ষান্তরে ওমরা হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। (২) হজের ফরজ তিনটি আর ওমরার ফরজ দু'টি। (৩) হজের জন্য সময় নির্দিষ্ট, আর ওমরার জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই। (৪) হজের মধ্যে মিনা, মুযদালিফাহ ও আরাফায় অবস্থান করা রয়েছে কিন্তু ওমরাতে তা নেই। (৫) হজের মধ্যে তওয়াফে বিদা রয়েছে কিন্তু ওমরাতে তা নেই।

فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ -এর বিশ্লেষণ : হজের ইহরাম বাঁধার পর হালাল হওয়ার পূর্বে হজ কার্য পালন অবস্থায় তিনটি রোজা রাখবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইহরাম ও হালাল হওয়ার মধ্যবর্তীতে এ রোজা রাখবে। তবে উত্তম হচ্ছে জিলহজ মাসের ৭ম, ৮ম, ও ৯ম তারিখে রোজা রাখা। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে কুরবানির দিন ও আইয়ামে তাশরীকে এ রোজা রাখা জায়েজ নেই। আর বাকি সাতটি রোজা বাড়ি ফিরার পর আদায় করবে।

فِدْيَةٌ -এর পরিমাণ : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোনো খানের চুল কাটতে হয়, অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তাহলে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোনো স্থানের চুল কাটা জায়েজ। কিন্তু এর ফিদিয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে রোজা রাখা অথবা সদকা দেওয়া অথবা কুরবানি করা। কুরবানির জন্য হেরেমের সীমা-রেখা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু রোজা রাখা এবং সদকা

দেওয়ার জন্য কোনো বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই ; তা যে কোনো স্থানে আদায় করা যেতে পারে। কুরআনের শব্দের মধ্যে রোজার কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোনো পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি : কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবী হযরত কা'ব ইবনে ওজরার এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেছেন, তিনটি রোজা এবং ছয়জন মিসকিনকে মাথা পিছু অর্ধ সা অর্থাৎ পৌনে দু'সের গম দিতে হবে। আর একটি ছাগল বা দুম্বা কুরবানি করতে হবে। তবে উত্তম হলো গরু অথবা উট কুরবানি করা।

اِحْصَارٌ -এর অর্থ : اِحْصَارٌ শব্দের অর্থ আটক করা, অবরোধ করা, বাধা প্রাপ্ত হওয়া। আটককৃত ব্যক্তি কুরবানির জানোয়ার জবাই করে মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হতে পারে। শত্রুর কারণে বা রোগের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হলেও একটি কুরবানি করতে হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَعْتَدِى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে অতিক্রম করে।

لَاتُلْقُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা নিক্ষেপ করো না।

اَتِمُّوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِتْمَامُ মূলবর্ণ (ت . م . م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা পূর্ণ কর।

اُحْصِرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْصَارُ মূলবর্ণ (ح . ص . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা যদি বাধাগ্রস্ত হও।

اَمِنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَمْنُ মূলবর্ণ (ا . م . ن) জিনস مهموز ف অর্থ– তোমরা নিরাপদ হবে।

لَمْ يَجِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَجْدُ মূলবর্ণ (و . ج . د) জিনস مثال واوى অর্থ– সে পায়নি।

لَمْ يَكُنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ ـ اَلْكَيْنُوْنَةُ মূলবর্ণ (ك . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে হয়নি।

اِتَّقُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ : এখানে اِعْلَمُوْا ফে'ল যমীরে اسم ফা'য়েল, اَنَّ হরফে মোশাব্বাহ বিল ফে'ল, اَللّٰهُ শব্দটি اَنَّ-এর اسم আর مَعَ الْمُتَّقِيْنَ তার خبر : অতঃপর اَنَّ তার اسم ও خبر নিয়ে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়ে مفعول অবশেষে فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ হয়েছে।

قوله وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ : এখানে لَا تُلْقُوا হলো فعل এবং انتم হলো فاعل আর بِأَيْدِيكُمْ প্রথম متعلق আর إِلَى التَّهْلُكَةِ হলো দ্বিতীয় متعلق ; এবার فعل - فاعل ও উভয় متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قوله وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ : এখানে أَتِمُّوا ফে'ল এতে انتم যমীর ফা'য়েল, الْحَجَّ হলো معطوف عليه আর و হলো حرف عطف এবং العمرة হলো معطوف ;এবার معطوف عليه ও معطوف মিলে مفعول به হয়েছে। لِلَّهِ জার ও মাজরুর মিলে متعلق ; অবশেষে فعل - فاعل - مفعول ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة خبرية হয়েছে।

قوله وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ : এখানে واو টি হরফে আতফ, لَا تَحْلِقُوا ফে'ল, এতে انتم যমীর فاعل; رُءُوسَكُمْ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول به হয়েছে। حَتَّى হরফে জার এবার يَبْلُغَ ফে'ল, الْهَدْيُ ফা'য়েল, محله মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول হয়েছে। এখন فعل - فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে একক হিসেবে مجرور হলো جار ও مجرور মিলে متعلق অবশেষে فعل - فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة إِنْشَائِيَّة হয়েছে।

قوله الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ : এখানে الْحَجُّ মুবতাদা, أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَة إِسْمِيَّة হলো।

وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ : এখানে اتَّقُوا পদটি فعل এতে انتم উহ্য সর্বনামটি তার فاعل হয়েছে। ن টি وقاية এখানে উহ্য ى متكلم مفعول ; সুতরাং فعل তার فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে جواب نداء অতঃপর يَا টি حرف نداء আর أُولِي পদটি مضاف এবং الْأَلْبَابِ টি مضاف اليه, এবার مضاف ও مضاف اليه মিলে منادى সুতরাং حرف نداء তার منادى ও جواب نداء মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة إِنْشَائِيَّة হয়েছে।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾

অনুবাদ (১৯৮) এতেও তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যে, জীবিকা অন্বেষণ কর, যা তোমাদের প্রভু-প্রদত্ত, অতঃপর তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তনকালে মাশআরে হারামের নিকট [মুযদালিফায়] আল্লাহর জিকির কর এবং [তদ্রূপ] জিকির কর যেরূপ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আর প্রকৃতপক্ষে তার পূর্বে তোমরা নিরেট অজ্ঞ ছিলে।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾

(১৯৯) অতঃপর তোমরা অবশ্যই ঐ স্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন কর, যেখান হতে অন্যান্য লোক যেয়ে প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন, অনুগ্রহ করবেন।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾

(২০০) অনন্তর যখন তোমরা হজের যাবতীয় কাজ পূর্ণ কর তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদেরকে স্মরণ করে থাক; বরং আল্লাহর স্মরণ তদপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত; সুতরাং কেউ কেউ এরূপ আছে যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে [যা কিছু দেওয়ার] ইহলোকেই প্রদান করুন, আর এরূপ লোক পরলোকে কোনো অংশ পাবে না।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

(২০১) আর কতক লোক এমন আছে– যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহলোকেও কল্যাণ দান করুন এবং পরলোকেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করুন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯৮) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ এতেও তোমাদের কোনো গুনাহ নেই যে اَنْ تَبْتَغُوْا অন্বেষণ কর فَضْلًا জীবিকা مِّنْ رَّبِّكُمْ যা তোমাদের প্রভু-প্রদত্ত فَاِذَآ اَفَضْتُمْ অতঃপর প্রত্যাবর্তনকালে مِّنْ عَرَفٰتٍ আরাফাত হতে فَاذْكُرُوا اللّٰهَ আল্লাহর জিকির কর عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ মাশআরে হারামের নিকট [মুযদালিফায়] وَاذْكُرُوْهُ এবং [তদ্রূপ] জিকির কর كَمَا هَدٰىكُمْ যেরূপ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ যদিও আর প্রকৃতপক্ষে তার পূর্বে তোমরা ছিলে لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ নিরেট অজ্ঞ।

(১৯৯) ثُمَّ اَفِيْضُوْا অতঃপর তোমরা অবশ্যই ঐ স্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন কর مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ যেখান হতে অন্যান্য লোক যেয়ে প্রত্যাবর্তন করে وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ ক্ষমা করবেন رَّحِيْمٌ অনুগ্রহ করবেন।

(২০০) فَاِذَا قَضَيْتُمْ অনন্তর যখন তোমরা পূর্ণ কর مَّنَاسِكَكُمْ হজের যাবতীয় কাজ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ তখন আল্লাহকে স্মরণ কর كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ যেভাবে তোমরা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদেরকে স্মরণ করে থাক اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا বরং আল্লাহর স্মরণ তদপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত فَمِنَ النَّاسِ সুতরাং কেউ কেউ এরূপ আছে مَنْ يَّقُوْلُ যারা বলে رَبَّنَآ হে আমাদের প্রভু! اٰتِنَا আমাদেরকে প্রদান করুন فِى الدُّنْيَا ইহলোকেই وَمَا لَهٗ আর এরূপ লোক পাবে না فِى الْاٰخِرَةِ পরলোকে مِنْ خَلَاقٍ কোনো অংশ

(২০১) وَمِنْهُمْ আর কতক লোক এমন আছে– مَّنْ يَّقُوْلُ যারা বলে رَبَّنَآ হে আমাদের প্রভু! اٰتِنَا আমাদেরকে দান করুন فِى الدُّنْيَا ইহলোকেও حَسَنَةً কল্যাণ وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً এবং পরলোকেও কল্যাণ দান করুন وَّقِنَا এবং আমাদেরকে রক্ষা করুন عَذَابَ النَّارِ দোজখের আজাব হতে।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

অনুবাদ : (২০২) এরূপ লোকেরা বড় অংশ পাবে তাদের এই আমলের দরুন এবং আল্লাহ তা'আলা সত্বরই হিসাব নিবেন।

(২০৩) আর আল্লাহর জিকির কর কয়েক দিন পর্যন্ত, অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করবে দুই দিনের মধ্যে, তার উপর কোনো পাপ নেই, আর যে দেরি করবে তার উপরও কোনো পাপ নেই– যে [আল্লাহর] ভয় রাখে, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, তোমাদের সকলকে আল্লাহরই সমীপে সমবেত হতে হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২০২) أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ এরূপ লোকেরা বড় অংশ পাবে مِمَّا كَسَبُوا তাদের এই আমলের দরুন وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ এবং আল্লাহ তা'আলা সত্বরই হিসাব নিবেন।

(২০৩) وَاذْكُرُوا اللَّهَ আর আল্লাহর জিকির কর فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ কয়েক দিন পর্যন্ত فَمَنْ تَعَجَّلَ অতঃপর যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করবে فِي يَوْمَيْنِ দুই দিনের মধ্যে فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ তার উপর কোনো পাপ নেই وَمَنْ تَأَخَّرَ আর যে দেরি করবে فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ তার উপরও কোনো পাপ নেই– لِمَنِ اتَّقَىٰ যে [আল্লাহর] ভয় রাখে وَاتَّقُوا اللَّهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক وَاعْلَمُوا এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ তোমাদের সকলকে আল্লাহরই সমীপে সমবেত হতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৯৮) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল–১ : ইমাম বুখারী ও রূহুল মা'আনী তাফসীর প্রণেতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কায় প্রাক ইসলামি যুগে ওকায, মুজান্না ও যুলমাজায নামে তিনটি আন্তদেশীয় বাজার ছিল। সেসব বাজারে হজের মৌসুমে জাহেলিয়াতের যুগে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করাকে অন্যায় কাজ মনে করা হতো। তাই সাহাবীরা এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেন। তখন তাদের এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে এসে আরজ করল, উট ভাড়া দেওয়া আগ থেকেই আমার ব্যবসা। হজের মৌসুমে কেউ কেউ আমার উট ভাড়া নেয়। আমিও তাদের সাথে হজে যাই এবং হজ করে আসি। তাতে কি আমার হজ জায়েজ হবে না? হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, রাসূল ﷺ-এর সময়ে এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে এমন প্রশ্ন করেছিল; কিন্তু তিনি তার প্রশ্নের কোনো উত্তর প্রদান করেননি। এ সময় রাসূলের উপর لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ এ আয়াতটি নাজিল হয়। পরে তিনি ঐ লোকটিকে ডেকে বললেন, হ্যাঁ তোমার হজ শুদ্ধ হবে।

(১৯৯) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الخ আয়াতের শানে নুযূল হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। জাহেলিয়াতের যুগেও হজ করার প্রচলন ছিল। হজের সময় সকল আরববাসী আরাফার ময়দানে অবস্থান করত। কুরাইশগণ নিজেদের বড় মনে করে হজ ক্রিয়ায় আরাফাহ পর্যন্ত যেত না; বরং মুযদালিফায় গিয়ে অবস্থান করত এবং সেখান থেকে ফিরে আসতো। যখন ইসলামে হজ ফরজ হয় তখন মুসলমানদের মধ্যে জাহিলিয়ার সে নিয়ম নিষিদ্ধ ঘোষণায় উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

(২০০) فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর লোবাবুন নুকূল গ্রন্থে এবং সাইয়েদ আলূসী তাঁর তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জাহেলী যুগে আরবরা হজের অনুষ্ঠানাদি সমাপন করে মসজিদে মিনা এবং পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে জামরার নিকট একত্রিত হলে, নিজেদের পিতৃপুরুষদের বীরত্ব গাথা, কৃতিত্ব, মহত্ত্ব ও দানশীলতার কথা বর্ণনা করত এবং গর্ব ও অহঙ্কার প্রকাশ করত। তাদের এ ধরনের জাহেলী কাজকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন এবং পিতৃ পুরুষের স্মরণের স্থলে তাঁকে স্মরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। অথবা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আরবের কোনো কোনো জাতির এমন নীতি ছিল যে, যখন তারা মিনায় একত্রিত হতো তখন দোয়া করত, হে প্রভু! এ বছর আমাদের খুব স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রশস্ততা দান কর, অভাব-অনটন দিও না, বৃষ্টি বর্ষণ করুন, কিন্তু তারা আখেরাত সম্পর্কে কিছুই প্রার্থনা করত না। এ ব্যাপারে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২০১) وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত জাহিলিয়া যুগে আরববাসীরা হজের কাজ সমাধান করে মিনায় একত্রিত হয়ে দোয়া করত, হে আল্লাহ! এ বছর আমাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশস্ততা দান করুন, আমাদের অভাব-অনটন দিবেন না বৃষ্টি বর্ষণ করুন ইত্যাদি বলে তারা কেবলমাত্র পার্থিব সুখ শান্তি কামনা করত। আখেরাতের জন্য কিছুই কামনা করত না। কেননা তাদের অনেকেই আখেরাতকে অস্বীকার করত এবং আখেরাতের সংগঠন সম্পর্কে অবগত ছিল না। তারা দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের আকিদা বিশ্বাসের মূলে কঠোরাঘাত করে বললেন, যদি তোমরা আখেরাত না চাও, কেবল দুনিয়া চাও, তাহলে আখেরাতে তোমাদের জন্য কিছুই থাকবে না।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ الخ -এর ব্যাখ্যা : এ আয়াতে এ কথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, হজের সফর কালে কোনো ব্যক্তি যদি গমনাগমন পথে পরিশ্রম করে কিছু উপার্জন করে নেয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। আরবের কাফেররা হজকে যে রকম ব্যবসার বাজার ও তামাসার বস্তুতে পরিণত করেছিল কুরআন এ দু'টি বাক্যের দ্বারা তা সংশোধন করে দিয়েছে। এর একটি হলো– তোমরা যা কিছু উপার্জন করবে তা আল্লাহর অনুগ্রহ বিবেচনা করে সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকবে। তাতে শুধু মুনাফা সংগ্রহই যেন উদ্দেশ্য না হয়। فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ বাক্যটিতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ উপার্জনে তোমাদের কোনো পাপ হবে না।

আরাফার পরিচয় : শব্দগত দিক দিয়ে عَرَفَاتٌ শব্দটি বহুবচন। এটা একটি প্রসিদ্ধ প্রান্তরের নাম। এটা মক্কার হেরেমের বাইরে দক্ষিণ পূর্ব দিকে বারো মাইল দূরে অবস্থিত। হাজীদের জন্য ৯ই জিলহজ সে প্রান্তরে সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে পরবর্তী রাত্রের সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় অবস্থান করা ফরজ। কেউ তা ছেড়ে দিলে হজই বাতিল হয়ে যাবে। কুরআনে আরাফাহকে বহুবচন عَرَفَاتٌ বলার পিছনে অনেক কারণ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো– এ মাঠে নিজ প্রতিপালকের সুগভীর পরিচয় ও অনেক ইবাদত দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভে সমর্থ হওয়া যায়। তা ছাড়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল এলাকার মুসলমানরাও এখানে পারস্পরিক পরিচয় লাভের সুযোগ পায়। তাই একে عَرَفَاتٌ বলা হয়।

قوله مَشْعَرِ الْحَرَامِ -এর মর্মার্থ : মিনা ও আরাফার ময়দানের মধ্যবর্তী মুযদালিফা নামক উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়কে "মাশয়ারে হারাম" বলা হয়। আরাফাতে অবস্থানের পর মিনাতে ফিরার পথে ৯ই জিলহজ তারিখ দিবাগত রাতে এ স্থানে অবস্থান করতে হয়। মাশ্‌য়ারে হারাম নামক পাহাড়ের উপর একটি মসজিদ রয়েছে। এখানে মাগরিব ও এশার নামাজ এক সঙ্গে পর পর আদায় করতে হয়। মিনায় শয়তানকে নিক্ষেপের জন্য এ স্থান হতেই সত্তরটি বা ততোধিক পাথর সংগ্রহ করে নিতে হয়।

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ -এর মর্মার্থ : হে হাজীগণ! আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য তিনি যে নিয়ম বলে দিয়েছেন সে নিয়মেই তাঁকে স্মরণ কর। এতে স্বীয় মতামত ও কিয়াসকে প্রাধান্য দিও না। কেননা কিয়াস অনুযায়ী তো মাগরিবের নামাজ মাগরিবের সময় এবং এশার নামাজ এশার সময় পড়া উচিত কিন্তু সে দিনের জন্য আল্লাহর ইচ্ছা হলো– মাগরিবের নামাজ দেরি করে এশার নামাজের সময় পড়া হবে।

এ ছাড়া আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর ইবাদত করার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন নয় যে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই তা গ্রহণ করবে; বরং আল্লাহর জিকির ও ইবাদতের নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে। নিয়ম মোতাবেক আদায় করলেই তা ইবাদত হবে। নিয়মের খেলাফ করা জায়েজ নয়, এতে কম বেশি করা অথবা, পূর্বাপর করা, যদিও এতে ইবাদত বেশি হয় তবুও তা আল্লাহর পছন্দনীয় নয়।

আরাফার দিবসের ফজিলত : আরাফার দিবসের ফজিলত ইসলামে অত্যধিক, এর ছওয়াবও অনেক। এ দিনে আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন। নেককার লোকদের জন্য এ দিনে নেক কাজের কয়েকগুণ ছওয়াব নির্ধারিত হয়। নবী করীম ﷺ বলেন, আরাফার দিনের রোজা পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়। –[কুরতুবী]

قوله ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ **-এর মর্মার্থ :** (অন্যান্য লোক যে স্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে, তোমরাও সে স্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন কর।) কা'বা ঘরের হেফাজতে নিয়োজিত আরবের কুরাইশগণ তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদা রক্ষা করে হজের ব্যাপারে কতগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে নিয়েছিল। সকল মানুষ আরাফায় যেত এবং সেখানে অবস্থান করার পর প্রত্যাবর্তন করত, কিন্তু তারা রাস্তায় মুযদালিফা নামক স্থানে অবস্থান করত, আরাফাহ ময়দানে যেত না। বাস্তব পক্ষে এসব ছল-ছুতার উদ্দেশ্য ছিল অহঙ্কার ও অহমিকা প্রকাশ এবং সাধারণ মানুষ থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। আল্লাহ তা'আলা তাদের অহমিকার সংশোধন করে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তোমরাও সেখানে (আরাফায়) যাও যেখানে অন্যান্য লোকজন যাচ্ছে, আর অন্যান্য লোকদের সাথেই তোমরা ফিরে এসো।

قوله فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ **-এর বিশ্লেষণ :** مَنَاسِكَ দ্বারা হজের অনুষ্ঠানাদিকে বুঝানো হয়েছে। মূলত مَنَاسِكَ অর্থ জবাই করা এবং কুরবানি করা। مَنَاسِكَ দ্বারা হজের নিয়ম-কানুনকে বুঝায়, যেমন রাসূল ﷺ বলেন, خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ অর্থাৎ তোমরা আমার কাছ থেকে হজের নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ কর।

قوله وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً الخ **বাক্যে** مَنْ **দ্বারা কারা উদ্দেশ্য :** এটা দ্বারা দু'ধরনের লোক উদ্দেশ্য। যথা–
(১) যারা আল্লাহর কাছে কেবল ইহকাল কামনা করে তারা সংখ্যায় খুব কম।
(২) যারা আল্লাহর কাছে ইহকাল-পরকাল উভয় কালের কল্যাণ কামনা করে তারা সংখ্যায় প্রচুর।
আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারীরা মোট চার প্রকার। যথা– (১) যারা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ছাড়া আর কিছুই চায় না, ওরা হলো কাফের। (২) যারা দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই প্রার্থনা করে, ওরা মু'মিন। (৩) যারা মুখে মু'মিনদের মতো বলে, অন্তরে তার বিপরীত বিশ্বাস করে, ওরা মুনাফিক। (৪) যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চায় না, ওরাই সর্বাধিক সফলকাম।

قوله حَسَنَةً **দ্বারা উদ্দেশ্য :** حَسَنَةً শব্দটি প্রকাশ্য বা গোপনীয় যাবতীয় কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক। দুনিয়ার কল্যাণ যেমন–শারীরিক সুস্থতা, পরিবার-পরিজনের সুস্থতা, হালাল রুজির প্রাচুর্য, দুনিয়াবি যাবতীয় প্রয়োজনের পূর্ণতা, নেক আমল ও সচ্চরিত্র, উপকারী বিদ্যা, মান-সম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি, আকিদার সংশোধন, সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েত, ইবাদতে একাগ্রতা প্রভৃতিসহ অসংখ্য স্থায়ী নিয়ামত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ লাভ প্রভৃতি এরই অন্তর্ভুক্ত।

قوله لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا **-এর ব্যাখ্যা :** لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا এ উক্তিটির অর্থ দু'ভাবে গ্রহণ করা যায়। (১) পূর্বোল্লিখিত দু'টি সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে তাদের কৃত আমল থেকে স্ব-স্ব প্রাপ্য হিস্যা দেওয়া হবে; প্রথম সম্প্রদায়কে শুধু পার্থিব জগতে, আর দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে উভয় জগতে। (২) ঐ দু'টি সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের কারণে যথাযোগ্য প্রতিদান দেওয়া হবে।

قوله وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ **-এর বিশ্লেষণ :** অর্থাৎ আল্লাহ অতি দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী। কেননা তার ব্যাপক জ্ঞান ও কুদরতের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি জগতের সমস্ত হিসাব গ্রহণের জন্য এমন কোনো উপকরণ ও জনবলের প্রয়োজন হবে না, যা মানুষের জন্য হয়ে থাকে। কাজেই তিনি সারা জগতবাসীর ও সৃষ্টিজগতের সকল হিসেব অতি অল্প সময়ে এবং মুহূর্তে গ্রহণ করবেন।

قوله أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ **-এর অর্থ :** আল্লাহ তা'আলা হজের আহকাম বর্ণনা প্রসঙ্গে একবার বলেছেন– أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ আবার বলেছেন– أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ সুতরাং أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ দ্বারা জিলহজের প্রথম দশ দিন, আর أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ দ্বারা আইয়্যামে তাশরীকের তিনদিন উদ্দেশ্য।

◆ **উক্ত দিনগুলোতে জিকির দ্বারা উদ্দেশ্য :** জিকির দ্বারা আইয়্যামে তাশরীকে শয়তানকে পাথরকণা নিক্ষেপ করার সময় এবং প্রত্যেক নামাজের পরে যে তাকবীর দেওয়া হয় এখানে উক্ত তাকবীর উদ্দেশ্য, তবে নামাজের পরের তাকবীরের শুরু ও শেষ নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। যেমন–(১) হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর (রা.) এবং ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে কুরবানির দিনের জোহর থেকে শুরু করে আইয়্যামে তাশরীকের দিনের সকাল পর্যন্ত তাকবীর চলবে। এতে ১৫ ওয়াক্ত নামাজের পর তাকবীর সাব্যস্ত হয়। (২) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় মত হলো, দশ তারিখ ফজর থেকে শুরু হবে এবং আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত চলবে। এতে আঠার ওয়াক্ত নামাজের পর তাকবীর দিতে হয়। (৩) ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও অন্যান্যদের মতে নয় তারিখ ফজর থেকে শুরু করে কুরবানির দিনের আসর পর্যন্ত, এতে আট ওয়াক্ত নামাজের পর তাকবীর দিতে হয়। (৪) হযরত আলী, ইবনে মাসউদ (রা.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, আহমদসহ অন্যান্যদের মতে নয় তারিখ ফজর থেকে শুরু করে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিনের আসর পর্যন্ত তেইশ ওয়াক্ত নামাজের পর তাকবীর দিতে হয়। চতুর্থ মতটির উপরই সাধারণ মানুষের আমল দেখা যায়। –[কাবীর]

◆ **মিনায় তড়িঘড়ি ও দেরির অর্থ :** যারা ঈদের পর মাত্র দু'দিন মিনায় থাকতে চায়, অথবা তিনদিন অবস্থান করে, তাদের কারোই পাপ হবে না। একে অপরকে পাপী বলা ঠিক নয়। হাজীগণ উভয় ব্যাপারেই স্বাধীন। তারা যে কোনো একটিতে আমল করতে পারেন। তবে তৃতীয় দিন পর্যন্ত আমল করাই উত্তম। দুই দিন থেকে চলে আসাকে تَعْجِيْل এবং তিন দিন থাকাকে تَاخِيْر বলা হয়।

قوله وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ **-এর পটভূমি :** অর্থাৎ গুণতি কয়েক দিন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর। এ কয়েক দিন বলতে তাশরীকের দিনসমূহ উদ্দেশ্য, যাতে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তাকবীর বলা ওয়াজিব। জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা মিনায় অবস্থান এবং জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা কতদিন আবশ্যক তা নিয়ে মতানৈক্য করত। কেউ কেউ মনে করত ১৩ই জিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা এবং জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা জরুরি। আর যারা ১২ তারিখে তাড়াহুড়া করে কাজ সেরে সেখান থেকে ফিরে আসত তাদেরকে পাপী বলে ধারণা করত এবং এই কাজকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করত। আবার একদল ছিল যারা ১২ তারিখে প্রত্যাবর্তন করাকে জরুরি মনে করত এবং ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করাকে পাপ মনে করতো। এ আয়াত দু'টিতে তাদের মতানৈক্যের মীমাংসা প্রদান করা হয়েছে।

قوله فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ الخ **-এর সংশ্লিষ্ট বিধান :** অর্থাৎ যারা ঈদের পর মাত্র দু'দিন মিনাতে অবস্থান করেই جَمْرَةُ ثَالِثَةُ -এর কাঁকর নিক্ষেপণের কাজ সম্পন্ন করত প্রত্যাবর্তন করে তাদেরও কোনো পাপ নেই। আর যারা তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করার পর প্রত্যাবর্তন করে তাদেরও কোনো পাপ নেই। পক্ষান্তরে এ দু'টি দল, যারা একে অপরকে পাপী বলে থাকে তারা উভয়েই ভুল পথে রয়েছে। প্রকৃত কথা হলো, হাজীরা উভয় ব্যাপারেই স্বাধীন। যে কোনো একটি আমল করতে পারে। তবে তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করাই উত্তম। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করে, তার জন্য তৃতীয় দিনের পাথর নিক্ষেপ ওয়াজিব নয়; কিন্তু মিনাতে থাকা কালে সূর্যাস্ত হয়ে গেলে তৃতীয় দিনের পাথর নিক্ষেপ ওয়াজিব। তবে তৃতীয় দিনের পাথর নিক্ষেপ পরদিন সকালেও করা যায়।

قوله وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ **-এর মর্মার্থ :** ইতঃপূর্বে হজের যত আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে, এ বাক্যটি ঐ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর অর্থ হলো, হজের সময় তোমরা যখন হজের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাক, তখনো প্রতিটি কাজে নিয়ত বিশুদ্ধ রেখে আল্লাহকে ভয় কর এবং হজ করেছ বলে পরে অহংকার করো না। তখনো আল্লাহকে ভয় করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। হাদীস শরীফে এসেছে, যখন মানুষ হজ করে ফিরে আসে তখন সে তার পূর্বকৃত পাপ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়, যেন সে সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে। তাই এ উক্তিতে হাজীদেরকে পরবর্তী জীবনের জন্য পরহেজগারী অবলম্বনের প্রতি বিশেষ তাগিদ প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তোমরা পূর্বের পাপ থেকে মুক্ত হয়েছ এখন পরের জন্য সর্তক হও। তাহলেই দুনিয়ার ও আখেরাতের মঙ্গল তোমাদের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীদেরকে দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণি হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী। এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে মুমিন; পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা

পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের কল্যাণ ও সমভাবে কামনা করে, পরবর্তী আয়াতসমূহে নেফাক বা কপটতা ও 'ইখলাস' বা আন্তরিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত মানব শ্রেণি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, কেউ মুনাফিক বা কপট আর কেউ মুখলিস বা আন্তরিকতাপূর্ণ।

আয়াতের শেষাংশে, যাতে নিষ্ঠাবান মুমিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, তা সে সমস্ত নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরামের শানে নাজিল হয়েছে, যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় অনুক্ষণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মুসতাদরাকে হাকেম, ইবনে জারীর, মুসনাদে ইবনে আবী হাতেম প্রভৃতি গ্রন্থে সহীহ সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত সোহাইব রুমী (র.)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কুরাইশ তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তাঁর তূনীরে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, হে কুরাইশগণ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তূনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারে কাছেও পৌছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পরবে। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদেরকে মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কুরাইশদল রাজি হয়ে গেল এবং হযরত সোহাইব রুমী নিরাপদে রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল ﷺ দু'বার ইরশাদ করলেন– رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَا يَحْيٰى - رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَا يَحْيٰى 'হে আবূ ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।' কোনো কোনো তাফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত একই ধরনের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। –[মাযহারী]

পূর্ববর্তী আয়াতে নিষ্ঠবানদের প্রশংসা করা হয়েছিল। অনেক সময় এই নিষ্ঠার মধ্যেও ভুলবশতঃ বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। যদিও উদ্দেশ্য থাকে অধিক আনুগত্য, কিন্তু সে আনুগত্য শরিয়ত ও সুন্নতের সীমারেখা অতিক্রম করে বিদআতে পরিণত হয়। যেমন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ প্রথমে ইহুদি আলেম ছিলেন এবং সে ধর্মমত অনুযায়ী শনিবার ছিল সপ্তাহের পবিত্র দিন, আর উটের গোশত ছিল হারাম। ইসলাম গ্রহণের পর সে সাহাবীর ধারণা হয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মে শনিবারকে পবিত্র দিন হিসেবে সম্মান করা ছিল ওয়াজিব। কিন্তু মুহাম্মদী শরিয়ত তার অসম্মান করা ওয়াজিব নয়। তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তে উটের গোশত ছিল হারাম, কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ –এর শরিয়তে তা ভক্ষণ করা ফরজ নয়। সুতরাং আমরা যদি যথারীতি শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে থাকি এবং উটের গোশতকে হালাল জেনেও কার্যত তা বর্জন করি, তাহলে তো দু'কূলই রক্ষা পায়– হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের প্রতিও আস্থা রইল, অথচ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর শরিয়তেরও কোনো বিরোধিতা হলো না। পক্ষান্তরে এতে আল্লাহর অধিকতর আনুগত্য এবং ধর্মের ব্যাপারে বেশি বিনয় প্রকাশ পাবে বলে মনে হয়। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই এ ধারণার সংশোধন উচ্চারণ করেছেন। তারই সার-সংক্ষেপ হচ্ছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। আর ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা তখনই সাধিত হবে, যখন এমন কোনো বিষয়কে ধর্ম হিসেবে পালন করা না হবে, যা ইসলামে পালনযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এমন সব বিষয়কে ধর্ম গণ্য করা হলো একটি শয়তানি প্রতারণাজনিত পদস্খলন। আর পাপ হিসেবে তার শাস্তি কঠোরতর হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

শব্দ বিশ্লেষণ

اُذْكُرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذِّكْرُ মূলবর্ণ (ذ . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্মরণ কর।

هَدَاكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন।

كُنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা ছিলে।

الضَّالِّيْنَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّلَالُ মূলবর্ণ (ض . ل . ل) জিনস مُضَاعَفْ ثلاثى অর্থ- যারা পথভ্রষ্ট, যারা বিভ্রান্ত, যারা গোমরাহ।

اَفِيْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفَاضَةُ মূলবর্ণ (ف . ى . ض) জিনস اجوف يائى অর্থ- তোমরা প্রত্যাবর্তন কর।

قَضَيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَضَاءُ মূলবর্ণ (ق . ض . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা সমাপ্ত করবে।

مَنَاسِكَكُمْ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে مَنْسَكٌ অর্থ- হজের কার্যাবলি।

يَقُوْلُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ- (ق . و . ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- সে বলেছে।

اٰتِنَا : এখানে نَ হলো যমীর, আর اٰتِ সীগাহ واحدمذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনসে মোরাক্কাব: مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ- আমাদেরকে দাও।

تَعَجَّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّعَجُّلُ মূলবর্ণ (ع . ج . ل) জিনস صحيح অর্থ- সে তাড়াতাড়ি করল।

تَأَخَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّاَخُّرُ মূলবর্ণ (أ . خ . ر) জিনস مهموز فاء অর্থ- সে বিলম্ব করল।

اتَّقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفرورق অর্থ- সে তাকওয়া অর্জন করেছে।

تُحْشَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَشْرُ মূলবর্ণ (ح . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ- তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ : وَ টি হরফে আতফ, اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা, سَرِيْعُ মুযাফ আর اَلْحِسَابُ হলো মুযাফ ইলাইহি অতঃপর مضاف ও مضاف اليه মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হলো।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤)

অনুবাদ (২০৪) আর কোনো কোনো মানুষ এমনও আছে যে, আপনার নিকট তার আলাপ- আলোচনা যা শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যেই হয়, চিত্তাকর্ষক মনে হয় এবং সে আল্লাহকে হাজির নাজির বর্ণনা করে নিজের অন্তরস্থ বিষয়ের প্রতি, অথচ সে বিরোধিতায় কঠোর।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥)

(২০৫) এবং যখন প্রস্থান করে, তখন এই চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায় যে, দেশে অশান্তির সৃষ্টি করবে এবং শস্য ও জীবজন্তু বিনষ্ট করে দিবে, আর আল্লাহ তা'আলা ফ্যাসাদ পছন্দ করেন না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦)

(২০৬) আর যখন কেউ তাকে বলে, আল্লাহকে তো ভয় কর, তখন অহঙ্কার তাকে ঐ পাপের দিকে অগ্রসর করে দেয়, সুতরাং এই প্রকৃতির লোকের যথোপযুক্ত শাস্তি- জাহান্নাম, আর এটা কী নিকৃষ্টতম বিশ্রামাগার।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧)

(২০৭) আর কতক লোক এমনও আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয়, এবং আল্লাহ [এরূপ] বান্দাদের [অবস্থার] প্রতি খুবই করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(২০৪) وَمِنَ النَّاسِ আর কোনো কোনো মানুষ এমনও আছে مَنْ يُّعْجِبُكَ যে আপনার নিকট চিত্তাকর্ষক মনে হয় قَوْلُهٗ তার আলাপ- আলোচনা فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا যা শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যেই হয় وَيُشْهِدُ اللّٰهَ এবং সে আল্লাহকে হাজির নাজির বর্ণনা করে عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ নিজের অন্তরস্থ বিষয়ের প্রতি وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ অথচ সে বিরোধিতায় কঠোর।

(২০৫) وَاِذَا تَوَلّٰى এবং যখন প্রস্থান করে سَعٰى فِي الْاَرْضِ তখন এই চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায় যে لِيُفْسِدَ فِيْهَا দেশে অশান্তি সৃষ্টি করবে وَيُهْلِكَ এবং বিনষ্ট করে দিবে الْحَرْثَ শস্য وَالنَّسْلَ ও জীবজন্তু وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ আর আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না الْفَسَادَ ফ্যাসাদ।

(২০৬) وَاِذَا قِيْلَ لَهُ আর যখন কেউ তাকে বলে اتَّقِ اللّٰهَ আল্লাহকে তো ভয় কর اَخَذَتْهُ তখন তাকে অগ্রসর করে দেয় الْعِزَّةُ অহঙ্কার بِالْاِثْمِ ঐ পাপের দিকে فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ সুতরাং এই প্রকৃতির লোকের যথোপযুক্ত শাস্তি-জাহান্নাম وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ আর এটা কী নিকৃষ্টতম বিশ্রামাগার।

(২০৭) وَمِنَ النَّاسِ আর কতক লোক এমনও আছে مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ যারা স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয় ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য وَاللّٰهُ এবং আল্লাহ رَءُوْفٌ খুবই করুণাময় بِالْعِبَادِ বান্দাদের [অবস্থার] প্রতি।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٢٠٨)

অনুবাদ : (২০৮) হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে দাখিল হও, এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, বাস্তাবিকই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٠٩)

(২০৯) অনন্তর তোমাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণাদি আসার পরেও যদি তোমরা [সীরাতের মুস্তাকীম হতে] পদস্খলিত হতে থাক, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা [প্রজ্ঞাময়] ।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (٢١٠)

(২১০) তারা শুধু তারই প্রতীক্ষা করে যে, আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ যেন মেঘপুঞ্জের চাঁদোয়া তলে [শাস্তি দেওয়ার মানসে] তাদের নিকট আসেন এবং যাবতীয় বিষয়েরই মীমাংসা হয়ে যায়, আর এই সমস্ত [পুরস্কার ও শাস্তির] বিষয়াদি আল্লাহরই সমীপে উপস্থিত করা হবে ।

سَلْ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢١١)

(২১১) আপনি বনী ইসরাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাদেরকে কত উজ্জ্বল প্রমাণাদি দান করেছিলাম, পরন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতকে পরিবর্তন করে তার নিকট পৌছার পর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন ।

শাব্দিক অনুবাদ

(২০৮) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! اُدْخُلُوْا তোমরা দাখিল হও فِى السِّلْمِ ইসলামে كَآفَّةً পূর্ণরূপে। وَلَا تَتَّبِعُوْا এবং অনুসরণ করে চলো না خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ শয়তানের পদাঙ্ক اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ বাস্তাবিকই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।

(২০৯) فَاِنْ زَلَلْتُمْ অনন্তর যদি তোমরা [সীরাতের মুস্তাকীম হতে] পদস্খলিত হতে থাক مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ তোমাদের নিকট আসার পরেও الْبَيِّنٰتُ উজ্জ্বল প্রমাণাদি। فَاعْلَمُوْۤا তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী حَكِيْمٌ হিকমতওয়ালা [প্রজ্ঞাময়] ।

(২১০) هَلْ يَنْظُرُوْنَ তারা শুধু তারই প্রতীক্ষা করে যে اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ যেন তাদের নিকট আসেন আল্লাহ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ মেঘপুঞ্জের চাঁদোয়া তলে وَالْمَلٰٓئِكَةُ এবং ফেরেশতাগণ وَقُضِىَ الْاَمْرُ এবং যাবতীয় বিষয়েরই মীমাংসা হয়ে যায় وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ আর এই সমস্ত [পুরস্কার ও শাস্তির] বিষয়াদি আল্লাহরই সমীপে উপস্থিত করা হবে ।

(২১১) سَلْ بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ আপনি বনী ইসরাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করুন كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ আমি তাদেরকে দান করেছিলাম, مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ কত উজ্জ্বল প্রমাণাদি وَمَنْ يُّبَدِّلْ পরন্তু যে ব্যক্তি পরিবর্তন করে نِعْمَةَ اللّٰهِ আল্লাহর নিয়ামতকে مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ তার নিকট পৌছার পর فَاِنَّ اللّٰهَ তবে নিশ্চয় আল্লাহ شَدِيْدُ الْعِقَابِ কঠোর শাস্তি প্রদান করেন ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২০৪) قوله وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আখনাস বিন শারীক এর ব্যাপারে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। সে একজন মুনাফিক ও মিষ্টভাষী ছিল। সে রাসূলের দরবারে এসে রাসূলের ভালোবাসার দাবি করত। আর এই ব্যাপারে সে আল্লাহকে সাক্ষী স্থাপন করত। এবং মিষ্ট কথার মাধ্যমে রাসূলকে আকৃষ্ট করে ফেলত। কিন্তু যখন সে মুসলমানদের শস্য ক্ষেত ও গবাদি পশুর পাশ দিয়ে যেত তখন তা জ্বালিয়ে ফেলত। তখন আল্লাহ তা'আলা তার এরূপ আচরণের কারণে হুজুর ﷺ-কে সতর্ক করার জন্য উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী]

শানে নুযূল – ২ : লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী (র.) বর্ণনা করেন যে, একদা কতিপয় বেদুঈন রাসূল ﷺ-এর দরবারে আগমন করত একান্ত মার্জিত ছলনামূলক আরজ করল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদেরকে কুরআন ও অন্যান্য ইসলামি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েকজন আলেম সাহাবী প্রেরণ করুন। রাসূল ﷺ তাদের কথা মতো একদল সুশিক্ষিত সাহাবী প্রেরণ করেন। সাহাবীররা যখন بَطْنُ الرَّجِيْعِ নামক স্থানে পৌছল, তখন বেদুঈন গোত্রের লোকেরা তাদের ঘেরাও করে হত্যা করে। তাদের উল্লিখিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ আয়াত নাজিল হয়।

(২০৭) قوله وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াত হযরত সুহাইব রুমী (রা.) এর ব্যাপারে নাজিল হয়। হযরত সুহাইব রুমী (রা.) যখন মদিনার পানে রওয়ানা হন তখন মক্কার কাফেররা তার গতিরোধ করে আর তখন তিনি তুনির থেকে তীর বের করলেন। আর বললেন, তোমরা জান আমি একজন দক্ষ তীরন্দাজ। আমার তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমার হাতে একটা তীর থাকা পর্যন্ত তোমরা কেউ আমার সাথে ঘেষতে পারবে না। যখন তীর শেষ হয়ে যাবে তখন তলোয়ার দিয়ে লড়াই করব। যখন তলোয়ার ভেঙ্গে যাবে তখন তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর। তবে তোমাদের আমি একটি উত্তম প্রস্তাব দিচ্ছি আমি মক্কায় সহায় সম্পত্তি সব রেখে এসেছি তোমরা সেগুলো নিয়ে যাও। এবং বিনিময়ে আমার পথ ছেড়ে দাও। তখন কাফেররা তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে তার পথ ছেড়ে দিল। তিনি মদিনায় পৌছে পূর্ণ ঘটনা বললে হুজুর ﷺ বললেন,- رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَا يَحْيٰى তখনই এই আয়াত নাজিল হয়।

(২০৮) قوله يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَاۤفَّةً الخ আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে নাজিল হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, ইহুদি ধর্মে শনিবার দিনটিকে সম্মান করা ওয়াজিব ছিল এবং উটের গোশত খাওয়া হারাম ছিল। তাই তাদের ধারণা হলো ইহুদি ধর্মে শনিবার দিনকে সম্মান করা ওয়াজিব। ইসলাম ধর্মে তাকে অসম্মান করা ওয়াজিব নয়; তদ্রূপ ইহুদি ধর্মে উটের গোশত খাওয়া হারাম কিন্তু ইসলাম ধর্মে উটের গোশত খাওয়া বাধ্য করা হয়নি। অর্থাৎ, হালাল। অতএব আমরা যদি শনিবার কে সম্মান করি এবং উটের গোশতা হালাল জানা সত্ত্বেও যদি এটা বর্জন করি তাহলে হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মের প্রতি আস্থা রইল এবং ইসলাম ধর্মের বিরোধিতাও হলো না। ফলে আমাদের উভয় কুলই রক্ষা পাব। তাছাড়া এর দ্বারা ধর্মের প্রতি আস্থা, আল্লাহর প্রতি বিনয়ী অতি মাত্রা প্রকাশ পাবে। তাই তারা রাসূলের দরবারে একথাটি প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন।

قوله وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ **-এর মর্মার্থ :** শত্রুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধুরন্ধর, কূটিল ষড়যন্ত্রকারীকে اَلَدُّ الْخِصَامِ বলা হয়। যে শত্রু তার শত্রুতায় বুদ্ধি, অর্থ, হাতিয়ার ইত্যাদি সর্বপ্রকার মাধ্যম ব্যবহার করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার, চুক্তি ভঙ্গ, কূটিল অপকৌশলের কোনো দিক ব্যবহারের বাকি রাখে না, তাকেই اَلَدُّ الْخِصَامِ বলে অভিহিত করা হয়। এরকম শত্রুরা নিজেদের কার্য সিদ্ধির যে কোনো রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

حَرْثٌ **শব্দের অর্থ :** ফতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন, حَرْثٌ শব্দের অর্থ বিদীর্ণ করা, ছিদ্র করা। এ কারণেই লাঙ্গলকে حَرْثٌ বলা হয়। যেহেতু তা দ্বারা জমি বিদীর্ণ করা হয়। حَرْثٌ শব্দটি এখানে এবং সূরা আলে ইমরানে ফসলাদি বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ফসলের বীজ মাটি বিদীর্ণ করে বুনতে হয় এবং তা মাটি বিদীর্ণ করে উদগত হয়, তাই উহাকে حَرْثٌ বলে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা রূপক অর্থে মেয়েদেরকে حَرْثٌ বলেছেন। কেননা তারা সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র স্বরূপ।

قَوْلُهُ النَّسْلَ -এর অর্থ : কতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন, نَسْل -এর শাব্দিক অর্থ- বিচ্ছিন্ন হওয়া, পড়ে যাওয়া, ঝরে পড়া। আর সন্তানদের نَسْل বলা হয় এজন্য যে, যেহেতু ওরা মায়ের পেট থেকে ঝরে পড়ে। আল মুনজিদ গ্রন্থকার বলেন, نَسْل শব্দটি একবচন, বহুবচন اَنْسَال আসে। অর্থ হলো–সন্তান, বংশধর।

قوله ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً الخ : سِلْم শব্দটি যের ও যবর সহযোগে [সিলম ও সালম] দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটির অর্থ হচ্ছে 'শান্তি', অপরটি 'ইসলাম'। এখানে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। –[ইবনে কাসীর] كَافَّةً শব্দটি 'পরিপূর্ণভাবে' এবং 'সাধারণভাবে' এই দু'ই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞাপক। এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে, একটি হচ্ছে اُدْخُلُوا [তোমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও] শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে। অথবা ইসলাম অর্থে سِلْم শব্দটির অবস্থা জ্ঞাপন করছে। প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ দাঁড়াবে এই যে, তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিষ্ক সবকিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছ অথচ তোমাদের মন-মস্তিষ্ক তাতে সন্তুষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিষ্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু হস্ত, পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে, তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। তাছাড়া কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক অথবা রাজনীতির সাথে হোক, অথবা এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে, – ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

এতদুভয় দিকের মূল প্রতিপাদ্যই মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের বিধানসমূহ তা মানবজীবনের যে কোনো বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দিবে, সে পর্যন্ত মুসলমান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

এ আয়াতের যে শানে নুযূল উপরে বলা হয়েছে। মূলত তার মূল বক্তব্য এই যে, শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে তোমাদেরকে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দিবে।

সতর্কতা : যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্য এ আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দীনদারদের মধ্যেই এ ত্রুটি বেশিরভাগ দেখা যায়। এরা দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষত সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয়, এরা যেন এসব রীতি নীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে শিখতেও যেমন এদের কোনো আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোনো আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ! অন্ততঃপক্ষে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (র.) রচিত 'আদাবে মো'আশারাত' পুস্তিকাটি পড়ে নেওয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত।

আল্লাহ ও ফেরেশতা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন ঘটনা কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। এমনিভাবে আল্লাহর আগমন দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী এবং বুযুর্গানে দীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে নেওয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে তা জানার প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সমস্ত গুণাবলি ও অবস্থা জানা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلَدُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার اَللَّدَدُ মূলবর্ণ (ل . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى একবচন, বহুবচন اَلِدَّاءُ অর্থ– ভীষণ ঝগড়াটে, তীব্র ঝগড়াকারী।

اَلْخِصَام : বাব مُفَاعَلَةٌ এর মাসদার : অর্থ– ঝগড়া করা।

اَخَذَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনসে مهموز ف. অর্থ– সে ধরেছে।

أَمْهِدْ : শব্দটি একবচন, বহুবচন أَمْهِدَةٌ ও مُهُدٌ অর্থ– বিছানা, ঠিকানা।

اٰمَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাবে إِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ا ـ م ـ ن) জিনসে مهموز فاء অর্থ– তারা ঈমান এনেছে।

كَافَّةً : শব্দটি একবচন, বহুবচন كَافَّاتٌ অর্থ– প্রতিহত করা, দূর করা।

زَلَلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزَّلَلُ ـ اَلزُّلُوْلُ ـ اَلزَّلُّ মূলবর্ণ (ز ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমাদের পদস্খলন ঘটে।

قُضِيَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَضَىُ মূলবর্ণ– (ق ـ ض ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– মীমাংসা হবে।

تُرْجَعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– এটা প্রত্যাবর্তিত হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ : এখানে واو বর্ণটি حرف عطف আর اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা رَؤُوْفٌ শিবহে ফে'ল আর بِالْعِبَادِ-এর باء হরফে জার, اَلْعِبَادُ মাজরূর মিলে متعلق; অতঃপর শিবহে ফে'ল তার فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে خبر; এখন مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

قوله ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً : এখানে اُدْخُلُوْا ফে'ল, এতে اَنْتُمْ উহ্য সর্বনামটি যুলহাল, كَافَّةً হাল, যুলহাল ও হালা মিলে فاعل আর فِى السِّلْمِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق সর্বশেষে فعل ও فاعل এবং متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ : এখানে لَا تَتَّبِعُوْا ফে'ল, এতে اَنْتُمْ উহ্য সর্বনামটি ফা'য়েল خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول به এখন فعل ও فاعل এবং مفعول মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ : এখানে اِنَّ টি হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ةُ টি اِنَّ-এর اسم , তারপর لَكُمْ জার ও মাজরূর মিলে متعلق অতঃপর عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ মাওসূফ ও সিফাত মিলে اِنَّ এর خبر সর্বশেষে اِنَّ তার اسم ও خبر এবং متعلق মিলে جملة اسمية হলো।

قوله وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ : এখানে واو টি حرف عطف, এবং اِلَى اللّٰهِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق مقدم আর تُرْجَعُ ফে'লে মাজহুল اَلْاُمُوْرُ নায়েবে ফা'য়েল, অবশেষে ফে'লে মাজহুল, তার নায়েবে ফা'য়েল ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله سَلْ بَنِىْ اِسْرَاۤءِيْلَ : এখানে سَلْ ফে'ল, এতে اَنْتَ উহ্য সর্বনাম ফা'য়েল, আর بَنِىْ মুযাফ اِسْرَائِيْلَ মুযাফ ইলাইহি। অতএব, মোযাফ ও মোযাফ ইলাইহি মিলে مفعول به হলো। অতঃপর فاعل . فعل ও مفعول به মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ : এখানে فَاءٌ টি فاء جزائية আর اِنَّ হরফটি حرف مشبهة بالفعل আর اَللّٰهَ শব্দটি اِنَّ-এর اسم এবং شَدِيْدُ الْعِقَابِ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে اِنَّ-এর خبر অবশেষে اِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢١٢)

অনুবাদ (২১২) পার্থিব জীবন কাফেরদের নিকট সুসজ্জিত মনে হয় এবং [এ কারণেই] তারা এই সমস্ত মুমিনদের সাথে বিদ্রূপ করে। অথচ [মুসলমানগণ] যারা [কুফর ও শিরক হতে] বেঁচে থাকে, ঐ সমস্ত কাফের হতে উচ্চস্তরে থাকবে কিয়ামতের দিন, আর রিজিক তো আল্লাহ যাকে চান বে-হিসাবে দিয়ে থাকেন।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۛ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٢١٣)

(২১৩) সকল মানুষ [এক কালে] একই পথের ছিল। অনন্তর আল্লাহ নবীগণকে পাঠালেন, যাঁরা সুসংবাদ প্রদান করতেন ও ভীতি প্রদর্শন করতেন, আর তাঁদের সাথে কিতাবও যথাযথভাবে নাজিল করলেন, এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ মানুষের মধ্যে তাদের মতভেদযুক্ত বিষয়সমূহের মীমাংসা করে দিবেন, এবং এই কিতাবে মতভেদ আর কেউ করেনি, কেবল তারাই, যারা এই কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল, তাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণসহ আসার পর তাদের পরস্পর বিদ্বেষের দরুন, অতঃপর আল্লাহ [সর্বদা] মুমিনদেরকে ঐ সত্য যা নিয়ে [মতবিরোধকারীরা] মতবিরোধ করত, স্বীয় করুণায় বলে দেন, আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২১২) زُيِّنَ সুসজ্জিত মনে হয় لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا কাফেরদের নিকট الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا পার্থিব জীবন وَيَسْخَرُوْنَ এবং তারা বিদ্রূপ করে مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই সমস্ত মুমিনদের সাথে وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا অথচ যারা বেঁচে থাকে فَوْقَهُمْ ঐ সমস্ত কাফের হতে উচ্চস্তরে থাকবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন وَاللّٰهُ يَرْزُقُ আর রিজিক তো আল্লাহ দিয়ে থাকেন مَنْ يَّشَآءُ যাকে চান بِغَيْرِ حِسَابٍ বে-হিসাবে।

(২১৩) كَانَ النَّاسُ সকল মানুষ ছিল اُمَّةً وَّاحِدَةً একই পথের فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ অনন্তর আল্লাহ নবীগণকে পাঠালেন مُبَشِّرِيْنَ যাঁরা সুসংবাদ প্রদান করতেন وَمُنْذِرِيْنَ ও ভীতি প্রদর্শন করতেন وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ আর তাঁদের সাথে কিতাবও নাজিল করলেন بِالْحَقِّ যথাযথভাবে لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ তাদের মতভেদযুক্ত বিষয়সমূহের وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ এবং এই কিতাবে মতভেদ আর কেউ করেনি اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ কেবল তারাই, যারা এই কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ তাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণসহ আসার পর بَغْيًا بَيْنَهُمْ তাদের পরস্পর বিদ্বেষের দরুন فَهَدَى اللّٰهُ অতঃপর আল্লাহ বলে দেন الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মুমিনদেরকে لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ যা নিয়ে মতবিরোধ করত مِنَ الْحَقِّ ঐ সত্য بِاِذْنِهٖ স্বীয় করুণায় وَاللّٰهُ يَهْدِيْ আর আল্লাহ তা'আলা প্রদর্শন করেন তাকে مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা করেন اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সঠিক পথ।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ‎(٢١٤)

অনুবাদ : (২১৪) অপর একটি কথা শ্রবণ কর, তোমরা কি মনে কর যে, [বিনা শ্রমে] বেহেশতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো তাদের ন্যায় তোমাদের সম্মুখে কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে, তাদের উপর [বিরোধীদের কারণে] এমন এমন অভাব ও বিপদ-আপদ এসেছিল এবং তারা এমন প্রকম্পিত হয়েছিল যে, স্বয়ং রাসূল ও তাঁর মুমিন সাথীগণও বলে উঠেছিলেন, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? স্মরণ রেখ! নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য আসন্ন।

يَسْــَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ‎(٢١٥)

(২১৫) লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কোন জিনিস [এবং কোথায়] ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন যে, যা কিছু তোমরা ব্যয় করতে চাও তা পিতা মাতার ও আত্মীয়-স্বজনের ও পিতৃহীন শিশুদের ও অভাবগ্রস্তদের ও মুসাফিরদের প্রাপ্য। আর যে কোনো নেক কাজ করবে, আল্লাহ তা'আলা তৎসম্বন্ধে খুবই অবহিত।

শাব্দিক অনুবাদ

(২১৪) اَمْ حَسِبْتُمْ তোমরা কি মনে কর اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ যে বেহেশতে প্রবেশ করবে وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ অথচ এখনো তাদের ন্যায় তোমাদের সম্মুখে কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেনি الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ তাদের উপর [বিরোধীদের কারণে] এমন এমন অভাব ও বিপদ-আপদ এসেছিল وَزُلْزِلُوْا এবং তারা এমন প্রকম্পিত হয়েছিল যে حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ স্বয়ং রাসূল বলে উঠেছিলেন وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ও তাঁর মুমিন সাথীগণও مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? اَلَآ স্মরণ রেখ! اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য আসন্ন।

(২১৫) يَسْــَٔلُوْنَكَ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে مَاذَا يُنْفِقُوْنَ তারা কোন জিনিস [এবং কোথায়] ব্যয় করবে قُلْ আপনি বলে দিন যে مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ যা কিছু তোমরা ব্যয় করতে চাও فَلِلْوَالِدَيْنِ তা প্রাপ্য পিতা মাতার وَالْاَقْرَبِيْنَ ও আত্মীয়-স্বজনের وَالْيَتٰمٰى ও পিতৃহীন শিশুদের وَالْمَسٰكِيْنِ ও অভাবগ্রস্তদের وَابْنِ السَّبِيْلِ ও মুসাফিরদের وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ আর যে কোনো নেক কাজ করবে فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ আল্লাহ তা'আলা তৎসম্বন্ধে খুবই অবহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২১২) قوله زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম সুয়ূতী তাঁর لُبَابُ النُّقُوْلِ فِىْ اَسْبَابِ النُّزُوْلِ গ্রন্থে বলেন, আরবের মুশরিকরা অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র সাহাবীদের দেখে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। যেমন– হযরত আবূ উবায়দা, আমের, সালেম, খাব্বাব, আম্মার, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও অন্যান্যদেরকে তারা বলতো, মুহাম্মদ কি শুধু গরিবরা তাঁকে অনুসরণ করবে তাতেই খুশি? যদি মুহাম্মদ -এর ধর্ম সত্য হতো তাহলে ধনী লোকেরাও তাঁর অনুসারী হতো। এসব গরিব লোকের অনুসরণে তাঁর কি কাজ? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এসব উক্তির জবাবে এ আয়াতটি নাজিল করেন।

(২১৪) قوله اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কোনো কোনো মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, খন্দকের মুজাহিদদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন। কেউ কেউ বলেন, ওহুদের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই আয়াত নাজিল হয়।

(২১৫) قوله يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আমর বিন জামূহ (রা.) অনেক সম্পদশালী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহঙ্কার করা এবং দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কিয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দারিদ্রের জন্য উপহাস করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোষে সে দোষী নয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে একটি উঁচু অগ্নিকুণ্ডের উপর দাঁড় করাবেন; যতক্ষণ না সে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে রাখা হবে। –[যিকরুল-হাদীস, কুরতুবী]

এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোনো এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবাই একই ধরনের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করত। তা ছিল প্রকৃতির ধর্ম। অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তা'আলা সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেন, তাঁদের প্রতি আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবীগণের চেষ্টা, পরিশ্রম ও তাবলীগের ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং তাঁদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়। আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে নবীগণকে মিথ্যা বলে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী এবং মুমিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফের বলে পরিচিত। এ আয়াতের প্রথম বাক্যে ইরশাদ হয়েছে– كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল কুরআনে' বলেছেন, আরবি অভিধান অনুযায়ী এমন মানবগোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়, যাদের মধ্যে কোনো বিশেষ কারণে সংযোগ, ঐক্য ও একতা বিদ্যমান থাকবে। সে ঐক্য মতাদর্শ ও বিশ্বাস জনিতই হোক অথবা একই যুগ একই এলাকা বা দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনই হোক অথবা অন্য কোনো অঞ্চলের বংশ, বর্ণ ও ভাষার সমতার কারণেই হোক।

'কোনো এক কালে সকল মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ ছিল' এতে দু'টি কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ একতা বলতে কোন ধরনের একতাকে বুঝানো হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ এই একতা কখন ছিল? প্রথম বিষয়ের মীমাংসা এ আয়াতের শেষ বাক্যটির দ্বারা হয়ে যায়। এতে একতার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে হক ও সত্য মতবাদ নির্ধারণের ব্যাপারে নবী ও রাসূল প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এ মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য নবী ও রাসূলগণের প্রেরণ এবং আসমানি কিতাব অবতরণ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, সে মতবিরোধ বংশ, ভাষা বর্ণ বা অঞ্চল অথবা যুগের মতানৈক্য ছিল না; বরং মতাবদর্শ, আকাইদ ও ধ্যান–ধারণার পার্থক্য ছিল। এতেই বুঝা যায় যে, এ আয়াতে একত্ব বলতে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা এবং আকীদার একত্বকেই বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং এ আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এমন এক সময় ছিল, যখন প্রতিটি মানুষ একই মত ও আদর্শ এবং একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশ্ন উঠে, সে মত ও বিশ্বাসটি কি ছিল? এতে দু'টি সম্ভাবনা বিদ্যমান। ১. হয় তখনকার সব মানুষ তাওহীদ ও ঈমানের প্রতি বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ ছিল নতুবা ২. সবাই মিথ্যা ও কুফরিতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ তাফসীরকারের সমর্থিত মত হচ্ছে যে, সে আকিদাটি ছিল সঠিক ও যথার্থতা ভিত্তিক। অর্থাৎ তাওহীদ ও ঈমানের ঐকমত্য।

এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, 'এক' বলতে আকিদা ও তরিকার একত্ব এবং সত্য-ধর্ম বলে আল্লাহর একত্ববাদ ও ঈমানের ব্যাপারে ঐকমত্যের কথাই বলা হয়েছে।

এখন দেখতে হবে, এ সত্য দীন ও ঈমানের উপর সমস্ত মানুষের ঐকমত্য কোন যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা কোন যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল? তাফসীরকার সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব এবং ইবনে যায়েদ (রা.) বলেছেন যে, এ ঘটনাটি 'আলমে-আযল' বা আত্মার জগতের ব্যাপারে। অর্থাৎ, সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ [আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?] তখন একবাক্যে সকল মানুষ একই আকীদাতে বিশ্বাসী ছিল, যাকে ঈমান ও ইসলাম বলা হয়। –[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, এই একত্বের বিশ্বাস তখনকার, যখন হযরত আদম (আ.) স্বস্ত্রীক দুনিয়াতে আগমন করলেন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি জন্মাতে আরম্ভ করল আর মানবগোষ্ঠী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করল। তাঁরা সবাই হযরত আদম (আ.)-এর ধর্ম, তাঁর শিক্ষা ও শরিয়তের অনুগত ছিল। একমাত্র কাবীল ছাড়া সবাই তাওহীদের সমর্থক ছিলেন।

'মুসনাদে বাযযার' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতির সাথে সাথে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, একত্বের ধারণা হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ হয়ে হযরত ইদরীস (আ.) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সে সময় সবাই মুসলমান এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এতদুভয় নবীর মধ্যবর্তী সময় হলো দশ 'করন'। বাহ্যতঃ এক 'করন' দ্বারা এক শতাব্দী বুঝা যায়। সুতরাং মোট সময় ছিল এক হাজার বছর।

কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, এই একক বিশ্বাসের যুগ ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর তুফান পর্যন্ত। হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিলেন, তারা ব্যতীত সমগ্র বিশ্ববাসী এতে ডুবে মরেছিল। তুফান বন্ধ হওয়ার পর যারা জীবিত ছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান, সত্য ধর্ম ও একত্ববাদে বিশ্বাসী।

বাস্তবপক্ষে এ তিনটি মতামতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তিনটি যুগই এমন ছিল, যেগুলোতে সমস্ত মানুষ একই মতবাদ ও একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সত্য ধর্মের উপর কায়েম ছিল। পরবর্তী আয়াতে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বাক্যটিতে সমস্ত মানব জাতিকে একই মত ও ধর্মের অনুসারী বলে উল্লেখ করার পর মতবিরোধের কোনো কারণ বর্ণনা না করেই বলা হয়েছে– 'আমি নবী-রাসূলগণ ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে মতবিরোধের মীমাংসা করা যায়।'

এ দুটি বাক্য আপাতত দৃষ্টিতে গরমিল মনে হয়। কারণ নবীগণ এবং কিতাবসমূহ প্রেরণের কারণ ছিল মানুষের মতানৈক্য। পক্ষান্তরে সে সময় কোনো মত পার্থক্য ছিল বলেই উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য এর অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। যারা কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন, তাদের জন্য এর মর্ম উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। কুরআন কখনো অতীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্প, কাহিনী কিংবা ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে উল্লিখিত যাবতীয় কাহিনীরই অবতারণা করেনি; বরং মধ্য থেকে সেসব অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে, যা এই কালামের প্রেক্ষাপটের দ্বারা বুঝা যায়। ফলে তা'ই বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে তা বিশ্বাসী স্বচক্ষে দেখেছে। তাই এর পুনরালোচনা ছিল নিষ্প্রয়োজন। তবে এতটুকু বলা হয়েছে যে, এসব মতানৈক্যের মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কি ব্যবস্থা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে– فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্বীয় আরাম ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দিতেন, আর তা থেকে যারা বিমুখ হয়েছিল, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখাতেন। আর তাদের নিকট ওহী ও আসমানি গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন যা বিভিন্ন মতাদর্শের নিরসন করে সত্য ও সঠিক মতাদর্শ জানিয়ে দেয়। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে, নবী-রাসূল এবং আসমানি গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পরেও বিশ্ববাসী দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিছু লোক এ হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, যাদের কাছে নবীগণ ও দলিলসমূহ এসেছে, তাদেরই একদল তা অগ্রাহ্য করেছে। অর্থাৎ, ইহুদি ও নাসারাগণ। আরো বিস্ময়কর বিষয়, আসমানি কিতাবে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের সম্ভাবনা ছিল না যে, তা বুঝা যায় না বা বুঝতে ভুল হয়; বরং প্রকৃতপক্ষে জেনে-বুঝেও শুধুমাত্র গোড়ামী ও জিদবশতঃ তারা এসবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

দ্বিতীয় দল হচ্ছে তাদের, যারা আল্লাহর দেওয়া হেদায়েতকে গ্রহণ করেছে এবং নবী রাসূল ও আসমানি কিতাবসমূহের মীমাংসা সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েছে। كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً এর সামর্ম হচ্ছে এই যে, প্রথমে বিশ্বের সমস্ত মানুষ সত্য ও সঠিক ধর্মের মধ্যে ছিল। অতঃপর মতের পার্থক্য ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার দরুন মতানৈক্য আরম্ভ হয়। দীর্ঘদিন পর আমল ও বিশ্বাসের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হতে থাকে, এমনকি সত্য-মিথ্যার মধ্যেও সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। সবাইকে সঠিক ধর্মের উপর পুনর্বহাল করার জন্য প্রকাশ্য প্রমাণের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তা মেনে নিয়েছে, আবার কেউ কেউ জিদবশতঃ অস্বীকার করেছে এবং বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে।

এ আয়াতের দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে অসংখ্য নবী রাসূল ও আসমানি কিতাব প্রেরণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল, 'মিল্লাতে ওয়াহেদা' ত্যাগ করে যে মানব সমাজ বিভিন্ন দল ও ফেরকাতে বিভক্ত হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় পূববর্তী ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনা। নবীগণের আগমনের ধারাটিও এভাবেই চলেছে। যখনই মানুষ সৎপথ থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনো না কোনো নবী প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাজিল করেছেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। আবার যখন তারা পথ হারিয়েছে, তখন অন্য আরো কজন নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে সেসব নবী-রাসূলের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলেই আরো নবী-রাসূল এবং কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেহেতু কুরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাজতে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কুরআনের শিক্ষাকে কিয়ামত পর্যন্ত এর প্রকৃত রূপে বহাল রাখার জন্য উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য হতে এমন এক দলকে সঠিক পথে কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন, যে দল সব সময় সত্য ধর্মে অটল থেকে মুসলমানদের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করতে থাকবে। কারো শত্রুতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এ জন্যই তাঁর পরে নবুয়ত ও ওহীর দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই সর্বোপরি খতমে-নবুয়ত ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : বুঝা গেল যে, ধর্মের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয়। মুসলমান ও অমুসলমানকে দু'টি জাতি হিসেবে চিহ্নিত করাই এর উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ আয়াতটিও একটি প্রমাণ। এতদসঙ্গে একথা ও পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, জাতীয়তা সৃষ্টি করার জন্যই, যা সৃষ্টির আদিতে ছিল যার বুনিয়াদ দেশ ও ভৌগলিক সীমার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না; বরং একক বিশ্বাস ও একক ধর্মের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইরশাদ হয়েছে– كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্যধর্মের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহবান করেছেন। যারা তাঁদের এ আহবানে সাড়া দেয়নি, তারা এক জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্বতন্ত্র জাতি গঠন করেছে। এ আয়াতের দ্বারা একথাও বুঝা গেল যে, মন্দ লোকেরা প্রেরিত নবীগণের এবং আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোকষ্ট নেওয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফেররা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ অবলম্ব করে নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মুমিন ও সালেহগণের উচিত নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা, তাঁদের অনুসরণে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর ওয়াজ এবং নম্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধাচারণকারীদের সত্য ধর্মের প্রতি আহবান করতে থাকা।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশত লাভ করতে পারবে না। অথচ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক পাপী ব্যক্তিও আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার দৌলতে জান্নাত লাভ করবে; এতে কোনো কষ্ট সহ্যের প্রয়োজনই হবে না। কারণ কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্ন স্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুমিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চ স্তরের বর্ণনা যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি এক হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

"সবচাইতে অধিক বালা-মসিবতে পতিত হয়েছেন, নবী-রাসূলগণ। তারপর তাঁদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ।"

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নবীগণ ও তাঁদের সাথীদের প্রার্থনা যে, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে' তা কোনো সন্দেহের কারণে নয় যা তাঁদের শানের বিরুদ্ধে ; বরং এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ তা'আলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেননি। অতএব, এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হোক। এমন প্রার্থনা আল্লাহর প্রতি ভরসা ও শানে নবুয়তের খেলাফ নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুতঃ নবী এবং সালেহীনগণই এরূপ প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি একান্ত গুরুত্ব ও তাকীদের সাথে বলা হয়েছে যে, কুফরি ও মুনাফেকী ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহর আদেশের পরিপন্থি হলে কারো কথাই মানবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জান-মাল কুরবান করে দাও এবং যাবতীয় দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ কর। এখান থেকে সে নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল কুরবান করার ছোট-খাটো বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে, যা জান-মাল এবং বিয়ে-তালাক প্রভৃতিসহ জীবনের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্ব থেকে যে বর্ণনাপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এখানেও সে রীতিই রক্ষা করা হয়েছে।

আনুষাঙ্গিক এ বিষয়গুলোর আলোচনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং এরও একটা বিশেষ রীতি রয়েছে। এসব বিষয়ের অধিকাংশই হচ্ছে এমন– যার সম্পর্কে সাহাবীগণ রাসূল কারীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং সেগুলোর উত্তর রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে সরাসরি আরশে মোয়াল্লা থেকে আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন। সে মতে এসব ফতোয়া বা প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন বলেও যদি মনে করা হয়, তাও ভুল হবে না। কুরআন শরীফে রয়েছে– قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ –এতে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলা ফতোয়া দেওয়ার কাজটিকে নিজেরই সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কাজেই এতে কোনো প্রকার রূপক বিশ্লেষণ চলে না। তাছাড়া বলা যেতে পারে যে, এ ফতোয়া রাসূল ﷺ দিয়েছেন, যা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে শেখানো হয়েছে। এ রুকূ'তে শরিয়তের যেসব হুকুম-আহকাম সাহাবীগণের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমগ্র কুরআনে এমনিভাবে প্রশ্নোত্তরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি

জায়গায় রয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি সূরা বাকারায়, একটি সূরা মায়েদায়, একটি সূরা আনফালে। এ নয়টি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে। এছাড়া সূরা আ'রাফে দু'টি এবং সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহাফ, সূরা ত্বা'হা ও সূরা নাযি'আতে একটি করে ছয়টি স্থানে কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল। যার উত্তর কুরআনে কারীমে উত্তরের আকারেই দেওয়া হয়েছে : মুফাস্সির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণের চাইতে কোনো উত্তম দল আমি দেখিনি; ধর্মের প্রতি তাঁদের এহেন ভালোবাসা ও সম্পর্ক সত্ত্বেও তাঁরা প্রশ্ন করতেন খুব অল্প। তাঁরা সর্বমোট তেরটি বিষয়ের উপর প্রশ্ন করেছিলেন। সেগুলোর উত্তর কুরআনে কারীমে দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁরা প্রয়োজন ছাড়া কোনো প্রশ্ন করতেন না। –[কুরতুবী]

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথমটিতে সাহাবীগণের প্রশ্নের বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ মানুষ কি ব্যয় করবে এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। এ প্রশ্নই দুটি আয়াতের পর পুনরায় একই বাক্যের মাধ্যমে করা হয়েছে।

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ কিন্তু প্রথমবার এই প্রশ্নের যে উত্তর উল্লিখিত আয়াতে দেওয়া হয়েছে, দু' আয়াতের পর এর উত্তর অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। এজন্য বুঝতে হবে যে, একই রকম প্রশ্নের দুটি উত্তরের একটি তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। আর সে তাৎপর্যটি সে সমস্ত অবস্থা ও ঘটনার বিষয়ে চিন্তা করলেই বুঝা যায়, যেগুলোর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছিল। যেমন, আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে এই যে, হযরত আমর ইবনে নূহ রাসূল ﷺ- কে প্রশ্ন করেছিলেন, যে مَا نُنْفِقُ مِنْ اَمْوَالِنَا وَاَيْنَ نَضَعُهَا অর্থাৎ আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? ইবনে জারীরের বর্ণনা মতে এ প্রশ্নটির দুটি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই দানের পাত্র কারা?

দু আয়াত পরে যে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, তার শানে নুযূল ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এই যে, মুসলমানগণকে যখন বলা হলো যে, তোমরা স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় কর, তখন কয়েকজন সাহাবী রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করার যে আদেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা শুনতে চাই, কি বস্তু কি পরিমাণে আল্লাহর পথে ব্যয় করব? এখানে এ প্রশ্নের একটিমাত্র অংশ বিদ্যমান। অর্থাৎ কি ব্যয় করা হবে এভাবে এ দু'টি প্রশ্নের ধারা ও রূপের কিছুটা বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রশ্নের কি ব্যয় করবে এবং কোথায় ব্যয় করবে বলা হয়েছে দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে কি ব্যয় করব? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কুরআন মাজীদ যা বলেছে, তাতে বুঝা যায় যে, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, 'কোথায় ব্যয় করবে' একে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিষ্কারভাবে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম অংশ 'কি খরচ করব' এর উত্তর দ্বিতীয় উত্তরের আওতায় বর্ণনা করা যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। এখন কুরআন মাজীদে বর্ণিত দুটি অংশের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথম অংশে অর্থাৎ, কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে– আল্লাহর রাস্তায় তোমরা যাই ব্যয় কর তার হকদার হচ্ছে তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়-স্বজন এতিম-মিসকিন ও মুসাফিরগণ।' আর দ্বিতীয় অংশের জবাবে অর্থাৎ, কি ব্যয় করবে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে ইরশাদ করা হয়েছে, তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ তা'আলা জানেন।' বাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই তোমাদের ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহর নিকট এর প্রতিদান পাবে।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে হয় তো প্রশ্নকারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই প্রশ্নের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আমরা যা ব্যয় করব তা কাকে দেব? কাজেই উত্তর দিতে গিয়ে দানের 'মাসরাফ' বা পাত্র সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া দানের বস্তু ও পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারটিকে প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নে শুধু জিজ্ঞাসা ছিল যে, কি খরচ করব? এর উত্তরে বলা হয়েছে قُلِ الْعَفْوَ 'আপনি বলে দিন যে, যা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর।' এতে বুঝা গেল যে, নফল সদকার বেলায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানদেরকে কষ্টে ফেলে, তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করে সদকা করার কোনো বিধান নেই। এতে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে নফল সদকা করাও আল্লাহর পছন্দ নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

زُيِّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– সুশোভিত করা হয়েছে। সাজানো হয়েছে।

يَسْخَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلسَّخْرُ মূলবর্ণ (س . خ . ر) জিনস صحيح অর্থ– ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। উপহাস করেছে।

يَشَآءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং مهموز لام অর্থ– সে চায়।

مُبَشِّرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب . ش . ر) জিনসে صحيح অর্থ– সুসংবাদাতাগণ।

وَمُنْذِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْذَارُ মূলবর্ণ (ن . ذ . ر) জিনস صحيح অর্থ– সতর্ককারীগণ।

يَحْكُمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُكْمُ মূলবর্ণ (ح . ك . م) জিনস صحيح অর্থ– তিনি মীমাংসা করবেন।

اخْتَلَفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِلَافُ মূলবর্ণ (خ . ل . ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিরোধিতা করল।

يَهْدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে হেদায়েত করে, পথ প্রদর্শন করে।

زُلْزِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার اَلزَّلْزَلَةُ মূলবর্ণ (ز . ل . ز . ل) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– তাদেরকে কাঁপিয়ে দেওয়া হলো। প্রকম্পিত করা হলো।

يَسْئَلُوْنَكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س . أ . ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তারা প্রশ্ন করে।

يُنْفِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفَاقُ মূলবর্ণ (ن . ف . ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা ব্যয় করে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا : এখানে زُيِّنَ হলো فعل مجهول আর ل হরফটি حرف جار এবং اَلَّذِيْنَ হলো اسم موصول আর كَفَرُوْا হলো فعل এবং এতে هُمْ যমীর فاعل এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে صلة অতঃপর موصول ও صلة মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হলো। اَلْحَيٰوةُ موصوف ও صفت মিলে نائب فاعل হলো زُيِّنَ ফে'লে মাজহুল-এর। উভয়টি اَلدُّنْيَا তার نائب فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ: এখানে و টি حرف عطف আর اَللّٰهُ মুবতাদা يَرْزُقُ ফে'ল এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল مَنْ অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল, يَشَآءُ ফে'ল এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল, بِـ টি حرف جار আর غَيْرِ মোযাফ ও মোযাফ ইলাইহি মিলে مجرور; জার ও মাজরূর মিলে متعلق হয়েছে يَرْزُقُ ফে'লের সঙ্গে; ফে'ল, ফা'য়েল মিলে جملة فعلية হয়ে صلة এবার موصول ও صلة মিলে হলো مفعول به ফে'লের يَرْزُقُ : এখন فعل . فاعل . مفعول به ও متعلق এবং মিলে جملة فعلية হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦)

অনুবাদ : (২১৬) জিহাদ করা তোমাদের উপর ফরজ, অথচ তা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর, আর এ কথা সম্ভব যে, তোমরা কোনো বিষয়কে অপ্রীতিকর মনে কর অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর এটাও সম্ভব যে, কোনো বিষয় তোমরা প্রীতিকর মনে কর অথচ তা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর, এবং আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জান না।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)

(২১৭) মানুষ আপনাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে, আপনি বলে দিন, তাতে [ইচ্ছাকৃতভাবে] যুদ্ধ-বিগ্রহ করা গুরুতর অপরাধ, আর আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহর সাথে ও মসজিদে হারামের সাথে কুফরি করা, এবং মসজিদে হারামের অধিকারীদেরকে তথা হতে বহিষ্কৃত করা তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ আল্লাহর নিকট, আর অশান্তি সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য, আর এই কাফেররা তোমাদের সাথে সর্বক্ষণ যুদ্ধ বাধিয়েই রাখবে এই উদ্দেশ্যে যে, সুযোগ পেলেই তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরিয়ে দিবে, আর তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে ফিরে যায়, অনন্তর কাফের অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়, তবে এরূপ লোকের আমলসমূহ ইহলোকে ও পরলোকে ব্যর্থ হয়ে যায়, এবং এরূপ লোক দোজখী হয়, তারা দোজখে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২১৬) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ জিহাদ করা তোমাদের উপর ফরজ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ অথচ তা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا আর এ কথা সম্ভব যে, তোমরা কোনো বিষয়কে অপ্রীতিকর মনে কর وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا আর এটাও সম্ভব যে, কোনো বিষয় তোমরা প্রীতিকর মনে কর وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ অথচ তা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর وَاللَّهُ يَعْلَمُ এবং আল্লাহ জানেন وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ আর তোমরা জান না।

(২১৭) يَسْأَلُونَكَ মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ সম্মানিত মাসে قِتَالٍ فِيهِ যুদ্ধ বিগ্রহ করা সম্বন্ধে, قُلْ আপনি বলে দিন قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ তাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা গুরুতর অপরাধ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ আর আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করা وَكُفْرٌ بِهِ এবং আল্লাহর সাথে কুফরি করা وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ও মসজিদে হারামের সাথে وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ এবং মসজিদে হারামের অধিকারীদেরকে তথা হতে বহিষ্কৃত করা أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ তার চেয়ে গুরুতর অপরাধ আল্লাহর নিকট وَالْفِتْنَةُ আর অশান্তি সৃষ্টি করা أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ হত্যা অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ আর এই কাফেররা তোমাদের সাথে সর্বক্ষণ যুদ্ধ বাধিয়েই রাখবে حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরিয়ে দিবে إِنِ اسْتَطَاعُوا সুযোগ পেলেই وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ আর তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি ফিরে যায় عَن دِينِهِ স্বীয় ধর্ম হতে فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ অনন্তর কাফের অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয় فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ তবে এরূপ লোকের আমলসমূহ ব্যর্থ হয়ে যায় فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ইহলোকে ও পরলোকে وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ এবং এরূপ লোক দোজখী হয় هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ তারা দোজখে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

অনুবাদ : (২১৮) প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে, এমন লোকই আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করে, আর আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন, করুণা করবেন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۙ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢١٨)

(২১৯) মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, এতদুভয়ের [ব্যবহারের] মধ্যে গুরুতর পাপও আছে এবং মানুষের [কোনো কোনো] উপকারও আছে, আর এতদুভয়ের [উক্ত] পাপরাশি তাদের উপকার অপেক্ষা অধিক গুরুতর, আর মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কি পরিমাণ ব্যয় করবে, আপনি বলে দিন যে পরিমাণ সহজ হয়, আল্লাহ এভাবে বিধানসমূহ সুস্পষ্টরূপে তোমাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়ে থাকেন, যেন তোমরা চিন্তা করে নাও।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

শাব্দিক অনুবাদ

(২১৮) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান এনেছে وَالَّذِينَ هَاجَرُوا এবং যারা হিজরত করেছে وَجَاهَدُوا এবং জিহাদ করেছে فِي سَبِيلِ اللَّهِ আল্লাহর পথে أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ এমন লোকই আশা পোষণ করে رَحْمَتَ اللَّهِ আল্লাহর রহমতের وَاللَّهُ আর আল্লাহ তা'আলা غَفُورٌ ক্ষমা করবেন رَّحِيمٌ করুণা করবেন।

(২১৯) يَسْأَلُونَكَ মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ মদ ও জুয়া সম্বন্ধে قُلْ আপনি বলে দিন فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ এতদুভয়ের [ব্যবহারের] মধ্যে গুরুতর পাপও আছে وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ এবং মানুষের উপকারও আছে وَإِثْمُهُمَا আর এতদুভয়ের পাপরাশি أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا তাদের উপকার অপেক্ষা অধিক গুরুতর وَيَسْأَلُونَكَ আর মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে مَاذَا يُنفِقُونَ কি পরিমাণ ব্যয় করবে قُلِ আপনি বলে দিন الْعَفْوَ যে পরিমাণ সহজ হয় كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ আল্লাহ এভাবে সু-স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়ে থাকেন لَكُمُ الْآيَاتِ বিধানসমূহ তোমাদের জন্য لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ যেন তোমরা চিন্তা করে নাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২১৭) قوله يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে কাফেরদের মোকাবিলায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা পথে ইবনে হাদরামী নামক এক কাফেরকে পেয়ে হত্যা করে কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের জানা ছিল না সে দিন জুমাদাস সানিয়ার ৩০ তারিখ ছিল না কি রজবের প্রথম তারিখ ছি। তারিখের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। ওদিকে মুশরিকরা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অভিযোগ তুলল যে, তারা সম্মানিত মাস রজবের প্রতি সম্মান দেখায় না। রজব মাসেই তারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[বায়জাবী– ১ : ১৪৭, মুখতাসার ইবনে কাসীর– ১ : ১৯০, রুহুল মা'আনী– ২ : ১০৭]

(২১৮) قوله إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ ও তার সাথীরা উল্লিখিত ঘটনার কারণে বলতে লাগল সম্মানিত মাসে লড়াইয়ের কারণে যদিও আমাদের কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু আমরা ছওয়াবের অধিকারী হব না। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[বায়জাবী– ১ : ১৪৮]

(২১৯) قوله يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইসলামের প্রথম যুগে জাহেলিয়াত যুগের সাধারণ রীতি নীতির মতো মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রাসূলে কারীম -এর হিজরতের পরেও মদিনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক বুদ্ধিকে অভ্যাসের উপর স্থান দেন, যদি কোনো অভ্যাস বিবেক বুদ্ধির পরিপন্থি হয় তবে সে অভ্যাসের ধারে কাছেও তারা যান না। এ ব্যাপারে নবী করীম -এর স্থান ছিল সবচেয়ে উর্ধ্বে। কেননা যে সব বস্তু কোনো কালে হারাম হবে এমন সব বস্তুর প্রতিও তার অন্তরে একটা সহজাত ঘৃণা ছিল। সাহাবীগণের মধ্যেও এমন কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন যারা হালাল থাকা কালেও মদ্যপান তো দূরের কথা তা স্পর্শও করেনি। মদিনায় পৌঁছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারুকে আজম, হযরত মা'আজ বিন জাবাল এবং কিছু সংখ্যক আনসার রাসূলে কারীম -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন সম্পদও ধ্বংস করে দেয় এ সম্পর্কে আপানার নির্দেশ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দু'টির মধ্যে অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয় যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সেসব বিষয়ও বুঝানো হয়েছে যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এতে মানুষের সব চাইতে বড় গুণ বুদ্ধি বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ বুদ্ধি এমন কঠিন গুণ যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়। এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। আয়াতটি মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য এক প্রকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর কোনো কোনো সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন এ আয়াতে মদকে হারাম করা হয়নি এবং এটা দীনের পক্ষে ক্ষতির কাজে ধাবিত করে বিধায় একে পাপের কারণ বলে স্থির করা হয়েছে। যাতে ফেতনায় পড়তে না হয় সে জন্য পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

(২১৯) قوله وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** একবার হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং সা'লাবা (রা.) রাসূলুল্লাহ -এর দরবারে এসে আরজ করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে তার রাহে খরচ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আর আমাদের কাছে গোলামও গৃহপালিত পশু ইত্যাদি বিভিন্ন সম্পদ রয়েছে এর মধ্য থেকে আমরা কি কি দান করব? এর জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। -[কানযুন নুকূল : ১৮]

জিহাদের কয়েকটি বিধান : উল্লিখিত আয়াতের প্রথমটিতে জিহাদ ফরজ হওয়ার আদেশ নিম্নলিখিত শব্দগুলোর দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে;

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 'তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হলো।' এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সব সময়ই জিহাদ করা ফরজ। তবে কুরআনের কোনো কোনো আয়াত ও রাসূল -এর হাদীসের বর্ণনাতে বুঝা যায় যে, জিহাদের এ ফরজ, ফরজে আইনরূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না; বরং এটা ফরজে কেফায়া। যদি মুসলমানদের কোনো দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোনো দেশে বা কোনো যুগে কোনো দলই জিহাদের ফরজ আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলমানকেই ফরজ থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হতে হবে। রাসূল ইরশাদ করেছেন-

اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -এর মর্ম হচ্ছে এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে। কুরআনের অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা জান এবং মালের দ্বারা জিহাদকারীগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।'

এতে যেসব ব্যক্তি কোনো অসুবিধার জন্য বা অন্য কোনো ধর্মীয় খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ যদি ফরজে আইন হতো তবে তা বর্জনকারীদেরকে সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো না।'

এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

অর্থাৎ 'কেন তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি ছোট দল ধর্মীয় ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য বেরিয়ে গেল না' এ আয়াতে কুরআন নিজেই ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব বন্টন করে দিয়ে বলছে যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান জিহাদের ফরজ আদায় করবে, আর কিছুসংখ্যক মুসলমান মানুষকে ধর্মীয় তা'লীম দানে নিয়োজিত থাকবে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন জিহাদ ফরজে আইন না হয়ে ফরজে-কেফায়া হবে।

তাছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ–এর নিকট জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতামাতা কি বেঁচে আছেন? উত্তরে সে বলল, জি! বেঁচে আছেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে উপদেশ দিলেন, তুমি পিতামাতার খেদমত করেই জিহাদের ছওয়াব হাসিল কর। এতেও বুঝা যায় যে, জিহাদ ফরজে কেফায়া। যখন মুসলমানদের একটি দল জিহাদের ফরজ আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলমানগণ অন্য খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলমানদের নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার আহবান করেন, তখন জিহাদ ফরজে আইনে পরিণত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে হাকীমের সূরা তওবায় ইরশাদ হয়েছে– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ

অর্থাৎ "হে মুসলমানগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর পথে বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা মনমরা হয়ে পড়।"

এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ না করুন, যদি কোনো ইসলামি দেশ অমুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরেও সে ফরজ আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উপর এ ফরজ পরিব্যাপ্ত হয় এবং ফরজে আইন হয়ে যায়। কুরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরজে কেফায়া।

যতক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরজে কেফায়া পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। কিংবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরজে কেফায়াতে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। আর যখন এ জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরজে-আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী অথবা ঋণদাতা কারোরই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দানের লক্ষ্যে ইরশাদ হয়েছে যে, 'যদিও জিহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা মনে হয়, কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোনো কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোনো বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরেছিল; কিন্তু পরিণামে দেখা গেল তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্টার অশুভ পরিণাম অনেক ব্যাপারেই ধরা পড়ে। তাই বলা হয়েছে : 'জিহাদ ও ধর্মযুদ্ধে যদিও আপাতদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশঙ্কা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বুঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি করছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল।"

নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধসংক্রান্ত নির্দেশাবলি : আলোচ্য আয়াতের দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে, তা হলো নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ, রজব, জিলকদ, জিলহজ এবং মহররম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম। এমনিভাবে কুরআনের অনেকগুলো আয়াতেই এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধ করা হয়েছে। যথা– مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে হুজুর ﷺ ঘোষণা করেছেন যে, এসব আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, উল্লিখিত চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের এ নিষেধাজ্ঞা সর্বকালের জন্যই প্রযোজ্য।

ইমামে তাফসীর, আতা ইবনে আবী রাবাহ কসম খেয়ে বলেছেন যে, এ আদেশ সর্বযুগের জন্য। তাবেয়ীগণের অনেকও এ আদেশকে স্থায়ী আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ এবং ইমাম জাসসাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। ফলে এখন কোনো মাসেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন আয়াত দ্বারা এ আদেশ রহিত করা হয়েছে? এ সম্পর্কে ফকীহগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً আয়াতটি উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ রহিতকারী। আবার অধিকাংশের মতে রহিতকারী সেই আয়াতটি হচ্ছে– فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ حَيْثُ শব্দটি এ স্থলে কাল বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকদের যে মাসে এবং যে কালেই [মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত] পাও, হত্যা কর। কারো কারো মতে এ আদেশ রাসূল ﷺ-এর কর্ম দ্বারা রহিত হয়েছে। তিনি নিষিদ্ধ মাসেই তায়েফ অবরোধ করেছিলেন এবং নিষিদ্ধ মাসেই হযরত 'আমের আশআরীকে' আওতাসের যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এ আদেশকে রহিত বলে উল্লেখ করেছেন।

রূহুল মা'আনী এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এবং বায়যাবী সূরা বারা'আতের প্রথম রুকূ'র তাফসীর প্রসঙ্গে এ আদেশ রহিত হওয়ার ব্যাপারে 'ইজমায়ে উম্মতের' কথা উল্লেখ করেছেন। –[বয়ানুল কুরআন]

কিন্তু তাফসীরে মাযহারী এসব দলিলের জবাবে বলেছেন যে, নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে। একে বলা হয়, আয়াতুস সাইফ'। অর্থাৎ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ পরন্তু এ আয়াতটি জিহাদ বা যুদ্ধ-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে। হুজুর ﷺ-এর ওফাতের মাত্র আশি দিন পূর্বে প্রদত্ত বিদায় হজের ভাষণেও নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান। কাজেই এর দ্বারা আলোচ্য আয়াতকে রহিত বলা চলে না। তাছাড়া রাসূল ﷺ-এর তায়েফ অবরোধ জিলকদ মাসে নয়; বরং শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এ অভিযানের দ্বারাও উল্লিখিত আয়াতকে মানসূখ বলা যায় না। অবশ্য একথা বলা যায় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা থেকে এ ব্যাপারটি স্বতন্ত্র যে, যদি কাফেররা এসব মাসেই আক্রমণ করে, তবে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ মুসলমানদের জন্যও বৈধ হবে। কাজেই আয়াতের শুধুমাত্র এ অংশটুকু রহিত বলা যেতে পারে, যার ব্যাখ্যা রয়েছে– اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ আয়াতটিতে।

মোটকথা, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা সর্বকালের জন্যই নিষিদ্ধ। তবে কাফেররা যদি এসব মাসে আক্রমণ করে, প্রতিরক্ষামূলক প্রতি-আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্যও জায়েজ। যেমন, ইমাম জাস্‌সাস হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, রাসূল ﷺ নিষিদ্ধ মাসে যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের দ্বারা আক্রান্ত না হতেন, ততক্ষণ আক্রমণ করতেন না।

মুরতাদের পরিণাম : উল্লিখিত আয়াত يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ এর শেষে মুসলমান হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম বলা হয়েছে– حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ অর্থাৎ, "তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে তথা ইহ ও পরকালের জন্য বরবাদ হয়ে গেছে।" এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তার কোনো নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তাহলে সে ব্যক্তি উত্তরাধিকার বা মিরাশের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন নামাজ-রোজা যত কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না।

আর পরকালে বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইবাদতের ছওয়াব না পাওয়া এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

মাসআলা : যদি এমন ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হয় তাহলে পরকালে দোজখ থেকে রেহাই পাওয়া এবং দুনিয়াতে তার উপর পুনরায় শরিয়তের হুকুম জারি হওয়া নিশ্চিত। তবে যদি সে প্রথম মুসলমান থাকা অবস্থায় হজ করে থাকে, তবে সামর্থ্যবান হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার তা ফরজ হওয়া না হওয়া, পূর্বের নামাজ রোজার পরকালে প্রত্যাবর্তন হওয়া না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) দ্বিতীয়বার হজকে ফরজ বলেন এবং পূর্বের নামাজ রোজার ছওয়াব পাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) দু'টি বিষয়েই মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম থেকেই কাফের হয়ে থাকে এবং সে অবস্থায় কোনো কাজ করে থাকে, কোনো দিন ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বকৃত যাবতীয় সৎকর্মের ছওয়াবই সে পাবে। আর যদি সে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

মাসআলা : মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাফেরদের অবস্থা অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। এজন্য কাফেরদের থেকে জিজিয়া কর গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর যদি মুরতাদ স্ত্রীলোক হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কেনান মুরতাদের কার্যকলাপের দরুন সরাসরিভাবে ইসলামের অবমাননা করা হবে। কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

সাহাবীগণের প্রশ্নসমূহ এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এ আয়াতও অন্তর্ভুক্ত। এতে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে সাহাবীগণের প্রশ্ন এবং আল্লাহর তরফ থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এ দু'টি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, বিস্তারিতভাবে এ দুটির তাৎপর্য ও বিধানগুলো লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

শরাব হারাম হওয়া এবং এতদসংক্রান্ত বিধান : ইসলামের প্রথম যুগে জাহেলিয়াত আমলের সাধারণ রীতি-নীতির মতো মদ্যপান ও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ-এর হিজরতের পরেও মদিনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল। কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের উর্ধ্বে স্থান দেন। যদি কোনো অভ্যাস বুদ্ধি বা যুক্তির পরিপন্থি হয়, তবে সে অভ্যাসের ধারে কাছে ও তারা যান না। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর স্থান সবচেয়ে উর্ধ্বে। কেননা যেসব বস্তু কোনো কালে হারাম হবে, এমন সব বস্তুর প্রতিও তাঁর অন্তরে একটা সহজাত ঘৃণা ছিল। সাহাবীগণের মধ্যেও এমন কিছুসংখ্যক লোক ছিলেন, যাঁরা হালাল থাকাকালেও মদ্য পান তো দূরের কথা, তা স্পর্শও করেননি।

মদিনায় পৌঁছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারুকে আজম, হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল এবং কিছুসংখ্যক আনসার রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন : "মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?" এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দুটির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়, যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সেসব বিষয়ও বুঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ বুদ্ধি এমন একটি গুণ যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য এক প্রকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় কোনো কোনো সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি; বরং এটা দীনের পক্ষে ক্ষতির কাজে ধাবিত করে বিধায় একে পাপের কারণ বলে স্থির করা হয়েছে, যাতে ফেতনায় পড়তে না হয়, সেজন্য পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মদের ব্যাপারে পরবর্তী আয়াতটি নাজিল হওয়ার ঘটনাটি নিম্নরূপ : একদিন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) সাহাবীগণের মধ্য হতে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। আহারাদির পর যথারীতি মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হলো এবং সবাই মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিবের নামাজের সময় হলে সবাই নামাজে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ইমামতি করতে এগিয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তিনি قُلْ يَآيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ সূরাটি ভুল পড়তে লাগলেন, তখনই মদ্যপান থেকে পুরোপুরি বিরত রাখার জন্য দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। ইরশাদ হলো– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى অর্থাৎ, 'হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাজের কাছেও যেয়ো না।' এতে নামাজের সময় মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সময় তা পান করার অনুমতি তখনও পর্যন্ত বহাল রয়ে গেল। পরবর্তীতে বহুসংখ্যক সাহাবী এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরই মদ্যপান সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যে বস্তু মানুষকে নামাজ থেকে বিরত রাখে,

তাতে কোনো কল্যাণই থাকতে পারে না। যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এমন বস্তুর ধারে-কাছে যাওয়া উচিত নয়, যা মানুষকে নামাজ থেকে বিরত করে। যেহেতু নামাজের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ের জন্য মদ্যপানকে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়নি, সেহেতু কেউ কেউ নামাজের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করতে থাকেন। ইতঃমধ্যে আরো একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। হযরত আতবান ইবনে মালেক কয়েকজন সাহাবীকে নিমন্ত্রণ করেন, যাদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) ও উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। আরবদের প্রথা অনুযায়ী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্ব-পুরুষদের অহঙ্কারমূলক বর্ণনা আরম্ভ হয়, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসাকীর্তন করা হয়। ফলে একজন আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ডদেশের একটি হাড় সা'দ এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে হযরত সা'দ (রা.) রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন হুজুর ﷺ দোয়া করলেন-

اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! শরাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার বর্ণনা ও বিধান দান কর।" তখনই সূরা মায়েদার উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো, মদ, জুয়া মূর্তি এবং তীর নিক্ষেপ এসবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানি কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তিলাভ ও কল্যাণ পেতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে, আর আল্লাহর জিকির ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হলো শয়তানের একান্ত কাম্য, তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?

মদের অবৈধতা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক নির্দেশ

আল্লাহর নির্দেশাবলির তাৎপর্য তিনিই জানেন। তবে শরিয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, ইসলামি শরিয়ত কোনো বিষয়ে কোনো হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন, কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষকেই এমন আদেশ দেন না, যা তার শক্তি ও ক্ষমতার উর্ধ্বে।' এই দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিল ইসলামি শরিয়তেও মদ্যপানকে হারাম করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

মদ্যপানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কুরআনের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে এই যে, মদপান সম্পর্কে এ চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে আলোচ্য এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম নির্দেশ। এতে মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে; মদ্যপান হারাম করা হয়নি; বরং এ আয়তটিকে এই মর্মে একটা পরামর্শ বলা যেতে পারে যে, এটা বর্জনীয় বস্তু। কিন্তু বর্জন করার কোনো নির্দেশ এতে দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা নিসায় বলা হয়েছে- لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى এতে বিশেষভাবে নামাজের সময় মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্য অনুমতি রয়ে যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে রয়েছে সূরা মায়েদায়। এতে পরিষ্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শরিয়তের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা বিশেষতঃ নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হতো।

আলেমগণ বলেছেন, 'যেভাবে শিশুদেরকে মায়ের দুধ ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তেমনি মানুষের কোনো অভ্যাসগত কাজ ছাড়ানো এর চাইতেও কষ্টকর।' এ জন্য ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে শরাবের মন্দ দিকগুলো মানবমনে বদ্ধমূল করেছে। অতঃপর নামাজের সময়ে একে নিষিদ্ধ করেছে এবং সব শেষে বিশেষ বিশেষ সময়ের পরিবর্তে কঠোরভাবে সর্বকালের জন্যই নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে।

তবে শরাব হারাম করার ব্যাপারে প্রথমতঃ ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়াটাই ছিল বৈজ্ঞানিক পন্থা। তেমনিভাবে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করার পর এর নিষিদ্ধতার আইন-কানুনও শক্তভাবে জারি করাও বিজ্ঞতারই পরিচায়ক। এজন্য রাসূল ﷺ শরাব সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে– "সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে শরাব। এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতম পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।"
নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'শরাব এবং ঈমান একত্রিত হতে পারে না'। তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা.) হুজুর ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর ﷺ মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণির ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন।

(১) যে লোক নির্যাস বের করে (২) প্রস্তুতকারক (৩) পানকারী (৪) যে পান করায় (৫) আমদানিকারক (৬) যার জন্য আমদানি করা হয় (৭) বিক্রেতা (৮) ক্রেতা (৯) সরবরাহকারী (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী।
অতঃপর শুধু মৌখিক শিক্ষা ও প্রচারের উপরই ক্ষান্ত হননি; বরং যথাযথ আইনের মাধ্যমেও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যার নিকট কোনো প্রকার মদ থেকে থাকে, তা অমুক স্থানে উপস্থিত কর।

সাহাবীগণের মধ্যে আদেশ পালনের অনুপম আগ্রহ : আদেশ পাওয়া মাত্র অনুগত সাহাবীগণ নিজ নিজ ঘরে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত মদ তৎক্ষণাৎ ফেলে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি মদিনার অলি-গলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদ্যপান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তিনি সেখানেই ফেলে দিয়েছিলেন। যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙ্গে ফেলেছেন। হযরত আনাস (রা.) তখন এক মজলিসে মদ্যপানের সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। হযরত আবূ তালহা, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাই ইবনে কা'ব, সোহাইল (রা.) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণ সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন– এবার সমস্ত শরাব ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল। অন্য বর্ণনায় আছে– হারাম ঘোষণার সময় যার হাতে শরাবের পেয়ালা ছিল এবং তা ঠোঁট স্পর্শ করছিল, তাও তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেদিন মদিনায় এ পরিমাণ শরাব নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, বৃষ্টির পানির মতো শরাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদিনার অলি-গলির অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই বৃষ্টি হতো তখন শরাবের গন্ধ ও রং মাটির উপর ফুটে উঠত।
যখন আদেশ হলো যে, যার কাছে যে রকম মদ রয়েছে, তা অমুক স্থানে একত্রিত কর। তখন মাত্র সেসব মদই বাজারে ছিল যা ব্যবসার জন্য রাখা হয়েছিল। এ আদেশ পালনকল্পে সাহাবীগণ বিনা দ্বিধায় নির্ধারিত স্থানে সব মদ একত্রিত করেছিলেন।

হুজুর ﷺ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে শরাবের অনেক পাত্র ভেঙ্গে ফেললেন এবং অবশিষ্টগুলো সাহাবীগণের দ্বারা ভাঙ্গিয়ে দিলেন। জনৈক সাহাবী মদের ব্যবসা করতেন এবং সিরিয়া থেকে মদ আমদানি করতেন। ঘটনাচক্রে তখন তিনি মদ আনার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন তিনি ব্যবসায়ের এ পণ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদিনায় প্রবেশ করার পূর্বেই মদ হারাম হওয়ার সংবাদ তাঁর কানে পৌছল, তখন সে সাহাবীও তাঁর সমুদয় মাল যা অনেক মুনাফার আশায় আনা হয়েছিল, এক পাহাড়ের পাদদেশে রেখে এসে হুজুরে আকরাম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এসব সম্পদের ব্যাপারে কি করতে হবে তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। মহানবী ﷺ হুকুম করলেন– মটকাগুলো ভেঙ্গে সমস্ত শরাব ভাসিয়ে দাও। অতঃপর বিনা আপত্তিতে তিনি তাঁর সমস্ত পুঁজির বিনিময়ে সংগৃহীত এ পণ্য স্বহস্তে মাটিতে ঢেলে দিলেন। এটাও ইসলামের মু'জিযা এবং সাহাবীগণের বিস্ময়কর আনুগত্যের নিদর্শন, যা এ ঘটনায় প্রমাণ হলো। যে জিনিসের অভ্যাস হয়ে যায়, সবাই জানে যে, তা ত্যাগ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। মদ্যপানে তাঁরা এমন অভ্যস্ত ছিলেন যে, অল্পদিন তা থেকে বিরত থাকাও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। কিন্তু নবী করীম ﷺ একটিমাত্র নির্দেশই তাঁদের অভ্যাসে এমন অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করল যে, তারপর থেকে তারা শরাবের প্রতি তেমনি ঘৃণা পোষণ করতে লাগলেন, যেমন পূর্বে তাঁরা এর প্রতি আসক্ত ছিলেন।

ইসলামি রাজনীতি এবং সাধারণ রাজনীতির পার্থক্য : আলোচ্য আয়াতে ও ঘটনাসমূহে শরাব হারাম হওয়ার আদেশের প্রতি আনুগত্যের একটা নমুনা দেখা গেল। একে ইসলামের মু'জিযা বা নবী করীম ﷺ-এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অথবা

ইসলামি রাজনীতির অপরিহার্য ফলশ্রুতিও বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ নেশার অভ্যাস ত্যাগ করা যে অত্যন্ত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তদুপরি আরব দেশের কথা তো স্বতন্ত্র, সেখানে এর প্রচলন এত বেশি ছিল যে, মদ ছাড়া কয়েক ঘণ্টা কাটানোও তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় তা কি পরশপাথর ছিল যে, মাত্র একটি ঘোষণার শব্দ কানে পৌঁছামাত্র তাঁদের স্বভাবে এ আমুল পরিবর্তন সাধিত হলো। সে একটি মাত্র ঘোষণাই তাঁদের অভ্যাসে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল যে, কয়েক মিনিট পূর্বে যে জিনিস এত প্রিয় এবং এত লোভনীয় ছিল, অল্প কয়েক মিনিট পরে তাই অত্যন্ত ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য পরিগণিত হয়ে গেল।

অপরদিকে বর্তমান যুগের তথাকথিত উন্নতমানের রাজনীতির একটি উদাহরণ সামনে রেখে দেখা যাক। আজ থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং সমাজসংস্কারকগণ মদ্যপানের মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলোর অনুধাবন করে দেশে মদ্যপানকে আইন করে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর এজন্য জনমত গঠনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে অভিহিত প্রচারের আধুনিকতম যন্ত্রগুলোও ব্যবহার করা হয়েছিল। সবগুলো প্রচার-মাধ্যমেই মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শত শত সংবাদপত্রে নিবন্ধ প্রকাশিত হলো, পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হলো, লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছেপে প্রচারও বিতরণ করা হলো। তাছাড়া আমেরিকার সংসদেও এজন্য আইন পাশ করা হলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমেরিকার যে অবস্থা মানুষের সামনে এবং সেখানকার সরকারি প্রতিবেদনের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে এসেছে। তা হলো এই যে, এই আধুনিক উন্নত ও শিক্ষিত জাতি সেই আইনগত নিষেধাজ্ঞার সময়টিতে সাধারণ সময়ের চাইতেও অধিক মাত্রায় মদ্যপান করেছে। এমনকি অবশেষে সরকার এ আইন বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়।

তদানীন্তন আরবের মুসলমান এবং আধুনিক আমেরিকার উন্নত জাতির মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই বিরাট পার্থক্যের কারণ ও রহস্য কি?

একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, ইসলামি শরিয়ত মানুষের সংশোধনের জন্য শুধু আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করেনি; বরং আইনের পূর্বে তাদের মন মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, ইবাদত-আরাধনা এবং পরকালের চিন্তা নামক পরশমণির পরশে মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। যার ফলে রাসূল [illegible]-এর একটিমাত্র আহ্বানেই তারা স্বীয় জান-মাল, শান-শওকত সবকিছুর বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। মক্কী জীবনে এই মানুষ তৈরির কাজই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে। এভাবে আত্মত্যাগীদের একটা বিরাট দল তৈরি হয়ে গেল। তারপর প্রণয়ন করা হলো আইন। পক্ষান্তরে মানুষের মনের পরিবর্তনের জন্য আমেরিকার সরকার অসংখ্য উপায় অবলম্বন করেছে। তাদের নিকট সবকিছু ছিল, কিন্তু ছিল না পরকালের চিন্তা। অপরদিকে মুসলমানদের প্রতিটি শিরা-উপশিরাও ছিল পরকালের চিন্তায় পরিপূর্ণ।

আজও যদি সমস্যাকাতর দুনিয়ার মানুষ সে পরশমণি ব্যবহার করে দেখেন, তবে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, অতি সহজেই সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

মদ্যপানের অপকারিতা ও উপকারিতার তুলনা : এ আয়াতে মদ ও জুয়া উভয় বস্তু সম্পর্কেই কুরআন বলেছে যে, এতে কিছু উপকারিতাও রয়েছে, তবে বেশ কিছু অপকারিতাও বর্তমান– কিন্তু এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতার মাত্রা অনেক বেশি। তাই একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, এর উপকারিতা এবং অপকারিতাগুলো কি কি? অতঃপর দেখতে হবে, উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশি হওয়ার কারণ কি? সবশেষে ফিকহের কয়েকটি মূলনীতি বর্ণনা করা হবে, যেগুলো এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

প্রথমে শরাব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক : এর উপকারিতার কথা বলতে গেলে শরাব-পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িকভাবে শক্তিও কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে কিছুটা লাবণ্যও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ নগণ্য উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এত বিস্তৃত ও গভীর যে, অন্য কোনো বস্তুতেই সচরাচর এতটা ক্ষতি দেখা যায় না। শরাবের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের হজমশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসে। সামগ্রিকভাবে শারীরিক সক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

একজন জার্মান ডাক্তার বলেছেন, যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত তারা চল্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের বৃদ্ধার মতো অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং তাদের শরীরের গঠন এত হাল্কা হয়ে যায় যে, ষাট বছরের বৃদ্ধেরও তেমনটি হয় না। শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে অল্প বয়সে বৃদ্ধের মতো বেকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া শরাব লিভার এবং কিডনীকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে ফেলে। যক্ষা রোগ মদ্যপানেরই একটা বিশেষ পরিণতি।

ইউরোপের শহরাঞ্চলে যক্ষ্মার আধিক্যের কারণও অতিমাত্রায় মদ্যপান। সেখানকার কোনো কোনো ডাক্তার বলেছেন, ইউরোপে অধিক মৃত্যুর কারণই হচ্ছে যক্ষ্মা। যখন থেকে ইউরোপে মদপানের আধিক্য দেখা দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাবও দেখা দিয়েছে।

এগুলো হচ্ছে মানবদেহে মদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবাই অবগত। সবাই জানেন যে, মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকে, ততক্ষণ তার জ্ঞান-বুদ্ধি কোনো কাজ ই করতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানীগণের অভিমত হচ্ছে এই যে, নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকেও দুর্বল করে দেয়। এতে মানুষ পাগলও হয়ে যায়। চিকিৎসাবিদগণের সবাই এতে একমত যে, শরাব কখনো শরীরের অংশে পরিণত হয় না, এতে শরীরে রক্তও সৃষ্টি হয় না; রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র। ফলে সাময়িকভাবে শক্তির সামান্য আধিক্য অনুভূত হয়। কিন্তু হঠাৎ রক্তের এ উত্তেজনা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যেসব শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, মদ্যপানের দরুন সেগুলো শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে দ্রুতগতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসতে থাকে। শরাবের দ্বারা মানুষের গলদেশ এবং শ্বাসনালীরও প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে স্বর মোটা এবং স্থায়ী কফ হয়ে থাকে, তারই ফলে শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। শরাবের প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানদের উপরও পড়ে। মদ্যপায়ীদের সন্তান দুর্বল হয় এবং অনেকে তাতে বংশহীনও হয়ে পড়ে।

একথাও স্মরণযোগ্য যে, মদ্যপানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নিজের মধ্যে চঞ্চলতা ও স্ফূর্তি এবং কিছুটা শক্তি অনুভব করে। ফলে তারা ডাক্তার-হাকীমদের মতামতকে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, শরাব এমন একটি বিষাক্ত দ্রব্য, যার বিষক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ পায়।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং এ শত্রুতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে এই অনিষ্টকারিতাই সবচেয়ে গুরুতর। সুতরাং কুরআন সূরা মায়েদার এক আয়াতে বলেছে– اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ অর্থাৎ 'শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়।'

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়। যার পরিণাম অনেক সময় অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে, তবে তার দ্বারা বেফাঁসভাবে কোনো গোপন তথ্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে সারা দেশেরই পরিবর্তন ও বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেশের রাজনীতি এবং প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রের কৌশলগত গোপন তথ্য শত্রুর হাতে চলে যেতে পারে। বিচক্ষণ গুপ্তচরেরা এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, সে মানুষকে পুতুলে পরিণত করে দেয়, যাকে দেখলে বাচ্চারা পর্যন্ত উপহাস করতে থাকে। কেননা তার কাজ ও চালচলন সবই তখন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। শরাবের আরো একটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এটি খেয়ানতের মতো।

শরাব মানুষকে সকল মন্দ থেকে মন্দতর কাজে চালিত করে। ব্যভিচার ও নরহত্যার অধিকাংশই এর পরিণাম। আর এ জন্য অধিকাংশ শরাবখানাই ব্যভিচার, জেনা ও হত্যাকাণ্ডের আখড়ায় পরিণত হয়। এসব হচ্ছে মানুষের শারীরিক ক্ষতি, আর রূহানী ক্ষতি তো সুপরিজ্ঞাত যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়া চলে না। অন্য কোনো ইবাদত অথবা আল্লাহর কোনো জিকির করাও সম্ভব হয় না। সে জন্য কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে– 'শরাব তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখে।'

এখন রইল আর্থিক ক্ষতির দিকটি। যদি কোনো এলাকায় একটি শরাবখানা খোলা হয়, তবে তা সমস্ত এলাকার টাকা-পয়সা লুটে নেয়, একথা সর্বজনবিদিত। এ ব্যয়ের পরিমাণ ও পর্যায় বহু রকমের। একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী শুধু একটি শহরে শরাবের মোট ব্যয় সামগ্রিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান।

এই হলো শরাবের ধর্মীয়, পার্থিব, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা, যা রাসূল ﷺ একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন– اُمُّ الْفَوَاحِشِ وَاُمُّ الْخَبَائِثِ অর্থাৎ 'শরাব সকল মন্দ ও অশ্লীলতার জননী।' এ প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য প্রবাদ বাক্যের মতোই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। –[তাফসীরে আল মানার : মুফতি আবদুহু : ২ : ২২৬]

আল্লামা তানতাবী (র.) আল জাওহারে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে– ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তাঁর গ্রন্থ 'খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ ফিল ইসলাম' এ লিখেছেন– 'প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য নির্মিত দুধারী তলোয়ার ছিল এই 'শরাব'। আমরা আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি; কিন্তু ইসলামি শরিয়ত আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি; ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত। আর যাদের ঘরে আমাদের সরবরাহকৃত শরাবের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না।'

জনৈক বৃটিশ আইনজ্ঞ ব্যান্টাম লিখেন, 'ইসলামি শরিয়তের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও একটি বৈশিষ্ট্য যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা যখন এর ব্যবহার শুরু করে, তখন থেকেই তাদের বংশে 'উন্মাদনা' সংক্রমিত হতে শুরু করেছে। আর ইউরোপের যেসব লোক এই পদার্থটিতে চুমুক দিতে শুরু করেছে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কাজেই আফ্রিকার লোকদের জন্যও এ কারণে কঠিন শাস্তি বিধান করা দরকার।

সারকথা, যে কোনো সৎ লোক যখনই শীতল মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠেছেন যে, 'এটি অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানি কাজ, এ যে ধ্বংসের উপকরণ। এই 'উম্মুল খাবায়েস' বা সকল অকল্যাণের মাতার ধারে কাছেও যেয়ো না; ফিরে এসো فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত কুরআনের চারটি আয়াত উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা নাহলের আরো এক জায়গায় নেশাকর দ্রব্যাদির আলোচনা অন্য ভঙ্গিতে করা হয়েছে। সে বিষয়টিও এখানেই আলোচনা করে ফেলা বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে হয়। যাতে শরাব ও অন্যান্য যাবতীয় নেশাকর দ্রব্যাদি সম্পর্কে কুরআনি বর্ণনাগুলো মোটামুটিভাবে সামনে এসে যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে এই– وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

অর্থাৎ, 'আর খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তোমরা নেশাকর দ্রব্য এবং উত্তম আহার্য প্রস্তুত করে থাক; নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে।'

তাফসীর ও ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার ঐ সমস্ত নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের খাদ্যরূপে দান করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি মহিমার পরিচয় দিয়েছেন। এতে প্রথমে দুধের কথা বলা হয়েছে। যাকে আল্লাহ তা'আলা জন্তুর পেটের মধ্যে রক্ত ও মলমূত্রের সংমিশ্রণ থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন খাদ্য হিসেবে দান করেছেন। ফলে মানুষকে কোনো কিছুই করতে হয় না। এজন্য এখানে نُسْقِيْكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমি তোমাদেরকে দুধ পান করিয়ে থাকি। অতঃপর বলা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের দ্বারাও মানুষ কিছু খাদ্য বস্তু তৈরি করে থাকে, যাতে তাদের উপকার হয়, এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা নিজেদের জন্য লাভজনক খাদ্য প্রস্তুতে মানুষের শিল্পজ্ঞানের কিছুটা হাত রয়েছে। আর এই দক্ষতার ফলে দু' রকমের খাদ্য তৈরি হয়েছে। একটি হলো নেশাজাত দ্রব্য, যাকে মদ বা শরাব বলা হয়। দ্বিতীয়টি হলো উৎকৃষ্ট খাদ্য। অর্থাৎ, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা অবস্থায় আহার করা অথবা শুকিয়ে ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে মানুষকে খেজুর ও আঙ্গুর দান করেছেন এবং তার দ্বারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য তৈরির কিছুটা অধিকারও তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন। এখন তাদের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা, তারা কি প্রস্তুত করবে? নেশাজাত দ্রব্য তৈরি করে নিজেদের বুদ্ধিকে বিকল করবে, না উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে শক্তি অর্জন করবে?

এ তাফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত দ্বারা নেশাজাত দ্রব্যকে হালাল বলার দলিল দেওয়া যাবে না। এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার দানসমূহ এবং তার ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা, যা যে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর নিয়ামত। যথা, সমস্ত আহার্য এবং মানুষের জন্য উপকারী বস্তুকে অনেকে না-জায়েজ পথে ব্যবহার করে। কিন্তু কারো ভুলের জন্য আল্লাহর নিয়ামত তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারে না। অতঃপর এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, 'কোন পথে ব্যবহার হালাল এবং কোন পথে ব্যবহার হারাম। তবু আল্লাহ তা'আলা এভাবে সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, নেশার বিপরীতে 'উৎকৃষ্ট খাদ্য' বলা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, নেশা ভালো বিষয় নয়। অধিকাংশ মুফাসসির নেশাযুক্ত বস্তুকেও 'সুকর' (سَكَرٌ) বলেছেন। –[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাসসাস]

গোটা মুসলিম উম্মতের মতে এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মদ্যপান হারাম হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত পরবর্তী সময়ে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদিও শরাব হালাল ছিল এবং মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই তা পান করতেন, কিন্তু তখনও এ আয়াতে এদিকে ইশারা করা হয়েছিল যে, এটি পান করা ভালো নয়। তারপর অত্যন্ত কঠোরতার সাথে শরাবকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। –[জাসসাস ও কুরতুবী]

জুয়ার অবৈধতা : مَيْسِرْ -এর আভিধানিক অর্থ বন্টন করা। يَاسِرْ বলা হয় বন্টনকারীকে। জাহেলিয়াত আমলে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বন্টন করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেওয়া হতো। কেউ একাধিক অংশ পেত, আবার কেউ বঞ্চিত হতো। বঞ্চিত ব্যক্তি উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো, আর গোশত দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হতো; নিজেরা ব্যবহার করত না।

এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেত, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ কৃপণ ও হতভাগ্য বলে মনে করা হতো। বন্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এরূপ জুয়াকে 'মাইসির' বলা হতো। সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে এবং জাস্সাস 'আহকামুল কুরআনে' লিখেছেন যে, মুফাসসিরে কুরআন হযরত ইবনে আব্বাস ইবনে ওমর (রা.), কাতাদা, মু'আবিয়া ইবনে সালেহ, আতা ও তাউস (রা.) বলেছেন, সব রকমের জুয়াই 'মাইসির' এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, مِنَ الْقِمَارِ الْمُخَاطَرَةُ। লটারীরও জুয়ারই অন্তর্ভুক্ত।' জাসসাস ও ইবনে সিরীন বলেছেন– 'যে কাজে লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাও মাইসির এর অন্তর্ভুক্ত।' –[রূহুল বয়ান]

مُخَاطَرَةٌ 'মুখাতিরা' বলা হয় এমন লেনদেনকে, যার মাধ্যমে কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে।

আজকাল নানা প্রকারের লটারী দেখা যায়। এসবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ও হারাম। মোটকথা, মাইসির ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে ব্যাপারে কোনো মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত আরোপতি হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়ার উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। আর এরই ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে। –[শামী– ৫ : ৩৫৫] উদাহরণতঃ এতে যায়েদ অথবা ওমরের যে কোনো একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এ সবের যত প্রকার ও শ্রেণি অতীতে ছিল, বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে, তার সবগুলোকে মাইসির, কেমার এবং জুয়া বলা যেতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শব্দ প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে লটারীর যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে, এ সবই কেমার ও মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে যদি শুধু একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়– যেমন, যে ব্যক্তি অমুক কাজ করবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। কেননা এটা লাভ ও লোকসানের মাঝে পরিক্রমণশীল নয়; বরং লাভ হওয়া ও লাভ না হওয়ার মধ্যে সীমিত।

এ জন্য সহীহ হাদীসে দাবা ও ছক্কা-পাঞ্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম বলা হয়েছে, কেননা এ সবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজি ধরা হয়ে থাকে। তাস খেলায় যদি টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, তবে তাও হারাম।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছক্কা-পাঞ্জা খেলে সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত করে। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, ছক্কা-পাঞ্জাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন যে, দাবা ছক্কা-পাঞ্জা খেলা অপেক্ষাও খারাপ। –[ইবনে কাছীর]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরাবের ন্যায় জুয়াও হালাল ছিল। মক্কায় যখন সূরা রূমের غُلِبَتِ الرُّوْمُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং কুরআন ঘোষণা করে যে, এখন রোম যদিও তাদের প্রতিপক্ষ কেসরার কাছে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা কয়েক বছরের মধ্যেই জয়লাভ করবে। তখন মক্কার মুশরিকরা তা অবিশ্বাস করে। সে সময় হযরত আবূ বকর (রা.) মুশরিকদের সাথে বাজি ধরলেন যে, যদি কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা জয়লাভ করে, তবে তোমাদেরকে এ পরিমাণ মাল পরিশোধ করতে হবে। এ বাজি মুশরিকরা গ্রহণ করল। ঠিক কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা জয়লাভ করল। শর্তানুযায়ী হযরত আবূ বকর (রা.) তাদের নিকট থেকে মাল আদায় করে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হুজুর ﷺ ঘটনা শুনে খুশি হলেন, কিন্তু মালগুলো সদকা করে দিতে আদেশ দিলেন।

কেননা যে বস্তু আগত দিনে হারাম হবে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো হালাল থাকাকালেও স্বীয় রাসূল ﷺ-কে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্যই তিনি শরাব ও জুয়া থেকে সর্বদা বেঁচে রয়েছন এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীও তা থেকে সর্বদা নিরাপদে রয়েছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত জিবরাঈল রাসূল ﷺ-কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, হযরত জাফর (রা.)-এর চারটি অভ্যাস আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। হুজুর ﷺ জাফর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চারটি অভ্যাস কি কি? তিনি উত্তর দিলেন, আজ পর্যন্ত আমার এ চারটি অভ্যাস কাউকেই বলিনি। আল্লাহ যখন আপনাকে জানিয়েই দিলেন তখন বলতে হয়। তা হচ্ছে এই, আমি দেখেছি যে, শরাব মানুষের বুদ্ধি বিলুপ্ত করে দেয়, তাই আমি কোনো দিনও শরাব পান করিনি। মূর্তির মধ্যে মানুষের ভালো-মন্দ কোনোটাই করার ক্ষমতা নেই বলে জাহেলিয়াত আমলেও আমি কোনো দিন মূর্তিপূজা করিনি। আমার স্ত্রী ও মেয়েদের ব্যাপারে আমার মধ্যে সম্ভ্রমবোধ অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে, তাই আমি কোনো দিনও জেনা করিনি। আমি দেখেছি যে, মিথ্যা বলা অত্যন্ত মন্দ কাজ, তাই আমি কোনো দিনও মিথ্যা কথা বলিনি। –[রূহুল বয়ান]

জুয়ার সামাজিক ও সামগ্রিক ক্ষতি : জুয়া সম্পর্কে কুরআন মাজীদ শরাব বিষয়ে প্রদত্ত আদেশেরই অনুরূপ বিধান প্রদান করেছে যে, এতে কিছুটা উপকারও রয়েছে, কিন্তু ক্ষতি অনেক বেশি। এর লাভ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। যদি খেলায় জয়লাভ করে, তবে একজন দরিদ্র লোক একদিনেই ধনী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর আর্থিক সামাজিক এবং আত্মিক ক্ষতি সম্পর্কে অনেক কম লোকই অবগত। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হচ্ছে। জুয়া খেলা একজনের লাভ এবং অপরজনের ক্ষতির উপর পরিক্রমণশীল। জয়লাভকারীর কেবল লাভই লাভ; আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। কেননা এ খেলায় একজনের মাল অন্যজনের হাতে চলে যায়। এজন্য জুয়া সামগ্রিকভাবে জাতির ধ্বংস এবং মানব চরিত্রের অধঃপতন ঘটায়। যে ব্যক্তি এতে লাভবান হয়, সে পরোপকারের ব্রত থেকে দূরে সরে রক্ত পিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির মৃত্যু এগিয়ে আসে, অথচ প্রথম ব্যক্তি আয়েশ বোধ করতে থাকে এবং নিজের পূর্ণ সামর্থ্য এতে ব্যয় করে। ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এর বিপরীত। কেননা এতে উভয়পক্ষের লাভ লোকসানের সম্ভাবনা থাকে। ব্যবসা দ্বারা মাল হস্তান্তরে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং উভয় পক্ষই এতে লাভবান হয়ে থাকে।

জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, জুয়াড়ী প্রকৃত উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা তার একমাত্র চিন্তা থাকে যে, বসে বসে একটি বাজির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই অন্যের মাল হস্তগত কর, যাতে কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজনই নেই। কোনো কোনো মনীষী সর্বপ্রকার জুয়াকেই 'মাইসির' বলেছেন। কারণস্বরূপ বলেছেন যে, এতে অতি সহজে অন্যের মাল হস্তগত হয়। জুয়া খেলা যদি দু'চার জনের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাতেও আলোচ্য ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমান যুগ, যাকে অনভিজ্ঞ, দূরদর্শিতাবিহীন মানুষ উন্নতির যুগ বলে অভিহিত করে থাকে, নতুন নতুন ও রকমারি শরাব বের করে নতুন নতুন নাম দিচ্ছে, স্বাদেরও নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে নানা পদ্ধতিতে তার প্রচলন ঘটাচ্ছে, অনুরূপভাবে জুয়ারও নানা প্রকার পন্থা বের করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক দিক রয়েছে যা সামগ্রিক। এসব নতুন পদ্ধতিতে সম্মিলিতভাবে গোটা জাতির কাছ থেকে কিছু কিছু করে টাকা নেওয়া হয় এবং ক্ষতিটা সকলের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে তা দেখার মতো কিছুই হয় না। আর যে ব্যক্তি এ অর্থ পায়, তা সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ফলে অনেকেই তার ব্যক্তিগত লাভ লক্ষ্য করে জাতির সমষ্টিগত ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। এ জন্য অনেকেই এ নতুন প্রকারের জুয়া জায়েজ বলে মনে করে। অথচ এতেও সেসব ক্ষতিই নিহিত, যা সীমিত জুয়া বিদ্যমান। একদিক দিয়ে জুয়ার এই নতুন পদ্ধতি প্রাচীন পদ্ধতির জুয়া অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এর ফলে জাতির সাধারণ মানুষের ধন সম্পদ দিন দিন কমতে থাকে; আর কয়েকজন পুঁজিপতির মাল বাড়তে থাকে। এতে সমগ্র জাতির সম্পদ কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ খুলে যায়।

পক্ষান্তরে ইসলামি জীবন-ব্যবস্থার বিধান হচ্ছে এই যে, যেসব ব্যবস্থায় সমগ্র জাতির সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে জমা হওয়ার পথ খোলে, সে সবগুলো পন্থাই হারাম। এ প্রসঙ্গে কুরআন ঘোষণা করেছে– كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ 'সম্পদ বণ্টন করার যে নিয়ম কুরআন নির্ধারণ করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ধন-দৌলত যেন কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

তাছাড়া জুয়ার আরো একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, জুয়াও শরাবের মতো পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। পরাজিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং জুয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়। কাজেই কুরআন শরীফ বিশেষভাবে এ ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছে।

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

অর্থাৎ, 'শয়তান শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির ও নামাজ থেকে বিরত রাখতে চায়।

ফিকহ শাস্ত্রের কয়েকটি নিয়ম : এ আয়াতে শরাব ও জুয়ার কিছু আপাত উপকারের কথা স্বীকার করেও তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে বুঝা গেল যে, কোনো বস্তু কিংবা কোনো কাজে দুনিয়ার সাময়িক উকার বা লাভ থাকলেই শরিয়ত একে হারাম করতে পারে না, এমন কথা নয়। কেননা যে খাদ্য বা ঔষধে উপকারের চাইতে ক্ষতি বেশি, তাকে কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত উপকারী বলে স্বীকার করা যায় না। অন্যথা পৃথবীর সবচেয়ে খারাপ বস্তুতেও কিছু না কিছু উপকার নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণসংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছু বা হিংস্র জন্তুর মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে যেসব বস্তুতে উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশি, শরিয়ত সেগুলোকেও হারাম সাব্যস্ত করেছে। চুরি-ডাকাতি, জেনা প্রতারণা এমন কি আছে, যাতে উপকার কিছুই নেই? কেননা কিছু না কিছু উপকার না থাকলে কোনো বুদ্ধিমান এর ধারে কাছেও যেতো না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এসব

কাজে খুবই বেশি লিপ্ত, যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলে বিবেচিত। তাতেই বুঝা যায় যে, প্রতিটি অন্যায় কাজেও কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই আছে। তবে যেহেতু এ সবের উপকারের চাইতে ক্ষতি মারাত্মক, এজন্য কোনো সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এগুলোকে উপকারী বা হালাল বলবে না। ইসলামি শরিয়ত শরাব ও জুয়াকে এই ভিত্তিতেই হারাম বলে ঘোষণা করেছে।

ফিকহের আর একটি আইন : এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, উপকার হাসিল করার চাইতে ক্ষতি রোধ করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বিধেয়। অর্থাৎ, কোনো একটি কাজে কিছু উপকারও হয়, আবার ক্ষতিও হয়, এক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাভ ত্যাগ করতে হবে। এমন উপকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য যা ক্ষতি বহন করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُحِبُّوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح . ب . ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা ভালোবাস।

لَايَزَالُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلزَّوَالُ মূলবর্ণ (ز . و . ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সর্বদা থাকবে।

يُقَاتِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُقَاتَلَةُ মূলবর্ণ (ق . ت . ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা যুদ্ধ করবে।

يَرُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা ফিরিয়ে দিবে।

اسْتَطَاعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সক্ষম হয়।

يَرْتَدِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِدَادُ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ফিরে যায়।

حَبِطَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحَبْطُ মূলবর্ণ (ح . ب . ط) জিনস صحيح অর্থ– এটা নষ্ট হয়ে গেছে।

يَرْجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বাব مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّجَاءُ মূলবর্ণ (ر . ج . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা আশা করে, কামনা করে।

مَنَافِعُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَنْفَعَةٌ অর্থ– লাভ, ফায়েদা।

يُبَيِّنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب . ي . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে বয়ান করে।

تَتَفَكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّفَكُّرُ মূলবর্ণ (ف . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা চিন্তা কর।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ : এখানে اَلْفِتْنَةُ মুবতাদা اَكْبَرُ শিবহে ফে'ল مِنَ الْقَتْلِ জার ও মাজরূর মিলে متعلق. শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলাহ হয়ে খবর, مبتدا ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ : এখানে هُمْ টি মুবতাদা فِيْهَا জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম। خٰلِدُوْنَ শিবহে ফে'ল. শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়াহ হলো।

فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٢٠)

অনুবাদ : (২২০) ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যাপারে, আর মানুষ আপনাকে এতিমদের [ব্যবস্থা] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, তাদের স্বার্থরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা অধিকতর শ্রেয়, আর যদি তোমরা তাদের সাথে ব্যয়বিধান একত্রেই রাখ, তবে তারা তোমাদের ভাই, আর আল্লাহ তা'আলা স্বার্থ-নষ্টকারীকে এবং স্বার্থ রক্ষাকারীকে জানেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারতেন, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٢٢١)

(২২১) আর বিবাহ করো না কাফের নারীদেরকে মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত। আর মুসলমান দাসী কাফের রমণী হতে উত্তম, যদিও সে তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করে, আর নারীদেরকে কাফের পুরুষের সাথে বিবাহ দিও না মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত, আর মুসলমান দাসও কাফের পুরুষের চেয়ে উত্তম যদিও সে তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করে, তারা দোজখের প্রেরণা দেয়, আর আল্লাহ জান্নাত ও ক্ষমার প্রতি প্রেরণা দেন স্বীয় বিধান দ্বারা, আর আল্লাহ মানবমণ্ডলীকে স্বীয় বিধানসমূহ এই জন্য বর্ণনা করেন যেন তারা উপদেশ মতো কাজ করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২২০) فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যাপারে وَيَسْـَٔلُوْنَكَ আর মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে عَنِ الْيَتٰمٰى এতিমদের সম্বন্ধে قُلْ আপনি বলে দিন اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ তাদের স্বার্থরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা অধিকতর শ্রেয় وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ আর যদি তোমরা তাদের সাথে ব্যয়বিধান একত্রেই রাখ فَاِخْوَانُكُمْ তবে তারা তোমাদের ভাই وَاللّٰهُ يَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা জানেন الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ স্বার্থ-নষ্টকারীকে এবং স্বার্থ রক্ষাকারীকে وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আল্লাহ ইচ্ছা করলে لَاَعْنَتَكُمْ তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারতেন اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী حَكِيْمٌ বিজ্ঞানময়।

(২২১) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ আর বিবাহ করো না কাফের নারীদেরকে حَتّٰى يُؤْمِنَّ মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ আর মুসলমান দাসী خَيْرٌ উত্তম مِّنْ مُّشْرِكَةٍ কাফের রমণী হতে وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ যদিও সে তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করে وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ আর নারীদেরকে কাফের পুরুষের সাথে বিবাহ দিও না حَتّٰى يُؤْمِنُوْا মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ আর মুসলমান দাসও خَيْرٌ উত্তম مِّنْ مُّشْرِكٍ কাফের পুরুষের চেয়ে وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ যদিও সে তোমাদের চিত্তাকর্ষণ করে اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ তারা দোজখের প্রেরণা দেয় وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا আর আল্লাহ প্রেরণা দেন اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ জান্নাত ও ক্ষমার প্রতি بِاِذْنِهٖ স্বীয় বিধান দ্বারা وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ আর আল্লাহ মানবমণ্ডলীকে স্বীয় বিধানসমূহ এই জন্য বর্ণনা করেন لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ যেন তারা উপদেশ মতো কাজ করে।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (٢٢٢)

অনুবাদ : (২২২) আর মানুষ আপনার নিকট ঋতুকালীন বিধান জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, তা অপবিত্র বস্তু, সুতরাং ঋতুকালে তোমরা স্ত্রীদের হতে পৃথক থাক, আর তাদের নিকটবর্তী হয়ো না পাক না হওয়া পর্যন্ত, অতঃপর যখন তারা উত্তমরূপে পাক হবে, তখন তাদের নিকট যাতায়াত কর যে স্থান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন তওবাকারীগণকে আর মহব্বত করেন পবিত্রাচারীদেরকে।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢٢٣)

(২২৩) তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ, সুতরাং স্বীয় শস্যক্ষেত্রে আগমন কর যেদিক দিয়ে ইচ্ছা, আর ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য কিছু [নেক কাজ] করতে থাক, আর আল্লাহকে ভয় কর এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, নিশ্চয়, তোমাদেরকে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হতে হবে, আর এরূপ মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٢٤)

(২২৪) আর স্বীয় কসমসমূহ দ্বারা আল্লাহ [-এর নাম]-কে প্রতিবন্ধক বানিওনা। এ সমস্ত কাজের যে, তোমরা কোনো নেক কাজ করবে এবং পরহেজগারী করবে ও মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবে, আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২২২) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ আর মানুষ আপনার নিকট ঋতুকালীন বিধান জিজ্ঞাসা করে قُلْ هُوَ اَذًى আপনি বলে দিন, তা অপবিত্র বস্তু فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ সুতরাং তোমরা স্ত্রীদের হতে পৃথক থাক فِى الْمَحِيْضِ ঋতুকালে وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ আর তাদের নিকটবর্তী হয়ো না حَتّٰى يَطْهُرْنَ পাক না হওয়া পর্যন্ত فَاِذَا تَطَهَّرْنَ অতঃপর যখন তারা উত্তমরূপে পাক হবে فَأْتُوْهُنَّ তখন তাদের নিকট যাতায়াত কর مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ যে স্থান দিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন التَّوَّابِيْنَ তওবাকারীগণকে وَيُحِبُّ আর মহব্বত করেন الْمُتَطَهِّرِيْنَ পবিত্রাচারীদেরকে।

(২২৩) نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ সুতরাং স্বীয় শস্যক্ষেত্রে আগমন কর اَنّٰى شِئْتُمْ যেদিক দিয়ে ইচ্ছা وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ আর ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য কিছু [নেক কাজ] করতে থাক وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর وَاعْلَمُوْٓا এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ নিশ্চয় তোমাদেরকে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হতে হবে وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ আর এরূপ মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

(২২৪) وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ আর আল্লাহ [-এর নাম]-কে বানিওনা عُرْضَةً প্রতিবন্ধক لِّاَيْمَانِكُمْ স্বীয় কসমসমূহ দ্বারা اَنْ تَبَرُّوْا এ সমস্ত কাজের যে, তোমরা কোনো নেক কাজ করবে وَتَتَّقُوْا এবং পরহেজগারী করবে وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ও মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবে وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২২০) قوله وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। যখন পবিত্র কুরআনের এ দুটি আয়াত নাজিল হলো– وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ এবং اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যাদের ঘরে এতিম ছিল, তারা এতিমদের খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ আলাদা করে দিল। তাদের জন্য আলাদা খাবার তৈরি করতেন এবং খাওয়া শেষে যা অবশিষ্ট থেকে যেত তা রেখে দিয়ে তাদেরকেই খাওয়াতেন; কিংবা নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু নিজেরা তার কিছুই স্পর্শ করতেন না। এভাবে বিষয়টি তাদের জন্য বেশ জটিল হয়ে দাঁড়াল; তখন তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে পেশ করলে এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

(২২১) قوله وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত মুকাতেল বলেন, আলোচ্য আয়াতটি ইবনে আবি খারছা গানাভী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে জনৈক মুশরিকা মেয়েকে বিবাহ করার অনুমতি চাইলেন মেয়েটি ছিল অত্যন্ত সুন্দরী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়।

(২২২) قوله وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইহুদিদের মাঝে এ প্রথা ছিল যে, তাদের নারীদের [হায়েজ] ঋতুস্রাব হলে তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া উঠা বসা সব বন্ধ করে দিত। অন্য দিকে খ্রিস্টানরা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম অর্থাৎ তারা খাওয়া দাওয়া উঠাবসা স্ত্রীগমন সব করত। একবার ছাবিত বিন ওহদাহ রাসূলে কারীম ﷺ -কে হায়েজা নারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, যে হায়েজ [ঋতুস্রাব] অবস্থায় আমরা নারীদের সাথে কেমন আচরণ করব তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[সূত্র তাফসীরে আহমদী : ৭০]

(২২৩) قوله نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। সবগুলোই এই আয়াতের শানে নুযূল হতে পারে। ১. হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত ইহুদিরা বলত কেউ যদি পিছনের দিক থেকে [যোনীদ্বার] দিয়ে স্ত্রী সঙ্গম করে তবে সন্তান ট্যারা চোখ বিশিষ্ট হয় তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।
২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন একদিন হযরত ওমর (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে এসে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো হালাক হয়ে গেছি, তিনি বললেন, কিসে তোমাকে হালাক করল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, রাতে আমার বাহনটি উল্টো করে ব্যবহার করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল ﷺ তাকে কোনো উত্তর দিলেন না তখন উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। তাতে বলা হয়েছে যে, সামনের দিক থেকে ও পিছনের দিক থেকে উভয়ভাবে স্ত্রী গমন করা যাবে তবে মলদ্বার এবং হায়েজ অবস্থা থেকে বেঁচে থাকবে। –[তিরমিযী : ২]

(২২৪) قوله وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا الخ আয়াতের শানে নুযূল : মেছতাহ নামক এক ব্যক্তি ছিল যাকে হযরত আবূ বকর (রা.) দান দক্ষিণা করতেন। সে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের সাথে জড়িয়ে পড়ে, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আল্লাহর নামে কসম খেয়েছেন যে, মেছতাহকে কোনো দান দক্ষিণা করবেন না। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قوله وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ الخ যে জাতিকে তাদের প্রথা পদ্ধতিতে আসমানি কিতাবের অনুসারী মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস ও আকীদার দিক দিয়ে খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, তারা আহলে কিতাব নয়, সে জাতির স্ত্রীলোক বিয়ে করা জায়েজ নয়। যেমন, আজকাল ইংরেজদেরকে সাধারণ মানুষ খ্রিস্টান বা নাসারা মনে করে, অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের কোনো কেনো আকীদা সম্পূর্ণ মুশরিকদের অনুরূপ। তাদের অনেকেই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত কিংবা আসমানি গ্রন্থ ইঞ্জিলকেও আসমানি গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এমন ব্যক্তিগণ আহলে কিতাব ঈসায়ী নয়। মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোঁজ–খবর না নিয়েই পাশ্চাত্যের মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান মনে করা হয়, কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, তার সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে জায়েজ নয়। আর যদি হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে তবে তাদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যাবে। আজকাল অনেকেই নিজের ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ এবং সামান্য কিছুটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই স্বীয় ধর্মীয় আকীদা নষ্ট করে বসে। কাজেই প্রথমে ছেলের আকীদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা দেওয়া মেয়েদের অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব।

মুসলমান ও কাফেরের পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ : আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমান পুরুষের বিয়ে কাফের নারীর সাথে এবং কাফের পুরুষের বিয়ে মুসলমান নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ কাফের স্ত্রী-পুরুষ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কেননা বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের ভালোবাসা, নির্ভরশীলতা এবং একাত্মতায় পরস্পরকের আকর্ষণ করে। তা ব্যতীত এ সম্পর্কে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর মুশরিকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালোবাসা ও নির্ভরশীলতার অপরিহার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শিরকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় অথবা কমপক্ষে কুফর ও শিরকের প্রতি ঘৃণা তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত সেও কুফর ও শিরকে জড়িয়ে পড়ে যার পরিণতি জাহান্নাম। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের দিকে আহবান করে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে আহবান করেন এবং পরিষ্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ উপদেশ মতো চলে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ মুশরিক শব্দ দ্বার সাধারণ অমুসলমানকে বুঝানো হয়েছে। কারণ কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা এ আদেশে অন্তর্ভুক্ত নয়। ইরশাদ হয়েছে :

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ; তাই এখানে মুশরিক বলতে ঐসব বিশেষ অমুসলমানকেই বুঝানো হয়েছে। যারা কোনো নবী কিংবা আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর ও শিরকের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণটি তো আপাতঃ দৃষ্টিতে সমস্ত অমুসলমানের বেলায়ই প্রযোজ্য হয়, এতদসত্ত্বেও কিতাবীদেরকে এ আদেশের আওতামুক্ত রাখার কারণ কি? উত্তর অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কিতাবীদের সাথে মুসলমানদের মতপার্থক্য অন্যান্য অমুসলমানের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। কেননা ইসলামের আকীদার তিনটি দিক রয়েছে, তাওহীদ, পরকাল ও রিসালাত। তন্মধ্যে পরকালের আকীদার বেলায় কিতাবী নাসারা ও ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে একমত। তাছাড়া আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাও তাদের প্রকৃত ধর্মমতে কুফর। অবশ্য তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি মহব্বত ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে যে শিরক পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা ভিন্ন কথা।

এখন মৌলিক মতপার্থক্য শুধু এই যে, তারা হুজুর ﷺ-কে রাসূল বলে স্বীকার করে না। অথচ ইসলাম ধর্মে এটি একটি মৌলিক আকীদা। এ আকীদা ব্যতীত কোনো মানুষ মুসলমান হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও অন্যান্য অমুসলমানদের তুলনায় কিতাবীদের মতপার্থক্য মুসলমানদের সাথে অনেকটা কম। কাজেই তাদের সংস্পর্শে পথভ্রষ্টতার ভয়ও তুলনামূলকভাবে কম।

তৃতীয়তঃ কিতাবীদের সাথে মতপার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম বলে তাদের মেয়েদের সাথে মুসলমান পুরুষের বিয়েকে জায়েজ করা হলেও তার বিপরীত দিকে মুসলিম নারীদের সাথে কিতাবী অমুসলমানদের বিয়ের ব্যাপারটিও জায়েজ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করলে পার্থক্যটা বুঝা যাবে। মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা দুর্বল। তাছাড়া স্বামীকে তার হাকেম বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। তার আকীদা ও পরিকল্পনা দ্বারা মেয়েদের আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই মুসলমান নারী যদি অমুসলমান কিতাবীদের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে এতে তার বিশ্বাস ও আকীদা নষ্ট হয়ে যাওয়া খুবই সহজ। অপরদিকে তার প্রভাবে স্বামী প্রভাবিত না হয়ে; বরং স্বামীর প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে কোনো অনিয়ম বা আতিশয্যে যদি লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার নিজস্ব ত্রুটি।

চতুর্থতঃ বৈবাহিক সম্পর্ক যে প্রভাব বিস্তার করে তা উভয় পক্ষে একই রকম হয়ে থাকে। সুতরাং এতে যদি এরূপ আশা পোষণ করা হয় যে, মুসলমানদের আকীদায় অমুসলমানদের আকীদা প্রভাবিত হয়ে সে-ই মুসলমান হয়ে যাবে, তবে এর চাহিদা হচ্ছে এই যে, মুসলমান এবং অন্যান্য অমুসলমানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েজ হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যখন কোনো কিছুতে লাভের একটি দিকের পাশাপাশি ক্ষতিরও কারণ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সুস্থবুদ্ধির চাহিদা অনুযায়ী ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা এবং সফলতা লাভের কাল্পনিক সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। হয়তো সে অমুসলমান প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে সতর্কতার বিষয় হলো, মুসলমান প্রভাবিত হয়ে যেন কাফের না হয়ে যায়।

পঞ্চমতঃ কিতাবী ইহুদি ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলমান পুরুষদের বিবাহের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ ঠিক হবে এবং স্বামীর পরিচয়েই সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু হাদীসে রয়েছে, এ বিবাহও পছন্দনীয় নয়। হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসলমান বিবাহের জন্য দীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনুসন্ধান করবে, যাতে করে সে তার ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যকারিণীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে তাদের সন্তানদেরও দীনদার হওয়ার সুযোগ মিলবে। যখন কোনো অধার্মিক মুসলমান মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে অমুসলমানদের মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ কারণেই হযরত ওমর ফারুক (রা.) যখন সংবাদ পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের মুসলমানদের এমন কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, তখন তিনি ফরমান জারি করলেন যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক জীবন তথা ধর্মীয় জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও ক্ষতির কারণ। –[কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মদ]

বর্তমান যুগের অমুসলমান কিতাবী, ইহুদি ও নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক ধোঁকা-প্রতারণা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবাহ এবং মুসলমান সংসারে প্রবেশ করে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। তাদের রচিত অনেক গ্রন্থেও যার স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে। মেজর জেনারেল আকবরের লেখা 'হাদীসে দেফা' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় হযরত ওমর ফারুক (রা.) সুদূর প্রসারী দৃষ্টি শক্তি বৈবাহিক ব্যাপারে সংক্রান্ত এ বিষয়টির সর্বনাশ দিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষতঃ বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যারা ইহুদি ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদমশুমারীর খাতায় যাদেরকে ধর্মীয় দিক দিয়ে ইহুদি কিংবা নাসারা বলে লেখা হয়, যদি তাদের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, খ্রিস্টান ও ইহুদি মতের সাথে তাদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণতঃই ধর্ম বিবর্জিত। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কেও মানে না, তাওরাতকেও মানে না, এমনকি আল্লাহর অস্তিত্বও মানে না, পরকালককেও মানে না। বলাবাহুল্য, বিবাহ হালাল হওয়ার কুরআনি আদেশ এমন সব ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণরূপেই হারাম। বিশেষতঃ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আয়াতে যাদের বুঝানো হয়েছে আজকালকার ইহুদি নাসারা তার আওতায় পড়ে না। সে হিসেবে সাধারণ অমুসলমানদের মতো তাদের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম।

হায়েযা অবস্থায় মহিলাদের থেকে দূরে থাকার বিধান : হায়েযা অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীর কোন্ কোন্ অঙ্গ থেকে দূরে থাকবে এবং কোন্ কোন্ অঙ্গ থেকে উপকার নিতে পারবে এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ নিম্নরূপ–

(১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, স্ত্রীর পূর্ণ শরীর থেকে বিরত থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ বলেছেন, কোনো অঙ্গ বা অংশকে خَاصّ করেননি।

(২) আহনাফ ও মালেকের মতে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশটুকু নিষিদ্ধ। কেননা নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশার সাথে এরূপ করেছেন।

(৩) ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু যৌনাঙ্গ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, حَلَّ كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الْجِمَاعَ

اَلْمَحِيْضِ -এর **অর্থ :** مَحِيْض অর্থ যখন حَيْض হয়, তখন এটা মাসদার। কারো মতে ইস্ম। কারো মতে এটা حَيْض -এর স্থান ও কালের রূপক নাম। এর মূল অর্থ প্রবাহিত হওয়া। এ অর্থে حَوْض বলা হয়। কেননা পানি তাতে প্রবাহিত হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

হায়েযের সময় : ওলামায়ে কেরাম হায়েযের মুদ্দাত নিয়ে মতভেদ করেছেন। যেমন–

(ক) ইমাম আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর মতে কমপক্ষে তিন দিন আর উর্ধ্বে দশ দিন। কেননা হাদীস শরীফে আছে– اَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ

(খ) ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেন, কমপক্ষে একদিন আর উর্ধ্বে পনেরো দিন।

(গ) ইমাম মালেকের মতে বেশি ও কমের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। এটা মহিলার অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

ঋতুস্রাবাবস্থায় সঙ্গমের কাফ্ফারা : কোনো লোক ভুলবশত ঋতুস্রাবাবস্থায় রতিক্রিয়া করে ফেললে ইমাম আহমদের মতে অর্ধেক দিনার কাফ্ফারা দিতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও জমহুর ওলামার মতে এরূপ কাজে কোনো কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে এহেন অশালীন কাজের জন্য খাঁটি তওবা করতে হবে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

قوله فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ **-এর অর্থ :** তোমরা মেয়েদের হায়েযা অবস্থায় তাদের সাথে মেলামেশা করবে না। দূরে থাকবে অথবা হায়েযের স্থান থেকে দূরে থাকবে। এখানে اعْتِزَالٌ অর্থ– সঙ্গম না করা। তবে উঠাবসা ও স্পর্শ করা জায়েজ, বরং লজ্জাস্থান ছাড়া বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ফায়দা গ্রহণ করা বৈধ। –[ফাতহুল কাদীর]

حَرْثٌ **-এর তাৎপর্য :** حَرْثٌ শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীর যোনি ছাড়া কোনো রাস্তায় সঙ্গম করা বৈধ নয়। কেননা এটা সন্তান-সন্ততি এবং বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্র। যেমনিভাবে ক্ষেত শস্য উৎপাদনের স্থান। উভয়টির মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য রয়েছে। জমিনে বীজ বপন করলে চারা গজায়, এমনিভাবে জরায়ুতে বীর্য রাখলে সন্তান জন্মে। অতএব যে স্থানে বীর্য রাখলে সন্তান জন্মিবে না, সে স্থানে সঙ্গম বৈধ হতে পারে না। –[ফাতহুল কাদীর]

قوله فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ**-এর ব্যাখ্যা :** মোল্লা জীয়ন তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন, এখানে أَنَّى শব্দটি كَيْفَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ হবে, সহবাস প্রক্রিয়ায় ইচ্ছামতো স্ত্রীর সাথে সঙ্গম কর। চাই তা স্ত্রীর পিছনে থেকে সামনের রাস্তা দিয়ে হোক, অথবা বসিয়ে, চিৎ করে শুইয়ে, দাঁড়িয়ে, স্ত্রীকে নিচে রেখে বা বুকের উপরে রেখে, যেভাবে ইচ্ছে ও সুবিধা হয় সেভাবে সহবাস কর। কারণ তাদের ব্যবহারের পদ্ধতিতে তোমাদের এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু শর্ত হলো, সর্বাবস্থায় স্ত্রীর যোনি পথে সঙ্গম করতে হবে।

قوله وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ **-এর মর্মার্থ :** এর অর্থ হলো– তোমরা দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগবিলাস, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি নিয়ে আনন্দে মত্ত থেকো না; বরং আখেরাতে অনন্ত সুখ লাভের জন্য নেক আমল থেকে কিছু আগে ভাগেই আল্লাহর কাছে প্রেরণ কর, যাতে তা তোমাদের জন্য আখেরাতে কাজে আসে। অথবা, এর অর্থ হলো নিজের বংশ রক্ষার চেষ্টা করো যেন এরা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং তাদেরকে উন্নত ইসলামি চরিত্র ও দীন ইসলাম শিক্ষা প্রদান করবে। অথবা, এর অর্থ হলো, সঙ্গম প্রক্রিয়ায় নিজেদের কল্যাণার্থে পূর্বাহ্নে বিসমিল্লাহ পড়ে নিও।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَسْئَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س . أ . ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তারা জিজ্ঞাসা করবে।

تُخَالِطُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মূলবর্ণ (خ . ل . ط) মাসদার المخالطة জিনস صحيح অর্থ– তোমরা একত্রিত করে নাও।

شَاءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং مهموز لام অর্থ– সে চেয়েছে।

اَعْنَتَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْنَاتُ মূলবর্ণ (ع . ن . ت) জিনস صحيح অর্থ– সে কষ্ট দিয়েছে।

لَاتُنْكِحُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْكَاحُ মূলবর্ণ (ن . ك . ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা বিবাহ করো না।

يَدْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা আহবান করবে।

يَتَذَكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّذَكُّرُ মূলবর্ণ (ذ . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

تَطَهَّرْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّطَهُّرُ মূলবর্ণ (ط . ه . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা পবিত্র হয়েছে।

فَأْتُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– তোমরা আস।

يُحِبُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح . ب . ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে মহব্বত করে।

التَّوَّابِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل مبالغة বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তওবাকারীগণ।

مُلٰقُوْ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اَلْمُفَاعَلَةُ মাসদার اَلْمُلَاقَاةُ মূলবর্ণ (ل . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সাক্ষাৎকারীগণ।

تَبَرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبِرُّ মূলবর্ণ (ب . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা সৎকাজ করবে।

تَتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা আত্মসংযম করবে।

وَتُصْلِحُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصْلَاحُ মূলবর্ণ (ص . ل . ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা শান্তি স্থাপন করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ : এখানে وَاوْ টি হরফে আতফ, আর ل টি তাকীদের জন্য ব্যবহৃত। عَبْدٌ মাওসূফ مُؤْمِنٌ সিফাত, মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা, خَيْرٌ টি শিবহে ফে'ল مِنْ مُشْرِكٍ জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক, শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলাহ হয়ে খবর, অবশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হলো।

قوله اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ : এখানে اُولٰٓئِكَ টি মুবতাদা يَدْعُوْنَ ফে'ল এতে هُمْ যমীর ফা'য়েল اِلَى النَّارِ জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক। ফে'ল ও ফা'য়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية خبرية হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়ায়ে খবরিয়াহ হলো।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (٢٢٥)

অনুবাদ (২২৫) আল্লাহ কৈফিয়ত চাবেন না। তোমাদের শপথসমূহের মধ্যে অযথা শপথের জন্য, কিন্তু কৈফিয়ত চাবেন তার যা তোমাদের অন্তরসমূহ [মিথ্যা বলার] ইচ্ছা করেছে, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَاۗءُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٢٢٦)

(২২৬) যারা কসম করে বসে স্বীয় পত্নীদের সাথে [তাদের নিকট না যাওয়ার] তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে, অতএব, তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন, অনুগ্রহ করবেন।

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٢٧)

(২২৭) আর যদি একেবারে পরিত্যাগ করারই দৃঢ় সঙ্কল্প করে থাকে, তবে আল্লাহ পাক শ্রবণ করেন, জানেন।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۗءٍ ۭ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۭ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٢٨)

(২২৮) আর তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ বিরত রাখবে নিজেদেরকে তিন ঋতু পর্যন্ত, আর সেই নারীদের জন্য হালাল নয় গোপন করা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ পাক তাদের জরায়ুর মধ্যে যদি ঐ নারীগণ আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, আর তাদের স্বামীগণ তাদেরকে পুনঃ গ্রহণ করার অধিকার রাখে ঐ ইদ্দতের মধ্যে, যদি ইচ্ছা করে পরস্পরে সদ্ভাবে থাকার, আর নারীদেরও [পুরুষদের উপর] তদ্রূপ দাবি আছে যদ্রূপ ঐ নারীদের উপর [পুরুষদের দাবি] আছে [শরিয়তের] নিয়ম অনুযায়ী, আর পুরুষদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে নারীদের উপর; আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

(২২৫) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ কৈফিয়ত চাবেন না بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ তোমাদের শপথসমূহের মধ্যে অযথা শপথের জন্য وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ কিন্তু কৈফিয়ত চাবেন তার بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ যা তোমাদের অন্তরসমূহ [মিথ্যা বলার] ইচ্ছা করেছে وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ আর আল্লাহ ক্ষমাশীল حَلِيْمٌ সহিষ্ণু।

(২২৬) لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ যারা কসম করে বসে مِنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ স্বীয় পত্নীদের সাথে تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। فَاِنْ فَاۗءُوْ অতএব, তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে فَاِنَّ اللّٰهَ তবে আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ ক্ষমা করে দিবেন رَّحِيْمٌ অনুগ্রহ করবেন।

(২২৭) وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ আর যদি একেবারে পরিত্যাগ করারই দৃঢ় সঙ্কল্প করে থাকে فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ তবে আল্লাহ পাক শ্রবণ করেন عَلِيْمٌ জানেন।

(২২৮) وَالْمُطَلَّقٰتُ আর তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ বিরত রাখবে নিজেদেরকে ثَلٰثَةَ قُرُوْۗءٍ তিন ঋতু পর্যন্ত وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ আর সেই নারীদের জন্য হালাল নয় اَنْ يَّكْتُمْنَ গোপন করা مَا خَلَقَ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন اللّٰهُ আল্লাহ পাক فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ তাদের জরায়ুর মধ্যে اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ যদি ঐ নারীগণ ঈমান রাখে بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি وَبُعُوْلَتُهُنَّ আর তাদের স্বামীগণ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ তাদেরকে পুনঃ গ্রহণ করার অধিকার রাখে فِيْ ذٰلِكَ ঐ ইদ্দতের মধ্যে اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا যদি ইচ্ছা করে পরস্পরে সদ্ভাবে থাকার وَلَهُنَّ আর নারীদেরও তদ্রূপ দাবি আছে مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ যদ্রূপ ঐ নারীদের উপর আছে بِالْمَعْرُوْفِ নিয়ম অনুযায়ী وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ আর পুরুষদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে নারীদের উপর وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

الطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٢٢٩)

অনুবাদ : (২২৯) এই তালাক দুইবার, অতঃপর রাখা নিয়মানুযায়ী অথবা বর্জন করা সদ্ভাবে, আর তোমাদের জন্য তা হালাল নয় যে, গ্রহণ কর সামান্য কিছুও তা হতে যা তোমরা [মহরানা স্বরূপ] তাদেরকে দিয়েছিলে, অনন্তর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, আল্লাহর বিধানসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না; অতএব, যদি তোমাদের এই আশঙ্কা হয় যে, উভয়ে আল্লাহর বিধানসমূহ কায়েম রেখে চলতে পারবে না, তবে উভয়েরই কোনো পাপ হবে না, ঐ বিনিময় গ্রহণে যা প্রদান করে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করে নেয়, এটা আল্লাহর বিধানসমূহ সুতরাং তোমরা এর সীমালঙ্ঘন করো না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানসমূহের সীমালঙ্ঘন করে, বস্তুত এরূপ লোকই নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(২২৯) اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ এই তালাক দুইবার فَاِمْسَاكٌ অতঃপর রাখা بِمَعْرُوْفٍ নিয়মানুযায়ী اَوْ تَسْرِيْحٌ অথবা বর্জন করা بِاِحْسَانٍ সদ্ভাবে وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ আর তোমাদের জন্য তা হালাল নয় যে اَنْ تَاْخُذُوْا গ্রহণ কর مِمَّاۤ তা হতে যা اٰتَيْتُمُوْهُنَّ তোমরা [মহরানা স্বরূপ] তাদেরকে দিয়েছিলে شَيْـًٔا সামান্য কিছুও اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ অনন্তর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ আল্লাহর বিধানসমূহ কায়েম রাখতে পারবে না فَاِنْ خِفْتُمْ অতএব, যদি তোমাদের এই আশঙ্কা হয় যে اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ উভয়ে আল্লাহর বিধানসমূহ কায়েম রেখে চলতে পারবে না فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا তবে উভয়েরই কোনো পাপ হবে না فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ঐ বিনিময় গ্রহণে যা প্রদান করে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করে নেয় تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর বিধানসমূহ فَلَا تَعْتَدُوْهَا সুতরাং তোমরা এর সীমালঙ্ঘন করো না وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানসমূহের সীমালঙ্ঘন করে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ বস্তুত এরূপ লোকই নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২২৬) قوله لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (রা.) বর্ণনা করেন, ইসলামের পূর্ব যুগের লোকেরা স্ত্রীদেরকে মানসিক কষ্ট দেওয়ার লক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করত কিন্তু তালাক দিত না। যেন সে অন্য স্বামী গ্রহণ করার সুযোগ না পায়। এ প্রথাকে ঈলা বলা হয়। এ ধরনের নিষ্ঠুর প্রথা বিলোপ করণার্থে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(২২৮) قوله وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা.) বলেন, যখন রাসূল ﷺ -এর যুগে আমি তালাকপ্রাপ্তা হলাম তখন তালাকপ্রাপ্তা নারীদের কোনো ইদ্দত ছিল না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[মুখতাসার ইবনে কাছীর : ২০২]

(২২৯) قوله اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইসলামের প্রথম যুগে লোকেরা তার স্ত্রীদেরকে অসংখ্যবার তালাক দিত। এবং নারীদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইদ্দতের ভিতরে তাকে পুনরায় গ্রহণ করে নিত। একবার এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে তালাকও দিব না যে আমার থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর কোনো দিন তোমার পাশেও আসব না। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল কিভাবে? স্বামী বলল, তোমাকে তালাক দিয়ে দিব যখনই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে ফিরিয়ে নিব। মহিলা গিয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে অভিযোগ করল তখন এ আয়াত নাজিল হলো।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে জুরাইয (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত ছাবেত বিন কায়েস ও হাবিবা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হাবিবা তার স্বামীর ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর দরবারে অভিযোগ করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন, তাহলে কি তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে [মহররূপে] নেওয়া বাগানটি ফিরিয়ে দিবে? তিনি সম্মতি জানালেন, তখন নবী করীম ﷺ স্বামীকে ডেকে এ প্রস্তাব শুনালেন। স্বামী আরজ করলেন, সেটি কি আমার জন্য হালাল হবে? ইরশাদ করলেন, হাঁ। স্বামী আরজ করলেন, তাহলে আমি তাই করে নিলাম। তখন এ আয়াত নাজিল হলো। –[লুবাব, ইবনে জারীর]

(২২৯) قوله وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম ইবনে কাছীর ও তাবারী বর্ণনা করেন, একদিন এক মহিলা যার নাম জামিলা বিনতে আব্দুল্লাহ, আর বুখারীর বর্ণনায় জামিলা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং আবূ দাউদের বর্ণনায় হাফসা বিনতে সাহল রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসে তার স্বামী সাবিত ইবনে কায়স সম্পর্কে অভিযোগ করে এবং মুখে চপেটাঘাতের চিহ্ন দেখায়। অতঃপর বলে যে, আমি তার ঘরে থাকব না। রাসূল ﷺ সাবিতকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসি। রাসূল (সা.) জামিলাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমার স্বামী সদ্ব্যবহারে অন্যান্য পুরুষদের তুলনায় অতুলনীয়; কিন্তু তার প্রতি আমার স্বাভাবিক ঘৃণা রয়েছে। কারণ সে বেটে, কালো এবং কুৎসিত। তাই আমাকে পৃথক করে দিন। রাসূল ﷺ জামিলাকে বললেন, যে বাগানটি তোমাকে সাবিত মহর হিসেবে দান করেছে, তা কি ফেরত দিবে? জামিলা বলল, বাগান কেন, আমি এর চেয়েও বেশি দিতে প্রস্তুত। রাসূল ﷺ বললেন, মোহর থেকে বেশি নেওয়া যাবে না। তারপর রাসূল ﷺ সাবিতকে বললেন, বাগান ফিরিয়ে নাও এবং এর পরিবর্তে তাকে তালাক দিয়ে দাও। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

يَمِيْن **বা শপথের সংজ্ঞা :** يَمِيْن [ইয়ামীন]-এর আভিধানিক অর্থ শপথ করা, আর পরিভাষায় কোনো কাজ না করার বা করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ [দৃঢ় অঙ্গীকার] করা।

শপথের প্রকারভেদ : শপথ ৩ প্রকার ঃ (১) গুমূস (২) মুনআকিদাহ (৩) লাগব।

(১) **গুমূস :** অতীত বিষয় সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করাকে গুমূস বলে। এ ধরনের মিথ্যা শপথ করা মারাত্মক গুনাহ। তার জন্য তওবা ও ইস্তেগফার করা জরুরি কিন্তু কোনো প্রকার কাফফারা জরুরি নয়। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ প্রকার কসমেরও কাফফারা দিতে হয়।

(২) **মুনআকিদাহ :** ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ করা বা না করার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করা। এ ধরনের শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

(৩) **লাগব :** কোনো অতীত বিষয় সম্বন্ধে অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে মিথ্যা শপথ করাকে লাগব বলে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও বিশিষ্ট সম্প্রদায়গণ বলেন, কোনোরূপ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যহীনভাবে কথায় কথায় আল্লাহর নামে শপথ করাকে লাগব বলে, এতে কোনো প্রকার গুনাহও নেই কাফফারাও দিতে হয় না।

শপথের কাফফারা : কসমের কাফ্ফারা তিনটি। এর মধ্যে হতে যে কোনো একটি আদায় করতে হবে। (১) تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ অর্থাৎ একজন গোলাম আজাদ করা। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, গোলাম বা ক্রীতদাস মুসলমান হতে হবে। কিন্তু হানাফী মাযহাব মতে গোলাম মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। (২) كِسْوَةٌ অর্থাৎ দশজন মিসকিনকে অন্তত সতর ঢাকার পরিমাণ এবং পরিধানের উপযোগী কাপড় দান করা। (৩) اِطْعَام অর্থাৎ দশ জন মিসকিনকে দু'বেলা তৃপ্তিজনক আহার করানো।

উপরিউক্ত তিনটি বিধানের কোনো একটি পালন করার সামর্থ্য না থাকলে একাধিকক্রমে তিনটি রোজা রাখা। কিন্তু সামর্থ্য থাকা অবস্থায় রোজা দ্বারা কাফফারা আদায় হবে না।

আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মাসআলা :

১. চরম যৌন উত্তেজনবশতঃ ঋতুকালীন অবস্থায় সহবাস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভালো করে তওবা করে নেওয়া ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে সাথে কিছু দান খয়রাত করে দিলে তা উত্তম।
২. পশ্চাদ পথে [অর্থাৎ যোনিপথ ছাড়া গুহ্যদ্বার দিয়ে] নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হারাম।

৩. 'লাগব-কসম' এর দু'টি অর্থ— একটি হচ্ছে এই যে, কোনো অতীত বিষয়ে মিথ্যা শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মতো সঠিক বলেই মনে করে না। উদাহরণতঃ নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে, 'যায়েদ এসেছে' কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কোনো ভবিষ্যত বিষয়ে এভাবে কসম করে বসল যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু অথচ অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'কসম' বেরিয়ে গেছে এরকম, এতে কোনো পাপ হবে না। আর সে জন্য একে 'লাগব' বা 'অহেতুক' বলা হয়েছে। আখেরাতে এজন্য কোনো জবাবদিহী করতে হবে না। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহীর কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সে সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় 'গুমূস', এতে পাপ হয়। তবে ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের প্রেক্ষিতে কোনো কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর উল্লিখিত অর্থে 'লাগব' কসমের জন্যও কোনো কাফ্ফারা নেই। এ আয়াতে এ দু'রকমের কসম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; 'লাগব' এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যাতে কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর একে 'লাগব' [অহেতুক] এজন্য বলা হয় যে, এতে পার্থিব কেনো কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয় না। এ অর্থে 'গুমূস' কসমও এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাতে পাপ হলেও কোনো রকম কাফ্ফারা দিতে হয় না। এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয়, তাকে বলা হয় 'মুনআকিদাহ'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি 'আমি অমুক কাজটি করব' কিংবা অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব' বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাতে তাকে কাফ্ফারা দিতেই হবে।

৪. যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে—

- প্রথমতঃ কোনো সময় নির্ধারণ করল না।
- দ্বিতীয়তঃ চার মাস সময়ের শর্ত রাখল।
- তৃতীয়তঃ চার মাসের বেশি সময়ের শর্ত আরোপ করল। অথবা
- চতুর্থতঃ চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখল। বস্তুতঃ ১ম, ২য়, ও ৩য় দিকগুলোকে শরিয়তে ঈলা বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছে চলে আসে। তাহলে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙ্গে, তাহলে সে স্ত্রীর উপর 'তালাকে কাতয়ী' বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ, পুনঃবার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া জায়েজ থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েজ হয়ে যাবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথ অটুট থাকবে। –[বয়ানুল কুরআন]

স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও মর্যাদা : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরিয়তী মূলনীতি হিসেবে গণ্য। এ আয়াতের পূর্বাপর কয়েকটি রুকূ'তে এ মূলনীতিই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা : ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। যা অনুধাবন করে নেওয়ার পর নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি ন্যায়ানুগ ও মধ্যমপন্থি জীবন ব্যবস্থার চাহিদাও ছিল তাই এবং এটাই হচ্ছে সে স্থান বা মর্যাদা, যার কম-বেশি করা কিংবা যাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির জন্যই বিরাট আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দুটি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দুটো বস্তুই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ। আরো একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দুটো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং উৎকর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বংসের রূপ পরিগ্রহ করে।

কুরআন মানুষকে একটা জীবন-বিধান দিয়েছে। তাতে উল্লিখিত দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফলাফল হতে পারে এবং যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে; সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বন্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা এসব একটা পৃথক বিষয় যাকে 'ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরি, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশি।

প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে: "যেহেতু আল্লাহ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে, তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।"

ইসলামপূর্ব সামজে নারীর স্থান : ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশি ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মতো তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে–শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোনো রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মিরাশের অধিকারিণী হতো না; বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন, কোনো জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোনো স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশি, যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারবে; তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিলনা। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোনো কোনো লোক এমনও ছিল, যারা নারীর মানব-সত্তাকেই স্বীকার করত না।

ধর্ম-কর্মেও নারীদের জন্য কোনো অংশ ছিল না, তাদেরকে ইবাদত-উপাসনা কিংবা জান্নাতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোনো কোনো সংসদে পরস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হলো অপবিত্র এক জানোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নেই। সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়াকে কৌলিণ্যের কারণ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনোটিই আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। কোনো কোনো জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেই তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হবে। মহানবী ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণী হিসেবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না। 'হযরত রাহমাতুল্লিল আলামীন' ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছেন। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরজ করেছে। বিয়ে–শাদী ও ধন–সম্পদে তাদেরক স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে, কোনো ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোনো অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোনো পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। তাদের সন্তুষ্টিবিধানকেও শরিয়তে মুহাম্মদী ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

বর্তমান ফেতনা-ফ্যাসাদের মূল কারণ : স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে

সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়াও নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও ঘরের কাজ-কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়াবিবাদ এবং নানা রকমের ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য কুরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে। অন্যকথা বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেভাবে ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল। অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আর একটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফ্যাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে। আরবদের মধ্যে একটা প্রবাদ রয়েছে– اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفَرِّطٌ অর্থাৎ, "মূর্খ লোক কখনো মধ্যপন্থা অবলম্বন করে না। যদি সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকে, তবে হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার পর্যায়ে চলে আসে।" বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে। যে নারীকে সব জাতি এক সময় মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজি ছিল না, সে জাতিগুলোই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত আল কুরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফেতনা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস থেকে ফেতনা-ফ্যাসাদ ছড়াচ্ছে সেদিকে কারো লক্ষ্যই নেই।

যদি আজ ফেতনা-ফ্যাসাদের কারণ উদঘাটনের জন্য কোনো নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে স্ত্রীলোকের বেপরোয়া চাল-চলন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অহংপূজার প্রভাব বড় বড় বুদ্ধিমান দার্শনিক চক্ষুকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে। অঙ্গ-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোনো কল্যাণকর চিন্তা বা পন্থাকেও সহ্য করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে রাসূল ﷺ -এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মাসআলা : এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করার পথ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে নিজের অধিকার আদায় করার চাইতে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হবারও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তা যদি হয়, তবে বিনা তাকিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায় করতে তৎপর, অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি আদৌ সচেতন নয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃষ্টি হতে থাকে।

যদি কুরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে বাইরে অর্থাৎ সারা বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য : সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা মানবচরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই দেওয়া হয়নি; বরং তা পালন করাও ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। এরই বর্ণনা اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা আল্লাহর নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপর হয়ে থাকে। তাই, পরকালের ব্যাপারে দুনিয়ার মতো স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোনো কোনো স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদার যোগ্য।

উল্লিখিত ভূমিকার পরে আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাক। ইরশাদ হচ্ছে– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ "তাদের অধিকার পুরুষের দায়িত্বে, যেভাবে পুরুষের অধিকার তাদের দায়িত্বে।" এতে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পুরুষ তো নিজের ক্ষমতায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না।

এতে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরুষের পক্ষে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করা উচিত। তাই مِثْلُ শব্দ ব্যবহার করে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্যের সমতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক হতে হবে। কেননা প্রকৃতিগতভাবেই তা ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব। এ কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে অবহেলা করলে সমভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

লক্ষ্যণীয় যে, কুরআনের ছোট একটি বাক্যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের মতো বিরাট বিষয়কে সন্নিবেশ করা হয়েছে। কেননা এ আয়াতেই নারীর সমস্ত অধিকার পুরুষের উপর এবং পুরুষের সমস্ত অধিকার নারীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত] এ বাক্য শেষে بِالْمَعْرُوْفِ শব্দ ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, অধিকার আদায় প্রচলিত ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ 'মারুফ' শব্দের অর্থ এমন বিষয় যা শরিয়ত অনুযায়ী নাজায়েজ নয় এবং সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী যাতে কোনো রকম জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। সারকথা, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়ম জারি করাই যথেষ্ট নয়; বরং প্রচলিত সাধারণ প্রথা-প্রচলনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথা অনুযায়ী কারো আচরণ অন্যের পক্ষে কষ্টের কারণ হলে তা জায়েজ হবে না। যথা বদমেজাজী অনুকম্পাহীনতা ইত্যাদি। এসব ব্যাপার আইনের আওতায় আসতে পারে না। কিন্তু بِالْمَعْرُوْفِ শব্দটি দ্বারা এসব ব্যাপারই বুঝানো হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে– وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, উভয় পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর এক স্তর বেশি মর্যাদা দান করেছেন। এতে একটি বিরাট দর্শন রয়েছে, যার প্রতি আয়াতের শেষ বাক্য وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছুটা উচ্চমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই তাদের অতি সতর্কভাবে ধৈর্যের সাথে কাজ করা আবশ্যক। যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কিছুটা গাফলতিও হয়ে যায়, তবে তারা তা সহ্য করে নিবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে মোটেই অবহেলা করবে না। –[কুরতুবী]

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় : বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত আদেশ বা হুকুম কুরআনের অনেক আয়াতেই এসেছে। তবে এ কয়টি আয়াতে তালাক সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর তা বুঝবার জন্য প্রথমে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের তাৎপর্য বুঝতে হবে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক : বিয়ের একটি দিক হচ্ছে এই যে, এটি পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তি। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি সুন্নত বা প্রথা ও ইবাদত। তবে সমগ্র উম্মত এতে একমত যে, বিয়ে সাধারণ লেন-দেন ও চুক্তির উর্ধ্বে একটা পবিত্র বন্ধন ও বটে, যেহেতু এতে একটি সুন্নত ও ইবাদতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাখা হয় না।

প্রথমতঃ যে কোনো স্ত্রীলোকের সাথে যে কোনো পুরুষের বিয়ে হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে শরিয়তের একটি বিধান রয়েছে। সে বিধানের ভিত্তিতে কোনো কোনো স্ত্রীলোকের বিয়ে কোনো কোনো পুরুষের সাথে হওয়া নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ বিয়ে ব্যতীত অন্যসব ব্যাপার সমাধা করার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়। একমাত্র মতবিরোধের সময়েই সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে এর সম্পাদনকালেই সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি একজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও

দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী ব্যতীত কোনো নারী এবং পুরুষ পরস্পর বিয়ের কাজ সম্পাদন করে এবং উভয়পক্ষের কেউ তা অস্বীকারও না করে, তবুও শরিয়তের বিধানমতে এ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে– যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ততঃ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে 'ইজাব ও কবুল' না হয়। বিয়ের সুন্নত নিয়ম হলো, সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থির করা। এমনিভাবে এতে আরো অনেক শর্তাবলি ও নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ অন্যান্য ইমামগণের মতে, বিয়ের ক্ষেত্রে লেন-দেন চুক্তির গুরুত্ব অপেক্ষা ইবাদত ও সুন্নতের গুরুত্ব অনেক বেশি। এ মতের সমর্থনে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের অনেক দলিল উদ্ধৃত করেছেন।

বিয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তালাক সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ করা দরকার। তালাক বিয়ের চুক্তি ও লেন-দেন বাতিল করাকে বুঝায়। ইসলামি শরিয়ত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে ইবাদতের গুরুত্ব বেশি দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশি, যেভাবে খুশি তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না; বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মতো কোনো অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এজন্যই এ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে যেসব কারণের উদ্ভব হয়, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় সে সমস্ত কারণ নিরসনের জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকটি বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের যে উপদেশ রয়েছে, সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, যাতে এ সম্পর্ক দিন দিন প্রগাঢ় হতে থাকে এবং কখনো ছিন্ন হতে পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বুঝাবার চেষ্টা, অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিস সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে। حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا আয়াতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে সালিস সাব্যস্ত করার নির্দেশটিও একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বিষয়টিকে যদি পরিবারের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তিক্ততা এবং মনের দূরত্ব আরো বেশি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত বড় আজাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এ জন্য ইসলামে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলামি শরিয়ত অন্যান্য ধর্মে মতো বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশি, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেওয়া হয়েছে, এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেওয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক, বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশি তালাকের কারণ হতে না পারে।

তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর জুলুম-অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যও রয়েছে। তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহবিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেওয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারগ অবস্থাতেই এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ অর্থাৎ, "আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক।"

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে না। এ হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতেই ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র অবস্থায়ও যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়ে থাকে, তবে এমতাবস্থায় এজন্য তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ, যদি তালাক দিতেই হয়, তবে এমন সময় তালাক দাও, যাতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ না হয়। ঋতু

অবস্থায়ও তালাক দিলে চলতি ঋতু ইদ্দত গণ্য হবে না। চলতি ঋতুর অন্তে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। আর যে তহুর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তহুরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরো দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেওয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহুর ঠিক করার আরো একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেওয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে। তৃতীয় শর্ত রাখা হয়েছে যে, বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মতো নয়। বৈষয়িক চুক্তির মতো বিয়ের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয়পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদ্দতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের অনেক সম্পর্কই বাকি থাকে। যেমন, স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না। চতুর্থ শর্ত এই যে, যদি পরিষ্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেওয়া হয়, তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না: বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিয়েই অক্ষুণ্ন থাকে।

তবে এ প্রত্যাহারের অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে কোনো অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক দেবে এবং তা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। এজন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। তবুও বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত তা করতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতে তালাক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথমে ইরশাদ হয়েছে- اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ অর্থাৎ, তালাক হয় দু'বার। অতঃপর এ দু'তালাকের মধ্যে শর্ত রাখা হয়েছে যে, এতে বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায় না; বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহবন্ধনে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা স্বামীর থাকে। বস্তুতঃ ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি তালাক প্রত্যাহার করা না হয়, তবেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়। এ বিষয়কে فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ, হয় শরিয়তের নিয়মানুযায়ী তালাক প্রত্যাহার করা হবে অথবা সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে তার ইদ্দত শেষ হতে দেওয়া হবে, যাতে সে [স্ত্রী] মুক্তি পেতে পারে।

এখনও তৃতীয় তালাকের আলোচনা আসেনি। মধ্যখানে একটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যা এ অবস্থায় আলোচনায় আসতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, কোনো কোনো অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না আবার তার অধিকার আদায় করারও কোনো চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মহর মাফ করিয়ে নেওয়ার বা ফেরত নেওয়ার দাবি করে বসে। কুরআন মাজীদ এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হয়েছে- وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا

অর্থাৎ, "তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেওয়া অর্থ-সম্পদ বা মহর ফেরত নেওয়া হালাল নয়।"

শব্দ বিশ্লেষণ

يُؤْلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْلَاءُ মূলবর্ণ (أ . ل . و) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص واوى অর্থ- তারা শপথ করে।

فَآءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفَيْئُ মূলবর্ণ (ف . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব, مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ- তারা প্রত্যাবর্তন করেছে।

اٰتَيْتُمُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব; مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ- তাদেরকে দিয়েছ।

يَخَافَا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ . و . ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা [দুজন] ভয় করে।

يُقِيْمَا : সীগাহ تثنية مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা [দুজন] কায়েম করে।

افْتَدَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ف . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে ফিদিয়া দিল।

لَاتَعْتَدُوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না।

يَتَعَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تفعل মাসদার اَلتَّعَدِّىْ মূলবর্ণ (ع . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ : এখানে لَا يُؤَاخِذُ ফে'ল كُمْ টি مفعول আর اَللّٰهُ শব্দটি فاعل এবং بِاللَّغْوِ টি جار مجرور ও جار মিলে متعلق হয়েছে لَا يُؤَاخِذُ -এর সঙ্গে আর فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ টি جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে উহ্য شبه فعل -এর সাথে। এর পর شبه فعل তার متعلق সহ حال এবার فعل . فاعل . مفعول . حال ও মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

قوله فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ : এখানে اِنَّ টি حرف مشبه بالفعل এবং اَللّٰهَ হলো اِنَّ -এর اسم আর سَمِيْعٌ ও عَلِيْمٌ প্রতিটি اِنَّ -এর خبر সুতরাং اِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ : এখানে واو টি حرف عطف আর اَللّٰهُ হলো مبتدأ এবং غَفُوْرٌ ও حَلِيْمٌ প্রতিটি খবর এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ الخ : এখানে واو টি حرف عطف আর اَلْمُطَلَّقٰتُ শব্দটি مبتدأ আর يَتَرَبَّصْنَ ফে'ল এতে هُنَّ হলো ضمير فاعل আর باء হলো حرف جار এবং اَنْفُسُ হলো مضاف আর هُنَّ হচ্ছে مضاف اليه এখন مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور আর جار ও مجرور মিলে متعلق এবং ثَلٰثَةَ হচ্ছে مضاف আর قُرُوْٓءٍ হলো مضاف اليه এবার مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول فيه হয়েছে। তারপর فعل . فاعل . مفعول فيه ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে গেছে।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يَتَرَاجَعَآ إِنْ ظَنَّآ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

অনুবাদ (২৩০) অনন্তর যদি কেউ [তৃতীয়] তালাক দেয় স্ত্রীকে, তবে এই স্ত্রী তার জন্য হালাল থাকবে না এর পর যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহিতা হয়, অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, তবে তাদের উভয়ের কোনো পাপ হবে না যথারীতি পরস্পর পুনর্মিলনে যদি উভয়ের দৃঢ় ধারণা হয়, আল্লাহর কানুন কায়েম রাখতে পারবে, আর এই সমস্ত আল্লাহর বিধান, আল্লাহ তা বর্ণনা করেন এরূপ লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوٓا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١)

(২৩১) আর যখন তোমরা তালাক প্রদান কর স্ত্রীদেরকে, অতঃপর তারা নিকটবর্তী হয় স্বীয় ইদ্দত শেষ হওয়ার, তখন হয়তো নিয়মানুযায়ী তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে থাকতে দাও অথবা নিয়মানুযায়ী তাদেরকে মুক্তি দাও, এবং তাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবদ্ধ রেখো না এই ইচ্ছায় যে, তাদের প্রতি অত্যাচার করবে, আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে বস্তুত, সে নিজেরই ক্ষতি করবে, আর আল্লাহর হুকুমসমূহকে খেল-তামাশা মনে করো না, আর আল্লাহর নিয়ামতকে যা তোমাদের প্রতি রয়েছে স্মরণ কর, আর সেই কিতাব ও হিকমতকে যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি এই হিসেবে নাজিল করেছেন যে, তা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করছেন, আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় খুব ভালোভাবে জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩০) فَإِنْ طَلَّقَهَا অনন্তর যদি কেউ তালাক দেয় স্ত্রীকে فَلَا تَحِلُّ لَهُ তবে এই স্ত্রী তার জন্য হালাল থাকবে না حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ এর পর যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহিতা হয় فَإِنْ طَلَّقَهَا অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয় فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ তবে তাদের উভয়ের কোনো পাপ হবে না أَنْ يَتَرَاجَعَا যথারীতি পরস্পর পুনর্মিলনে إِنْ ظَنَّآ যদি উভয়ের দৃঢ় ধারণা হয় أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ আল্লাহর কানুন কায়েম রাখতে পারবে وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ আর এই সমস্ত আল্লাহর বিধান يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ আল্লাহ তা বর্ণনা করেন এরূপ লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান।

(২৩১) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ আর যখন তোমরা তালাক প্রদান কর স্ত্রীদেরকে فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ অতঃপর তারা নিকটবর্তী হয় স্বীয় ইদ্দত শেষ হওয়ার فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ তখন হয়তো নিয়মানুযায়ী তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে থাকতে দাও أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ অথবা নিয়মানুযায়ী তাদেরকে মুক্তি দাও। وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا এবং তাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবদ্ধ রেখো না وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ বস্তুত, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। وَلَا تَتَّخِذُوا আর মনে করো না آيَاتِ اللَّهِ আল্লাহর হুকুমসমূহকে هُزُوًا খেল-তামাশা। وَاذْكُرُوا আর স্মরণ কর نِعْمَتَ اللَّهِ আল্লাহর নিয়ামতকে عَلَيْكُمْ যা তোমাদের প্রতি রয়েছে وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি এই হিসেবে নাজিল করেছেন যে يَعِظُكُمْ بِهِ তা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করছেন। وَاتَّقُوا اللَّهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক وَاعْلَمُوا এবং দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় খুব ভালোভাবে জানেন।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (۲۳۲)

(২৩২) আর যখন তোমাদের মধ্যে এরূপ লোক পাওয়া যায় যে, তারা স্বীয় পত্নীগণকে তালাক দিয়েছে তৎপর সেই স্ত্রীগণ স্বীয় নির্ধারিত সময় [ইদ্দত]-ও পূর্ণ করে ফেলে, তখন তোমরা তাদেরকে এই কাজে বাধা দিও না যে, তারা স্বীয় স্বামীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়, যখন পরস্পর সকলে সম্মত হয়ে যায় নিয়মানুযায়ী, এই বিষয় দ্বারা নসিহত করা হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, এই নসিহত কবুল করা তোমাদের জন্য অধিকতর বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার বিষয়, আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩২) وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ আর যখন তোমাদের মধ্যে এরূপ লোক পাওয়া যায় যে, তারা স্বীয় পত্নীগণকে তালাক দিয়েছে فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ তৎপর সেই স্ত্রীগণ স্বীয় নির্ধারিত সময় [ইদ্দত]-ও পূর্ণ করে ফেলে فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ তখন তোমরা তাদেরকে এই কাজে বাধা দিও না اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ যে তারা স্বীয় স্বামীর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয় اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ যখন পরস্পর সকলে সম্মত হয়ে যায় নিয়মানুযায়ী ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ এই বিষয় দ্বারা নসিহত করা হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ এই নসিহত কবুল করা তোমাদের জন্য অধিকতর বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার বিষয় وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৩০) قوله فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমরআতে রেফায়া অর্থাৎ হযরত আয়েশা বিনতে আবদির রহমান এর প্রথম বিবাহ হয় তারই চাচাতো ভাই রিফায়া বিন ওহাব বিন উতাইকের সাথে। পরে সে তাকে তালাক দিয়ে দেয় অতঃপর আব্দুর রহমান বিন সুবাইর কুরাবীর সাথে তার বিয়ে হয়, দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিয়ে দেয়। তখন তিনি রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে এসে আরজ করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আব্দুর রহমান আমাকে মিলনের পূর্বেই তালাক দিয়ে দিয়েছে এখন কি আমি পূর্বের স্বামী রেফায়ার কাছে বিবাহ বসতে পারব? হুজুর ﷺ বললেন, যতক্ষণ না আব্দুর রহমান এর সাথে তোমার মিলন হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। –[বায়যাবী– ১ : ১৫৫, মুখতাসার ইবনে কাসীর – ১ : ২০৮]

(২৩১) قوله وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ছাবেত বিন ইয়াসার নামক জনৈক আনসারী সাহাবী তার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দিলেন। অতঃপর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার তিন দিন পূর্বে তাকে ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তাকে পুনরায় দ্বিতীয় তালাক দিয়ে দিলেন এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আরো এক তালাক দিয়ে দিলেন। যদ্দরুন বিবির প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল এভাবে তালাক দিয়ে নিছক তাকে কষ্ট দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য ছিল এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২৩১) قوله وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আবুদ দরদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জাহেলিয়াতের যুগে কোনো কোনো স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অথবা বাদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলত যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেওয়া বা মুক্তি দিয়ে দেওয়া কোনো আমার উদ্দেশ্যই ছিল না। তখনই উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এতে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে তবুও তা কার্যকারী হয়ে যাবে। এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। –[বায়যাবী– ১ : ১৫৬, ইবনে কাছীর– ১ : ২১০, মাআরেফুল কুরআন : ১২৮]

(২৩২) قوله وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত : তিনি তার ভগ্নিকে জনৈক মুসলমান ব্যক্তির কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার কাছে যতদিন জীবন যাপন করার করলেন। পরে তার স্বামী তাকে এক তালাক দেয়। ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে ফিরিয়ে নেননি। কিন্তু এরপর স্বামীও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন আর তার স্ত্রী ও স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাই অন্যান্য প্রস্তাবকারীদের মধ্যে তিনিও তাকে আবার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তখন ভাই মাকাল (রা.) তাকে বলল হে ইতর, এই মহিলার মাধ্যমে তোমাকে আমি সম্মান দিয়েছিলাম তাকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়ে দিলে। আল্লাহর কসম! তুমি আর কখনো তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। এই তোমার সাথে সম্পর্ক শেষ। রাবী বলেন, আল্লাহ তা'আলা জানতেন এই স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর টানের কথা এবং এই স্বামীর প্রতি ঐ মহিলার টানের কথা তখন আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

মাকাল এ আয়াত শোনার পর বললেন, আমার পরওয়ারদেগারের আদেশ শুনেছি এবং তা শিরোধার্য করে নিচ্ছি যে, এর পর তিনি উক্ত ভগ্নিপতিকে ডেকে আনলেন এবং বললেন তোমার কাছে আমি আমার বোনকে পুনরায় বিয়ে দিচ্ছি আর আমি তোমার সম্মান করছি। –[তিরমিযী– ২ : ১১, মুখতাসার ইবনে কাছীর– ১ : ২]

অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, যাতে মহর ফেরত নেওয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি এবং স্বামী যদি তাই বুঝে , তবে এমতাবস্থায় মহর ফেরত নেওয়া বা তা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেওয়া জায়েজ হবে। এই মাসআলা বর্ণনা করার পর ইরশাদ হয়েছে– فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ অর্থাৎ, এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা এমতাবস্থায় এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সব দিক বুঝে শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে যে, স্ত্রী ইদ্দতের পরে অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোনো কারণে যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

তিন তালাক ও তার বিধান : এ ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তালাক দেওয়ার শরিয়তসম্মত বিধান হচ্ছে বড় জোর দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যাবে। তৃতীয় তালাক দেওয়া উচিত হবে না। আয়াতের শব্দ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ এরপর তৃতীয় তালাককে [যদি] শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে– এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নতুবা বলা উচিত ছিল যে, অর্থাৎ তালাক তিনটি। তাই এর অর্থ হচ্ছে, তৃতীয় তালাক পর্যন্ত পৌঁছা উচিত নয়। আর এ জন্যই ইমাম মালেক এবং অনেক ফকীহ, তৃতীয় তালাক দেওয়ার অনুমতি দেননি। তাঁরা একে তালাকে বিদ'আত বলেন। আর অন্যান্য ফকীহগণ তিন তুহুরে আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দেওয়া জায়েজ বলেন। এসব ফকীহ একেই সুন্নত তালাক বলেছেন। কিন্তু কেউই একথা বলেননি যে, এটাই তালাকের সুন্নত বা উত্তম পন্থা; বরং বিদ'আত তালাক এর স্থলে সুন্নত তালাক শুধু এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কুরআন ও হাদীসের ইরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়, যখন তালাক দেওয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় থাকে না, তখন তালাক দেওয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক তুহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এ এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে। ইদ্দত শেষে হলে পরে বিবাহসম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহগণ একে আহসান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহবাগীণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন।

ইবনে আবি শায়বা তাঁর গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহবন্ধন স্বাভাবিকভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে।

কুরআনের শব্দের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যায়। তবে مَرَّتٰنِ শব্দ দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, এক শব্দে দুই তালাক দেওয়া উচিত নয়; বরং দুই তুহুরে পৃথকভাবে দুই তালাক দিতে হবে। اَلطَّلَاقُ এর দ্বারাই দুই তালাক প্রমাণিত হয়, কিন্তু مَرَّتٰنِ শব্দটি এ নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে যে, দুই তালাক পৃথক পৃথক শব্দে হওয়াই উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে একেবারে দু'টি টাকা দেয়, তবে তাকে দু'বার দিয়েছে বলা যায় না। তেমনি কুরআনের শব্দে দুই বারের অর্থ হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া। –[রূহুল মা'আনী]

যাহোক, কুরআন মাজীদের শব্দের দ্বারা যেহেতু দুই তালাক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, এজন্য ইমাম ও ফকীহগণ একে সুন্নত তরিকা বলে অভিহিত করেছেন্ তৃতীয় তালাক উত্তম না হওয়াও কুরআনের বর্ণনাভঙ্গিতেই বুঝা যায় এবং এতে কোনো মতানৈক্য নেই। রাসূলে আকরাম ﷺ-এর হাদীস দ্বারাও তৃতীয় তালাক নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বলে প্রমাণিত হয়। ইমাম নাসায়ী মুহাম্মদ ইবনে লাবিদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন– 'এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক এক সাথে দিয়েছে– এ সংবাদ রাসূল ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের প্রতি উপহাস করছ? অথচ আমি এখনো তোমাদের মধ্যেই রয়েছি। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতে লাগল। হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে হত্যা করব?

ইবনে কাইয়্যেম এ হাদীসের সনদকে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে সঠিক বলেছেন। –[যাদুল মা'আদ] আল্লামা মাওয়ারদী, ইবনে কাছীর, ইবনে হাজার প্রমুখ সবাই এ হাদীসের সনদকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইমাম মালেক এবং অন্যান্য ফকীহবৃন্দ তৃতীয় তালাককে নাজায়েজ ও বিদ'আত বলেন। অন্যান্য ইমামগণ তিন তুহুরে তিন তালাক দেওয়াকে সুন্নত তরিকা বলে যদিও একে বিদ'আত থেকে দূরে রেখেছেন, কিন্তু এটা যে তালাকের উত্তম পন্থা নয়, তাতে কারো দ্বিমত নেই।

মোটকথা, ইসলামি শরিয়ত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে; বরং শরিয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারগতাবশতঃ যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেওয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়।

এতে আরো সুবিধা হচ্ছে এই যে, পরিষ্কার শব্দে এক তালাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদ্দতের মধ্যে ভালো-মন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়; যদি তারা ভালো মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী বিবাহমুক্ত হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভালো মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পন্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরো এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরিয়তও পছন্দ করে না। তবে এ দু'টি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতোই রয়ে যায়। অর্থাৎ, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে উভয় পক্ষের ঐকমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেওয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাত ছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে নবায়নের এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি তালাকের দু'টি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে– فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ এতে দুটি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন নেই; বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়াই যথেষ্ট। এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিল-মহব্বতের সাথে সংসার জীবনযাপন করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথা স্ত্রীকে ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ দিবে, যাতে বিবাহ-বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেন তালাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ বলা হয়েছে। تَسْرِيْحٌ অর্থ খুলে দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেওয়া বা অন্য কোনো কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আবূ দাউদ (র.) আবূ রজিন আসাদী থেকে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন, কুরআন مَرَّتَانِ বলেছে, তারপর তৃতীয় তালাকের কথা বলেনি কেন? তিনি উত্তর দিলেন যে, পরে যে تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ বলা হয়েছে সেটিই তৃতীয় তালাক।-[রূহুল মা'আনী] অধিকাংশ আলেমের মতে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তৃতীয় তালাক যে কাজ করে, এ কর্ম পদ্ধতিও তাই করে যা ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার না করলেই হয়। আর যেভাবে اِمْسَاكٌ -এর সাথে بِمَعْرُوْفٍ শব্দের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়েই রাখতে হয়, তবে উত্তম পন্থায়ই ফিরিয়ে রাখা হোক। তেমনিভাবে تَسْرِيْحٌ -এর সাথে اِحْسَانٌ শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎলোকের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে, কোনো কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকেন। এমনিভাবে যদি বিবাহ বন্ধনও ছিন্ন করার পর্যায়ে এসে যায়, তবে তা রাগান্বিত হয়ে বা ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে করা উচিত নয়; এহসান ও ভদ্রতার সাথেই তা সম্পন্ন করা উচিত। বিদায়ের সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে উপহার-উপঢৌকন হিসেবে কিছু কাপড়-চোপড়, কিছু টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে বিদায় করবে।

এ ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ

অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী কিছু উপঢৌকন ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে বিদায় করা উচিত।

আর যদি সে এরূপ না করেই তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে শরিয়ত প্রদত্ত তার সমস্ত ক্ষমতা বিনা প্রয়োজনে হাত ছাড়া করে দিল। ফলে তার শাস্তি হচ্ছে এই যে, এখন আর সে তালাকও প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হওয়া ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর কখনো বিয়ে হতে পারবে না।

একত্রে তিন তালাকের প্রশ্ন : এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর এই যে, কোনো কাজের পাপ কাজ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হলেও যাকে গুলি করে বা কোনো অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলি বৈধভাবে করা হলো, কি অবৈধভাবে করা হয়েছে, সে জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। চুরি সব ধর্মমতেই পাপ, কিন্তু যে অর্থ- সম্পদ চোরাই পথে পাচার করা হয়, তা তো হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায় ও পাপের একই অবস্থা যে, এর অন্যায় ও পাপ হওয়া এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরিয়ত-প্রদত্ত উত্তম নীতি-নিয়মের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে প্রয়োজন ব্যতীত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতাকে শেষ করে দেওয়া এবং একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যদিও রাসূল ﷺ-এর অসন্তুষ্টির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এজন্য সমগ্র উম্মত এক বাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েজও বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয়, তবে এর ফলাফলও তাই হবে, বৈধ পথে অগ্রসর হলে যা হয়। অর্থাৎ, তিন তালাক হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহ বন্ধন নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না।

হুজুর ﷺ-এর মীমাংসাই এ ব্যাপারে বড় প্রমাণ যে, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েও তিন তালাক কার্যকরী করেছেন। হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনা বর্ণনা রয়েছে। আর যারা এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতেও তাঁরা হাদীসের সেসব ঘটনার সংগ্রহ করেই একত্রিত করেছেন। সম্প্রতি জনাব মাওলানা আবূ জাহেদ সরফরাজ তাঁর 'উমদাতুল আসার' গ্রন্থে এ মাসআলা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে এ সম্পর্কিত মাত্র দু' তিনটি হাদীস উদ্ধৃত হলো।

ইতঃপূর্বেও দু'তালাক সংক্রান্ত আইন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ইসলামে তালাকের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থাসমূহ কুরআনের দার্শনিক বর্ণনাসহকারে বিবৃত হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে আরো কিছু বিষয় এবং তার আহকাম বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের পর তা প্রত্যাহার ও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা : প্রথম আয়াতের বর্ণিত প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে এই যে, যখন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক তার ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে, তখন স্বামীর দুটি অধিকার থাকে। একটি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার করে তাকে স্বীয় বিবাহেই রেখে দেওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তালাক প্রত্যাহার না করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা।

এ দু'টি অধিকার সম্পর্কে কুরআন শর্ত আরোপ করেছে যে, রাখতে হলে কিংবা ছিন্ন করতে হলে নিয়মানুযায়ী করতে হবে। এতে بِالْمَعْرُوْفِ শব্দটি দু জায়গায়ই পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যাহারের জন্যও কিছু শর্ত

ও নিয়ম-কানুন বর্তমান রয়েছে এবং ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারেও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন বর্তমান। উভয় অবস্থায় যেটাই গ্রহণ করা হোক, শরিয়তের নিয়মানুযায়ী করতে হবে। শুধু সাময়িক খেয়াল-খুশি বা আবেগের তাগিদে কোনো কিছু করা চলবে না। উভয় দিক সম্পর্কেই শরিয়তের কিছু বিধান কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর তারই বিশ্লেষণ করেছেন মহানবী ﷺ-তার হাদীসে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তালাক দেওয়ার পর এই বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ অবস্থা ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিয়েতে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে এ জন্য শরিয়তের নিয়ম হচ্ছে মনোমালিন্যকে অন্তর থেকে দূর করে সুন্দর ও সুখি জীবন যাপন এবং পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করার মানসে করতে হবে, স্ত্রীকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা করা চলবে না। এজন্য আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–
وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا

অর্থাৎ স্ত্রীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখো না।

এ পৃথিবীতেও চিন্তা করলে দেখা যায়, কোনো অত্যাচারী ব্যক্তি কারো প্রতি অত্যাচার করে সাময়িকভাবে আত্মতুষ্টি লাভ করে বটে, কিন্তু তার অশুভ পরিণতিতে তাকে অধিকাংশ সময় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। সে অনুধাবন করুক বা না করুক, অনেক সময় এমন বিপদে পতিত হয় যে, অত্যাচারের ফলাফল দুনিয়াতেই তাকে কিছু না কিছু ভোগ করতে হয়।

কুরআন হাকীমের নিজস্ব একটা দার্শনিক বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে। দুনিয়ার আইন-কানুন ও শাস্তির বর্ণনার ন্যায় কুরআন শুধুমাত্র আইন-কানুন ও শাস্তির কথাই বর্ণনা করে না; বরং একান্ত গুরুগম্ভীরভাবে তার বিধি-বিধানের দার্শনিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং তার বিরোধিতার দরুন মানুষের যে অকল্যাণ হতে পারে, তার এমন ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়, যা দেখে যে লোক মানবতার আবরণ সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলেনি, সে কখনো এসবের দিকে অগ্রসরই হতে পারে না। কেননা প্রত্যেকটি আইন-কানুনের সঙ্গে আল্লাহর ভয় ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

বিয়ে ও তালাককে খেলায় পরিণত করো না : দ্বিতীয় মাসআলা হচ্ছে এই যে, এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াতকে খেলায় পরিণত করো না।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا খেলায় পরিণত করার একটি তাফসীর হচ্ছে, বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় তাফসীর হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াতের যুগে কোনো কোনো লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাঁদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলত, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেওয়া বা মুক্তি দিয়ে দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাজিল হয়। এতে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে, তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, হাসি তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক, দ্বিতীয়টি দাস মুক্তি এবং তৃতীয়টি বিয়ে। হাদীসটি ইবনে মারদুভিয়াহ উদ্ধৃত করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে, আর ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রা.) থেকে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ–

"তিনটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বলা আর হাসি-তামাশাচ্ছলে বলা একই সমান। ১. বিবাহ, ২. তালাক ৩. রাজ'আত বা তালাক প্রত্যাহার।"

এ তিনটি বিষয়ে শরিয়তের আদেশ হচ্ছে এই যে, যদি দু'জন স্ত্রী ও পুরুষ বিয়ের ইচ্ছা ব্যতীতও সাক্ষীর সামনে হাসতে হাসতে বিয়ের ইজাব ও কবুল করে নেয়, তবুও বিয়ে হয়ে যাবে। তেমনি তালাক প্রত্যাহার এবং দাসকে মুক্তিদানের ব্যাপারেও শরিয়তের এই বিধান। এসব ক্ষেত্রে হাসি-তামাশা কোনো ওজররূপে গণ্য হবে না।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্য বিয়েতে বাধা দেওয়া হারাম : দ্বিতীয় আয়াতে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের সাথে করা হয়। তাদেরকে অন্য লোকের সাথে বিয়ে করতে বাধা দেওয়া হয়। প্রথম স্বামী তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। আবার কোনো কোনো পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশ্যে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্ত্রীর অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেওয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশতঃ উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমতো শরিয়ত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেওয়া একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক, অথবা তার অভিভাকদের পক্ষ থেকেই হোক। কিন্তু শর্ত হচ্ছে– إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ : তবে এ হুকুম তখন বর্তাবে, যখন উভয়ে শরিয়তের নিয়মানুযায়ী রাজি হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে রাজি না হয়, তবে কোনো এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। যদি উভয়ে রাজিও হয় আর তা শরিয়ত আইন মোতাবেক না হয়, যথা—বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করতে আরম্ভ করে, অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই যদি পুনর্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের এবং বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকের যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে।

এমনিভাবে কোনো মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত পারিবারিক 'কুফু' বা সামঞ্জস্যহীন স্থানে বা বংশের প্রচলিত মহরের কম মহরে বিয়ে করতে চায়। যার পরিণাম বা কু-প্রভাব বংশের উপর পতিত হতে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রে তারা তাকে বাধা দিতে পারেন। তবে إِذَا تَرَاضَوْا বলে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যায় না।

আয়াতের শেষে তিনটি বাক্যের প্রথমটিতে ইরশাদ হয়েছে– ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

অর্থাৎ, "এ আদেশ সেসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করে।" এতেই ইশারা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের বিশ্বাস করে তাদের জন্য এসব আহকাম যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা এ আদেশ পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে তাদের বুঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে

ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ এসব হুকুমের আনুগত্য তোমাদের জন্য পবিত্রতার কারণ' এতে ইশারা করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা পাপ-মগ্নতা এবং ফেতনা-ফ্যাসাদের কারণ। কেননা বয়ঃপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতি যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অপরদিকে তার সতিত্ব, পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশঙ্কায় ফেলারই নামান্তর। তৃতীয়তঃ সে যদি এই বাধার ফলে কোনো পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার সে পাপের অংশীদার তারাও হবে যারা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে।

আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কুরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি : কুরআনে কারীম এখানে একটি বিধান উপস্থাপন করেছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছামতো বিয়ে করতে বাধা দেওয়া অন্যায়। এ বিধান স্থির করার পর তার বাস্তবায়নকে সহজ করার জন্য এর প্রতি সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ককে তৈরি করার উদ্দেশ্যে তিনটি বাক্য উল্লেখ করেছে। প্রথম বাক্যে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং পরকালে শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে সে বিধান বাস্তবায়নের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যে এ আইন অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে এ আইনের আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তৃতীয় বাক্যে বলে দিয়েছে যে, এই আনুগত্যের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত; এর বিরুদ্ধাচরণের মাঝে কোনো কল্যাণ আছে বলে যদিও তোমরা কখনো ধারণা কর, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতারই ফল।

শব্দ বিশ্লেষণ

سَرِّحُوهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْرِيْح মূলবর্ণ (س ـ ر ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাদেরকে মুক্তি দাও।

لَاتَتَّخِذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা বানিও না।

يَعِظُكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ ظ) জিনস مثال واوى অর্থ– সে উপদেশ দেয়।

اتَّقُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّقَاءَ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اعْلَمُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জেনে রাখ।

تَرَاضَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّرَاضِىْ মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা পরস্পর সম্মত হবে।

يُوْعَظُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ ظ) জিনস مثال واوى অর্থ– উপদেশ দেওয়া হয়।

اَزْكٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلزَّكٰوةُ মূলবর্ণ (ز ـ ك ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– অধিক শুদ্ধ।

اَطْهَرُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلطُّهُوْرُ মূলবর্ণ (ط ـ ه ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অধিক পবিত্র।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর اللّٰهَ শব্দটি اِنَّ এর اسم এবং باء হলো حرف جار আর كُلِّ টি مضاف ও شَيْءٍ ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق مقدم ও عليم টি شبه فعل অবশেষে, شبه فعل ও متعلق মিলে اِنَّ এর خبر হয়েছে, অতঃপর اِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ : এখানে اَنْتُمْ টি সর্বনামটি مبتدأ আর لَا تَعْلَمُوْنَ হলো فعل এবং اَنْتُمْ فاعل ; এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে خبر অবশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَٰلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ (٢٣٣)

অনুবাদ (২৩৩) আর জননীগণ স্বীয় সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসরকাল স্তন্য দান করবে, এই নির্দিষ্ট সময় তারই জন্য, যে স্তন্য দানের মুদ্দত পূর্ণ করতে চায়, আর যার সন্তান তার দায়িত্বে স্তন্য দানকারিণীদের খোরপোষের ভার নিয়মানুযায়ী বর্তিবে, কাউকেও [কোনো] নির্দেশ দেওয়া হয় না কিন্তু তার ক্ষমতানুযায়ী কোনো জননীকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় তার সন্তানের জন্য এবং কোনো পিতাকেও কষ্ট দেওয়া উচিত নয় তার সন্তানের জন্য, আর উক্ত নিয়মানুযায়ী [সন্তানের ভার] অর্পিত হবে ওয়ারিশদের উপর, অতঃপর যদি উভয়ে দুধ ছাড়ানোর ইচ্ছা করে স্বীয় সম্মতি ও পরামর্শক্রমে, তবে উভয়ের কোনো পাপ হবে না, আর যদি তোমরা স্বীয় সন্তানদেরকে অন্য কোনো ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তবে [এতেও] তোমাদের কোনো পাপ হবে না, যখন সমর্পণ করবে, তাদেরকে যা কিছু দেওয়া স্থির করেছ, নিয়মানুযায়ী, আর আল্লাহকে ভয় কর এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ খুব প্রত্যক্ষ করতেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩৩) وَالْوَالِدَاتُ আর জননীগণ يُرْضِعْنَ স্তন্য দান করবে أَوْلَادَهُنَّ স্বীয় সন্তানদেরকে حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ পূর্ণ দুই বৎসরকাল لِمَنْ أَرَادَ এই নির্দিষ্ট সময় তারই জন্য أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ যে স্তন্য দানের মুদ্দত পূর্ণ করতে চায় وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ আর যার সন্তান তার দায়িত্বে বর্তিবে رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ স্তন্য দানকারিণীদের খোরপোষের ভার بِالْمَعْرُوفِ নিয়মানুযায়ী لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا কাউকেও [কোনো] নির্দেশ দেওয়া হয় না কিন্তু তার ক্ষমতানুযায়ী وُسْعَهَا লَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ কোনো জননীকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় بِوَلَدِهَا তার সন্তানের জন্য وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ এবং কোনো পিতাকেও কষ্ট দেওয়া উচিত নয় তার সন্তানের জন্য وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ আর উক্ত নিয়মানুযায়ী [সন্তানের ভার] অর্পিত হবে ওয়ারিশদের উপর فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا অতঃপর যদি উভয়ে দুধ ছাড়ানোর ইচ্ছা করে عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ স্বীয় সম্মতি ও পরামর্শক্রমে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا তবে উভয়ের কোনো পাপ হবে না وَإِنْ أَرَدْتُمْ আর যদি তোমরা চাও أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ স্বীয় সন্তানদেরকে অন্য কোনো ধাত্রীর দুধ পান করাতে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তবে তোমাদের কোনো পাপ হবে না إِذَا যখন সমর্পণ করবে سَلَّمْتُمْ তাদেরকে যা কিছু দেওয়া স্থির করেছ بِالْمَعْرُوفِ নিয়মানুযায়ী وَاتَّقُوا اللَّهَ আর আল্লাহকে ভয় কর وَاعْلَمُوا এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস রাখ যে أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ খুব প্রত্যক্ষ করছেন।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (٢٣٤)

(২৩৪) আর যারা তোমাদের মধ্য হতে মৃত্যুবরণ করে এবং পত্নীগণকে রেখে যায়, উক্ত পত্নীগণ নিজেদেরকে বিরত রাখবে চার মাস ও দশ দিন, অনন্তর যখন তারা স্বীয় ইদ্দত পূর্ণ করবে। তখন তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না ঐ সমস্ত কাজে যা উক্ত স্ত্রীগণ নিজেদের জন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্ব করবে যথানিয়মে এবং আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (٢٣٥)

(২৩৫) আর তোমাদের জন্য গুনাহ হবে না এতে যে, উক্ত নারীদেরকে [বিবাহের] প্রস্তাব প্রদান সম্বন্ধে কোনো কথা ইঙ্গিত করে বল অথবা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখ, আল্লাহ জ্ঞাত আছেন যে, তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে কিন্তু তাদের সাথে [পরিষ্কার শব্দে] বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিও না, হ্যাঁ, কোনো কথা নিয়মানুযায়ী আলোচনা করতে পার, আর তোমরা [এখন] বিবাহ-বন্ধনের সঙ্কল্পও করো না যে পর্যন্ত না নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে যায়, আর দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ জ্ঞাত আছেন তোমাদের অন্তরের বিষয়াদি সুতরাং তাঁকে ভয় করতে থাক, আর বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩৪) وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ আর যারা তোমাদের মধ্য হতে মৃত্যুবরণ করে وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا এবং পত্নীগণকে রেখে যায় يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ উক্ত পত্নীগণ নিজেদেরকে বিরত রাখবে اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا চার মাস ও দশ দিন فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ অনন্তর যখন তারা স্বীয় ইদ্দত পূর্ণ করবে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তখন তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ ঐ সমস্ত কাজে যা উক্ত স্ত্রীগণ নিজেদের জন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্ব করবে بِالْمَعْرُوْفِ যথানিয়মে وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ এবং আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।

(২৩৫) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ আর তোমাদের জন্য গুনাহ হবে না فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ এতে যে কোনো কথা ইঙ্গিত করে বল مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ উক্ত নারীদেরকে [বিবাহের] প্রস্তাব প্রদান সম্বন্ধে اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ অথবা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখ عَلِمَ اللّٰهُ আল্লাহ জ্ঞাত আছেন যে اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا কিন্তু তাদের সাথে [পরিষ্কার শব্দে] বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিও না اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا হ্যাঁ, কোনো কথা নিয়মানুযায়ী আলোচনা করতে পার وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ আর তোমরা [এখন] বিবাহ-বন্ধনের সঙ্কল্পও করো না حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ যে পর্যন্ত না নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে যায় وَاعْلَمُوْٓا আর দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ আল্লাহ জ্ঞাত আছেন مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ তোমাদের অন্তরের বিষয়াদি فَاحْذَرُوْهُ সুতরাং তাঁকে ভয় করতে থাক وَاعْلَمُوْٓا আর বিশ্বাস রেখ যে اَنَّ اللّٰهَ আল্লাহ তা'আলা غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ الخ **-এর মর্মকথা :** উল্লিখিত আয়াতটিতে দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের স্তন্যদানের সম্পর্কে বিধানের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। শিশুকে স্তন্যদান করা শরিয়ত মায়ের উপর ওয়াজিব করেছে। কোনো মা যদি কোনো শরয়ী ওজর ব্যতীত শুধুমাত্র বৈষয়িক কারণে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা শিশুর পিতার উপর অসন্তুষ্টির দরুন স্তন্যদান বন্ধ করে দেয় তাহলে তা তার জন্য পাপ হবে। বিবাহ বহাল অবস্থায় স্ত্রী স্তন্য দানের জন্য স্বামীর নিকট হতে কোনো প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না। কেননা স্তন্যদান এটা স্ত্রীর দায়িত্ব। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে স্তন্যদায়িনী মা শিশুর পিতার নিকট স্তন্য দানের বিনিময়ে সামাজিক ন্যায়বিচার মতে যথাযথ স্তন্য মূল্যের অধিকারিণী হবেন।

শিশুর স্তন্য দানের সময়সীমা : (১) ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু'বছর। যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যপান বাচ্চার অধিকার। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, স্তনাদানের সময়সীমা দু'বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করানো সঙ্গত নয়।
(২) ইমাম আবূ হানীফা (র.) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস তথা আড়াই বছর পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যদানের সময় সীমার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি দলিল হিসেবে কুরআনের আয়াত حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন। তা ছাড়া তার অভিমতের পক্ষে অনেক হাদীসও রয়েছে। তবে আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করানো সকলের ঐকমত্যে হারাম।

قوله وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ **-এর ব্যাখ্যা :** এখানে বাচ্চার দুগ্ধপানের বিনিময় পিতার দায়িত্বে রাখা হয়েছে। অথচ সে পিতা-মাতার যৌন ফসল। এ বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ছিল যে, পিতা এ আদেশকে বোঝা মনে করবে। তাই কুরআনের ভাষ্যে وَالِدٌ শব্দের স্থলে مَوْلُودٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ শিশুটি যার পরিচয়ে ও যার উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণকারী এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শিশুর লালন-পালন, পিতা-মাতা উভয়েরই দায়িত্ব; যেহেতু শিশু পিতার বলেই অভিহিত হয়ে থাকে, পিতার বংশেই শিশুর বংশ পরিচয় হয়ে থাকে, সেহেতু শিশুর খরচের দায়িত্ব তার উপর কোনো বোঝা বলে মনে করা উচিত নয়।
শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণ-পোষণ পিতার দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর খরচ বা ভরণ-পোষণ স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী হবে, মর্যাদা অনুসারে নয়।
হেদায়া গ্রন্থাকার বলেন– যদি পুরুষ ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তার এমন মানের খোরপোশ দিতে হবে যা দরিদ্রদের চেয়ে বেশি এবং ধনীদের চেয়ে কম। ইমাম কারখী (র.) বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোশ নির্ধারণ করা হবে।

قوله لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ **(মাকে স্তন্য দানে বাধ্য করার বৈধতা প্রসঙ্গে) :** এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, শিশুর পিতামাতা তাকে দুধ পান করানো নিয়ে কোনো ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না। মা যদি দুধপান করাতে অক্ষম হয়, আর পিতা মনে করে যে, শিশুটি তারও বটে। কাজেই মায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করা চলবে কিন্তু তা সমীচীন নয়। অপারগ অবস্থায় তাকে দুধ পানে বাধ্য করা যাবে না। কিংবা পিতা দরিদ্র ব্যক্তি, পক্ষান্তরে মায়ের কোনো আর্থিক সমস্যা নেই, এতদসত্ত্বেও মা স্তন্যদানে এ বলে অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুধ পানের ব্যবস্থা করা হোক। মায়ের এমন অপারগতা প্রকাশের পর যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু কোনো দুগ্ধ বৈধ পশু বা অন্য কোনো মহিলার দুধ পান করতে না চায়, তাহলে মাকে দুধ পানে বাধ্য করা যাবে।

قوله وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ **-এর মর্মার্থ :** যদি শিশুর পিতা জীবিত না থাকে তাহলে যে ব্যক্তি শিশুর প্রকৃত উত্তরাধিকারী তথা অভিভাবক সে তার দুধ পানের দায়িত্ব নেবে। অর্থাৎ, সে দুধ মা ও ধাত্রীর ব্যয়ভার বহন করবে। আর যদি উত্তরাধিকারী একাধিক হয়, তাহলে প্রত্যেকে স্ব-স্ব মিরাশ অনুপাতে ব্যয়ভার বহন করবে।
ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এতিম শিশুর দুধ পানের ব্যয় বহনের দায়িত্ব উত্তরাধিকারীদের উপর অর্পণ করাতে এ কথা বুঝা যায় যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যয়ভার দুধ পান শেষ হওয়ার পরও তাদের উপরই বর্তাবে। কেননা দুধের কোনো বিশেষত্ব নেই, উদ্দেশ্য হচ্ছে ভরণ-পোষণ।

قوله فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ **স্তন্য পান বন্ধকরণ সম্পর্কিত বিধান :** যদি শিশুর পিতা-মাতা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে স্থির করে যে, দুধ পানের সময়সীমার মধ্যেই স্তন্যদান বন্ধ করা হবে ; চাই তা মায়ের কোনো সমস্যার কারণে বা বাচ্চার কোনো সমস্যার কারণে হোক, তাহলে তাতে কোনো গুনাহ নেই। পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের শর্তটি আরোপ করে বুঝানো হয়েছে যে, স্তন্যদান বন্ধের ব্যাপারটি সন্তানের মঙ্গল কামনার ভিত্তিতে হতে হবে। পরস্পর ঝগড়া বিবাদের কারণে বা ক্রোধের ফল হিসেবে শিশুর কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

قوله وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ الخ **ধাত্রী-মাতার দ্বারা স্তন্য পান করানোর হুকুম :** শিশুর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তাকে মা ছাড়া অন্য মহিলার দুধ পান করানো যাবে। কিন্তু এই শর্তে যে, স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর যে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তা পুরাপুরিভাবে আদায় করতে হবে। আর যদি তাকে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়া না হয় তাহলে সে অপরাধের পাপ তার উপর অথবা তার অবর্তমানে উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তাবে।

এমনকি স্তন্যদায়িনী ধাত্রীকে পারিশ্রমিকের কথা দুধপান শুরু করার পূর্বেই পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে ঠিক করে দিতে হবে, যাতে পরে বিবাদ সৃষ্টি না হয়। আর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ ধাত্রীর পারিশ্রমিক তার হাতে পৌছে দিতে হবে। এতে কোনো প্রকার টালবাহানা করা চলবে না, যাতে স্তন্যদানে শিশুর কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।

শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব আর মাতার ভরণ-পোষণ পিতার দায়িত্ব : এ আয়াতের দ্বারা একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক-পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসেবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্য দানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। –[মাযহারী]

স্ত্রীর খরচ স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী হবে, না স্ত্রীর মর্যাদা অনুসারে : শিশুর পিতা-মাতা উভয়ই যদি ধনী হয়, তবে ভরণ পোষণও ধনী ব্যক্তিদের মতো হওয়া ওয়াজিব। আর দু'জনই গরিব হলে গরিবের মতোই ভরণ-পোষণ দিতে হবে। দু'জনের আর্থিক অবস্থা যদি ভিন্ন ধরনের হয়, তবে এক্ষেত্রে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন– যদি পুরুষ ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তবে এমন মানের খোরপোষ দিতে হবে, যা দরিদ্রদের চাইতে বেশি এবং ধনীদের চাইতে কম।

ইমাম কারখী (র.) বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোষ নির্ধারণ করতে হবে।

ফতহুল কাদীরে এ মতের সমর্থনে বহু ফকীহর ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে স্তন্যদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনার পর ইরশাদ হয়েছে– لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

অর্থাৎ কোনো মাতাকে তার শিশুর জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না। আর কোনো পিতাকেও এর জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না।" অর্থাৎ শিশুর পিতা-মাতা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করবে না। যেমন, মাতা যদি স্তন্যদান করতে অপারগ হয় আর যদি পিতা মনে করে, যেহেতু শিশু তারও বটে, কাজেই তার উপর চাপ সৃষ্টি করা চলে। কিন্তু না, অপারগ অবস্থায় মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা যাবে না। অথবা পিতা দরিদ্র এবং মাতার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্তন্যদানে অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করা হোক, এমন মানসিকতা প্রদর্শন করাও সঙ্গত হবে না।

মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা না করার বিবরণ : পঞ্চম মাসআলা لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا এতে বুঝা যায় যে, মা যদি কোনো অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোনো স্ত্রীলোকের বা কোনো জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে।

قوله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত তিন হায়েয আর বিধবাদের ইদ্দত গর্ভবতী না হওয়ার ক্ষেত্রে চার মাস দশদিন। আর গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু চার মাস দশ দিনের মধ্যে যদি তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়, তাহলে প্রসব করা দ্বারাই তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে। স্বামী মারা গেলে ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীলোকদের সুগন্ধি ব্যবহার করা, সাজ সজ্জা করা, সুরমা, তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করা, প্রয়োজন ব্যতীত ওষুধ ব্যবহার করা, রঙ্গিন কাপড় পরা জায়েজ নেই। বিবাহের জন্য প্রকাশ্য আলোচনা করাও জায়েজ নেই।

বিধবা গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দত : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, জমহূর আলিমদের নিকট গর্ভবতী স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত হলো গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। তবে হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ বিষয়ে ভিন্নমত পাওয়া যায়, তা হলো أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ অর্থাৎ দু'ইদ্দতের মধ্যে যেটি দূরবর্তী সেটি ধর্তব্য। অর্থাৎ গর্ভ খালাসের পরেও যদি চার মাস ১০ দিন পূর্তির বাকি থাকে তবে অবশিষ্ট দিনগুলো পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। ইমাম শা'য়বী, নাখায়ী, হাম্মাদ, হাসান গর্ভ খালাসের সাথে সাথে নিফাসের সময়টিও ইদ্দতের শামিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মহিলার উপর ইদ্দতের কারণ : শরিয়তের পক্ষ থেকে মহিলার উপর ইদ্দত প্রযোজ্য হওয়ার কয়েকটি কারণ ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন। যেমন– (ক) জরায়ু পুরুষের বীর্যমুক্ত কিনা তা বুঝার জন্য। যেন একজনের বংশ অন্যজনের সাথে যুক্ত না হয়। (খ) আল্লাহর নির্দেশ পালন করে ইবাদতের নিদর্শন উপস্থাপনের জন্য মহিলাদেরকে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। (গ) স্বামী বিয়োগের উপর শোক প্রকাশ এবং এতদিন যে সে তার উপর করুণা করেছে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। (ঘ) বিবাহ বন্ধনের গুরুত্ব অপরিসীম একথা বুঝানোর জন্য। এ কাজটি ইচ্ছা করলেই সম্পাদন করা যায় না, আর করলেই তা মুহূর্তে বিচ্ছেদ করা যায় না। বিচ্ছেদ করে ফেললে সাথে সাথে আবার বিয়ে করা যায় না, দীর্ঘ দিন অপেক্ষায় থাকতে হয়। এটা কোনো খেল তামাশা নয়।

দাসীর ইদ্দত : মুক্ত-স্বাধীন মহিলার ইদ্দতের অর্ধেক হলো দাসীর ইদ্দত। অতএব তালাক হবে দু'টি আর ইদ্দত হবে দু' হায়েয বা দু' মাস পাঁচদিন। আল্লামা ইবনে সিরিনের মতে, দাসীর ইদ্দত স্বাধীনার মতোই হবে।

قوله وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا الخ **-এর মর্মার্থ :** স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দত পালনে যে সময় নির্ধারিত রয়েছে এটা ঐ বিধবাদের জন্য যাদের সাথে তাদের স্বামী নির্জনবাস করেছে। কিন্তু গর্ভবতী বিধবাদের সে ইদ্দত পালন করতে হবে না; বরং প্রসবের সাথে সাথেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

قوله وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ الخ **-এর মর্মার্থ :** تَعْرِيْض শব্দের আভিধানিক অর্থ পরোক্ষ সংকেত প্রদান করা, অস্পষ্ট কথা বলা। পারিভাষিক অর্থ হলো– এমন কথা বলা যা উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। বয়ানুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, ইদ্দতকালে মহিলার সাথে বিবাহ সম্পর্কে চারটি বিধান বর্ণিত হয়েছে। (১) স্পষ্টভাবে মুখে প্রস্তাব করা হারাম। (২) মুখে সাংকেতিক বচনের মাধ্যমে প্রস্তাব করাতে দোষ নেই। (৩) ইদ্দতের মধ্যে অন্তরে অন্তরে বিবাহের সংকল্প পোষণ করা হারাম। (৪) ইদ্দতের পরে বিবাহ করবে বলে ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা পোষণ করাতে দোষ নেই।

ইদ্দতকালীন বিধান : স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী ইদ্দত কালের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করা, সাজ সজ্জা করা, সুরমা, তেল ইত্যাদি ব্যবহার করা, প্রয়োজন ব্যতীত ওষুধ সেবন করা, অলংকার ব্যবহার করা এবং রঙ্গিন কাপড় পরা জায়েজ নয়। বিবাহের জন্য প্রকাশ্য আলাচনা করাও দুরস্ত নয়। আর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোক যার তালাক প্রত্যাহার যোগ্য নয়, তাদের ক্ষেত্রে স্বামীর গৃহে ইদ্দত অতিক্রান্ত করার অবস্থায় দিনের বেলায় অতিপ্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়াও নিষিদ্ধ। –[মা'আরিফ]

اَلْكِتٰب **শব্দের বিশ্লেষণ :** اَلْكِتٰب শব্দের অর্থ হচ্ছে– লিখিত বিষয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকালকে বুঝানো হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

كِسْوَةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন كُسًا অর্থ– পোশাক-পরিচ্ছেদ।

تُكَلَّفُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْلِيْفُ মূলবর্ণ (ك.ل.ف) জিনস صحيح অর্থ– তাকে দায়িত্বভার দেওয়া হয়।

لَاتُضَارُّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلضِّرَارُ মূলবর্ণ (ض.ر.ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না।

تَسْتَرْضِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব إِسْتِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ر . ض . ع) মাসদার اَلْإِسْتِرْضَاعُ জিনস صحيح অর্থ- তোমরা স্তন্য পান করতে চাও।

سَلَّمْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْلِيْمُ মূলবর্ণ (س . ل . م) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা অর্পণরেছ।

يُتَوَفَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّيْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তারা মৃত্যু মুখে পতিত হবে।

يَذَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و . ذ . ر) জিনস مثال واوى অর্থ- তারা রেখে যায়।

يَتَرَبَّصْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّرَبُّصُ মূলবর্ণ (ر . ب . ص) জিনস صحيح অর্থ- বিবাহ হতে বিরত থাকবে।

عَرَّضْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْرِيْضُ মূলবর্ণ (ع . ر . ض) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ইঙ্গিতে বলেছ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ : এখানে اَلْوَالِدَاتُ হলো مبتدأ আর يُرْضِعْنَ হলো فعل এতে هُنَّ যমীর فاعل এবং اَوْلَادَهُنَّ উভয়টি مضاف اليه ও مضاف মিলে مفعول به এবং حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ উভয়টি موصوف ও صفت মিলে مفعول فيه এখন فعل - فاعل - مفعول به ও مفعول فيه মিলে جملة فعلية হয়ে خبر অবশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ : এখানে اِعْلَمُوْا হলো فعل এতে انتم যমীর فاعل আর اَنَّ হলো حرف مشبه بالفعل এবং اَللهَ শব্দটি اَنَّ এর اسم ; অতঃপর بِ টি حرف جار ও مَا টি اسم موصول এবং تَعْمَلُوْنَ হলো فعل এতে انتم হলো فاعل এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে صلة অতঃপর موصول ও صلة মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হচ্ছে بَصِيْرٌ শিবহে فعل এর সাথে অবশেষে شبه جملة متعلق ও شبه فعل মিলে مفعول به হয়ে فعل - فاعل - مفعول به ও মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ (٢٣٦)

অনুবাদ (২৩৬) তোমাদের প্রতি কোনো [মহরের] দায়িত্ব নেই যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে এরূপ অবস্থায় তালাক দাও যে, তাদেরকে স্পর্শও করনি আর তাদের জন্য কোনো মহরও ধার্য করনি, এবং তাদেরকে ফায়দা পৌছাও, সচ্ছল ব্যক্তির জিম্মায় তার অবস্থানুযায়ী এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মায় তার অবস্থানুযায়ী এক বিশেষ রকমের ফায়দা [জামাজোড়া] পৌছানো যা যথারীতি সদাচারীদের উপর ওয়াজিব।

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢٣٧)

(২৩৭) আর যদি তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য কিছু মহরও নির্ধারিত করেছিলে, তাহলে তোমাদের নির্ধারিত মহরের অর্ধাংশ, হ্যাঁ যদি ঐ স্ত্রীগণ মাফ করে দেয় অথবা সেই ব্যক্তি [অর্থাৎ স্বামী স্বেচ্ছায় পূর্ণ মহর দিয়ে] অনুগ্রহ করে যার হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে, আর তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়া পরহেজগারীর অধিক নিকটবর্তী এবং তোমরা পরস্পরে উদারতা প্রদর্শনে শৈথিল্য করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যসমূহ প্রত্যক্ষ্য করেন।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ (٢٣٨)

(২৩৮) তোমরা সংরক্ষণ কর সমস্ত নামাজের এবং মধ্যবর্তী নামাজের, আর দণ্ডায়মান হও আল্লাহর সম্মুখে বিনয়ী অবস্থায়।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩৬) لَا جُنَاحَ তোমাদের প্রতি কোনো [মহরের] দায়িত্ব নেই اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে এরূপ অবস্থায় তালাক দাও যে مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ তাদেরকে স্পর্শও করনি اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً আর তাদের জন্য কোনো মহরও ধার্য করনি وَّمَتِّعُوْهُنَّ এবং তাদেরকে ফায়দা পৌছাও عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ সচ্ছল ব্যক্তির জিম্মায় তার অবস্থানুযায়ী وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মায় তার অবস্থানুযায়ী مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ এক বিশেষ রকমের ফায়দা [জামাজোড়া] পৌছানো حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ যা যথারীতি সদাচারীদের উপর ওয়াজিব।

(২৩৭) وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ আর যদি তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً এবং তাদের জন্য কিছু মহরও নির্ধারিত করেছিলে فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ তাহলো তোমাদের নির্ধারিত মহরের অর্ধাংশ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ হ্যাঁ যদি ঐ স্ত্রীগণ মাফ করে দেয় اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ অথবা সেই ব্যক্তি অনুগ্রহ করে যার হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى আর তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়া পরহেজগারীর অধিক নিকটবর্তী وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ এবং তোমরা পরস্পরে উদারতা প্রদর্শনে শৈথিল্য করো না اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যসমূহ প্রত্যক্ষ করেন।

(২৩৮) حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ তোমরা সংরক্ষণ কর সমস্ত নামাজের وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى এবং মধ্যবর্তী নামাজের وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ আর দণ্ডায়মান হও আল্লাহর সম্মুখে قٰنِتِيْنَ বিনয়ী অবস্থায়।

(২৩৯) আর যদি তোমাদের [যথারীতি নামাজ পড়তে] আশঙ্কা হয় তবে [জমিনে] দাঁড়িয়ে অথবা আরোহী অবস্থায় পড়ে নাও, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাও, তখন আল্লাহর স্মরণ সেরূপে কর যেরূপ তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন–যা তোমরা জানতে না।	فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩)
(২৪০) আর তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয় এবং পত্নীগণকে রেখে যায়, তারা যেন স্বীয় পত্নীদের জন্য অসিয়ত করে যায়, যেন সে এক বৎসর পর্যন্ত উপকৃত হয় এরূপে যে, তাদেরকে ঘর হতে বহিষ্কৃত করা না হয়। হ্যাঁ, যদি নিজেরাই বের হয়ে যায়, তবে তোমাদের কোনো পাপ নেই, ঐ নিয়ামত সঙ্গত বিষয়ে যা তারা নিজেদের জন্য [সাব্যস্ত] করে; আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী জ্ঞানময়।	وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠)
(২৪১) আর সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে কিছু কিছু ভোগ্যবস্তু দেওয়া নিয়মানুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে– পরহেজগারদের প্রতি।	وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)
(২৪২) এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, আশা, তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।	كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٤٢)

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩৯) فَإِنْ خِفْتُمْ আর যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় فَرِجَالًا তবে দাঁড়িয়ে أَوْ رُكْبَانًا অথবা আরোহী অবস্থায় পড়ে নাও فَإِذَا أَمِنْتُمْ অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাও فَاذْكُرُوا اللَّهَ তখন আল্লাহর স্মরণ সেরূপে কর كَمَا عَلَّمَكُمْ যেরূপ তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন– مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ যা তোমরা জানতে না।

(২৪০) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ আর তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু হয় وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا এবং পত্নীগণকে রেখে যায় وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ তারা যেন স্বীয় পত্নীদের জন্য অসিয়ত করে যায় مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ যেন সে এক বৎসর পর্যন্ত উপকৃত হয় এরূপে যে غَيْرَ إِخْرَاجٍ তাদেরকে ঘর হতে বহিষ্কৃত করা না হয় فَإِنْ خَرَجْنَ হ্যাঁ, যদি নিজেরাই বের হয়ে যায় فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তবে তোমাদের কোনো পাপ নেই فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ঐ নিয়ামতসঙ্গত বিষয়ে যা তারা নিজেদের জন্য করে وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী জ্ঞানময়।

(২৪১) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ আর সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ কিছু কিছু ভোগ্যবস্তু দেওয়া নিয়মানুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে– حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ পরহেজগারদের প্রতি।

(২৪২) كَذَٰلِكَ এরূপে يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন آيَاتِهِ তাঁর বিধানসমূহ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ আশা, তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৩৬) قوله مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল : যখন পূর্বের আয়াতে তালাক প্রাপ্তা নারীদের প্রতি সাধ্য অনুযায়ী ও** সামর্থ্য অনুযায়ী ইহসান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল তালাক প্রাপ্তা নারীর প্রতি ইহসান করা মোস্তাহাব। অতএব না করলে তাতে কোনো গুনাহ হবে না এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২৩৮) قوله حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : অধিকাংশ সময় ব্যবসায়িক লেন-দেনের কারণে সাহাবায়ে কেরামের আছরের নামাজ বিলম্ব হয়ে যেত। এমনকি সূর্য ডুবে যাওয়ার উপক্রম হতো। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২৩৮) قوله وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ الاية **আয়াতের শানে নুযূল** : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা নামাজের মধ্যেও কথাবার্তা বলতাম। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এর দ্বারা আমাদের চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হলো। –[তিরমিযী]

(২৪০) قوله وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : হযরত মুকাতেল বিন হাইয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তায়েফ থেকে ছেলে মেয়ে পিতামাতা ও স্ত্রীসহ মদিনায় আগমন করেন এবং এখানে এসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিষয়টি রাসূল ﷺ কে জানানো হলে তিনি তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার পিতামাতা ও সন্তানদের যথারীতি অংশ দিলেন। কিন্তু স্ত্রীকে কিছু দিলেন না। তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর এক বছরের ব্যয়ভার বহন করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিলেন। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

বি. দ্র. এ নির্দেশ ছিল মিরাশের আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে। পরে যখন মিরাশের আয়াত নাজিল হয় এবং স্ত্রীকেও স্বামীর বাড়ি ঘর ও অন্যান্য জিনিসে অংশ দেওয়া হয় তখন এ আয়াতটির নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। –[মা'আরেফুল কুরআন]

قوله لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ **-এর ব্যাখ্যা** : মোহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের চারটি অবস্থা রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি অবস্থার হুকুম এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

- প্রথমটি হচ্ছে– স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি এবং মোহরও ধার্য করা হয়নি।
- দ্বিতীয়টি হচ্ছে– মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস হয়নি।
- তৃতীয়টি হচ্ছে– মোহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে।
- চতুর্থটি হচ্ছে– মোহর ধার্য করা হয়নি অথচ সহবাসের পর তালাক দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মোহর স্ত্রীকে পরিশোধ করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম দু' প্রকারের আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে স্বামীর কর্তব্য নিজের পক্ষ হতে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেওয়া। ন্যূনপক্ষে তাকে (স্ত্রীকে) এক জোড়া কাপড় দিয়ে দিবে। এর কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য এ কথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী হওয়া উচিত। সামর্থ্যবান লোক যেন এ ব্যাপারে কার্পণ্য না করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে এর নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে এক জোড়া কাপড়।

দ্বিতীয় অবস্থার হুকুম হচ্ছে যে, যদি স্ত্রীর মোহর বিবাহের সময় ধার্য করা হয়ে থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হয় তবে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক তাকে পরিশোধ করতে হবে। আর যদি স্ত্রী ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মোহরই দিয়ে দেয় তবে তা হচ্ছে তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার।

মোত্আর পরিমাণ : মোত্আর সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে গোলাম প্রদান করা, এর চেয়ে কম হলো রৌপ্য প্রদান, এর চেয়ে কম হলো কাপড় প্রদান করা। যদি তালাকদাতা ধনী হয় তাহলে দাস বা অন্য সমপরিমাণ কিছু প্রদান করা। আর যদি তালাকদাতা গরিব হয়, তাহলে একটি জামা, একটি ওড়না ও একটি চাদর "মোতা" স্বরূপ দান করবে।

قوله عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ**-এর মর্মকথা** : ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে বর্ণনা করেন, اَلْمُوْسِعِ বলতে ধনী লোককে বুঝায়, আর اَلْمُقْتِرِ বলতে দরিদ্র লোককে বুঝায়। আয়াতের অর্থ হলো, স্বামীর অবস্থা অনুপাতে স্ত্রীর খোরপোষ নির্ধারণ করা হবে। কেউ কেউ বলেন, স্ত্রীর খোরপোষের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এমনিভাবে مُتْعَةً নির্ধারণ করতে হবে, যাতে করে স্বামীর জন্য তা তার ক্ষমতার বাইরে চলে না যায়; কিংবা তার স্ত্রী নির্যাতিত না হয়। অধিকন্তু মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

قوله مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ-এর ব্যাখ্যা : কেউ যদি স্ত্রী সহবাস না করে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তখন তার কর্তব্য হবে নিজের পক্ষ হতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপভোগ্য বস্তু দিয়ে দেওয়া। ন্যূনপক্ষে তাকে এক প্রস্ত কাপড় প্রদান করবে। কুরআন মাজীদ প্রকৃত পক্ষে এ জন্যই কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি ; যার ফলে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। (১) হযরত ইমাম হাসান (র.) হতে বর্ণিত, এরূপ এক ক্ষেত্রে তিনি বিশ হাজার দিরহামের উপঢৌকন প্রদানের ফয়সালা দিয়েছিলেন। (২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ন্যূনতম পরিমাণ হলো এক প্রস্ত কাপড় ; (৩) হযরত কাযী শোরাইহ (র.) পাঁচশত রৌপ্য মুদ্রা দেওয়ার কথা বলেছেন। (৪) হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি সহায়তার প্রশ্নে উভয়ই মতবিরোধ করে তাহলে মহরে মিছালের অর্ধাংশ দিতে হবে ; (৫) হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনো নির্দিষ্ট জিনিস প্রদানে স্বামীকে বাধ্য করা যাবে না।

قوله إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الخ -এর ব্যাখ্যা : পুরুষের পূর্ণ মহর দেওয়াকে তালাক প্রদত্ত মহিলার অর্ধেক প্রাপ্য মোহরের বিবরণের পাশাপাশি হয়তো এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরব দেশের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোহরের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে দেওয়া হতো। সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক মোহর স্বামী ফেরত পেত। যদি সে বদান্যতার কারণে অর্ধেক ফেরত না নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায় পড়ে। এরূপ ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষে অনুকূল বলা হয়েছে। কেননা তালাকটি যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষে অনুকূল বলা হয়েছে। এই ক্ষমা তারই নিদর্শন, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে উত্তম ও পুণ্যের কাজ। তাই ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে স্বামীর পক্ষ হতেও হতে পারে।

قوله الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ -এর তাফসীর : অত্র আয়াতের তাফসীরে রাসূল ﷺ নিজে বর্ণনা করেন যে, বিবাহ বন্ধনের মালিক হলো স্বামী। এ হাদীসটি দারাকুতনীতে আমর ইবনে শো'আইব তার পিতা থেকে তিনি তার দাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এটি হযরত আলী (রা.) এবং ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও বর্ণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সমাধা হওয়ার পর বিবাহ ঠিক রাখা বা ভঙ্গ করার মালিক স্বামী।

قوله الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى সম্পর্কে তাফসীর কারকগণের মধ্যে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। ১. হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তা দ্বারা ফজরের নামাজ বুঝানো হয়েছে। ২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে মাগরিবের নামাজ। ৩. কতিপয় সাহাবীদে মতে জোহরের নামাজ। ৪. কারো কারো মতে ইশার নামাজ ; ৫. কারো মতে ঈদের নামাজ অথবা জুমার নামাজ। ৬. জমহুর বসরীদের মতে আসরের নামাজ উদ্দেশ্যে। অধিকাংশ বিজ্ঞ সাহাবীদের ও তাবেয়ীদের নির্ভরযোগ্য মতেও আসরের নামাজকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আর এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য।

كَمَا عَلَّمَكُمْ -এর ইঙ্গিত : যেমনিভাবে তিনি তোমাদেরকে নামাজ আদায় করার জন্য শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ নামাজ সম্বন্ধে শরিয়তের যে বিধান দেওয়া হয়েছে। আর ভয়-ভীতিতেও নিরাপদ অবস্থায় যেমনিভাবে নামাজ পড়ার পদ্ধতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তোমরা নামাজ পড় এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। অথবা, যেভাবে আদায় করতে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় হয়, ঠিক সেভাবেই তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় কর।

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ এর মর্মার্থ : যখন তোমাদের শত্রুর বা হিংস্র প্রাণীর ভয়ের আশঙ্কা থাকবে তখন হাটাচলা অবস্থায় বা আরোহী অবস্থায় নামাজ আদায় কর। আর শত্রুর ভয় থেকে নিরাপত্তা লাভ করার প্রেক্ষিতে তোমরা আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় কর। নিরাপদ অবস্থায় নির্ধারিত নিয়মে নামাজ আদায় কর এবং আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ কর।

ভয়কালীন নামাজ আদায় : যুদ্ধ চলাকালীন শত্রুর আক্রমণে অথবা যে কোনো সময়ে মানুষ অথবা হিংস্র প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়-ভীতি বিদ্যমান অবস্থায় আদায়কৃত নামাজকে সালাতুল খাওফ বলে ; নামাজের সময় হলে ইমাম মানুষকে দু'দলে ভাগ করবে ; একদল শত্রুর সম্মুখে থাকবে ও দ্বিতীয় দল ইকতেদা করবে ; এক রাকাত হলে প্রথম দল শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে আর দ্বিতীয় দল ইকতেদা করবে, ইমাম দ্বিতীয় রাকাত ও তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে; কিন্তু মুক্তাদীগণ সালাম না ফিরিয়ে শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে। প্রথম দল এসে বিনা কেরাতে একা একা এক রাকাত ও তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে এবং শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে। আর দ্বিতীয় দল এসে কেরা'ত সহকারে এক রাকাত ও তাশাহহুদ পড়ে নিবে।

قوله قُومُوا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ এর মর্মার্থ : قٰنِتِيْنَ শব্দটি قُنُوتٌ হতে নির্গত। অর্থ আনুগতকারীগণ ; এর মর্মার্থ সম্পর্কে মুফাসসিরীনের কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন قٰنِتِيْنَ অর্থ– ذَاكِرِيْنَ ও دَاعِيْنَ অর্থাৎ জিকিরকারী ও দোয়াকারী।
২. হযরত কাতাদাহ (রা.) ও হাসান বসরী (র.) বলেন, এর অর্থ– مُطِيْعِيْنَ তথা আনুগত্যকারীগণ।
৩. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন- এর অর্থ خَاشِعِيْنَ তথা বিনয়ীগণ।

৪. ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এর অর্থ– سَاكِتِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চুপ বা নীরবতা পালনকারীগণ।
৫. তাফসীরে ইবনে কাছীরে আছে, এর অর্থ– ذَلِيْلِيْنَ তথা অতি নম্র ব্যক্তিগণ।
৬. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন, এর অর্থ– الطَّاعَةُ مَعَ الْخُضُوْعِ তথা বিনয়ের সাথে আনুগত্য করা।
৭. কারো মতে الْإِشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ অর্থাৎ ইবাদতে মশগুল থাকা। যেমন হাদীসে এসেছে– قِيْلَ اَيُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ

নামাজের সংখ্যা নির্ধারণ : সকল মুসলমানের ঐকমত্যে নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত। উক্ত আয়াতটি এই কথার প্রতি পূর্ণ সমর্থন করে। কেননা اَلصَّلَوٰتُ শব্দটি বহুবচন, এর দ্বারা কমপক্ষে তিন ওয়াক্ত নামাজ বুঝায়। তারপর الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى নিয়ে হলো চার ওয়াক্ত। এখন চার ওয়াক্ত হতে মধ্যবর্তী নামাজ নির্ধারণ করা যায় না। অতএব বুঝা যায় যে, নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত। মধ্যবর্তী এক ওয়াক্ত এবং দুই পাশে দুই ওয়াক্ত। এ ছাড়াও আরো চারটি আয়াত রয়েছে। যেমন–

১. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ এখানে سُبْحَانَ اللّٰهِ দ্বারা নামাজ উদ্দেশ্য অর্থাৎ حِيْنَ تُمْسُوْنَ দ্বারা মাগরিব ও ইশা وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ দ্বারা ফজর عَشِيًّا দ্বারা আসর এবং حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ দ্বারা জোহরের নামাজ উদ্দেশ্য।
২. اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ আয়াতের دُلُوْكِ দ্বারা زَوَالُ شَمْسٍ উদ্দেশ্য। এর দ্বারা জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এবং দ্বারা فَجْر উদ্দেশ্য।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا আয়াতের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উল্লেখ রয়েছে।
৪. اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বর্ণনা পাওয়া যায়।

নামাজের সংরক্ষণ দ্বারা উদ্দেশ্য : নামাজের সংরক্ষণ বলতে সকল শর্তসহ নামাজ আদায় করাকে বুঝায়। অর্থাৎ, শরীর, কাপড় ও নামাজের স্থান পবিত্র, শরীর ঢাকা, কেবলামুখী হওয়া, নামাজের সকল আরকান সংরক্ষণ করা। নামাজ নষ্ট করে দেয় এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সর্বোপরি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য নামাজ আদায় করাকে সংরক্ষণ বুঝায়। –[তাফসীরে কাবীর]

رِجَالًا ও رُكْبَانًا দ্বারা উদ্দেশ্য : رِجَالٌ শব্দটি رَاجِلٌ-এর বহুবচন। পদব্রজে চলমান ব্যক্তিকে رَاجِلٌ বলা হয়। আর رُكْبَانٌ শব্দটি رَاكِبٌ-এর বহুবচন। পায়ে না চলে ঘোড়া, উটা বা অন্য যে কোনো বাহনে আরোহণকারীকে رَاكِبٌ বলা হয়। অতএব আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তোমরা স্বাভাবিকাবস্থায় না হয়ে কোনো ভয়ের মুহূর্তে অবস্থান করলে পায়ে হেটে হোক, আরোহণাবস্থায় হোক নামাজ আদায় করবে। কোনো অবস্থাতেই নামাজ ত্যাগ করা যাবে না। এমনকি ইশারা করে হলেও নামাজ আদায় করতে হবে।

ভয়ের সময় রাকাতের সংখ্যা : ইমাম শাফেয়ী, মালেক এবং একদল আলেমের মতে, ভয়ের সময় দু' রাকাত নামাজ আদায় করতে হবে। যেমন সফরে দু'রাকাত আদায় করা হয়।

হাসান ইবনে আবুল হাসান, কাতাদাহ প্রমুখের মতে, ইশারার মাধ্যমে এক রাকাত পড়বে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুকিমাবস্থায় চার সফরাবস্থায় দুই ও ভয়ের সময় এক রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন।

قوله وَصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ الخ -এর ব্যাখ্যা : বয়ানুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে অন্যান্যদের মতো স্ত্রীদেরকেও মৃত স্বামীর অসয়িতের উপর নির্ভর করতে হতো। তৎকালীন বিধান অনুযায়ী বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর ঘরে বাস করতে চাইলে এক বছর কাল পর্যন্ত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে হতো, কিন্তু স্ত্রী ইদ্দত চলাকালে স্বীয় প্রাপ্য হিস্যা মৃত স্বামীর ওয়ারিশদেরকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র বিবাহ করে চলে যেতে পারত। তারপর মিরাশের আয়াত নাজিল হওয়ায় এ আয়াতের বিধান মানসুখ হয়ে যায়।

قوله وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ...... وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ জাহেলিয়াত আমলে স্বামীর মৃত্যুর দরুন ইদ্দত ছিল এক বৎসর। কিন্তু ইসলামে এক বৎসরের স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন– পূর্ববর্তী আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا এতে স্ত্রীকে এতটুকু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু তখনও পর্যন্ত মিরাশের বিধান নাজিল হয়নি এবং মিরাশের কোনো অংশ স্ত্রীলোকের জন্য নির্ধারণ করা হয়নি; বরং তাদের ভাগ্য পুরুষের অসিয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল যা পূর্ববর্তী আয়াত كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ এর তাফসীরে বুঝা গেছে। কাজেই নির্দেশ হয়েছিল যে, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের সুবিধার জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত বাড়িতে থাকতে চায়, তবে এক বৎসর পর্যন্ত থাকার অধিকার রয়েছে এবং তারই পরিত্যক্ত অর্থ–সম্পদ থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ইদ্দতের সময় পর্যন্ত দিতে হবে।

এ আয়াতে সেই নির্দেশটিই বর্ণনা করা হয়েছে আর স্বামীদেরকে সেভাবেই অসিয়ত করতে বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ অধিকারটি ছিল স্ত্রীর তাই তা আদায় করা না করার অধিকারও ছিল তারই। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য তাকে ঘর

থেকে বের দেওয়া জায়েজ ছিল না। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে তার অংশ ছেড়েও দিতে পারতো। আর অন্যত্র বিয়ে করাও জায়েজ ছিল। এখানে 'নিয়মানুযায়ী' শব্দের অর্থ তাই। কিন্তু ইদ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়া বা বিয়ে করা ইত্যাদি ছিল পাপের কাজ। স্ত্রীলোকের জন্যও এবং বাধা দিতে পারা সত্ত্বেও যারা বাধা না দেয় তাদের জন্যও। পরে যখন মিরাশের আয়াত নাজিল হয়, তখন বাড়ি-ঘর এবং অন্যান্য সব কিছুর মধ্যেই যেহেতু স্ত্রীকেও অংশ দেওয়া হয়েছে, কাজেই সে তার নিজের অংশে থাকার এবং নিজের অংশ থেকে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকারী রয়ে গেছে। ফলে এ আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে।

قوله وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের উপকার করার কথা এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এসেছে। তবে তা ছিল শুধুমাত্র দু'রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য। সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেওয়া হয়েছে, তাদের একটি উপকার ছিল কমপক্ষে একজোড়া কাপড় দেওয়া। আর দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে অর্ধেক মহর দেওয়া। বাকি রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যাদের সাথে স্বামী নির্জনবাস কিংবা সহবাস করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মহর ধার্য করা হয়েছে, তাদের উপকার করা অর্থ, তার ধার্যকৃত পূর্ণ মহর দিয়ে দেওয়া। আর যার মহর ধার্য করা হয়নি তার জন্য মহরে মিছাল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যদি مَتَاعٌ শব্দের দ্বারা 'বিশেষ ফায়দা' বলতে একজোড়া কাপড় বুঝানো হয়, তবে একজনকে তা দেওয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর অন্যান্যদের বেলায় তা মোস্তাহাব। আর যদি مَتَاعٌ শব্দের দ্বারা খোর-পোষ বুঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত করতে হয়, তাতে ইদ্দত পর্যন্ত তা দেওয়া ওয়াজিব। তালাকে রাজয়ীই হোক আর তালাকে-বায়েনাই হোক ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর অন্তর্ভুক্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَتِّعُوْهُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّمْتِيْعُ মূলবর্ণ (م . ت . ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা খরচ দাও।

الْمُوْسِعِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْسَاعُ মূলবর্ণ (و . س . ع) জিনস مثال واوى অর্থ– সম্পদশালী, ধনী ব্যক্তি।

الْمُقْتِرِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتَارُ মূলবর্ণ (ق . ت . ر) জিনস صحيح অর্থ– অস্বচ্ছল ব্যক্তি, দরিদ্র।

يَعْفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَفْوُ মূলবর্ণ (ع . ف . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা মাফ করে দেয়।

لَاتَنْسَوُا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن . س . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা ভুলো না।

قُوْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقِيَامُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা দণ্ডায়মান হও।

يُتَوَفَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মরে যায়।

الْمُتَّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তাকওয়া অর্জনকারীগণ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى : এখানে حٰفِظُوْا হলো فعل এতে اَنْتُمْ যমীর فاعل আর عَلٰى হলো حرف جار ও الصَّلَوٰتِ হলো معطوف عليه এবং واو টি হচ্ছে حرف عطف অতঃপর الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى হলো موصوف ও صفت মিলে معطوف এবার معطوف عليه ও معطوف মিলে مجرور তারপর جار ও مجرور মিলে متعلق ; متعلق ও فعل ـ فاعل মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ : এখানে قُوْمُوْا হলো فعل এতে'اَنْتُمْ যমীর ذو الحال আর قٰنِتِيْنَ হলো حال এবার حال ও ذو الحال মিলে فاعل এবং لله শব্দটি جار ও مجرور মিলে متعلق এবার فعل ـ فاعل , متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হলো।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ (٢٤٣)

অনুবাদ (২৪৩) তুমি কি ঐ সকল লোকের ঘটনা অবগত নও– যারা বের হয়ে পড়ছিল নিজেদের ঘর হতে আর তারা বহু সহস্রই ছিল, মৃত্যু হতে বাঁচার জন্য, সুতরাং আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, মরে যাও। অতঃপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন, নিশ্চয়, আল্লাহ তা'আলা অতি অনুগ্রহশীল মানুষের প্রতি, কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকরগুজারী করে না।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٤٤)

(২৪৪) আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর এবং দৃঢ়ভাবে একথা জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۚ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٢٤٥)

(২৪৫) [এমন ব্যক্তি] কে আছে, যে আল্লাহকে করজ দিবে উত্তম করজ দেওয়া, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে তার জন্য বর্ধিত করে দিবেন বহুগুণে, আর আল্লাহ তা'আলা কমান এবং বাড়ান, আর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ

(২৪৬) মূসা পরবর্তী একদল বনী ইসরাঈলের কাহিনী তুমি কি জান না? যখন তারা নিজেদের এক নবীকে বলেছিল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করুন যেন আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারি,

শাব্দিক অনুবাদ

(২৪৩) اَلَمْ تَرَ তুমি কি ঐ সকল লোকের ঘটনা অবগত নও– اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا যারা বের হয়ে পড়ছিল مِنْ دِيَارِهِمْ নিজেদের ঘর হতে وَهُمْ اُلُوْفٌ আর তারা বহু সহস্রই ছিল حَذَرَ الْمَوْتِ মৃত্যু হতে বাঁচার জন্য فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ সুতরাং আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন مُوْتُوْا মরে যাও ثُمَّ اَحْيَاهُمْ অতঃপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা لَذُوْ فَضْلٍ অতি অনুগ্রহশীল عَلَى النَّاسِ মানুষের প্রতি وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ কিন্তু অধিকাংশ লোক لَا يَشْكُرُوْنَ শোকরগুজারী করে না।

(২৪৪) وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর وَاعْلَمُوْا এবং দৃঢ়ভাবে একথা জেনে রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ سَمِيْعٌ খুব শ্রবণকারী, عَلِيْمٌ মহাজ্ঞানী।

(২৪৫) مَنْ ذَا কে আছে, الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ যে আল্লাহকে করজ দিবে قَرْضًا حَسَنًا উত্তম করজ দেওয়া فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে তার জন্য বর্ধিত করে দিবেন اَضْعَافًا كَثِيْرَةً বহুগুণে وَاللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা يَقْبِضُ কমান وَيَبْصُطُ এবং বাড়ান وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ আর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

(২৪৬) اَلَمْ تَرَ তুমি কি জান না? اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ একদল বনী ইসরাঈলের কাহিনী مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى মূসা পরবর্তী اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ যখন তারা নিজেদের এক নবীকে বলেছিল যে ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করুন نُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ যেন আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারি قَالَ সেই পয়গম্বর বললেন هَلْ عَسَيْتُمْ এরূপ সম্ভাবনা আছে কি যে

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۚ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٦)

অনুবাদ : সেই পয়গম্বর বললেন, এরূপ সম্ভাবনা আছে কি যে, যদি তোমাদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়, তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলল, আমাদের এমন কি কারণ হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করব না, অথচ আমরা আমাদের বাড়ি-ঘর হতে এবং সন্তানদের হতেও বহিষ্কৃত হয়েছি, অনন্তর যখন তাদেরকে জিহাদের আদেশ করা হলো তখন তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই পশ্চাৎপদ হলো, আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে ভালোরূপেই জানেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧)

(২৪৭) আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, আল্লাহ তা'আলা তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল, আমাদের উপর তার রাজত্ব করার অধিকার কিরূপে থাকতে পারে? অথচ তার তুলনায় আমরাই রাজত্ব করার অধিক যোগ্য, তাকে তো আর্থিক সচ্ছলতা প্রদান করা হয়নি, পয়গম্বর বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মোকাবিলায় তাঁকে নির্বাচিত করেছেন, আর আধিক্য প্রদান করেছেন, তাকে জ্ঞানে এবং দেহাবয়বে, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাজ্য যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, আর আল্লাহ প্রশস্ততা প্রদানকারী, মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ যদি তোমাদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয় أَلَّا تُقَاتِلُوا তোমরা যুদ্ধ করবে না? قَالُوا তারা বলল وَمَا لَنَا আমাদের এমন কি কারণ হতে পারে যে أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করব না وَقَدْ أُخْرِجْنَا অথচ আমরা বহিষ্কৃত হয়েছি مِنْ دِيَارِنَا আমাদের বাড়ি-ঘর হতে وَأَبْنَائِنَا এবং সন্তানদের হতেও فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ অনন্তর যখন তাদেরকে জিহাদের আদেশ করা হলো تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ তখন তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই পশ্চাৎপদ হলো وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে ভালোরূপেই জানেন।

(২৪৭) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নিযুক্ত করেছেন لَكُمْ তোমাদের জন্য طَالُوتَ তালূতকে مَلِكًا বাদশাহ قَالُوا তারা বলতে লাগল أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا আমাদের উপর তার রাজত্ব করার অধিকার কিরূপে থাকতে পারে? وَنَحْنُ أَحَقُّ অথচ আমরাই অধিক যোগ্য بِالْمُلْكِ রাজত্ব করার مِنْهُ তার তুলনায় وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ তাকে তো আর্থিক সচ্ছলতা প্রদান করা হয়নি قَالَ পয়গম্বর বললেন إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মোকাবিলায় তাঁকে নির্বাচিত করেছেন وَزَادَهُ আর আধিক্য প্রদান করেছেন بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ তাকে জ্ঞানে এবং দেহাবয়বে وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাজ্য যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ আর আল্লাহ প্রশস্ততা প্রদানকারী, মহাজ্ঞানী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৪৩) قوله أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বনী ইসরাঈলদের এক সম্প্রদায় আরুরাত অথবা দাউরাদান নামক স্থানে বসবাস করত। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিল, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। তারা ভীত হয়ে সকলে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে এ কথা অবগত করানোর জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না, তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু'জন সে ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন বিকট শব্দ করলেন যে, সকলে একসাথে মৃত্যুবরণ করল। তাদের মধ্যে একটি লোকও জীবিত ছিল না। পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারল, তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের কাফন-দাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না, তাই তাদের চারিদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধ কূপের মতো করে দেওয়া হলো। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃত দেহগুলো পঁচে গলে গেল, আর হার গোড়গুলো তেমনি পড়ে রইল। দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলদের হিযকীল (আ.) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাবার পথে সে বন্ধ স্থানে বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়গুলো থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন; তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ তা'আলা! আপনি তাদের সকলকে পুনর্জীবিত করে দিন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন। আর সকলকে পুনর্জীবিত করে দিলেন। উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –মা'আরেফুল কুরআন

(২৪৫) قوله مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا الخ আয়াতের শানে নুযূল : একদা আবূ দাহ্দাহ্ (রা.) নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুটি বাগান আছে আমি এর একটি দান করলে ঐ জাতীয় বাগান বেহেশতে পাব কি এবং আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিও আমার সাথে থাকবে কি? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে বাগানের দ্বারে গিয়ে তার স্ত্রীকে এ সুসংবাদটি জানাল, তাতে সে আনন্দে বলে উঠল "আপনার কৃত বস্তুতে আল্লাহ বরকত দান করুন" অতঃপর আবূ দাহ্দাহ্ (রা.) উত্তম বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করলেন। তার এ দানের প্রসঙ্গে উপরিউক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গিতে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়েত করেছেন জিহাদের বিধান বর্ণনার পূর্বে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হায়াত-মাউত বা জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। যুদ্ধ বা জিহাদে অংশ নেওয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনি ভীরুতার সাথে আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নয়। তাফসীরে ইবনে কাসীরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধৃতিসহ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোনো এক শহরে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করত। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করার জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না। তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু'জন সে ময়দানের দু' ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই এক সাথে মরে গেল, একটি লোকও জীবিত রইল না; পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারল, তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন-কাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না তাই তাদেরকে চারদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বদ্ধ কূপের মতো করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃতদেহগুলো পচে-গলে গেল এবং হাড়-গোড় তেমনি পড়ে রইল দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের হিযকীল (আ.) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সে বদ্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে মৃত লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে দাও। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গুলোকে আদেশ দিলেন–

অর্থাৎ, ওহে পুরাতন হাড়সমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিজ নিজ স্থানে সমবেত হতে আদেশ করেছেন। আল্লাহর নবীর যবানীতে এসব হাড় আল্লাহর আদেশ শ্রবণ করল। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর] অনেক জড়বস্তুকে হয়তো মানুষ অনুভূতিহীন মনে করে, কিন্তু দুনিয়ার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুও আল্লাহর অনুগত ও ফরমাবরদার এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুযায়ী বুদ্ধি ও অনুভূতির অধিকারী। কুরআনে কারীম أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে তার উপযুক্ত হেদায়েত দান করেছেন।

মোটকথা, একটি মাত্র শব্দে প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পুনঃস্থাপিত হলো। অতঃপর সে নবীর প্রতি নির্দেশ হলো, সেগুলোকে বলো, 'ওহে হাড়সমূহ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ ও চামড়া দ্বারা সুসজ্জিত হও।'

সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। অতঃপর রূহকে আদেশ করা হলো। হে আত্মাসমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ উচ্চারিত হতেই সে নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত হয়ে দাঁড়ালো এবং বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকাতে আরম্ভ করল। আর সবাই বলতে লাগল سُبْحَانَكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ "তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই।"

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবিকে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কিয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এর বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা তা জিহাদ হোক কিংবা প্লেগ মহামারীই হোক, আল্লাহ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদর পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মূহুর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মূহুর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

এখন ঘটনাটি কুরআনের ভাষায় লক্ষ্য করুন! কুরআন মাজীদ ইরশাদ করেছে– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ অর্থাৎ আপনি কি সেসব লোকের ঘটনা লক্ষ্য করেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল।"

লক্ষণীয় যে, এ ঘটনা হুজুর ﷺ-এর যুগের হাজার হাজার বছর পূর্বেকার। হুজুর ﷺ-এর পক্ষে এ ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। তাই এখানে اَلَمْ تَرَ বলার উদ্দেশ্য কি? মুফাসসিরগণ বলেছেন, এমনিভাবে যেসব ঘটনা সম্পর্কে اَلَمْ تَرَ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ ঘটনা হুজুর ﷺ-এর যুগের বহু পূর্বেকার যা হুজুরে পাক ﷺ-এর দেখার কথা কল্পনা ও করা যায় না। সে সব ক্ষেত্রে দেখা দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মার দর্শন। এসব ক্ষেত্রে اَلَمْ تَرَ দ্বারা اَلَمْ تَعْلَمْ [আপনি কি জানেন না?] বুঝানো হয়। তবুও اَلَمْ تَرَ শব্দে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ঘটনা যে সবারই জানা, সুপ্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার, এদিকে ইঙ্গিত করা। বুঝানো হচ্ছে যে, ঘটনাটি এমনি সুপ্রসদ্ধি এবং বহুল আলোচিত যেন এখনো ইচ্ছা করলে তা দেখা যেতে পারে কিংবা দেখার যোগ্য। اَلَمْ تَرَ-এর পরে اِلٰى শব্দ যোগ করায় ভাষাগত দিক দিয়ে এদিকেই ইঙ্গিত বুঝায়। অতঃপর কুরআন কারীম তারা সংখ্যায় অনেক ছিল বলে উল্লেখ করেছে। وَهُمْ اُلُوْفٌ অর্থাৎ সংখ্যা তারা ছিল হাজার হাজার। এ সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু আরবি ভাষার নিয়মানুযায়ী এ শব্দটি অধিকতা বাচক বহুবচন। এতে বুঝা যায় যে, তাদের সংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল না।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে– فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বললেন, "তোমরা মরে যাও।" আল্লাহর এ আদেশ প্রত্যক্ষও হতে পারে, বা পরোক্ষভাবে কোনো ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে।

অতঃপর বলেছেন– اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। এতে সে করুণাও অন্তর্ভুক্ত যা বনী ইসরাঈলদের উল্লিখিত দলটির প্রতি পুনর্জীবন দানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল এবং সে দয়াও শামিল যাতে উম্মতে মুহাম্মদীকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

অতঃপর পথভোলা মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ইরশাদ হয়েছে– وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার শত সহস্র দয়া ও করুণার নির্দশন মানুষের সামনে অহর্নিশ উপস্থিত হতে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

প্রাসঙ্গিকভাবে এ আয়াত অন্য কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের উপর কোনো তাদবীর কার্যর হতে পারে না। জিহাদ অথবা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যা কোনো ব্যতিক্রম হওয়ার নয়।

দ্বিতীয়তঃ কোনোখানে কোনো মহামারী কিংবা কোনো মারাত্মক রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেওয়া বৈধও নয়। রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ মোতাবেক অন্য এলাকার লোকের পক্ষেও মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া বৈধ নয়। হাদীসে বলা হয়েছে সে রোগের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের উপর আজাব নাজিল করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোনো শহরে প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেয়ো না আর যদি কোনো এলাকাতে এ রোগ দেখা দেয় এবং তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না।'

প্লেগ সম্পর্কে মহানবীর উক্তির দর্শন : এ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, 'কোথাও যাওয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে না, আবার কোনোখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নয়। এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমতঃ মহামারীগ্রস্ত এলাকাব বাইরের লোককে আসতে নিষেধ করার পর একটি তাৎপর্য এই যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার পর তার হায়াত শেষ হওয়ার দরুনই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করল, এতদসত্ত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, সেখানে না গেলে হয়তো সে মারা যেত না। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও হয়তো এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হতো না। অথচ যা ঘটেছে তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। যেখানেই থাকতো তার মৃত্যু এ সময়েই হতো। এ আদেশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে, যাতে করে তারা কোনো ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হয়।

দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো এই যে, এতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে কষ্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়; বরং সাধ্যমতো ঐসব বস্তু থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া নিজের জানের হেফাজত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়মের চাহিদাও তাই যে, আল্লাহর দেওয়া তাকদীরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেসব স্থানে প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকে, সেসব স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার সতর্কতামূলক তদবীর।

এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করার মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিত। একটি হচ্ছে এই যে, যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে থাকে, তবে সাধারণভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল তারা তো সহজেই পালাতে পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের অবস্থা কি হবে? আর যারা রোগাক্রান্ত তাদের সেবা-শুশ্রুষা কিংবা মারা গেলে দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে?

দ্বিতীয়তঃ যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়তো রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়ি-ঘর ছেড়ে বের হয়ে থাকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরো বেড়ে যাবে। কারণ, প্রবাসজীবনে রোগাক্রান্ত হলে যে কি অবস্থা হয় তা সবারই জানা।

তৃতীয়তঃ যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া প্রবেশ করে থাকে, তবে তা বিভিন্ন এলাকায় ছিড়িয়ে পড়বে। আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহর উপর ভরসা করে পড়ে থাকে তবে হয়তো নাজাত পেতে পারে। আর যদি এ রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্যে থাকে, তবে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।

ইমাম বুখারী (র.) ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে জানিয়েছেন, তিনি রাসূল ﷺ-কে প্লেগ মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল ﷺ তাঁকে বলেছেন, এ রোগটি আসলে শাস্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে জাতিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য হতো তাদের ভিতরে পাঠানো হতো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর যেসব বান্দা এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকায়ই ধৈর্যসহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মতো ছওয়াব পাবে। হুজুর ﷺ-এর বাণী– 'প্লেগ শাহাদাত এবং প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ' এর ব্যাখ্যাও তাই।

এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পলায়ন করা হারাম। এ বিষয়টি কুরআনের অন্যত্র অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

এটা একান্তই আল্লাহর কুদরত যে, সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিপাহসালার আল্লাহর অসি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) যার সমগ্র ইসলামি জীবনই জিহাদে অতিবাহিত হয়েছে, তিনি কোনো জিহাদে শহীদ হননি; বরং রোগাক্রান্ত হয়ে বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করার আক্ষেপে তিনি অনুতাপ করেছিলেন এবং পরিবারের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আমি অমুক অমুক বিরাট বিরাট জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছি। আমার শরীরের এমন কোনো জায়গা নেই যা তীর-বল্লম অথবা অন্য কোনো মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে যখম হয়নি। কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, আজ আমি গাধার মতো বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। আল্লাহ যেন আমাকে ভীরু-কাপুরুষের প্রাপ্য শাস্তি না দেন মৃত্যু ভয়ে যারা জিহাদ থেকে সরে থাকতে চায়, তাদেরকে আমার জীবনের এ উপদেশমূলক ঘটনাটি শুনিয়ে দিও।'

قوله يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا করজ বা ঋণ অর্থ নেক আমল ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এখানে করজ বা ঋণ শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই তো একমাত্র মালিক তিনিই। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব, সেভাবে তোমাদের সদ্ব্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেওয়া হবে।

বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহর পথে একটি খেজুর দানা ব্যয় করলে, আল্লাহ তা'আলা একে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দিবেন যে, তা পরিমাণে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি হবে। আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেওয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেওয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন

১. কোনো একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ দু'বার সদকা করার সমতুল্য।"

২. ইবনে আরাবী (র.) বলেন, এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একদল দুর্ভাগা বলাবলি করতো যে, মুহাম্মদের রব অভাবী এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে, আর আমরা অভাবমুক্ত। এর উত্তরে ইরশাদ হয়েছে–إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا।

দ্বিতীয় দল হচ্ছে সে সমস্ত লোকের, যারা এ আয়াত শুনে এর বিরুদ্ধাচরণ এবং কার্পণ্য অবলম্বন করেছে। ধন-সম্পদের লোভ তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার তৌফিক তাদের হয়নি।

তৃতীয় দল হচ্ছে সেসব নিষ্ঠাবান মুসলমানদের, যাঁরা এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই সাড়া দিয়েছিলেন এবং নিজেদের পছন্দ করা সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। যেমন- আবূ দাহদাহ (রা.) প্রমুখ। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবূ দাহদাহ (রা.) রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তাঁর তো ঋণের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এর বদলে তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন। হযরত আবূ দাহদাহ (রা.) একথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। হযরত আবূ দাহদাহ (রা.) বলতে লাগলেন– 'আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহকে ঋণ দিলাম। রাসূল ﷺ বললেন, একটি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দাও এবং অন্যটি নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও। হযরত আবূ দারদাহ (রা.) বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দু'টি বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম– যাতে খেজুরের ছয় শ' ফলন্ত বৃক্ষ রয়েছে, সেটা আমি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন এর বদলে আল্লাহ তোমাকে জান্নাত দান করবেন।

হযরত আবূ দাহদাহ (রা.) বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন। স্ত্রীও তাঁর এ সৎকর্মের কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন : খেজুরের পরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষ এবং প্রশস্ত অট্টালিকা আবূ দাহদাহর জন্য তৈরি হয়েছে।

৩. ঋণ দেওয়ার বেলায় তা ফেরত দেওয়ার সময় যদি কিছু অতিরিক্ত দেওয়ার কোনো শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশি দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার [ঋণের] হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে।'

তবে যদি অতিরিক্ত দেওয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م . و . ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা মরে যাও।

أَحْيَاهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح . ى . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সে জীবিত করল।

قَاتِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْقِتَالُ মূলবর্ণ (ق . ت . ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জিহাদ কর।

اِعْلَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ سَمِعَ বাব اَلْعِلْمُ মাসদার (ع . ل . م) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জান।

قَدْ اُخْرِجْنَا : সীগাহ جمع متكلم ماضى قريب مجهول বহছ اِفْعَالٌ বাব اَلْاِخْرَاجُ মাসদার (خ . ر . ج) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– আমাদেরকে বের করা হয়েছে।

دِيَارِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন دَارٌ অর্থ– ঘরসমূহ।

اَبْنَآءٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে اِبْنٌ অর্থ– ছেলেরা।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب ماضى معروف বহছ تَفَعُّلٌ বাব اَلتَّوَلِّىْ মাসদার (و . ل . ى) মূলবর্ণ জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা বিমুখ হলো।

اصْطَفٰى : সীগাহ واحد مذكرغائب ماضى معروف বহছ اِفْتِعَالٌ বাব اَلْاِصْطِفَاءُ মাসদার (ص . ف . و) মূলবর্ণ জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি নির্বাচন করেছেন।

يُؤْتِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ اِفْعَالٌ বাব اَلْاِيْتَاءُ মাসদার (ا . ت . ى) মূলর্বণ জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ– তিনি দান করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ الخ : এখানে أ টি استفهامية আর تَرَ لَمْ হলো فعل এবং اِلٰى حرف جار ও اَلَّذِيْنَ হলো اسم موصول আর خَرَجُوْا হলো فعل এতে هُمْ যমীর হলো ذو الحال আর و টি حالية এবং هُمْ টি مبتدأ আর اُلُوْفٌ তার خبر এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়ে حال অতঃপর ذو الحال ও حال মিলে فاعل হয়েছে। من টি حرف جار ও دِيَارِهِمْ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে। حذر الموت উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول له হয়েছে। এখন فعل ـ فاعل ـ مفعول له ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে صلة এবার موصول ও صلة মিলে مجرور হলো اِلٰى হরফে জারের। জার ও মাজরুর মিলে متعلق হলো لَمْ تَرَ ফে'ল-এর। অবশেষে لَمْ تَرَ ফে'ল তার فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ : এখানে و টি حرف عطف হয়েছে, اِلَيْهِ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق مقدم আর تُرْجَعُوْنَ ফে'লে مجهول এতে اَنْتُمْ যমীর نائب فاعل এখন فعل مجهول ـ نائب فاعل ও متعلق مقدم মিলে جملة فعلية হলো।

قوله اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى : এখানে أ টি استفهامية এবং حرف لَمْ تَرَ হলো فعل আর اَنْتَ যমীর فاعل এবং اِلَى الْمَلَاِ উভয়টি جار ও مجرور মিলে প্রথম متعلق তারপর من টি حرف جار এবং بَنِىْ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে দ্বিতীয় متعلق اِسْرَآئِيْلَ আর من হলো حرف جر এবং موسى بعد উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে তৃতীয় متعلق অতঃপর فعل ـ فاعل ও সকল متعلق মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٢٤٨)

অনুবাদ (২৪৮) আর তাদের নবী তাদেরকে বললেন, তার বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি আসবে, যাতে সান্ত্বনার বস্তু রয়েছে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আর কতক উদ্বৃত্ত বস্তু রয়েছে যা মূসা ও হারূন (আ.) পরিত্যাগ করে গেছেন, উক্ত সিন্দুক ফেরেশতাগণ বহন করে আনবে, তাতে তোমাদের জন্য পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (٢٤٩)

(২৪৯) অনন্তর যখন তালূত সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদী দ্বারা, সুতরাং যে ব্যক্তি তা হতে পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়, আর যে ব্যক্তি তা মুখেও না নেয় সে আমার দলভুক্ত, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি স্বীয় হস্তে এক অঞ্জলি পানি পান করে [তবে এতটুকু অনুমতি আছে], অতঃপর সকলেই তা হতে পান করতে লাগল, তাদের মধ্যকার অল্পকয়েকজন ব্যতীত, সুতরাং যখন তালূত এবং তাঁর সঙ্গী-মুমিনগণ নদী অতিক্রম করে গেলেন, তারা বলতে লাগল– আজ তো আমাদের মধ্যে জালূত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না, এরূপ লোক যাদের এই ধারণা ছিল যে, তারা অবশ্যই আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে, বলতে লাগল, কত কত ক্ষুদ্র দল বৃহত্তম দলের উপর আল্লাহর হুকুমে জয় লাভ করেছে, বস্তুত আল্লাহ অটল সঙ্কল্পকারীদের সহায়তা করেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৪৮) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ আর তাদের নবী তাদেরকে বললেন اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ তার বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন এই যে, اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি আসবে فِيْهِ سَكِيْنَةٌ যাতে সান্ত্বনার বস্তু রয়েছে مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে وَبَقِيَّةٌ আর কতক উদ্বৃত্ত বস্তু রয়েছে مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ যা মূসা ও হারূন পরিত্যাগ করে গেছেন تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ উক্ত সিন্দুক ফেরেশতাগণ বহন করে আনবে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ তাতে তোমাদের জন্য পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

(২৪৯) فَلَمَّا فَصَلَ অনন্তর যখন যাত্রা করলেন طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ তালূত সৈন্যবাহিনী নিয়ে قَالَ তখন তিনি বললেন اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদী দ্বারা فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ সুতরাং যে ব্যক্তি তা হতে পানি পান করবে فَلَيْسَ مِنِّيْ সে আমার দলভুক্ত নয় وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ আর যে ব্যক্তি তা মুখেও না নেয় فَاِنَّهٗ مِنِّيْ সে আমার দলভুক্ত اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ হ্যাঁ, যে ব্যক্তি স্বীয় হস্তে এক অঞ্জলি পানি পান করে فَشَرِبُوْا مِنْهُ অতঃপর সকলেই তা হতে পান করতে লাগল اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ তাদের মধ্যকার অল্পকয়েকজন ব্যতীত فَلَمَّا جَاوَزَهٗ সুতরাং যখন নদী অতিক্রম করে গেলেন هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ তালূত এবং তাঁর সঙ্গী-মুমিনগণ قَالُوْا তারা বলতে লাগল– لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ আজ তো আমাদের মধ্যে ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ জালূত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হওয়ার قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ এরূপ লোক যাদের এই ধারণা ছিল যে, اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ তারা অবশ্যই আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে, বলতে লাগল كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ কত কত ক্ষুদ্র দল غَلَبَتْ জয় লাভ করেছে فِئَةً كَثِيْرَةً বৃহত্তম দলের উপর بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর হুকুমে وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ বস্তুত আল্লাহ অটল সঙ্কল্পকারীদের সহায়তা করেন।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (۲۵۰)

অনুবাদ : (২৫০) আর যখন সমরক্ষেত্রে জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো, তখন বলতে লাগল, হে আমাদের প্রভু! আমাদের অন্তরে দৃঢ়তা নাজিল করুন আর আমাদের পদ দৃঢ় রাখুন, আর আমাদেরকে এই কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী করুন।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (۲۵۱)

(২৫১) অনন্তর তালূতের বাহিনী জালূতের দলকে আল্লাহর হুকুমে পরাস্ত করে দিল। আর দাউদ (আ.) জালূতকে হত্যা করেছেন, আর তাকে আল্লাহ পাক রাজত্ব ও জ্ঞান দান করলেন উপরন্তু আরো যা কিছু আল্লাহ ইচ্ছা করলেন তাকে শিক্ষা দিলেন, আর যদি আল্লাহ তা'আলা মানব সমাজের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রদমিত না করতে থাকতেন, তবে বিশ্ব অশান্তিপূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ খুবই অনুগ্রহশীল বিশ্ববাসীর প্রতি।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (۲۵۲)

(২৫২) এই সমুদয় আল্লাহর আয়াত যা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনাচ্ছি আপনাকে, আর নিশ্চয় আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৫০) وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ আর যখন সমরক্ষেত্রে জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো। قَالُوْا তখন বলতে লাগল رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا হে আমাদের প্রভু! আমাদের অন্তরে দৃঢ়তা নাজিল করুন وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا আর আমাদের পদ দৃঢ় রাখুন وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ আর আমাদেরকে এই কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী করুন।

(২৫১) فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ অনন্তর তালূতের বাহিনী জালূতের দলকে আল্লাহর হুকুমে পরাস্ত করে দিল। وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ আর দাউদ (আ.) জালূতকে হত্যা করেছেন وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ আর তাকে আল্লাহ পাক দান করলেন الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ রাজত্ব ও জ্ঞান وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ উপরন্তু আরো যা কিছু আল্লাহ ইচ্ছা করলেন তাকে শিক্ষা দিলেন وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ আর যদি আল্লাহ তা'আলা প্রদমিত না করতে থাকতেন النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ মানব সমাজের এক দলকে অন্য দল দ্বারা لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ তবে বিশ্ব অশান্তিপূর্ণ হয়ে যেত وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ কিন্তু আল্লাহ খুবই অনুগ্রহশীল عَلَى الْعٰلَمِيْنَ বিশ্ববাসীর প্রতি।

(২৫২) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ এই সমুদয় আল্লাহর আয়াত نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ যা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনাচ্ছি আপনাকে وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ আর নিশ্চয় আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বনী ইসরাঈলের নবীর পরিচয় : হযরত মূসা (আ.)-এর যুগ হতে বনী ইসরাঈলগণ "তাবূতে সাকিনা" (শান্তির সিন্দুক) টি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। যার কল্যাণে বা বরকতে তারা বিজয় লাভ করত। কালক্রমে তাদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকায় আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট হতে এ বরকতটি ছিনিয়ে নেন। নবুয়ত প্রাপ্তি তাদের মধ্য হতে সমাপ্তি ঘটে। তাদের বংশে শুধুমাত্র একজন গর্ভবতী মহিলা জীবিত ছিল। তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তার নাম রাখা হয় শামাবীল বা সামাউন। নবুয়তের বয়সে তিনি নবুয়ত লাভ করেন। নবুয়তের দায়িত্ব পালন কালে তাঁর কওম তাঁর নিকট একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার আবেদন জানান। যার নেতৃত্বে তারা জিহাদ করবে। তিনি আল্লাহ তা'আলার আদেশে তালূতকে বাদশাহ নিযুক্ত করলেন।

তালূতের পরিচয় : তালূত বিনইয়ামীন গোত্রের লোক। বাইবেলে তাঁর নাম বলা হয়েছে "শোল।" তিনি সাধারণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন তিনি তাঁর পিতার হারানো গাধার খোঁজে বের হয়েছিলেন। যেতে যেতে তিনি হযরত শামাবীল (আ.)-এর বাসস্থানের নিকট পৌঁছলে তিনি (শামাবীল) আল্লাহর নির্দেশে তালূতকে বাড়িতে নিয়ে যান, তাঁর মাথায় তেল দেন এবং তাকে চুম্বন করেন। আর বনী ইসরাঈলদের একটি সাধারণ সভা ডেকে এ যুবককে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করেন। বনী ইসরাঈলগণ প্রথমে তাঁর রাজত্ব স্বীকার করেনি। কারণ তিনি কোনো রাজ বংশ বা ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেননি। অবশ্য পরে নবীর আদেশক্রমে তাঁর রাজা সুলভ নিদর্শন দেখে বাদশাহ হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

قوله أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ -এর সংশ্লিষ্ট ঘটনা : তালূত বনী ইসরাঈলদের বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার উত্তম নিদর্শন হচ্ছে যে, তাদের হারানো "তাবূতে সাকীনাহ" (শান্তির সিন্দুক) খানা ফিরে পাবে। বনী ইসরাঈলগণ আল্লাহর ঐতিহ্য হতে বিচ্ছিন্ন হলে, তাদের অন্যায়-অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছলে এ সিন্দুকটি জালূত এর হস্তগত হয়। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বনী ইসরাঈলদেরকে এ সিন্দুকটি ফিরিয়ে দিলেন। ঘটনার বিবরণ এই, কাফেররা সিন্দুকটি যেখানেই রাখত সে এলাকাতেই ভীষণ বিপদ আপদ উপস্থিত হতো। অবশেষে বাধ্য হয়ে জালূত সিন্দুকটিকে একটি গরুর গাড়ী দিয়ে নিজ এলাকা হতে পাঠিয়ে দিয়ে নিস্তার পেল। ফেরেশ্তাগণ গাড়ি খানিকে বনী ইসরাঈলদের নিকট পৌঁছে দিলেন। তাতে বনী ইসরাঈলগণ আনন্দিত হয়ে তালূতকে বাদশাহ বলে স্বীকার করে নিল।

তাবূতে সাকীনার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য : কারো মতে এটি একটি সোনার থালা ছিল, যাতে নবীদের অন্তঃকরণ ধৌত করা হতো। এটি হযরত মূসা (আ.) প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যাতে তিনি তাওরাতের তখতীগুলো রেখেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর মুখ ছিল, রুহও ছিল এবং দুটি মাথা ও লেজ ছিল। যখন তারা তার নিকট কোনো সাহায্য চাইতো, তখন তা পেত, ফলে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করত। তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে এর মাধ্যমে মীমাংসা করে নিত। আবার কারো মতে তা ছিল একটি সিন্দুক।

হযরত মূসা (আ.) তাওরাতের যে সংকলন করেছিলেন, তার মূল গ্রন্থও তাতে সংরক্ষিত ছিল। একটি বোতলে কিছুটা "মান্না" ও ছিল। যেন পরবর্তী বংশধরগণ তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি মরু ভূমিতে প্রদত্ত আল্লাহর এ অপূর্ব অনুগ্রহের কথা স্মরণ করতে পারে। হযরত মূসা (আ.)-এর হাতের লাঠিও তাতে সংরক্ষিত ছিল।

قوله سَكِينَةٌ الخ -এর উদ্দেশ্য : سَكِينَةٌ শব্দের উদ্দেশ্য বর্ণনায় মুফাস্সিরগণ মতানৈক্য করেছেন। (১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাকীনা হলো জান্নাতী পেয়ালা যাতে নবীদের অন্তর ধোয়া হয়েছিল। (২) হযরত আলী (রা.) বলেন, এটি একটি প্রবল বাতাস। (৩) কেউ কেউ বলেন, سَكِينَةٌ হলো বনী ইসরাঈলরা যখন তালূতের ব্যাপারে মতভেদ করছিল এবং এ মতভেদের পর যে নিষ্কৃতি পেয়েছিল তাই سَكِينَةٌ (৪) কারো কারো মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বয়ং তাবূত যা তাদের প্রশান্তির কারণ হবে এবং যুদ্ধের মাঠে তাবূত সামনে থাকলে তারা মানসিক প্রশান্তির কারণে যুদ্ধের মাঠ ত্যাগ করবে না। (৫) ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেন, سَكِينَةٌ আল্লাহর পক্ষ হতে একটি রুহ যা কথা বলত এবং সঠিক বস্তুটি উপস্থাপন করত। আর যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে আওয়াজ করে লোকদের উৎসাহিত করত।

قوله وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ الخ -এর ব্যাখ্যা : بَقِيَّةٌ শব্দ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এ বিষয়ে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। بَقِيَّةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ অবশিষ্টাংশ। অর্থাৎ তার মধ্যে মূসা ও হারূন (আ.)-এর রেখে যাওয়া স্মৃতির অবশিষ্টাংশ ছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) এ প্রসঙ্গে তাঁর কিতাবে অনেকের অভিমত উল্লেখ করেছেন।

(১) হযরত ইকরামা (র.) বলেন, بَقِيَّةٌ দ্বারা তাওরাত কিতাব বুঝানো হয়েছে যা মূসা ও হারূন (আ.) বনী ইসরাঈলদের জন্য অনুকরণীয় বস্তু হিসেবে রেখে যান। (২) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, بَقِيَّةٌ দ্বারা হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আ.)-এর লাঠি উদ্দেশ্য, যা তাবূতে রক্ষিত ছিল। (৩) হযরত আবূ সালেহ (র.) বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি, কাপড় এবং হারূন (আ.)-এর কাপড়, পাগড়ি ও তাওরাত উদ্দেশ্য।

قوله فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ الخ আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা : তালূত যখন জালূতের বিরুদ্ধে যাত্রার জন্য যুবক লোকদের প্রতি আহ্বান জানাল, তখন সখের বসে আশি হাজার সৈন্য তালূতের সঙ্গী হলো। আল্লাহর পক্ষ হতে তালূত তাদেরকে পরীক্ষা করলেন। আর তা হচ্ছে– পথিমধ্যে একটি নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হবে। তিনি বললেন, যারা এ নদীর পানি এক অঞ্জলী ব্যতীত অধিক পরিমাণে পান করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। আর যারা মোটেই পান করবে না অথবা হাতের এক অঞ্জলী মাত্র পান করবে তারা আমার লোক তাতে সন্দেহ নেই। নদী পার হওয়ার সময় ছিল প্রচণ্ড গরম। সুতরাং সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই পেট ভরে পানি পান করে নিল, তবে তাদের পিপাসা আরও বেড়ে গেল।

قوله قَالَ إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ الخ -এর মর্মার্থ : মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, এ পরীক্ষার কারণ আমার মতে এই যে, অনুরূপ ক্ষেত্রে মানুষের জোশ ও উত্তেজনা অনেক গুণে বেড়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এগিয়ে আসে। উপরন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য লোকদেরকেও বিচলিত করে। এসব লোকদের দূরে সরানোই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। তাই তাদের জন্য আল্লাহ এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন যা ছিল অত্যন্ত উপযোগী। কেননা যুদ্ধের সময় অত্যন্ত প্রখর দিনে প্রবল পিপাসায় প্রচুর পানি পাওয়া সত্ত্বেও পান না করা বিরাট দৃঢ়তার পরিচায়ক। উল্লেখ্য, কুরআনে যে নদীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো জর্দান নদী।

طَالُوْتَ -এর নামকরণ : طَالُوْتَ শব্দটি طُوْل ধাতু থেকে গঠিত। طَالُوْتَ উচ্চারণে اسم فاعل مبالغة -এর সীগাহ, যার অর্থ–অধিক লম্বা। তিনি যেহেতু বনী ইসরাঈলের মধ্যে সবচেয়ে সুঠামদেহী ও অধিকতর লম্বা ছিলেন, এ জন্যই তাঁকে তালূত নামকরণ করা হয়েছে। বাস্তবে এ শব্দটি একটি হিব্রু শব্দ। অতএব, طُوْل শব্দ থেকে এর আরবিকরণ পণ্ডশ্রম মাত্র। তালূত মোট চল্লিশ বছর বনী ইসরাঈলের রাজা ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি একধারে নবী ও বাদশাহ ছিলেন। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, তিনি রাজা ছিলেন। তবে শামাবীল নবীর ওহী দ্বারা তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতেন।

قوله قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ الخ -এর সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা : রূহুল মা'আনীতে ইবনে আবূ হাতেমের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়াতের উদ্ধৃতিতে ঘটনাটির যে বিবরণ বর্ণিত হয়েছে, হতে বুঝা যায় যে, এতে তিন প্রকার লোক ছিল। যেমন–(১) একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ততে পারেনি। (২) দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই; কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে শত্রুর মোকাবিলায় বিজয় লাভে আস্থাহীন ছিল। (৩) তৃতীয় দল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যা লঘিষ্টতার জন্য কোনো চিন্তা করেননি।

তালূতের সৈন্য সংখ্যা : ইমাম সুদ্দির মতে তালূতের প্রাথমিক সৈন্য সংখ্যা আশি হাজার ছিল। বুখারী শরীফে বদর যুদ্ধের বর্ণনা অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, বদরে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা তালূতের সৈন্য বাহিনীর সমান ছিল। তাতে বুঝা যায় যে, যারা নদী অতিক্রম করে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ বা তার চেয়ে কিছু বেশি। কেউ কেউ ৩৬০ বলে বর্ণনা করেছেন।

قوله وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -এর ব্যাখ্যা : তালূত যুদ্ধের জন্য ডাক দেওয়াতে ঝোঁকের বশে অনেকেই সেনাদলে যোগদান করে, কিন্তু হীনমনোবল ব্যক্তিদের কারণে দৃঢ়মনা যোদ্ধাদের মনেও তাদের সাথে সাথে দুর্বলতা এসে যেতে পারে, সেহেতু হীনমনোবল ব্যক্তিদেরকে তালূতের সেনাবাহিনী হতে বের করার উদ্দেশ্যেই একটি নদী দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করেন। অত্যন্ত প্রখর দিনে প্রবল পিপাসায় প্রচুর পানি পাওয়া সত্ত্বেও পান না করা বিরাট ধৈর্যশীল হওয়ার পরিচায়ক, সুতরাং এ মহা পরীক্ষায় যারা ধৈর্য সহকারে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের সঙ্গেই আল্লাহ রয়েছেন এবং তাঁদেরকেই বিজয় দিয়েছেন।

তালূত ও জালূতের ঘটনা : হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের এগার শত বৎসর পূর্বে আমালিকা নামক স্থানে বর্তমান সিরিয়া রাজ্যে হযরত শামুয়েল (আ.)-এর জমানায় জালূত নামক এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিল। সে বনী ইসরাঈলদেরকে পরাজিত করে তাদের থেকে তাদের পুত্র কন্যা ও সহায় সম্পত্তি কেড়ে নেয়। তারা হযরত শামুয়েল (আ.)-এর নিকট জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার আহবান জানায়। হযরত শামুয়েল (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তালূত নামক জনৈক ব্যক্তিকে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করেন। তালূত সম্পদশালী নয় এবং সাধারণ পরিবারের লোক বিধায় লোকেরা তাঁকে বাদশাহ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা আপত্তি করে যে, রাজত্বের ব্যাপারে তালূত অপেক্ষা আমরাই বেশি হকদার। হযরত শামুয়েল (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তালূতকে দৈহিক শক্তি ও রাজনৈতিক জ্ঞান দান করেছেন। তা ছাড়া তালূতের মানোনয়নের নিদর্শন হচ্ছে যে, তোমাদের হারানো সম্পদ "তাবূতে সাকিনা" ফেরেশতা কর্তৃক পুনরায় তোমাদের হস্তগত হবে। এ শুভ সংবাদ পেয়ে সকলেই তালূতকে বাদশাহ হিসেবে মেনে নিল। অবশেষে তালূত আশি হাজার সৈন্য নিয়ে জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে সৈন্যরা পানি পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পানি প্রার্থনা করলে তালূত বললেন, তোমাদের যাত্রা পথে সামনে একটি নদী পড়বে। এ নদীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান এবং ধৈর্য পরীক্ষা করবেন। আর তা হচ্ছে নদী অতিক্রমকালে প্রচণ্ড তৃষ্ণায়ও তোমরা নদী হতে পানি পান করতে পারবে না তবে এক অঞ্জলী পরিমাণ পানি পান করতে পারবে। তার বেশি নয়। যে এক অঞ্জলীর

অধিক পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। তাদের মধ্য হতে কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন পাকা ঈমানদার ব্যতীত আর কেউই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না। উত্তীর্ণের সংখ্যা ছিল তালূতসহ ৩১৩ জন। বাকি সবাই পেট পূর্ণ করে পানি পান করার ফলে নদীর তীরে পড়ে রইল। জালূতের তিন লক্ষ সৈন্য দেখে অল্প সংখ্যক দুর্বল ঈমানের লোকেরা ঘাবড়ে গেল এবং যুদ্ধ করার অস্বীকৃতি জানাল। কিন্তু মজবুত ঈমানের লোকেরা যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের পূর্ণ বিশ্বাসী, তারা বলল– অনেক ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে। জিহাদে জয়লাভ করার মূল বস্তু হচ্ছে ঈমান। সুতরাং তারা আমালিকায় পৌঁছে যুদ্ধের সম্মুখীন হলো এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাল যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সুদৃঢ় থাকার শক্তি দিন এবং ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন। মুনাজাত শেষে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যুদ্ধে জালূত হযরত দাউদ (আ.)-এর হাতে নিহত হয় এবং বনী ইসরাঈলগণ জয়লাভ করে।

হযরত দাউদ (আ.)-এর পরিচয় : বনী ইসরাঈলদের নবী হযরত শামুয়েল (আ.) ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর হাতে জালূতের মৃত্যু নির্দিষ্ট। তাই নবী হযরত দাউদ (আ.)-কে খোঁজ করে তাঁর পিতার নিকট হতে অনুমতি নিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তখন তিনি অত্যন্ত ছোট ছিলেন। যুদ্ধে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তিনটি পাথর হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে কথা বলে যে, اِنَّكَ بِنَا تَقْتُلُ جَالُوْتَ অর্থাৎ আপনি আমাদের দ্বারা জালূতকে হত্যা করতে পারবেন। তিনি পাথরগুলোকে সাথে নিয়ে নিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এদিকে জালূত ঘোষণা দিল যে, যে আমাকে হত্যা করতে পারবে সে আমার বাদশাহী পাবে। বিশাল দেহী জালূত এগিয়ে আসলে হযরত দাউদ (আ.) তার মাথার প্রতি লক্ষ্য করে পরপর পাথরগুলো নিক্ষেপ করেন। ফলে জালূত নিহত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-কে বাদশাহী এবং নবুয়ত প্রদান করেন, আর জালূতের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। –[বায়যাবী]

শব্দ বিশ্লেষণ

مُبْتَلِيْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِلَاءُ মূলবর্ণ (ب . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পরীক্ষাকারী।

نَهَرٍ : শব্দটি একবচন, বহুবচন انهار অর্থ– নদী।

لَمْ يَطْعَمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلطَّعْمُ মূলবর্ণ (ط . ع . م) জিনস صحيح অর্থ– স্বাদ গ্রহণ করবে না।

اغْتَرَفَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِغْتِرَافُ মূলবর্ণ (غ . ر . ف) অর্থ– অঞ্জল ভর্তি করল।

شَرِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلشُّرْبُ মূলবর্ণ (ش . ر . ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা পান করেছে।

جَاوَزَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُجَاوَزَةُ মূলবর্ণ (ج . و . ز) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে অতিক্রম করে।

مُلٰقُوْا : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাবে مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُلَاقَاةُ মূলবর্ণ– (ل . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সাক্ষাৎকারীগণ।

بَرَزُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبُرُوْزُ মূলবর্ণ (ب . ر . ز) জিনস صحيح অর্থ– তারা বের হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ : এখানে ان হলো حرف مشبه بالفعل ও اللّٰهَ হলো اِنَّ-এর ইসম আর مُبْتَلِيْ হলো شبه فعل এতে هُوَ যমীর نائب فاعل এবং كُمْ টি ضمير مفعول আর بِنَهَرٍ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে। এবার شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে ان এর خبر এবার ان তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

قوله كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ : এখানে كَمْ টি خبرية ، مميزة এবং مِنْ টি حرف جار ও فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ টি صفت ও موصوف মিলে مجرور হয়েছে। এবার جار ও مجرور মিলে تميز অতঃপর تميز ও مميزة মিলে مبتدأ হয়েছে, غَلَبَتْ ফে'ল, এতে هِيَ যমীর ফা'য়েল, যা প্রথম فِئَةٌ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। فِئَةً كَثِيْرَةً মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফউলে বিহী, بِاء হরফে জার, اِذْنِ اللّٰهِ মোযাফ ও মোযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক। এখন ফে'ল, ফা'য়েল, মাফউল ও মুতা'আল্লিক মিলে جملة فعلية হয়ে খবর। অবশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ : এখানে واو টি হরফে আতফ قَتَلَ ফে'ল دَاوُدُ ফায়েল جَالُوْتَ মাফউল, এখন ফে'ল ফায়েল ও মাফউল মিলে جملة فعلية হলো।

قوله وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ এখানে واو টি حرف عطف আর اٰتٰى ফে'ল, এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল, ةُ টি প্রথম মাফউল الْمُلْكَ মা'তূফ আলাইহি واو টি حرف عطف এবং الْحِكْمَةَ মা'তূফ। অতঃপর মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে দ্বিতীয় মাফউল। অতএব ফে'ল, ফায়েল ও উভয় মাফউল মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ : এখানে واو টি حرف عطف আর عَلَّمَ ফে'ল, এতে هُوَ যমীর ফায়েল, ةُ টি مفعول এবং مِنْ টি হরফে জার مَا টি ইসমে মাওসূল, يَشَاءُ ফে'ল এবং এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল। অতঃপর ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে جملة فعلية হয়ে صلة হয়েছে। অতএব, মাওসুল ও সিলাহ মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে متعلق ; এখন ফে'ল ফা'য়েল مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হলো।

৩য় পারা

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ (٢٥٣)

অনুবাদ : (২৫৩) এই রাসূলগণ এমন যে, আমি তাঁদের একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তাঁদের মধ্যে কেউ এমন আছেন যাঁর সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন, আর তাঁদের মধ্যে কারো পদ-মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, আর আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ প্রদান করেছি এবং আমি তাকে সাহায্য করেছি রূহুল কুদুস দ্বারা, আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের পরবর্তী [উম্মত]-গণ পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না তাদের নিকট প্রমাণাদি আসার পর কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধী হলো, সুতরাং তাদের কেউ ঈমান আনল এবং কেউ কাফের রইল, আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই করেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٢٥٤)

(২৫৪) হে মুমিনগণ! ব্যয় কর ঐ সমস্ত বস্তু হতে যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, সেই দিন সমাগত হওয়ার পূর্বে যেদিন না কোনো ক্রয়-বিক্রয় হবে এবং না কোনো বন্ধুত্ব হবে এবং না কোনো সুপারিশ চলবে, আর কাফেররাই অবিচার করে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৫৩) تِلْكَ الرُّسُلُ এই রাসূলগণ এমন যে فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ আমি তাঁদের একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি مِنْهُمْ তাঁদের মধ্যে কেউ এমন আছেন مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ যাঁর সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ আর তাঁদের মধ্যে কারো পদ-মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ আর আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ প্রদান করেছি وَاَيَّدْنٰهُ এবং আমি তাকে সাহায্য করেছি بِرُوْحِ الْقُدُسِ রূহুল কুদুস দ্বারা وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ তবে তাদের পরবর্তীগণ পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করত না مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ তাদের নিকট প্রমাণাদি আসার পর وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধী হলো فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ সুতরাং তাদের কেউ ঈমান আনল وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ এবং কেউ কাফের রইল وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন। مَا اقْتَتَلُوْا তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না وَلٰكِنَّ اللّٰهَ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন।

(২৫৪) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে মুমিনগণ! اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ ব্যয় কর ঐ সমস্ত বস্তু হতে যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ সেই দিন সমাগত হওয়ার পূর্বে لَّا بَيْعٌ فِيْهِ যেদিন না কোনো ক্রয়-বিক্রয় হবে وَلَا خُلَّةٌ এবং না কোনো বন্ধুত্ব হবে وَّلَا شَفَاعَةٌ এবং না কোনো সুপারিশ চলবে وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ আর কাফেররাই অবিচার করে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ (٢٥٥)

অনুবাদ : (২৫৫) আল্লাহ [এরূপ যে,] তিনি ভিন্ন কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, চিরঞ্জীব, সংরক্ষণকারী, না তন্দ্রা তাঁকে অভিভূত করতে পারে আর না নিদ্রা; তাঁরই স্বত্বাধীন রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে, এমন ব্যক্তি কে আছে? যে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত, তিনি অবগত আছেন তাদের [সৃষ্টির] উপস্থিত ও অনুপস্থিত অবস্থাবলি আর ঐ সমুদয় সৃষ্টি তাঁর ইলমের কোনো বস্তুকেই স্বীয় জ্ঞানের আবেষ্টনীতে আনতে পারে না, হ্যাঁ, যে পরিমাণ তিনি ইচ্ছা করেন, তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও জমিনকে নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছে, আর আল্লাহর পক্ষে এতদুভয়ের হিফাজত কিছুমাত্র কষ্টকর হয় না, এবং তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাশীল অতি মহান।

لَاۤ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ ۚ قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ ۚ فَمَنْ یَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَیُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ (٢٥٦)

(২৫৬) ধর্মে [ইসলাম গ্রহণে] জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হেদায়েত পৃথক হয়ে গেছে পথভ্রষ্টতা হতে, সুতরাং যে ব্যক্তি শয়তানকে অমান্য করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে আঁকড়ে ধরল খুব শক্ত কড়া- যার কোনো প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই, আর আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, খুব জ্ঞাত।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৫৫) اَللّٰهُ আল্লাহ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় اَلْحَیُّ চিরঞ্জীব الْقَیُّوْمُ সংরক্ষণকারী لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ না তন্দ্রা তাঁকে অভিভূত করতে পারে আর না নিদ্রা لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ তাঁরই স্বত্বাধীন রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে مَنْ ذَا এমন ব্যক্তি কে আছে? الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ যে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে اِلَّا بِاِذْنِهٖ তাঁর অনুমতি ব্যতীত یَعْلَمُ তিনি অবগত আছেন مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ তাদের উপস্থিত وَمَا خَلْفَهُمْ ও অনুপস্থিত অবস্থাবলি وَلَا یُحِیْطُوْنَ আর ঐ সমুদয় সৃষ্টি স্বীয় জ্ঞানের আবেষ্টনীতে আনতে পারে না بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ তাঁর ইলমের কোনো বস্তুকেই اِلَّا بِمَا شَآءَ হ্যাঁ, যে পরিমাণ তিনি ইচ্ছা করেন وَسِعَ كُرْسِیُّهُ তাঁর কুরসী নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছে السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا আর আল্লাহর পক্ষে এতদুভয়ের হেফাজত কিছুমাত্র কষ্টকর হয় না وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ এবং তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাশীল অতি মহান।

(২৫৬) لَاۤ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ ধর্মে জবরদস্তি নেই قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ নিশ্চয় হেদায়েত পৃথক হয়ে গেছে مِنَ الْغَیِّ পথভ্রষ্টতা হতে فَمَنْ یَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ সুতরাং যে ব্যক্তি শয়তানকে অমান্য করে وَیُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে فَقَدِ اسْتَمْسَكَ সে আঁকড়ে ধরল بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی খুব শক্ত কড়া لَا انْفِصَامَ لَهَا যার কোনো প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রবণকারী, খুব জ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৫৫) قوله اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ الخ : বনী ইসরাঈলদের অনুরোধে একদা হযরত মূসা (আ.) ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন, আল্লাহ তা'আলা কি কখনো নিদ্রা যান? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে হযরত মূসা (আ.)-কে একাধারে তিন দিন নিদ্রা না যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। ফেরেশতাগণ তাই করেন। অতঃপর পরবর্তী রাত্রে হযরত মূসা (আ.)-এর দু'হাতে দু'টি বোতল দিয়ে বলা হয়, এ বোতল দু'টিকে দু'হাতে ধরে রাখুন। তিনি তা-ই করলেন। রাত্রি যতই গভীর হতে থাকে ততই তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। শত চেষ্টা করেও নিদ্রার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। অবশেষে তিনি নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েন। ফলে বোতল দু'টি হাত হতে পড়ে ভেঙ্গে যায়। তখন ফেরেশতারা বলেন, হে মূসা (আ.)! নিদ্রার প্রভাবে দু'টি বোতলকে আপনি ঠিক রাখতে পারলেন না। আল্লাহ তা'আলা যদি নিদ্রা যান তাহলে এ বিশাল বিশ্বকে কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন? সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি আল্লাহর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

رَوَى ابْنُ كَثِيْرٍ هٰذَا الرِّوَايَةَ مِنْ طُرُقٍ عَدِيْدَةٍ وَقَالَ : وَهُوَ عَنْ اَخْبَارِ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَهُوَ مِمَّا يَعْلَمُ اَنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ مِثْلُ هٰذَا مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاِنَّهٗ مُنَزَّهٌ عَنْهُ. وَقَالَ اَيْضًا : وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ جِدًّا وَالْاَظْهَرُ اَنَّهٗ اِسْرَائِيْلِيٌّ لَا مَرْفُوْعٌ. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (١/ ٨٧٩)

(২৫৬) قوله لَآ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মদিনার মুশরিক মহিলাদের যখন সন্তান হতো না। তখন তারা মানত করত যদি আমাদের সন্তান হয়, তবে আমরা তাদের ইহুদি বানাব এবং ইহুদিদের হাতে সমর্পণ করব। এভাবে তাদের অনেক সন্তান ইহুদিদের হাতে ছিল। যখন সে সকল লোক মুসলমান হয় এবং আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হয়ে যায় তখন ইহুদিদের সাথে লড়াই হয়। সর্বশেষ তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনা হতে নিষ্কৃত লাভের জন্য মহানবী ﷺ বনি নযীরকে দেশান্তরের নির্দেশ দেন। তখন আনসারগণ ইহুদিদের নিকট গচ্ছিত নিজেদের সন্তানদেরকে ফেরত নিতে আবেদন করেন, যেন নিজেদের সংস্পর্শে রেখে মুসলমান করে নিতে পারেন। তখন উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর (আ. শিফক)]

অথবা, তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ আছে, বনূ সালিম গোত্রের হুসাইনি নামক এক ব্যক্তির দু'সন্তান খ্রিস্টান ছিল, কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন মুসলমান। একবার রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি তাদেরকে জবরদস্তিমূলক মুসলমান বানিয়ে নিই। কারণ সাধারণভাবে তো তারা খ্রিস্টান ধর্ম থেকে ফিরে আসবে না। তখন উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

১. আয়াত تِلْكَ الرُّسُلُ এর বক্তব্যে নবী করীম ﷺ-কে এক প্রকার সান্ত্বনা দান করা উদ্দেশ্য। কেননা তাঁর নবুয়ত দলিল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরও অর্থাৎ, যা وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও কাফেররা তা মেনে নিচ্ছিল না। ফলে এটি তাঁর পক্ষে দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা একথা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, ইতঃপূর্বেও বিভিন্ন পদমর্যদা সম্পন্ন বহু নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু কারোই সমগ্র উম্মত ঈমানদার হয়নি। কিছুসংখ্যক লোক আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, আবার অনেকে বিরুদ্ধাচরণও করেছে। অবশ্য এতেও আল্লাহর বহু তাৎপর্য রয়েছে, যদিও তা সবার বুঝে আসে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এতটুকু বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, এর মধ্যেও নিশ্চয় কোনো বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

২. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আয়াতটিতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণের মধ্যে কেউ কেউ অন্য নবী অপেক্ষা মর্যাদায় বড় ছিলেন, অথচ হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর নবীগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করো না।' তিনি আরো বলেছেন- 'আমাকে মূসা (আ.)-এর চাইতে বড় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করো না।' আরো উক্ত হয়েছে যে, 'আমি বলতে পারি না যে, কেউ ইউনুস ইবনে মাত্তা অপেক্ষা উত্তম।' অতএব এর উত্তর কি? আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এর স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দিয়েছেন। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর : ১/৬৭১]

৩. مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ হযরত মূসা (আ.)-এর সাথেই আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতীত কথা বলেছেন, কিন্তু তাও অন্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা সূরা শুরার مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ [কোনো মানুষের পক্ষে আল্লাহর সাথে

কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়। আয়াতে অন্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলার বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। এতেই বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর কথা বলা অন্তরাল থেকেই হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর পরে কোনো রকম অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হওয়া সম্ভব। তাই শুরার সে আয়াতটি পার্থিব জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়।

এ সূরায় ইবাদত এবং বৈষয়িক আচার-আচরণের বেশ কিছু বিধান এবং রীতি-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মনের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যাবতীয় সৎকাজের মধ্যে জান-মাল ব্যয় করাটাই মানুষের কাছে সবচেয়ে কঠিন মনে হয়। অথচ আল্লাহর বিধানসমূহের অধিকাংশই জান অথবা মাল সম্পর্কিত। তাছাড়া অধিকাংশ মানুষই পাপে লিপ্ত হয়, এই জানের মহব্বত অথবা মালের প্রতি আসক্তির কারণেই। সুতরাং বলতে গেলে এ দু'টিই সমস্ত পাপের মূল উৎস। আর তা থেকে মুক্তিলাভই হলো যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগীর লক্ষ্য। কাজেই এসব বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা একান্তই যুক্তিযুক্ত।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ; শীর্ষক আয়াতে জানের মহব্বত ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী আয়াত مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ - এর মধ্যে সম্পদের মোহ ত্যাগ করে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে বিলিয়ে দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এরপরে বর্ণিত তালূতের কাহিনী দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মর্যদা ও কর্তৃত্বপ্রাপ্তি ধন-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একান্তভাবেই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পরন্তু যারা জানের পরোয়া না করেই আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে, তাদের নজির এবং প্রতিফলও তালূতের ঘটনাতে বিধৃত হয়েছে। অতঃপর সম্পদ আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়ে জীবনের প্রকৃত সাফল্য লাভ করার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে– اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর।

যেহেতু সম্পদ ব্যয় করার উপর অনেক ইবাদত ও মো'আমালাত নির্ভরশীল। তাই এ বিষয়টি সমধিক বিস্তারিতভাবে এবং গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী রুকূ'তেও বেশির ভাগ আলোচনা সম্পদ ব্যয় প্রসঙ্গেই করা হয়েছ। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এখনই কাজ করার সময় পরকালে কোনো কাজ বা ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, আর বন্ধুত্বের খাতিরেও কেউ কিছু দিবে না। পক্ষান্তরে কেউ এসে সুপারিশ করে মুক্ত করবে, তাও সম্ভব হবে না; যতক্ষণ আল্লাহ নিজে না ছাড়বেন।

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফজিলত : এ আয়াতটি কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফজিলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এটিকে সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি মর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব আরজ করলেন, তা হচ্ছে– আয়াতুল কুরসী। রাসূল (সা.) তার সমর্থন করে বললেন– হে আবুল মানযার! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনাতে রয়েছে, হুজুরে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে লোক প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো অন্তরায় থাকে না।' অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

এ আয়াতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ জাল্লা-শানুহুর একক অস্তিত্ব, তাওহীদ ও গুণাবলির বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহর অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম-অনন্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের হওয়া যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোনো কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোনো ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, কোনো প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোনো অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে না পারে। এই হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য– اَللهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ এতে আল্লাহ শব্দটি সত্তাগত নাম। অর্থ, সে সত্তা যা সকল পরাকাষ্ঠার অধিকারী ও সব কিছু থেকে মুক্ত لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা ইবাদতের যোগ্য। 'ইলাহ' সে সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

দ্বিতীয় বাক্য اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ আরবি ভাষায় حَیٌّ অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহর নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছেন যে, তিনি সর্বদা জীবিত ও বিদ্যমান থাকবেন: মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। قَیُّوْمُ শব্দ قِیَامٌ শব্দ হতে উৎপন্ন, এটা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থে– ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকেও বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। 'কাইয়ূম' আল্লাহর এমন এক বিশেষ গুণ যাতে কোনো সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়িত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা যে নিজের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোনো মানুষকে 'কাইয়ূম' বলা জায়েজ নয়। যারা 'আব্দুল কাইয়ূম' নামকে বিকৃত করে শুধু 'কাইয়ূম' বলে তারা গুনাহগার হবে।

আল্লাহর গুণবাচক নামের মধ্যে حَیٌّ وَ قَیُّوْمُ অনেকের মতে 'ইসমে আজম।' হযরত আলী (রা.) বলেছেন, বদরের যুদ্ধে আমি একবার চেয়েছিলাম, রাসূল ﷺ কে দেখবো, তিনি কি করছেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সেজদায় পড়ে يَا حَیُّ يَا قَیُّوْمُ বলছেন।

তৃতীয় বাক্য لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ – سِنَةٌ সীন-এর নিচে যের দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। نَوْمٌ পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে 'কাইয়ূম' শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আসমান ও জমিনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। সমস্ত সৃষ্টি রাজি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়তো ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করছেন, তাঁর কোনো সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহকে নিজের বা অন্য কোনো সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মতো মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিরও কোনো কারণ নেই। আর তাঁর সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

চতুর্থ বাক্য لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত لَامٌ অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ এবং জমিনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

পঞ্চম বাক্য مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ অর্থ হচ্ছে এমন কে আছে, যে তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত? এতে কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মালিক এবং কোনো বস্তু তাঁর চেয়ে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোনো কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারতো যে, কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে, তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহর কিছু খাস বান্দা আছেন, যাঁরা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথা নয়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– রাসূল ﷺ বলেছেন, হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সমস্ত উম্মতের জন্য সুপারিশ করব। একে 'মাকামে মাহমূদ' বলা হয়, যা হুজুর ﷺ-এর জন্য খাস। অন্যের জন্য নয়।

ষষ্ঠ বাক্য–یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অগ্রপশ্চাত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্রপশ্চাত বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলি আল্লাহর জানা রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বুঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাত বলতে বুঝানো হয়েছে যা অদৃশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোনো কোনো বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের উপরই পরিব্যপ্ত। সুতরাং এ দুটিতে কোনো বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয় দিকই বুঝানো হয়েছে।

সপ্তম বাক্য وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ অর্থাৎ মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের কোনো একটি অংশবিশেষকেও পরিবিষ্টিন করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত, এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোনো সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

অষ্টম বাক্য– "وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ" অর্থাৎ, তার কুরসী এত বড়, যার মধ্যে সাত আকাশ ও জমিন পরিবেষ্টিত রয়েছে। আল্লাহ উঠা-বসা আর স্থান-কাল থেকে মুক্ত। এ ধরনের আয়াতকে মানুষের পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানবজ্ঞানের উর্ধ্বে। তবে হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বুঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। ইবনে কাসীর হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) -এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুজুর ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি বলেছেন, যার এখতিয়ারে আমার প্রাণ তাঁর কসম, কুরসীর সাথে সাত আকাশ ও সাত জমিনের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেওয়া একটি আংটির মতো। অন্য এক বর্ণনাতে আছে যে, আরশের তুলনায় কুরসীও অনুরূপ। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

নবম বাক্য وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষে এ দুটি বৃহৎ সৃষ্টি আসমান ও জমিনের হেফাজত করা কোনো কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

দশম বাক্য وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্বের নয়টি বাক্যে আল্লাহর সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বুঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত, বড়ত্ব ও মহত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহর 'যাত' ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সেজন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, কেউ কোনো শক্ত দড়ি ছিঁড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোনো রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিঁড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার। –[বয়ানুল কুরআন]

এ আয়াত দেখে কোনো কোনো লোক প্রশ্ন করে, আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, ধর্মে কোনো বল প্রয়োগ নেই। অথচ ইসলাম ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ ইসলামে জিহাদ ও কেতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেওয়া হয়নি। যদি তাই হতো, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফেরদেরকে নিজ দায়িত্বে আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইসলামে জিহাদ ও কেতাল ফেতনা-ফ্যাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা ফ্যাসাদ আল্লাহর পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফেররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ "তারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ফ্যাসাদকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

এজন্য আল্লাহ তা'আলা জিহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেমতে জিহাদের মাধ্যমে অনাচারী জালেমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করার সমতুল্য। ইসলাম জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদেরকে হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনিভাবে সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিযিয়া বা কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে।

ইসলামের এ কার্য পদ্ধতিতে বুঝা যায় যে, সে জিহাদ ও কেতালের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না; বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায়-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। হযরত ওমর (রা.) একজন বৃদ্ধা নাসারা স্ত্রীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর দিল। আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করব? হযরত ওমর (রা.) একথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি; বরং এ আয়াত পাঠ করলেন لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ ধর্মে কোনো বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। আর জিহাদ ও কেতাল দ্বারা শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয়। সুতরাং এর দ্বারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভবই নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ বা কেতালের নির্দেশ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতের পরিপন্থি নয়। –[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ

آتَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস মোরাক্কাব, ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ- আমরা দিয়েছি।

اَيَّدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّايِيْدُ মূলবর্ণ (أ . ى . د) জিনস মোরাক্কাব: مهموز فاء ও اجوف يائى অর্থ- আমরা শক্তিশালী করেছি।

مَا اقْتَتَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِتَالُ মূলবর্ণ (ق . ت . ل) জিনস صحيح অর্থ- সে যুদ্ধ করেনি।

يُرِيْدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ر . و . د) মাসদার اَلْاِرَادَةُ জিনস اجوف واوى অর্থ- সে ইচ্ছা করেছে।

اَلْقَيُّوْمُ : শব্দটি বাব نَصَرَ থেকে ব্যবহৃত হয় এবং قِيَامٌ থেকে مبالغة-এর সীগাহ। অর্থ- সর্বসত্তার ধারক। ঐ মহান সত্তা যিনি নিজে থাকবেন এবং অন্যকেও থাকতে দিবেন। এটি আল্লাহর সিফাতী নামসমূহ থেকে একটি নাম।

لَاتَأْخُذُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- সে ধরে না।

لَايُحِيْطُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح . و . ط) জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা আয়ত্ব করতে পারে না।

لَايَئُوْدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَوْدُ মূলবর্ণ (أ . و . د) জিনস মোরাক্কাব: مهموز فاء ও اجوف واوى অর্থ- সে ক্লান্ত করে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ : এখানে واو টি حرف عطف আর لٰكِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل এবং اَللّٰهَ শব্দটি হচ্ছে لٰكِنَّ-এর اسم এবং يَفْعَلُ ফে'ল, এতে هُوَ যমীর فاعل এবং مَا টি اسم موصول আর يُرِيْدُ হলো فعل এতে هُوَ যমীর فاعل এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে صلة অতঃপর موصول ও صلة মিলে مفعول এবার فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে لٰكِنَّ-এর خبر অবশেষে لٰكِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

قوله اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ : এখানে اَللّٰهُ শব্দটি مبتدأ আর لَا টি نفى جنس لا، এবং اِلٰهَ টি لَا-এর اسم ও اِلَّا টি حرف استثناء আর هُوَ টি مستثنى হচ্ছে اَحَدٌ উহ্য مستثنى منه-এর. مستثنى ও مستثنى منه মিলে لَا-এর خبر এবার لا، نفى جنس তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হয়ে প্রথম خبر হলো اَللّٰهُ মুবতাদা-এর। اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় خبر অবশেষে مبتدأ তার তিন خبر মিলে جملة اسمية হলো।

قوله لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ : এখানে لَا تَأْخُذُ হলো فعل আর ه টি مفعول এবং سِنَةٌ হলো معطوف عليه। واو হরফে عطف আর لَانَوْمٌ হচ্ছে معطوف-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে فاعل এবং فعل, فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে اَللّٰهُ শব্দের চতুর্থ খবর।

اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۙ یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ؕ۬ وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِیٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۵۷﴾

অনুবাদ : (২৫৭) আল্লাহ তাদের সাথী হন যারা ঈমান এনেছে, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে [বাঁচিয়ে] আনেন নূরের দিকে, আর যারা কাফের তাদের সাথী হয় শয়তানের দল, তারা তাদেরকে নূর হতে বের করে (বিরত রেখে) অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এই প্রকার লোকই দোজখবাসী হবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِیْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَ یُمِیْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْیٖ وَ اُمِیْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ یَاْتِیْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیْ كَفَرَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۲۵۸﴾

(২৫৮) তুমি কি ঐ ব্যক্তির কাহিনী জ্ঞাত হওনি, যে ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম এর সঙ্গে বিতর্ক করেছিল স্বীয় পরওয়ারদেগার সম্বন্ধে, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন। যখন ইবরাহীম বললেন, আমার রব এরূপ যে, তিনি জীবন দান করেন এবং জীবন হরণ করেন, সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং জীবন হরণ করি, ইবরাহীম বললেন, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করে দাও। তাতে সেই কাফের হতভম্ব হয়ে গেল, আর আল্লাহ এমন বিপথগামীদেরকে হেদায়েত করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৫৭) اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا আল্লাহ তাদের সাথী হন যারা ঈমান এনেছে یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আনেন নূরের দিকে وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا আর যারা কাফের اَوْلِیٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ তাদের সাথী হয় শয়তানের দল یُخْرِجُوْنَهُمْ তারা তাদেরকে নিয়ে যায় مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ নূর হতে বের করে রেখে অন্ধকারের দিকে اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ এই প্রকার লোকই দোজখবাসী হবে هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

(২৫৮) اَلَمْ تَرَ اِلَی তুমি কি ঐ ব্যক্তির কাহিনী জ্ঞাত হওনি الَّذِیْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ যে ব্যক্তি ইবরাহীম এর সঙ্গে বিতর্ক করেছিল فِیْ رَبِّهٖ স্বীয় পরওয়ারদেগার সম্বন্ধে اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ যখন হযরত ইবরাহীম বললেন رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَ یُمِیْتُ আমার রব এরূপ যে, তিনি জীবন দান করেন এবং জীবন হরণ করেন قَالَ اَنَا اُحْیٖ وَ اُمِیْتُ সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং জীবন হরণ করি قَالَ اِبْرٰهٖمُ ইবরাহীম বললেন فَاِنَّ اللّٰهَ یَاْتِیْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করেন فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করে দাও فَبُهِتَ الَّذِیْ كَفَرَ তাতে সেই কাফের হতভম্ব হয়ে গেল وَ اللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ আর আল্লাহ এমন বিপথগামীদেরকে হেদায়েত করেন না

(২৫৯) অথবা তোমাদের এরূপ ঘটনা জানা আছে কি? যেমন এক ব্যক্তি এমন এক পল্লীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল যার ঘরগুলো স্বীয় ছাদের উপর পতিত হয়েছিল, সে বলতে লাগল কি উপায়ে আল্লাহ এই পল্লীকে জীবিত করবেন তার মৃত্যুর পর, সুতরাং আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে একশত বৎসর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখলেন, অতঃপর তাকে জীবিত করে উঠালেন, আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতকাল এই অবস্থায় ছিলে? সে বলল, হয়ত একদিন ছিলাম, কিংবা এক দিনের চেয়েও কম, আল্লাহ বললেন না, বরং তুমি একশত বৎসর ছিলে, তুমি স্বীয় পানাহারের বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তা পঁচে গলে যায়নি এবং তোমার গাধার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এবং যেন তোমাকে মানুষের জন্য একটি নজির করে দিই, আর হাড়গুলোর প্রতি দৃষ্টি কর আমি তাদেরকে কেমন করে সংযোজিত করি, অতঃপর তার উপর গোশ্‌ত স্থাপন করি, অনন্তর যখন এ সমস্ত অবস্থা তার নিকট প্রকাশিত হলো, তখন সে বলে উঠল আমি বিশ্বাস করি, নিশ্চয় আল্লাহ যাবতীয় বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٥٩)

শাব্দিক অনুবাদ

(২৫৯) اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ অথবা তোমাদের এরূপ ঘটনা জানা আছে কি? যেমন এক ব্যক্তি এমন এক পল্লীর ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا যার ঘরগুলো স্বীয় ছাদের উপর পতিত হয়েছিল قَالَ সে বলতে লাগল اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ কি উপায়ে আল্লাহ এই পল্লীকে জীবিত করবেন بَعْدَ مَوْتِهَا তার মৃত্যুর পর فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ সুতরাং আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে একশত বৎসর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখলেন ثُمَّ بَعَثَهٗ অতঃপর তাকে জীবিত করে উঠালেন قَالَ كَمْ لَبِثْتَ আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতকাল এই অবস্থায় ছিলে قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا সে বলল, হয়ত একদিন ছিলাম اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ কিংবা এক দিনের চেয়েও কম قَالَ আল্লাহ বললেন بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ না বরং তুমি একশত বৎসর ছিলে فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ তুমি স্বীয় পানাহারের বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর لَمْ يَتَسَنَّهْ তা পঁচে গলে যায়নি وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ এবং তোমার গাধার প্রতি দৃষ্টিপাত কর وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ এবং যেন তোমাকে মানুষের জন্য একটি নজির করে দিই وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ আর হাড়গুলোর প্রতি দৃষ্টি কর كَيْفَ نُنْشِزُهَا আমি তাদেরকে কেমন করে সংযোজিত করি ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا অতঃপর তার উপর গোশ্‌ত স্থাপন করি فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ অনন্তর যখন এ সমস্ত অবস্থা তার নিকট প্রকাশিত হলো قَالَ তখন সে বলে উঠল اَعْلَمُ আমি বিশ্বাস করি اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিশ্চয় আল্লাহ যাবতীয় বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ও নমরূদের বিতর্ক : হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) নমরূদ বাদশাহর রাজত্বকালে বাবেলের নিকটবর্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সেদেশে তখন প্রবল পৌত্তলিকতার প্রভাব ছিল। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। নমরূদ বাদশাহ তাকে ডেকে বলল, তোমার প্রভু কি? হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) উত্তর

দিলেন, বিশ্বজগতের প্রভুই আমার প্রভু। নমরূদ বলল, তার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, তিনি বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। নমরূদ বলল, সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নেই, আপনা-আপনিই সকল বস্তু সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইচ্ছা করলে আমিও জীবন ও মৃত্যু দান করতে পারি। তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আমার প্রতিপালক আল্লাহ তিনি সূর্যকে পূর্বদিক হতে উদিত করেন, তুমি সূর্যটিকে পশ্চিম দিক হতে উদিত কর। এতে নমরূদ হতভম্ব হয়ে গেল, আর কোনো উত্তর দিতে পারল না।

নমরূদের পরিচয় : নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তার পিতার নাম কিনয়ান, সে ছিল জারজ সন্তান। সে সম্পূর্ণ ভূ-মণ্ডলের অধিপতি ছিল। চারজন রাজা সারা দুনিয়াতে রাজত্ব করেছিলেন। তন্মধ্যে দু'জন মুসলমান। (১) হযরত সুলাইমান (আ.) (২) যুলকারনাইন। আর দু'জন কাফের তারা হচ্ছে– (১) নমরূদ ও (২) বখতে নসর। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১/৬৮৬]

হযরত ইবরাহীম (আ.) নবী হিসেবে আগমনকাল : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগে মানুষ পৌত্তলিক ছিল। তাঁর পিতা মূর্তিপূজারী তো ছিলেনই নির্মাতাও ছিলেন। হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত ১৬৪২ বছর যাবৎ পৃথিবীতে মূর্তিপূজার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। হযরত নূহের নবুয়তকালেই মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। মানুষ সমাজের সর্দার, নেতা এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের প্রতিকৃতি তৈরি শুরু করে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে তাদের পূজা-পার্বণে লিপ্ত হয়। এভাবেই এগুলোকে আল্লাহর ক্ষমতাগুণে এবং ক্ষমতাধর ভাবতে থাকে। ফলে তারাই হয়ে পড়ে তাদের নিকট মানুষের পরমেশ্বর। তাই প্রতিমা পূজা হতে মানুষকে ফিরিয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী করার জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে মানুষের মধ্য থেকেই নবী মনোনীত করতেন। এ লক্ষ্যেই আল্লাহ মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নবী মনোনীত করে পাঠান।

قوله اَلَّذِىْ حَاۤجَّ اِبْرٰهِيْمَ -এর ব্যাখ্যা : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে যার বিতর্ক হয়েছিল কুরআনে কারীম ঘৃণাভরে তার নাম বর্ণনা করেনি। ইমাম কুরতুবী বলেন, ঐ ব্যক্তি ছিল নমরূদ ইবনে কুস ইবনে কিনয়ান ইবনে নূহ। সে ঐ সময়েই মেসোপটেমিয়ার বাদশাহ ছিল। এটি হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও সুদ্দীর অভিমত। এক সময়ে নমরূদের মাথায় একটি মশা ঢুকে পড়ায় সে মরণ দংশনে মারা যায়। কারো কারো মতে সে ছিল নমরূদ ইবনে ফালেখ ইবনে আবির ইবনে সাম।

قوله فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ-এর সংশ্লিষ্ট বক্তব্য : মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন– فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ উক্তির ক্ষেত্রে বিব্রত বোধ করত সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে বিতর্ক থেকে সরে পড়ার কারণ ছিল এই যে, তার অন্তরে হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ কথা জেগে থাকবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ আছেন এবং পূর্ব দিক হতে সূর্য উদয় করা তাঁরই কাজ। ইচ্ছা করলে তিনি পশ্চিম দিক হতেও উদয় করতে পারেন। আর এ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে বিতর্কে বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে অবশ্য এ রকম ঘটেও যেতে পারে। আর এ রকম হলে বিশ্বময় এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাতে না আবার লাভের পরিবর্তে ক্ষতি বেড়ে যায়। যেমন, মানুষ ইবরাহীমের মু'জিযা দেখে যদি নমরূদের দিক হতে ফিরে তার দিকে ঝুঁকে যায়। সামান্য বাড়াবাড়িতে না আবার রাজত্বই চলে যায়। এসব ভেবে সে কোনো উত্তর দেয়নি। তা ছাড়া তার কাছে এ প্রশ্নের কোনো উত্তরও ছিল না, এ জন্য হতভম্ব হয়ে পড়ে।

قوله اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ الخ আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তির পরিচয় ও বর্ণনা : আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তি সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ বলেন– হযরত খিজির (আ.) আবার কেউ বলেন– হেযকীল নামীয় এক ব্যক্তি। আবার কেউ বলেন– হযরত উযায়ের (আ.) আর গ্রামটি ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস। তবে স্বীকৃত মতে হযরত উযায়ের (আ.)-কেই বুঝানো হয়েছে। [তাফসীর ইবনে কাসীর]

হযরত উযায়ের (আ.)-এর ঘটনা : আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিই হলেন হযরত উযায়ের (আ.)। সমস্ত তাওরাত কিতাব তাঁর মুখস্ত ছিল। বখতে নসর নামক জনৈক রাজা যখন বাইতুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে বনী ইসরাঈলদের অনেককে বন্দী

করেছিল, তখন বন্দীদের মধ্যে হযরত উযায়েরও ছিলেন। সেখান হতে মুক্তি পেয়ে ফিরার পথে এমন একটি গ্রাম দেখতে পান যার ইমারত ও অট্টালিকাগুলো ভূমিস্মাৎ হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থা দেখে তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এখানকার অধিবাসীরা সকলেই তো মারা গিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা এদেরকে আবার কিভাবে পুনর্জীবিত করবেন? আল্লাহ তা'আলা এ নবীকে দুনিয়াতেই এর নজির দেখানোর উদ্দেশ্যে হযরত উযায়ের (আ.) -কে একশত বৎসর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখলেন। কিন্তু তার শরীর নষ্ট ও পঁচে-গলে যায়নি। সাথে সাথে তার বাহন (গাধা) টিরও মৃত্যু দিলেন। তবে গাধাটির দেহ পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে গেছে, শুধু হাড়গুলো খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে রয়েছে। আর তার সাথে যে খাদ্য ও পানীয় বস্তু ছিল তা আল্লাহর কুদরতে বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয়নি। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

আল্লাহ তা'আলা একশত বৎসর পর হযরত উযায়ের (আ.)-কে জীবিত করলেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ অবস্থায় কতকাল ছিলে? তিনি উত্তর দিলেন, এ অবস্থায় একদিন বা একদিনের কিছু অংশ হবে। আল্লাহ বললেন না, বরং তুমি একশত বৎসর এ অবস্থায় ছিলে। তুমি দেখ তোমার গাধাটির দিকে তা মরে-পঁচে অস্থিসার হয়ে আছে। আর তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে লক্ষ্য কর তা যথা পূর্ব আকৃতিতে রয়েছে। অতঃপর তুমি দেখ কিভাবে হাড্ডিগুলো জোড়া লাগে এবং কিভাবে গোশত ও আত্মার সঞ্চার হয়। এ বিস্ময়কর ঘটনা অবলোকন করে তিনি অত্যন্ত প্রশান্তি অনুভব করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।

উক্ত একশত বৎসরে দেশের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে। বাইতুল মুকাদ্দাস বনী ইসরাঈলদের দখলে পুনরায় আবাদ হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা হযরত উযায়ের (আ.)-কে যখন মৃত্যু দিয়েছিলেন তখন ছিল সকাল, আর একশত বৎসর পর যখন জীবিত করেন তখন ছিল বিকাল, তাই তিনি একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ বলেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, যদি গতকাল এসে থাকি, তবে একদিন, আর যদি আজ এসে থাকি তবে একদিনের কিছু কম সময় অবস্থান করেছি। আল্লাহ তা'আলা মৃতকে জীবিত করতে পারবেন, এটা তার বিশ্বাস ছিল, তবে এ ঘটনায় তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জিত হলো। অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে গমন করলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। কেননা তিনি তখন যুবক ছিলেন, এখনো তাই আছেন, তাঁর সমবয়সি লোকেরা কেউ বেঁচে নেই। অপ্রাপ্ত বয়সি লোকেরা এখন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছে। তিনি উযায়ের বলে পরিচয় দিলে সকলেই বলতে থাকে বখ্‌তে নসর তাকে বন্দী করলে তিনি আর ফিরে আসেননি। তাঁর ছেলেরা অত্যন্ত ছোট ছিল, এখন তারা বৃদ্ধ। সকলে বলতে লাগল, হযরত উযায়ের (আ.)-এর তাওরাত কিতাব মুখস্থ ছিল আপনি তা পড়ে শুনান। পরে তিনি তা পাঠ করে শুনালেন। রাজা বখ্‌তে নসর তাওরাত কিতাব পুড়ে ফেলেছিল, তাই হযরত উযায়ের (আ.)-এর পুনর্জীবনের সাথে সাথে তাওরাত কিতাবেরও পুনর্জীবন লাভ হয়।

قوله عَلٰى قَرْيَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে قَرْيَةٌ দ্বারা একটি জনপদকে বুঝানো হয়েছে। قَرْيَةٌ শব্দ এখানে জনবিরল এলাকা অর্থে নয়; বরং এটা দ্বারা নগর বুঝানো উদ্দেশ্য। যে নগর জালিম বাদশাহ বখ্‌তে নসর ধ্বংস করে দিয়েছিল। কাতাদাহ এবং ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, قَرْيَةٌ দ্বারা বায়তুল মাকদিস এবং এর অধিবাসী উদ্দেশ্য। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

قوله فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ এখানে طَعَامٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত উযায়ের (আ.)-এর নিকট খাদ্য ও পানীয় কি ছিল, তা কুরআনে কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়নি। মুফাসসিরগণ বলেন, তাঁর খাবার ছিল আঙ্গুর বা ডুমুর ফল। আর পানীয় ছিল আঙ্গুরের রস বা দুধ। অনেকে বলেন, সাধারণ পথিকরা যেসব খাদ্য পানীয় সাথে করে নেয়; তাঁর সাথেও তেমন খাদ্য এবং পানীয় ছিল।

قوله لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ -এর মর্মার্থ : হযরত ওযায়ের (আ.)-কে একশত বছর পর পুনর্জীবিত করে আল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কতদিন কাটালে?' উত্তরে তিনি বললেন لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ অর্থাৎ একদিন বা তার চেয়ে কিছু কম। তাঁর এরূপ উত্তর থেকে বুঝা যায় যে, ইহজগতের প্রাকৃতিক রীতি-নীতি ও মৃত্যুর পর জগতের প্রাকৃতিক রীতি-নীতি এক রকম নয়। অনেকে মনে করেন তাঁকে ভোর বেলায় মৃত্যু দেওয়া হয়েছিল এবং একশত বছর পর বিকেল বেলায় জীবিত করা হয়। ফলে তিনি একদিনের কথা বলেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَاجَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُحَاجَّةُ মূলবর্ণ (ح ـ ج ـ ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল।

اٰتٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মোরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– সে দিয়েছে।

يُمِيْتُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمَاتَةُ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনসে اجوف واوى অর্থ– তিনি মৃত্যু দেন, তিনি জীবন হরণ করেন।

بُهِتَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব كَرُمَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْبَهْتُ মূলবর্ণ (ب ـ ه ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– সে হয়রান হয়ে রইল।

خَاوِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَوَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– ধ্বসে পড়া।

عُرُوْشٌ : এটি বহুবচন, একবচনে عَرْشٌ অর্থ– ছাদ।

يُحْيِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তিনি জীবন দান করেন।

اَمَاتَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمَاتَةُ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اجوف واوى অর্থ তিনি মৃত্যু দিয়েছেন।

لَمْ يَتَسَنَّهْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّسَنُّهُ মূলবর্ণ (س ـ ن ـ ن) জিনস ناقص يائى অর্থ– ইহা নষ্ট হয়নি।

نَكْسُوْهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَسْوُ মূলবর্ণ (ك ـ س ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমরা পরিয়ে দেই।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ : এখানে واو টি حرف عطف আর اَللّٰهُ শব্দটি مبتدأ এবং لَا يَهْدِىْ হলো فعل এতে هُوَ যমীর فاعل এবং اَلْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ উভয়টি صفت ও موصوف মিলে مفعول এবার فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে خبر অবশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰـكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٦٠)

অনুবাদ : (২৬০) আর সেই সময়কে স্মরণ কর যখন ইবরাহীম আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি মৃতকে কি প্রকারে জীবিত করবেন, ইরশাদ হলো– তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন, বিশ্বাস কেন করব না, তবে এই উদ্দেশ্যে আবেদন করছি, যেন আমার অন্তর সান্ত্বনা লাভ করে। আল্লাহ বললেন, আচ্ছা, তবে চারটি পাখি আন, অতঃপর তাদেরকে পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর এক একটি অংশ রেখে দাও। অতঃপর তাদেরকে আহবান কর, প্রত্যেকটি দৌড়ে দৌড়ে তোমার নিকট আসবে, আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ প্রতাপশালী, হেকমতওয়ালা।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٢٦١)

(২৬১) যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের ব্যয়িত ধন-সম্পদের অবস্থা এরূপ যেমন একটি শস্য বীজ যা হতে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, প্রত্যেকটি শীষের মধ্যে শত শস্য হয়, আর এই বৃদ্ধি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, আর আল্লাহ প্রশস্ততার মালিক, মহাজ্ঞানী।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٢٦٢)

(২৬২) যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আর ব্যয় করার পর কৃপা প্রকাশ করে না এবং ক্লেশও দেয় না, তারা তাদের বিনিময় পাবে স্বীয়-রব-এর নিকট আর না তাদের কোনো আশঙ্কা হবে আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৬০) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ আর সেই সময়কে স্মরণ কর যখন ইবরাহীম আরজ করলেন رَبِّ اَرِنِىْ হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে দেখিয়ে দিন كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى আপনি মৃতকে কি প্রকারে জীবিত করবেন قَالَ ইরশাদ হলো اَوَلَمْ تُؤْمِنْ তুমি কি বিশ্বাস কর না قَالَ بَلٰى তিনি বললেন, বিশ্বাস কেন করব না وَلٰـكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ তবে এই উদ্দেশ্যে আবেদন করছি, যেন আমার অন্তর সান্ত্বনা লাভ করে قَالَ আল্লাহ বললেন, আচ্ছা فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ তবে চারটি পাখি আন فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ অতঃপর তাদেরকে পোষ মানিয়ে নাও ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا অতঃপর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর এক একটি অংশ রেখে দাও ثُمَّ ادْعُهُنَّ অতঃপর তাদেরকে আহবান কর يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا প্রত্যেকটি দৌড়ে দৌড়ে তোমার নিকট আসবে وَاعْلَمْ আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ اَنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَزِيْزٌ প্রতাপশালী حَكِيْمٌ হেকমতওয়ালা।

(২৬১) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ যারা নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে তাদের ব্যয়িত ধন-সম্পদের অবস্থা এরূপ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে كَمَثَلِ حَبَّةٍ যেমন একটি শস্য বীজ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ যা হতে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয় فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ প্রত্যেকটি শীষের মধ্যে শত শস্য হয় وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ আর এই বৃদ্ধি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ প্রশস্ততার মালিক, মহাজ্ঞানী।

(২৬২) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ যারা স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا আর ব্যয় করার পর প্রকাশ করে না مَنًّا কৃপা وَّلَآ اَذًى এবং ক্লেশও দেয় না لَّهُمْ اَجْرُهُمْ তারা তাদের বিনিময় পাবে عِنْدَ رَبِّهِمْ স্বীয়-রব-এর নিকট وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ আর না তাদের কোনো আশঙ্কা হবে وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾

(২৬৩) সন্তুষ্টজনক কথা বলে দেওয়া এবং ক্ষমা করা ঐ দান অপেক্ষা [বহু] উত্তম যার পর কষ্ট প্রদান করা হয়, আর আল্লাহ অভাবশূন্য ধৈর্যশীল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

(২৬৪) হে মুমিনগণ! তোমরা কৃপা প্রকাশ করে অথবা ক্লেশ প্রদান করে তোমাদের দানসমূহকে বিনষ্ট করো না, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন দান করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং ঈমান রাখে না আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি। সুতরাং ঐ ব্যক্তির অবস্থা এরূপ যেমন এক খণ্ড মসৃণ পাথর যার উপর কিছু পরিমাণ মাটি আছে, অনন্তর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং তাকে পূর্ণ পরিষ্কার করে দেয়, এরূপ লোকের স্বীয় উপার্জন কিছুই হস্তগত হবে না, আর আল্লাহ কাফেরদেরকে [পরকালে বেহেশতের] পথ দেখাবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৬৩) قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ সন্তুষ্টজনক কথা বলে দেওয়া وَّمَغْفِرَةٌ এবং ক্ষমা করা خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ ঐ দান অপেক্ষা উত্তম يَّتْبَعُهَآ اَذًى যার পর কষ্ট প্রদান করা হয় وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ আর আল্লাহ অভাবশূন্য ধৈর্যশীল।

(২৬৪) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ তোমরা তোমাদের দানসমূহকে বিনষ্ট করো না بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى কৃপা প্রকাশ করে অথবা ক্লেশ প্রদান করে كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন দান করে رِئَآءَ النَّاسِ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ এবং ঈমান রাখে না আল্লাহর প্রতি وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি فَمَثَلُهٗ সুতরাং ঐ ব্যক্তির অবস্থা এরূপ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ যেমন এক খণ্ড মসৃণ পাথর عَلَيْهِ تُرَابٌ যার উপর কিছু পরিমাণ মাটি আছে فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ অনন্তর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয় فَتَرَكَهٗ صَلْدًا এবং তাকে পূর্ণ পরিষ্কার করে দেয় لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا এরূপ লোকের স্বীয় উপার্জন কিছুই হস্তগত হবে না وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ আর আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ দেখাবেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৬১) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** নবম হিজরি সালে রোমান বাহিনী মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিলে তাদেরকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে তাবূক যুদ্ধের সরঞ্জাম ও রসদ সংগ্রহের জন্য মহানবী ﷺ সাহাবীদের নিকট আল্লাহর পথে দান করার আহবান জানান। এ আহবানে সাড়া দিয়ে হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সকল সম্পদ, হযরত ওমর (রা.) তাঁর অর্ধেক সম্পদ এবং হযরত ওসমান (রা.) এক হাজার উট ও এক হাজার দীনার দান করেন। এতে মহানবী ﷺ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের জন্য দোয়া করেন। এ প্রসঙ্গেই বর্ণিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(২৬২) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** রূহুল মা'আনী, কুরতুবী ও বায়যাবী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তাবূকের যুদ্ধে হযরত ওসমান (রা.) ইসলামি ফৌজের সাহায্যের জন্য এক হাজার গদি সজ্জিত উট ও এক হাজার

দীনার দান করেছিলেন। তখন রাসূল ... দোয়া করলেন– يَا رَبِّ عُثْمَانُ رَضِيتُ عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ অর্থাৎ, হে প্রভু! আমি ওসমানের প্রতি সন্তুষ্ট, তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হও। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) তাঁর সম্পদ থেকে চার হাজার দিরহাম দান করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কেই উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিবেদন ও পুনর্জীবনদান প্রত্যক্ষকরণ : এটি হলো তৃতীয় কাহিনী যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রতি আরজ করলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার কারণ কি? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি তোমার আস্থা নেই? হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের আস্থা বিবৃত করে নিবেদন করলেন, আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা আপনার সর্বময় ক্ষমতার নির্দশন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে এ বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানব-প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে, এটা কি করে হবে, না জানি এর প্রক্রিয়াটি কেমন? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) এরূপ নিবেদন করেছিলেন যাতে মৃতব্যক্তিকে জীবিতকরণ সংক্রান্ত চিন্তায় দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অধিকন্তু মনে যাতে স্থিরতা আসে; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হলো যাতে সেগুলোর সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্র হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনি যেন সেগুলোকে ভালোভাবে চিনতেও পারেন। পরে নির্দেশ হলো, পাখিগুলোকে জবাই করে এর হাড়-গোশত ইত্যাদি সবগুলোকেই কিমায় পরিণত কর, তারপর সেগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজ পছন্দমতো কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দাও তারপর এদেরকে ডাক। তখন এগুলো আল্লাহর কুদরতে জীবিত হয়ে দৌড়ে তোমার কাছে চলে আসবে।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে ইবনুল মুনযিরের উদ্ধৃতিতে হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশত রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন হে ইবরাহীম! কিয়ামতের দিন এমনিভাবে সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে এক মুহূর্তে সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চারিত করে দিব। কুরআনের ভাষায় يَأْتِينَكَ سَعْيًا বলা হয়েছে যে, এসব পাখি দৌড়ে আসবে, যাতে বুঝা যায়, সেগুলো উড়ে আসবে না। কেননা আকাশে উড়ে আসলে দৃষ্টির অগোচরে যেতে পারে এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। পক্ষান্তরে মাটির উপরে দৌড়ে আসলে তা দৃষ্টির মধ্যে থাকবে। এ ঘটনাতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের পরে পুনর্জীবনের এমন এক নিদর্শন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দেখালেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়েরও অবসান হতে পারে। পুনর্জীবন এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে মুশরিকদের এটাই ছিল বড় প্রশ্ন। মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়, আর এ মাটি বাতাসের সাথে কোথায় কোথায় উড়ে যায়। আবার কখনো পানির স্রোতের সাথে গড়িয়ে যায়, কখনো বা বৃক্ষ ও শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে আবার এর রেণু-কণা, দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিক্ষিপ্ত রেণু-কণা একত্রিত করে তাতে প্রাণসঞ্চার করার বিষয়টি সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে লোকের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। সব বিষয়কেই তারা নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করতে চায়। তারা তাদের বোধশক্তির বাইরের কোনো ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তাও করতে পারে না। অথচ তারা যদি নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই একটু চিন্তা করে, তবেই বুঝতে পারবে যে, তাদের অস্তিত্ব সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুর একটা সমষ্টি।

আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর : আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমতঃ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মনে এ প্রশ্নই বা কেন জেগেছিল? অথচ তিনি আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার উপর বিশ্বাসীরূপে তৎকালীন বিশ্বে সর্বাধিক দৃঢ় ছিলেন।

এর উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রশ্ন কোনো সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ছিল না; বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতে মৃতদেহকে জীবিত করবেন, তা তাঁর সর্বময় ক্ষমতার জন্য কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু মৃতকে জীবিত করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে, তারা কখনো কোনো মৃতকে জীবিত হতে দেখেনি। পরন্তু মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি ও রূপ বিভিন্ন রকম হতে পারে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে এই যে, যে বস্তু সে দেখেনি তার অনুসন্ধান করার জন্য তার মনে একটা সহজাত কৌতুহল জন্ম নেয়। এতে তার ধারণা, বিভিন্ন পথে এগিয়ে যেতে থাকে। তাতে চিন্তাজনিত কষ্টও সহ্য করতে হয়। এ চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পেয়ে অন্তরে স্থিরতা লাভ করাকেই 'এতমিনান' বা প্রশান্তি বলা হয়। এই এতমিনান লাভের উদ্দেশ্যেই ছিল হযরত ইবরহীম (আ.)-এর এ প্রার্থনা।

এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, ঈমান ও এতমিনান-এর মাধ্যমে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঈমান সে ইচ্ছাধীন দৃঢ়বিশ্বাসকে বলে, যা মানুষ রাসূল ﷺ-এর কথায় কোনো অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অর্জন করে। আর 'এতমিনান' অন্তরের সে দৃঢ়তাকে বলা হয় যা প্রত্যক্ষ কোনো ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। অনেক সময় কোনো দৃশ্যমান বিষয়েও দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায়, কিন্তু অন্তরের এতমিনান বা প্রশান্তি লাভ হয় না এজন্য যে, এর স্বরূপ জানা থাকে না। এতমিনান বা প্রশান্তি শুধু চাক্ষুষ দর্শনে লাভ হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) মৃত্যুর পর পুনর্জীবিন সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী অবশ্যই ছিলেন; তবে প্রশ্নটি ছিল শুধু তার স্বরূপটি জানার জন্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) মৃতকে জীবিত করার স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন বটে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে কোনোরূপ সন্দেহ ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে أَوَلَمْ تُؤْمِنْ অর্থাৎ তুমি কি বিশ্বাস কর না, বলার হেতু কি?

উত্তর এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক উত্থাপিত এ প্রশ্নটি দু'ধরনের অর্থ হতে পারে।

এক. তিনি জীবিত করার স্বরূপ জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন। তবে মূল প্রশ্ন অর্থাৎ, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না।

দুই. পুনর্জীবিত করার ক্ষমতায় সন্দেহ কিংবা অস্বীকৃতি থেকেও এ প্রশ্ন জন্ম নিতে পারে। প্রশ্নের ভাষা ও সম্ভাবনার প্রতিকূল নয়। উদাহরণতঃ কোনো বোঝা সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস এই যে, অমুক ব্যক্তি এটি বহন করতে পারবে না। তখন আপনি তার অপারগতা প্রকাশ করার জন্য বললেন— দেখি, তুমি কেমন করে বোঝাটি বহন কর। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রশ্নের এ ভুল অর্থও কেউ কেউ গ্রহণ করতে পারত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে বললেন أَوَلَمْ تُؤْمِنْ যাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) উত্তরে بَلَىٰ হ্যাঁ, বিশ্বাস করি, বলে ভুল বুঝার অবকাশ থেকে মুক্ত হয়ে যান।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে। আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এতে 'ঈমান বিল গায়েব' বা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন হয়।

এটি সূরা বাকারার ৩৬ তম রুকূ', যা ২৬২ নং আয়াত থেকে শুরু হয়। এখনো এ সূরার পাঁচটি রুকূ বাকি রয়েছে। তন্মধ্যে শেষ রুকুতে সামগ্রিক ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী চার রুকূ'তে ২৬২ তম আয়াত থেকে ২৮৩ তম আয়াত পর্যন্ত মোট ২১টি আয়াত। এগুলোতে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ ও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এসব নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্ব যেসব অর্থনৈতিক সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেগুলোর সমাধান আপনা-আপনিই বের হয়ে আসবে। আজ কোথাও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কোথাও এর জবাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত রয়েছে। এসব নীতির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে গোটা বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তপ্ত লাভায় পরিপূর্ণ হয়ে আগ্নেয়গিরির রূপ ধারণ করেছে। এসব আয়াতে ইসলামি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণিত হয়েছে। এটি দু'ভাগে বিভক্ত।

১. প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অভাবগ্রস্ত, দীন-দুঃখীদের জন্য ব্যয় করার শিক্ষা- একে সদকা ও খয়রাত বলা হয়
২. সুদের লেন-দেনকে হারাম করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ।

প্রথম দু'রুকূ'তে দান-খয়রাতের ফজিলত, তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদান এবং তৎসম্পর্কিত বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ দু' রুকূ'তে সুদভিত্তিক কারবারের অবৈধতা, নিষেধাজ্ঞা এবং ঋণদানের বৈধ পন্থার বর্ণনা রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর দান-খয়রাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এমন কতিপয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা দান-খয়রাতকে বরবাদ ও নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত করে।

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে দু'টি উদাহরণ। একটি আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় দান খয়রাতের এবং অপরটি অগ্রহণীয় ও ফাসেদ দান-খয়রাতের।

এ রুকূ'তে এ পাঁচটি বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে।

এসব বিষয়বস্তুর পূর্বে জানা দরকার যে, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করাকে কুরআন পাক কোথাও اِنْفَاقٌ শব্দে, কোথাও اِطْعَامٌ শব্দে কোথাও صَدَقَةٌ শব্দে এবং কোথাও اِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ শব্দে ব্যক্ত করেছে। কুরআনের এসব শব্দ এবং বিভিন্ন স্থানে এগুলোর ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে اِطْعَامٌ - اِنْفَاقٌ - صَدَقَةٌ প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার দান-খয়রাত ও ব্যয়কেই বুঝায়; তা ফরজ, ওয়াজিব, কিংবা নফল, মোস্তাহাব যাই হোক। ফরজ জাকাত বুঝাবার জন্য কুরআন একটি স্বতন্ত্র শব্দ اِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ ব্যবহার করেছে এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিশেষ সদকাটি আদায় করা ও ব্যয় করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এ রুকূ'তে বেশির ভাগ اِنْفَاقٌ শব্দ এবং কোথাও صَدَقَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এখানে সাধারণ দান-খয়রাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لِيَطْمَئِنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اَلْاِطْمِئْنَانُ মূলবর্ণ (ط . م . ء . ن) জিনস صحيح অর্থ- প্রশান্তির জন্য।

خُذْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- তুমি ধর।

صُرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّوْرُ মূলবর্ণ (ص . و . ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা বশীভূত কর।

اُدْعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তুমি ডাক।

يَأْتِيْنَكَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস মোরাক্কাব; ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ- তারা আসব।

يُتْبِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِتْبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ- তারা অনুসরণ করে।

صَفْوَانٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَفْوَانَةٌ অর্থ- মসৃণ পাথর।

اَصَابَهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصَابَةُ মূলবর্ণ (ص . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- তার কাছে পৌঁছেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

قوله وَاعْلَمْ اَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ : এখানে واو টি حرف عطف আর اِعْلَمْ হলো فعل এবং এতে ضمير اَنْتَ যমীর فاعل আর اَنَّ হলো حرف مشبه بالفعل এবং اللّٰهَ শব্দটি اَنَّ-এর اسم এবং عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ উভয়টি اَنَّ এর خبر এবার اَنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হয়ে مفعول অবশেষে فعل - فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية انشائية হয়েছে।

قوله قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ : এখানে قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ উভয়টি موصوف ও صفت মিলে معطوف عليه এবং واو টি حرف عطف আর مَغْفِرَةٌ টি معطوف এবার معطوف عليه ও معطوف মিলে مبتدأ হয়েছে। خَيْرٌ শব্দটি شبه فعل আর যমীর هُوَ তার نائب فاعل আর مِنْ صَدَقَةٍ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق এবার شبه فعل তার نائب فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে خبر এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا : এখানে لَا يَقْدِرُوْنَ হলো فعل আর এতে هُمْ যমীর فاعل এবং عَلٰى شَيْءٍ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق তারপর مِنْ হলো حرف جار ও مَا হলো اسم موصول আর كَسَبُوْا হলো فعل এতে هُمْ যমীর فاعل এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে صلة হয়েছে। اسم موصول ও صلة মিলে مجرور আর جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে উহ্য شبه فعل -এর সঙ্গে। উহ্য شبه فعل তার متعلق সহ صفت হয়েছে شَيْءٍ শব্দের। موصوف ও صفت মিলে مجرور। جار ও مجرور মিলে متعلق অবশেষে فعل - فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢٦٥)

অনুবাদ (২৬৫) আর ঐ সমস্ত লোকের ব্যয়িত মালের অবস্থা- যারা নিজেদের মাল ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের এবং স্বীয় আত্মাসমূহের দৃঢ়তা সাধনের উদ্দেশ্যে, [তাদের] দৃষ্টান্ত ঐ বাগানের ন্যায় যা কোনো টিলার উপর অবস্থিত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হলো, ফলে ঐ বাগান দ্বিগুণ ফল-শস্য উৎপন্ন করল, আর যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না হয়, তবে হালকা বৃষ্টিও তার জন্য যথেষ্ট, আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মসমূহ পূর্ণরূপে দেখেন।

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ (٢٦٦)

(২৬৬) আচ্ছা! তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করে যে, তার একটি উদ্যান থাকে খেজুর ও আঙ্গুরের যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তার ঐ উদ্যান [অনুরূপ আরো] সর্বপ্রকার ফল হয় এবং সে ব্যক্তির বার্ধক্য এসে পড়ে, আর তার সন্তানাদিও আছে যারা অক্ষম, অনন্তর সেই উদ্যানে এক ঝঞ্ঝাবায়ু এসে পড়ে, যাতে অগ্নিপ্রবাহ থাকে, ফলে উদ্যানটি জ্বলে যায়, আল্লাহ এরূপে নজিরসমূহ বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য, যেন তোমরা চিন্তা করে দেখ।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৬৫) وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ আর ঐ সমস্ত লোকের ব্যয়িত মালের অবস্থা- যারা নিজেদের মাল ব্যয় করে ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ এবং স্বীয় আত্মাসমূহের দৃঢ়তা সাধনের উদ্দেশ্যে كَمَثَلِ جَنَّةٍ দৃষ্টান্ত ঐ বাগানের ন্যায় بِرَبْوَةٍ যা কোনো টিলার উপর অবস্থিত اَصَابَهَا وَابِلٌ যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হলো فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ফলে ঐ বাগান দ্বিগুণ ফল-শস্য উৎপন্ন করল فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ আর যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না হয়, فَطَلٌّ তবে হালকা বৃষ্টিও তার জন্য যথেষ্ট وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মসমূহ পূর্ণরূপে দেখেন।

(২৬৬) اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ আচ্ছা! তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করে যে اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ তার একটি উদ্যান থাকে مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ খেজুর ও আঙ্গুরের تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ তার ঐ উদ্যান সর্বপ্রকার ফল হয় وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ এবং সে ব্যক্তির বার্ধক্য এসে পড়ে وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ আর তার সন্তানাদিও আছে যারা অক্ষম فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ অনন্তর সেই উদ্যানে এক ঝঞ্ঝাবায়ু এসে পড়ে فِيْهِ نَارٌ যাতে অগ্নিপ্রবাহ থাকে فَاحْتَرَقَتْ ফলে উদ্যানটি জ্বলে যায় كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ আল্লাহ এইরূপে বর্ণনা করেন لَكُمُ الْاٰيٰتِ তোমাদের জন্য নজিরসমূহ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ যেন তোমরা চিন্তা করে দেখ।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (২৬৭) হে মুমিনগণ! তোমরা ব্যয় কর স্বীয় উপার্জন হতে উত্তম বস্তু, আর তা হতে যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, আর নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি মনস্থ করো না যে, তা হতে সদকা করবে অথচ তোমরা কখনো তা গ্রহণকারী নও, হ্যাঁ, যদি ভ্রুক্ষেপ না কর, আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন, প্রশংসার যোগ্য।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ (٢٦٧)
(২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে অসৎ কাজের [কৃপণতার] পরামর্শ দেয়, আর আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর পক্ষ হতে ক্ষমা করার ও অধিক দেওয়ার, আর আল্লাহ প্রশস্ততার মালিক, মহাজ্ঞানী।	اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٢٦٨)
(২৬৯) যাকে ইচ্ছা ধর্মের জ্ঞান প্রদান করেন আর যে ব্যক্তি ধর্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হয় সে অতি কল্যাণের বস্তু প্রাপ্ত হলো, বস্তুত নছিহত তারাই কবুল করে যারা বুদ্ধিমান।	يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ (٢٦٩)

শাব্দিক অনুবাদ

(২৬৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! اَنْفِقُوْا তোমরা ব্যয় কর مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ স্বীয় উপার্জন হতে উত্তম বস্তু وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ আর তা হতে যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ আর নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি মনস্থ করো না যে مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ তা হতে সদকা করবে وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ অথচ তোমরা কখনো তা গ্রহণকারী নও اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ হ্যাঁ, যদি ভ্রুক্ষেপ না কর وَاعْلَمُوْٓا আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন, প্রশংসার যোগ্য।

(২৬৮) اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ শয়তান তোমাদেরকে অভাবগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখায় وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ এবং তোমাদেরকে অসৎ কাজের পরামর্শ দেয় وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ আর আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন مَّغْفِرَةً তাঁর পক্ষ হতে ক্ষমা করার وَفَضْلًا ও অধিক দেওয়ার وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ প্রশস্ততার মালিক, মহাজ্ঞানী।

(২৬৯) يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা ধর্মের জ্ঞান প্রদান করেন وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ আর যে ব্যক্তি ধর্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হয় فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا সে অতি কল্যাণের বস্তু প্রাপ্ত হলো وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ বস্তুত নছিহত তারাই কবুল করে যারা বুদ্ধিমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৬৫) قوله وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** যারা নিজেদের ধন-সম্পদকে মনের দৃঢ়তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে ব্যয় করে তাদেরকে একটি উপমার মাধ্যমে আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়ত ও পূর্বোক্ত শর্তাবলির প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফজিলত অনেক। সৎ নিয়ত, আন্তরিকতা ও রিয়ামুক্তভাবে অল্প ব্যয় করলেও তাতে আল্লাহ বরকত দিয়ে বৃদ্ধি করে দেন এবং তা পারলৌকিক সাফল্যের কারণ হয়।

(২৬৭) قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ত আয়াতটি আমাদের আনসারী সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা ছিলাম খেজুর বাগানের মালিক। লোকেরা তাদের খেজুরের বাগান থেকে বেশি বা কম পরিমাণ হিসেবে নিয়ে আসত। কোনো ব্যক্তি এক ছড়া বা দুই ছড়াও নিয়ে আসত এবং তা মসজিদে ঝুলিয়ে রাখত। আহলে সুফফা সাহাবাদের খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাদের কারো যখন ক্ষুধা লাগত তখন তারা খেজুর ছড়ার কাছে এসে তার লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত করত এতে তা থেকে কাঁচা পাকা খেজুর ঝরে পড়ত। আর তা খেয়ে নিত। কিন্তু যেসব লোকের ভালো কাজের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না। তাদের কেউ কেউ এমনও খেজুরের ছড়া নিয়ে আসত যার মধ্যে রদ্দী ও পচা খেজুর রয়েছে এবং তা ঝুলিয়ে দিত। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, এরপর আমাদের প্রত্যেকেই তার নিকট যা আছে তার মধ্যে উত্তমটি নিয়ে আসত। –[তিরমিযী : ২]

আল্লাহর পথে ব্যয় করার একটি দৃষ্টান্ত : প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অর্থাৎ হজ, জিহাদ কিংবা ফকির, মিসকিন, বিধবা ও এতিমদের জন্য কিংবা সাহায্যের নিয়তে আত্মীয় স্বজনদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন, কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হলো, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাঁড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ' দানা অর্জিত হয়ে গেল।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার ছওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ' পয়সার ছওয়াব অর্জিত হতে পারে।

সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সৎকর্মের ছওয়াব দশগুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ' গুণে পৌঁছে।

দান গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলি : কিন্তু কুরআনে পাক এ বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের দৃষ্টান্তের আকারে বর্ণনা করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ' দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি হবে উৎকৃষ্ট। কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হবে এবং জমিনও হবে সরস। কেননা এ তিনটির যেকোনো একটি বিষয়ে অভাব হলেও হয় দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ, একটি দানাও উৎপন্ন হবে না কিংবা এক দানা থেকে সাতশ' দানার মতো ফলনশীল হবে না।

এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহর পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক ছওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

১. পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা। হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোনা কিছুই গ্রহণ করেন না।
২. যে ব্যয় করবে তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। কোনো খারাপ নিয়তে কিংবা নাম-যশ অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যয় করে, সে ঐ অজ্ঞ কৃষক সদৃশ, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়।
৩. যার জন্য ব্যয় করবে, সেও সদকা গ্রহণের যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করলে সদকা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফজিলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয় করা রীতি ও সুন্নত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তির প্রতি ব্যয় করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফজিলত অর্জিত হবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে দান খয়রাতের নির্ভুল ও সুন্নত তরিকা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের ছওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোনো বিপদাশঙ্কা নেই এবং অতীতের ব্যাপারেও তাদের কোনো চিন্তা নেই।

সদকা গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলি : এ আয়াতে সদকা কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে :– ১. দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং ২. গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ তার সাথে এমন কোনো ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

তৃতীয় আয়াতে قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ অর্থাৎ সদকা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত দুটি শর্তের আরো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে কারো প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং দ্বিতীয়তঃ যাকে দান করা হবে তার সাথে এমন কোনো ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, আর্থিক অক্ষমতা কিংবা ওজরের সময় যাঞ্চাকারীর জওয়াবে কোনো যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত অজুহাত বলে দেওয়া এবং যাঞ্চাকারী অশোভন আরচণ করে রাগান্বিত করলে তাকে ক্ষমা করা বহুগুণে শ্রেয়। সে দান খয়রাতের চেয়ে যার পর দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সম্পদশালী ও সহিষ্ণু। তিনি কারো অর্থের মুখাপেক্ষী নন। যে ব্যক্তি ব্যয় করে, সে নিজের উপকারের জন্যই করে। অতএব, ব্যয় করার সময় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কারো প্রতি তার অনুগ্রহ নেই, নিজের উপকারের জন্য সে ব্যয় করছে। দান গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনোরূপ অকৃতজ্ঞতা অনুভব করলেও তাকে খোদায়ী রীতির অনুসারী হয়ে ক্ষমা করা দরকার।

চতুর্থ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই অন্যভাবে আরো তাকীদসহ বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুখে অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা আচার-আচরণের মাধ্যমে গ্রহীতাকে কষ্ট দিয়ে নিজের দান-খয়রাতকে বরবাদ করো না।

এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে দান-খয়রাতের পর অনুগ্রহ প্রকাশ কিংবা গ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়ার মতো কোনো কাজ করা হয়, তা বাতিল এবং না করার শামিল। এরূপ দান-খয়রাতে কোনো ছওয়াব নেই। এ আয়াতে দান কবুল হওয়ার আরো একটি শর্ত বর্ণনা করে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোনো মসৃণ পাথরের উপর মাটি জমে যায় এবং তাতে কেউ বীজ বপন করে। অতঃপর এর উপর মুষলধারে বারিপাত হয়। ফলে মাটি কেটে গিয়ে পাথরটি সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে যায়। এরূপ লোক স্বীয় উপার্জন হস্তগত করতে সক্ষম হবে না এবং আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এতে সদকা-খয়রাত কবুল হওয়ার এ শর্ত জানা গেল যে, নির্ভেজালভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালের ছওয়াবের নিয়তে ব্যয় করতে হবে লোক দেখানো কিংবা নাম-যশের নিয়ত করা যাবে না। নাম-যশের নিয়তে ব্যয় করা ধন-সম্পদ জলাঞ্জলি দেওয়ারই নামান্তর। যদি পরকালে বিশ্বাসী মুমিনও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কোনো দান-খয়রাত করে, তবে তার অবস্থাও তদ্রূপ হবে এবং বিনিময়ে কোনো ছওয়াবই সে পাবে না। এমতাবস্থায় এখানে لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ যোগ করে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোক দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কাজ করা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। লোক দেখানো কাজ করা বিশ্বাসে ত্রুটিরই লক্ষণ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- আল্লাহ তা'আলা কৃতঘ্ন কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত ও আয়াত সব মানুষের জন্যই প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এ সবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে; বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তৌফিক তথা সৎ কাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোনো হেদায়েত কবুল করতে পারে না।

পঞ্চম আয়াতে গ্রহণযোগ্য দান-খয়রাতের একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। যারা স্বীয় ধন-সম্পদকে মনে দৃঢ়তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে ব্যয় করে, তাদের উদারহণ কোনো টিলায় অবস্থিত বাগানের মতো। প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও হাল্কা বারিবর্ষণই যার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত।

এ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়ত ও উপরিউক্ত শর্তাবলির প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফজিলত অনেক। সৎ নিয়ত ও আন্তরিকতার সাথে অল্প ব্যয় করলেও তা যথেষ্ট এবং পারলৌকিক সাফল্যের কারণ। ষষ্ঠ আয়াতে উপরিউক্ত শর্তাবলির বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে দান-খয়রাত বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টিও একটি উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে- তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি যে, তার একটি আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হবে, বাগানের নীচ দিয়ে পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব রকম ফল থাকবে, সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলে সন্তানও বর্তমান থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে দাবানল আঘাত হানবে এবং বাগানটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে তোমাদের জন্য নজির বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

এ উদহারণে কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত যোগ করা হয়েছে; অর্থাৎ সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তার সন্তান-সন্ততিও আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক, ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কারো বাগান ও শস্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেওয়ার আশা করতে পারে, কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে নেওয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমাত্র লোকের ভরণ-পোষণ, কষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মতো বলিষ্ঠ যুবক ও সৎসন্তান-সন্ততি থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার দরুন তেমন বেশি চিন্তা ও ব্যাথার কারণ নেই। কেননা সে সন্তান-সন্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত; বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম। মোটকথা এ তিনটি শর্তই

মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্য যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করল, বাগান তৈরি হয়ে ফলও দিতে লাগল, এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। তার সন্তান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক ও দুর্বল। এহেন মুহূর্তে যদি তৈরি বাগান জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই কথা।

পূর্ণ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সদকা ও খয়রাত আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়ার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে এখলাস। অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে ও অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করতে হবে; নাম-যশের উদ্দেশ্যে নয়।

এখন সমগ্র রুকূ'র সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহর পথে ব্যয় ও সদকা খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে।

- প্রথমতঃ যে ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে।
- দ্বিতীয়তঃ সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে।
- তৃতীয়তঃ বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে।
- চতুর্থতঃ খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না।
- পঞ্চমতঃ যাকে দান করা হবে, তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।
- ষষ্ঠতঃ যা কিছু ব্যয় করা হবে, খাঁটি নিয়তের সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে। নাম-যশের জন্য নয়।

দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার সময় কোনো হকদারের হক যাতে নষ্ট না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বীয় পোষ্যদের প্রয়োজনীয় খরচাদি তাদের অনুমতি ছাড়া বন্ধ অথবা হ্রাস করে দান-খয়রাত করা কোনো ছওয়াবের কাজ নয়। অভাবগ্রস্ত ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করে সব ধন-সম্পদ দান করা কিংবা ওয়াকফ করে দেওয়া সুন্নাহর শিক্ষার পরিপন্থি। এ ছাড়াও আল্লাহর পথে ব্যয় করার হাজারো পন্থা রয়েছে।

সুন্নত দান এই যে, গুরুত্ব ও প্রয়োজনের তীব্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে খাত নির্বাচন করতে হবে। ব্যয়কারীরা সাধারণত এ দিকে লক্ষ্য রাখে না।

তৃতীয় শর্তের সারমর্ম এই যে, নিজ ধারণা মতে কোনো কাজকে সৎকাজ মনে করে সেই খাতে ব্যয় করাই ছওয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং খাতটি শরিয়তের বিচারে বৈধ ও পছন্দনীয় কিনা তা দেখাও জরুরি। যদি কেউ অবৈধ খেলাধুলার জন্য স্বীয় সহায়-সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেয়, তবে সে ছওয়াবের পরিবর্তে আজাবের যোগ্য হবে। শরিয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়– এমন সব কাজের বেলায় এ কথাই প্রযোজ্য।

পূর্ববর্তী রুকূ'তে আল্লাহর পথে ব্যয় করার বর্ণনা ছিল। এখন এর সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচ্য রুকূ'র সাতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, এর বিবরণ নিম্নরূপ– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا ...... غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

শানে নুযূল দৃষ্টে طَيِّبٰتِ শব্দের অর্থ করা হয়েছে– 'উৎকৃষ্ট'। কেউ কেউ দান করার জন্য নিকৃষ্ট বস্তু নিয়ে আসত। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার শব্দের ব্যাপকতা দৃষ্টে এর অর্থ করেছেন 'হালাল'। কেননা মাল পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট তখনই হয়, যখন তা হালালও হয়। এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতে হালালেরও তাকীদ হবে। তবে প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ী অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, খয়রাতের মাল হালাল এবং উৎকৃষ্ট দুটোই হওয়া শর্ত। মনে রাখা দরকার যে, আয়াতে উৎকৃষ্ট মাল দেওয়ার নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্য, যার কাছে উৎকৃষ্ট বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্দ ও নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করে। مَا كَسَبْتُمْ এবং اَخْرَجْنَا শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। আর وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে অকেজো জিনিস ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যার কাছে মূলতই উৎকৃষ্ট বস্তু নেই, সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। সে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করলেও গ্রহণীয় হবে।

مَا كَسَبْتُمْ শব্দ থেকে কোনো কোনো আলেম মাসআলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েজ। কেননা মহানবী ﷺ বলেন, তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জনের একটি পূতঃপবিত্র অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর। –[কুরতুবী]

শস্য ক্ষেতের ওশর-বিধি : وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ বাক্যে اَخْرَجْنَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী জমিতে [যে জমিনের উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ ইসলামি বিধান অনুযায়ী সরকারি তহবিলে জমা দিতে হয়।] যে ফল উৎপন্ন হয়, তার এক দশমাংশ দান করা ওয়াজিব। আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, ওশরী জমিতে ফসল অল্প হোক বা বেশি হোক ওশর দেওয়া ওয়াজিব। সূরা আন'আমের وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ আয়াতটি ওশর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশসূচক।

'ওশর' ও 'খারাজ' ইসলামি শরিয়তের দুটি পারিভাষিক শব্দ। এ দুয়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। উভয়টিতে ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে আর্থিক ইবাদতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; যেমন জাকাত। এ কারণেই ওশরকে 'জাকাতুল-আরদ' বা ভূমির জাকাতও বলা হয়। পক্ষান্তরে খেরাজ শুধু করকে বুঝায়। এতে ইবাদতের কোনো দিক নেই। মুসলমানরা ইবাদতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেওয়া হয়, তাকে 'ওশর' বলা হয়। অমুসলিমরা ইবাদতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে 'খারাজ' বলা হয়। জাকাত ও ওশরের মধ্যে কার্যতঃ আরো পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্য সামগ্রির উপর বছরান্তে জাকাত ওয়াজিব হয়, কিন্তু ওশরী জমিনে উৎপাদনের সাথে সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়।
দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্য মুনাফা না হলেও বছরান্তে জাকাত ফরজ হবে। ওশর ও খেরাজের বিস্তারিত ফিকহ গ্রন্থ সমূহের দ্রষ্টব্য।

الشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

যখন কারো মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-খয়রাত করলে ফকির হয়ে যাবে, বিশেষতঃ আল্লাহ তা'আলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং খোদায়ী ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানি ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেওয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এখানে এরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা শয়তানের চেহারাও দেখিনি। প্ররোচনা ও নির্দেশ দেওয়া দূরের কথা। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, সদকা-খয়রাত করলে গুনাহ মাফ হবে এবং ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহর ভাণ্ডারে কোনো কিছুর অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়ত ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِبْتِغَآءَ : এটি বাব اِفْتِعَالٌ এর মাসদার মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অন্বেষণ করা।

اٰتَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মোরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ- সে দিয়েছে।

يَوَدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মূলবর্ণ (و ـ د ـ د) মাসদার اَلْوِدَادُ، اَلْمَوَدَّةُ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- সে পছন্দ করে।

اَصَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصَابَةُ মূলবর্ণ (ص ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- সে পৌছেছে।

لَاتَيَمَّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّيَمُّمُ মূলবর্ণ (ى ـ م ـ م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তোমরা ইচ্ছা করো না।

اُوْتِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস মোরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ- তাকে দেওয়া হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ : এখানে كَذٰلِكَ শব্দটি مبتدأ আর يُبَيِّنُ হলো فعل এবং اَللّٰهُ শব্দটি فاعل ও لَكُمْ এর ل টি حرف جار এবং كُمْ الْاٰيٰتِ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে فعل ـ فاعل ـ مفعول له ও مفعول له হয়েছে। এখন لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ পুরোটা جملة হয়ে متعلق তারপর جملة اسمية হয়েছে। এরপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة فعلية خبرية হয়ে خبر মিলে متعلق হয়েছে।

قوله وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ : এখানে و টি حرف عطف এবং مَا টি نافية আর يَذَّكَّرُ হলো فعل এতে هُوَ যমীর مستثنى منه আর اِلَّا টি حرف استثناء এবং اُولُو الْاَلْبَابِ উভয়টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مستثنى এবার مستثنى منه ও مستثنى মিলে فاعل তারপর فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়েছে।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ (٢٧٠)	অনুবাদ (২৭০) আর তোমরা যে কোনো প্রকার ব্যয় কর অথবা যে কোনো প্রকার মানত কর, আল্লাহ তার সবকিছুই নিশ্চিতভাবে অবগত আছেন, আর অনাচারীদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।
اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (٢٧١)	(২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে প্রদান কর সদকাসমূহ সে-ও ভালো কথা, আর যদি তাতে গোপনীয়তা অবলম্বন কর ও দরিদ্রদেরকে দিয়ে দাও, তবে এই গোপনীয়তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম এবং আল্লাহ তোমাদের কতিপয় পাপও মোচন করে দিবেন, আর আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।
لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ (٢٧٢)	(২৭২) তাদেরকে সৎপথে [ইসলামে] আনয়ন করা আপনার দায়িত্ব নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন, আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিজেদের স্বার্থের জন্যই কর, আর তোমরা অন্য কোনো উদ্দেশ্যেই ব্যয় করো না আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত, আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করছ, এই সমস্তের [ছওয়াব] তোমরা পুরোপুরি প্রাপ্ত হবে এবং তোমাদের জন্য তাতে কিছু মাত্রও কম করা হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭০) وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ আর তোমরা যে কোনো প্রকার ব্যয় কর اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ অথবা যে কোনো প্রকার মানত কর فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ আল্লাহ তার সবকিছুই নিশ্চিতভাবে অবগত আছেন وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ আর অনাচারীদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

(২৭১) اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ যদি তোমরা প্রকাশ্যে প্রদান কর সদকাসমূহ فَنِعِمَّا هِيَ সে-ও ভালো কথা وَاِنْ تُخْفُوْهَا আর যদি তাতে গোপনীয়তা অবলম্বন কর وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ ও দারিদ্রদেরকে দিয়ে দাও فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ তবে এই গোপনীয়তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ এবং আল্লাহ তোমাদের কতিপয় পাপও মোচন করে দিবেন, وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ আর আল্লাহ তোমাদের কৃত-কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

(২৭২) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ তাদেরকে সৎপথে আনয়ন করা আপনার দায়িত্ব নয়; وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর فَلِاَنْفُسِكُمْ নিজেদের স্বার্থের জন্যই কর وَمَا تُنْفِقُوْنَ আর তোমরা অন্য কোনো উদ্দেশ্যেই ব্যয় করো না اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করছ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ এই সমস্তের ছওয়াব তোমরা পুরোপুরি প্রাপ্ত হবে وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ এবং তোমাদের জন্য তাতে কিছু মাত্রও কম করা হবে না

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (২৭৩) প্রকৃত দাবি সেই অভাবীদেরই যারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, আল্লাহর পথে, তাদের পক্ষে দেশের কোথাও বিচরণ করা সম্ভব হয় না, যারা ওয়াকেফহাল নয় তারা তাদেরকে ধনী মনে করে এরা যাচঞা করা হতে বিরত থাকার দরুন তোমরা তাদেরকে চিনে নিতে পারবে তাদের লক্ষণের দ্বারা, তারা লোকের নিকট ব্যাকুলভাবে যাচঞা করে বেড়ায় না, আর যে অর্থ তোমরা ব্যয় করবে নিশ্চয় আল্লাহ তার পূর্ণ খবর রাখেন।	لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (٢٧٣)
(২৭৪) যারা ব্যয় করে নিজেদের সম্পদসমূহ রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যভাবে [সর্বাবস্থায়] তারা তাদের ছওয়াব পাবে তাদের রবের নিকটে এবং না তাদের কোনো আশঙ্কা আছে আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।	اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٢٧٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭৩) لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ প্রকৃত দাবি সেই অভাবীদেরই যারা اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আবদ্ধ হয়ে পড়েছে আল্লাহর পথে لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ তাদের পক্ষে দেশের কোথাও বিচরণ করা সম্ভব হয় না يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ যারা ওয়াকেফহাল নয় তারা তাদেরকে ধনী মনে করে مِنَ التَّعَفُّفِ এরা যাচঞা করা হতে বিরত থাকার দরুন تَعْرِفُهُمْ তোমরা তাদেরকে চিনে নিতে পারবে بِسِيْمٰهُمْ তাদের লক্ষণের দ্বারা لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا তারা লোকের নিকট ব্যাকুলভাবে যাচঞা করে বেড়ায় না وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ আর যে অর্থ তোমরা ব্যয় করবে فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ তার পূর্ণ খবর রাখেন।

(২৭৪) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ যারা ব্যয় করে নিজেদের সম্পদসমূহ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ রাত্রে ও দিনে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً গোপনে ও প্রকাশ্যভাবে فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ তারা তাদের ছওয়াব পাবে عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের রবের নিকট وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ এবং না তাদের কোনো আশঙ্কা আছে وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ আর না তারা চিন্তান্বিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৭১) قوله اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রকাশ্যে এবং গোপনে দান-খয়রাত করার মধ্যে কোনটি উত্তম তা জিজ্ঞাসা করেন। এ প্রশ্নের উত্তরে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

দান-খয়রাতের নিয়ম : ফরজ সদকা প্রকাশ্যভাবে দেওয়া ভালো। আর নফল সদকা গোপনে দেওয়া ভালো। তেমনিভাবে প্রত্যেক ফরজ কাজ প্রকাশ্যভাবে এবং নফল কাজ গোপনে করাই উত্তম। তবে লোক দেখানো উদ্দেশ্য না হলে লোক সম্মুখে প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম। তাতে অন্যেরাও দানের প্রতি উৎসাহিত হয়। আর গোপনে দান করলে দান গ্রহীতা লজ্জা পায় না। তা ছাড়া চরিত্র সংশোধন হতে থাকে। সৎ স্বভাবগুলো অর্জিত হতে থাকে আর অসৎ স্বভাবগুলো ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে। বস্তুত এতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

(২৭২) قوله لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ মুশরিকদেরকে দীনের প্রতি ছলে-কলে অনুরাগী করার উদ্দেশ্যে মু'মিনদের প্রতি আদেশ করলেন : لَا تَصَدَّقُوْا اِلَّا عَلٰى اَهْلِ دِيْنِكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের দীনি ভাইদের ছাড়া অন্য কারো প্রতি দান-খয়রাত করবে না। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর] এখানে উল্লেখ যে, মুশরিকরা অভাবের তাড়নায় মুসলিম ধনীদের সদকার প্রতি সদা লালায়িত ছিল। তাই তাদের মধ্যে ইসলাম-প্রীতি সৃষ্টি করার জন্য উপরিউক্ত আদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু এ উক্তিটি আল্লাহ অপছন্দ করেন। অতঃপর এ আয়াতটি নাজিল হয়।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, কতিপয় মুসলমান ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের শ্বশুর-জামাই সম্পর্কীয় গরিব আত্মীয় এবং দুগ্ধ সম্পর্কিত গরিব আত্মীয়দের প্রতি দান-খয়রাত করতে সংকোচ করতে থাকেন। এরই প্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াতটি নাজিল হয়।

(২৭৪) قوله اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আসাকেরের বরাত দিয়ে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একবার দশ হাজার দিরহাম দিনে, দশ হাজার দিরহাম রাতে, দশ হাজার দিরহাম গোপনে এবং দশ হাজার দিরহাম প্রকাশ্যে, মোট চল্লিশ হাজার দিরহাম আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

قَالَ الْاَلُوْسِىْ : وَتَعَقَّبَهُ السُّيُوْطِىُّ بِاَنَّ حَدِيْثَ تَصَدُّقِهِ بِاَرْبَعِيْنَ اَلْفَ دِيْنَارٍ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِىْ تَارِيْخِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا وَخَبَرَ اَنَّ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ لَمْ اَقِفْ عَلَيْهِ. وَكَاَنَّ مَنِ ادَّعٰى ذٰلِكَ فَهِمَهُ مِمَّا اَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ…… فَاَيْنَ اَصْحَابُ هٰذِهِ الْاٰيَةِ الْكَرِيْمَةِ وَاَنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهَا لَا دَلَالَةَ فِيْهَا عَلَى الْمُدَّعِىْ - ٧/ ٣٧.

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত হযরত আলী (রা.)-এর শানে নাজিল হয়। একদা তার নিকট মাত্র চারটি দিরহাম ছিল। এগুলো হতে তিনি রাতে ১ দিরহাম, দিনে এক দিরহাম, প্রকাশ্যে এক দিরহাম এবং গোপনে এক দিরহাম দান করেন তখন এ আয়াতটি নাজিল হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

قوله وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ**-এর মর্মার্থ :** উল্লিখিত ভাষ্যে نَفَقَةٌ শব্দটি نَكِرَهْ ব্যবহার করে সর্ববিধ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে অর্থাৎ ব্যয় প্রকাশ্যও হতে পারে এবং গোপনীয়ও হতে পারে, অল্পও হতে পারে এবং অনেকও হতে পারে, আবার সৎপথেও হতে পারে এবং অসৎ পথেও হতে পারে। অনুরূপ نَذْرٌ শব্দটিকে نَكِرَهْ ব্যবহার করে ব্যাপকার্থে সব রকমের মানত অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ মানত কিংবা লোক দেখানো শর্ত সাপেক্ষ এবং শর্ত শূন্যও হতে পারে। সৎ উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং অসৎ উদ্দেশ্যেও হতে পারে। এ জন্যই পরবর্তী فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ উক্তি দ্বারা সাবধান করা হয়েছে যে, ব্যয় বা মানত যাই করা হয়, তা যেন হিসেব করে করা হয় যাতে আল্লাহর ক্রোধ উৎপাদিত না হয় কেননা আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই জানেন।

قوله وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ**- এর মর্মার্থ :** বাহ্যত বক্ষ্যমাণ আয়াতে ফরজ, নফল সব রকমের দান-খয়রাতকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্ব প্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই কল্যাণকর। এতে ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় প্রকারের উপকারিতা রয়েছে। ধর্মীয় উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। জাগতিক উপকারিতা এই যে, অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা অতীব কল্যাণকর হওয়া নফল সদকার ক্ষেত্রে সর্বজন বিবেচ্য। কিন্তু ফরজ সদকার ক্ষেত্রে অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রকাশ্যে দান করা উত্তম। এতে সম্ভাব্য অপবাদ থেকে মুক্তিলাভও ঘটে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ মর্মে বর্ণিত আছে যে, নফল সদকা গোপনীয়তার সাথে করলে প্রকাশ্য সদকার চেয়ে ৭০ গুণ ছওয়াব বেশি আর ফরজ সদকা প্রকাশ্যে করলে গোপনীয়তার চেয়ে ২৫ গুণ বেশি ছওয়াব পাওয়া যায় –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]।

قوله وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ**- এর ব্যাখ্যা :** উল্লিখিত উক্তিটি পূর্বোক্ত خَيْرٌ শব্দের উপর عَطْف হয়েছে, তবে এখানে সদকা গুনাহের কাফফারা হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। আর যদি বাক্যটি جُمْلَهْ مُسْتَانِفَهْ হয়, তবে গুনাহের কাফফারা হওয়া সব রকমের দানের সাথে সম্পৃক্ত। তবে শুধু এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য গোপনীয়তার পার্শ্বে একে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গোপনে দান করার মধ্যে যদি তুমি কোনো বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষণ্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা এর দ্বারা আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করবেন এটা তোমার জন্য সদকার বিরাট উপকারও বটে।

قوله لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ الخ **-এর মর্মার্থ : ইমাম সুয়ূতী (র.)** আসবাবুন নুকূল গ্রন্থে বলেন, মসজিদে নববীর আঙ্গিনার অধিবাসী প্রায় চারশত মুহাজির সাহাবী রাসূলের মসজিদের পার্শ্বে সার্বক্ষণিক অবস্থান করে দীন শিক্ষার কাজে সদা ব্যস্ত এবং খণ্ড যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। তারা দুনিয়াবি সুখ ও কষ্ট কোনোটার প্রতি মনোযোগী ছিলেন না। তারা সেখানে ধর্মীয় ইলম শিক্ষা এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে সার্বক্ষণিক মানসিকভাবে তৈরি থাকতেন। নিজ প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জনের সময়টুকু তাঁরা পেতেন না। তাঁরা দরিদ্র, ক্ষুধাতুর থাকা সত্ত্বেও নিজেরা মানুষের কাছে হস্ত প্রসারিত করতেন না। আল্লাহ তাদের লক্ষ্য করে এ আয়াত নাজিল করে বলেন, তোমরা তাদেরকে দান কর। কেননা তারাই তা পাওয়ার হকদার।

قوله لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ الخ **-এর মর্মার্থ :** তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ এ আয়াতে বলেন যে, দান-খয়রাতে আসলে তোমাদের নিয়ত অনুযায়ী তোমাদের নিজেদেরই উপকার হবে। এমতাবস্থায় দান-খয়রাত বিশেষত মুসলমানদেরকেই করা উত্তম। কিন্তু নফল সদকা হলে মানবতার বিবেচনায় অমুসলিমদের প্রতিও সদকা করা যায়, আলোচ্য আয়াতে সদকা অর্থ নফল সদকা যা জিম্মি কাফেরকেও দেওয়া জায়েজ। এখানে ফরজ সদকা বুঝানো হয়নি। ফরজ সদকা মুসলমান ছাড়া অন্যদের দেওয়া জায়েজ নয়। তবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ বলে নবীজীকে একথা জানিয়ে দিলেন যে, হেদায়েতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা; হেদায়েত করার কোনো ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়নি। তিনি কেবল উপদেশদাতা। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন– اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

قوله لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ الخ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** ইমাম কুরতুবী (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে ফকির শব্দ দ্বারা ঐ সব লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা উপার্জনের জন্য কোনো কাজ করতে পারে না। এখানে সাধারণ ভিক্ষুক বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা দ্বারা আসহাবে সুফ্ফার আর্থিক অসহায় অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قوله يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোনো ফকিরকে যদি মূল্যবান পোশাক পরা অবস্থায় দেখা যায়, তবে একারণে তাকে ধনী মনে করা যাবে না; বরং যদি সে আর্থিক অবস্থায় দুর্বল হয় এবং সংসার জীবন অভাব অনটনগ্রস্ত হয়, তবে তাকে ফকিরই বলা হবে। এ রকম ব্যক্তিকে জাকাত দান করা বা সদকা দেওয়া জায়েজ হবে।

قوله تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা আর্থিকভাবে অভাবগ্রস্ত তাদের চেহারা দেখলেই চেনা যায়। অভাবগ্রস্তদের চোখে-মুখে দারিদ্র্যের ছাপ থাকে। পোশাক-আশাক পরিপাটি হলেই তাকে ধনী মনে করার কারণ নেই। মূলত যে সকল গরিব লোক পরিপাটি থাকে এবং মানুষের মাঝে প্রকাশ্যে ভিক্ষা চায় না অধিকন্তু তারাই সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। ইমাম রাযী (রা.) তাফসীরে কবীরে এবং ইমাম কুরতুবী (রা.) তাঁর তাফসীরে বলেন, এতে বুঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোনো বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায় যার গলদেশে পৈতা পরা থাকে এবং খতনাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলমানের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না।

قوله لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا الخ **-এর মর্মকথা :** আমাদের সমাজে কতিপয় ভিক্ষুক আছে যারা মানুষকে ভিক্ষা দিতে বাধ্য করে। কতিপয় ভিক্ষুক এমন যে, নির্লজ্জভাবে যখন তখন, যেখানে সেখানে প্রকাশ্যে ভিক্ষা করে বেড়ায়। এ জাতীয় ভিক্ষা বৃত্তিকে ইসলাম হারাম করেছে তবে এ প্রকার ভিক্ষুককে (যদি সে ভিক্ষা পাওয়ার যোগ্য হয়) সাহায্য করা গুনাহ নয়। আরো এক শ্রেণির দরিদ্রলোক আছে যারা আত্ম-মর্যাদাবোধের কারণে প্রকাশ্যে কারো কাছে ভিক্ষা (সাহায্য) চায় না; গোপনে কারো কাছে কিছু চাইলেও জোর দাবি করে না, আলোচ্য আয়াতে لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا দ্বারা এ শ্রেণির দরিদ্রদের বুঝানো হয়েছে। মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, তারা কোনো ব্যক্তির পথ রোধ করে ভিক্ষা চায় না। কোনো কোনো তাফসীরকার এজন্য বলেন, তাদের বিরক্তিকর সাওয়ালের অভ্যাসই নেই। কতিপয় মুফাসসির বলেন, এর অর্থ এই যে, তারা মোটেও সাওয়াল করেন না। ইমাম তাবারী ও মাজ্জাজ (র.) বলেন, اِلْحَافٌ অর্থ– ধন্না দেওয়া এবং এমনভাবে কাকুতি-মিনতি করে হাত পাতা যে, কিছু আদায় না করা পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয় না।

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ এ সপ্তম আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাত্রে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতের জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই, দিবারাত্রিরও কোনো প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহর পথে ব্যয় করলে ছওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়তে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়ত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে ব্যয় করার কোনো প্রয়োজন দেখা না দেওয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُبْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْدَاءُ মূলবর্ণ (ب . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তোমরা প্রকাশ করে দাও।

تُخْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (خ . ف . ى) মাসদার اَلْاِخْفَاءُ জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা গোপন কর।

تُؤْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى ও مهموز فاء অর্থ- তোমরা দাও।

يَهْدِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে হেদায়েত করে।

يَشَآءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلشَّيْءُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং مهموز لام অর্থ- সে চায়।

اُحْصِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْصَارُ মূলবর্ণ (ح . ص . ر) জিনস صحيح অর্থ- তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

لَايَسْتَطِيْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা সক্ষম নয়। তাদের ক্ষমতা নেই।

لَايَسْئَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব মূলবর্ণ (س . أ . ل) فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ জিনস مهموز عين অর্থ- তারা চায় না।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ : এখানে يَحْسَبُ হলো فعل আর هُمْ হলো مفعول اول এবং اَلْجَاهِلُ হলো فاعل তারপর اَغْنِيَاءَ হলো مفعول ثانى আর مِنَ التَّعَفُّفِ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق অবশেষে فعل.فاعل ও উভয় مفعول এবং متعلق মিলে جملة فعلية হলো।

قَالَ فِىْ اِعْرَابِ الْقُرْاٰنِ : مِنَ التَّعَفُّفِ جَارٌ مَجْرُوْرٌ فِىْ مَوْضَعِ نَصَبٍ عَلٰى اَنَّهٗ مَفْعُوْلٌ لِاَجَلِهٖ وَجَرَّ بِهٖ "مِنْ" لِاَنَّهٗ فَقَدَ شَرْطًا مِنْ اَهَمِّ شُرُوْطِهٖ وَهُوَ اِتِّحَادُ الْفَاعِلِ. فَفَاعِلُ الْحِسْبَانِ هُوَ الْجَاهِلُ. وَفَاعِلُ التَّعَفُّفِ هُمُ الْفُقَرَاءُ - ١. ٣٦٥

অনুবাদ : (২৭৫) যারা সুদ গ্রহণ করে, তারা দাঁড়াবে না সেই অবস্থা ব্যতীত যে অবস্থায় দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাভিভূত করে দেয়, তা এই জন্য যে, তারা বলেছিল, ক্রয়-বিক্রয় সুদের ন্যায়ই। অথচ আল্লাহ হালাল করেছেন ক্রয়-বিক্রয়কে এবং হারাম করেছেন সুদকে, অতঃপর যার নিকট স্বীয় রবের পক্ষ হতে উপদেশ পৌঁছেছে অনন্তর সে বিরত রয়েছে, তবে তারই থাকবে যা কিছু পূর্বে হয়েছে, আর তার বিষয়টি আল্লাহর হাওয়ালায় রইল, আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করে, তবে তারা দোজখবাসী হবে, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।	اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢٧٥)
(২৭৬) আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন, আর আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না কোনো অমান্যকারীকে, কোনো পাপাচারীকে।	يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ (٢٧٦)
(২৭৭) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আর নামাজের পাবন্দি করেছে, আর জাকাত আদায় করেছে, তারা তাদের ছওয়াব পাবে তাদের রবের নিকট এবং না তাদের কোনো আশঙ্কা থাকবে এবং না তারা চিন্তান্বিত হবে।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٢٧٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭৫) اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا যারা সুদ গ্রহণ করে لَا يَقُوْمُوْنَ তারা দাঁড়াবে না اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ সেই অবস্থা ব্যতীত যে অবস্থায় দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাভিভূত করে দেয় ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ তা এই জন্য যে। قَالُوْٓا তারা বলেছিল। اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ক্রয়-বিক্রয় সুদের ন্যায়ই وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ অথচ আল্লাহ হালাল করেছেন ক্রয়-বিক্রয়কে। وَحَرَّمَ الرِّبٰوا এবং হারাম করেছেন সুদকে فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ অতঃপর যার নিকট স্বীয় রবের পক্ষ হতে উপদেশ পৌঁছেছে فَانْتَهٰى অনন্তর সে বিরত রয়েছে, فَلَهٗ مَا سَلَفَ তবে তারই থাকবে যাকিছু পূর্বে হয়েছে, وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ আর তার বিষয়টি আল্লাহর হাওয়ালায় রইল وَمَنْ عَادَ আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করে فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ তবে তারা দোজখবাসী হবে هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

(২৭৬) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ এবং সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ আর আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ কোনো অমান্যকারীকে, কোনো পাপাচারীকে।

(২৭৭) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি করেছে وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ আর জাকাত আদায় করেছে لَهُمْ اَجْرُهُمْ তারা তাদের ছওয়াব পাবে عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের রবের নিকট وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ এবং না তাদের কোনো আশঙ্কা থাকবে وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং না তারা চিন্তান্বিত হবে

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (২৭৮) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, এবং সুদের যা বকেয়া রয়েছে তা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা ঈমানদার হও।	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
(২৭৯) অতঃপর যদি তোমরা না কর তবে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও, আল্লাহর পক্ষ হতে ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে, আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন প্রাপ্ত হবে , না তোমরা কারো প্রতি জুলুম করতে পারবে , আর না তোমাদের প্রতি কেউ জুলুম করতে পারবে।	فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾
(২৮০) আর যদি [দেনাদার] অভাবী হয় তবে অবকাশ দেওয়ার হুকুম আছে সচ্ছলতা পর্যন্ত, আর মাফ করে দেওয়া আরো উত্তম তোমাদের জন্য, যদি তোমাদের অবগতি থাকে।	وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾
(২৮১) আর সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর সমীপে নীত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্ম [-এর ফল] পুরোপুরি প্রাপ্ত হবে এবং তাদের উপর কোনো প্রকার অবিচার করা হবে না।	وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭৮) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا হে মুমিনগণ! ٱتَّقُوا ٱللَّهَ আল্লাহকে ভয় কর। وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا এবং সুদের যা বকেয়া রয়েছে তা পরিত্যাগ কর إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ যদি তোমরা ঈমানদার হও।

(২৭৯) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا অতঃপর যদি তোমরা না কর فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ তবে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ আল্লাহর পক্ষ হতে ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে وَإِن تُبْتُمْ আর যদি তোমরা তওবা কর فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ তবে তোমরা তোমাদের মূলধন প্রাপ্ত হবে لَا تَظْلِمُونَ না তোমরা কারো প্রতি জুলুম করতে পারবে وَلَا تُظْلَمُونَ আর না তোমাদের প্রতি কেউ জুলুম করতে পারবে।

(২৮০) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ আর যদি [দেনাদার] অভাবী হয় فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ তবে অবকাশ দেওয়ার হুকুম আছে সচ্ছলতা পর্যন্ত وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ আর মাফ করে দেওয়া আরো উত্তম তোমাদের জন্য إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ যদি তোমাদের অবগতি থাকে।

(২৮১) وَٱتَّقُوا يَوْمًا আর সেই দিনকে ভয় কর تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ যে দিন তোমরা আল্লাহর সমীপে নীত হবে ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ অতঃপর প্রত্যেকেই পুরোপুরি প্রাপ্ত হবে مَّا كَسَبَتْ তার কৃতকর্ম [-এর ফল] وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ এবং তাদের উপর কোনো প্রকার অবিচার করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৭৮) قوله يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : এ আয়াতটি সাকীফ গোত্রের বনী আমর ইবনে ওমায়ের এবং মাখযুম গোত্রের বনী মুগীরা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। জাহেলি যুগে তাদের মধ্যে সুদের লেনদেন ছিল, ইসলাম আগমনের পর বনূ আমর বনূ মুগীরার নিকট নিজেদের সুদ দাবি করে, তখন তারা বলে আমরা ইসলাম গ্রহণের

পর তা আদায় করব না। শেষ পর্যন্ত উভয় গোত্রের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। ঘটনাটি তৎকালীন মক্কার গভর্নর হযরত আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা.)-এর নিকট উত্থাপিত হলে তিনি নবী করীম (সা.)-এর নিকট তা লিখে পাঠান এবং তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[ইবনে কাসীর]

(২৭৮) قوله وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** লুবাবুন নুকূল গ্রন্থকার বলেন, যখন সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন বনূ আমরের লোকেরা গ্রহীতাদের উপর মূলধন পরিশোধের জন্য বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকে। আর ঋণগ্রহীতা হিসেবে বনূ মুগীরা ঋণ আদায়ের জন্য সময় চাইতে থাকে। কিন্তু বনূ আমর একদিনের সময় দিতেও অস্বীকার করে এবং বলে যখন আমরা সুদ ছেড়েছি তখন মূল টাকা আদায়ের জন্য সময় দেব কেন? আমাদের সব ঋণ যেভাবে হোক এখনি আদায় করে দাও। অথচ বনূ মুগীরার জন্য এটা একটা বিরাট বোঝা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাদের এ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে এ আয়াতটি নাজিল হয়।

اَلرِّبٰوا **-এর অর্থ– :** رِبٰوا আরবি ভাষার একটি প্রসিদ্ধ শব্দ। رِبٰوا সম্পর্কে ইমাম জাস্‌সাস্‌ আহকামুল কুরআনে বলেন, هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوْطُ فِيْهِ الْاَجَلُ وَزِيَادَةُ مَالٍ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ অর্থাৎ, ঐ ঋণ যা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এশর্তে দেওয়া হয় যে, ঋণগ্রহীতা তাকে মূলধন থেকে কিছু বেশি অর্থ দিবে।

ইবনে আরাবী আহকামুল কুরআনে বলেন, اَلرِّبٰوا فِى اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ بِهٖ فِى الْاٰيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ অর্থাৎ, আভিধানিক অর্থে। رِبٰوا অর্থ অতিরিক্ত কিছু দেওয়া। আয়াতে প্রত্যেক ঐ অতিরিক্ত পরিমাণকে বুঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোনো বিনিময় নেই।

রাসূল ﷺ হাদীসে। رِبٰوا-এর সংজ্ঞায় বলেন, كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا অর্থাৎ, প্রত্যেক ঋণ যা কোনো মুনাফা আনে, তাই "রিবা"।

رِبٰوا **-এর প্রকারভেদ :** ইমাম রাযী তাফসীরে কবীরে বলেন, রিবা দু'প্রকার। যথা– (১) বাকি বিক্রয়সূত্রে রিবা। (২) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি নেওয়া রিবা। প্রথম প্রকার "রিবা" জাহেলী যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। সে যুগের লোকেরা এরূপ লেনদেন করত। দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশি করা। رِبٰوا তথা সুদের অন্তর্ভুক্ত। আহকামুল কুরআনে বলা হয়েছে "রিবা" দু'প্রকার। যথা–(১) একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে। (২) অপরটি ক্রয়-বিক্রয়ের বাইরে। দ্বিতীয় প্রকারই ছিল জাহেলী যুগের "রিবা"।

قوله قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا الخ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতে, জাহেলী যুগের সুদের ব্যবসায়ীদের সুদ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণিত হয়েছে। তারা বলত, সুদের ব্যবসা আর সাধারণ ব্যবসা মূলত একই বিষয়। কারণ উভয় ব্যবসায়ে লাভ রয়েছে। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি আদৌ সঠিক নয়। তাই আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল রেখেছেন। এ আয়াতের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, সুদখোরেরা দু'টি অপরাধ করেছে। যথা– (১) সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। (২) সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলত তাদের উত্তরে বলেছে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদেরই মতো। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি সুদী লেনদেনের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য থাকে। তাই সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হওয়া যুক্তিযুক্ত। অথচ ক্রয়-বিক্রয়কে কেউ হারাম বলে না।

قوله وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا**-এর ব্যাখ্যা :** এ বাক্যটি আল্লাহ তা'আলা সুদের ব্যবসায়ীদের ঐ উক্তির জবাবে বলেছেন, যাতে তারা ব্যবসাকে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় উক্তি দ্বারা এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখিয়েছেন। আল্লাহ পাক একটিকে হালাল এবং অপরটিকে হারাম করেছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে? সুদখোরদের আপত্তি ছিল যুক্তি ভিত্তিক। আর আল্লাহ এর জবাব যুক্তির মাধ্যমে দেননি; বরং বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছেন যে, সব কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলাই। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর লাভ-ক্ষতি ও ভালো-মন্দ সম্পর্কে তিনিই পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

قوله يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ الخ **-এর মর্মকথা :** এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং জাকাত কিংবা দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এ উক্তি পরকালের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পরিষ্কার। সত্যোপলব্ধির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট। এদিকে লক্ষ্য করেই হযরত রাসূল ﷺ বলেছেন– اِنَّ الرِّبٰوا وَاِنْ كَثُرَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهٗ تَصِيْرُ اِلٰى قَلٍّ অর্থাৎ, সুদ যদিও বাহ্যত বৃদ্ধি পায়; কিন্তু এর শেষ পরিণতি হলো স্বল্পতা।

قوله وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ الخ **-এর মর্মার্থ :** আল্লাহ তা'আলা কোনো কাফের গুনাহগারকে পছন্দ করেন না। এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদ হারামই মনে করে না; বরং বেপরোয়ার সাথে সুদের কারবার চালিয়ে যায় তারা কুফরিতে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যত সুদ খায় তারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত, পাপাচারী। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।

قوله اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** এ আয়াতে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশের প্রতি অনুগত সৎকর্মশীল মু'মিনদের বিরাট পুরস্কার ও পরকালীন সুখ-শান্তির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে সুদখোরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ও লাঞ্ছনার আজাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তাই কুরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এর সাথে সাথে ঈমানদার সৎকর্মী তথা নামাজ জাকাত আদায়কারীদের ছওয়াব ও পরকালীন মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

সুদের অপকারিতা : সুদ গ্রহণকারীদের হৃদয় নির্মম ও নিষ্ঠুর হয়ে যায়। দয়া-মায়া ও পরোপকার তাদের হৃদয় হতে বিলীন হয়ে যায়। স্বার্থপরতা, কপটতা এবং কুটিলতা তাদেরকে পেয়ে বসে। সুদ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পদশালীরা দরিদ্র ব্যক্তিদের সম্পদ চুষে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। ফলে উভয়ের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। দেশে ও সমাজে ভেদাভেদ ও বৈষম্য গজিয়ে উঠে। দীন-দরিদ্রের দুঃখ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং সম্পদশালীদের সম্পদ আরো বাড়তে থাকে। এ সব কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা সুদকে হারাম করেছেন।

اَلرِّبٰوا তথা সুদের পরিচয় : আভিধানিক অর্থ : رِبٰوا শব্দের অর্থ– (১) اَلْفَضْلُ তথা অতিরিক্ত হওয়া। যেমন– فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا (২) اَلزِّيَادَةُ তথা বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন আল্লাহ বলেন– مَا اٰتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ
পরিভাষায় ঃ هُوَ الزِّيَادَةُ عَلٰى اَصْلِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُعٍ অর্থাৎ, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির বহির্ভূত মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে সুদ বলা হয়।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে– اَلرِّبٰوا هُوَ الزِّيَادَةُ عَلٰى رَاْسِ الْمَالِ অর্থাৎ, মূলধনের অতিরিক্তি গ্রহণ করাকে সুদ বলে।

মোটকথা, লেনদেন ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসেবে যে অতিরিক্ত মাল ধার্য করা হয়, যার কোনো বিনিময় দেওয়া হয় না, তাই সুদ।

সমাজ জীবনে সুদের অপকারিতা : (১) সুদ গরিব শোষণের হাতিয়ার। (২) সুদ সমাজে ধনী-গরিবের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি করে। (৩) দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে। (৪) সামাজিক শান্তি বিনষ্ট করে। (৫) সমাজে অন্যায়, পাপাচার, নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি করে। (৬) মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়। (৭) সুদ সমাজের নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ বিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত। (৮) সুদ গরিবের সম্পদকে ধনীদের মাঝে পুঞ্জিভূত করে দেয়। (৯) সামাজিক শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ধ্বংস করে দেয়। (১০) সমাজে অনৈসলামিক অর্থ ব্যবস্থা চালু হয়। (১১) অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।

قوله اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا الخ **-এর মর্মকথা :** বিনিয়োগকৃত সুদের টাকা ছেড়ে দেওয়া মানব মনের জন্য কঠিন হতে পারত, তাই আগে اتَّقُوا اللّٰهَ বলে পরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا অর্থাৎ, তোমরা বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা এবং বিরুদ্ধাচরণ না করাই ঈমানের পরিচায়ক। নির্দেশটি পালন কষ্ট সাধ্য ছিল বলে এর পূর্বে اتَّقُوا اللّٰهَ বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশের পর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যুক্ত করা হয়েছে।

قوله وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** যদি তোমরা তওবা করে ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে সংকল্প বদ্ধ হও, তবে তোমরা আসল মূলধন পেয়ে যাবে। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারো উপর জুলুম করতে পারবে না এবং কোনো ঋণগ্রহীতা মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে গড়িমসি করে তোমাদের উপর জুলুম করতে পারবে না। আয়াতে আসল মূলধন ফিরে পাওয়ার ব্যাপারটা তওবার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবেই তোমরা আসল মূলধন ফিরে পাবে।

এ আয়াতের বাহ্য ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করে তওবা না করলে মূলধন পাবে না। এর অর্থ হলো যদি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সুদকে হারাম মনে না করে, পরন্তু আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তওবা করে সুদ ছেড়ে না দেয় তবে এ ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ, ধর্মত্যাগী। ধর্মত্যাগীর ধন-সম্পদ কোনো মু'মিনের হস্তগত থাকলে তাতে ধর্মত্যাগীর মালিকানা থাকে না।

قوله فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا الخ **-এর মর্মার্থ :** আল্লাহর আদেশের পর সুদ না ছাড়লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে জিহাদ ঘোষিত হয়েছে। কুফরি ছাড়া অন্য কোনো বৃহত্তম গুনাহের জন্য কুরআনুল কারীমে এত বড় শাস্তির কথা উল্লিখিত হয় নি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিয়ামত দিবসে সুদখোরকে বলা হবে যুদ্ধের জন্য তোমার হাতিয়ার নাও। সুদখোর যদি অনবরত সুদ খেতেই থাকে এবং কোনো নসিহত না শুনে, তবে তাকে হত্যা করা হবে। হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, আল্লাহ সুদখোরকে হত্যার ধমক দিয়েছেন। যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই সে হত্যার উপযুক্ত।

কারো মতে, যদি কোনো জনপদ সুদকে হালাল বলে সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তারা মুরতাদ। মুরতাদের সকল বিধান তাদের উপর কার্যকর হবে। আর তারা যদি হালাল না বলে সুদ গ্রহণ করে, তবে ইমাম বা নেতার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা বৈধ।

قوله وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** সুদখোরের অভ্যাস হলো এই যে, ঋণগ্রহীতা যদি নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সুদের অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায়। তৎপর সুদে আসলে মিলে মূলধন হয়ে সুদের হার আগের চেয়ে বাড়িয়ে দেয়। এখানে আল্লাহ তা'আলা আইন দিয়েছেন যে, কোনো ঋণগ্রহীতা বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েজ নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এরূপ গরিবকে ক্ষমা করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম। এখানে ক্ষমা করাকে কুরআনে সদকা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য সদকা হয়ে যাবে এবং বিরাট ছওয়াবের কারণ হবে।

ঋণগ্রহীতা নিঃস্ব হলে তার সাথে নম্র ব্যবহারের ফজিলত : রাসূল ﷺ নিঃস্ব ঋণগ্রহীতার সাথে নম্র ব্যবহারের বহু ফজিলত বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কোনো নিঃস্ব দেনাদারকে সময় দেবে সে প্রত্যহ দেনা পরিমাণ অর্থ সদকা করার ছওয়াব পাবে। যখন দেনার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায় এবং দেনাদার দেনা পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তখন সময় দিলে প্রত্যেহ দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ সদকা করার ছওয়াব পাবে।

তাবারানী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, যেদিন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর আরশ ছাড়া মাথা গুঁজবার কোনো ছায়া পাবে না, সেদিন যে ব্যক্তি স্বীয় মস্তকের উপর আল্লাহর রহমতের ছায়া থাকার আশা রাখে, তার উচিত নিঃস্ব ঋণগ্রহীতার সাথে নম্র ব্যবহার করা, কিংবা তাকে মাফ করে দেওয়া। অন্য হাদীসে আছে, যে চায় তার দোয়া কবুল হোক, কিংবা বিপদ দূর হোক, তাঁর উচিত নিঃস্ব দেনাদারকে সময় প্রদান করা।

قوله وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ **-এর তাৎপর্য :** এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় কেয়ামতের ভয়, হাশরের হিসাব নিকাশ, ছওয়াব এবং আজাবের বিষয় উল্লেখ করে মানুষকে সুদের মতো ঘৃণ্য কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– কুরআন অবতরণের দিক হতে এটি সর্বশেষ আয়াত। এরপর কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এর একত্রিশ দিন পর রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে নয় দিন পর ইন্তেকালের কথা বর্ণিত আছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَأْكُلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (ا . ك . ل) জিনস مهموز ف، অর্থ- তারা ভক্ষণ করে।

لَايَقُوْمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ق . و . م) মাসদার اَلْقِيَامُ জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা দণ্ডায়মান হয় না।

يَتَخَبَّطُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মূলবর্ণ (خ . ب . ط) মাসদার اَلتَّخَبُّطُ জিনস صحيح অর্থ- সে বানিয়ে দিয়েছে।

انْتَهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ن . ه . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে ছেড়ে দিল।

يُرْبِي : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْبَاءُ মূলবর্ণ (ر . ب . و) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি বাড়িয়ে দেন।

اَقَامُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واى অর্থ- তারা কায়েম করল।

ذَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و . ذ . ر) জিনস مثال واوى অর্থ- তোমরা ছেড়ে দাও।

اْذَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاِذْنُ মূলবর্ণ (ا . ذ . ن) জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা জেনে রাখ।

تُبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা তওবা করেছ।

تُوَفّٰى : সীগাহ واحدمؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّوْفِيَةُ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তাকে পুরোপুরি দেওয়া হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ : এখানে واو হরফে আতফ اَللّٰهُ মুবতাদা لَا يُحِبُّ ফে'ল এতে هُوَ যমীর ফা'য়েল كُلَّ মুযাফ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহি এবার মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাফউলে বিহী। এখন ফে'ল, ফা'য়েল ও মাফউলে বিহি মিলে জুমলায়ে فعلية হয়ে খবর, সবশেষে মুবাতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হলো।

قوله وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ : এখানে واو টি حرف عطف এবং مَنْ টি اَلَّذِىْ অর্থে- ইসমে মাওসূল, عَادَ ফে'ল, এতে هُوَ যমীর فاعل এবার فعل ও فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে صلة অতঃপর صلة ও موصول মিলে শর্ত, فَاء টি جزائية এবং اُولٰٓئِكَ মুবতাদা اَصْحَابُ النَّارِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে جزاء, শর্ত এবং জাযা মিলে জুমলায়ে শরতিয়াহ হলো।

قوله وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ : এখানে واو টি হরফে আতফ اِتَّقُوْا ফে'ল এতে اَنْتُمْ যমীর فاعل আর يَوْمًا টি মাওসূফ تُرْجَعُوْنَ ফে'ল এতে اَنْتُمْ যমীর নায়েবে ফায়েল فِيْهِ এবং اِلَى اللّٰهِ উভয়টি جار ও مجرور মিলে متعلق এখন ফে'লে মাজহুল, নায়েবে ফা'য়েল ও উভয় متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে صفت এবার صفت ও موصوف মিলে مفعول فيه এবার فعل. فاعل مفعول فيه মিলে جملة فعلية হলো।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ

অনুবাদ : (২৮২) হে মুমিনগণ! যখন আদান-প্রদান করতে চাও ধারের এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, আর তা লিপিবদ্ধ করে নাও, আর অবশ্য যেন তোমাদের মধ্যে কোনো লিখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিপিবদ্ধ করে, আর কোনো লিখক যেন লিপিবদ্ধ করতে অস্বীকারও না করে– যেরূপ আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারও কর্তব্য লিখে দেওয়া, আর ঐ ব্যক্তি মুসাবিদা করিয়ে নিবে যার উপর দাবি ওয়াজিব হয়, আর আল্লাহ তা'আলাকে যিনি তার প্রতিপালক ভয় করতে থাকে, আর তাতে [লিপিবদ্ধ করাতে] বিন্দুমাত্রও কম করবে না। অধিকন্তু যার উপর দাবি ওয়াজিব ছিল, সে যদি ক্ষীণবুদ্ধি হয়, অথবা দুর্বল হয় অথবা স্বয়ং মুসাবিদা করতে অক্ষম হয়, তবে তার কার্য নির্বাহক যথাযথভাবে মুসাবিদা করিয়ে নিবে, আর দুই জন পুরুষকে তোমাদের মধ্য হতে সাক্ষী করে নাও কিন্তু যদি এই দুই সাক্ষী পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ এবং দুজন স্ত্রীলোক এমন সাক্ষীদের মধ্য হতে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যেন এই দুজন স্ত্রীলোকের মধ্যে কোনো একজন ভুলে গেলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৮২) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ যখন আদান-প্রদান করতে চাও ধারের اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত فَاكْتُبُوْهُ আর তা লিপিবদ্ধ করে নাও وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ আর অবশ্য যেন তোমাদের মধ্যে কোনো লিখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিপিবদ্ধ করে وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ আর কোনো লিখক যেন লিপিবদ্ধ করতে অস্বীকারও না করে– كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ যেরূপ আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন فَلْيَكْتُبْ তারও কর্তব্য লিখে দেওয়া وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ আর ঐ ব্যক্তি মুসাবিদা করিয়ে নিবে যার উপর দাবি ওয়াজিব হয় وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ আর আল্লাহ তা'আলাকে যিনি তার প্রতিপালক ভয় করতে থাকে وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا আর তাতে বিন্দুমাত্রও কম করবে না فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ অধিকন্তু যার উপর দাবি ওয়াজিব ছিল সে যদি سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا ক্ষীণবুদ্ধি হয়, অথবা দুর্বল اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ অথবা স্বয়ং মুসাবিদা করতে অক্ষম হয় فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ তবে তার কার্য নির্বাহক যথাযথভাবে মুসাবিদা করিয়ে নিবে وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ আর দুজন পুরুষকে তোমাদের মধ্য হতে সাক্ষী করে নাও فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ কিন্তু যদি এই দুই সাক্ষী পুরুষ না হয় فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ তবে একজন পুরুষ এবং দুজন স্ত্রীলোক مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ এমন সাক্ষীদের মধ্য হতে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا যেন এই দুই জন স্ত্রীলোকের মধ্যে কোনো একজন ভুলে গেলে فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۚ وَاَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۚ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

আর সাক্ষীরাও যেন অস্বীকার না করে যখন তাদেরকে ডাকা হয়, আর তোমরা তা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত লিখতে বিতৃষ্ণ হয়ো না, চাই তা ক্ষুদ্র হোক অথবা বৃহৎ, এই লিখন সমধিক সুবিচার প্রতিষ্ঠকারী আল্লাহর নিকট এবং সাক্ষ্যের জন্য সমধিক সঠিকতা সংরক্ষণকারী, আর তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার জন্য বেশি সুবিধাজনক, কিন্তু কোনো সওদা হাতে হাতে হলে, যা তোমরা পরস্পর [নগদ] আদান-প্রদান করে থাক, তবে তা লিপিবদ্ধ না করায় তোমাদের কোনো দোষ নেই, আর ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তোমরা সাক্ষী করে নাও, আর কোনো লিখককে যেন কষ্ট দেওয়া না হয় এবং কোনো সাক্ষীকেও না, আর যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তাতে তোমাদের গুনাহ হবে, আর আল্লাহকে ভয় কর, এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاۤءُ আর সাক্ষীরাও যেন অস্বীকার না করে اِذَا مَا دُعُوْا যখন তাদেরকে ডাকা হয় وَلَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ আর তোমরা তা লিখতে বিতৃষ্ণ হয়ো না। صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا চাই তা ক্ষুদ্র হোক অথবা বৃহৎ اِلٰۤى اَجَلِهٖ নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ এই লিখন সমধিক সুবিচার প্রতিষ্ঠকারী عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ এবং সাক্ষ্যের জন্য সমধিক সঠিকতা সংরক্ষণকারী وَاَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا আর তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার জন্য বেশি সুবিধাজনক اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً কিন্তু কোনো সওদা হাতে হাতে হলে تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ যা তোমরা পরস্পর আদান-প্রদান করে থাক فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا তবে তা লিপিবদ্ধ না করায় তোমাদের কোনো দোষ নেই وَاَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْ আর ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তোমরা সাক্ষী করে নাও وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ আর কোনো লিখককে যেন কষ্ট দেওয়া না হয় এবং কোনো সাক্ষীকেও না। وَاِنْ تَفْعَلُوْا আর যদি তোমরা এরূপ কর فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ তবে তাতে তোমাদের গুনাহ হবে وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলিল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি : আলোচ্য আয়াতসমূহে লেন-দেন সম্পর্কিত আইনের জরুরি মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। যাকে চুক্তিনামাও বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লিখিত হয়েছে। আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দ শ' বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলত। লেখালেখি এবং দলিল-দস্তাবেজের প্রথা প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কুরআন পাক এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে- اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ অর্থাৎ, "তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার-কর্জের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও।"

এতে প্রথম নীতি এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ধার-কর্জের লেন-দেনে দলিল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত- যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোনো পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।

দ্বিতীয়তঃ ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেন-দেন জায়েজ নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন মেয়াদও এমনভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনোরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কেননা আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধানকাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। যেহেতু সে যুগে লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না, তাই সম্ভাবনা ছিল যে, লেখক কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে। ফলে কারো ক্ষতি এবং কারো লাভ হয়ে যাবে। এ সম্ভাবনার কারণেই অতঃপর বলা হয়েছে وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ অর্থাৎ, এটা জরুরি যে, তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে।

এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, লেখক কোনো একপক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে– যাতে কারো মনে সন্দেহ বা খট্‌কা না থাকে।

অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।

এরপর দলিল কোন পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ অর্থাৎ, যার দায়িত্বে দেনা, সে লেখাবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকি রাখল। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে সে দলিলের বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকারপত্র। লেখানোর মধ্যেও কমবেশির সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাই বলা হয়েছে : وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا অর্থাৎ, সে তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করবে এবং দেনা বিন্দুমাত্রও কম লেখাবে না। লেন-দেনের ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনো নির্বোধ অথবা অক্ষম, বৃদ্ধ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, মূক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলিলের বিষয়বস্তু বলে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই অতঃপর বলা হয়েছে : এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার কোনো অভিভাবক লেখাবে। পাগল ও নাবালেগের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মূক এবং অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ করতে পারে। যদি তারা কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এখানে কুরআন পাকের ওলী শব্দটি উভয় অর্থই বুঝায়।

সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরি মূলনীতি : এ পর্যন্ত লেন-দেনে দলিল লেখা ও লেখানো জরুরি মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, দলিলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না; বরং এতে সাক্ষ্যও রাখবে– যাতে কোনো সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন যে, লেখা শরিয়তসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোনো ফয়সালা করা হয় না।

সাক্ষীর সংখ্যা : এপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরি নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণতঃ ১. সাক্ষী দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা হওয়া জরুরি। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলা সাধারণ লেন-দেনের সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট নয়

সাক্ষীর শর্তাবলি : ২. সাক্ষী মুসলমান হতে হবে। مِنْ رِّجَالِكُمْ শব্দে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। ৩. সাক্ষীকে নির্ভরযোগ্য 'আদিল' [বিশ্বস্ত] হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ও ফাজের [অর্থাৎ পাপাচারী] হলে চলবে না। مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে।

শরিয়ত সম্মত ওজর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা গুনাহ : নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন কোনো ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্য ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মিটানোর একমাত্র উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরিভাবে জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে।

এরপর আবার লেন-দেনের দলিল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে– লেন-দেন ছোট কিংবা বড় হোক-সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার। এ ব্যাপারে বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে চমৎকাররূপে সহায়তা করে। যদি নগদ লেন-দেন হয় তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা উভয়পক্ষের মধ্যে কোনো সময় মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণতঃ বিক্রেতা মূল্যপ্রাপ্তি অস্বীকার করতে পাবে কিংবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্তু বুঝে পায়নি। এ মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে।

সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করার মূলনীতি : আয়াতের শুরুতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে এবং সাক্ষী হতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়তো মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারত। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে : وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ অর্থাৎ কোনো লেখক বা সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। অর্থাৎ নিজের উপকারের জন্য যেন তাদের বিব্রত না করা হয়। এরপর বলা হয়েছে– وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গুনাহ হবে।

এতে বুঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম। এ কারণেই ফকীহগণ বলেন– যদি লেখক লেখার পারিশ্রমিক দাবি করে কিংবা সাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়; তবে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। তা না দেওয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করার শামিল এবং অবৈধ। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ সাক্ষ্য দেওয়া থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য না হয়। এ দ্বিবিধ সর্তকতার ফলেই প্রত্যেক মামলায় সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ সাক্ষী পেত এবং নিষ্পত্তি দ্রুত, সহজ ও ন্যায়ানুগ হতো। বর্তমান বিশ্ব কুরআনি নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। ফলে সমগ্র বিচার ব্যবস্থা ভুণ্ডুল হয়ে গেছে। ঘটনার আসল ও সত্য সাক্ষী পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকেই সাক্ষ্য দান থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এই যে, যার নাম সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়, পুলিশী ফৌজদারী মকদ্দমা হলে রোজই সময়ে-অসময়ে থানা পুলিশ তাদের ডেকে পাঠায়। মাঝে মাঝে কয়েক ঘণ্টা বসিয়ে রাখে। দেওয়ানী আদালতসমূহেও সাক্ষীর সাথে অপরাধীর মতো ব্যবহার করা হয়। এরপর রোজ রোজ মকদ্দমার হাজিরা পরিবর্তিত হয়। তারিখের পর তারিখ পড়ে। বেচারা সাক্ষী নিজ কাজ-কারবার, মজুরি কিংবা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। অন্যথা হলে পরোয়ানা জারি করে গ্রেফতার করা হয়। তাই কোনো ভদ্র ও ব্যস্ত মানুষ কোনো মামলার সাক্ষী হওয়াকে আজাব বলে মনে করে এবং যথাসাধ্য এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। তবে শুধু পেশাদার সাক্ষীই এসব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যাদের কাছে সত্য-মিথ্যার কোনো পার্থক্য নেই। কুরআন পাক এ সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনাদি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করে এসব অনিষ্টের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে–

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। এ আয়াতে অনেক বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো ফিকহবিদ এ আয়াত থেকে বিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। **প্রথমতঃ** বাকির ব্যাপারে যদি কেউ বিশ্বস্ততার জন্য কোনো বস্তু বন্ধক নিতে চায়, তাও করতে পারে। কিন্তু مَقْبُوضَةٌ শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বন্ধকী বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য জায়েজ নয়। সে শুধু ঋণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত একে নিজের অধিকারে রাখবে। এর যাবতীয় মুনাফা আসল মালিকের প্রাপ্য।

দ্বিতীয়তঃ যে ব্যেক্তি কোনো বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখে, সে সাক্ষ্য গোপন করতে পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর গুনাহগার হবে। 'অন্তর গুনাহগার' বলার কারণ এই যে, কেউ যেন একে শুধু মুখের গুনাহ মনে না করে। কেননা অন্তর থেকেই প্রথমে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। তাই অন্তরের গুনাহ প্রথম।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَدَايَنْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّدَايُنُ মূলবর্ণ (د ـ ى ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা পরস্পরের ঋণের কারবার কর।

لَا يَأْبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْإِبَاءُ মূলবর্ণ (ا ـ ب ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– সে অস্বীকার করে না।

لِيُمْلِلِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِمْلَاءُ মূলবর্ণ (م ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যেন সে লিখিয়ে নেয়।

لِيَتَّقِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْإِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– যেন সে ভয় করে।

تَرْضَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلرِّضَاءُ মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা পছন্দ কর।

دُعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনসে ناقص واوى অর্থ– তাদেরকে ডাকা হলো।

اَقْوَمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقِيَامُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সবচেয়ে বেশি সোজা, অধিক দৃঢ়তর।

اَدْنٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাবে نَصَرَ মাসদার اَلدُّنُوُّ মূলবর্ণ– (د ـ ن ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– বেশি নিকটে, অধিক নিকটতর।

لَا تَرْتَابُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِيَابُ মূলবর্ণ (ر ـ ى ـ ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা সন্দেহ করো না।

تُدِيْرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدَارَةُ মূলবর্ণ (د ـ و ـ ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা ঘুরাও।

تَبَايَعْتُمْ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّبَايُعُ মূলবর্ণ (ب ـ ى ـ ع) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা পরস্পরে ক্রয়-বিক্রয় কর।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ : এখানে واو টি হরফে আতফ اِنْ হরফে শর্ত تَفْعَلُوْا ফে'ল, এতে اَنْتُمْ যমীরটি তার ফা'য়েল, ফে'ল, ফা'য়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়াহ হয়ে শর্ত। فَاء টি জাযাইয়্যাহ اِنَّ হরফে মোশাব্বাহ বিল ফে'ল, ه টি اِنَّ-এর ইসম, فُسُوْقٌ শিবহে ফে'ল بِكُمْ জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক। শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে ইন্না-এর খবর, ইন্না তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হয়ে জাযা, শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়াহ হলো।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (২৮৩) আর যদি তোমরা কোথাও প্রবাসে থাক এবং কোনো লিখক না পাও, তবে বন্ধকী দ্রব্যসমূহ, যা অধিকারে দেওয়া হয়, আর যদি একে অপরকে বিশ্বাস করে, তবে বিশ্বাসকৃত ব্যক্তির উচিত যেন অপরের হক পরিশোধ করে দেয়, আর যেন ভয় করে আল্লাহকে, যিনি তার প্রতিপালক, আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, আর যে ব্যক্তি তা গোপন করবে তার অন্তর পাপী হবে, আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মকে খুব ভালোভাবে জানেন।	وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۳﴾
(২৮৪) আল্লাহ তা'আলারই স্বত্বাধীন রয়েছে সবকিছু যা আসমানসমূহে আছে এবং জমিনে আছে, আর যা তোমাদের অন্তরে আছে, তা চাই তোমরা প্রকাশ কর, অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট হতে তার হিসেব নিবেন, অনন্তর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণক্ষমতাবান।	لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۴﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(২৮৩) وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ আর যদি তোমরা কোথাও প্রবাসে থাক وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا এবং কোনো লিখক না পাও فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ তবে বন্ধকী দ্রব্যসমূহ, যা অধিকারে দেওয়া হয় فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا আর যদি একে অপরকে বিশ্বাস করে فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ তবে বিশ্বাসকৃত ব্যক্তির উচিত যেন অপরের হক পরিশোধ করে দেয় وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ আর যেন ভয় করে আল্লাহকে, যিনি তার প্রতিপালক وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না وَمَنْ يَّكْتُمْهَا আর যে ব্যক্তি তা গোপন করবে فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ তার অন্তর পাপী হবে وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মকে খুব ভালোভাবে জানেন।

(২৮৪) لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলারই স্বত্বাধীন রয়েছে مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ সবকিছু যা আসমানসমূহে আছে এবং জমিনে আছে وَاِنْ تُبْدُوْا আর তা চাই তোমরা প্রকাশ কর مَا فِىۤ اَنْفُسِكُمْ যা তোমাদের অন্তরে আছে اَوْ تُخْفُوْهُ অথবা গোপন রাখ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট হতে তার হিসাব নিবেন فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ অনন্তর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণক্ষমতাবান।

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

অনুবাদ : (২৮৫) বিশ্বাস রাখেন রাসূল সেই বিষয়ের প্রতি যা তাঁর প্রতি নাজিল করা হয়েছে তাঁর প্রভুর পক্ষ হতে আর মুমিনগণও, সকলেই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি এই মর্মে যে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না। আর তারা সকলেই বলল, আমরা শ্রবণ করলাম এবং সানন্দে আনুগত্য স্বীকার করলাম, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

(২৮৬) আল্লাহ তা'আলা কাউকেও নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না কিন্তু তাই যা তার সামর্থ্যে আছে, সে ছওয়াবও তারই পাবে যা সে স্বেচ্ছায় করে এবং সে শাস্তিও তারই ভোগ করবে যা সে স্বেচ্ছায় করে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, যদি আমরা ভুলে যাই, কিংবা ভুল করে বসি, হে আমাদের রব! আমাদের প্রতি কোনো কঠোর ব্যবস্থা পাঠাবেন না, যেরূপ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর পাঠিয়েছিলেন, হে আমাদের রব! আমাদের প্রতি এমন কোনো গুরুভার চাপিয়ে দিবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, আর ক্ষমা করে দিন আমাদেরকে এবং মার্জনা করে দিন, আর আমাদের প্রতি কৃপা করুন। আপনি আমাদের কর্মসম্পাদক, সুতরাং আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর প্রাবল্য দান করুন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৮৫) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ বিশ্বাস রাখেন রাসূল بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ সেই বিষয়ের প্রতি যা তাঁর প্রতি নাজিল করা হয়েছে مِنْ رَّبِّهٖ তাঁর প্রভুর পক্ষ হতে وَالْمُؤْمِنُوْنَ আর মুমিনগণও كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ সকলেই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি وَمَلٰٓئِكَتِهٖ এবং তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি وَكُتُبِهٖ ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি وَرُسُلِهٖ এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ এই মর্মে যে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না وَقَالُوْا আর তারা সকলেই বলল سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا আমরা শ্রবণ করলাম এবং সানন্দে আনুগত্য স্বীকার করলাম غُفْرَانَكَ رَبَّنَا আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, হে আমাদের প্রতিপালক! وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ আর আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।

(২৮৬) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا আল্লাহ তা'আলা কাউকেও নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না اِلَّا وُسْعَهَا কিন্তু তাই যা তার সামর্থ্যে আছে لَهَا مَا كَسَبَتْ সে ছওয়াবও তারই পাবে যা সে স্বেচ্ছায় করে وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ এবং সে শাস্তিও তারই ভোগ করবে যা সে স্বেচ্ছায় করে رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ হে আমাদের রব! আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না اِنْ نَّسِيْنَآ যদি আমরা ভুলে যাই اَوْ اَخْطَاْنَا কিংবা ভুল করে বসি رَبَّنَا হে আমাদের রব! وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا আমাদের প্রতি কোনো কঠোর ব্যবস্থা পাঠাবেন না كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا যেরূপ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর পাঠিয়েছিলেন رَبَّنَا হে আমাদের রব! وَلَا تُحَمِّلْنَا আমাদের প্রতি এমন কোনো গুরুভার চাপিয়ে দিবেন না مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই وَاعْفُ عَنَّا আর ক্ষমা করে দিন আমাদেরকে وَاغْفِرْ لَنَا এবং মার্জনা করে দিন وَارْحَمْنَا আর আমাদের প্রতি কৃপা করুন اَنْتَ مَوْلٰىنَا আপনি আমাদের কর্মসম্পাদক فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ সুতরাং আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর প্রাবল্য দান করুন

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৮৫) قوله اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.) ও হযরত মুয়ায (রা.) যখন পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা বুঝতে পারলেন যে, বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল ও মনের ওয়াসওয়াসার হিসাবও আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেন। তখন তারা সে ভয়ে রাসূল ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্তর আমাদের আয়ত্বে নয়, শয়তানি ও কুচিন্তা আমাদের মনে উদয় হয়। এর জন্য শাস্তি হলে আমাদের উপায় কি? হুজুর ﷺ এতদশ্রবণে বলেন– আল্লাহর নির্দেশ যা কিছু এসেছে তা তোমরা বিনা দ্বিধায় মেনে নাও, ইহুদিদের ন্যায় বিতর্ক করো না। কেননা আল্লাহর নির্দেশ সর্বাবস্থায় মেনে নেওয়া ওয়াজিব। শেষ পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ তারা তা মেনে নেয়। তখন উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(২৮৬) قوله لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا الخ আয়াতের শানে নুযূল : সাহাবায়ে কেরামদের মনে আন্তরিক দুশ্চিন্তা ও কু-প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা উদ্রেক হয় যে, কিভাবে এ পাপ থেকে আত্মরক্ষা করব? তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর সাহাবায়ে কেরামদেরকে সান্ত্বনা দান করেন এবং সাথে সাথে প্রার্থনা করার কতিপয় পদ্ধতি শিক্ষা দেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মহানবী ﷺ আয়াতটিকে বারবার তেলাওয়াত করতে থাকেন। তাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পরম সাফল্য ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আসতে থাকে। পরবর্তীতে ইসলামের মহাসফল্য অর্জিত হয়। এটা রাসূলের সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। আজ বিশ্বের মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের শরণাপন্ন হয়ে ইহকাল ও পরকালের মহাসাফল্য অর্জন করতে পারে।

আলোচ্য আয়াত উপরিউক্ত বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। তোমরা যদি ঘটনা জেনেও তা গোপন কর, তবে সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ এর হিসাব গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইকরিমা (রা.), শা'বী (র.) ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে। –[কুরতুবী]

শাব্দিক ব্যাপকতার দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক এবং যাবতীয় বিশ্বাস, ইবাদত ও লেন-দেন এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি তাই। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন। যে কাজ করা হয়েছে এবং যে কাজের শুধু মনে মনে সংকল্প করা হয়েছে, সে সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন। বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ভাষ্যে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– কিয়ামতের দিন মুমিনকে আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী করা হবে এবং আল্লাহ তাকে এক এক করে সব গুনাহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেন, এ গুনাহটি কি তোমার জানা আছে? মুমিন স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়াতেও তোমার গুনাহ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফিকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে।

বর্ণিত শেষ আয়াতদ্বয়ের বিশেষ ফজিলত : আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরা বাকারার শেষ আয়াত। সহীহ হাদীসসমূহে এ আয়াত দু'টির বিশেষ ফজিলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর] ইশার নামাজের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাজের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। মুস্তাদরাকে হাকেম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি আয়াত দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে এ দু'টি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু'টি আয়াত শিক্ষা কর এবং নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও,

এ কারণেই হযরত ফারূকে আজম ও হযরত আলী (রা.) বলেন, আমাদের মতে যার সামান্যও বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে এ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করা ব্যতীত নিদ্রা যাবে না। এ আয়াতদ্বয়ের অর্থগত বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই যে, সূরা বাকারার অধিকাংশ বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে এ আয়াত দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে। যথা বিশ্বাস, ইবাদত, লেন-দেন, চরিত্র-সামাজিকতা ইত্যাদি। সর্বশেষ এ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে অনুগত মুমিনদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধান শিরোধার্য করে নিয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা এ আয়াতদ্বয়ের পূর্ববর্তী আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের মনে দেখা দিয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল এই– যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো–

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ অর্থাৎ 'তোমাদের অন্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নিবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব নিবেন। অনিচ্ছাকৃত কু-চিন্তা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ ব্যাপক ছিল। এতে বুঝা যেতো যে, অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেওয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রাসূল ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী ﷺ আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না; বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে আপাততঃ আদেশ দিলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন– মুমিনের কাজ হলো তা মেনে নেওয়া। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ শুনে তোমাদের এ কথা বলা উচিত : سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু! যদি নির্দেশ পালনে আমাদের কোনো ত্রুটি বা ভুল হয়ে থাকে, তবে তা ক্ষমা করুন। কেননা আমাদের সবাইকে আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মতো কাজ করলেন; যদিও তাঁদের মনে এ খটকা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কু-চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি আয়াত নাজিল করেন। প্রথম আয়াতে মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যে আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। প্রথম আয়াত হচ্ছে :

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থাৎ, রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ বিষয়ের প্রতি, যা তাঁর কাছে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মহানবী ﷺ-এর প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে 'রাসূল' শব্দ ব্যবহার করে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরপর বলেছেন, রাসূল ﷺ-এর যেমন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রতি বিশ্বাস রয়েছে, তেমনি সাধারণ মুমিনদেরও রয়েছে। এতে প্রথমে পূর্ণ বাক্যে রাসূল ﷺ-এর বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে, এরপর মুমিনদের বিশ্বাস পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বর্ণনা–ভঙ্গিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও আসল বিশ্বাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সকল মুসলমান অভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসের স্তরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশ্বাস প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শ্রবণের ভিত্তিতে এবং অন্য মুসলমানগণের বিশ্বাস 'অদৃশ্য বিশ্বাস' এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখার ভিত্তিতে।

এরপর মহানবী ﷺ ও অন্য মুমিনদের অভিন্ন ও সংক্ষিপ্ত ঈমানের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি, পূর্ণতার যাবতীয় গুণে তাঁর গুণান্বিত হওয়ার প্রতি, ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি এবং আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থাবলি ও সমস্ত পয়গম্বরগণের সকলেরই সত্য হওয়ার প্রতি।

এরপর বলা হয়েছে যে, এ উম্মতের মুমিনগণ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মতো আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বরগণের মধ্যে প্রভেদ করবে না যে, কাউকে পয়গম্বর মানবে এবং কাউকে মানবে না। যেমন, ইহুদিরা হযরত মূসা (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে পয়গম্বর মানে, কিন্তু শেষনবী ﷺ-কে পয়গম্বর মানে না। এ উম্মতের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বরকে অস্বীকার করে না। এরপর সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুখে বলেছিলেন– سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ঐ সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াত থেকে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, অন্তরে গোপন ধারণার জন্য দায়ী করা হলে আজাব থেকে কিরূপে বাঁচা যাবে। বলা হয়েছে– لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বহির্ভূত কোনো কাজের নির্দেশ দেন না। কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কল্পনা ও কুচিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, এরপর সেগুলো কার্যে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ তা'আলার কাছে মাফ। যেসব কাজ ইচ্ছা করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসেব হবে।

এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মানুষের যেসব কাজকর্ম হাত, পা, চক্ষু, মুখ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোকে 'বাহ্যিক কাজকর্ম' বলা হয়। এগুলো দু'প্রকার : এক ইচ্ছাধীন– যা ইচ্ছা করে করা হয়; যেমন ইচ্ছা করে কথা বলা, ইচ্ছা করে কাউকে প্রহার করা ইত্যাদি। দুই. অনিচ্ছাধীন, যা ইচ্ছা ছাড়াই ঘটে যায়। যেমন, এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে ফেলা অথবা কাঁপুনি রোগে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত নড়ে যাওয়ার কারণে কারো ক্ষতি হয়ে যাওয়া। এখানে লক্ষণীয় যে, বিশেষভাবে ইচ্ছাধীন কাজ-কর্মেরই হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি হবে– অনিচ্ছাকৃত কাজের আদেশ মানুষকে দেওয়া হয়নি এবং সেজন্য ছওয়াব বা আজাব হবে না।

এমনিভাবে যেসব কাজকর্ম মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোও দু'প্রকার। এক. ইচ্ছাধীন, যেমন, ইচ্ছা করে অন্তরের কুফর ও শিরকের বিশ্বাস পোষণ করা কিংবা জেনে বুঝে ইচ্ছা সহকারে নিজেকে বড় মনে করা। অর্থাৎ অহংকার করা কিংবা মদ্য পানে কৃতসংকল্প হওয়া প্রভৃতি। দুই. অনিচ্ছাধীন। যেমন– ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মনে কু-ধারণা আসা। এ ক্ষেত্রেও হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি শুধু ইচ্ছাধীন কাজের জন্যই হবে। অনিচ্ছাধীন কাজের জন্য নয়।

কুরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে কেরামের মানসিক উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। আয়াতের শেষে এই বিষয়বস্তুটি আরো ফুটিয়ে তোলার জন্য বলা হয়েছে– لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থাৎ, মানুষ ছওয়াবও সে কাজের জন্যই পাবে, যা স্বেচ্ছায় করে এবং শাস্তিও সে কাজের জন্যই যা স্বেচ্ছায় করে।

এখানে সন্দেহ দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের ছওয়াব অথবা আজাব হয়। যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজ করে– যা দেখে অন্যরাও এ সৎকাজে উদ্বুদ্ধ হয়, যতদিন পর্যন্ত অন্যেরা এ সৎকাজ করতে থাকবে, ততদিন এর ছওয়াব প্রথম ব্যক্তিও পেতে থাকবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো পাপ কাজ প্রবর্তন করে, ভবিষ্যতে যত লোক এ পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদের সমান পাপ প্রথম প্রচলনকারী ব্যক্তিরাও হতে থাকবে। হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণিত আছে যে, কেউ যদি নিজের ছওয়াব অন্যকে দিতে চায়, তবে অন্য ব্যক্তি এ ছওয়াব পায়। অতএব, বুঝা গেল যে, ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের ছওয়াব কিংবা আজাব হয়।

এ সন্দেহ নিরসনকল্পে বলা যায় যে, প্রথমাবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে ঐ কাজের ছওয়াব কিংবা আজাব হবে, যা যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে। অতএব, পরোক্ষভাবে এমন কোনো কাজের ছওয়াব কিংবা আজাব হওয়া এর পরিপন্থি নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি। উপরিউক্ত দৃষ্টান্তসমূহে একথা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যক্ষ্যভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ছওয়াব কিংবা আজাব হয়নি; বরং অন্যের মধ্যস্থতায় হয়েছে। এছাড়া মধ্যস্থতার মধ্যে তার কার্য ও ইচ্ছার প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি কারো উদ্ভাবিত ভালো কিংবা মন্দ পথ অবলম্বন করে, তার মধ্যে প্রথম ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কাজের প্রভাব থাকে, যদিও প্রথম ব্যক্তি এ প্রভাবের ইচ্ছা করেনি। এমনিভাবে কেউ কোনো ব্যক্তিকে ছওয়াব তখনই পৌঁছায়, যখন সে তার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করে থাকে। এ হিসেবে অপরের কাজের ছওয়াব এবং আজাবও প্রকৃতপক্ষে নিজের কাজেরই ছওয়াব ও আজাব।

উপসংহারে কুরআন পাক মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছে। এতে ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোনো কাজ হয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলা হয়– رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দায়ী করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি।' এরপর বলা হয়েছে–

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

অর্থাৎ, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারি ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের [বনী ইসরাঈলদের] উপর অর্পণ করেছিলে এবং আমাদের উপর এমন ফরজ কাজ আরোপ করো না, যা সম্পাদনের শক্তি আমাদের নেই।'

এর অর্থ সেসব কঠিন কাজকর্ম, যা বনী ইসরাঈলের উপর আরোপিত ছিল। যেমন, নাপাক বস্ত্র ধৌত করলে পাক হতো না; বরং নাপাক অংশ কেটে ফেলতে হতো কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে হতো এবং নিজেকে হত্যা করা ব্যতীত তাদের তওবা কবুল হতো না। কিংবা অর্থ এই যে, দুনিয়াতে আমাদের উপর আজাব নাজিল করো না; যেমন, বনী ইসরাঈলের কু-কর্মের জন্য নাজিল করেছ। এসব দোয়া যে আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে প্রকাশও করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَمْ تَجِدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى تاكيد بلم در فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِجْدَانُ মূলবর্ণ (و . ج . د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা পাবে না।

رِهٰنٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে رهن অর্থ– বন্ধককৃত বস্তু।

مَقْبُوْضَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَبْضُ মূলবর্ণ (ق . ب . ض) জিনস صحيح অর্থ– দখলে/ করায়ত্বে প্রদত্ত বস্তু।

لِيُؤَدِّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّأْدِيَةُ মূলবর্ণ (أ . د . ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– সে যেন আদায় করে। তার আদায় করতে হবে।

اؤْتُمِنَ سীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِئْتِمَانُ মূলবর্ণ (أ . م . ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তার ভরসা করা হয়েছে।

تُبْدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْدَاءُ মূলবর্ণ (ب . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা প্রকাশ কর।

تُخْفُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْفَاءُ মূলবর্ণ (خ . ف . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা গোপন রাখ।

نَسِيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن . س . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমরা বিস্মৃত হই।

اَخْطَأْنَا সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْطَاءُ মূলবর্ণ (خ . ط . أ) জিনস مهموز لام অর্থ– আমরা ভুল করেছি।

اُعْفُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَفْوُ মূলবর্ণ (ع . ف . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি ক্ষমা কর।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ : এখানে واو টি হরফে আতফ. اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা. بَاء টি حرف جار আর مَا টি ইসমে মাওসূল تَعْمَلُوْنَ ফে'ল এতে اَنْتُمْ যমীর ফা'য়েল, এবার ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়াহ হয়ে সিলাহ, মাওসূল ও সিলাহ মিলে মাজরূর, এবার জার মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম عَلِيْمٌ শিবহে ফে'ল, শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হলো।

قوله اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ : এখানে اٰمَنَ ফে'ল الرَّسُوْلُ মা'তুফ আলাইহি واو টি حرف عطف আর المؤمنون হলো معطوف এবার معطوف عليه ও معطوف মিলে فاعل আর بِ হরফে জার مَا-টি ইসমে মাওসূল اُنْزِلَ শব্দটি فعل مجهول তার هو যমীর নায়েবে ফায়েল। اِلَيْهِ জার মাজরূর মিলে متعلق اول হয়েছে اُنْزِلَ এর সঙ্গে। مِنْ হরফে জার। رَبِّهٖ মোযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে مجرور, জার-মাজরূর মিলে متعلق ثانى হয়েছে اُنْزِلَ এর সাথে। اُنْزِلَ তার নায়েবে ফায়েল ও দুই متعلق মিলে متعلق ثالث হয়ে صله এরপর صله ও موصول মিলে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে جملة فعليه হয়েছে। اٰمَنَ এর সঙ্গে اٰمَنَ তার ফায়েল, মাফঊল ও متعلق মিলে جملة فعليه ।

قوله وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : এখানে واو টি حرف عطف আর اللّٰهُ শব্দটি مبتدا আর عَلٰى হলো حرف جار এবং كُلِّ شَيْءٍ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিকে মুকাদ্দাম قَدِيْرٌ শিবহে ফে'ল, শিবহে ফে'ল ও মুতা'আল্লিক মিলে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হলো।

قوله لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا : এখানে لَا يُكَلِّفُ ফে'ল اللّٰهُ ফা'য়েল نَفْسًا মুসতাছনা মিনহু اِلَّا হরফে ইসতিছনা وُسْعَهَا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুসতাছনা, মুসতাছনা মিনহু ও মুসতাছনা মিলে মাফঊল এখন فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হলো।

قوله فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ : এখানে فَاء টি তা'কিবিয়াহ اُنْصُرْ ফে'ল এতে اَنْتَ যমীর ফা'য়েল نَا টি মাফঊল عَلٰى হরফে জার اَلْقَوْمِ اَلْكٰفِرِيْنَ মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক, অবশেষে ফে'ল, ফা'য়েল, মাফঊল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়ায়ে ইনশাইয়্যাহ হলো।

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ
সূরা আলে ইমরান

মদিনায় অবতীর্ণ : আয়াত-২০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১) আলিফ লাম মীম	الٓمّٓ (١)
(২) আল্লাহ এমন যে, তিনি ব্যতীত মা'বুদরূপে গ্রহণ করার যোগ্য আর কেউই নেই, তিনি চিরঞ্জীব, যাবতীয় বস্তুর সংরক্ষণকারী।	اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (٢)
(৩) আল্লাহ আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছেন বাস্তব সত্যের সাথে এই প্রকারে যে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে আর প্রেরণ করছিলেন, তাওরাত ও ইঞ্জীল।	نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ (٣)
(৪) তার পূর্বে জনগণের হেদায়েতের জন্য আর আল্লাহ প্রেরণ করেছেন মু'জিযাসমূহ, নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করেছে আল্লাহর আয়াতসমূহকে, তাদের জন্য রয়েছে, কঠোর শাস্তি, আর আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী।	مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٤)
(৫) নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কোনো বিষয়ই গোপন নেই, না জমিনে আর না আসমানে।	اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ (٥)

শাব্দিক অনুবাদ

(১) الٓمّٓ আলিফ লাম মীম

(২) اللّٰهُ আল্লাহ এমন যে, لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ব্যতীত মা'বুদরূপে গ্রহণ করার যোগ্য আর কেউই নেই الْحَيُّ তিনি চিরঞ্জীব الْقَيُّوْمُ যাবতীয় বস্তুর সংরক্ষণকারী।

(৩) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ আল্লাহ আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করেছেন بِالْحَقِّ বাস্তব সত্যের সাথে مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ এই প্রকারে যে তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ আর প্রেরণ করেছিলেন, তাওরাত ও ইঞ্জীল।

(৪) مِنْ قَبْلُ তার পূর্বে هُدًى لِّلنَّاسِ জনগণের হেদায়েতের জন্য وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ আর আল্লাহ প্রেরণ করেছেন মু'জিযাসমূহ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করেছে بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াতসমূহকে لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ আর আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী ذُو انْتِقَامٍ প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

(৫) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কোনো বিষয়ই গোপন নেই فِي الْاَرْضِ না জমিনে وَلَا فِي السَّمَآءِ আর না আসমানে।

هُوَ الَّذِىۡ يُصَوِّرُكُمۡ فِى الۡاَرۡحَامِ كَيۡفَ يَشَآءُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ (٦)

(৬) তিনি এমন সত্তা যে, জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করে থাকেন, যেরূপ ইচ্ছা করেন, কেউই মাবূদ হওয়ার যোগ্য নয় তিনি ব্যতীত, তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞ।

هُوَ الَّذِىۡۤ اَنۡزَلَ عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ مِنۡهُ اٰيٰتٌ مُّحۡكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيۡنَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَيۡغٌ فَيَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ وَابۡتِغَآءَ تَاۡوِيۡلِهٖ ۚ وَمَا يَعۡلَمُ تَاۡوِيۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَالرّٰسِخُوۡنَ فِى الۡعِلۡمِ يَقُوۡلُوۡنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ (٧)

(৭) তিনি এমন সত্তা যিনি তোমাদের প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন, যার একাংশে ঐ আয়াতসমূহ রয়েছে, যা অস্পষ্ট মর্ম হতে সংরক্ষিত, এই আয়াতগুলো কিতাবের মূলভিত্তি, আর অন্যান্য আয়াতগুলো এরূপ যে, যা অস্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট, সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা তার ঐ অংশের পিছনে পড়ে যা অস্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট, গোলযোগ অন্বেষণের উদ্দেশ্যে এবং তার [মনগড়া] ব্যাখ্যা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে, অথচ তার মর্ম আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ অবগত নয়। আর যারা [ধর্মীয়] জ্ঞানে নিপুণ তারা বলে- আমরা তাতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি, সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত, আর উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান।

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ رَحۡمَةً ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ (٨)

(৮) হে পরওয়ারদেগার! আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করবেন না, তার পর যে, আপনি আমাদের সুপথ প্রদর্শন করেছেন, আর আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয় আপনি মহান দাতা।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬) هُوَ الَّذِىۡ তিনি এমন সত্তা যে يُصَوِّرُكُمۡ فِى الۡاَرۡحَامِ জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করে থাকেন كَيۡفَ يَشَآءُ যেরূপ ইচ্ছা করেন لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ কেউই মাবূদ হওয়ার যোগ্য নয় তিনি ব্যতীত الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ তিনি পরাক্রমশালী, তত্ত্বজ্ঞ।

(৭) هُوَ الَّذِىۡۤ তিনি এমন সত্তা যিনি اَنۡزَلَ عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ তোমাদের প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন مِنۡهُ اٰيٰتٌ مُّحۡكَمٰتٌ যার একাংশে ঐ আয়াতসমূহ রয়েছে, যা অস্পষ্ট মর্ম হতে সংরক্ষিত هُنَّ اُمُّ الۡكِتٰبِ এই আয়াতগুলো কিতাবের মূলভিত্তি وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ আর অন্যান্য আয়াতগুলো এরূপ যে, যা অস্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট فَاَمَّا الَّذِيۡنَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ زَيۡغٌ সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে فَيَتَّبِعُوۡنَ مَا تَشَابَهَ مِنۡهُ তারা তার ঐ অংশের পিছনে পড়ে যা অস্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট ابۡتِغَآءَ الۡفِتۡنَةِ গোলযোগ অন্বেষণের উদ্দেশ্যে وَابۡتِغَآءَ تَاۡوِيۡلِهٖ এবং তার ব্যাখ্যা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে وَمَا يَعۡلَمُ تَاۡوِيۡلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ অথচ তার মর্ম আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ অবগত নয় وَالرّٰسِخُوۡنَ فِى الۡعِلۡمِ আর যারা জ্ঞানে নিপুণ يَقُوۡلُوۡنَ তারা বলে- اٰمَنَّا بِهٖ আমরা তাতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি كُلٌّ مِّنۡ عِنۡدِ رَبِّنَا সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ আর উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান।

(৮) رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا হে পরওয়ারদেগার! আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করবেন না بَعۡدَ اِذۡ هَدَيۡتَنَا তার পর যে, আপনি আমাদের সুপথ প্রদর্শন করেছেন وَهَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ رَحۡمَةً আর আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন اِنَّكَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ নিশ্চয় আপনি মহান দাতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَجْهُ تَسْمِيَةٍ বা নামকরণ : আরবি ভাষায় একটি কথা আছে যে, تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ তথা অংশ বিশেষের নামানুসারে পূর্ণ বস্তুটির নামকরণ করা হয়। অত্র সূরাতে اٰلَ عِمْرَانَ অংশটি উল্লেখ আছে যেমন ইরশাদ হয়েছে- إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ إِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ [আয়াত নং ৩৪] তাই অত্র সূরাকে اٰلَ عِمْرَانَ (আলে ইমরান) নামে নামকরণ করা হয়েছে।

তবে এই ইমরান কে? এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। কিছু সংখ্যকের মতে ইনি হলেন عِمْرَانُ بْنُ يَصْهُرَ (ইমরান ইবনে ইয়াসহার) যিনি হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আ.)-এর পিতা। তার নামানুসারে অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে। কেননা হযরত মূসা (আ.) ইমরান বংশের প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম নবী। আর হযরত ঈসা (আ.) শেষ ও গৌরবান্বিত পয়গম্বর।

কিছু সংখ্যক মুফাসসিরীনের মতে এই ইমরান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عِمْرَانُ بْنُ مَاثَانَ [ইমরান ইবনে মাছান]। যিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা মারইয়াম (আ.)-এর পিতা ছিলেন। তাঁর নামানুসারে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যেহেতু অত্র সূরায় প্রধানতঃ হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম, নবুয়তপ্রাপ্তি, তাঁর অলৌকিক কার্যাবলি ইহুদিদের সাথে বাদানুবাদ অবশেষে আসমানে উত্তোলন ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে।

মূল কথা اٰلَ عِمْرَانَ অংশটি অত্র সূরায় আছে এবং ইমরান বংশ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে বিধায় এই সূরাকে اٰلَ عِمْرَانَ [আলে ইমরান] নামে নামকরণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে উভয় (عِمْرَانُ) ইমরানের মাঝে আঠারো শত বৎসর ব্যবধান যা كَشَّافُ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল

আলে ইমরান পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় বৃহত্তম সূরা এতে ২০ রুকূ ও ২০০ আয়াত রয়েছে। এই সূরাটি চারটি ভাগে অবতীর্ণ হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

১. সূরার শুরু হতে চতুর্থ রুকূ পর্যন্ত কিংবা ৮০ আয়াত পর্যন্ত নাজরানের খ্রিস্টানদের জবাবে অবতীর্ণ হয়। تَدْرِيْبٌ নামক গ্রন্থে তাদের আগমন ৫ম হিজরির কথা বলা হয়েছে।

২. আর إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى الخ থেকে শুরু করে ৭ম রুকূ পর্যন্ত খুব সম্ভব ৯ম হিজরির দিকে ইহুদিদের نَحْنُ اَبْنَاءُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ الخ এই কথার জবাবে অবতীর্ণ হয়।

৩. আর তৃতীয় অংশ তথা সপ্তম রুকূ হতে ত্রয়োদশ রুকূ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে মুবাহালার সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এর সময় কাল ৬ষ্ঠ কিংবা ৭ম হিজরি হতে পারে।

৪. আর চতুর্থ অংশটি ত্রয়োদশ রুকূ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত ওহুদ যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ওহুদের ঘটনা সম্পর্কে নাজিল হয়।

সূরার বিষয়বস্তু : অত্র সূরার কথাগুলো বিশেষ করে দু'টি দলের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। প্রথম দল আহলে কিতাব তথা ইহুদি নাসারা। আর দ্বিতীয় দল হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসারী তথা মুসলমানগণ! এই সূরার শুরুতেই মহান আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর গুণাবলি এবং বৃহৎ চারটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর তাঁর অসীম ক্ষমতা ও মাতৃগর্ভে সন্তানের আকৃতি প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এরপর মুহকাম এবং মুতাশাবিহ, মুতাশাবিহকে অকপটে অস্বীকার করে নেওয়া সঠিক পথে স্থির থাকার প্রার্থনা, শেষ দিবসের উপস্থিতি, কাফেরদের পরিণাম, ফেরাউনীদের দৃষ্টান্ত, দুনিয়ার মোহ, মনোনীত দীন ইসলাম। সব কিছু আল্লাহর হাতে। ইমরানের ঘটনা জাকারিয়ার প্রার্থনা, মারইয়ামের প্রতিপালন, হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাব। তাঁর মু'জিযা, তাঁকে আকাশে উত্তোলন, হযরত ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত হযরত আদম (আ.), আহলে কিতাবদের ষড়যন্ত্র, সর্বপ্রথম ইবাদতের ঘর কা'বা শরীফ। সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, ইহুদিদের লাঞ্ছনা, বদর যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য, সুদ, মুত্তাকীদের আলামত, সুখে-দুঃখে দান খয়রাত, ক্রোধ-দমন, পাপের অনুশোচনা করে ক্ষমা চাওয়া।

এরপর ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা, ওহুদে বিপর্যয়, ওহুদে মুনাফিকদের কার্যকলাপ, পরামর্শ, দৃঢ় মনোবল, রাসূলের আগমন রহমত স্বরূপ, শহীদদের অনাবিল জীবন, উত্তম-অধমের মধ্যে পার্থক্য, ইহুদিদের দৃষ্টান্ত, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মুসলমানদের ধৈর্য ও আল্লাহভীরুতা, মহান আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শনাবলি সব সময় তার স্মরণ, তাঁর নিকট প্রার্থনা, বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া, পাপ মোচনের অঙ্গীকার।

কাফেরদের পরিণাম, মুমিনদের অনাবিল সুখ-শান্তির কথা, কিছু আহলে কিতাবের মহৎগুণ, এবং সব শেষে মুসলমানদের ধৈর্য, দৃঢ়তা ও আল্লাহভীরুতার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

(২) لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** একবার নজরানের খ্রিস্টানের একদল রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে এসে মনগড়া কিছু বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন। এক পর্যায়ে তারা বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! যদি হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র না হয়ে থাকেন তাহলে বলুন, হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা কে? হুজুর ﷺ বললেন, বেকুব! সন্তানকে পিতার অনুরূপ হতে হয়। অথচ হযরত ঈসা (আ.) পানাহার করেন, চলাফেরা করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এসব কিছু থেকে পবিত্র। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের শুরু থেকে নিয়ে আশিরও উর্ধ্বে আয়াত নাজিল করেন। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

শানে নুযূল-২ : আল্লামা বগবী (র.) কালবী এবং রবী ইবনে আনাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, এই আয়াতসমূহ নাজরানের প্রতিনিধি দলের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। এই প্রতিনিধি দলের লোক সংখ্যা ছিল ষাট। তারা উষ্ট্রের উপর আরোহণ করে এসেছিল। ষাটজনের এই দলের মধ্যে চৌদ্দজন ছিল উপনেতা। আর তিনজন ছিল নেতা। আইকেবের নামক এক ব্যক্তি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যার পরামর্শ ছাড়া দলের কোনো লোক কোনো কাজ করত না। আইকেবের আসল নাম ছিল আব্দুল মাসিহ। প্রিয়নবী ﷺ যখন আসরের নামাজ পড়ছিলেন তখন তারা মসজিদে প্রবেশ করে। তারা অত্যন্ত মূল্যবান এবং সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত ছিল। তাদের নামাজের সময় হলে প্রিয়নবী ﷺ-এর অনুমতি নিয়ে তারা পূর্ব দিকে মুখ করে নিজেদের নামাজ আদায় করে।

প্রিয়নবী ﷺ তাদেরকে ইসলাম কবুল করার আহবান জানালেন। তারা বলল, আমরা তো আপনার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। প্রিয়নবী ﷺ বললেন, তোমরা অসত্য কথা বলছ, তোমাদেরকে যে বিষয়টি ইসলাম থেকে বিরত রাখছে তা হলো হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র দাবি করে থাকা। তোমরা ক্রুসেডের পূজা কর এবং শুকরের গোশত খাওয়াকে হালাল বলে মনে কর। তখন তারা বলল, যদি আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা না হন তাহলে তার পিতা কে? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরা কি জান না যে, আমাদের পালনকর্তা সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ কর্তা, সকলের নেগাহবান এবং রিজিকদাতা। তারা বলল, হ্যাঁ একথাও সত্য। তখন প্রিয়নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন এই সব কাজের কোনোটি হযরত ঈসা (আ.)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে কি? খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল বলল, না। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরা কি জানো না যে, আল্লাহ পাকের নিকট আসমান জমিনের কোনো কিছুই গোপন নেই। তখন তারা বলল, জানব না কেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, তাহলে তোমরা বল হযরত ঈসা (আ.)-কে যে খাস ইলম আল্লাহ পাক দান করেছেন তা ছাড়া এই সব বিষয় তিনি কিছু কি জানতেন? তারা বলল, না। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, আমাদের প্রতিপালক তার ইচ্ছা মোতাবেক হযরত ঈসা (আ.)-কে মাতৃগর্ভে আকৃতি দান করেছেন। আমাদের প্রতিপালক পানাহার করেন না। প্রতিনিধিদল বলল, জি-হ্যাঁ, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরা একথা উপলব্ধি কর না যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে তার মা এভাবেই গর্ভে ধারণ করেছেন। যেভাবে মায়েরা গর্ভে ধারণ করে থাকেন। আর এভাবেই তিনি ভূমিষ্ট হয়েছেন যেভাবে সাধারণত মানব সন্তান ভূমিষ্ট হয়। হযরত ঈসা (আ.)-কে এভাবেই আহার প্রদান করা হয়েছে যেভাবে শিশুদেরকে প্রদান করা হয়। আর হযরত ঈসা (আ.) পানাহার করতেন। প্রস্রাব-পায়খানাও করতেন। প্রতিনিধি দল বলল, হ্যাঁ, এসব কথা আমরাও জানি। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তাহলে তোমরাই বল তোমাদের দাবি মোতাবেক হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র কিভাবে হতে পারেন? একথার পর প্রতিনিধিদল নীরব হয়ে যায়। তখন আল্লাহ পাক সূরায়ে আলে ইমরানের প্রথম ৮০টি আয়াত নাজিল করেন। -[তাফসীরে নূরুল কুরআন : ১৫৬]

আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতটি নাজরানের খ্রিস্টানদের هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ الخ (৭) বাদানুবাদের সময় নাজিল হয়। তথা তারা হুজুর ﷺ -এর দাঁত ভাঙ্গা যুক্তি প্রমাণে অক্ষম হয়ে বলল যে, আপনি কি স্বীকার করেন না? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তখন তারা বলল, হযরত ঈসা كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْحٌ مِّنْهُ হযরত ঈসা (আ.) কে (আ.) আল্লাহর পুত্র হবার জন্য এটাই যথেষ্ট। তখন অত্র আয়াতটি নাজিল হয়। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যে এই কুরআন টি كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْحٌ مِّنْهُ অবতীর্ণ করেন তার কিছু অংশ মুহকাম তথা সুস্পষ্ট আর কিছু অংশ মুতাশাবিহ [অস্পষ্ট]। আর ও তোমরা বুঝ না। অনর্থক তা নিয়ে তর্ক বহছ কর। تَاْوِيْل -এর অন্তর্ভুক্ত যার অর্থ তোমরা জান না এবং এর مُتَشَابِهٌ
–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

(১-২) الٓمّٓ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ الخ হিজরি ৫ম হিজরি ৫ম সনে ষাট সদস্য বিশিষ্ট নাজরানের অধিবাসী একদল খ্রিস্টান মদিনায় আগমন করেন। এদের মধ্যে ১৪ জন ছিল নেতৃস্থানীয়। ৩ জন ছিল শীর্ষস্থানীয়। তারা যথাক্রমে ১. সম্প্রদায়ের নেতা আব্দুল মসীহ। ২. বিশিষ্ট পরামর্শদাতা আইজাস ও ৩. প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা আব্দুল হারেছা ইবনে আলকামা ছিল।

এরা রাসূল ﷺ-এর সাথে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ঝগড়া শুরু করল, তাদের দাবি ছিল– ১. তারা প্রথমবার বলল, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র, কেননা তাঁর কোনো পিতা নেই, ২. দ্বিতীয়বার বলল, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং আল্লাহ কেননা তিনি মৃতকে জীবন্ত করতে সক্ষম, ৩. এরপর বলল– হযরত ঈসা (আ.) তিনি খোদার একজন, কেননা আল্লাহ বলেন خَلَقْنَا এবং فَعَلْنَا আমরা সৃষ্টি করেছি বা আমরা করেছি। যদি তিনি একজনই হতেন তবে جَمْع কেন বললেন? মহানবী ﷺ বললেন– তোমরা কি এটা মান্য কর যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব কখনো মরবেন না। তারা বলল হ্যাঁ, এরপর বললেন তোমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে কি ধারণা কর তিনি মরণশীল? তারা বলল, হ্যাঁ।

এভাবে তিনি প্রমাণ করলেন যে হযরত ঈসা (আ.) কখনো প্রভু হতে পারেন না; বরং আল্লাহ এবং তার মাঝে কোনোরূপ সাদৃশ্যও নেই। তারা পরাজিত হয়েও ইসলাম কবুল না করলে উক্ত সূরার প্রথম হতে ৮০ এর ও কিছু বেশি আয়াত নাজিল হয়। –[তাফসীরে ছাওরী]

قوله اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ -এর বিশ্লেষণ : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের একত্ববাদ তথা তাওহীদের আলোচনা করে. একত্ববাদ প্রমাণের জন্য দু'টি সিফাত উল্লেখ করেছেন। এর পরবর্তী আয়াত দ্বয়েআরো দু'টি সিফাত বর্ণনা করেছেন। বস্তুত খ্রিস্টানদের হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা হবার দাবি প্রত্যাখ্যান করাই এর উদ্দেশ্য। প্রথম সিফাত اَلْحَيُّ অর্থাৎ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু কখনো নেই। এরূপ গুণ কোনো মানুষের হতে পারে না। স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.) ও মরবেন। কাজেই উপাস্য হবার যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো নেই।

اَلْقَيُّوْمُ -এর মর্ম : যিনি নিজে নিজে প্রতিষ্ঠিত, এবং যিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তিনিই কাইয়ূম, তিনি সৃষ্টির সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তার ইচ্ছায়ই সব কিছু হয়ে থাকে। এরূপ যোগ্যতা আর কারো নেই। একমাত্র আল্লাহই এ গুণের অধিকারী।

نَزَّلَ ও اَنْزَلَ এর মধ্যকার পার্থক্য : نَزَّلَ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل -এর تَنْزِيْل মাসদার হতে নির্গত। আর اَنْزَلَ বাবে اِفْعَال এর اِنْزَال মাসদার হতে নির্গত। উভয়ের অর্থ অবতীর্ণ করা।

তবে نَزَّلَ বাবে تَفْعِيْل এ হবার কারণে বার বার অবতীর্ণের অর্থে আসে। কেননা বাবে تَفْعِيْل -এর একটি বৈশিষ্ট্য তথা خَاصِيَة হলো تَدْرِيْج আর এটা এখানে প্রয়োগ হয়েছে। এজন্য পবিত্র কুরআনের বেলায় نَزَّلَ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআন রাসূল ﷺ-এর ২৩ বৎসর নবুয়তি জীবনে প্রয়োজন অনুসারে নাজিল হয়েছে। একসাথে নাজিল হয়নি

আর اَنْزَلَ টির ব্যবহার একত্রে সবটুকু অবতীর্ণ হবার ক্ষেত্রে. এজন্য তাওরাত ও ইঞ্জীলের ক্ষেত্রে اَنْزَلَ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা এগুলো একবারে সবটুকু অবতীর্ণ হয়েছে। আর কুরআনের ক্ষেত্রেও কখনো اَنْزَلَ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এতে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় না। কেননা কুরআন একসাথে لَوْح مَحْفُوْظ হতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে আর তথা হতে ধীরে ধীরে এসেছে।

اَلْكِتَابُ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে اَلْكِتَابُ কে মুতলাকভাবে বলা হয়েছে। اَلْكِتَابُ দ্বারা আসমানি সব কিতাব শামিল হলেও এখানে عَلَيْكَ দ্বারা অন্য সব কিতাব বাদ পড়ে শুধু মাত্র কুরআনই উদ্দেশ্য হয়েছে। কেননা মহানবী ﷺ -এর উপর সর্ব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ حَقٌّ-এর মর্মার্থ : حَقٌّ অর্থ– ন্যায় বা সত্য এর বিপরীত হলো بَاطِلٌ আর حَقٌّ শব্দটি صِدْقٌ-এর চেয়ে عَامٌ তাই এটা সব কিছুকে شَامِلٌ করবে। কাজেই পবিত্র কুরআনে যত রকমের ঘটনা, ওয়াদা, ধমকি, আহকাম, বিশ্বাসগত বিষয় এক কথায় যা কিছু আছে সবই যথার্থ সত্য। আর বিপরীত যা কিছু আছে সবই বাতিল তথা গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ التَّوْرٰةُ-এর বিশ্লেষণ : تَوْرَاةٌ শব্দটির অর্থ আলোকিত হওয়া, এর বহুবচন, تَوْرِيَاتٌ ও تَوْرَاتٌ আসে। এখানে تَوْرَاةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাব। হযরত মূসা (আ.) ৪০ দিন তূর পাহাড়ে اِعْتِكَافٌ করার পর মহান আল্লাহ এটা ইবরানী ভাষায় তাঁকে প্রদান করেন। তাই কিতাবটি কতগুলো لَوْحٌ বা তখতের উপর লিপিবদ্ধ ছিল। অনেক কঠোর বিধি-বিধানও তাতে ছিল।

قَوْلُهُ الْاِنْجِيْلُ-এর বিশ্লেষণ : اِنْجِيْلٌ শব্দটি نَجْلٌ হতে নির্গত। যার অর্থ হলো মূল বা আসল। কেননা ইঞ্জীল ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের খনি বা মূল। হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর অত্যন্ত সহজ আহকাম সম্বলিত অত্র কিতাবটি সুরিয়ানী ভাষায় নাজিল হয়।

قَوْلُهُ الْفُرْقَانُ এর দ্বারা উদ্দেশ্য : এ নিয়ে ওলামাদের মাঝে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। صَاحِبُ كَشَّافٍ কয়েকটি মতামত পেশ করেন।

১. এর দ্বারা সব আসমানি কিতাব উদ্দেশ্য কেননা সব কিতাবই সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী।

২. অথবা পূর্বোল্লিখিত কিতাবদ্বয়ই উদ্দেশ্য। যেহেতু খাসভাবে উল্লেখের পর عَامٌ ভাবে সবগুলোকে পার্থক্যকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৩. অথবা এর দ্বারা তৃতীয় কিতাব যাবূরই উদ্দেশ্য, কেননা তার উল্লেখ ইতঃপূর্বে নেই।

৪. অথবা পবিত্র কুরআনের মর্যাদা বৃদ্ধি ও ফজিলত প্রকাশের লক্ষ্যে পুনরায় কুরআনেরই উল্লেখ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন এর দ্বারা নবীদের مُعْجِزَةٌ উদ্দেশ্য। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ

বিঃ দ্রঃ এখানে উল্লেখ্য যে সর্ববৃহৎ চারটি গ্রন্থকে সংক্ষেপে জানার জন্য ওলামায়ে কেরাম চারটি শব্দ বের করেছেন। আর তা হলো ১. فَعَمٌ ২. تَعَمٌ ৩. زَيْد ৪. اِسْع

এগুলোর বিশ্লেষণ হলো

১. فَعَمٌ এখানে ف তে فُرْقَانٌ তথা কুরআন ع দ্বারা আরবি ভাষা, م দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ তথা কুরআন আরবি ভাষায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়।

২. تَعَمٌ এখানে ت দ্বারা تَوْرَاةٌ আর ع দ্বারা ইবরানী ভাষা, م দ্বারা হযরত মূসা (আ.) অর্থাৎ তাওরাত ইবরানী ভাষায় হযরত মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়।

৩. زَيْدٌ এখানে ز দ্বারা زَبُوْر আর ى দ্বারা ইউনানী ভাষা, د দ্বারা হযরত দাউদ (আ.) অর্থাৎ যাবূর ইউনানী ভাষায় হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়।

৪. اِسْعٌ এখানে ا দ্বারা ইঞ্জীল س দ্বারা সুরিয়ানী ভাষা ع দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) অর্থাৎ ইঞ্জীল সুরিয়ানী ভাষায় হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়।

قوله هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاۤءُ الخ -এর মর্মার্থ : অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ শক্তি ও অসীম কুদরতের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। যে তিনি মানুষকে জননীর উদরে তিনটি অন্ধকার পর্যায়ে কিরূপ নিপুণভাবে গঠন করেছেন তাদের আকার আকৃতি ও বর্ণ বিন্যাসে এমন শিল্পী সুলভ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আকৃতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে এমন মিল খায় না যে, স্বতন্ত্র পরিচয় দুরূহ হয়ে পড়ে। সৃষ্টির আদি হতে অদ্যাবধি দুজনকে একইরূপ পাওয়া গেছে এরূপ কোনো নজির নেই। তিনি ছাড়া কারো জ্ঞান ও শক্তি সামর্থ্য এরূপ নয়।

اَلْمُحْكَمَاتُ وَالْمُتَشَابِهَاتُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আয়াতসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. مُحْكَمَاتٌ .২ مُتَشَابِهَاتٌ :

◈ **প্রথমত ঃ** مُحْكَمَاتٌ এর অর্থ সুদৃঢ়, মজবুত [সুস্পষ্ট] বা পাকা। তথা যে সব আয়াতের অর্থ নির্ধারণে ও গ্রহণে কোনো সমস্যা হয় না বা সন্দেহের অবকাশ থাকে না তাকে 'মুহকামাত' বলে। তাফসীরে মাযহারীর লিখক বলেন- আরবি ভাষার নিয়মাবলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ব্যক্তি যে সব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারে, সে সব আয়াতকে মুহকামাত বলে। এ সব আয়াত কিতাবের মূল, সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য কর্তব্য।

◈ **দ্বিতীয়ত ঃ** مُتَشَابِهَاتٌ-এর অর্থ অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য তথা যে সব আয়াতের অর্থ গ্রহণে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কিংবা মূল রহস্য মোটেই উদঘাটন করা যায় না। তাকে 'মুতাশাবিহাত' বলা হয়। তাফসীর মাযহারীর গ্রন্থকার বলেন- আরবি ভাষার নিয়মবলি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে সব আয়াতের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝতে সক্ষম হন না। সেসব আয়াতকে মুতাশাবিহাত বলে।

মুতাশাবিহাতের প্রকারভেদ : মুতাশাবিহাত আবার দু'ভাগে বিভক্ত :

১. حُرُوْف مُقَطَّعَاتٌ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অক্ষর যা কিছু সূরার শুরুতে রয়েছে। যেমন- الٓمّٓ - الٓمّٓصٓ - الٓرٰ ইত্যাদি। এগুলোর দ্বারা আল্লাহ কি উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা তিনিই ভালো জানেন। কারো পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।

২. اٰيَاتُ صِفَاتٌ গুণবাচক আয়াতগুলো, যেমন- رُوْحُ اللّٰهِ - كَلِمَةُ اللّٰهِ - اِسْتَوَاءُ عَلَى الْعَرْشِ এগুলোর শাব্দিক অর্থ জানা গেলেও মূল রহস্য জানা যায় না। এখানে উল্লেখ্য যে, এগুলোর ভাব বুঝা না গেলেও এগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক।

اَلْفِتْنَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য : فِتْنَةٌ শব্দটি একবচন এর বহুবচন হলো فِتَنٌ এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে- ১. পরীক্ষা যেমন ইরশাদ হয়েছে- حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ এমনকি তারা [হারূত ও মারূত] বলত যে আমরা পরীক্ষায় আছি। ২. ঝগড়া-ফ্যাসাদ, বিপর্যয় অত্র আয়াতে তাই উদ্দেশ্য। অথবা এখানে فِتْنَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গোমরাহ করা এবং পথভ্রষ্ট করা। অথবা এই فِتْنَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেওয়া।

اَلْاِخْتِلَافُ فِى الْوَقْفِ فِىْ قَوْلِهٖ اِلَّا اللّٰهُ وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ এর মাঝে ওয়াকফ নিয়ে মতান্তর : ১. অধিকাংশ সাহাবী, ইমাম আযম ও ইমাম মালেকের মতে اِلَّا اللّٰهُ এর উপর وَقْف হবে। তখন অর্থ হবে মুতাশাবিহাতের তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে এটার উপর ঈমান আনয়ন করলাম। আর আব্দুর রাজ্জাক সহীহ সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে যা বর্ণনা করেন তাও এটার উপর দালালত করে।

২. আর কিছু সংখ্যকের মতে فِى الْعِلْمِ-এর উপর وَقْف হবে। এই رِوَايَةٌ টি مُجَاهِدٌ ও ضِحَاكٌ হতে বর্ণিত। তখন অর্থ হবে সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীরাও مُتَشَابِهَاتٌ-এর তাৎপর্য বুঝেন। তবে তারা তাদের জ্ঞানের উপর নিশ্চিত না হয়ে আল্লাহর করুণা প্রার্থনা করেন।

৩. আর কিছু সংখ্যকের মতে উভয়টি জায়েজ।

এজন্যই তাফসীরে মাযহারীর সম্মানিত মুসান্নিফ অত্র আয়াতের তাফসীর এভাবে করেছেন যে, মুতাশাবিহাতের মূল রহস্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, তবে যাকে আল্লাহ তৌফিক প্রদান করেছেন সে-ই জানে। -[কাশশাফ]

اَلرَّاسِخُ فِى الْعِلْمِ কারা : رَاسِخُوْنَ শব্দটি رَاسِخٌ-এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ হলো দৃঢ়। পরিভাষায় رَاسِخُوْنَ বলতে বুঝায় ঐ সমস্ত মহামানবগণ যারা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা অবগত আছেন এবং মুজাহাদা ও মুহাসাবা দ্বারা আল্লাহর মা'রেফাত অর্জন করেছেন। তারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, সব কিছু আল্লাহর সৃষ্ট। সর্ববিষয়ে তিনি অবগত তাঁর জ্ঞান অপরিসীম। কুরআন আল্লাহর কালাম। সব কিছুর উপর তিনি ক্ষমতাবান তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই হয় না ইত্যাদি

তাবীল-এর অর্থ : تَاوِيْل শব্দটি মাসদার। اَوْل মূল ধাতু হতে নির্গত, শাব্দিক অর্থ হলো اَلرُّجُوْعُ প্রত্যাবর্তন করা তথা কোনো বিষয়কে তার মূলের দিকে ফিরোনো। পরিভাষায় এর অর্থ হলো- مَا يُمْكِنُ اِدْرَاكُهٗ بِالْقَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ যা শুধু আরবি নিয়ম-কানুন দ্বারা বুঝা যায়। তাকে তাবীল বলা হয়। আর আয়াতে بَاطِنِىْ ভাব উদ্ধার করাকেও تَاوِيْل বলা হয়। এখানে শেষ অর্থটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

تَفْسِيْر ও تَاوِيْل -এর মধ্যকার পার্থক্য

১. তাফসীর কুরআন হাদীস দ্বারা বিশ্লেষণ করাকে বলে। আর তাবীল শুধু আরবি কায়েদা দ্বারা অর্থ করাকে বলে।
২. জাহেরী ভাবধারাকে তাফসীর আর বাতেনী ভাবধারাকে তাবীল বলা হয়।
৩. ইমাম তিরমিযী (র.) -এর মতে তাফসীর তা যার উপর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এটা আল্লাহর উদ্দেশ্য। আর তাবীল কতগুলো সম্ভাবনাময় অর্থের একটিকে অনিশ্চিতভাবে প্রাধান্য দেওয়া।
৪. তাফসীরের ব্যবহার অধিকাংশ একক শব্দের মধ্যে হয়। আর তাবীলের ব্যবহার অধিকাংশ অর্থ এবং জুমলার মধ্যে হয়।

ইমাম রাগেবের মতে تَاوِيْل খাস যা শুধু আল্লাহর কালামে হয় আর تَفْسِيْر আম (عَامْ) যার ব্যবহার كُتُبْ اِلٰهِيَّهْ এবং كُتُبْ غَيْرُ اِلٰهِيَّهْ উভয়ে হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

الْحَيُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه অর্থ- চিরঞ্জীব।

الْقَيُّوْمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ مبالغة অর্থ- সর্বসত্তার ধারক।

يُصَوِّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْوِيْرُ মূলবর্ণ (ص - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- তিনি আকৃতি গঠন করেন।

يَشَآءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلشَّيْئُ মূলবর্ণ (ش - ى - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ- তিনি চান।

يَتَّبِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صحيح অর্থ- তারা অনুসরণ করে।

يَذَّكَّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّذَكُّرُ মূলবর্ণ (ذ - ك - ر) জিনস صحيح অর্থ- সে উপদেশ গ্রহণ করে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ : এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা لَا টি نفى جنس لا، আর اِلٰهَ টি اسم لا আর اِلَّا هُوَ হচ্ছে لَا -এর খবর। اَللّٰهُ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّوْمُ যথাক্রমে اسم ও خبر মিলে اَللّٰهُ এর প্রথম খবর। আর اَلْحَيُّ اَلْقَيُّوْمُ যথাক্রমে اَللّٰهُ এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খবর। অথবা اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ উহ্য মুবতাদা هُوَ এর খবর।

قوله نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ : এখানে نَزَّلَ শব্দটি فعل -এর ضمير টি فاعل তারপর على টি حرف جار আর ك হলো مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে نَزَّلَ -এর সাথে, اَلْكِتَابَ শব্দটি

, حال এর- كِتَابٌ -এর প্রথম (مفعول) ذو الحال - بِالْحَقِّ শব্দটি উহ্য مُتَلَبِّسًا -এর সাথে মিলে

এরপর ذو الحال তার দু'হাল لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ অংশটি مُصَدِّقًا -এর সাথে মিলে দ্বিতীয় حال হয়েছে

নিয়ে জুমলা متعلق ও مفعول - فاعل তার ফে'ল نَزَّلَ অতএব । এর نَزَّلَ মিলে مفعول হয়েছে.

فعلية হয়েছে।

قوله إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ : এখানে إِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর اللّٰهَ শব্দটি إِنَّ -এর اسم আর لَا আর معطوف হলো فِي الْأَرْضِ মওসূফ شَيْءٌ তারপর متعلق তার সাথে عليه এবং فعل টি يَخْفَى

এর- مَوْجُودٌ -এর সাথে উহ্য মিলে معطوف عليه ও معطوف এবার معطوف عليه হলো وَلَا فِي السَّمَاءِ

মিলে لَا يَخْفَى । তার فاعل এর- لَا يَخْفَى হয়েছে । صفت ও موصوف মিলে صفت হয়েছে । এর شَيْءٌ তার

জুমলা خبر ও اسم মিলে متعلق ও فاعل তার إِنَّ এর خبر হয়েছে । এরপর إِنَّ হয়ে جملة মিলে

اسمية হয়েছে ।

قوله هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ : এখানে هُوَ টি মুবতাদা اَلَّذِيْ মাওসূল يُصَوِّرُكُمْ ফে'ল, তার ضمير فاعل

يصور এবং كُمْ টি মাফঊল فِي الْأَرْحَامِ জার মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক, كَيْفَ يَشَاءُ টি ظرف তারপর

তার فاعل ,مفعول ,متعلق ও ظرف মিলে صلة হয়েছে । صلة ও موصول মিলে خبر এবার মুবতাদা

ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে ।

قوله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ : এখানে مَا يَعْلَمُ টি فعل আর উহ্য احد টি مستثنى আর تَأْوِيلَهُ উভয়টি মুযাফ ও

মুযাফ ইলাইহি মিলে مفعول হয়েছে إِلَّا হরফে استثناء আর اللّٰهُ শব্দটি مستثنى منه এবার

مفعول ও فعل - فاعل মিলে مَا يَعْلَمُ এর فاعل এবার مستثنى منه ও مستثنى মিলে

جملة فعلية হয়েছে ।

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۹﴾

অনুবাদ : (৯) হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি সকল মানুষকে সমবেতকারী ঐ দিনে যাতে কোনো সন্দেহ নেই; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ভঙ্গ করেন না [তাঁর] ওয়াদা।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ﴿۱۰﴾

(১০) নিশ্চয় যারা কুফরি করে, কখনো তাদের কাজে আসবে না তাদের ধন আর তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকাবিলায় সামান্য পরিমাণও, আর এই প্রকৃতির লোক জাহান্নামের ইন্ধন হবে

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۱۱﴾

(১১) যেমন আচরণ ছিল ফেরাউন সম্প্রদায়ের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের, তারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন তাদের অপরাধের জন্য, আর আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۲﴾

(১২) আপনি এই কাফেরদেরকে বলে দিন যে, অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে সমবেত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর তা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯) رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! اِنَّكَ নিশ্চয় আপনি جَامِعُ النَّاسِ সকল মানুষকে সমবেতকারী لِيَوْمٍ ঐ দিনে لَا رَيْبَ فِيْهِ যাতে কোনো সন্দেহ নেই اِنَّ اللّٰهَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ভঙ্গ করেন না [তাঁর] ওয়াদা।

(১০) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিশ্চয় যারা কুফরি করে لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ কখনো তাদের কাজে আসবে না اَمْوَالُهُمْ তাদের ধন وَلَآ اَوْلَادُهُمْ আর তাদের সন্তান-সন্ততি مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا আল্লাহর মোকাবিলায় সামান্য পরিমাণও وَاُولٰٓئِكَ هُمْ আর এই প্রকৃতির وَقُوْدُ النَّارِ লোক জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

(১১) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ যেমন আচরণ ছিল ফেরাউন সম্প্রদায়ের وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ এবং তাদের পূর্ববর্তীদের كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا তারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ তাই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন بِذُنُوْبِهِمْ তাদের অপরাধের জন্য وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আর আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

(১২) قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا আপনি এই কাফেরদেরকে বলে দিন যে سَتُغْلَبُوْنَ অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ এবং তোমাদেরকে সমবেত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে وَبِئْسَ الْمِهَادُ আর তা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ (١٣)	(১৩) নিশ্চয়, তোমাদের জন্য মহান নিদর্শন রয়েছে দুই দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল, এক দল তো আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল, আর অন্যদল ছিল কাফের, এই কাফেররা নিজেদেরকে মুসলমানাদের দ্বিগুণ দেখছিল, প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আর আল্লাহ স্বীয় সাহায্য দ্বারা যাকে ইচ্ছা শক্তি প্রদান করে থাকেন, নিশ্চয় তার মধ্যে মহান উপদেশ রয়েছে চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য।
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ (١٤)	(১৪) সুশোভিত মনে হয় মানুষের নিকট লোভনীয় বস্তুর মহব্বত, রমণী হোক, সন্তান-সন্ততি হোক, পুঞ্জীভূত স্বর্ণ এবং রৌপ্য হোক, চিহ্নিত অশ্ব বা পালিত পশু হোক, আর শস্যক্ষেত্রই হোক, এই সমুদয় পার্থিব জীবনের ব্যাবহারিক বস্তু, আর পরিণামের শোভা তো আল্লাহরই নিকট রয়েছে।
قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ (١٥)	(১৫) আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর কথা বলে দিব, যা এই বস্তুসমূহ অপেক্ষা উত্তম, এরূপ মানুষের জন্য যারা আল্লাহভীরু তাদের রবের নিকট এরূপ উদ্যান রয়েছে যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে, আর পাক-পবিত্রা বিবিগণ রয়েছে, আর সন্তুষ্টি রয়েছে আল্লাহর তরফ হতে, আর আল্লাহ খুব দেখেন বান্দাগণকে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩) قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ নিশ্চয়, তোমাদের জন্য মহান নিদর্শন রয়েছে فِىْ فِئَتَيْنِ দুই দলের মধ্যে, الْتَقَتَا যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এক দল তো আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ আর অন্যদল ছিল কাফের يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ এই কাফেররা নিজেদেরকে মুসলমানাদের দ্বিগুণ দেখছিল رَاْىَ الْعَيْنِ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ আর আল্লাহ স্বীয় সাহায্য দ্বারা যাকে ইচ্ছা শক্তি প্রদান করে থাকেন اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً নিশ্চয় তার মধ্যে মহান উপদেশ রয়েছে لِّاُولِى الْاَبْصَارِ চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য।

(১৪) زُيِّنَ لِلنَّاسِ সুশোভিত মনে হয় মানুষের নিকট حُبُّ الشَّهَوٰتِ লোভনীয় বস্তুর মহব্বত مِنَ النِّسَآءِ রমণী হোক وَالْبَنِيْنَ সন্তান-সন্ততি হোক وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ পুঞ্জীভূত স্বর্ণ এবং রৌপ্য হোক وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ চিহ্নিত অশ্ব وَالْاَنْعَامِ বা পালিত পশু হোক وَالْحَرْثِ আর শস্যক্ষেত্রই হোক ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এই সমুদয় পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক বস্তু وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ আর পরিণামের শোভা তো আল্লাহরই নিকট রয়েছে।

(১৫) قُلْ আপনি বলে দিন اَؤُنَبِّئُكُمْ আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর কথা বলে দিব بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ যা এই বস্তুসমূহ অপেক্ষা উত্তম لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا এরূপ মানুষের জন্য রয়েছে যারা আল্লাহভীরু عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের রবের নিকট جَنّٰتٌ এরূপ উদ্যান تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ আর পাক-পবিত্রা বিবিগণ রয়েছে وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ আর সন্তুষ্টি রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ আর আল্লাহ খুব দেখেন বান্দাগণকে

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ ... وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ الخ (১০-১১) **আয়াতের শানে নুযূল :** উল্লিখিত অংশটি একত্ববাদের অস্বীকার কারীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে নাজিল হয়েছে. তারা ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যের কারণে খুব গর্ববোধ করত, ফলে আল্লাহ তা'আলা এ সব আয়াত অবতীর্ণ করে বলেন যে, তাদের এসব কিছু কিয়ামতের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না, এগুলো তাদের কোনোরূপ উপকার করতে পারবেনা; বরং তারা অগ্নিতেই নিক্ষিপ্ত হবে।

قوله قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ الخ (১২) **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতটি মদিনার ইহুদিদের লক্ষ্য করে নাজিল হয়। বর্ণিত আছে, মহানবী ﷺ বদর যুদ্ধ হতে ফিরে এসে মদিনার ইহুদিদের কাইনুকা বাজারে [বনূ কোরাইজা, বনূ নযীর] একত্রিত করে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। এবং কুরাইশদের ন্যায় তাদের উপরও মসিবত আসার ভয় দেখান। তারা জবাবে বলল যে, আপনি যুদ্ধে অনভিজ্ঞদের উপর জয়লাভ করেছেন. আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে বুঝতেন যে, আমরা কেমন? তখন মহান আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতটি অবতরণ করে অচিরেই তাদের অহঙ্কার চুর্ণের খবর দেন এবং শেষ পরিণতির কথাও জানিয়ে দেন।

قوله زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الخ (১৪) **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে যে. যখন নাজরান প্রতিনিধিদল মহানবী ﷺ এর সাথে বিতর্ক করার লক্ষ্যে মদিনার দিকে রওয়ানা দিল, তখন আবুল হারেছা ও তার বড়ভাই কুরজ খচ্চরের পিঠে ছিল। খচ্চর হোঁচট খেলে তার বড় ভাই বলে উঠল "মুহাম্মদ ধ্বংস হোক" [নাউযু বিল্লাহ] আবুল হারেছা বলল- তোমার ধ্বংস হোক। কুরজ এতে বিব্রত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আবুল হারেছা বলল, "ইনি সে নবী, যার আগমন বার্তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে দেওয়া হয়েছে, কুরজ জিজ্ঞাসা করল, তাহলে তুমি তার উপর ঈমান আনছ না কেন? সে উত্তরে বলল, রোমান সম্রাট আমাকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে রেখেছে, সে আমাকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। আমি যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন করি তবে আমার সকল সুযোগ-সুবিধা ছিনিয়ে নিবে, ফলে আমি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ব। উল্লিখিত আয়াত আবুল হারেছার সেই ভ্রান্ত-বিশ্বাসের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়, এবং দুনিয়ার এ সমস্ত বস্তু পরকালীন সম্পদের তুলনায় তুচ্ছ বলে ঘোষণা করা হয়।

অথবা মহানবী ﷺ বদর প্রান্তরে কুরাইশদেরকে পরাজিত করে মদিনায় এসে ইহুদিদেরকে "কাইনুকার" বাজারে সমবেত করে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত প্রদান করেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাদের অর্থ সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য ও অস্ত্র শস্ত্রের বিপুলতার কারণে অহঙ্কার করতে থাকে। ফলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে বলেন যে, এসবই ক্ষণস্থায়ী; বরং পরকালের বিষয়াবলিই চিরস্থায়ী ও সর্বোত্তম।

কেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে খাস করা হয়েছে? এই পার্থিব জীবনে বিপদে-আপদে ধন-সম্পদ, ছেলে-মেয়ে মানুষের একেবারে নিকটতম সাহায্যকারী এগুলোই সুখ-শান্তির উপকরণ এদের উপর নির্ভর করে একজন মানুষ বেড়ে উঠে। কিন্তু পরকালীন জীবনে এগুলো কোনোই উপকারে আসবে না। মুমিনদের দান-খয়রাত ও নেক সন্তানের দোয়ায় সে মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু কাফেরের সে রূপ কোনো সুযোগ নেই।

ফেরাউনের ঘটনা : তৎকালীন যুগে মিশরের রাজাদের উপাধি ছিল ফেরাউন, যেমনি হাবশার রাষ্ট্র প্রধানকে বলা হতো নাজ্জাশী, পারস্যে কায়সার এবং রোমে কেসরা তবে এই فِرْعَوْنُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন তার নাম হলো أَبُو الْعَبَّاسِ وَلِيدُ بْنُ مُصْعَبٍ আবুল আব্বাস ওয়ালীদ ইবনে মাস'আব। সে প্রথম জীবনে মিশরের গোরস্থানের দারোগা ছিল এরপর মিশরের বাদশাহ রাইয়ান ইবনে ওলীদের মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে যাবতীয় কুকর্মে লিপ্ত হয়

কারো কারো মতে সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উপর ঈমান আনয়ন করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় বে-ঈমান হয়ে যায়। এই পিশাচ চারশত বৎসর হায়াত পেয়েছিল। এক পর্যায়ে সে ঘোষণা করে বসে যে, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى অর্থাৎ আমি তোমাদের বড় প্রতিপালক। এই ঘোষণায় বনী ইসরাঈল ছাড়া সকলে তাকে সেজদা করল। সর্ব প্রথম তার মন্ত্রী 'হামান' সেজদা করল। যারা তাকে খোদা মানতো না তাদের উপর কঠিন নির্যাতন চালানো হতো।

অবশেষে মহান আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে বনী ইসরাঈলকে রক্ষা কল্পে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর কুদরতে তাঁর গৃহেই লালিত-পালিত হন। নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) তাকে দীনের দাওয়াত প্রদান করেন, সে তা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে পুনরায় পুরো উদ্যমে বনী ইসরাঈলদের উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলা তার দলবলসহ তাকে নীল দরিয়াতে ডুবিয়ে হত্যা করেন। বর্তমানে তার মরদেহ মিশরের পিরামিডে সংরক্ষিত আছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের শিক্ষার জন্য আল্লাহ তার লাশ অক্ষত রাখবেন।

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ-এর দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে : এ বিষয়ে কতগুলো মতামত পাওয়া যায়–

১. এর দ্বারা قَوْمُ عَادٍ কে বুঝানো হয়েছে। নবীর সাথে বেয়াদবির কারণে ও আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার ফলে প্রবল বাতাস দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করা হয়।

২. অথবা হযরত নূহ (আ.)-এর قَوْم কে বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে বন্যা দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা হয়।

৩. অথবা قَوْمُ ثَمُودْ 'ছামূদ জাতি' উদ্দেশ্য, আল্লাহর আদেশ উপেক্ষা ও হযরত সালেহ (আ.)-এর উটনীকে কতল করার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

৪. অথবা এখানে এর দ্বারা নমরূদ ও তার দলবলকে বুঝানো হয়েছে সেও ফেরাউনের ন্যায় খোদায়ী দাবি করেছিল। অবশেষে আল্লাহ তাকে তার সৈন্য-সামন্তসহ মশা দ্বারা ধ্বংস করে দেন।

তবে অধিকাংশ ওলামার মতে وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ দ্বারা সাধারণভাবে ফেরাউনের পূর্ববর্তী সকল কাফেরদেরকেই বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেকেই নাফরমানির কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল।

اَلَّذِينَ كَفَرُوا দ্বারা কারা উদ্দেশ্য:

১. কাশশাফ গ্রন্থকারের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় বনূ কুরাইজা ও বনূ নযীর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এরূপই বর্ণিত আছে।

২. কিছু সংখ্যকের মতে আরবের কয়েকটি মুশরিক সম্প্রদায় উদ্দেশ্য।

৩. কারো কারো মতে আরবের সব মুশরিক সম্প্রদায় উদ্দেশ্য।

دَأْبٌ দ্বারা কি উদ্দেশ্য : دَأْبٌ শব্দটি মাসদার এর কয়টি অর্থ আছে–

১. دَأْبٌ অর্থ– جُهْدٌ বা চেষ্টা-সাধনা, যেমন আরবরা বলে دَأَبَ فِي الْعَمَلِ إِذَا لَوَّحَ فِيهِ সে কর্মে লিপ্ত হয়েছে। যখন সে তাতে চেষ্টা করে। –[কাশশাফ]

২. دَأْبٌ অর্থ কখনো ظُلْمٌ-এর অর্থে আসে যেমন বলা হয় إِنَّكَ لَتَظْلِمُ النَّاسَ كَدَأْبِ أَبِيكَ অর্থাৎ كَظُلْمِ أَبِيكَ তোমার পিতার জুলুমের ন্যায় মানুষের উপর জুলুম করছ।

৩. কখনো مَحْرُومٌ বা বঞ্চিতের অর্থে আসে যেমন বলা হয়– إِنَّ فُلَانًا مَحَارِمُ كَدَأْبِ أَبِيهِ তথা অমুক ব্যক্তি তার পিতার ন্যায় বঞ্চিত হয়েছে অর্থাৎ كَمَا حُرِمَ أَبُوهُ

৪. دَأْبٌ অর্থ اَلْعَادَةُ বা অভ্যাস বা স্বভাব আর আয়াতে এ অর্থটিই উদ্দেশ্য।

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ : এ স্থানে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বদরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী ﷺ মদিনায় এসেও শান্তিতে থাকতে পারলেন না। মহানবী ﷺ-এর মদিনায় ক্রম উন্নতি দেখে, কুরাইশরা মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য হিজরির ২য় সনে ১০০০ (এক হাজার) সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী ও বিরাট সমর সজ্জা নিয়ে মদিনাভিমুখে রওয়ানা দেয়। মহানবী ﷺ এই সংবাদ শুনে ৩১৩ জনের একদল ভক্ত অনুচর ও স্বল্প পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে 'বদর' নামক স্থানে তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ান। ২য় হিজরির ১৭ই রমজান মঙ্গলবার দিন উভয়ের মাঝে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাঁর অনুগ্রহে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। কুরাইশরা যুদ্ধক্ষেত্রে ২৪ জন নেতাসহ ৭০ জনের লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। আরো ৭০ জন বন্দীও হয়। মুসলমানদের ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসার শাহাদাত বরণ করেন।

قوله سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ -এর মর্মার্থ : এটি মদিনার ইহুদি সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে কেননা বদরের ঘটনার পর রাসূল ﷺ তাদেরকে ঈমান আনয়ন করতে বললে তারা নিজেদেরকে অভিজ্ঞ যোদ্ধা হিসেবে প্রকাশ করে অবজ্ঞা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করেছেন। বনূ কোরাইযার পুরুষদেরকে কতল করা হয়েছে এবং নারী শিশুদেরকে দাস দাসীতে পরিণত করা হয়েছে। আর বনূ নযীরকে মদিনা হতে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

قوله فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا : দ্বারা কোন ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে : فِئَتَيْنِ শব্দটি فِئَةٌ-এর দ্বিবচন, এর অর্থ হলো দু'দল। এই দু'দল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বদর প্রান্তরে যে দু'দলের লড়াই হয়েছিল তারা। এদের একপক্ষ হলো মুষ্টিমেয় ৩১৩ জন মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী। তথা মহানবী ﷺ-এর সাহাবীগণ যাদের সম্বল ছিল ২টি উষ্ট্র ৮০ খানা তরবারি। ও অল্প কয়েক খানা বর্শা ও ছয়টি বর্ম।

আর অপর পক্ষ হলো মক্কার কুরাইশবৃন্দ। যাদের সৈন্য সংখ্যা প্রায় এক হাজার। অশ্বারোহী ছিল ১০০ জন উষ্ট্রারোহী ছিল ৭০০ জন। অস্ত্র-সস্ত্রে তারা ছিল সুসজ্জিত। এদের নেতৃত্বে ছিল আবূ জাহল, ওতবা, শায়বা, রাবিয়াসহ আরবের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণ।

قوله يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ -এর যমীরসমূহের প্রত্যাবর্তন স্থল ও তদানুযায়ী অর্থ : এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়।

১. يَرَوْنَ-এর যমীর মুশরিকদের প্রতি, هُمْ যমীরটি মুসলমানদের প্রতি। আর مِثْلَيْهِمْ-এর যমীরটি মুশরিকদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। তখন অর্থ হবে মুশরিকগণ মুসলমানদেরকে মুশরিকদের দ্বিগুণ দেখতে পেল।
২. يَرَوْنَ -এর যমীর মুসলমানদের প্রতি, هُمْ মুশরিকদের প্রতি আর مِثْلَيْهِمْ এর هُمْ মুসলমানদের প্রতি। অর্থাৎ, মুসলমানরা মুশরিকদেরকে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখতে পেয়েছে। -[কাশশাফ]
৩. يَرَوْنَ এর যমীর মুশরিকদের প্রতি هُمْ মুসলমানদের প্রতি আর مِثْلَيْهِمْ-এর যমীরে هُمْ মুসলমানদের প্রতি رَاجِعٌ হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকরা মুসলমানদেরকে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখতে পেল।
৪. يَرَوْنَ-এর যমীর মুশরিকদের প্রতি, هُمْ যমীরটি ও মুশরিকদের প্রতি আর مِثْلَيْهِمْ-এর যমীর মুসলমানদের প্রতি প্র্যাতাবর্তন করবে। তখন অর্থ- মুশরিকরা নিজেদেরকে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখতে পেল।
৫. يَرَوْنَ -এর যমীর মুসলিমদের প্রতি আর هُمْ যমীরটিও মুসলমানদের প্রতি আর مِثْلَيْهِمْ এর যমীর মুশরিকদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। তখন অর্থ হবে মুসলমানগণ নিজেদেরকে মুশরিকদের দ্বিগুণ দেখতে পেল।
৬. অথবা সবগুলো যমীর মুসলমানদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। তখন অর্থ হবে মুসলমানগণ নিজেদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখতে পেল।
৭. অথবা সবগুলো যমীর মুশরিকদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তবে এই قَوْل টি অত্যন্ত দুর্বল।

قوله وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ : এর মর্মার্থ : অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে সাহায্য সহযোগিতার কথা বলেছেন। যেরূপ তিনি বদর প্রান্তরে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বিরাট বাহিনীর উপর বিজয় প্রদান করেছেন। এমনকি শত্রুদের চোখে মুসলমানদেরকে বেশি দেখিয়েছেন। ফলে তারা ভীত হয়ে পড়েছে। এছাড়া তিনি সরাসরি ফেরেশতা দ্বারাও সহযোগিতা করেছেন। আর স্বল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মনোবল অত্যন্ত দৃঢ় রেখেছেন। এ সবই نَصْرٌ বা সাহায্য।

সাতটি বিষয়কে ভালোবাসার বস্তু হিসেবে উল্লেখ করার কারণ

১. اَلنِّسَاءِ **স্ত্রীগণ** : প্রেম ভালোবাসা মানুষের সহজাত প্রকৃতি। স্ত্রীগণই ভালোবাসার অন্যতম বস্তু, দৈহিক শান্তি ও [আত্মিক] মানসকি তৃপ্তি এদের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। تَوَالُدْ ও تَنَاسُلْ তথা বংশ বিস্তার রমণীগণ দ্বারাই হয়।

২. وَالْبَنِيْنَ **সন্তান-সন্ততি** : একজন মানুষ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম সন্তান-সন্ততি, এছাড়াও بَقَاءُ اَلتَّنَاسُلْ তথা বংশ অবশিষ্ট থাকা সন্তান দ্বারাই হয়।

৩-৪. الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ **স্বর্ণ ও রৌপ্য** : পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মূল হলো স্বর্ণ, রৌপ্য। এর দ্বারাই মানুষ সুখে স্বাচ্ছন্দে পৃথিবীতে জীবন যাপন করে। অর্থকড়ি ছাড়া মানব জীবন মূল্যহীন।

৫. وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ **চিহ্নযুক্ত ঘোড়া** : অশ্ব মানুষের গর্বের প্রাণী, যুদ্ধে অন্যতম বাহন হিসেবে ঘোড়া পরিগণিত হয়। এছাড়া এর অনেকগুলো গুণের কারণেও মানুষ তাকে ভালোবেসে থাকে।

৬. وَالْاَنْعَامِ **চতুষ্পদ জন্তু** : যেমন গরু, ছাগল, উট, দুম্বা ইত্যাদি এগুলো অর্থ-সম্পদের অন্যতম উপকরণ। অধিক জন্তু গর্বেরও কারণ, এগুলোর মধ্যে বরকত অনেক বেশি বলেও মানুষ তা পছন্দ করে।

৭. وَالْحَرْثِ **শষ্য ক্ষেত্র** : খাদ্য খেয়ে মানুষ জীবন ধারণ করে, আর তাদের যাবতীয় খাদ্য এই রেক্ষত খামার হতেই উৎপাদিত হয়।

مَنِ الْمُزَيِّنُ সুসজ্জিত কারী কে?

এই বস্তুগুলোকে কে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন? এই ক্ষেত খামার হতেই উৎপাদিত হয়।

১. এই সাতটি বস্তুর লোভনীয়কারী হলেন আল্লাহ তা'আলা যেমন ইরশাদ হয়েছে- اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً. এছাড়া মুজাহিদের কেরাতে প্রমাণিত আছে তিনি পড়েছেন زَيَّنَ لِلنَّاسِ কে مَعْرُوْفْ করে। এটি অধিকাংশ ওলামার অভিমত।

২. হাসান বসরীসহ কিছু সংখ্যক মুফাসসিরীনের মতে সুসজ্জিত বা লোভনীয়কারী হলো শয়তান। যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ

এখন উভয় কথার মধ্যে এভাবে সমাধান দেওয়া যায় যে, প্রকৃত مُزَيِّنْ হলো আল্লাহ তা'আলা তিনি বান্দাদের পরীক্ষার জন্য এরূপ করেছেন যা আয়াত দ্বারা বুঝা যায়।

আর শয়তান যেটা লোভনীয় করে তা শরিয়তের দৃষ্টিতে মন্দ বা সীমাতিরিক্ত কিংবা যা শরিয়ত অনুমোদন দেয় না। কেননা শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়কে সুশোভিত করা মন্দ নয়; বরং এতে অনেক উপকার ও নিহিত আছে। -[মা'আরেফুল কুরআন]

قَنَاطِيْرْ এর পরিমাণ : قَنَاطِيْر শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো قِنْطَارْ শাব্দিক অর্থ হলো اَلْمَالُ الْكَثِيْرُ অধিক সম্পদ। তবে এর পরিমাণ নিয়ে আলেমদের মাঝে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়।

১. হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়ের হতে বর্ণিত مِائَةُ اَلْفِ دِيْنَارٍ একশত হাজার দিনার। وَلَقَدْ جَاءَ الْاِسْلَامُ يَوْمَ جَاءَ بِمَكَّةَ مِائَةُ رَجُلٍ قَدْ قَنْطَرُوْا [কাশশাফ]

২. কিছু সংখ্যকের মতে ষাড়ের চামড়া পূর্ণ সম্পদ। -[কাশশাফ]

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত কেনতারের পরিমাণ ১২ হাজার আওকিয়া।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত- বার হাজার দিনার যা বারো হাজার দিরহাম।

৫. হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় এক হাজার দিনার।

৬. হযরত আবূ ওবায়দা (রা.)-এর মতে অজস্র ধন-সম্পদই হলো কিনতার।

মোটকথা, قِنْطَارْ বলতে প্রচুর পরিমাণের ধন-সম্পদকে বুঝানো হয়েছে।

مُسَوَّمَةٌ এর অর্থ : مُسَوَّمَةٌ শব্দটি اسم مفعول -এর সীগাহ, অর্থ চিহ্ন বা দাগ। তাই কাশশাফ গ্রন্থকার তিনটি অর্থ বলেছেন।

১. اَلْمُعَلَّمَةُ مِنَ الْمُسَوَّمَةِ : অর্থ সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট।
২. اَلْمُطَهَّمَةُ : সৃষ্টিগত দিক থেকে পরিপূর্ণ তথা তাতে কোনোরূপ অপূর্ণতা নেই।
৩. اَلْمَرْعِيَّةُ : اَلرَّاعِيَةُ فِيْ مَرْعَاهَا অর্থাৎ বিচরণশীল যা তার বিচরণ ক্ষেত্রে চড়ে বেড়ায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

دَأْبِ : শব্দটি একবচন, এর বহুবচন আসে না। অর্থ– অভ্যাস, অবস্থা।

سَتُغْلَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلتَّغَلُّبُ মূলবর্ণ (غ . ل . ب) জিনসে صحيح অর্থ– তোমরা পরাজিত হবে।

تُحْشَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَشْرُ মূলবর্ণ (ح . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

الْمِهَادُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন امهدة অর্থ– ঠিকানা

الْتَقَتَا : সীগাহ تثنية مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِلْتِقَاءُ মূলবর্ণ– (ل . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী হলো।

يَرَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين ও ناقص يائى অর্থ– তারা দেখে।

يُؤَيِّدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّأْيِيْدُ মূলবর্ণ– (أ . ى . د) জিনস মুরাক্কাব, مهموز فاء ও اجوف يائى অর্থ– তিনি শক্তিশালী করেন।

عِبْرَةً : শব্দটি একবচন, বহুবচন عبر অর্থ– উপদেশ।

زُيِّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– সুশোভিত করা হয়েছে।

الشَّهَوَاتِ : শব্দটি বহুবচন, একবচন شهوة অর্থ– আকর্ষণীয় বস্তু, পছন্দনীয় জিনিস।

أُنَبِّئُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْبِيْئُ মূলবর্ণ (ن . ب . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আমি সংবাদ দিব।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ : এখানে رَبَّنَا টি مضاف ও مضاف اليه মিলে مبتدأ আর اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল এবং كَ টি ان এর اسم এবং جَامِعُ শিবহে ফে'ল আর النَّاسِ টি مفعول এবং لِ টি حرف جار আর يَوْمٍ মাওসূফ ও اسم لا আর رَيْبَ টি اسم لا আর فِيْهِ টি উহ্য موجود -এর সাথে মিলে خبر لا হয়েছে। এবার لا খবর মিলে يوم -এর সিফাত হয়েছে। صفت ও موصوف মিলে مجرور এরপর جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে جَامِعُ এর সাথে, جَامِعُ তার متعلق ও مفعول নিয়ে ان -এর خبر হয়েছে। এবার اسم ان ও خبر ان মিলে جملة اسمية হয়ে رَبَّنَا এর خبر হয়েছে। এখন مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية।

قوله وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ : এখানে اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা شَدِيْدُ মুযাফ الْعِقَابِ মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف اليه মিলে খবর মুবতাদা ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا : এখানে كَانَ টি فعل ناقص আর لَكُمْ টি শিবহে ফে'লের সাথে متعلق হয়েছে। এবার الْتَقَتَا মাওসূফ فِئَتَيْنِ জুমলা হয়ে খবর مقدم হয়েছে। اٰيَةٌ মাওসূফ فِيْ হরফে জার فِئَتَيْنِ মাওসূফ الْتَقَتَا شبه فعل জুমলা হয়ে সিফাত। موصوف ও صفت মিলে مجرور হয়েছে فى এর সাথে, فى উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে জুমলা হয়ে صفت এর اية হয়েছে। اية তার صفت- এর সাথে মিলে خبر كان হয়েছে। اسم كان ও خبر كان মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ : এখানে يَرَوْنَ ফে'ল যমীর فاعل এর- هم টি মাফউল, مِثْلَيْ মুযাফ هِمْ মুযাফ ইলাইহি উভয়টি মিলে مفعول به হলো। رَاْيَ মুযাফ الْعَيْنِ মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف اليه মিলে يَرَوْنَ ফে'লের مفعول مطلق হয়েছে। يَرَوْنَ ফে'ল ও فاعل ও তিন مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ : এখানে اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা يُؤَيِّدُ ফে'ল যমীরে هُوَ ফা'য়েল باء হরফে জার نَصْرِ মুযাফ ہ মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور হলো। جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে يؤيد ফে'লের সাথে, এরপর مَنْ টি موصول এবং يَشَاۤءُ ফে'ল যমীরে هُوَ ফা'য়েল فعل ও فاعل মিলে جملة হয়ে صلة এর مَنْ এবার موصول ও صلة মিলে مفعول به হলো। يُؤَيِّدُ ফে'ল তার فاعل، مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে خبر হয়েছে। مبتدا ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল فِيْ ذٰلِكَ উহ্য ফে'লের সাথে মিলে خبر مقدم হলো। لَ তাকিদ عِبْرَةً মাওসূফ لِ হরফে জার اُولِي মুযাফ الْاَبْصَارِ মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে মাজরূর جار ও مجرور মিলে উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে মিলে جملة হয়ে صفة হলো عبرة মুবতাদা মাওসূফও তার সিফাত মিলে اسم اِنَّ مؤخر অবশেষে اسم اِنَّ ও خبر اِنَّ মিলে جملة اسمية হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

অনুবাদ : (১৬) [তারা] এরূপ লোক যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমাদেরকে দোজখের আজাব হতে বাঁচিয়ে নিন।

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

(১৭) [তারা] সহিষ্ণু এবং সত্যপরায়ণ এবং বিনয়ী এবং দানশীল এবং শেষ রাত্রে পাপ মোচনের প্রার্থনাকারী।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

(১৮) সাক্ষ্য প্রদান করেছেন আল্লাহ তা'আলা এর যে, ঐ [পাক] সত্তা ভিন্ন অন্য কেউই মাবূদ হওয়ার যোগ্য নয়, আর ফেরেশতারাও এবং জ্ঞানবানগণও আর মাবূদও এরূপ যে, ন্যায়ের সাথে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী, তিনি ভিন্ন কেউই মাবূদ হওয়ার যোগ্য নয়, তিনি পরাক্রমশালী- মহাজ্ঞানী।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

(১৯) নিঃসন্দেহে, ধর্ম [সত্য ও মনোনীত] আল্লাহর নিকট শুধু ইসলামই। আর আহলে কিতাবরা [ইসলাম সম্বন্ধে] যে মতভেদ করেছে তা এই অবস্থার পর যে, তাদের নিকট প্রমাণ পৌঁছেছিল [ইসলাম সম্বন্ধে সন্দেহবশত নয়; বরং] শুধু [মুসলমানদের প্রতি] পরস্পর জিদ ও হিংসাবশত আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আহকামকে প্রত্যাখ্যান করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি সত্বর তার হিসাব গ্রহণকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬) اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ এরূপ লোক যারা বলে رَبَّنَآ হে আমাদের প্রতিপালক! اِنَّنَآ اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا সুতরাং আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিন وَقِنَا এবং আমাদেরকে বাঁচিয়ে নিন عَذَابَ النَّارِ দোজখের আজাব হতে।

(১৭) اَلصّٰبِرِيْنَ [তারা] সহিষ্ণু وَالصّٰدِقِيْنَ এবং সত্যপরায়ণ وَالْقٰنِتِيْنَ এবং বিনয়ী وَالْمُنْفِقِيْنَ এবং দানশীল وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ এবং শেষ রাত্রে পাপ মোচনের প্রার্থনাকারী।

(১৮) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন আল্লাহ তা'আলা এর যে لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ঐ সত্তা ভিন্ন অন্য কেউই মাবূদ হওয়ার যোগ্য নয় وَالْمَلٰٓئِكَةُ আর ফেরেশতারাও وَاُولُوا الْعِلْمِ এবং জ্ঞানবানগণও قَآئِمًا بِالْقِسْطِ আর মাবূদও এরূপ যে, ন্যায়ের সাথে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন কেউই মাবূদ হওয়ার যোগ্য নয় الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ তিনি পরাক্রমশালী- মহাজ্ঞানী।

(১৯) اِنَّ الدِّيْنَ নিঃসন্দেহে, ধর্ম عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ আল্লাহর নিকট শুধু ইসলামই وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আর আহলে কিতাবরা যে মতভেদ করেছে اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ তা এই অবস্থার পর যে, তাদের নিকট প্রমাণ পৌঁছেছিল بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ শুধু পরস্পর জিদ ও হিংসা বশত وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আহকামকে প্রত্যাখ্যান করবে فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি সত্বর তার হিসাব গ্রহণকারী।

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٢٠)

(২০) এরপরও যদি তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে আপনি বলে দিন, আমি তো আমার চেহারা একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু করেছি, আর আমার অনুগামীরাও, আর বলুন, আহলে কিতাবকে এবং [মুশরিক] আরবদেরকে, তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করতেছ? অতঃপর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তারাও পথে এসে যাবে, আর যদি তারা বিমুখই থাকে, তবে আপনার দায়িত্ব শুধু [আল্লাহর আহকাম] পৌছে দেওয়া মাত্র, আর আল্লাহ স্বয়ং দেখে নিবেন বান্দাদেরকে।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢١)

(২১) নিশ্চয়, যারা অমান্য করে আল্লাহর আয়াতসমূহকে এবং অন্যায়ভাবে পয়গম্বরগণকে হত্যা করে এবং হত্যা করে এমন লোকদেরকে যারা ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দেয়, সুতরাং এরূপ লোকদেরকে সংবাদ শুনিয়ে দিন এক যন্ত্রণাময় শাস্তির।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (٢٢)

(২২) তারা ঐ সকল লোক, যাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে, ইহলোক ও পরলোকে, আর তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(২০) فَإِنْ حَآجُّوكَ এরপরও যদি তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে فَقُلْ তবে আপনি বলে দিন أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ আমি তো আমার চেহারা একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু করেছি وَمَنِ اتَّبَعَنِ আর আমার অনুগামীরাও وَقُلْ আর বলুন لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ আহলে কিতাবকে وَالْأُمِّيِّينَ এবং [মুশরিক] আরবদেরকে أَأَسْلَمْتُمْ তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করতেছ? فَإِنْ أَسْلَمُوا অতঃপর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে। فَقَدِ اهْتَدَوا তবে তারাও পথে এসে যাবে। وَّإِن تَوَلَّوْا আর যদি তারা বিমুখই থাকে فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ তবে আপনার দায়িত্ব শুধু [আল্লাহর আহকাম] পৌছে দেওয়া মাত্র وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ আর আল্লাহ স্বয়ং দেখে নিবেন বান্দাদেরকে।

(২১) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ নিশ্চয় যারা অমান্য করে بِآيَاتِ اللَّهِ আল্লাহর আয়াতসমূহকে وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে بِغَيْرِ حَقٍّ অন্যায়ভাবে وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ এবং হত্যা করে এমন লোকদেরকে যারা ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দেয় فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ সুতরাং এরূপ লোকদেরকে সংবাদ শুনিয়ে দিন এক যন্ত্রণাময় শাস্তির।

(২২) أُولَٰئِكَ তারা ঐ সকল লোক الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ যাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ইহলোক ও পরলোকে وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ আর তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮) قوله شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা ইমাম বগভী (র.) বলেন, সিরিয়া থেকে দু'জন বিশিষ্ট ইহুদি পণ্ডিত একবার মদিনায় আগমন করেন। মদিনার আবাসিক এলাকা দেখে তারা মন্তব্য করেন যে, শেষ জমানার নবী যে রকম লোকালয়ে অবস্থান করবেন বলে তাওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এটা ঠিক সে রকম বলেই মনে হচ্ছে। এরপর তারা জানতে পারেন যে, এখানে একজন মহান ব্যক্তি আছেন যাকে সবাই নবী বলে আখ্যায়িত করেন। তারা হযরত নবী করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তাওরাতে বর্ণিত আখেরী নবীর গুণাবলি তাদের সামনে ভেসে উঠে। তারা বললেন, আপনি কি মুহাম্মদ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তারা বলল, আপনি কি আহমদ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা আরো বলল, আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করব। যদি আপনি সঠিক উত্তর দেন তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। হযরত নবী করীম ﷺ বললেন, প্রশ্ন করুন। তারা বলল, আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোনটি? এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হযরত নবী করীম ﷺ আয়াতটি তেলাওয়াত করে তাদের শুনিয়ে দিলে তারা তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যান। -[মা'আরিফুল কুরআন : ১৬৮]

(১৯) قوله اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** অত্র আয়াতটি ইহুদি ও নাসারাদের অসত্য দাবির প্রতিবাদে নাজিল হয়। ইহুদি সম্প্রদায় যখন দাবি করেছিল যে হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্ম, তথা ইহুদি ধর্মই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম এর উপরে কোনো ধর্ম নেই। এমনিভাবে খ্রিস্টানগণও দাবি করল যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এটা আল্লাহর মনোনীত, এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো ধর্ম নেই। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের অসত্যতা প্রতিপাদন করে ইসলামের সত্যতা ও গ্রহণ যোগ্যতার বর্ণনা দিয়ে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। এমনিভাবে অন্য আয়াতে বলেছেন- وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অনুসরণ করবে তা তার থেকে কখনো গৃহীত হবে না। -[প্রান্তটীকা জালালাইন]

(২১) قوله اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উল্লিখিত আয়াতদ্বয় ইহুদিদের চরম অপরাধ ও শাস্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি একদা রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন সবচাইতে কঠিন শাস্তি কাদের হবে? রাসূল ﷺ বললেন, যারা নবীদের কতল করে এবং যারা ভালো কাজের আদেশ প্রদান করে এবং মন্দকাজ হতে বাধা দান করে তাদেরকে হত্যা করে। এরপর রাসূল ﷺ এই আয়াত তেলাওয়াত করে দুঃখের সাথে বললেন, হে আবূ ওবায়দা! বনী ইসরাঈলগণ একদিন সকাল বেলায় ৪৩ জন নবীকে কতল করেছিল, এ কাজে ১৭০ কিংবা ১২০ জন আলেম মর্মাহত হয়ে তাদেরকে এই পাপকার্য হতে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দেন। পাপিষ্ঠগণ সেদিন বিকাল বেলায় তাদেরকেও হত্যা করে দেয়। এমনকি এই গোষ্ঠী রাসূল ﷺ কে পর্যন্ত হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। এই আয়াতে জালেমদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা ও এর পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। -[কাশশাফ]

قوله رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا الخ **এর মর্মার্থ :** এ স্থানে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের প্রার্থনার কথা বলেছেন, যারা পূর্বোক্ত আসক্ত ৭টি বস্তু পরিত্যাগ করে, কিংবা সেগুলোকে আখেরাত লাভের মাধ্যম জানায়, তারা এটা করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং সদা সর্বদা আল্লাহর নিকট বিনীত প্রার্থনাও করে তাদের পাপসমূহ মার্জনা করার জন্য। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাদের ছয়টি বিশেষ গুণের কথাও উল্লেখ করেছেন।

مَعْنَى الصَّبْرِ وَاَقْسَامُهٗ : صَبْر শব্দটি মাসদার, শাব্দিক অর্থ اَلْحَبْسُ বা আটকিয়ে রাখা।

শরিয়তের পরিভাষায় : সত্যের পথে অটল থাকার লক্ষ্যে সকল প্রকার অপছন্দনীয় কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখা।

أَقْسَامُ الصَّبْرِ : সবর তিন প্রকার-

১. اَلصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ : কল্যাণের উপর দৃঢ় থাকার জন্য ধৈর্যধারণ করা।

২. اَلصَّبْرُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ : অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্য অবলম্বন করা।

৩. اَلصَّبْرُ عَلَى الْمُصِيْبَةِ : বিপদাপদে পেরেশান না হয়ে ধৈর্যধারণ করা।

বস্তুত আয়াতে صابرين বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কষ্ট স্বীকার করে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ধৈর্যধারণ ও নির্ভর করে।

مَعْنَى الصِّدْقِ وَأَقْسَامُهُ : اَلصِّدْقُ শব্দটি মসাদার, শাব্দিক অর্থ হলো ন্যায়, নিষ্ঠা, বা সত্যবাদিতা।

শরিয়তের পরিভাষায় مُطَابِقٌ لِلْوَاقِعِ তথা বাস্তবতার অনুরূপ বিষয়াবলিকে صِدْق বা সত্য বলে, আর خِلَافًا لِلْوَاقِعِ বা বাস্তবতার বিপরীতকে كِذْب বা মিথ্যা বলে।

أَقْسَامُ الصِّدْقِ : صِدْق তিন প্রকার।

১. اَلصِّدْقُ فِى الْفِعْلِ : তথা কাজে ও কর্মে সত্যবাদিতা।

২. اَلصِّدْقُ فِى الْقَوْلِ : অর্থাৎ কথায় সত্যবাদিতা।

৩. اَلصِّدْقُ فِى النِّيَّةِ : তথা সংকল্পে সত্যবাদিতা, তথা বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্প হওয়া।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْحَقِّ : صِدْق ও حَقّ এর মধ্যকার পার্থক্য নিম্নরূপ

১. صِدْق এর বিপরীত كِذْب যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ আর حَقّ এর বিপরীত بَاطِلٌ ব্যবহৃত হয়। যথা- কুরআনে রয়েছে- قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

২. حَقّ টি عَام তথা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যেমন- قَوْل حَقّ - دِيْن حَقّ - مَذْهَب حَقّ আর صِدْق টি خَاص তথা শুধু বাচনিক ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়- قَوْل صِدْق

৩. কখনো কখনো উভয়ে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে মূলনীতি হলো اِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا وَاِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا অর্থাৎ উভয়টি একসাথে আসলে পৃথক অর্থ হবে আর পৃথকভাবে আসলে একই অর্থ হবে।

مَعْنَى الْقَانِتِيْنَ : قَانِتِيْن শব্দটি قُنُوْت হতে নির্গত এর কতগুলো অর্থ রয়েছে। যেমন-

১. طَاعَة তথা আনুগত ২. اَلدُّعَاءُ প্রার্থনা ৩. طُوْلُ الْقِيَام অধিক সময় দাঁড়িয়ে থাকা। ৪. خُشُوْع বিনয় ৫. اَلسُّكُوْتُ চুপ থাকা যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

আর যখন دُعَاء অর্থ নেওয়া হয় তখন এর দ্বারা যে দু'রকম দোয়া বুঝানো হয়।

১. قُنُوْت نَازِلَة যা বদদোয়ার জন্য পড়া হয়। এটা ফজর নামাজে রাসূল ﷺ একমাস পর্যন্ত পড়েছেন বলে প্রমাণিত আছে।

২. قُنُوْت رَاتِبَة : যা নিয়মিতভাবে আমরা বিতিরের নামাজে পড়ে থাকি।

مَعْنَى الْمُنْفِقِيْنَ : اَلْمُنْفِقِيْنَ এটি اِنْفَاق থেকে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো ব্যয় করা বা খরচ করা। এখানে منفقين বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নিয়মিত আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করে।

مَعْنَى الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ : শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এ সময় মানুষ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে অলসতা ও জড়তা মানুষকে বেষ্টন করে রাখে। কিন্তু যারা আরামের ঘুমকে হারাম করে জেগে উঠে আল্লাহর ইবাদতে মাশগুল হয়, তখন ইবাদত পূর্ণাঙ্গ হয়। আল্লাহর খাস রহমত তাকে বেষ্টন করে রাখে। আল্লাহ প্রেমিকদের সর্বোত্তম সময় শেষ রজনী। এজন্য বলা হয় فَمَنْ طَلَبَ الْعُلٰى سَهِرَ اللَّيَالِىْ হাদীসে আছে রাত্রির শেষাংশে মহান আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে এসে বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলেন- هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقُهُ

قوله شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ **-এর ব্যাখ্যা :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের বর্ণনার পর মহান আল্লাহ অত্র আয়াতে এক বিশেষ ভঙ্গিতে একত্ববাদের উপর তিনটি সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন।

১. شَهَادَةُ اللّٰهِ **তথা আল্লাহর সাক্ষ্য :** এখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত। যেহেতু আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি এবং সমুদয় সৃষ্টি তাঁর একত্ববাদের উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়া তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল, গ্রন্থাবলি ও একত্বাদের সাক্ষ্যদাতা। এসব বস্তু আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত। কাজেই স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই যেন সাক্ষ্য দেন যে, তাঁকে ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই।

২. شَهَادَةُ الْمَلَائِكَةِ **তথা ফেরেশতাদের সাক্ষ্য :** ফেরেশতাগণ আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত এবং তাঁর সৃষ্টিগত সকল ক্রিয়া কর্মের কর্মী বাহিনী তাঁরা সবকিছু জেনে শুনে এবং চাক্ষুস দেখে সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই।

৩. شَهَادَةُ اُولِى الْعِلْمِ **তথা বিশেষ জ্ঞানীদের সাক্ষ্য :** এ বিশেষ জ্ঞানী বলতে সব পয়গম্বর এবং মুসলমান আলেম শ্রেণিকে বুঝানো হয়েছে। একারণেই ইমাম গাজ্জালী ও আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এ আয়াতে আলেমদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাক্ষ্যকে নিজের এবং ফেরেশতাগণের সাথে উল্লেখ করেছেন। এখানে বিশেষ জ্ঞানী বলতে সম্ভবতঃ ঐ সব মনীষীগণকেও বুঝানো হয়েছে যারা বিশুদ্ধ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অথবা সৃষ্টি জগত সম্পর্কে গভীর গবেষণার ফলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হলো যে, এ সৃষ্টিজগতের একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন এবং তিনি একক। তিনি ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। -[মা'রেফুল কুরআন]

এখানে উল্লেখ্য যে, এই আয়াত পড়ার পর রাসূল وَاَنَا ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ বলতেন, আমাদেরও তা বলা উচিত।

قوله قَآئِمًا بِالْقِسْطِ **এর ব্যাখ্যা :** মহান আল্লাহ কোনো কিছুই অসমাঞ্জস্য সৃষ্টি করেননি। যাকে যেভাবে সৃষ্টি করা প্রয়োজন তাকে সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। যাকে যে বস্তু যেটুকু দেওয়া প্রয়োজন তাকে তাই দিয়েছেন। কারো প্রতি বিন্দু মাত্রও জুলুম করেননি। যেমন কাশশাফ গ্রন্থকার বলেছেন-

مُقِيْمًا بِالْعَدْلِ فِيْمَا يَقْسِمُ مِنَ الْاَرْزَاقِ وَالْاٰجَالِ وَيُثِيْبُ وَيُعَاقِبُ وَمَا يَاْمُرُ بِهٖ عِبَادَهٗ مِنْ اِنْصَافِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ وَالْعَمَلِ عَلَى السَّوِيَّةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ তিনি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি রিজিক, হায়াত, বণ্টন করেন। ছওয়াব দিবেন, শাস্তি প্রদান করবেন এবং বান্দাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে ন্যায়-নীতিতে নির্দেশ প্রদান করেন। যার যতটুকু সামর্থ্য তাকে ততটুকু কর্ম করার সুযোগ দেন। তথা কারো প্রতি অন্যায় করেন না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন : اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ অর্থাৎ আল্লাহ বান্দার প্রতি জুলুম করেন না।

قَائِمٌ ও قَيُّوْمٌ **এর মধ্যকার পার্থক্য :** উভয়টি قِيَامٌ মাসদার হতে নির্গত। উভয়ের অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া। কিন্তু কিছু পার্থক্য রয়েছে, তা নিম্নরূপ-

১. قَائِمٌ নিজে দাঁড়ানো। قَيُّوْمٌ নিজে দাঁড়ানোর সাথে সাথে অন্যকেও দণ্ডায়মান করানো।

২. قَيُّوْمٌ আল্লাহর জন্য খাস, অন্য কারো বেলায় তা ব্যবহৃত হয় না। আর قَائِمٌ আম, যা সবার জন্য ব্যবহার হয়।

দীন ও ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যা : আরবি ভাষায় دِيْن শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে এক অর্থ রীতি ও পদ্ধতি। কুরআনের পরিভাষায় دِيْن সেসব মূলনীতি ও বিধি-বিধানকে বলা হয় যা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল পয়গম্বরের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। 'শরিয়ত' অথবা 'মিনহাজ' শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা। 'মাযহাব' শব্দটি দীনের বিভিন্ন শাখার বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কুরআন বলে-

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সে দীনই প্রবর্তন করেছেন, যার নির্দেশ ইতঃপূর্বে নূহ ও অন্যান্য পয়গম্বরদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

এতে বুঝা যায়, সব পয়গম্বরের দীনই এক ও অভিন্ন ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তার যাবতীয় পরাকাষ্ঠার অধিকারী হওয়া এবং সমুদয় দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাঁকে ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য না হওয়ার প্রতি মনে প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা। কিয়ামত দিবস, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তিদান এবং জান্নাত ও দোজখের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা, মুখে স্বীকার করা, আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল ও তাঁদের বিধানের প্রতিও তেমনিভাবে ঈমান আনা। 'ইসলাম' শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের আনুগত্য করেছে, তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম। এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই হযরত নূহ (আ.) বলেন وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ আমি 'মুসলিম' হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। -[সূরা ইউনুস] এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেকে ও নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমা' বলেছিলেন : رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

হযরত ঈসা (আ.)-এর সহচরগণ এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল : وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ 'সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম'।

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তাঁর আনীত দীনই ছিল দীনে ইসলাম এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দীনে মুহাম্মদীই 'ইসলাম' নামে অভিহিত হয়েছে- যা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। যদি ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ নেওয়া হয়, অর্থাৎ, মুহাম্মদ ﷺ -এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী দীনগুলোকেও তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা রহিত হয়ে গেছে। অতএব উভয় অবস্থাতে আয়াতের প্রকৃত অর্থ একই দাঁড়ায়।

তাই কুরআনের সম্বোধিত উম্মতের সামনে ইসলামের যে কোনো অর্থই নেওয়া হোক না কেন, সারমর্ম হবে এই যে, রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাবের পর কুরআন ও তাঁর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এ ধর্মই আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো ধর্ম নয়। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বিধৃত হয়েছে।

ইসলামেই মুক্তি নিহিত : আজকাল ইসলামের উদারতার নামে কুফর ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা হয় এবং বলা হয় যে, সৎকর্ম সম্পাদন করলে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যে কোনো ধর্মাবলম্বীই মুক্তি পাবে- সে ইহুদি, খ্রিস্টান, অথবা মূর্তিপূজারী যাই হোক। আলোচ্য আয়াত এ উদ্ভট মতবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে ইসলামের মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। এটা একটি কাল্পনিক বিষয়, যা কুফরের পোশাকেও সুন্দর মানায়। কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াত পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, আলো ও অন্ধকার যেরূপ এক হতে পারে না, তদ্রূপ অবাধ্যতা ও আনুগত্য উভয়টি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হতে পারে না। যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো একটি মূলনীতি অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিদ্রোহী ও পয়গম্বরগণের শত্রু, প্রচলিত অর্থে সৎকর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে সে যতই সুন্দর হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত, তার কোনো ধর্ম ধর্তব্য নয়। কুরআনে এমন লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে- فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোনো আমল ওজন করব না।

পরিশেষে বলা হয়েছে- وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নির্দশনাবলি অস্বীকার করে, আল্লাহ দ্রুত তার হিসাব গ্রহণ করবেন। মৃত্যুর পর প্রথমতঃ কবর তথা বরযখ-জগতে পরকালের প্রথম পরীক্ষা নেওয়া হবে। এপর বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ হবে কিয়ামতে। এ হিসাব-নিকাশের সময়ই সব বিরোধের স্বরূপ ফুটে উঠবে। মিথ্যাপন্থিরা তাদের স্বরূপ জানতে পারবে এবং শাস্তিও শুরু হয়ে যাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

قِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِقَايَةُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তুমি বাঁচাও।

الْقٰنِتِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقُنُوْتُ মূলবর্ণ (ق . ن . ت) জিনস صحيح অর্থ- আনুগত্যকারীগণ।

الْمُنْفِقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفَاقُ মূলবর্ণ (ن . ف . ق) জিনস صحيح অর্থ- ব্যয়কারীগণ।

الْمُسْتَغْفِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِغْفَارُ মূলবর্ণ (غ . ف . ر) জিনস صحيح অর্থ- ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

الْاَسْحَارِ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে سحر অর্থ- ভোরের সময়সমূহ।

قَآئِمًا : সীগাহ واحدمذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقِيَامُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ- প্রতিষ্ঠিত, দণ্ডায়মান।

اُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ- তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

جَآءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئُ অর্থ- সে এসেছে।

حَآجُّوْكَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মূলবর্ণ (ح . ج . ج) মাসদার اَلْمُحَاجَّةُ জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা তর্ক করে।

اتَّبَعَنِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ- সে অনুসরণ করে।

الْاُمِّيّٖنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে اُمِّىٌّ অর্থ- নিরক্ষরগণ।

اهْتَدَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ : এখানে شَهِدَ টি فعل আর اللّٰهُ শব্দটি ذو الحال এবং قَآئِمًا শব্দটি بِالْقِسْطِ শিবহে فعل ও متعلق মিলে الله শব্দের حال উভয়ে মিলে معطوف عليه এবং واو টি حرف عطف আর اَلْمَلٰٓئِكَةُ প্রথম معطوف এবং واو টি حرف عطف ও اُولُوالْعِلْمِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে দ্বিতীয় معطوف এবার معطوف عليه তার দুই معطوف মিলে فاعل মিলে হয়েছে। ان হরফে মুশাব্বাহ বিলফে'ল। ه টি اسم ان আর لا টি লায়ে নফী জিনস اِلٰهَ ইসমে লা, উহ্য اَحَد মাওসূফ,

لا টি غير এর অর্থে مضاف আর هو মুযাফ ইলাইহি, উভয়ে মিলে সিফাত। صفت ও موصوف মিলে جملة হয়ে লا এর خبر হয়েছে লا ও اسم মিলে خبر এর ان হলো, এরপর ان তার اسم ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়ে شَهِدَ এর مفعول হয়েছে। সুতরাং فعل ، فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

قوله إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ : এখানে إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিলফে'ল اَلدِّيْنَ মাওসূফ উহ্য শিবহে ফে'ল اَلْمُخْتَار عِنْدَ মুযাফ اللّٰهِ শব্দটি مضاف اليه উভয়ে মিলে ظرف متعلق হয়েছে اَلْمُخْتَار এর সাথে। اَلْمُخْتَار টি তার ظرف নিয়ে শিবহে জুমলা হয়ে صفت হয়েছে। صفت ও موصوف মিলে ان এর اسم হলো। আর اَلْاِسْلَامُ টি إِنَّ এর خبر অতঃপর তার اسم ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

قوله فَإِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا : এখানে إِنْ টি حرف شرط আর اَسْلَمُوْا ফে'ল هم ضمير ফা'য়েল, উভয়ে মিলে جملة فعلية হয়ে شرط হয়েছে আর فاء টি جزاء- এর জন্য; قَدِ اهْتَدَوْا ফে'ল উহ্য যমীর هم ফা'য়েল, উভয়ে মিলে جملة فعلية হয়ে جزاء হলো সুতরাং شرط ও جزاء মিলে جُمْلَة شَرْطِيَّة হয়েছে।

قوله وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ : واو হরফে আতফ اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা আর بَصِيْرٌ শিবহে ফে'ল باء হরফে জার اَلْعِبَادِ মাজরুর, উভয়ে মিলে متعلق হয়েছে بَصِيْرٌ- এর সাথে, بَصِيْرٌ শিবহে ফে'ল তার মুতা'আল্লেক মিলে শিবহে জুমলাহ হয়ে خبر হয়েছে। সুতরাং মুবতাদা ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

অনুবাদ : (২৩) আপনি কি এরূপ লোক প্রত্যক্ষ করেননি, যাদেরকে কিতাবের [তাওরাতের] এক অংশ প্রদান করা হয়েছিল। আর সেই কিতাবুল্লাহর দিকে এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে আহ্বানও করা হয়, যেন এটা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, অতঃপর তাদের মধ্য হতে কতক লোক ফিরে যায় অবজ্ঞা করে।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

(২৪) এটা এই জন্য যে, তারা এরূপ বলে যে, আমাদেরকে কেবল নির্দিষ্ট অল্প কয়দিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। আর তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে তাদের [ধর্ম সম্বন্ধে] তৈরি মনগড়া কথাসমূহ।

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

(২৫) অনন্তর তাদের কি অবস্থা হবে। যখন আমি তাদেরকে ঐ তারিখে সমবেত করব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং পূর্ণ বিনিময় প্রাপ্ত হবে প্রত্যেকে যা কিছু সে করেছিল, আর তাদের উপর জুলুম করা হবে না।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

(২৬) আপনি এরূপ বলুন, হে আল্লাহ! সমস্ত রাজ্যের মালিক, আপনি রাজ্য যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং যার হতে ইচ্ছা করেন, রাজ্য ছিনিয়ে নেন, আর যাকে ইচ্ছা আপনি বিজয়ী করেন, আর যাকে ইচ্ছা আপনি পরাভূত করেন, আপানারই অধিকারে রয়েছে সমস্ত কল্যাণ, নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৩) أَلَمْ تَرَ আপনি কি এরূপ লোক প্রত্যক্ষ করেননি। إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا যাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ কিতাবের এক অংশ يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللهِ আর সেই কিতাবুল্লাহর দিকে এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে আহ্বানও করা হয় لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ যেন এটা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ অতঃপর তাদের মধ্য হতে কতক লোক ফিরে যায় وَهُمْ مُّعْرِضُونَ অবজ্ঞা করে।

(২৪) ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ এটা এই জন্য যে। قَالُوا তারা এরূপ বলে যে لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ আমাদেরকে কেবল নির্দিষ্ট অল্প কয়দিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে وَغَرَّهُمْ আর তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে فِي دِينِهِمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ তাদের [ধর্ম সম্বন্ধে] তৈরি মনগড়া কথাসমূহ।

(২৫) فَكَيْفَ অনন্তর তাদের কি অবস্থা হবে إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ যখন আমি তাদেরকে ঐ তারিখে সমবেত করব لَّا رَيْبَ فِيهِ যাতে কোনো সন্দেহ নেই وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ এবং পূর্ণ বিনিময় প্রাপ্ত হবে প্রত্যেকে مَّا كَسَبَتْ যা কিছু সে করেছিল وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ আর তাদের উপর জুলুম করা হবে না।

(২৬) قُلِ আপনি এরূপ বলুন اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ হে আল্লাহ! সমস্ত রাজ্যের মালিক تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ আপনি রাজ্য যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ এবং যার হতে ইচ্ছা করেন রাজ্য ছিনিয়ে নেন وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ আর যাকে ইচ্ছা আপনি বিজয়ী করেন وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ আর যাকে ইচ্ছা আপনি পরাভূত করেন بِيَدِكَ الْخَيْرُ আপানারই অধিকারে রয়েছে সমস্ত কল্যাণ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧)

(২৭) আপনি রাত্র [-এর অংশ]-কে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিন [এর অংশ]-কে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান, আর আপনি সজীবকে নির্জীব হতে বের করেন। [যেমন ডিম্ব হতে বাচ্চা] আর নির্জীব বস্তুকে সজীব হতে বের করেন, আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক দান করেন।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ (٢٨)

(২৮) মুসলমানদের উচিত কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা মুসলমানদের [বন্ধুত্ব] অতিক্রম করে, আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার কোনো হিসাবে নয়, অবশ্য এমন অবস্থায় [বাহ্যিক বন্ধুত্বের অনুমতি আছে] যখন তোমরা তাদের থেকে কোনো প্রকার আশঙ্কা কর, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন, আর আল্লাহরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٩)

(২৯) আপনি বলে দিন যদি তোমরা গোপন কর স্বীয় মনের বিষয়কে, অথবা তা প্রকাশ কর আল্লাহ তা জানেন, আর তিনি তো সবকিছু জানেন যা কিছু আসমানসমূহে আছে আর যা কিছু জমিনে আছে আর আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাও পূর্ণ রাখেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৭) تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ আপনি রাত্রকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ আর আপনি সজীবকে নির্জীব হতে বের করেন وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ আর নির্জীব বস্তুকে সজীব হতে বের করেন وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ আপনি যাকে ইচ্ছা রিজিক দান করেন بِغَيْرِ حِسَابٍ অপরিমিত।

(২৮) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ মুসলমানদের উচিত গ্রহণ না করা الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদেরকে اَوْلِيَآءَ বন্ধুরূপে مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের অতিক্রম করে وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ সে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার কোনো হিসাবে নয় اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً অবশ্য এমন অবস্থায় যখন তোমরা তাদের থেকে কোনো প্রকার আশঙ্কা কর وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ আর আল্লাহরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

(২৯) قُلْ আপনি বলে দিন اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ যদি তোমরা গোপন কর স্বীয় মনের বিষয়কে اَوْ تُبْدُوْهُ অথবা তা প্রকাশ কর يَعْلَمْهُ اللّٰهُ আল্লাহ তা জানেন وَيَعْلَمُ আর তিনি তো সবকিছু জানেন مَا فِي السَّمٰوٰتِ যা কিছু আসমানসমূহে আছে وَمَا فِي الْاَرْضِ আর যা কিছু জমিনে আছে وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাও পূর্ণ রাখেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৩) قوله اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল ﷺ ইহুদিদের পাঠশালায় গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তখন নাঈম ইবনে আমর এবং হারেছ ইবনে যায়েদ জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কোন দীনের উপর রয়েছেন? রাসূল ﷺ উত্তরে বলেন– "আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাতের উপর আছি" তখন তারা বলল– হযরত ইবরাহীম (আ.) তো ইহুদি ছিলেন। আপনি কেন ইহুদি হচ্ছেন না? তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা তাওরাত আনয়ন কর, তা আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবে। কিন্তু তারা তাওরাত উপস্থিত করতে অস্বীকার করে তখন অত্র আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। –[কাশ্শাফ]

দ্বিতীয় মত : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ -এর যুগে সম্ভ্রান্ত ইহুদি পরিবারের এক পুরুষ ও মহিলা জেনা করে, এর শাস্তির ব্যাপারে ইহুদিদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হয়। অবশেষে মীমাংসার ব্যাপারে রাসূলের নিকট প্রেরণ করা হয়। রাসূল ﷺ তাদেরকে ইহুদি ধর্মমত অনুযায়ী পাথর নিক্ষেপে হত্যার আদেশ দেন, তারা বলে তাওরাতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার আদেশ নেই। তখন রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের এবং আমার মাঝে তাওরাত ফয়সালা করবে। তোমাদের মাঝের বিদ্বান লোককে ডাক সে তা পড়ে শুনাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে সুরিয়াকে ডাকা হলো। সে তাওরাত পড়ার সময় দণ্ডবিধিগুলোর উপর হাত রেখে পড়তে থাকে। এটা দেখে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) রাসূল ﷺ-কে অবহিত করেন। রাসূল ﷺ তার হাত উঠিয়ে رَجْم [রজমের] আয়াত দেখতে পেলেন। ফলে রাসূল ﷺ পুনরায় পাথর নিক্ষপ করে হত্যার নির্দেশ দেন, তখন তাদেরকে পাথর নিক্ষপ করে হত্যা করা হলো। এতে ইহুদিরা অসন্তুষ্ট হয়ে তাওরাত মানতে অস্বীকার করে। তখন উক্ত আয়াতসমূহ মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন। -[জালালাইন কাশশাফ]

(২৬) قوله قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, ৫ম হিজরিতে খন্দকের (আহযাবের) যুদ্ধে পরিখা খননের সময় বিরাট আকৃতির একটি পাথর ভাঙ্গতে যে তিন বার আলোক রশ্মি বের হয়েছিল তাতে মহানবী ﷺ-কে রোম, পারস্য ও ইয়েমেনের রাজ প্রাসাদ দেখানো হয়েছিল। এবং হযরত জিবরাঈলের মাধ্যমে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, মুসলমানরা এগুলো বিজয় করবে। রাসূল ﷺ এ সুসংবাদ ঘোষণা করার পর মুনাফিক ও কাফেররা বলতে লাগল, মুহাম্মদ নিজের পা রাখার স্থান পাচ্ছেন না, ক্ষুধা-পিপাসায় মরছে। অথচ সাথীগণকে রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন। মহান আল্লাহ তাদের এই বিদ্রূপ ও অসভ্যতা খণ্ডনের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন। পরবর্তীতে মুসলমানরা হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে রোম ও পারস্য বিজয় করেন। –[কাশশাফ ও মা'রেফুল কুরআন]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় রোম ও পারস্য বিজয়ের কথা বলেছেন এতে মুনাফিক ও ইহুদিরা বিদ্রূপ করে বলতে লাগল, কোথায় মুহাম্মদ আর কোথায় রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য। তারা এদের তুলনায় কত বেশি শক্তিধর তাদেরকে পদানত করার দুঃস্বপ্ন দেখছে। তখন অত্র আয়াত নাজিল হয়। –[কাশ্শাফ]

(২৮) قوله لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বিখ্যাত সাহাবী রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, অত্র আয়াতটি মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এবং তার সহযোগীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তারা প্রকাশ্যে ইসলাম দেখাত আর গোপনে কুফরি করত, তারা ইহুদি ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব রাখত। মুসলমানদের খবরাখবর তাদের নিকট পৌঁছাত। এমনি তারা কামনা করত, ইহুদি ও মুশরিকরা যেন মুহাম্মদ -এর উপর বিজয় লাভ করে তখন আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন।

দ্বিতীয় মত : দ্বিতীয় মতানুযায়ী বুঝা যায় যে, এই আয়াতটি হযরত عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ [ওবাদা ইবনে সামেত (রা.)] সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর সাথে ইহুদিদের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি যখন তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার ইচ্ছা করেছিলেন তখনই আল্লাহ অত্র আয়াত নাজিল করে মুসলমানদেরকে এরূপ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। –[প্রান্তটীকা কাশ্শাফ]

اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا : কাদেরকে কিতাবের কিছু দেওয়া হয়েছে। ১. কাশশাফ গ্রন্থকারের মতে এর দ্বারা اَحْبَارُ الْيَهُوْدِ তথা ইহুদিদের পাদ্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

অথবা এখানে সেসব ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নবী করীম ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন করেনি। আয়াতের বাচনভঙ্গি দ্বারা সকল আহলে কিতাবকে বুঝায়, কিন্তু আয়াতটি লাঞ্ছনার স্থানে বর্ণিত হওয়ার কারণে এবং অন্যান্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে সকল আহলে কিতাব উদ্দেশ্য নয়।

نَصِيْب বা অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এর দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যা কাশশাফ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন।

১. اِنَّهُمْ حَصَّلُوْا نَصِيْبًا وَافِرًا مِنَ التَّوْرٰةِ অর্থাৎ তাওরাতের পরিপূর্ণ একটা অংশ তারা পেয়েছে। এখানে مِنَ الْكِتَابِ এর مِن টি بَيَان এর জন্য অথবা تَبْعِيْض অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. اَوْ حَصَّلُوْا مِنَ الْجِنْسِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ অথবা তারা অবতীর্ণ কতগুলো কিতাব পেয়েছে।

৩. اَوْ مِنَ اللَّوْحِ التَّوْرٰةِ وَهِيَ نَصِيْبٌ عَظِيْمٌ : অথবা তারা তাওরাতের কতগুলো তখত পেয়েছে, যা ছিল এক বড় অংশ।

كِتَابُ اللّٰهِ দ্বারা কোনটি উদ্দেশ্য : অধিকাংশের মতে كِتَابُ اللّٰهِ দ্বারা এখানে تَوْرٰة কে বুঝানো হয়েছে। আর হযরত হাসান বসরীর মতে كِتَابُ اللّٰهِ দ্বারা পবিত্র কুরআন উদ্দেশ্য। বস্তুত আয়াতের ভাবভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে كِتَابُ اللّٰهِ দ্বারা তাওরাত ই উদ্দেশ্য।

مَا هُوَ سَبَبُ قَوْلِ الْيَهُوْدِ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ

ইহুদিদের এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি যে, আমাদেরকে অগ্নি অল্প কয়দিন স্পর্শ করবে? মুফাসসিরীনদের মতে তাদের একথা বলার কারণ হলো–

- প্রথমতঃ তাদের দাবি হযরত মূসা (আ.)-এর দীন রহিত হয়নি। কাজেই তরা মুমিন। তাই তারা কিছু দিন আগুনে জ্বললেও পরে মুক্তি পাবে।
- দ্বিতীয়তঃ তারা বলত যে, আমরা যদি আগুনে জ্বলি ৪০ দিনের বেশি অগ্নিতে জ্বলব না, কেননা আমাদের পূর্বপুরুষরা ৪০ দিন গরুর বাছুরের পূজা করেছিল।

مَا هُوَ افْتِرَاءُهُمْ : **তাদের মনগড়া কথা কি?** তাদের কয়েকটি মনগড়া কথা রয়েছে–

১. لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ : তথা আমাদের হাতে গোনা অল্প কয়দিন ছাড়া আমাদের আজাব হবে না।

২. نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ اَحِبَّاءُهُ : অর্থাৎ আমরা আল্লাহর সন্তান ও একান্ত বন্ধু। অতএব আমাদের পাপ মার্জনীয়।

৩. نَحْنُ عَلَى الْحَقِّ وَاَنْتَ عَلَى بَاطِلٍ : আমরা সত্য ও ন্যায়ের উপর রয়েছি। আপনি [মুহাম্মদ ﷺ] ভ্রান্ত পথে রয়েছেন। কাজেই আমরা যা বলি বা যা করি তা সঠিক।

مُلْك বা রাজ্য দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

اَلْمُرَادُ بِالْمُلْكِ : এ স্থানের مُلْك বা রাজত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টি জগত তথা মহান আল্লাহ তা'আলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সব কিছু মিলেই রাজত্ব আর এই পূর্ণাঙ্গ রাজত্বের মালিক তিনিই এতে আর কারো কর্তৃত্ব চলে না।

اَلْمُرَادُ بِتُؤْتِي الْمُلْكَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ : এই দু'স্থানের مُلْك এক। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায়।

১. مُلْكُ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ তথা নবুয়ত ও রেসালাতের রাজত্ব এটা মহান আল্লাহর বিশেষ দান এটা একমাত্র মনোনীত ব্যক্তিবর্গকেই দিয়ে থাকেন।

২. مُلْكُ الدُّنْيَا তথা দুনিয়ার রাজত্ব : এই ভূমণ্ডলের অংশ বিশেষের রাজত্ব, : পুরো দুনিয়ার রাজত্ব কেউই পায়নি। সীমিত সময়ের জন্য সীমিত অংশের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব কাউকে দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন। যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন। আর কারো থেকে অপমানের সাথে কেড়ে নেন।

تَشْرِيْعُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ : এখানে بِيَدِكَ الْخَيْرُ বলা হয়েছে অথচ বলা দরকার ছিল بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ কিন্তু আয়াতে শুধু خَيْرٌ [কল্যাণ] শব্দ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো যে বিষয়কে কোনো ব্যক্তি অথবা জাতি অকল্যাণকর বা বিপজ্জনক মনে করে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা জাতির জন্য আপাত দৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক মনে হলেও পরিণামের সামগ্রিক ফলশ্রুতির দিক দিয়ে তা হয়তো মন্দ নয়, হতে পারে এক জাতির জন্য যা বিপদ অন্য জাতির জন্য তা সাক্ষাৎ রহমত। বস্তুত বিশ্ব স্রষ্টার রহস্য ও সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার দিক দিয়ে প্রত্যেক বস্তুই কল্যাণ। অকল্যাণ কিছুই নেই। -[মা'আরেফুল কুরআন]

قوله تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ **-এর ব্যাখ্যা** : মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমতাধর তিনি কোনো ঋতুতে রাতের অংশকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। যার ফলে রাত ছোট হয়ে দিন বড় হতে থাকে। যেমন গ্রীষ্মকাল। তখন দিন বাড়তে বাড়তে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত হয় আর রাত কমতে কমতে ৯ ঘণ্টায় এসে দাঁড়ায়।
আবার কোনো ঋতুতে দিনের অংশকে রাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। তখন দিন ছোট হয়ে রাত বড় হতে থাকে। যেমন শীতকাল এ ঋতুতে রাত ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত হয়। আর দিন কমে ৯ ঘণ্টায় নেমে আসে।

قوله وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ **-এর ব্যাখ্যা** : জীবন্ত হতে মৃত এবং মৃত হতে জীবন্তকে বের করার কয়েকটি ব্যাখ্যা মুফাসসিরগণ করেছেন-

১. জীবন্তকে মৃত হতে যেমন ডিম থেকে বাচ্চা অথবা বীর্য থেকে মানব সন্তান অথবা বীজ থেকে বৃক্ষ বের করেন এবং মৃতকে জীবন্ত হতে যেমন পশু পাখি থেকে ডিম, মানব থেকে বীর্য অথবা বৃক্ষ থেকে ফল ও শুষ্ক বীজ বের করেন।
২. আর ব্যাপক অর্থ নিলে, মৃত দ্বারা কাফের এবং জীবিত দ্বারা মুমিন উদ্দেশ্য হবে। যেমন আযর হতে হযরত ইবরাহীম (আ.) কে বের করেছেন, আর হযরত নূহ (আ.) থেকে কেনান [কাফের] কে বের করেছেন।
৩. অথবা মন্দ হতে ভালো এবং ভালো হতে মন্দ বের করা উদ্দেশ্য।
৪. অথবা পূর্ণ হতে অপূর্ণ এবং অপূর্ণ হতে পূর্ণ বের করা উদ্দেশ্য।
৫. অথবা বিদ্বানের ঔরসে মূর্খ এবং মূর্খের ঔরসে বিদ্বান পয়দা করেন।

لِمَا نَهَى اللّٰهُ اَنْ لَا يَتَّخِذَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ : আল্লাহ কেন মুমিনদেরকে নিষেধ করেছেন কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ অনেকগুলো আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এমনকি "সূরা মায়েদায়" ধমকের সুরে বলেছেন وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ -এর একটি বিশেষ কারণ হলো মানুষের জীবন সাধারণ জীব জানোয়ারের মতো নয়; বরং মানুষের জীবন একটি উদ্দেশ্যমূলক জীবন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও ইবাদতই মানব জীবনের লক্ষ্য। জগতের কাজ-কারবার, রাজ্যশাসন, রাজনীতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীনে, অতএব, যে মানব এ লক্ষ্যের বিরোধী সে মানবতার প্রধান শত্রু। কাজেই এই শত্রুর সাথে তার আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি কিছুতেই সম্ভব নয়। যার জীবন উদ্দেশ্যমূলক এবং যার বন্ধুত্ব, শত্রুতা, একাত্মতা, বিরোধিতা সবই এ উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্পিত। সে কি করে কাফেরের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে? এদিকে লক্ষ্য করেই রাসূল ﷺ বলেছেন- مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ তবে অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও উপকার সাধন যুদ্ধরত কাফের ছাড়া সবার বেলায় জায়েজ। এমনিভাবে বাহ্যিক সচ্চরিত্রতা ও সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার সবার সাথেই বৈধ।

কাফেরদের সাথে সম্পর্ক : কাফেরদের সাথে মুমিনদের ব্যবহার তিন প্রকার।

১. مُوَالَاتٌ **পারস্পরিক বন্ধুত্ব** : তথা কুফরির প্রতি সম্মত হয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। এটা কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নেই; বরং এটা একেবারে হারাম। যেমন- ইরশাদ হয়েছে-
يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ
২. مُدَارَاتٌ **বাহ্যিক সদ্ব্যবহার** : এটা তিন অবস্থায় জায়েজ।

ক. ক্ষতিরোধের লক্ষ্যে : তথা কাফেরদের সাথে সদ্ব্যবহার না করলে যদি কোনো ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে তবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা জায়েজ। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেছেন- اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً

খ. ধর্মীয় কল্যাণার্থে : অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে যদি তাদের হেদায়েতপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকে তবে তা জায়েজ নতুবা না জায়েজ।

গ. মেহমানদারী রক্ষার্থে : তথা যদি কোনো অমুসলিম মুসলমানদের মেহমান হয়। তখন মেহমান হিসেবে তার সম্মান করা জায়েজ।

৩. مُوَاسَاتٌ **সাহায্য করা :** হারবী কাফেরদের সাথে মুওয়াসাত জায়েজ; হারবী ভিন্ন অন্যান্য কাফেরের সাথে এটা করা জায়েজ নেই।

قوله وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ **-এর ব্যাখ্যা :** আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ স্বীয় সত্তা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন। যেহেতু ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের খাতিরে কাফেরদেরকে আন্তরিক বন্ধুত্বে আবদ্ধ করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা কারো জন্য উচিত নয়। বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্তরের সাথে, অন্তরের অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। কাজেই কেউ আন্তরিক বন্ধুত্ব রেখে মৌখিক অস্বীকৃতি প্রদান করলে তাও আল্লাহ জানবেন। সুতরাং সর্বাবস্থায় সব বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেছেন। -[মা'আরেফুল কুরআন]

পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত : এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বহু আয়াতে সংক্ষেপে এবং কোনো কোনো স্থানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আয়াতে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এসব দেখে শুনে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ অমুসলিমদের মনে সন্দেহ জাগে যে, মুসলমানদের ধর্মে কি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদাচার প্রদর্শনেরও কোনো অবকাশ নেই? পক্ষান্তরে এর বিপরীত কুরআনের অনেক আয়াত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনেক বাণী এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীগণের আচরণ থেকে অমুসলিমদের সাথে দয়া, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি এবং সমবেদনার নির্দেশও পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এমন সব ঘটনাবলিও প্রমাণিত দেখা যায়, যা অন্যান্য জাতির ইতিহাসে একান্তই বিরল। এসব দেখে একজন স্থূলবুদ্ধি মুসলমানও এক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলিতে পরস্পর বিরোধিতা ও সংঘর্ষ অনুভব করতে পারে। কিন্তু উপরিউক্ত উভয় প্রকার ধারণা সত্যিকার কুরআনি শিক্ষার প্রতি অগভীর মনোযোগ ও অসম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের ফল। কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে এতদসম্পর্কিত আয়াতগুলো একত্রিত করে গভীরভাবে চিন্তা করলে অমুসলিমদের অভিযোগও দূর হয়ে যায় এবং আয়াত ও হাদীসসমূহের মধ্যে কোনো প্রকার পরস্পর বিরোধিতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ উদ্দেশ্যে বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। এতে বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি ও সমবেদনার পারস্পরিক পার্থক্য এবং প্রত্যেকটির স্বরূপ জানা যাবে। আরো জানা যাবে তার কারণ কি কি?

দুই ব্যক্তি অথবা দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। একটি স্তর হলো আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার। এই স্তরের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হতে পারে, অমুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা কিছুতেই জায়েজ নয়।

দ্বিতীয়তঃ সমবেদনার স্তর। এর অর্থ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও উপকার করা। এই স্তরের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া সব অমুসলমানদের সাথেও স্থাপন করা জায়েজ।

সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছে- "যারা তোমাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে তোমাদের বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে দয়া ও ন্যায়বিচারের ব্যবহার করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিষেধ করেন না।"

তৃতীয়তঃ সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর। এর অর্থ বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধিত করা অথবা আতিথেয়তা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব অমুসলমানের সাথেই এটা জায়েজ। সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً বলে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা জায়েজ নয়। তবে যদি তুমি তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার লক্ষ্যে বন্ধুত্ব করতে চাও, তাহলে জায়েজ। সৌজন্য ভাবও বন্ধুত্বের হয়ে থাকে। এজন্য একে বন্ধুত্ব থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে। -[বয়ানুল কুরআন]

চতুর্থতঃ লেনদেনের স্তর। অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও সব অমুসলমানের সাথে জায়েজ; তবে এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয়, তবে জায়েজ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ, খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ফিকহবিদগণ এ কারণেই যুদ্ধরত কাফেরদের হাতে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন। তাদের চাকরি প্রদান করা অথবা তাদের কল-কারখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাকুরি করা সবই জায়েজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَتَوَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

يَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা মিথ্যাচার করে।

وُفِّيَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْفِيَةُ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- পুরোপুরি দেওয়া হবে।

تُؤْتِى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ- তুমি প্রদান কর।

لَايَتَّخِذِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى غائب معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- যেন সে গ্রহণ না করে।

تُخْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِخْفَاءُ মূলবর্ণ (خ . ف . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা গোপন কর।

تُبْدُوْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِبْدَاءُ মূলবর্ণ (ب . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তোমরা প্রকাশ কর।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ : এখানে واو টি حرف عطف আর وُفِّيَتْ হলো فعل এবং كُلُّ হলো مضاف আর نَفْس হলো مضاف اليه উভয়ে মিলে ذو الحال পরের অংশ واو টি حالية আর هم আর মুবতাদা لا يُظْلَمُوْنَ ফে'ল ও ضمير هم এ ফা'য়েল, উভয়ে মিলে جملة فعلية হয়ে كُلُّ نَفْس এর হাল এর হয়েছে। আর اسم موصول টি ما এর مَا كَسَبَتْ। এর وُفِّيَتْ হয়েছে نائب فاعل মিলে حال ও ذوالحال এবার كَسَبَتْ ফে'ল, যমীরে هى ফা'য়েল উভয়ে মিলে جملة فعلية হয়ে صلة এবার صلة ও موصول মিলে مفعول হলো। সুতরাং جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ মিলে مفعول ও نائب فاعل তার فعل টি وُفِّيَتْ হলো।

قوله تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ : এখানে تُؤْتِى ফে'ল যমীরে انت ফা'য়েল اَلْمُلْكَ প্রথম مفعول আর مَنْ ইসমে মাওসূল تَشَاءُ সিলাহ মিলে মাওসূল ও صلة মিলে জুমলা হয়ে দ্বিতীয় مفعول সুতরাং তার فعل ও فاعل মিলে فعل ও فاعل টি দুই مفعول নিয়ে জুমলায়ে فِعْلِيَّة হলো।

قوله اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল لَ তার اسم আর قَدِيْرٌ শিবহে ফে'ল عَلٰى হরফে জার كُلِّ মুযাফ شَىْءٍ মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো قدير-এর সাথে, قَدِيْرٌ তার متعلق নিয়ে শিবহে জুমলা হয়ে اِنَّ খবর اِنَّ সুতরাং তার اسم ও خبر মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

قوله وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ : اِلَى হরফে জার اَللّٰه শব্দটি مجرور উভয়ে মিলে متعلق হয়েছে উহ্য يَكُوْن এর সাথে তার خبر ও مبتدأ مؤخر নিয়ে জুমলা হয়ে خبر مقدم হলো। আর اَلْمَصِيْرُ টি مبتدأ مؤخر অতএব. متعلق مقدم মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হলো।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۛ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا ۢ بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ ۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

অনুবাদ : (৩০) যেদিন প্রত্যেকেই স্বীয় কৃত নেককাজসমূহ উপস্থাপিত পাবে এবং স্বীয় কৃত মন্দ কাজসমূহ [-ও], [সেদিন] এই কামনা করবে যে, কি চমৎকার হতো, যদি এই ব্যক্তি এবং সেই দিনের মধ্যে সুদূর ব্যবধান থাকত, আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন, এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি খুব দয়াশীল।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾

(৩১) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা রাখ, তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবেন, আর আল্লাহ খুব ক্ষমাশীল বড় করুণাময়।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

(৩২) আপনি বলে দিন, তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহ ও রাসূলের, অতঃপর যদি তারা ফিরে যায়, তবে [শুনে রাখুক] আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সাথে ভালোবাসা রাখেন না।

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾

(৩৩) নিশ্চয় আল্লাহ মনোনীত করেছেন [নবুয়তের জন্য] আদমকে, নূহকে এবং ইবরাহীমের সন্তানগণকে ও ইমরানের সন্তানদেরকে বিশ্বজগতের উপর;

ذُرِّيَّةً ۢ بَعْضُهَا مِنْ ۢ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾

(৩৪) তাঁরা একে অন্যের সন্তান, আর আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩০) يَوْمَ تَجِدُ যেদিন পাবে كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেকেই مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ স্বীয় কৃত নেককাজসমূহ مُّحْضَرًا উপস্থাপিত وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ এবং স্বীয় কৃত মন্দ কাজসমূহ تَوَدُّ [সেদিন] এই কামনা করবে যে لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ কি চমৎকার হতো, যদি এই ব্যক্তি এবং সেই দিনের মধ্যে থাকত اَمَدًا ۢ بَعِيْدًا সুদূর ব্যবধান وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ ۢ بِالْعِبَادِ এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি খুব দয়াশীল।

(৩১) قُلْ আপনি বলে দিন اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ যদি তোমরা আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা রাখ فَاتَّبِعُوْنِيْ তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবেন وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর আল্লাহ খুব ক্ষমাশীল বড় করুণাময়।

(৩২) قُلْ আপনি বলে দিন اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহ ও রাসূলের فَاِنْ تَوَلَّوْا অতঃপর যদি তারা ফিরে যায় فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ তবে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সাথে ভালোবাসা রাখেন না।

(৩৩) اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى নিশ্চয় আল্লাহ মনোনীত করেলেন اٰدَمَ وَنُوْحًا আদমকে, নূহকে وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ এবং ইবরাহীমের সন্তানগণকে وَاٰلَ عِمْرٰنَ ও ইমরানের সন্তানদেরকে عَلَى الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বজগতের উপর।

(৩৪) ذُرِّيَّةً ۢ بَعْضُهَا مِنْ ۢ بَعْضٍ তাঁরা একে অন্যের সন্তান وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

إِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٣٥)

(৩৫) যখন ইমরান পত্নী নিবেদন করল, হে আমার রব! আমি মানত করেছি আপনার জন্য এই সন্তান যা আমার উদরে রয়েছে, তাকে আজাদ রাখা হবে, সুতরাং আপনি আমা হতে গ্রহণ করুন, নিশ্চয় আপনি খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (٣٦)

(৩৬) অনন্তর যখন সে কন্যা প্রসব করল, বলল, হে আমার প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি, অথচ আল্লাহ সমধিক জানেন যা সে প্রসব করেছে, আর সে ছেলে [যা তিনি কামনা করেছিলেন] এই কন্যার সমকক্ষ নয়, আর আমি এই কন্যার নাম মারইয়াম রাখলাম আর আমি তাকে ও তার সন্তানগণকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করতেছি– বিতাড়িত শয়তান হতে।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)

(৩৭) অনন্তর তাঁকে তাঁর প্রতিপালক উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন, আর উত্তমরূপে তাঁর পরিবর্ধন সমাধা করলেন এবং যাকারিয়াকে তাঁর অভিভাবক করে দিলেন, যখনই যাকারিয়া উত্তম প্রকোষ্ঠে তাঁর নিকট আসতেন, তখন তাঁর নিকট পানাহারের বস্তুসমূহ পেতেন, এরূপ বলতেন, হে মারইয়াম! এই খাদ্যগুলো তোমার জন্য কোথা হতে এসেছে? তিনি বলতেন, তা আল্লাহর নিকট হতে এসেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অধিকার বিহনে রিজিক প্রদান করেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৫) اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ যখন ইমরান পত্নী নিবেদন করল رَبِّ হে আমার রব! اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ আমি মানত করেছি আপনার জন্য مَا فِىْ بَطْنِىْ এই সন্তান যা আমার উদরে রয়েছে। مُحَرَّرًا তাকে আজাদ রাখা হবে فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ সুতরাং আপনি আমা হতে গ্রহণ করুন اِنَّكَ اَنْتَ নিশ্চয় আপনি السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

(৩৬) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا অনন্তর যখন সে কন্যা প্রসব করল قَالَتْ বলল رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى হে আমার প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি وَاللّٰهُ اَعْلَمُ অথচ আল্লাহ সমধিক জানেন بِمَا وَضَعَتْ যা সে প্রসব করেছে وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى আর সে ছেলে [যা তিনি কামনা করেছিলেন] এই কন্যার সমকক্ষ নয় وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ আর আমি এই কন্যার নাম মারইয়াম রাখলাম وَاِنِّىْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ আর আমি তাকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি وَذُرِّيَّتَهَا ও তার সন্তানগণকে مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ বিতাড়িত শয়তান হতে।

(৩৭) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا অনন্তর তাঁকে তাঁর প্রতিপালক গ্রহণ করলেন بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ উত্তমরূপে وَاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا আর উত্তমরূপে তাঁর পরিবর্ধন সমাধা করলেন وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا এবং যাকারিয়াকে তাঁর অভিভাবক করে দিলেন كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا যখনই যাকারিয়া তাঁর নিকট আসতেন الْمِحْرَابَ উত্তম প্রকোষ্ঠে وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا তখন তাঁর নিকট পানাহারের বস্তুসমূহ পেতেন قَالَ এরূপ বলতেন يٰمَرْيَمُ হে মারইয়াম! اَنّٰى لَكِ هٰذَا এই খাদ্যগুলো তোমার জন্য কোথা হতে এসেছে? قَالَتْ তিনি বলতেন هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ তা আল্লাহর নিকট হতে এসেছে اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অধিকার বিহনে রিজিক প্রদান করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩১) قوله قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির এবং হাসান বসরী (র.) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ -এর যুগে কিছু লোক বলেছিল হে মুহাম্মদ! ﷺ আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আমরা আমাদের প্রভুকে ভালোবাসি। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। এর মর্ম হচ্ছে যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবি কর তবে আল্লাহর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিপূর্ণ অনুসরণের কষ্টি পাথরে এ দাবির যথার্থ প্রমাণ উপস্থাপিত কর। কেননা যে যত বেশি তার অনুসরণ করবে সে তত বেশি আল্লাহ পাকের প্রতি তার প্রেম ভালোবাসার প্রমাণ উপস্থাপন করবে। [আসবাবুন নুযূল পৃ. : ৬১]

যা হোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার পৌত্তলিকরা কাবা শরীফের ভিতরে মূর্তি স্থাপন করেছিল। আর বন্য মুরগির ডিম তার ভিতর ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং সেগুলোর কানে বালি ভরে রেখেছিল এবং সেগুলোকে সেজদা করছিল। প্রিয়নবী ﷺ সেখানে গমন করলেন এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং বললেন, কুরাইশগণ! তোমরা তোমাদের পিতামহ হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর তরিকার বিরোধিতা করছ। তখন কুরাইশরা বলেছিল আমরাতো আল্লাহর মহব্বতে মূর্তি পূজা করি, যাতে করে এতদ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন– ২২০-২২১] [আসবাবুন নুযূল পৃ. : ৬১]

(৩২) قوله قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** একবার কুরাইশগণ বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা আল্লাহ মনে করে এ মূর্তির পূজা করি না; বরং মূর্তিকে আমরা নাজাতের উপায় এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশকারী মনে করি। কিয়ামতের দিন তাদের সুপারিশের মাধ্যমে আমরা মুক্তি পাব। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

(৩৩) قوله إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, ইহুদিরা বলত, আমরা হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধর এবং আমরা তাদের দীনের উপরই রয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াত নাজিল করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে ইসলাম, নবুয়ত ও রিসালাত দ্বারা মনোনীত করে প্রাধান্য দান করেছেন। আর হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমরা তাদের দীনের বিপরীত রয়েছ। –[জালালাইন প্রান্তটীকা]

মহব্বতের অর্থ ও তার প্রকারভেদ

مَعْنَى الْمَحَبَّةِ : এর শাব্দিক অর্থ– مَيْلُ الْقَلْبِ إِلَى الشَّيْءِ لِتَصَوُّرِ كَمَالٍ فِيْهِ অর্থাৎ কোনো বস্তুর পরিপূর্ণতার কারণে তার দিকে অন্তর ধাবিত হওয়া। এটা স্রষ্টা এবং বান্দার দিক হতে দু'ভাবে বিভক্ত।

১. مَحَبَّةُ الْعَبْدِ لِلّٰهِ [**বান্দার ভালোবাসা আল্লাহর জন্য**] : আর তা হলো عِبَادَةٌ عَنْ إِرَادَةِ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্যের ইচ্ছা পোষণ করে [তা বাস্তবায়িত করা]।

২. مَحَبَّةُ اللّٰهِ لِلْعَبْدِ [**বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা**] : আর তার পরিচয় হলো عِبَادَةٌ عَنْ إِرَادَةِ إِيْصَالِ الْكَمَالَاتِ وَالْخَيْرَاتِ إِلَيْهِ অর্থাৎ বান্দার দিকে কল্যাণ ও পরিপূর্ণতার বিষয়াবলি পৌছানো।

দ্বিতীয় ভাগ : সাধারণ মহব্বত বা ভালোবাসা তিন ভাগে বিভক্ত।

১. طَبْعِيٌّ [**স্বভাবগত ভালোবাসা**] : যা মানুষের ইচ্ছাধীন নয় এবং ক্ষমতারও অধীন নয়, এমনিতেই থাকে, যেমন সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু ইত্যাদির মহব্বত।

২. إِيْمَانِيٌّ [**বিশ্বাসগত ভালোবাসা**] : তথা সকল মহব্বতের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত প্রাধান্য দেওয়া, যেমনি হাদীসে এসেছে– لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

৩. عَقْلِيٌّ [**যুক্তিসিদ্ধ ভালোবাসা**] : যে ভালোবাসা স্বভাবপ্রসূত নয়; বরং জ্ঞান ও যুক্তিসিদ্ধ তথা যুক্তি ও জ্ঞান তাকে ভালোবাসতে বলে। যেমন তিক্ত ঔষধ, মানুষের মন স্বাভাবিকভাবে তা সেবা করতে চায় না। কিন্তু সুস্থতা অর্জনের লক্ষ্যে জ্ঞান তা সেবন করার নির্দেশ দেয়।

আল্লাহর জন্য বান্দার ভালোবাসার উদ্দেশ্য : কিছু পূর্বে এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে তথা আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করা, আল্লাহর ভালোবাসা শুধুমাত্র মুখের দাবি নয়; বরং কার্যে পরিণত করার বিষয়। দুনিয়ার জীবনে মানব জীবনের সার্বিক বিষয়াবলি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী চালানোকেই আল্লাহর ভালোবাসা বলে।

كَيْفَ يُحِبُّ اللّٰهُ الْعَبْدَ কিভাবে আল্লাহ বান্দাকে ভালোবাসেন : আল্লাহর ভালোবাসার অর্থ তার অনুগ্রহ তথা দুনিয়াতে বান্দাকে তার মর্জি মতো চলার তৌফিক প্রদান করা। বান্দার পাপ মোচন করা এবং তার ইবাদতে মশগুল রাখা ইত্যাদিই মহান আল্লাহর মহব্বত।

عِمْرَانْ দ্বারা কোন عِمْرَانْ উদ্দেশ্য : এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. কিছু সংখ্যকের মতে এই عِمْرَانْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عِمْرَانُ بْنُ يَصْهَرْ [ইমরান ইবনে ইয়াসহার]। যিনি হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আ.)-এর পিতা। তখন اٰلِ عِمْرَانْ দ্বারা هَارُوْن ও مُوْسٰى নবীদ্বয় উদ্দেশ্য।

২. কিছু সংখ্যকের মতে এই عِمْرَانْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عِمْرَانُ بْنُ مَاثَانْ [ইমরান ইবনে মাছান] যিনি ছিলেন হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতা। তখন اٰلِ عِمْرَانْ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে হযরত ঈসা (আ.)। এই মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

এখানে উল্লেখ্য যে, উভয় ইমরানের মাঝে (১৮০০) আঠারশত বৎসরের ব্যবধান।

হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা : হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পিতার নাম ছিল ইমরান ইবনে মাছান। তিনি ছিলেন তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম, বনী ইসরাঈলের সর্দার এবং পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসের ইমাম। আর মায়ের নাম ছিল হান্না বিনতে ফাকূয (حَنَّةُ بِنْتُ فَاقُوْذ) তিনি ছিলেন বন্ধ্যা। একদা তিনি একটি গাছের ছায়ায় বসা অবস্থায় দেখতে পেলেন যে, একটি পাখি তার ছানাকে আহার খাওয়াচ্ছেন। ফলে তাঁর অন্তরে সন্তানের কামনা সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি আল্লাহর নিকট সন্তানের প্রার্থনা করলেন। যাকে তিনি পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করবেন। মহান আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করলেন।

মারইয়ামের জন্ম ও হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে : মহান আল্লাহ বিবি হান্নাকে একটি কন্যা সন্তান দান করেন। যার নাম রাখলেন 'মারইয়াম' হান্না গর্ভাবস্থায় হযরত ইমরান মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফলে তাঁর মানত অনুযায়ী জন্মের পর, মারইয়ামকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য নিয়ে যান। ইমাম ও সর্দারের কন্যা হিসেবে তাকে সবাই প্রতিপালন করতে চাইলেন। হযরত জাকারিয়া (আ.) বললেন, আমি তার খালু, তার খালা আমার গৃহে, খালা মায়ের ন্যায়। অতএব আমিই দায়িত্ব পাওয়ার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু তার এ যুক্তি কেউ মানল না। অবশেষে লটারীর মাধ্যমে হযরত জাকারিয়া (আ.) বিজয়ী হয়ে তাঁর অভিভাকত্বের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি তাকে বায়তুল মাকদিসের একটি কক্ষে রেখে প্রতিপালন করেন। –[কাশশাফ, বয়ানুল কুরআন]

مُحَرَّرًا দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত মারইয়াম (আ.) কোনো বাঁদি ছিলেন না যে, তাঁকে স্বাধীন করতে হবে; বরং مُحَرَّرًا [মুহাররারান] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বায়তুল মাকদিসের খেদমত করার জন্য দুনিয়ার সমস্ত কাজ হতে মুক্ত রাখা, তথা সে অন্য কোনো কাজ করবে না, শুধু পবিত্র গৃহের তত্ত্বাবধানেই থাকবে।

ইমাম শা'বী (র.) বলেন, মুহাররার অর্থ مُخْلِصًا لِلْعِبَادَةِ তথা বিশেষভাবে ইবাদতের কাজে লিপ্ত রাখা। অন্য কোনো কাজে মশগুল না রাখা।

কিভাবে সন্তানকে উৎসর্গ করা হয় : আমাদের শরিয়তে সন্তানকে এরূপ উৎসর্গ করা জায়েজ নেই। কিন্তু বনী ইসরাঈলদের মাঝে এরূপ মানত জায়েজ ছিল। তবে এটা ছিল ছেলে সন্তানের বেলায় মেয়ে সন্তানের উপর ছিল না। কিন্তু বিবি মারইয়ামের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। হান্নার দোয়াকে কবুল করেছেন বিধায় এরূপ হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলরা এরূপ মানত করত। আর যখন ছেলে প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে যেত, তখন তাকে বায়তুল মাকদিসের খেদমত করার বা না করার সুযোগ দেওয়া হতো।

قوله وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ -এর বিশ্লেষণ : এটি কার قَوْل এ বিষয়ে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মতে এটি মহান আল্লাহর কথা। তখন ت. কে সাকিন করে পড়া হবে মারইয়ামের সম্মানার্থে একথা বলা হয়েছে, কেননা হান্না কি রত্ন প্রসব করেছেন সে জানে না, সে যে বিশ্ববাসীর নিকট একটি সুউজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হবে, তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ت. কে যের দিয়ে পড়েছেন। এতেও আল্লাহর উক্তি বলে বুঝা যায়। তথা, তুমি যা প্রসব করেছ, তা আল্লাহ ভালো কারেই জানেন।

২. কিছু সংখ্যক ت. কে رَفْع বা পেশ দিয়ে পড়েছেন। তখন এটা বিবি হান্নার উক্তি হবে। সে অল্লাহর দরবারে অজুহাত পেশ করেছেন ; যে আমি কি চেয়েছি আর কি প্রসব করেছি আল্লাহই ভালো জানেন।

قوله وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى -এর বিশ্লেষণ : এখানে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. কিছু সংখ্যকের মতে এটা মহান আল্লাহর উক্তি হান্নাকে সান্ত্বনা দান করতে গিয়ে একথা বলেন। তখন এর ব্যাখ্যা হবে–
   ক. আল্লাহ তা'আলা এ কন্যা হতে যে কাজ নিবেন তা অন্য কোনো পুরুষ সন্তান হতে নিবেন না। কাজেই কোনো পুরুষ এই মেয়ের ন্যায় নয়।
   খ. অথবা, এই কন্যার যে সম্মান ও মরতবা হবে কোনো ছেলের এই মর্যাদা হবে না।
   গ. অথবা, যে পুত্র হান্না চেয়েছিল তার চাইতে এ কন্যাকে তার চেয়ে যোগ্য বানানো হয়েছে।

২. আর কিছু সংখ্যকের মতে এই উক্তি হযরত হান্নার। তিনি দুঃখবোধ করে এই উক্তিটি করেছিলেন তখন অর্থ– হবে।
   ক. খেদমতের জন্য পুরুষ যেমন শক্তিমান। মেয়েরা তেমন নয়। কাজেই ছেলে মেয়ের মতো নয়।
   খ. মসজিদের খেদমতের জন্য পুরুষরা যেমন সর্বদা পাক-পবিত্র থাকতে পারে মেয়েরা তা পারে না।
   গ. মসজিদের খেদমতে মহিলাদের ব্যাপারে সামাজিক দোষ-ক্রটি বিদ্যমান। কিন্তু পুরুষের ব্যাপারে তা নেই।

محراب দ্বারা উদ্দেশ্য : মেহরাব বলতে সাধারণত আমরা ইমাম সাহেব দাঁড়াবার স্থানকে বুঝি। কিন্তু এখানে তা বুঝানো হয়নি; বরং তাদের ধর্মে উপাসনালয় সংলগ্ন উঁচু স্থানে নির্মিত প্রকোষ্ঠকে মেহরাব বলা হয়। যেখানে পুরোহিতগণ অবস্থান করেন। হযরহ জাকারিয়া (আ.) বিবি মারইয়ামের জন্য এরূপ একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করেন। যে স্থানে সিঁড়ি ছাড়া কেউ পৌছতে পারতো না। তিনি সময় মতো খাবার দাবার পৌছে দিয়ে কক্ষ বন্ধ করে চলে আসতেন। তিনি ছাড়া অন্য কারো তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না।

কেউ কেউ মেহরাব দ্বারা মসজিদ উদ্দেশ্য নেন। আবার কেউ বলেন মসজিদের ভিতরের একটি কক্ষ যাতে বিবি মারইয়াম ছিলেন তাই মেহরাব।

কেউ বলেন বায়তুল মাকদিসের সম্মুখস্থ উঁচু স্থানই মেহরাব। –[কাশশাফ, বয়ানুল কুরআন]

وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا রিজিক দ্বারা সাধারণ খাবারই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে রিজিক দ্বারা বেহেশতী ফল-মূল বুঝানো হয়েছে। হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকটে বেমওসুমী ফল-মূল পাওয়া যেত। যেমন গ্রীষ্মের ফল শীতে, শীতের ফল গ্রীষ্মে আসত। এটা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর কারামত। হযরত জাকারিয়া (আ.) ছাড়া কারো তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না। তিনি ৭টি দরজা বন্ধ করে চলে যেতেন। কিন্তু এ ফল-মূল নিয়মিতই পৌছত। হযরত জাকারিয়া (আ.) এ দৃশ্য বার বার দেখে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে বসলেন। হযরত মারইয়াম (আ.) জবাব দিলেন যে– هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ এটা আল্লাহর পক্ষ হতে।

عِمْرَانُ -এর স্ত্রী কে ছিলেন? হযরত ইমরানের স্ত্রীর নাম হলো حَنَّةُ بِنْتُ فَاقُوْذ [হান্না বিনতে ফাকূয]। তার গর্ভে হযরত মারইয়াম (আ.) জন্ম গ্রহণ করেন আর হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল اِيْشَاعُ بِنْتُ فَاقُوْذ [ঈশা বিনতে ফাকূয]।

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত ইমরানের প্রথমে فَاقُوْذ ফাকূযকে বিয়ে করেন। এ সময়ে হান্না তার কোলে ছিল। তথা ফাকূযের অন্য ঘরের [প্রথম স্বামীর] সন্তান ছিল। এরপর عِمْرَانُ এর ঔরসে اِيْشَاعُ জন্ম গ্রহণ করেন। فَاقُوْذ-এর মৃত্যুর পর পুনরায় ইমরান (আ.) হান্নাকে বিয়ে করেন যা তাদের শরিয়তে তথা رَبِيْبَة কে বিয়ে করা জায়েজ ছিল। মায়ের দিক থেকে ঈশা হান্নার বোন তাই মারইয়ামের খালা হয়েছে। আর মারইয়ামের পিতার দিক থেকে ঈশা মারইয়ামের বোন।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَوَدُّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْمَوَدَّةُ মূলবর্ণ (و . د . د) জিনস মুরাক্কাব مضاعف ثلاثى এবং مثال واوى অর্থ- সে কামনা করে।

اَطِيْعُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা অনুসরণ কর।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّيُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

اصْطَفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِصْطِفَاءُ মূলবর্ণ (ص . ف . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তিনি নির্বাচন করেছেন।

مُحَرَّرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْرِيْرُ মূলবর্ণ (ح . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আজাদকৃত।

سَمَّيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْمِيَةُ মূলবর্ণ (س . م . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- আমি নাম রেখেছি।

اُعِيْذُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعَاذَةُ মূলবর্ণ (ع . و . ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْمِحْرَابُ : শব্দটি একবচন; বহুবচন محاريب অর্থ- স্থান, কক্ষ, ঘরের উত্তম স্থান।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ : এখানে اِنَّ টি حرف مشبه بالفعل আর اللّٰهَ শব্দটি اسم ان এবং لَا يُحِبُّ টি فعل যমীরে هو ফা'য়েল الْكٰفِرِيْنَ পদটি مفعول এবার فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে خبر ان হয়েছে। সুতরাং اسم ان ও خبر ان মিলে جملة اسمية হয়েছে।

قوله اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ : এখানে اِنَّ পদটি حرف مشبه بالفعل আর اللّٰهَ শব্দটি اسم اِنَّ এবং اصْطَفٰى ফে'ল, যমীরে هُوَ ফা'য়েল اٰدَمَ হলো معطوف عليه আর واو হলো حرف عطف এবং نُوْحًا হলো معطوف এরপর واو হরফে আতফ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে হয়েছে معطوف এবং واو। হরফে আতফ, اٰلَ عِمْرٰنَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাতূফ, কাজেই معطوف عليه তার তিন معطوف মিলে مفعول হয়েছে। আর عَلٰى হরফে জার الْعٰلَمِيْنَ মাজরূর। উভয় মিলে متعلق হলো اِصْطَفٰى-এর সাথে। اِصْطَفٰى ফে'ল তার ফা'য়েল, মাফঊল ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে خبر ان হলো সুতরাং اسم اِنَّ ও خبر ان মিলে جُمْلَةً اِسْمِيَّةً হলো।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿۳۸﴾

অনুবাদ : (৩৮) তখন যাকারিয়া প্রার্থনা করলেন স্বীয় প্রভুর নিকট বললেন, হে আমার রব! দান করুন আমাকে খাছ আপনার নিকট হতে কোনো উত্তম সন্তান, নিশ্চয় আপনি খুব প্রার্থনা শ্রবণকারী।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا ۢ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۳۹﴾

(৩৯) অতঃপর তাঁকে ফেরেশতাগণ ডেকে বললেন, যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন- আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়ার, তাঁর অবস্থা এই হবে যে, তিনি সমর্থনকারী হবেন, 'কালিমাতুল্লাহর' [নবুয়তে ঈসার] এবং সরদার হবেন এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে খুব দমনকারী হবেন আর নবীও হবেন এবং উচ্চস্তরের সুসভ্যও হবেন।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۴۰﴾

(৪০) যাকারিয়া আরজ করলেন, হে আমার রব! আমার পুত্র হবে কি করে? অথচ আমার বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে আমার স্ত্রীও প্রসবের যোগ্য রয়নি, আল্লাহ বললেন, এই অবস্থাতেই পুত্র হবে, কেননা আল্লাহ যা চান করেন।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿۴۱﴾

(৪১) তিনি আরজ করলেন, হে আমার রব! আমার জন্য কোনো লক্ষণ নির্ধারণ করুন, আল্লাহ বললেন, তোমার লক্ষণ এটাই যে, তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে সমর্থ হবে না তিন দিন পর্যন্ত ইশারা ব্যতীত, আর স্বীয় প্রভুর প্রচুর পরিমাণে জিকির করবে আর তাসবীহ পাঠ কর অপরাহ্নে ও পূর্বাহ্নে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৮) هُنَالِكَ তখন دَعَا زَكَرِيَّا যাকারিয়া প্রার্থনা করলেন رَبَّهٗ স্বীয় প্রভুর নিকট قَالَ বললেন رَبِّ হে আমার রব! هَبْ لِيْ দান করুন আমাকে مِنْ لَّدُنْكَ খাছ আপনার নিকট হতে ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً কোনো উত্তম সন্তান اِنَّكَ নিশ্চয় আপনি سَمِيْعُ الدُّعَآءِ খুব প্রার্থনা শ্রবণকারী।

(৩৯) فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ অতঃপর তাঁকে ফেরেশতাগণ ডেকে বললেন وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন- اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন بِيَحْيٰى ইয়াহইয়ার مُصَدِّقًا তাঁর অবস্থা এই হবে যে, তিনি সমর্থনকারী হবেন بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ 'কালিমাতুল্লাহর' [নবুয়তে ঈসার] وَسَيِّدًا এবং সরদার হবেন وَّحَصُوْرًا এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে খুব দমনকারী হবেন وَّنَبِيًّا আর নবীও হবেন مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ এবং উচ্চস্তরের সুসভ্যও হবেন।

(৪০) قَالَ যাকারিয়া আরজ করলেন رَبِّ হে আমার রব! اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ আমার পুত্র হবে কি করে? وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ অথচ আমার বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ আমার স্ত্রীও প্রসবের যোগ্য রয়নি قَالَ আল্লাহ বললেন كَذٰلِكَ এই অবস্থাতেই পুত্র হবে اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ কেননা আল্লাহ যা চান করেন।

(৪১) قَالَ رَبِّ তিনি আরজ করলেন, হে আমার রব! اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً আমার জন্য কোনো লক্ষণ নির্ধারণ করুন قَالَ আল্লাহ বললেন اٰيَتُكَ তোমার লক্ষণ এটাই যে اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে সমর্থ হবে না ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ তিন দিন পর্যন্ত اِلَّا رَمْزًا ইশারা ব্যতীত وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا, আর স্বীয় প্রভুর প্রচুর পরিমাণে জিকির করবে وَّسَبِّحْ আর তাসবীহ পাঠ কর بِالْعَشِيِّ অপরাহ্নে وَالْاِبْكَارِ ও পূর্বাহ্নে।

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ (٤٢)

(৪২) আর যখন ফেরেশতাগণ বললেন, হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন বিশ্বজগতের নারীগণের মোকাবিলায়।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (٤٣)

(৪৩) হে মারইয়াম! আনুগত্য করতে থাক স্বীয় রবের এবং সেজদা করতে থাক আর রুকূ' করতে থাক রুকূ'কারীদের সঙ্গে।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ (٤٤)

(৪৪) এই ইতিবৃত্ত গায়বি সংবাদসমূহের অন্যতম, আমি তার ওহী প্রেরণ করছি আপনার নিকট, আপনি তখন তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা স্ব-স্ব কলমসমূহ নিক্ষেপ করছিল এই উদ্দেশ্যে যে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মারইয়ামের প্রতিপালন করবে, আর আপনি তখনো তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা পরস্পর মতবিরোধ করছিল।

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (٤٥)

(৪৫) [ঐ সময়কে স্মরণ কর] যখন ফেরেশতাগণ বললেন, হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন একটি কালেমার যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে, তাঁর নাম হবে- মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, সম্মানিত হবেন ইহলোক ও পরলোকে এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪২) وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ আর যখন ফেরেশতাগণ বললেন يٰمَرْيَمُ হে মারইয়াম! اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন وَطَهَّرَكِ এবং পবিত্র করেছেন وَاصْطَفٰىكِ এবং নির্বাচিত করেছেন عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বজগতের নারীগণের মোকাবিলায়।

(৪৩) يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ হে মারইয়াম! আনুগত্য করতে থাক لِرَبِّكِ স্বীয় রবের وَاسْجُدِىْ এবং সেজদা করতে থাক وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ আর রুকূ' করতে থাক রুকূ'কারীদের সঙ্গে।

(৪৪) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ এই ইতিবৃত্ত গায়বি সংবাদসমূহের অন্যতম نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ আমি তার ওহী প্রেরণ করছি আপনার নিকট وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ আপনি তখন তাদের নিকট ছিলেন না اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ যখন তারা স্ব-স্ব কলমসমূহ নিক্ষেপ করছিল এই উদ্দেশ্যে যে اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ তাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মারইয়ামের প্রতিপালন করবে وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ আপনি তখনো তাদের নিকট ছিলেন না اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ যখন তারা পরস্পর মতবিরোধ করছিল।

(৪৫) اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ যখন ফেরেশতাগণ বললেন يٰمَرْيَمُ হে মারইয়াম! اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ একটি কালেমার যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ তাঁর নাম হবে- মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ সম্মানিত হবেন ইহলোকে ও পরলোকে وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা : হযরত যাকারিয়া (আ.) বনী ইসরাঈলদের অন্যতম খ্যাতিমান নবী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল 'আযম'। তিনি হযরত ইমরান (আ.)-এর মৃত্যুর পর বায়তুল মাকদিসের ইমাম ও মোতাওয়াল্লী নির্বাচিত হন। সম্পর্কের দিক হতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা মারইয়াম (আ.)-এর খালু ছিলেন, হযরত মারইয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব তাঁর উপরেই অর্পিত ছিল। একদা হযরত মারইয়ামের কক্ষে বে-মওসুমি ফল দেখে, মহান আল্লাহর অসীম কুদরত প্রত্যক্ষ করে অতি বৃদ্ধ বয়সে তার একটি সন্তানের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে। ফলে ঐ স্থানেই মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) কে দান করেন।
আল্লাহর কুদরতে হযরত ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করলে বনী ইসরাঈলরা তাঁর [যাকারিয়ার] উপর অপবাদ আরোপ করে, অবশেষে তারা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ড করে ফেলেন। কথিত আছে যে, তাকে বায়তুল মাকদিসের 'ছাখরা' নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। 'সূরা মারইয়ামে' তার অনেক গুণের কথা বর্ণিত আছে।

قوله هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ : **এর ব্যাখ্যা :** হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা এমনকি উভয়ের বয়সও একশতের কাছাকাছি। এ সময়ে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করার সাহসও করতেন না। কিন্তু যখন দেখতে পেলেন যে, হযরত মারইয়ামকে আল্লাহ মওসুম ছাড়াই ফল দান করেছেন। তখনই তাঁর মনে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল এবং সন্তানের জন্য প্রার্থনা করে বসলেন, মহান আল্লাহ তাঁর মিনতিকে কবুল করে নিলেন এবং তাকে ইয়াহইয়া নামক সন্তান দান করলেন যিনি পূত-পবিত্র, সর্দার জিতেন্দ্রিয় ও শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন। –[মা'রেফুল কুরআন]

كَلِمَةُ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য : كَلِمَةُ اللّٰهِ -এর অর্থ হলো আল্লাহর কথা। কিন্তু এর উদ্দেশ্য বনী ইসরাঈলদের সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আ.)। কেননা–

১. তিনি আল্লাহর এক كَلِمَة বা শব্দ كُنْ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন।

২. তিনি শিশু অবস্থায় কথা বলেছেন বলেই তাকে كَلِمَةُ اللّٰهِ বলা হয়।

৩. অথবা كَلِمَةُ اللّٰهِ হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম। যেমন মানুষের নাম রাখা হয় فَضْلُ اللّٰهِ - عَبْدُ اللّٰهِ কেউ কেউ বলেন, এখানে كَلِمَةُ اللّٰهِ দ্বারা সেই কিতাব উদ্দেশ্য। যা আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে।

سَيِّدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : سَيِّدٌ শব্দটির অর্থ নেতা বা সর্দার যিনি জাতির নেতৃত্ব প্রদান করেন তাকে سَيِّدٌ বলা হয়। তবে এর আরো কয়েকটি অর্থ রয়েছে–

১. سَيِّدٌ অর্থ حَلِيْمٌ বা ধৈর্যশীল।

২. ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।

৩. ফকীহ ও জ্ঞানী

حَصُوْرٌ এর অর্থ : حَصُوْرٌ টি حَصْرٌ হতে গৃহীত। এর অর্থ আবদ্ধকারী, এর কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

১. যিনি মহিলাদের নিকটবর্তী হন না সহবাসের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও।

২. কারো মতে যিনি জনগণের সাথে জুয়া খেলায় লিপ্ত হন না।

৩. কারো মতে যিনি খেল-তামাশায় মনোযোগ দেন না।

মোটকথা হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর অন্তরে পরকালের চিন্তা প্রবল হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভব করতেন না। এজন্য তাকে حَصُوْرٌ বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, যার সহবাসের ক্ষমতা নেই তাঁকে حَصُوْرٌ বলা হয় না।

তিন দিন কথা না বলার কারণ : মানুষের সাথে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর কথা বন্ধ রেখে কিছু সময়ের জন্য স্বীয় জবানকে আল্লাহর জিকিরের জন্য খাস করে নেওয়া। যাতে এই অসীম নিয়ামতের শোকরগুজারি হয়ে যায়। এজন্যই পরবর্তী আয়াতে সকাল-সন্ধ্যায় জিকির ও তাসবীহ আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

رَمْز এর অর্থ কি? رَمْزٌ একবচন, বহুবচনে رُمُوزٌ শাব্দিক অর্থ হলো اَلتَّحَرُّكُ বা নড়াচড়া করা, যখন নড়াচড়া করে তখন اِرْتَمَزَ বলা হয়। এজন্যই নদীকে رَامُوزٌ বলা হয়।

পরিভাষায় এর পরিচয় হলো : হাত, মাথা বা অন্য কোনো অঙ্গ দ্বারা ইশারা করা। যেমনভাবে اَخْرَسُ বা মূক ব্যক্তি বলে থাকে। –[কাশশাফ]।

مَلٰئِكَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : مَلٰئِكَةٌ দ্বারা সাধারণত সকল ফেরেশতাকে বুঝানো হয়। কিন্তু এখানে مَلٰئِكَةٌ দ্বারা ফেরেশতাদের সর্দার আল্লাহর বাণী বাহক হযরত জিবরাঈল (আ.) কে বুঝানো হয়েছে।

কিভাবে আল্লাহ মারইয়ামকে নির্বাচিত করেছেন : এর ধরন কয়েকটি হতে পারে।

১. তিনি ছাড়া আর কোনো নারীকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য গ্রহণ করা হয়নি।
২. সরাসরি ফেরেশতাগণ তাকে লক্ষ্য করে আল্লাহর সংবাদ শুনিয়েছেন। আর কোনো মহিলার ব্যাপারে এরূপ ঘটেনি।
২. বিনা স্বামীতে আল্লাহ তাকে একজন উঁচু মর্যাদার রাসূল দান করেছেন।
৪. ইবাদতের জন্য তাঁকেই বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন।
৫. শিশু অবস্থায়ই হযরত ঈসা (আ.) দ্বারা মারইয়ামের সতীত্বের স্বীকৃতি পেশ করা হয়েছে।
৬. একজন সম্মানিত নবীর মাধ্যমে পবিত্র ঘরে রেখে তাকে লালন-পালন করেছেন।

طَهَّرَكِ -এর অর্থ কি আল্লাহ আপনাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করেছেন। এ বাক্যটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

১. মহান আল্লাহ তাঁকে পুরুষের স্পর্শ হতে পবিত্র রেখেছেন।
২. মন্দ ও খারাপ কার্য হতে মুক্ত রেখেছেন।
৩. কুফর, শিরক থেকে পবিত্র রেখেছেন।
৪. ইহুদিদের অপবাদ [জেনাকারিণী] থেকে শিশু সন্তানের মাধ্যমে পবিত্র রেখেছেন।

মারইয়াম কি নবী ছিলেন? ওলামায়ে কেরাম সর্বসম্মত যে, কোনো মহিলা নবী ছিলেন না যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى এখানে رِجَالٌ তথা পুরুষদের সাথে রেসালাতকে খাস করা হয়েছে। কাজেই হযরত মারইয়াম (আ.) নবী নন, তবে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন وَلِىٌّ [ওলী] হওয়ার কারণে হয়েছে।

لِمَ لَمْ يَقُلْ وَاسْجُدِىْ مَعَ السّٰجِدِيْنَ : مَعَ السّٰجِدِيْنَ কেন বলেননি অথচ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ বলেছেন এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রুকূ' করার ব্যাপারে মানুষ সাধারণত বেশি যত্নবান হয় না; বরং সামান্য একটু ঝুঁকেই সোজা হয়ে যায়। এ ধরনের রুকূ' পরিপূর্ণ হয় না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা مَعَ الرّٰكِعِيْنَ যুক্ত করে নমুনা বলে দিয়েছেন যে, তোমরা রুকূ' পুরাপুরি রুকুকারীদের মতো হওয়া আবশ্যক। –[মা'আরেফুল কুরআন]

কলম নিক্ষেপের ঘটনা : হযরত মারইয়ামের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা হযরত ইমরান মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া বিবি হান্নার মান্নত অনুযায়ী মারইয়ামের জন্মের পর তাঁকে বায়তুল মাকাদিসে প্রেরণ করেন একদিকে সম্মানিত সর্দার ও ইমামের কন্যা অন্যদিকে মাতা কর্তৃক বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলি সকলকে তাঁর দায়িত্ব নিতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে এ বিষয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া বেঁধে যায়। তখন তার সুষ্ঠু মীমাংসার শর্ত স্থির করে সকলেই জর্দান নদীর স্রোতে তাদের স্ব-স্ব তাওরাত লিখার কলম নিক্ষেপ করলেন। সকলের কলম স্রোতে ভেসে গেল। শুধু হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর কলমই স্রোতের বিপরীত দিকে ধাবিত হলো। তাই পূর্বে নির্ধারিত শর্তানুসারে হযরত যাকারিয়া (আ.)-ই হযরত মারইয়াম (আ.)-এর লালন-পালনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন। আল্লাহ তা'আলা এখানে সেই অদৃশ্য ঘটনাই রাসূল ﷺ কে অবহিত করেন।

কলমসমূহ দ্বারা কি উদ্দেশ্য : মুফাসসিরীনে কেরামের অধিকাংশই এমত পোষণ করেছেন যে, এখানে اَقْلَامٌ কলমসমূহ দ্বারা ঐ কলমগুলোই উদ্দেশ্য যেগুলোর সাহায্যে তারা তাওরাত লিখত।

তবে কেউ কেউ اَزْلَامٌ -এর দ্বারা তীর উদ্দেশ্য নিয়েছেন যা জুয়া খেলার মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

صُوْرَةُ الْوَحْي [ওহীর পদ্ধতি] :

১. فِي الْمَنَامِ সত্য ও সঠিক স্বপ্ন যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্বপ্ন যাতে তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করতে দেখেছিলেন।

২. اَلنَّفْثُ فِي الرُّوْعِ : কোনো মাধ্যম ব্যতীত অন্তকরণে ওহী ঢেলে দেওয়া যেমনি ইরশাদ হয়েছে– إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوْعِيْ

৩. مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ : পর্দার আড়াল হতে সরাসরি আল্লাহ কথা বলেন, যেমন হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে শুনেছেন।

৪. بِوَاسِطَةِ جِبْرَائِيْلَ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ ওহী প্রেরণ করেন। তবে হযরত জিবরাঈল (আ.) কখনো মানুষের আকৃতিতে, কখনো নিজ সুরতে রাসূলদের কাছে আসতেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ঘটনা : হযরত ঈসা (আ.) বিনা পিতায় আল্লাহর কুদরতে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত মারইয়াম (আ.) কুমারী অবস্থায় বায়তুল মাকদিসের হযরত জিবরাঈলের সুসংবাদে তিনি গর্ভবতী হন। অবিবাহিত অবস্থায় তিনি গর্ভবতী হলে ইহুদিরা নানা কথা রটনা করে, ফলে তিনি জেরুজালেমের বায়তুল্লাহাম নামক স্থানে চলে যান। সে স্থানেই একটি শুষ্ক খেজুর বৃক্ষের নিচে হযরত ঈসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করেন। জন্ম হয়েই তিনি মায়ের পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং নিজে নবী হওয়ার সুসংবাদ জনগণকে শুনিয়ে দেন।

ঈসা এবং মসীহ -এর অর্থ : عِيْسٰى শব্দটি তাঁর নাম, এটি اِيْشُوْع হতে আরবিতে আনা হয়েছে عَيْسٌ শব্দ হতে নির্গত এর অর্থ শুভ্র। তার শরীরে লাল বর্ণের চাইতে সাদা বর্ণের প্রভাব বেশি ছিল বলে তাকে عِيْسٰى বলা হয়।

اَلْمَسِيْحُ এটি তার সম্মানিত উপাধি مَسْحٌ হতে নির্গত, ইবরানী ভাষায় মূলে ছিল مَشِيْحَا শাব্দিক অর্থ– اَلْمُبَارَكُ বা পবিত্র। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ

মাসীহ নামকরণ : ১. مَسْحٌ অর্থ স্পর্শ করা যেহেতু তিনি যখনই কোনো রুগীর শরীরে স্পর্শ করতেন তখনই তার রোগ ভালো হয়ে যেত। এজন্য তাকে مَسِيْحٌ বা স্পর্শকারী বলা হয়।

২. অথবা مَسِيْحٌ অর্থ– ভ্রমণকারী, যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ যেহেতু তিনি দাজ্জালকে তাড়া করতে গিয়ে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুড়ে বেড়াবেন, এজন্য তাকে مَسِيْحٌ বা ভ্রমণকারী বলা হয়। –[কাশশাফ]

ঈসা (আ.) কে কেন اِبْنِ مَرْيَمَ মায়ের দিকে নিসবত করা হয় : পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়মের বহির্ভূত মহান আল্লাহর অসীম কুদরতে হযরত ঈসা (আ.) বিনা পিতায় শুধু মায়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য তাকে মায়ের দিকে ফিরিয়ে عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ বলা হয়। এছাড়া এই অলৌকিক ঘটনাকে মানুষের মনে চির জাগ্রত ও চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যও ঈসা ইবনে মারইয়াম বলা হয়।

قَوْلُهٗ كَيْفَ يَكُوْنُ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ : ইহজগতে ও পরজগতে কিভাবে তিনি وَجِيْهٌ বা সম্মানিত হবেন। এ বিষয়ে মুফাসসিরীনদের কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়–

১. দুনিয়াতে তিনি নবুয়ত লাভের মাধ্যমে এবং মানুষের উপর মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার কারণে সম্মানিত হবেন আর পরকালে জান্নাতে উঁচু স্থান লাভের মাধ্যমে মর্যাদাশীল হবেন।

২. ইহকালে তাঁর প্রার্থনা কবুল, মৃতকে জীবন দান, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরুগীর চিকিৎসার মাধ্যমে মর্যাদাবান হবেন। আর আখেরাতে উম্মতের সুপারিশকারী হিসেবে সম্মানিত হবেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের একটি প্রমাণ : আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর একটি অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি শৈশবে যে বয়সে কোনো শিশু কথা বলতে সক্ষম হয় না, তখনই কথা বলতেন। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, জন্মের পর যখন ইহুদিরা হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করতঃ ভর্ৎসনা করতে থাকে,

তখন সদ্যজাত শিশু হযরত ঈসা (আ.) বলে উঠেন: আমি আল্লাহর বান্দা। এতদসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, যখন তিনি প্রৌঢ় বয়সে হবেন, তখনও মানুষের সাথে কথা বলবেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শৈশবাবস্থায় কথা বলা নিঃসন্দেহে একটি অলৌকিক ব্যাপার– যার উল্লেখ এক্ষেত্রে সমীচীন হয়েছে। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে কথা বলা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়। মুমিন, কাফের পণ্ডিত, মূর্খ সবাই এ বয়সে কথা বলে। কাজেই এক্ষেত্রে বিশেষ গুণ হিসেবে এটা উল্লেখ করার অর্থ কি?

এ প্রশ্নের এক উত্তর বয়ানুল কুরআনে দেওয়া হয়েছে যে, শৈশবাবস্থায় কথা বলা বর্ণনা করারই আসল উদ্দেশ্য তৎসঙ্গে প্রৌঢ় বয়সের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর শৈশবাবস্থার কথাবার্তাও শিশুসুলভ হবে না; বরং প্রৌঢ় লোকদের মতো জ্ঞানীসূলভ, মেধা সম্পন্ন, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَبْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাবে فَتَحَ মাসদার اَلْهِبَةُ মূলবর্ণ–(و . ه . ب) জিনসে مثال واوى অর্থ– তুমি দান কর।

ذُرِّيَّةً : শব্দটি একবচন; বহুচন ذَرَارِىُّ ও ذُرِّيَّاتٌ অর্থ– সন্তান।

نَادَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে ডেকেছে।

عَاقِرٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন عَوَاقِرُ ও عُقَّرٌ অর্থ– বন্ধ্যা নারী।

رَمْزًا : বাব نَصَرَ এর মাসদার অর্থ– ইশারা, ইঙ্গিত।

الْعَشِيِّ : শব্দটি বহুবচন; একবচন عَشِيَّةٌ অর্থ– সন্ধ্যা, রাতের প্রথম অংশ।

الْإِبْكَارِ : শব্দটি বহুবচন; একবচন بكر অর্থ– সকাল প্রত্যুষ।

اصْطَفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِصْطِفَاءُ মূলবর্ণ (ص . ف . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি পছন্দ করেছেন।

يُلْقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা নিক্ষেপ করল।

وَجِيْهًا : বাব كَرُمَ থেকে সিফাতে মুশাব্বাহ অর্থ মহা সম্মানের অধিকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِى الْمِحْرَابِ : نَادَتْ ফে'ল اَلْمَلَائِكَةُ ফা'য়েল ه টি ذو الحال আর و টি হালিয়া هُوَ মুবতাদা فِى الْمِحْرَابِ শিবহে ফে'ল, যমীরে هو যুলহাল يُصَلِّىْ ফে'ল যমীর هُوَ ফা'য়েল قَائِمٌ মুতা'আল্লিক يُصَلِّىْ তার ফে'ল, ফা'য়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে যমীরে هُوَ -এর حال হলো। حال ও ذو الحال মিলে قَائِمٌ -এর فاعل হলো, ফে'ল ও فاعل মিলে জুমলা হয়ে خبر হলো هُوَ মুবতাদা তার خبر নিয়ে জুমলা হয়ে حال হলো যমীরের। حال ও ذو الحال মিলে মাফউল। সুতরাং نَادَتْ তার ফা'য়েল ও مفعول নিয়ে جُمْلَة فِعْلِيَّة হলো।

قوله وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ : এখানে سَبِّحْ ফে'ল هُوَ যমীর ফায়েল, ب হরফে জার اَلْعَشِىِّ মা'তূফ আলাইহি و হরফে আতফ اَلْاِبْكَارِ মা'তূফ, معطوف عليه ও معطوف মিলে মাজরূর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো, সুতরাং فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হলো।

অনুবাদ : (৪৬) আর মানুষের সাথে কথা বলবেন দোলনার মধ্যে এবং প্রাপ্ত বয়সে, এবং সুসভ্য লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।	وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾
(৪৭) মরাইয়াম বললেন, হে আমার রব! কিরূপে আমার সন্তান হবে? অথচ কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি, আল্লাহ বললেন, এরূপই হবে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করে দেন, যখন কোনো কার্যকে পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন, হয়ে যাও, ফলে তা হয়ে যায়।	قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾
(৪৮) আর আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব এবং জ্ঞানগর্ভ কথা এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল।	وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾
(৪৯) আর তাঁকে বনী ইসরাঈলের প্রতি [পয়গম্বর করে] প্রেরণ করবেন, আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হতে [স্বীয় নবুয়তের] যথেষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি, তা এই যে, আমি তোমাদের জন্য কাদার দ্বারা এরূপ আকার গঠন করি যেমন পক্ষীর আকৃতি হয়ে থাকে, অতঃপর তাতে ফুৎকার দেই, ফলে তা পক্ষী হয়ে যায় আল্লাহর আদেশে, আর আমি আরোগ্য করি জন্মান্ধকে এবং কুষ্ঠ রোগীকে এবং জীবিত করি মৃতকে আল্লাহর আদেশে, আর তোমাদেরকে বলে দেই, যা কিছু নিজেদের ঘরে খাও এবং যা রেখে আস। নিশ্চয় তার মধ্যে তোমাদের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ আছে যদি তোমরা ঈমান আনতে চাও।	وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৬) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ আর মানুষের সাথে কথা বলবেন فِي الْمَهْدِ দোলনার মধ্যে وَكَهْلًا এবং প্রাপ্ত বয়সে وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ এবং সুসভ্য লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(৪৭) قَالَتْ মরাইয়াম বললেন رَبِّ হে আমার রব! اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ কিরূপে আমার সন্তান হবে? وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ অথচ কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি قَالَ আল্লাহ বললেন كَذٰلِكِ এরূপই হবে اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করে দেন। اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا যখন কোনো কার্যকে পূর্ণ করতে ইচ্ছা করেন فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ তখন তাকে বলেন كُنْ হয়ে যাও فَيَكُوْنُ ফলে তা হয়ে যায়।

(৪৮) وَيُعَلِّمُهُ আর আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিবেন الْكِتٰبَ কিতাব وَالْحِكْمَةَ এবং জ্ঞানগর্ভ কথা وَالتَّوْرٰىةَ এবং তাওরাত وَالْاِنْجِيْلَ ও ইঞ্জীল।

(৪৯) وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ আর তাঁকে বনী ইসরাঈলের প্রতি [পয়গম্বর করে] প্রেরণ করবেন اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ আমি তোমাদের নিকট এসেছি بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভু হতে [স্বীয় নবুয়তের] যথেষ্ট প্রমাণ নিয়ে اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ তা এই যে আমি তোমাদের জন্য এরূপ আকার গঠন করি مِّنَ الطِّيْنِ কাদার দ্বারা كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ যেমন পক্ষীর আকৃতি হয়ে থাকে فَاَنْفُخُ فِيْهِ অতঃপর তাতে ফুৎকার দেই فَيَكُوْنُ طَيْرًا ফলে তা পক্ষী হয়ে যায় بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর আদেশে وَاُبْرِئُ আর আমি আরোগ্য করি الْاَكْمَهَ জন্মান্ধকে وَالْاَبْرَصَ এবং কুষ্ঠ রোগীকে وَاُحْيِ الْمَوْتٰى এবং জীবিত করি মৃতকে بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর আদেশে وَاُنَبِّئُكُمْ আর তোমাদেরকে বলে দেই بِمَا تَاْكُلُوْنَ যা কিছু খাও وَمَا تَدَّخِرُوْنَ এবং যা রেখে আস فِيْ بُيُوْتِكُمْ নিজেদের ঘরে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ নিশ্চয় তার মধ্যে তোমাদের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ আছে اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা ঈমান আনতে চাও।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ (٥٠)

(৫০) আর আমি এসেছি আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থনকারীরূপে আর এই জন্য এসেছি যে, হালাল করে দিব তোমাদের জন্য কতিপয় এমন বস্তু যা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছিল, আর আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে [নবুয়তের] প্রমাণ নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছি। মোটকথা, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর আমার কথা মেনে নাও।

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (٥١)

(৫১) নিশ্চয় আল্লাহ আমারও রব তোমাদেরও রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর, এটাই সরল পথ।

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (٥٢)

(৫২) অনন্তর যখন ঈসা তাদের মধ্যে কুফর দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, এমনও কেউ আছে কি, যে আমার সাহায্যকারী হবে আল্লাহর পথে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী হবো, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম আর আপনি এ কথার সাক্ষী থাকুন যে, আমরা ফরমাবরদার।

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ (٥٣)

(৫৩) হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি তার প্রতি যা আপনি নাজিল করেছেন, আর আনুগত্য অবলম্বন করেছি আমরা রাসূলের, সুতরাং আমাদেরকে তাদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন, যারা সমর্থনকারী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫০) وَمُصَدِّقًا আর আমি এসেছি সমর্থনকারীরূপে لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের وَلِاُحِلَّ لَكُمْ আর এই জন্য এসেছি যে, হালাল করে দিব তোমাদের জন্য بَعْضَ الَّذِيْ কতিপয় এমন বস্তু যা حُرِّمَ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছিল وَجِئْتُكُمْ আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে [নবুয়তের] প্রমাণ নিয়ে فَاتَّقُوا اللّٰهَ মোটকথা, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর وَاَطِيْعُوْنِ আর আমার কথা মেনে নাও।

(৫১) اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ আমারও রব তোমাদেরও রব فَاعْبُدُوْهُ সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ এটাই সরল পথ।

(৫২) فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى অনন্তর যখন ঈসা দেখতে পেলেন مِنْهُمُ الْكُفْرَ তাদের মধ্যে কুফর قَالَ তখন তিনি বললেন مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ এমনও কেউ আছে কি যে আমার সাহায্যকারী হবে আল্লাহর পথে? قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ হাওয়ারীগণ বলল نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী হবো اٰمَنَّا بِاللّٰهِ আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম وَاشْهَدْ আর আপনি এ কথার সাক্ষী থাকুন بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ যে আমরা ফরমাবরদার।

(৫৩) رَبَّنَآ হে আমাদের রব! اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি بِمَآ اَنْزَلْتَ তার প্রতি যা আপনি নাজিল করেছেন وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ আর আনুগত্য অবলম্বন করেছি আমরা রাসূলের فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ সুতরাং আমাদেরকে তাদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন, যারা সমর্থনকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত ঈসা (আ.)-এর অলৌকিক কার্যাবলি : এ স্থানে হযরত ঈসা (আ.)-এর ৫টি মু'জিযার উল্লেখ রয়েছে–
১. মাটি দিয়ে পাখির আকৃতিতে খাঁচা তৈরি করে তাতে ফুঁক দিলে সাথে সাথে তা উড়ে যাওয়া।
২. জন্মান্ধ রোগীকে নিরাময় করা।
৩. কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করা।
৪. মৃতকে আল্লাহর আদেশে জীবিত করা।
৫. ভক্ষণকৃত [জিনিসের] এবং গৃহে রক্ষিত বস্তুর সংবাদ প্রদান করা।

اَكْمَهْ এর অর্থ : كَمْهٌ -এর বহুবচন اَكْمَهْ এর শাব্দিক অর্থ নিয়ে কিছুটা মতান্তর রয়েছে।
১. কারো মতে জন্মান্ধকে আকমাহ বলে।
২. কেউ বলেন اَلْمَمْسُوْحُ الْعَيْنِ তথা যার চক্ষুর স্থান মুছে গেছে তাকে اَكْمَهْ বলে।
৩. কারো মতে যে চক্ষু নিয়ে জন্মগ্রহণ করার পর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে তাকে اَكْمَهْ বলে।
৪. কেউ বলেন এমন অন্ধ যার অস্তিত্ব এই উম্মতে নেই। বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার [জন্মান্ধকে] রোগীকে একত্রিত করা হয়েছিল। তিনি সকলকে দোয়ার মাধ্যমে সুস্থ করে দিয়েছিলেন।

ঈসা (আ.) কাকে জীবিত করেছেন : এতে কিছুটা মতান্তর রয়েছে–
১. কাশশাফ গ্রন্থকারের মতে তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলে সামকে (سَامُ بْنُ نُوْحٍ) জীবিত করেছিলেন।
২. কারো মতে তিনি তাঁর বন্ধু (عَازِرْ) আযেরকে জীবিত করেছেন।
এছাড়া আরো কিছু মৃতকে জীবিত করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত ঈসা (আ.) কি কি হালাল করেছিলেন যা হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মে হারাম ছিল :
কাশশাফ গ্রন্থকারের মতে বস্তুগুলো হলো–
১. اَلشُّحُوْمُ : তথা পশুর চর্বি।
২. لُحُوْمُ الْاِبِلِ : উটের গোশত।
৩. اَلسَّمَكُ : মাছ।
৪. وَكُلُّ ذِيْ ظُفُرٍ : প্রত্যেক থাবা বা নখ বিশিষ্ট প্রাণী।
কেউ বলেন, হালাল করেছেন শুধু মাছ আর ঐ সমস্ত পাখি যাতে থাবা নেই তবে শনিবারে মাছ ধরা হালাল করেছেন কিনা এ ব্যাপারে ব্যাপক মতান্তর রয়েছে।
উল্লেখ্য যে, এসব বস্তু বনী ইসরাঈলের উপর হারাম ছিল।

كَيْفَ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ
কিভাবে হযরত ঈসা (আ.) তাদের থেকে কুফরি উপলব্ধি করলেন? এটা কয়েকভাবে হতে পারে।
১. তারা সরাসরি কুফরি করেছিল যা তিনি দেখতে পেলেন।
২. অথবা তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল ফলে তিনি তা বুঝতে পারলেন।
৩. অথবা তাঁকে আল্লাহ তাদের কুফরি সম্পর্কে অবহিত করেন।
৪. অথবা তাদের কার্যকলাপে তিনি তাদের কুফরি অনুভব করলেন।
৫ অথবা তারা তাঁর আনীত বিধানাবলির ব্যাপারে হটকারিতা করেছিল।

مَنْ هُمُ الْحَوَارِيُّوْنَ **: হাওয়ারী কারা :** حَوَارِيُّوْنَ শব্দটি حَوَارِيٌّ -এর বহুবচন। এটি حَوْرٌ ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো ধবধবে সাদা।

১. তারা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করত বলে তাদেরকে حَوَارِيٌّ বলা হয়।
২. কারো মতে তারা কাপড় সাদা করতো এজন্য তাদেরকে হাওয়ারী বলা হতো।

৩. মুফতি শফী (র.) বলেন, তাদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে তাদেরকে হাওয়ারী নামে অভিহিত করা হয়।
৪. অথবা হাওয়ারী অর্থ– সাহায্যকারী যেহেতু তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহায্য করেছেন বলেই এ নামে অভিহিত করা হয়।
৫. অথবা حَوَارِيٌّ অর্থ– খাঁটি বা অকৃত্রিম, তারা খাঁটি ঈমানদার ছিল বলে حَوَارِيٌّ বলা হয়েছে। তারা সংখ্যায় ১২ বার জন ছিল বলে মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন।

مَنْ هُمُ الشَّاهِدُوْنَ : সাক্ষ্যদানকারী কারা : এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়।
১. ঐ সমস্ত নবীগণ যারা তাদের উম্মতদের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবেন।
২. অথবা যারা একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়।
৩. অথবা উম্মতে মুহাম্মদী, কেননা তারা অন্যান্য উম্মতদের উপর সাক্ষ্য প্রদানকারী হবেন। –[কাশশাফ]

শব্দ বিশ্লেষণ

أُبْرِئُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْرَاءُ মূলবর্ণ (ب . ر . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আমি ভালো করি।

اُحْيِ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح . ى . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– আমি জীবিত করি।

اُنَبِّئُكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلتَّنْبِئَةُ মূলবর্ণ (ن . ب . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আমি বলে দেই।

تَدَّخِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাবে اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِدِّخَارُ মূলবর্ণ (د . خ . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জমা কর।

اَطِيْعُوْنِ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضرمعروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা আমার অনুসরণ কর।

مُسْتَقِيْمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব استفعال মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সোজা সঠিক।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا : এখানে يُكَلِّمُ ফে'ল যমীরে هو যুলহাল, النَّاسَ হলো مفعول আর فِي الْمَهْدِ জার ও মাজরূর মিলে উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে متعلق হয়ে প্রথম حال আর كَهْلًا দ্বিতীয় حال এবার ذو الحال তার দুই حال নিয়ে فاعل হয়েছে। অবশেষে فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

قوله وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَ الْاِنْجِيْلَ : এখানে يُعَلِّمُ ফে'ল যমীরে هو ফা'য়েল, প্রথম মাফউল اَلْكِتَابَ মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ اَلْحِكْمَةَ প্রথম মা'তূফ, واو হরফে আতফ, اَلتَّوْرٰةَ দ্বিতীয় মা'তূফ, واو হরফে আতফ اَلْاِنْجِيْلَ তৃতীয় মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি তার তিন معطوف নিয়ে দ্বিতীয় مفعول হলো সুতরাং فعل ـ فاعل ও দুই مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ (٥٤)

অনুবাদ : (৫৪) আর তারা গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আল্লাহ গোপন কৌশল করলেন, আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰۤى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (٥٥)

(৫৫) যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দান করব, এবং তোমাকে [আপাততঃ] নিজের দিকে উঠিয়ে নিচ্ছি এবং আমি তোমাকে ঐসকল লোক হতে পবিত্র করব যারা প্রত্যাখ্যান করে, আর যারা তোমার কথা মানে তাদেরকে বিজয়ী করব তাদের উপর যারা প্রত্যাখ্যানকারী, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত, অতঃপর আমারই দিকে হবে সকলের প্রত্যাবর্তন, তৎপর আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিব ঐ সমস্ত বিষয়ে যাতে তোমরা পরস্পর মতভেদ করছিলে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (٥٦)

(৫৬) সুতরাং যারা কাফের ছিল, বস্তুত আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব ইহলোকেও এবং পরলোকেও, আর তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ (٥٧)

(৫৭) আর যারা মুমিন ছিল এবং নেক আমল করেছিল, ফলতঃ আল্লাহ তাদেরকে তাদের ছওয়াব দান করবেন, আর আল্লাহ জালেমদের সাথে ভালোবাসা রাখেন না।

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ (٥٨)

(৫৮) এটা আমি আপনাকে পড়ে পড়ে শুনাচ্ছি যা প্রমাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৪) وَمَكَرُوْا আর তারা গোপন ষড়যন্ত্র করল وَمَكَرَ اللّٰهُ এবং আল্লাহ গোপন কৌশল করলেন وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।

(৫৫) اِذْ قَالَ اللّٰهُ যখন আল্লাহ বললেন يٰعِيْسٰى হে ঈসা! اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দান করব وَرَافِعُكَ اِلَىَّ এবং তোমাকে [আপাততঃ] নিজের দিকে উঠিয়ে নিচ্ছি وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং আমি তোমাকে ঐ সকল লোক হতে পবিত্র করব যারা প্রত্যাখ্যান করে وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ আর যারা তোমার কথা মানে তাদেরকে বিজয়ী করব فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তাদের উপর যারা প্রত্যাখ্যানকারী اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ অতঃপর আমারই দিকে হবে সকলের প্রত্যাবর্তন فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ তৎপর আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিব فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ঐ সমস্ত বিষয়ে যাতে তোমরা পরস্পর মতভেদ করছিলে।

(৫৬) فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا সুতরাং যারা কাফের ছিল فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا বস্তুত আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ইহলোকেও এবং পরলোকেও وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ আর তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

(৫৭) وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা মুমিন ছিল وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক আমল করেছিল فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ফলতঃ আল্লাহ তাদেরকে তাদের ছওয়াব দান করবেন وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ জালেমদের সাথে ভালোবাসা রাখেন না।

(৫৮) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ এটা আমি আপনাকে পড়ে পড়ে শুনাচ্ছি যা مِنَ الْاٰيٰتِ প্রমাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(৫৯) নিশ্চয়, ঈসার আশ্চর্য অবস্থা আল্লাহর নিকট আদমের আশ্চর্য অবস্থার ন্যায়, তাঁকে মাটি দ্বারা তৈরি করলেন তৎপর তা [-র কালেব]-কে বললেন, [সজীব] হয়ে যাও, তখনই তা [সজীব] হয়ে গেল।	إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾
(৬০) এই বাস্তব ঘটনা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুতরাং আপনি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।	الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾
(৬১) অতএব, যে ব্যক্তি ঈসা সম্বন্ধে আপনার সাথে বিতর্ক করে আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে আপনি বলে দিন, আস আমরা ডেকে নেই আমাদের সন্তানগণকে এবং তোমাদের সন্তানগণকে, আর আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদেরকে ও স্বয়ং তোমাদেরকে। অতঃপর আমরা খুব আন্তরিকতার সাথে এরূপ প্রার্থনা করি যে, আল্লাহর লা'নত দেই অসত্যপন্থিদের উপর।	فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ قف ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾
(৬২) নিশ্চয় এসব যা কিছু বর্ণিত হলো তাই সত্য বিবরণ, আর কেউই নেই মা'বুদ হওয়ার যোগ্য আল্লাহ ব্যতীত, আর নিঃসন্দেহে আল্লাহই পরক্রমশালী, মহা জ্ঞানী।	إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৯) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ নিশ্চয়, ঈসার আশ্চর্য অবস্থা عِندَ اللَّهِ আল্লাহর নিকট كَمَثَلِ آدَمَ আদমের আশ্চর্য অবস্থার ন্যায় خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ তাঁকে মাটি দ্বারা তৈরি করলেন ثُمَّ قَالَ لَهُ তৎপর তা [-র কালেব]-কে বললেন, كُن হয়ে যাও فَيَكُونُ তখনই তা [সজীব] হয়ে গেল।

(৬০) الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ এই বাস্তব ঘটনা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ সুতরাং আপনি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

(৬১) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ অতএব, যে ব্যক্তি ঈসা সম্বন্ধে আপনার সাথে বিতর্ক করে مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর فَقُلْ তবে আপনি বলে দিন تَعَالَوْا আস نَدْعُ আমরা ডেকে নেই أَبْنَاءَنَا আমাদের সন্তানগণকে وَأَبْنَاءَكُمْ এবং তোমাদের সন্তানগণকে وَنِسَاءَنَا আর আমাদের নারীগণকে وَنِسَاءَكُمْ ও তোমাদের নারীগণকে وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ এবং স্বয়ং আমাদেরকে ও স্বয়ং তোমাদেরকে ثُمَّ نَبْتَهِلْ অতঃপর আমরা খুব আন্তরিকতার সাথে এরূপ প্রার্থনা করি যে فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ আল্লাহর লা'নত দেই অসত্যপন্থিদের উপর।

(৬২) إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ নিশ্চয় এসব যা কিছু বর্ণিত হলো তাই সত্য বিবরণ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ আর কেউই নেই মা'বুদ হওয়ার যোগ্য আল্লাহ ব্যতীত وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহই পরাক্রমশালী, মহা জ্ঞানী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫৯) قوله إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইকরিমা, কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন, নাজরানের প্রতিনিধি খ্রিস্টানেরা হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্ক নিয়ে নবী করীম (সা.)-এর সাথে তর্ক করতে গিয়ে বলল, আমরা জানতে পেরেছি, আপনি নাকি আমাদের নবী সম্পর্কে মন্দাচার করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি বান্দা। তখন মহানবী (আ.) বললেন যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা, মরিয়মের প্রতি প্রেরিত কালিমা ও তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত রুহ হলে তাতে অসুবিধা কিসের। তখন তারা বলল, আপনি কি কখনো কোনো পুরুষ ব্যতিরেকে মহিলা থেকে মানুষ জন্ম গ্রহণ করতে দেখতে পেয়েছেন। না কি এমন কিছু শুনতে পেয়েছেন। অতঃপর তারা বের হয়ে গেলে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[বাহরে মুহীত : ৫০০/২, রূহুল মা'আনী : ১৮৬/২]

শানে নুযূল – ২ : অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, আপনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে এ ধরনের মানুষ ভূমিষ্ট হতে দেখান তো? তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল– ৩ : হযরত ওয়াকী' মুবারক ও হাসান হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নাজরান থেকে দু'জন ধর্ম যাজক আসে। তখন রাসূল ﷺ তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। ফলে একজন বলল যে, আমরা তো আপনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। রাসূল ﷺ বললেন যে, তোমরা মিথ্যা বলছ। ইসলাম গ্রহণ করা থেকে তোমাদেরকে দু'তিনটি বস্তু বিরত রাখছে।

১. তোমাদের সলীবের [ক্রুসের] পূজা। ২. তোমাদের শূকর খাবার এবং ৩. তোমাদের কর্তৃক আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা। তখন তারা বলল, তাহলে ঈসার পিতা কে? তখন তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ الخ

শানে নুযূল– ৪ : বায়হাকী দালায়েল নামক গ্রন্থে সালমা বিন আব্দ ইয়াস-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ নাজরান বাসীদের নামে পত্র লিখেন। "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে নাজরানের দলপতি ও নাজরান বাসীদের নামে। তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রশংসা প্রেরণ করব, যিনি হলেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের ইলাহ। আম্মা বাদ! আমি তোমাদেরকে বান্দার ইবাদত করা থেকে আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আহ্বান করছি। বান্দার প্রভুত্বতা থেকে, আল্লাহর প্রভুত্বতার প্রতি ডাকছি। তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার কর, তাহলে জিযিয়া কর প্রদান কর, তাতেও যদি সম্মত না হও, তাহলে তোমাদের প্রতি যুদ্ধের ঘোষণা করলাম"। ওয়াসসালাম।

পরন্তুঃ নাজরান নেতা যখন পত্র পাঠ করল, তখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। নাজরানের অধিবাসী শুরাহবীল বিন ওদা' নামক এক ব্যক্তির নিকট সে পত্র পাঠাল। ফলে শুরাহবীল তা পাঠ করল। পত্র পাঠের পর নাজরান দলপতি বলল, এতে আপনার মতামত কি? শুরাহবীল বলল, আমি জানি যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে নবুয়ত দেওয়ার প্রতি ইবরাহীম (আ.) কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং এ ব্যক্তি নবী হতে পারেন তা সম্ভব নয় কি? নবুয়ত সম্পর্কীয় বিষয়ে আমার কোনো মতামত নেই। যদি জাগতিক কোনো বিষয় হতো, তাহলে সে বিষয়ে আমি তোমাকে অবহিত করে দিতাম। নাজরান দলপতি একের পর একের নিকট পত্র পাঠাতে থাকল, তবে সকলে শুরাহবীলের ন্যায় মত প্রকাশ করল। সুতরাং সকলেই একমতে উপনীত হলো যে, শুরাহবীল, আব্দুল্লাহ বিন শুরাহবীল, হায়ার বিন কানাস প্রমুখকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসল। ফলে রাসূল ﷺ তাদেরকে কোনো কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। তারাও রাসূল ﷺ থেকে জানতে চায়। সে আলোচনার মধ্যে তারা বলল, ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, আজকের দিনে এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই। সুতরাং তোমরা থাক, তাহলে আগামীকাল সকালে তোমাদেরকে বলে দিব হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত আমাকে যা কিছু জানানো হয়। ফলে মুবাহালার দাওয়াত সম্বলিত এ দু'আয়াত নাজিল হয়।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ الخ

তখন তারা তা স্বীকার করতে অসম্মতি জানাল। সুতরাং পরদিন সকাল হলে রাসূল ﷺ হযরত হাসান, হুসাইন ও হযরত ফাতেমা (রা.) সহ বদ দোয়া করার জন্য মাঠের দিকে বের হলেন, তখন শুরাহবীল তার সাথীদেরকে বলল, আমি তো অত্যন্ত ভীতিকর পরিস্থিতি উপলব্ধি করছি। এ ব্যক্তি যদি নবী হয়ে থাকেন, আর আমরা তাঁর সাথে লা'নত করতে যাই, যাদের সাথে নিয়ে চলেছেন তাদের নিয়ে যদি বদ দোয়া করেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোনো চুল-নখ পর্যন্তও অবশিষ্টা থাকবে না। সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং শুরাহবীল তার সাথীদ্বয়ের সাথে আলোচনা করে রাসূল ﷺ-এর সাথে জিযিয়া কর প্রদান করার শর্তে সন্ধি স্থাপন করে। –[রূহুল মা'আনী : ১৮৬/২]

(৫৮-৬০) قوله ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ . الخ **আয়াতের শানে নুযূল–১ : হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেন, রাসূল** ﷺ নাজরানের দুজন পুরোহিতের কাছে তশরিফ নিয়ে গেলেন। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করল, বলুন তো, হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা কে? রাসূল ﷺ আল্লাহ পাকের নির্দেশ পাওয়া পর্যন্ত কোনো বিষয়েই তাড়াহুড়া করতেন না। তাই তিনি আল্লাহ পাকের নির্দেশের অপেক্ষায় রইলেন। তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন। ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ থেকে مِنَ الْمُمْتَرِينَ পর্যন্ত। –[ইবনে আবী হাতেম লুবাব]

শানে নুযূল–২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ-এর দরবারে নাজরান থেকে একটি দল আগমন করল। তারা জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে তোমার? তুমি যে আমাদের ধর্ম গুরুর সমালোচনায় মেতে উঠেছ। রাসূল ﷺ বললেন, কার কথা বলছ? তারা বলল, হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা বলছি। তোমার ধারণায় তিনি নাকি আল্লাহর বান্দা। ইরশাদ করলেন অবশ্যই। তারা বলল, ঈসার মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কি তোমার নজরে পড়েছে। যা কারো মুখে শুনেছ। এই বলে তারা বেরিয়ে গেল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তশরিফ এনে আরজ করলেন, আবার যদি তারা আসে তবে তাদেরকে إِنَّ مَثَلَ عِيسَى হতে مِنَ الْمُمْتَرِينَ পর্যন্ত পড়ে শুনাবেন।

(৬১) قوله فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن . الاية **আয়াতের শানে নুযূল :** মুবাহালার আয়াত আলোচ্য আয়াতের পটভূমি এই যে, মহানবী ﷺ নাজরানের খ্রিস্টানদের কাছে একটি ফরমান প্রেরণ করেন। এতে ধারাবাহিকভাবে ৩ টি বিষয় উল্লেখ করা হয়। ১. ইসলাম কবুল কর। ২. অথবা জিযিয়া কর দাও। ৩. অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। খ্রিস্টানরা পরস্পর পরামর্শ করে শুরাহবীল, আব্দুল্লাহ ইবনে শুরাহবিল ও জিবার ইবনে ফয়েজকে হুজুর ﷺ -এর কাছে পাঠায়। তারা এসে ধর্মীয় বিষয়াদি আলোচনা শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা (আ.)কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্য প্রবল বাদানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে মুবাহালার উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে রাসূল ﷺ প্রতিনিধি দলকে মুবাহালার আহবান জানান এং নিজেও হযরত ফাতিমা, হযরত আলী এবং ইমাম হাসান হোসাইন (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে শুরাহবীল ভীত হয়ে যায় এবং সাথী দলকে বলতে থাকে তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবীর সাথে মুবাহালা করলে ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তির অন্য কোনো পথ খোঁজ। সঙ্গীদ্বয় বলল, তোমার মতে মুক্তির উপায় কি? সে বলল, আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর এতেই প্রতিনিধি সম্মত হয় এবং মহানবী ﷺ তাদের উপর জিযিয়া কর ধার্য করে মীমাংসায় উপনীত হন। –[ইবনে কাছীর, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন]

আয়াতের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর ব্যাখ্যা : কোনো কোনো ফেরকার লোকেরা আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন শব্দ ও অর্থে বিকৃত সাধন করে হযরত ঈসা (আ.)-এর হায়াত এবং আখেরি জমানায় তাঁর পুনরাগমন সম্পর্কিত মুসলমানদের সর্ববাদি সম্মত আকীদাকে ভুল প্রমাণ করতে সচেষ্ট রয়েছে। এ কারণে আয়াতের শব্দবলির পূর্ণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ : আরবি ভাষায় 'মকর' শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশল। উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য মকর ভালো এবং মন্দ লক্ষ্য অর্জনের জন্য হলে তা মন্দও হতে পারে। এ কারণেই وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ আর مَكْرٌ শব্দের সাথে سَيِّئٌ [মন্দ] যোগ করা হয়েছে। বাংলা ভাষার বচনভঙ্গিতে মকর শব্দটি শুধু ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ নিয়ে আরবি বাচনভঙ্গিতে সন্দেহ করা উচিত নয়। আরবি অর্থের দিক দিয়েই এখানে আল্লাহকে 'শ্রেষ্ঠতম কুশলী' خَيْرُ الْمَاكِرِينَ বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল অবলম্বন করতে আরম্ভ করে। তারা অনবরত বাদশাহর কাছে বলতে থাকে যে, লোকটি আল্লাহদ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে বাদশাহ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ান জারি করেন। ইহুদিদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশলও স্বীয় পথে অগ্রসর হচ্ছিল। পরবর্তী আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। –[তাফসীরে ওসমানী]

اِسْتِيْفَاء ও اِيْفَاء، وَفَاء – اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ শব্দের মাসদার تَوَفِّيْ এবং মূলবর্ণ وَفِيْ, অভিধানে এর অর্থ পুরোপুরি নেওয়া এসব শব্দেরও প্রকৃত অর্থ পুরোপুরি নেওয়া। আরবি ভাষার সব অভিধান-গ্রন্থই এর প্রমাণ। মৃত্যুর সময় মানুষ নির্ধারিত আয়ু পূর্ণ করে ফেলে এবং আল্লাহ প্রদত্ত আত্মা পুরোপুরি নিয়ে নেওয়া হয়। এ কারণে রূপক অর্থে শব্দটি মৃত্যু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৈনন্দিন নিদ্রা মৃত্যুর একটি হাল্কা নমুনা। কুরআনে এ অর্থেও تَوَفِّيْ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে–

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا আল্লাহ মৃত্যুর সময় প্রাণ নিয়ে নেন। আর যাদের মৃত্যু আসে না, তাদের নিদ্রার সময় প্রাণ নিয়ে নেন।

দুররে মানসূর গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ অর্থাৎ, আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ জমানায় স্বাভাবিক মৃত্যুদান করব।

এ তাফসীরের সারমর্ম এই যে, تَوَفِّيْ শব্দের অর্থ মৃত্যু; কিন্তু আয়াতের শব্দে رَافِعُكَ প্রথমে ও مُتَوَفِّيْكَ পরে হবে। এখানে مُتَوَفِّيْكَ কে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নিজের কাছে উঠিয়ে নেওয়া চিরতরে নয়; বরং এ ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্য হবে। এরপর তিনি আবার দুনিয়াতে আসবেন, শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এভাবে আকাশ থেকে পুনর্বার অতরণ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের পর মৃত্যুবরণের ঘটনাটি একাধারে একটি মু'জিযা; এতদসঙ্গে হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্মান ও মর্যাদার পূর্ণত্বলাভ এবং খ্রিস্টানদের এ বিশ্বাসের খণ্ডন যে, হযরত ঈসা (আ.) অন্যতম উপাস্য। নতুবা জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরো জোরদার হয়ে যেত যে, তিনিও আল্লাহ তা'আলার মতোই চিরঞ্জীব এবং ভালোমন্দের নিয়ামক। এ কারণে প্রথমে مُتَوَفِّيْكَ বলে এসব ভ্রান্ত ধারণায় মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এররপর নিজের দিকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্যি কথা এই যে, কাফের ও মুশরিকরা চিরকালই পয়গম্বরগণের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে এসেছে। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলারও চিরাচরিত রীতি ছিল এই যে, যখনই কোনো জাতি পয়গম্বরের বিরোধিতায় অনমনীয় হয়েছে এবং মু'জিযা দেখার পরও অস্বীকার ও অবিশ্বাস অব্যাহত রেখেছে, তখনই আল্লাহ তা'আলা আসমানি আজাব পাঠিয়ে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। যেমন, 'আদ, সামূদ এবং সালেহ ও লূত পয়গম্বরে কওমের বেলায় করা হয়েছে। অথবা পয়গম্বরকেই কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করিয়ে অন্যদিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে তাঁকে শক্তি ও সৈন্যবল দান করে অবাধ্য কওমের বিরুদ্ধে জয়ী করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আগমন করেন এবং সবশেষে হুজুর ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আগমন করেন। অতঃপর সেখান থেকে অভিযান পরিচালনা করে মক্কা জয় করেন। ইহুদিদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে তুলে নেওয়াও প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার হিজরতই ছিল– তারপর তিনি আবার দুনিয়াতে পদার্পণ করে ইহুদিদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি জয়লাভ করবেন

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এ হিজরত সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আকাশের দিকেই করানো হলো কেন? এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বলেন যে, ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতোই; অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) যেমন সাধারণ সৃষ্টজীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় পিতা-মাতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, তেমনি হযরত ঈসা (আ.) -এর জন্মও সাধারণ মানুষের জন্ম থেকে পৃথক পন্থায় হয়েছে এবং মৃত্যুও অভিনব পন্থায় শত শত বৎসর পর জগতে পুনরাগমনের পরেই হবে। সুতরাং তাঁর হিজরতও যদি ভিন্ন প্রকৃতিতে ও বিস্ময়কর পন্থা হয়; তবে তাতে আশ্চর্য কি?

এসব বিস্ময়কর ঘটনার কারণেই মূর্খ খ্রিস্টানরা ভ্রান্তবিশ্বাসে পতিত হয়ে তাঁকে খোদা বলতে শুরু করেছে। অথচ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব ঘটনার মধ্যেই তাঁর বন্দেগি, খোদায়ী নির্দেশের প্রতি আনুগত্য এবং মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রমাণাদি রয়েছে। এ কারণেই কুরআন প্রতিটি ক্ষেত্রে ওদের উপরিউক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডনের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। আকাশে উত্থিত করার ফলে ওদের বিশ্বাস খুব জোরদার হয়ে যেত। তাই مُتَوَفِّيْكَ শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য ইহুদিদের খণ্ডন। কারণ তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে ও শূলীতে চড়াতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের সব পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেন। কিন্তু শব্দ আগে-পিছে করার ফলে আলোচ্য আয়াতে খ্রিস্টানদের বিশ্বাসও খণ্ডন হয়ে গেছে যে, হযরত ঈসা (আ.) খোদা নন, তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবেন; এক সময় তাঁরও মৃত্যু হবে।

ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে বলেন, কুরআন মাজীদ এমনিভাবে বিশেষ বিশেষ রহস্যের কারণে শব্দ আগে-পিছে করার ভূরি ভূরি নজির রয়েছে। পরবর্তী ঘটনাকে অগ্রে ও অগ্রবর্তী ঘটনাকে পরে বর্ণনা করা হয়েছে –[তাফসীরে কাবীর, ২ : ৪৮১

قوله وَرَافِعُكَ إِلَيَّ : এতে বাহ্যতঃ হযরত ঈসা (আ.)কেই সম্বোধন করা হয়েছে যে, আপনাকে উপরে উঠিয়ে নেব। সবাই জানেন যে, হযরত ঈসা (আ.) শুধু আত্মার নাম নয়; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের নাম। কাজেই আয়াতে দৈহিক উত্তোলন বাদ দিয়ে শুধু আত্মিক উত্তোলন বুঝা সম্পূর্ণ ভুল। তবে একথা ঠিক যে, আরবি শব্দটি উচ্চ মর্তবার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন– يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ এবং وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ইত্যাদি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।
কিন্তু এটা জানা যায় যে, উচ্চ মর্তবার অর্থে رفع শব্দটির ব্যবহার রূপক। উল্লিখিত আয়াতসমূহে পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার ভিত্তিতে এ ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে আসল অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থ বুঝার কোনো কারণ নেই। এ ছাড়া আয়াতে رَفْعٌ শব্দের সাথে إِلَى ব্যবহার করার কারণে রূপক অর্থের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গেছে। এ আয়াতে وَرَافِعُكَ إِلَيَّ এবং সূরা নিসার আয়াতেও ইহুদিদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন প্রসঙ্গে وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদিরা নিশ্চিতই হযরত ঈসা (আ.) -কে হত্যা করেনি; বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। "নিজের কাছে তুলে নেওয়া" সশরীরে তুলে নেওয়াকেই বলা হয়।

হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর পাঁচটি অঙ্গীকার : আলোচ্য ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে পাঁচটি অঙ্গীকার করেছেন।
সর্বপ্রথম অঙ্গীকার এই যে, তাঁর মৃত্যু ইহুদিদের হাতে হত্যার মাধ্যমে হবে না; বরং প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায় হবে। প্রতিশ্রুত সময়টি কিয়ামতের নিকটতম জমানায় আসবে। তখন হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিভিন্ন সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীসে এর বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে।
দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে আপাততঃ ঊর্ধ্ব জগতে তুলে নেওয়া হবে। সাথে সাথে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়।
তৃতীয় অঙ্গীকার ছিল অপবাদ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে। এ অঙ্গীকার এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ নবী ﷺ আগমন করে ইহুদিদের যাবতীয় অপবাদ দূর করে দেন। উদাহরণতঃ পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করার কারণে ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মবিষয়ে অপবাদ আরোপ করতো। কুরআন এ অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে যে, তিনি আল্লাহর কুদরত ও নির্দেশে পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। হযরত আদমের জন্মগ্রহণ ছিল আরো বেশি বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ তিনি পিতা ও মাতা উভয় ব্যতিরেকেই জন্মগ্রহণ করেন।
ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে খোদায়ী দাবি করার অভিযোগও এনেছিল। কুরআনের অনেক আয়াতে এর বিপরীতে হযরত ঈসা (আ.)-এর বন্দেগি ও মানবত্বের স্বীকারোক্তি বর্ণিত হয়েছে।
চতুর্থ অঙ্গীকার وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীর বিপক্ষে আপনার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা হবে। আয়াতে অনুসরণের অর্থ হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তে বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি করা। এর জন্য যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করা শর্ত নয়। এভাবে খ্রিস্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ মুসলমানরাও হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তে বিশ্বাসী। এটা ভিন্ন কথা যে, এতটুকু বিশ্বাসই পরকালের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং হযরত ঈসা (আ.)-এর যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করার উপর পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। হযরত ঈসা (আ.)-এর অকাট্য বিধানাবলির মধ্যে একটি ছিল এই যে, পরবর্তীকালে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতিও ঈমান আনতে হবে। খ্রিস্টানরা এটি পালন করেনি। ফলে তারা আখেরাতের মুক্তি থেকে বঞ্চিত। মুসলমানরা এটিও পালন করেছে। ফলে তারা পরকালের মুক্তির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু জগতে ইহুদিদের বিপক্ষে বিজয়ী রাখার অঙ্গীকার শুধু হযরত ঈসা (আ.) নবুয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ অঙ্গীকার অনুযায়ী ইহুদিদের বিপক্ষে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের বিজয় সব সময় অর্জিত হয়েছে এবং নিশ্চিতরূপেই কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।
এ অঙ্গীকারের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, ইহুদি জাতির বিপক্ষে খ্রিস্টান ও মুসলমান জাতি সর্বদাই বিজয়ী হয়েছে। তাদের রাষ্ট্রই দুনিয়ার যত্রতত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র : ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র দেখে এ ব্যাপারে সন্দেহ করা যায় না। কারণ প্রথমতঃ এ রাষ্ট্রটি রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের একটি সামরিক ছাউনি ছাড়া কিছুই নয়। ওরা এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। যদি একদিনের জন্যও এর মাথার উপর থেকে রাশিয়া, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নেয়, তবে বিশ্বের মানচিত্র থেকে এর অস্তিত্ব মুছে যাওয়া সুনিশ্চিত। এ কারণে বাস্তবধর্মী লোকদের দৃষ্টিতে ইসরাঈলের এ ইহুদি রাষ্ট্রটি একটি আশ্রিত রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কিছু নয়। যদি একে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ধরেও নেওয়া হয়, তবুও খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সমষ্টির বিপরীতে এ যে নেহাতই একটি আপাংক্তেয় রাষ্ট্র, তা কোনো সুস্থবুদ্ধি ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে বলা যায় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কিছুদিনের জন্য ইহুদিদের প্রাধান্য বিস্তারের সংবাদ স্বয়ং ইসলামি রেওয়ায়েতসমূহেই দেওয়া হয়েছে। যদি দুনিয়ার আয়ু ফুরিয়ে এসে থাকে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তবে এ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইসলামি রেওয়ায়েতে পরিপন্থি নয়। এহেন ক্ষণস্থায়ী আলোড়নকে সাম্রাজ্য অথবা রাষ্ট্র বলা যায় না।

পঞ্চম অঙ্গীকার এই যে, কিয়ামতের দিন সব ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসা করা হবে। সময় এলে এ অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে যে, ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ

হযরত ঈসা (আ.)-এর হায়াত ও অবতরণের প্রশ্ন : জগতে একমাত্র ইহুদিরাই একথা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়ে সমাহিত হয়ে গেছেন এবং পরে জীবিত হননি। কুরআনে সূরা নিসার আয়াতে ওদের এ ধারণার স্বরূপ উদঘাটিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ বাক্যাংশে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর শত্রুদের চক্রান্ত স্বয়ং তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, যেসব ইহুদি তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করেছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে হুবহু হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় করে দেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-কে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেন। আয়াতের ভাষা এরূপ : وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ "তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলেও চড়ায়নি। কিন্তু আল্লাহর কৌশলে তারা সাদৃশ্যের ধাঁধায় পতিত হয় এবং নিজের লোককেই হত্যা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।"

এ দুই দলের বিপরীতে ইসলামের বিশ্বাস আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য কতিপয় আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইহুদিদের কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নিয়েছেন। তাঁকে হত্যা করা হয়নি এবং শূলেও চড়ানো হয়নি। তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে বিদ্যমান রয়েছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আকাশ থেকে অবতরণ করে ইহুদিদের বিপক্ষে জয়লাভ করবেন, অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন।

এ বিশ্বাসের উপর সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হাফেজ ইবনে হজর 'তালখীস' গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় এ ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।

এখানে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি চিন্তা করলে আলোচ্য প্রশ্নে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। তা এই যে, সূরা আলে ইমরানের একাদশতম রুকূ'তে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরের উল্লেখ একটিমাত্র আয়াতে সংক্ষেপে করেছেন। এরপর প্রায় তিন রুকূ'র বাইশটি আয়াতে হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর পরিবারের উল্লেখ এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে, কুরআন যাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর উল্লেখও এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতামহীর উল্লেখ, তাঁর মানতের বর্ণনা, জননীর জন্ম, তাঁর নাম, তাঁর লালন-পালনের বিস্তারিত বিবরণ, হযরত ঈসা (আ.)-এর জননী কি পানাহার করলেন, শিশু সন্তানকে নিয়ে গৃহে আগমন, পরিবারের লোকদের ভর্ৎসনা, জন্মের পরপরই হযরত ঈসা (আ.)-এর বাকশক্তি প্রাপ্তি, যৌবনে পদার্পণ, স্বজাতিকে ধর্মের প্রতি আহবান, তাদের বিরোধিতা, সহচরদের সাহায্য, ইহুদিদের ষড়যন্ত্র, জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্থিত প্রভৃতি। এরপর মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে তাঁর আরো গুণাবলি, আকার আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণও এমনিভাবে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কুরআন ও হাদীসে কোনো পয়গম্বরের জীবনালেখ্য এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়টিই সকলের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এরূপ কেন করা হয়েছে এবং এর তাৎপর্য কি?

সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত নবী করীম ﷺ হলেন সর্বশেষ নবী, তাঁরপর আর কোনো নবী আসবেন না। এ কারণে তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভাব্য ঘটনাবলি সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই একদিকে তিনি পরবর্তীকালে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সাধারণ গুণাবলির মাধ্যমে ও অনেকের বেলায় নাম উল্লেখ করে তাঁদের অনুসরণ করতে জোর তাকিদ করেছেন। অপরদিকে উম্মতের ক্ষতিসাধানকারী পথভ্রষ্ট লোকদের পরিচয়ও বলেছেন।

পরবর্তীকালে আগমনকারী পথভ্রষ্টদের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হবে দাজ্জাল। তার ফেতনাই হবে সর্বাধিক বিভ্রান্তিকর হযরত নবী করীম ﷺ তার এত বেশি হাল-হাকিকত বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার আগমনের সময়ে সে যে পথভ্রষ্ট, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকবে না। এমনিভাবে পরবর্তীকালে আগমনকারী সংস্কারক ও অনুসরণযোগ্য মনীষীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত ও রিসালাতের সম্মানে ভূষিত করেছেন, দাজ্জালের ফিৎনার সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্যে আকাশে জীবিত রেখেছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জাল হত্যার জন্য নিয়োজিত হবেন। এ কারণে তাঁর জীবনালেখ্য ও গুণাবলি মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে তাঁর অবতরণের সময় তাঁকে চেনার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ ও বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

এর রহস্য ও উপযোগিতা অনেক। প্রথম, তাঁর পরিচয়ে জটিলতা থাকলে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। মুসলিম সম্প্রদায় তাঁর সাথে সহযোগিতা করবে না। ফলে তিনি কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন?

দ্বিতীয়, হযরত ঈসা (আ.) সে সময় নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট হয়ে জগতে আসবেন না; বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করবেন। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি স্বীয় নবুয়তের পদ থেকে অপসারিতও হবেন না। তখন তিনি হবেন প্রাদেশিক শাসকের মতো, যিনি নিজ প্রদেশের শাসক পদে অধিষ্ঠিত থেকেও প্রয়োজনবশতঃ অন্য প্রদেশে চলে যান। তিনি এ প্রদেশে শাসক হিসেবে না এলেও নিজ প্রদেশের শাসক পদ থেকে অপসারিতও নন। মোটকথা এই যে, হযরত ঈসা (আ.) তখনও নবুয়ত ও রিসালাতের গুণে গুণান্বিত হবেন। তাঁকে অস্বীকার করা পূর্বে যেরূপ কুফর ছিল, তখনো কুফর হবে। এমতাবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায় যারা কুরআনি নির্দেশের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী যদি অবতরণের সময় তাঁকে চিনতে না পারে, তবে অবিশ্বাসে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

তৃতীয় হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের ঘটনা দুনিয়ার অন্তিম পর্যায়ে সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় তাঁর অবস্থা ও লক্ষণাদি অস্পষ্ট হলে অন্য কোনো প্রতারকের পক্ষ থেকে এরূপও দাবি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, আমিই মসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম। এখন কেউ এরূপ করলে লক্ষণাদির সাহায্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে। উদাহরণতঃ হিন্দুস্তানে এক সময় মির্জা কাদিয়ানী দাবি করে বসে যে, সে-ই প্রতিশ্রুত মসীহ। মুসলমান ওলামাগণ এসব লক্ষণের সাহায্যেই তার এ ভ্রান্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিপদাপদ মুমিনদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ : فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ এ আয়াতের বিষয়বস্তুতে সামান্য একটি প্রশ্ন দেখা যায় যে, কিয়ামতের মীমাংসার বর্ণনায় একথা বলার মানে কি যে, ইহকাল ও পরকালে শাস্তি দেব? কারণ তখন সে ইহকালের শাস্তি হবেই না।

এর সমাধান এই যে, এ কথাটি অপরাধীকে লক্ষ্য করে বিচারকের এরূপ উক্তির মতোই যে, এখন তোমাকে এক বছর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমতাবস্থায় পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হলে নিশ্চিতরূপেই দুই বছরের সাজা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে এক বছরের সাথে অতিরিক্ত এক বছর যুক্ত হয়ে মোট দুই বৎসর সাজা হবে।

আলোচ্য আয়াতেও তদ্রূপ বুঝা দরকার। ইহকালের সাজা তো হয়েই গেছে। এর সাথে পরকালের সাজা যুক্ত হয়ে কিয়ামতের দিন মোট সাজা পূর্ণ করা হবে। অর্থাৎ, ইহকালের সাজা পরকালের সাজার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কিন্তু মুমিনদের অবস্থা এর বিপরীত। ইহকালে তাদের উপর কোনো বিপদাপদ এলে গুনাহ মাফ হয় এবং পরকালের দণ্ড লঘু অথবা রহিত হয়। সে কারণেই لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মুমিনগণ ঈমানের কারণে আল্লাহর প্রিয়। প্রিয়জনের সাথে এমনি ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে কাফেররা কুফরের কারণে আল্লাহর ঘৃণার পাত্র। ঘৃণিতদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয় না– –[বয়ানুল কুরআন]

কিয়াসের প্রামাণ্যতা : اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিয়াসও শরিয়ত সম্মত প্রমাণ কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম আদমের জন্মের অনুরূপ। অর্থাৎ, আদম (আ.)-কে যেমন জনক ও জননী ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টিকে আদম (আ.)-এর সৃষ্টির উপর কিয়াস করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। –[মাযহারী]

মুবাহালার সংজ্ঞা : فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -কে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুবাহালার সংজ্ঞা এই : যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লা'নতের অর্থ আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে দূরে সরে পড়া। আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে পড়া মানেই খোদায়ী ক্রোধের নিকটবর্তী হওয়া। এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর ক্রোধ বর্ষিত হোক। এরূপ করার পর যে পক্ষ মিথ্যাবাদীর পরিচয়, অবিশ্বাসীদের ভোগ করবে। সেসময় সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিচয় অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এভাবে প্রার্থনা করাকে 'মুবাহালা' বলা হয়। এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একত্রিত করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

مُتَوَفِّيْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّيْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق
অর্থ– মৃত্যুদানকারী।

مُطَهِّرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّطْهِيْرُ মূলবর্ণ (ط . ه . ر) জিনস صحيح
অর্থ– পবিত্রকারী।

نَتْلُوْ সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت . ل . و) জিনস ناقص
واوى অর্থ– আমরা পাঠ করি।

كُنْ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك . و . ن) জিনস
اجوف واوى অর্থ– তোমরা হও।

مُمْتَرِيْنَ সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِمْتِرَاء মূলবর্ণ (م . ر . ى) জিনস ناقص يائى
অর্থ– সন্দেহ পোষণকারী।

تَعَالَوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّعَالِىْ মূলবর্ণ (ع . ل . و)
জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা আস।

نَدْعُ সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص
واوى অর্থ– আমরা আহবান করব।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ : ذٰلِكَ টি اسم اشارة মুবাতদা। نَتْلُوْا ফে'ল যমীরে نحن ফা'য়েল, ه মাফঊল عَلٰى হরফে জার كَ মাজরূর,
উভয় মিলে متعلق হয়েছে, مفعول . فاعل . فعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে خبر হলো।
সুতরাং مبتدا ও خبر মিলে جُمْلَةً اِسْمِيَّةً হলো।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾

অনুবাদ : (৬৩) অতঃপর যদি তারা বিমুখ থাকে তবে নিশ্চয় আল্লাহ খুব জানেন অশান্তিকারীদেরকে।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

(৬৪) আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব! আস, এমন এক কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে [স্বীকার্য হওয়ার দিক দিয়ে] সমান, [তা এই] আমরা ইবাদত করব না আল্লাহ ব্যতীত কারো এবং আল্লাহর সাথে কাউকেও অংশী স্থির করব না এবং স্থির করব না আমাদের মধ্য হতে কেউ অন্য কাউকেও রব আল্লাহকে পরিত্যাগ করে, অতঃপর যদি তারা বিমুখ থাকে, তবে তোমরা বলে দাও, তোমরা এই সাক্ষী থেক যে, আমরা মান্যকারী।

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

(৬৫) হে আহলে কিতাব! কেন বিতর্ক করছ ইবরাহীম সম্বন্ধে? অথচ নাজিল করা হয়নি তাওরাত এবং ইঞ্জিল- কিন্তু তাঁর পর, তবুও কি তোমরা বুঝ না?

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

(৬৬) হ্যাঁ, তোমরা এমন যে, এরূপ বিষয়ে তো তর্ক-বিতর্ক করেছিলে, যাতে তোমাদের কথঞ্চিত জ্ঞান ছিল, কিন্তু এমন বিষয়ে কেন তর্ক-বিতর্ক করতেছ যাতে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নেই? আর আল্লাহ তা'আলা জানেন অথচ তোমরা জান না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৩) فَاِنْ تَوَلَّوْا অতঃপর যদি তারা বিমুখ থাকে তবে فَاِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ عَلِيْمٌ খুব জানেন بِالْمُفْسِدِيْنَ অশান্তিকারীদেরকে।

(৬৪) قُلْ আপনি বলুন يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! تَعَالَوْا আস اِلٰى كَلِمَةٍ এমন এক কথার দিকে سَوَآءٍ সমান بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে [স্বীকার্য হওয়ার দিক দিয়ে] اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ [তা এই] আমরা ইবাদত করব না আল্লাহ ব্যতীত কারো وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا এবং আল্লাহর সাথে কাউকেও অংশী স্থির করব না وَلَا يَتَّخِذَ এবং স্থির করব না بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا আমাদের মধ্য হতে কেউ অন্য কাউকেও রব مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে পরিত্যাগ করে فَاِنْ تَوَلَّوْا অতঃপর যদি তারা বিমুখ থাকে فَقُوْلُوا তবে তোমরা বলে দাও اشْهَدُوْا তোমরা এই সাক্ষী থেক بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ যে আমরা মান্যকারী।

(৬৫) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! لِمَ تُحَآجُّوْنَ কেন বিতর্ক করছ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীম সম্বন্ধে? وَمَاۤ اُنْزِلَتِ অথচ নাজিল করা হয়নি التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ তাওরাত এবং ইঞ্জীল- اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ কিন্তু তাঁর পর اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবুও কি তোমরা বুঝ না?

(৬৬) هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ হ্যাঁ, তোমরা এমন যে حَاجَجْتُمْ এরূপ বিষয়ে তো তর্ক-বিতর্ক করেছিলে, فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ যাতে তোমাদের কথঞ্চিত জ্ঞান ছিল فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ কিন্তু এমন বিষয়ে কেন তর্ক-বিতর্ক করছ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ যাতে তোমাদের মোটেই জ্ঞান নেই? وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ আর আল্লাহ তা'আলা জানেন অথচ তোমরা জান না।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৬৭) ইবরাহীম ইহুদিও ছিলেন না, এবং নাসারাও ছিলেন না বরং [নিশ্চয়] সরলপন্থি [অর্থাৎ] মুসলমান ছিলেন, এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।	مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾
(৬৮) নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী নিশ্চিতরূপে তারাই ছিল, যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল, আর এই নবী [মুহাম্মদ] এবং এই মুমিনগণ [উম্মতে মুহাম্মদী], আর আল্লাহ মুমিনদের সাহায্যকারী।	اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾
(৬৯) অন্তরের সাথে কামনা করে আহলে কিতাবদের এক দল, যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেয়, আর তারা কাউকেও বিপথগামী করতে পারে না কিন্তু নিজেরাই নিজেদেরকে [বিভ্রান্তির শাস্তিতে নিপতিত করছে] অথচ তারা খবর রাখে না।	وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾
(৭০) হে আহলে কিতাব! কেন কুফরি করছ আল্লাহর আয়াতের সঙ্গে? অথচ তোমরা স্বীকার করছ।	يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৭) مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا ইবরাহীম ইহুদিও ছিলেন না وَّلَا نَصْرَانِيًّا এবং নাসারাও ছিলেন না وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا বরং সরলপন্থি মুসলমান ছিলেন وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

(৬৮) اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী নিশ্চিতরূপে তারাই ছিল لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল وَهٰذَا النَّبِيُّ আর এই নবী [মুহাম্মদ ﷺ] وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং এই মুমিনগণ [উম্মতে মুহাম্মদী] وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ আর আল্লাহ মুমিনদের সাহায্যকারী।

(৬৯) وَدَّتْ অন্তরের সাথে কামনা করে طَّآئِفَةٌ এক দল مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ আহলে কিতাবদের لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেয় وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ আর তারা কাউকেও বিপথগামী করতে পারে না কিন্তু নিজেরাই নিজেদেরকে [বিভ্রান্তির শাস্তিতে নিপতিত করছে] وَمَا يَشْعُرُوْنَ অথচ তারা খবর রাখে না।

(৭০) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! لِمَ تَكْفُرُوْنَ কেন কুফরি করছ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াতের সঙ্গে? وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ অথচ তোমরা স্বীকার করছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৪) قوله يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا ... بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, মহান আল্লাহ তা'আলা যখন اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا [ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ আল্লাহ ব্যতীত তাদের পাদ্রী ও পুরোহিতগণকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে] এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, তখন আদী ইবনে হাতেম তাঈ বলেন, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না, রাসূল ﷺ বললেন, যে জিনিসকে তারা হারাম বলে দেয় তা হারাম এবং যে জিনিসকে তারা হালাল বলে দেয় তা হালাল বলে জান কিনা? জবাবে হাতেম বলল, হ্যাঁ, হুজুর! এরূপ করে থাকি। তখন হুজুর ﷺ বললেন, এটা দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে, আর তখন অত্র আয়াত নাজিল হয়। –[সুনানে তিরমিযী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

(৬৫) قوله يَاَهْلَ الْكِتٰبِ ... وَاَنْتُمْ لَا تَعْقِلُوْنَ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নাজরানের খ্রিস্টানদের নিকট ইহুদি আলেমগণ এসে রাসূল ﷺ-এর সম্মুখে ঝগড়া শুরু করে দেয়, ইহুদিরা বলল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহুদি ছিলেন আর খ্রিস্টানরা দাবি করল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) খ্রিস্টান ছিলেন, তাদের এসব দাবি খণ্ডন করে মহান আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াত নাজিল করেন। এতে এ কথা স্পষ্টভাবে বলেন যে, তাঁর বহু পরেই এ ধর্মদ্বয়ে সৃষ্টি বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান। -[তাফসীর ইবনে কাসীর, তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

(৬৯) قوله وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উল্লিখিত আয়াতগুলো ইহুদি আলেমদের কুচক্রান্ত ও মূর্খতা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, ওহুদ যুদ্ধের সময় ইহুদিদের সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ ও কতিপয় আলেম মহানবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী, যেমন হযরত আম্মার, হুযায়ফা ও মা'আয (রা.) প্রমুখকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে আহবান জানায়। মহান আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে বলে দেন যে, এসব দুষ্কর্ম তাদের নিজেদেরকেই ধ্বংসে নিমজ্জিত করছে, অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।

قوله تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ : এ আয়াত থেকে তাবলীগ তথা দীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর একটি মূলনীতি জানা যায়। তা এই যে, ভিন্ন মতাবলম্বী কোনো দলকে দীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে হলে প্রথমে তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতিই আহবান জানানো উচিত, যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রোম সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন এমন বিষয়ের প্রতি আহবান জানান, যাতে উভয়েই একমত ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ। আমন্ত্রণলিপিটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো–

"আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি– যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। এ পত্র আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যে হেদায়েতের পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাই। মুসলমান হয়ে যান; শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। আর যদি বিমুখ হন, তবে আপনার প্রজা সাধারণের গুনাহ আপনার উপর পতিত হবে। হে আহলে কিতাবগণ! এমন এক বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না। তাঁর সাথে অংশীদার করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করব না।" –তাফসীরে ইবনে কাসীর]

আহলে কিতাব দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে : এতে কয়েকটি অভিমত রয়েছে।

১. কিছু সংখ্যকের মতে নাজরানের প্রতিনিধি দলকে বুঝানো হয়েছে।

২. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা মদিনার ইহুদিগণকে বুঝানো হয়েছে।

৩. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে اَهْلُ الْكِتٰبِ দ্বারা ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহুদি ও খ্রিস্টান ছিলেন এটা বলার কারণ কি?

ইহুদি খ্রিস্টানদের পরস্পর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা একথা বলেন, ইহুদিরা বলত যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহুদি ছিলেন, আর খ্রিস্টানরা বলত যে, তিনি নাসারা ছিলেন, তাদের পরস্পর দাবিকে নস্যাৎ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ইবরাহীম (আ.) না ইহুদি ছিলেন, না খ্রিস্টান। কেননা এই দু'টি ধর্মমত তাঁর বহু পরেই দুনিয়াতে এসেছে, তাওরাত ও ইঞ্জীলও তাঁর গমনের অনেক পরেই অবতীর্ণ হয়েছে।

حَنِيْفٌ مُّسْلِمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? হানীফ অর্থ একনিষ্ঠ, সহজ-সরল। আর মুসলিম আত্মসমর্পণকারী, তথা মুসলমান। অতএব যে কেউ যাবতীয় বাতিল মত ও পথ পরিত্যাগ করে একমাত্র হক ও সত্যের পথ আঁকড়ে থেকে আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হন তাকে حَنِيْفًا مُّسْلِمًا বা একনিষ্ঠ মুসলমান বলা হয়।

ইহুদি, নাসারা ও হানীফ কারা?

ইহুদি : যারা হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারী তাদেরকে ইহুদি বলা হয়। এরা 'তাওরাত' নামক কিতাবের অনুসারী পরবর্তী সময়ে তারা তাওরাতকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে তাতে নিজেদের মনগড়া মতবাদ সংযোজন করে নেয়। অনেকগুলো ভ্রান্ত মতবাদ তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

নাসারা : ইহুদিদেরই একাংশ যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনয়ন করেছিল, ইঞ্জীল কিতাবই তাদের ধর্মগ্রন্থ ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর পর তারাও ইহুদিদের ন্যায় ইঞ্জীলের রদবদল করে। এমনকি হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা বা খোদার পুত্র হিসেবে মান্য করত, হযরত মারইয়াম (আ.)-কে খোদার স্ত্রী হিসেবে সাব্যস্ত করত, এরূপ অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস তারা পোষণ করত।

হানীফ : এ সম্প্রদায়ের লোক না ইহুদি না খ্রিস্টান। তারা এ দু'ই সম্প্রদায়ের কাউকে মানতো না; বরং তারা হযরত ইবরহীম (আ.)-এর অনুসারী ছিলেন, একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করতো রাসূলের সময়েও মক্কায় কিছু হানীফ লোক ছিল।

هٰذَا النَّبِىُّ দ্বারা কি উদ্দেশ্য : "এই নবী" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ। যেহেতু তিনি সার্বিক আচার-আচরণে ও মতাদর্শে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকটতম। দীনি পিতা হিসেবে এই জাতির জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন, যেমন ইরশাদ হয়েছে : مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ এ ছাড়া মহানবী ﷺ সরাসরি হযরত ইসমাঈল (আ.) হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। এজন্য তিনিই হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একান্ত ঘনিষ্ট। আর هٰذَا النَّبِىُّ ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সম্মান ও মর্যাদার জন্য।

اِسْمُ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : সাইয়েদুনা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা ছিলেন অমুসলিম তার নাম নিয়ে কিছুটা মতান্তর রয়েছে–

১. কিছু সংখ্যকের মতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম ছিল 'আযর' যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে– وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا

২. কারো মতে তার মূল নাম হলো তারেক, আযর তার উপাধি।

৩. কেউ বলেন, উভয়টি তার নাম।

৪. কিছু সংখ্যক বলেন اٰزَرُ (আযর) তাদের মূর্তির নাম, তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য অথবা তার হঠকারিতার জন্য তাকে ازر [আযর] বলা হয়েছে।

اٰيَاتُ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এর দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

১. এখানে "আল্লাহর আয়াতসমূহ" দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জীলে উল্লিখিত নিদর্শনসমূহ। যাতে মহানবী ﷺ -এর যাবতীয় গুণাবলি ও তাঁর সম্পূর্ণ পরিচিতি বর্ণিত হয়েছে।

২. অথবা اٰيَاتُ اللّٰهِ দ্বারা পবিত্র কুরআন শরীফকে বুঝানো হয়েছে।

৩. অথবা এর দ্বারা মহানবী ﷺ -এর নবুয়তের দলিলসমূহ তথা মু'জিযাকে বুঝানো হয়েছে। –[কাশশাফ]

وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : تَشْهَدُوْنَ শব্দটি شَهَادَةٌ এবং شهود উভয় হতে নির্গত হতে পারে। এ হিসেবে এ তিনটি বিশ্লেষণ হবে।

১. পূর্বে উল্লিখিত اٰيَاتُ اللّٰهِ দ্বারা যদি তাওরাত ও ইঞ্জীল উদ্দেশ্য হয়, তখন تَشْهَدُوْنَ টি شَهَادَةٌ সাক্ষ্য প্রদান মাসদার হতে নির্গত হবে। অর্থ হবে তোমরা উক্ত কিতাবদ্বয় পাঠান্তে সাক্ষ্য প্রদান করছ যে, মুহাম্মদ ﷺ সত্য, তবে কেন অস্বীকার করছ।

২. আর اٰيَاتُ اللّٰهِ দ্বারা যদি পঠিত কুরআন উদ্দেশ্য হয়, তবে شُهُوْد প্রত্যক্ষ করা মাসদার হতে নির্গত হবে তখন অর্থ হবে পবিত্র কুরআনের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে সত্য জেনেও কেন তোমরা তা অস্বীকার করছ।

৩. আর اٰيَاتُ اللّٰهِ যদি সমস্ত اٰيَاتٌ নিদর্শনাবলি উদ্দেশ্য হয়, তখন شُهُوْد ও شَهَادَةٌ হতে নির্গত হয়। আর এটা হবে مَجَازٌ বা রূপক। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলি পর্যবেক্ষণ করে তার উপর জ্ঞান লাভ করে সাক্ষ্য প্রদান করছ। এতদসত্ত্বেও কিভাবে তা অস্বীকার করছ। –[কাশশাফ]

শব্দ বিশ্লেষণ

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّي মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

لَا يَتَّخِذُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– সে বানাবে না।

حَاجَجْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُحَاجَةُ মূলবর্ণ (ح . ج . ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা ঝগড়া করেছ।

وَدَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْوُدُّ মূলবর্ণ (و . د . د) জিনস মুরাক্কাব مثال واوى এবং مضاعف ثلاثى অর্থ– সে চায়, কামনা করে।

مَا يُضِلُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِضْلَالُ মূলবর্ণ (ض . ل . ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বিপথগামী করে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ : এখানে لَا يَتَّخِذُ ফে'ল بَعْضُنَا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে ফা'য়েল بعضا প্রথম মাফউল اَرْبَابًا দ্বিতীয় মাফউল مِنْ دُوْنِ اللهِ মুযাফ-মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে উহ্য شبه فعل এর সঙ্গে متعلق হয়ে اَرْبَابٌ-এর সঙ্গে متعلق হয়ে اَرْبَابٌ এর সিফত। এরপর فعل তার فاعل ও দুই مفعول মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ।

قوله وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ : এখানে مَا كَانَ ফে'লে নাকেস যমীরে هُوَ ইসমে كَانَ উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে كَانَ خبر হলো। সুতরাং اسم كَانَ ও خبر كان মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে।

يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لِمَ تَلۡبِسُوۡنَ الۡحَقَّ بِالۡبَاطِلِ وَتَكۡتُمُوۡنَ الۡحَقَّ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ (٧١)	অনুবাদ : (৭১) হে আহলে কিতাব! কেন মিশ্রিত করছ বাস্তবকে অবাস্তবের সঙ্গে, আর [কেন] গোপন করছ সত্যকে? অথচ তোমরা জান।
وَقَالَتۡ طَّآئِفَةٌ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ اٰمِنُوۡا بِالَّذِىۡۤ اُنۡزِلَ عَلَى الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَجۡهَ النَّهَارِ وَاكۡفُرُوۡۤا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُوۡنَ (٧٢)	(৭২) আর আহলে কিতাবদের কেউ কেউ [মুসলমানদেরকে তাদের স্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে] বলল যে, ঈমান আন তার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে মুসলমানদের উপর, দিনের প্রথমাংশে এবং প্রত্যাখ্যান করে বস দিনের শেষ ভাগে, বিচিত্র নয় যে, তারা [স্বীয় ধর্ম হতে] ফিরে যাবে।
وَلَا تُؤۡمِنُوۡۤا اِلَّا لِمَنۡ تَبِعَ دِيۡنَكُمۡ ؕ قُلۡ اِنَّ الۡهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنۡ يُّؤۡتٰٓى اَحَدٌ مِّثۡلَ مَاۤ اُوۡتِيۡتُمۡ اَوۡ يُحَآجُّوۡكُمۡ عِنۡدَ رَبِّكُمۡ ؕ قُلۡ اِنَّ الۡفَضۡلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ (٧٣)	(৭৩) এবং অন্য কারো সম্মুখে স্বীকার করো না তোমাদের ধর্মের অনুসারী ব্যতীত, (হে মুহাম্মদ) আপনি বলে দিন, নিশ্চয় হেদায়েত আল্লাহর হেদায়েত, তোমরা এরূপ ব্যবহার এই জন্য কর যে, অন্যকেও তেমন বস্তু দেওয়া হচ্ছে যা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, অথবা অন্য লোক তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট, আপনি বলে দিন, নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহরই অধিকারে, তিনি তা প্রদান করেন, যাকে ইচ্ছা, আর আল্লাহ প্রশস্ততার মালিক, মহাজ্ঞানী।
يَّخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الۡفَضۡلِ الۡعَظِيۡمِ (٧٤)	(৭৪) নির্দিষ্ট করে দেন স্বীয় অনুগ্রহের সাথে যাকে ইচ্ছা, আর আল্লাহ তা'আলা অতিশয় অনুগ্রহশীল।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭১) يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! لِمَ تَلۡبِسُوۡنَ কেন মিশ্রিত করছ الۡحَقَّ بِالۡبَاطِلِ বাস্তবকে অবাস্তবের সঙ্গে وَتَكۡتُمُوۡنَ الۡحَقَّ আর [কেন] গোপন করতেছ সত্যকে? وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ অথচ তোমরা জান।

(৭২) وَقَالَتۡ طَّآئِفَةٌ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ আর আহলে কিতাবদের কেউ কেউ বলল যে اٰمِنُوۡا بِالَّذِىۡۤ ঈমান আন তার প্রতি যা اُنۡزِلَ عَلَى الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا নাজিল করা হয়েছে মুসলমানদের উপর وَجۡهَ النَّهَارِ দিনের প্রথমাংশে وَاكۡفُرُوۡۤا اٰخِرَهٗ এবং প্রত্যাখ্যান করে বস দিনের শেষ ভাগে لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُوۡنَ বিচিত্র নয় যে, তারা [স্বীয় ধর্ম হতে] ফিরে যাবে।

(৭৩) وَلَا تُؤۡمِنُوۡۤا এবং অন্য কারো সম্মুখে স্বীকার করো না اِلَّا لِمَنۡ تَبِعَ دِيۡنَكُمۡ তোমাদের ধর্মের অনুসারী ব্যতীত قُلۡ (হে মুহাম্মদ) আপনি বলে দিন اِنَّ الۡهُدٰى هُدَى اللّٰهِ নিশ্চয় হেদায়েত আল্লাহর হেদায়েত اَنۡ يُّؤۡتٰٓى اَحَدٌ তোমরা এরূপ ব্যবহার এই জন্য কর যে, অন্যকেও তেমন বস্তু দেওয়া হচ্ছে مِّثۡلَ مَاۤ اُوۡتِيۡتُمۡ যা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল اَوۡ يُحَآجُّوۡكُمۡ অথবা অন্য লোক তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে عِنۡدَ رَبِّكُمۡ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট قُلۡ আপনি বলে দিন اِنَّ الۡفَضۡلَ নিশ্চয় অনুগ্রহ بِيَدِ اللّٰهِ আল্লাহরই অধিকারে يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ তিনি তা প্রদান করেন যাকে ইচ্ছা وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ আর আল্লাহ প্রশস্ততার মালিক মহাজ্ঞানী।

(৭৪) يَّخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهٖ নির্দিষ্ট করে দেন স্বীয় অনুগ্রহের সাথে مَنۡ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَاللّٰهُ ذُو الۡفَضۡلِ الۡعَظِيۡمِ আর আল্লাহ তা'আলা অতিশয় অনুগ্রহশীল।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (٧٥)

অনুবাদ : (৭৫) আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ এরূপ যে, যদি তুমি তার নিকট রাশি রাশি ধনও গচ্ছিত রাখ, তবুও সে তা তোমার নিকট ফিরিয়ে দিবে, আর তাদেরই কেউ এরূপ যে, যদি তুমি তার নিকট একটি মাত্র দিনারও গচ্ছিত রাখ, তবে সে তাও তোমাকে ফিরিয়ে দিবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তার শিরোপরি দাঁড়িয়ে থাক, এটা [গচ্ছিত ধন ফেরত না দেওয়া] এই জন্য যে, তারা বলে, আমাদের উপর আহলে কিতাব ছাড়া অন্য কারো [ধন-সম্পদ] সম্বন্ধে [ধর্মতঃ] কোনোরূপ অভিযোগ নেই এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তারাও জানে।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (٧٦)

(৭৬) অভিযোগ কেন হবে না? যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন এমন পরহেজগারগণকে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٧٧)

(৭৭) নিশ্চয় যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং স্বীয় শপথসমূহের পরিবর্তে সামান্য বিনিময় গ্রহণ করে, তারা পরকালে কোনো অংশ পাবে না, আর আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না, এবং দৃষ্টিপাতও করবেন না তাদের প্রতি কিয়ামত দিবসে, এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৫) وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ এরূপ যে مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ যদি তুমি তার নিকট গচ্ছিত রাখ بِقِنْطَارٍ রাশি রাশি ধনও يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ তবুও সে তা তোমার নিকট ফিরিয়ে দিবে وَمِنْهُمْ আর তাদেরই কেউ এরূপ যে مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ যদি তুমি তার নিকট একটি মাত্র দিনারও গচ্ছিত রাখ لَا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ তবে সে তাও তোমাকে ফিরিয়ে দিবে না اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا যে পর্যন্ত না তুমি তার শিরোপরি দাঁড়িয়ে থাক, ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا এটা [গচ্ছিত ধন ফেরত না দেওয়া] এই জন্য যে, তারা বলে لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ আমাদের উপর আহলে কিতাব ছাড়া অন্য কারো [ধন-সম্পদ] সম্বন্ধে [ধর্মতঃ] কোনোরূপ অভিযোগ নেই وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অথচ তারাও জানে।

(৭৬) بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ অভিযোগ কেন হবে না? যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ করে; وَاتَّقٰى এবং আল্লাহকে ভয় করে فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ তবে নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন [এমন] পরহেজগারগণকে।

(৭৭) اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ নিশ্চয় যারা গ্রহণ করে بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং স্বীয় শপথসমূহের পরিবর্তে ثَمَنًا قَلِيْلًا সামান্য বিনিময় اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ তারা পরকালে কোনো অংশ পাবে না وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ আর আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ এবং দৃষ্টিপাতও করবেন না তাদের প্রতি يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে وَلَا يُزَكِّيْهِمْ এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ আর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৭১) قوله يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলন, আহলে কিতাব, আব্দুল্লাহ বিন সাইফ, আদী বিন যায়েদ ও হারেছ বিন আউফ পরস্পর বলল যে, চল আমরা মুহাম্মদ ও তার সাথীদের প্রতি যা অবতরণ করা হয়, সকালে তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করি আর সন্ধ্যায় তার প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করি । যাতে করে তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের মাঝে বিভ্রান্তি বা হ-জ-ব-র-ল সৃষ্টি হয়ে যায় । তাহলে আমরা যা করি তারাও আমাদের অনুসরণে তাই করে যাবে । ফলে তারা নিজেদের ধর্ম থেকে ফিরে আসবে । তাদের এমন বিভ্রান্তি কর কর্মসূচির জবাবে আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন । –[ফাতহুল কাদীর : ৩৬২/১]

(৭২) قوله وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতটি ইহুদি আলেমদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় । ঘটনা এই যে, একদা খায়বারের ১২ জন ইহুদি আলেম পরস্পর সলা-পরামর্শ করে বলল যে, আস দিনের প্রথমাংশে মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে মৌখিকভাবে ঈমান আনয়ন করব । আর তা দিনের শেষ বেলায় অস্বীকার করে বলব 'আমরা আমাদের কিতাবে ভালোভাবে দেখেছি । আর আমাদের আলেমদের সাথে পরামর্শ করেছি । কিন্তু কিতাবে বর্ণিত গুণ বৈশিষ্ট্যাবলি মুহাম্মদের মধ্যে নেই । সে মিথ্যা ও তার ধর্ম বাতিল । এরূপ করলে তাঁর অনুসারীরা সন্দেহে পড়ে যাবে । ফলে তারা ফিরেও আসতে পারে । তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতরণ করেন । –[কাশশাফ]

অথবা : কারো মতে অত্র আয়াতটি কেবলা পরিবর্তনের পর ইহুদিদের ষড়যন্ত্র উপলক্ষে অবতীর্ণ হয় । বর্ণিত আছে যে, ইহুদিদের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ তার সাথীদের বলল যে, তোমরা মুসলমানদের উপর ঈমান এনে দিনের প্রথম ভাগে কা'বার দিকে ফিরে নামাজ পড়বে আর দিনের শেষের দিকে صَخْرَة তথা বায়তুল মাকাদিসের দিকে ফিরে নামাজ পড়বে । এতে মুসলমানরা ধারণা করবে যে, তারা আমাদের থেকে অধিক জ্ঞানী । ফলে তারা ইসলাম ত্যাগ করে ফিরে আসতে পারে । –[কাশশাফ]

(৭৫) قوله وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ............ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক কোরেশী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর নিকট [ইহুদি থাকা অবস্থায়] বারশত আওকিয়া পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রা গচ্ছিত রাখল, কিছুদিন পর আমানতকৃত স্বর্ণমুদ্রা সে ফেরত চাইলে তৎক্ষণাৎ সে তা তাকে দিয়ে দিল ।

অপর দিকে ফানখাজ ইবনে আযওয়ারা নামক ইহুদির নিকট একজন কোরেশী একটি মাত্র দিনার আমানত রাখল । যখন সে তার দিনারটি চাইল তখন সে অস্বীকার করে বলল, সে ইহুদি নয়, সে মূর্খ কাজেই তাদের সম্পদ আমাদের জন্য বৈধ । তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করলে জবাবাদিহী করতে হবে না, তাদের সম্পর্কেই উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় । –[কাশশাফ]

(৭৭) قوله اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, ইহুদি আলেমগণ উৎকোচ গ্রহণ করে তাওরাতের বিভিন্ন আহকামকে গোপন করে রাখত, অথবা তাওরাতের সে স্থানে নিজেদের মনগড়া হুকুম লিপিবদ্ধ করে দিত । এমনিভাবে তারা মহানবী ﷺ -এর পরিচিতি ও গুণাবলি গোপন করে রাখত, কারো নিকট বলত না । এমনকি কসম করে বলত, তাওরাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিচয় এরূপ নেই । তখন মহান আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দেন ।

অথবা অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, উক্ত আয়াতটি আশয়াছ ইবনে কায়েস ও তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় । ঘটনা হলো আশয়াছ ইবনে কায়েস ও তার চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে একখণ্ড জমি অথবা একটি কূপ নিয়ে বিবাদ ছিল । উভয়ে মীমাংসার জন্য রাসূল ﷺ-এর নিকট মোকাদ্দামা পেশ করে । তখন রাসূল ﷺ প্রতিপক্ষকে বললেন, "তোমার দাবির স্বপক্ষে দলিল পেশ কর" সে বলল, আমার কোনো প্রমাণ নেই । এরপর আশ'য়াছকে বললেন যে, "তুমি হলফ কর" সে শপথ করতে ইচ্ছা পোষণ করলে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ।

مَنْ هُمْ طَائِفَةٌ : একটি দল কারা : طَائِفَةٌ (দল) দ্বারা ইহুদিদের একদলকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে তারা হলো খায়বারের ১২ জন ইহুদি আলেম। আর কেউ বলেন এরা হলো কা'ব ইবনে আশরাফ ও তার সহযোগীরা।

قَوْلُهُ إِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা : এর দ্বারা মহান আল্লাহ এ কথার উপর সতর্ক করেছেন যে, তাদের এরূপ প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা কোনো উপকারেই আসবেনা। তথা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় করুণা দ্বারা মুসলমান হবার তৌফিক প্রদান করেন এবং তাঁকে ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকারও সুযোগ প্রদান করেন। সুতরাং হে আহলে কিতাবগণ তোমরা শত চেষ্টা ও কৌশল করেও তাকে দীন হতে সরাতে পারবে না। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। তিনিই হেদায়েতের ও পথ ভ্রষ্টতার প্রকৃত মালিক।

مَا أُوْتِيْتُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? : এর দ্বারা কিতাব, হিকমত এবং মর্যাদাসমূহ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কুচক্রী ইহুদিরা সর্বদা এই কথা প্রচার করত যে, পৃথিবীতে ইহুদি জাতিকেই ধর্মীয় জ্ঞানের ইজারাদারী দেওয়া হয়েছে। তাওরাত কিতাব আমাদের উপরই অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর মতো উচ্চ মর্যদা সম্পন্ন নবী আমাদের মধ্যেই প্রেরিত হয়েছে। অধিকাংশ নবী আমাদের বংশেই এসেছে। কাজেই এরূপ গুণ অন্য কোনো বংশ পাক তা তারা চাইতো না এবং আরবের নিরক্ষর লোকগুলো এর দ্বারা সম্মানিত হবে তা তাদের চক্ষুশূল ছিল।

اَلْمُرَادُ بِفَضْلِ اللّٰهِ আল্লাহর অনুগ্রহ দ্বারা উদ্দেশ্য : فَضْلُ اللّٰهِ দ্বারা হেদায়েত, নবুয়ত, ইসলাম, শরিয়ত, ঈমান এসবই উদ্দেশ্য। এসবই আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে এসব দান করেন, যাকে ইচ্ছা তা হতে বঞ্চিত করেন।

اَلْقِنْطَارُ وَالدِّيْنَارُ দ্বারা উদ্দেশ্য : قِنْطَار একবচন, বহুবচনে قَنَاطِيْر সাধারণত বহু পরিমাণের ধন সম্পদকে قَنَاطِيْر বলা হয়।

دِيْنَارٌ একবচন, বহুবচনে دَنَانِيْر অর্থ– এক দিনার তথা এক তোলার $\frac{১}{৪}$ অংশ তবে এখানে قِنْطَارٌ দ্বারা অধিক সম্পদ বুঝানো হয়েছে। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে। যদি তার নিকট অধিক মাল গচ্ছিত রাখা হয় তবে সে যথা সময়ে ফেরত দেয়।

আর دِيْنَارٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বল্প সম্পদ আহলে কিতাবদের সাথে কিছু এমন লোক রয়েছে যাদের নিকট একেবারে স্বল্প পরিমাণ সম্পদ আমানত রাখলে তাও ফেরত দেয় না।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ : "আমাদের উপর উম্মীদের কোনো অধিকার নেই" এর বাখ্যা হলো ইহুদিরা বলত যে, আমরা পৃথিবীতে সম্মানিত। কাজেই যারা আমাদের ধর্মের অনুসারী নয় তাদের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করলে কোনো অপরাধ নেই। তাদের ধন-সম্পদ আমাদের জন্য বৈধ।

এছাড়া তারা আরো মনে করত যে, তারা আল্লাহর পুত্র আর অন্যান্যরা তাদের সেবক এবং চাকর-বাকর। কাজেই তাদের সবকিছুই বৈধ।

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ : আল্লাহর উপর তারা কি মিথ্যা বলত? ইহুদিরা বলত যে, উম্মীদের আমানত খেয়ানত করা আমাদের জন্য বৈধ "এটা তাওরাতে রয়েছে। অথচ তাওরাতে এরূপ কোনো কথা নেই। তারা নিজেরাও জানে যে, এটা তাওরাতের কথা নয়। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই তারা এরূপ বলত। তাওরাত ঐশী গ্রন্থ হিসেবে, এই মিথ্যাচারটা আল্লাহর উপর গিয়ে পড়ে, আর এটাই হলো আল্লাহর উপর মিথ্যা বলা।

আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি এবং তাদের শপথসমূহ কি?

عَهْدُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি বলতে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে যা তারা নবীদের মাধ্যমে মহানবী ﷺ -এর উপর ঈমান আনয়নের ব্যাপারে করেছে যে, তার সহযোগিতা করবে তার যাবতীয় গুণাবলি প্রকাশ করে নিজেরা ঈমান আনবে এবং অন্যদেরকেও ঈমান আনার জন্য উৎসাহিত করবে।

أَيْمَانِهِمْ : এটি يَمِيْنٌ -এর বহুবচন, শাব্দিক অর্থ হলো 'কসম' এখানে উদ্দেশ্য হলো তাদের পারস্পরিক লেন-দেন ও বান্দার হকের ব্যাপারে কৃত ওয়াদাসমূহ।

مَعْنٰى قَوْلِهٖ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ : আল্লাহ তাদের প্রতি তাকাবেন না" এর অর্থ হলো এই নয় যে, আল্লাহ তাদেরকে দেখবেন না; বরং হাশরের ময়দানে আল্লাহ সবাইকে দেখবেন তাঁর দৃষ্টির আড়াল কেউ হবে না। এখানে অর্থ হলো তিনি তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি দিবেন না; বরং রাগ ও গোস্বার দৃষ্টিতে তাকাবেন।

مَعْنٰى وَلَا يُزَكِّيْهِمْ : তিনি তাদেরকে পবিত্র করবেন না, অর্থাৎ তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন গুনাহ ও পাপ থেকে পবিত্র ও মুক্ত করবেন না এবং ক্ষমাও করবেন না; বরং পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণ করে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। অথবা وَلَا يُزَكِّيْهِمْ অর্থ– وَلَا يُثْنِىْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ তিনি তাদের প্রশংসা করবেন না। যেরূপ বিশ্বাসী পবিত্রাত্মাদের প্রশংসা করবেন।

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

কুরআন ও সুন্নায় অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। উল্লিখিত ৭৭ নং আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে পাঁচটি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে–

১. জান্নাতের নিয়ামতসমূহে তার কোনো অংশ নেই।

২. আল্লাহ তা'আলা তার সাথে অনুকম্পাসূচক কথা বলবেন না।

৩. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না।

৪. আল্লাহ তার পাপ মার্জনা করবেন না। কেননা ওয়াদা ভঙ্গকারী বান্দার হক নষ্ট করেছে, বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ মার্জনা করেন না।

৫. তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

اُوْتِيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

يُحَاجُّوْكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُحَاجَّةُ মূলবর্ণ (ح . ج . ج) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা বিজয়ী হবে।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ي . ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– তিনি চান।

قِنْطَارٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে قناطير অর্থ– প্রচুর মাল।

لَا يُؤَدِّه : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّادِيَةُ মূলবর্ণ (أ . د . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– সে ফেরত দিবে না।

اِتَّقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে তাকওয়া অবলম্বন করে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ : এখানে قُلْ ফে'ল যমীরে انت ফা'য়েল اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَلْهُدٰى ইসমে ইন্না هُدىٰ মুযাফ আর اللّٰهُ মুযাফ ইলাইহি উভয় মিলে اِنَّ এর خبر হলো اِنَّ তার اسم ও خبر নিয়ে জুমলা হয়ে مفعول হলো। সুতরাং فعل . فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : এখানে اللّٰهُ শব্দটি মুবাতাদা ذو মুযাফ اَلْفَضْل মওসূফ اَلْعَظِيْم সিফাত صفت ও موصوف মিলে মুযাফ ইলাইহি হলো مضاف ও مضاف اليه মিলে خبر অতএব مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾

অনুবাদ : (৭৮) আর নিশ্চয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন যে, বক্র করে নিজেদের ভাষাকে কিতাব [পাঠ] -এর মধ্যে, যেন তোমরা তাকে মনে কর কিতাবের অংশ অথচ তা কিতাবের অংশ নয়, এবং তারা বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে, অথচ এটা [কিছুতেই] আল্লাহর নিকট হতে নয়, আর তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথচ তারা জানে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾

(৭৯) কোনো মানুষের পক্ষ এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিতাব এবং জ্ঞান ও নবুয়ত প্রদান করেন, অতঃপর সে লোকদেরকে বলবে, আমার বান্দা হয়ে যাও, আল্লাহকে ত্যাগ করে; বরং সে বলবে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, এই জন্য যে, তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং এই জন্য যে, তোমরা তা পাঠ কর।

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾

(৮০) আর এ কথারও নির্দেশ করবেন না যে, তোমরা ফেরেশতাদেরকে এবং নবীদেরকে রব স্থির করে নাও, তিনি কি তোমাদেরকে কুফরি কথা বলে দিবেন? এটার পর যে, তোমরা মুসলমান হয়েছ।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৮) وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا আর নিশ্চয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন যে يَلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ বক্র করে নিজেদের ভাষাকে بِالْكِتٰبِ কিতাব [পাঠ] -এর মধ্যে لِتَحْسَبُوْهُ যেন তোমরা তাকে মনে কর مِنَ الْكِتٰبِ কিতাবের অংশ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ অথচ তা কিতাবের অংশ নয় وَيَقُوْلُوْنَ এবং তারা বলে যে هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ এটা আল্লাহর নিকট হতে وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ অথচ এটা [কিছুতেই] আল্লাহর নিকট হতে নয় وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ আর তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অথচ তারা জানে।

(৭৯) مَا كَانَ لِبَشَرٍ কোনো মানুষের পক্ষ এটা সম্ভব নয় যে اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রদান করেন الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ কিতাব এবং জ্ঞান ও নবুয়ত ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ অতঃপর সে লোকদেরকে বলবে كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ আমার বান্দা হয়ে যাও مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ত্যাগ করে وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ বরং সে বলবে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ এই জন্য যে, তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ এই জন্য যে, তোমরা তা পাঠ কর।

(৮০) وَلَا يَاْمُرَكُمْ আর এ কথারও নির্দেশ করবেন না যে اَنْ تَتَّخِذُوا তোমরা স্থির করে নাও الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ ফেরেশতাদেরকে এবং নবীদেরকে اَرْبَابًا রব اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ তিনি কি তোমাদেরকে কুফরি কথা বলে দিবেন? بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ এটার পর যে, তোমরা মুসলমান হয়েছ।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ (٨١)

অনুবাদ : (৮১) আর যখন আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি নিলেন, নবীগণ হতে যে, আমি যাকিছু তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান দান করি, অতঃপর যখন তোমাদের নিকট কোনো নবী আসেন, যিনি সত্যতা প্রতিপাদনকারী হন তার যা তোমাদের নিকট রয়েছে, তখন তোমরা অবশ্য সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং তাঁর সাহায্যও করবে, বললেন, তোমরা কি একরার করলে এবং এই বিষয়ে আমার প্রতিশ্রুতি [নির্দেশ] কবুল করলে? তাঁরা [নবীগণ] বললেন, আমরা একরার করলাম, [আল্লাহ] বললেন, তবে সাক্ষী থেক এবং আমি [-ও] এটার প্রতি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (٨٢)

(৮২) সুতরাং যে ব্যক্তি ফিরে যাবে তার পরে, তবে এরূপ ব্যক্তিই হুকুম অমান্যকারী।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ (٨٣)

(৮৩) তবে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা অন্বেষণ করে? অথচ আল্লাহর সমীপে সমস্তই নতশির রয়েছে, যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা জমিনে আছে– স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায়, আর সমস্তকে আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮১) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ আর যখন আল্লাহ তা'আলা নিলেন مِيْثَاقَ প্রতিশ্রুতি النَّبِيّٖنَ নবীগণ হতে لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ যে আমি যা কিছু তোমাদেরকে দান করি مِّنْ كِتٰبٍ কিতাব وَّحِكْمَةٍ ও জ্ঞান ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ অতঃপর যখন তোমাদের নিকট কোনো নবী আসেন مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ যিনি সত্যতা প্রতিপাদনকারী হন তার যা তোমাদের নিকট রয়েছে لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ তখন তোমরা অবশ্য সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে وَلَتَنْصُرُنَّهٗ এবং তাঁর সাহায্যও করবে قَالَ বললেন ءَاَقْرَرْتُمْ তোমরা কি একরার করলে وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ এবং এই বিষয়ে কবুল করলে? اِصْرِىْ আমার প্রতিশ্রুতি। قَالُوْٓا তাঁরা [নবীগণ] বললেন اَقْرَرْنَا আমরা একরার করলাম قَالَ [আল্লাহ] বললেন فَاشْهَدُوْا তবে সাক্ষী থেক وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ এবং আমি [-ও] এটার প্রতি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম।

(৮২) فَمَنْ تَوَلّٰى সুতরাং যে ব্যক্তি ফিরে যাবে بَعْدَ ذٰلِكَ তার পরে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ তবে এরূপ ব্যক্তিই হুকুম অমান্যকারী।

(৮৩) اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ তবে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা অন্বেষণ করে? وَلَهٗٓ اَسْلَمَ অথচ আল্লাহর সমীপে সমস্তই নতশির রয়েছে مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা জমিনে আছে– طَوْعًا وَّكَرْهًا স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ আর সমস্তকে আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৭৯) قوله ما كان لبشر ان يؤتيه الله الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে যে, নাজরানের খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা রাসূল ﷺ-এর দরবারে আসলে হুজুর ﷺ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তখন ইহুদিদের মধ্যে আবূ রাফে কোরাজি বলে উঠল, হে মুহাম্মদ! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার ইবাদত করি? যেভাবে নাসারাগণ হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত করে। রাসূল ﷺ বললেন কখনো নয়, আমি তো এতটুকু বলি যে, তোমরা পূর্বে যেরকম দীনদার ছিলে, এখন সে দীনদারী নেই, কাজেই ইসলাম গ্রহণ করে পরিপূর্ণ দীনদার হয়ে যাও। তবেই উভয় জাহানে তোমাদের মঙ্গল হবে। তখন অত্র আয়াত নাজিল হয়।

অথবা অন্য বর্ণনায় আছে, জনৈক সাহাবী রাসূল ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আমরা পরস্পর সালামের ন্যায় আপনাকে সালাম করে থাকি। তেমনি আমরা আপনাকে সেজদা করতে পারি না? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করা হারাম; বরং তোমরা নবীকে সম্মান কর মর্যাদার সাথে তখন অত্র আয়াত নাজিল হয়। –[কাশশাফ, মা'আরেফুল কুরআন]

(৮৩) قوله أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, আহলে কিতাবগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীন নিয়ে ঝগড়া করে মহানবী ﷺ-এর নিকট মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয়। তাদের উভয় দলই এ দাবি উত্থাপন করল যে, তারা ইবরাহীম (আ.)-এর বেশি নিকটতম। রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা উভয় দলই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীন থেকে বৈরি, তথা তাঁর দীনের উপর কেউই নেই; বরং আমিই তাঁর দীনের অনুসারী' তখন তারা বলল, আমরা আপনার ফয়সালায় সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আর আপনার দীনও গ্রহণ করব না, তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

আয়াতে فَرِيْقًا দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? : এখানে আহলে কিতাবদের একদলকে বুঝানো হয়েছে। যারা কিতাবকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নিজেদের মনগড়া কথা জুড়ে দিত।

কাশশাফ গ্রন্থকারের মতে এরা হলেন كَعْبُ بْنُ الْاَشْرَفِ (কা'ব বিন আশরাফ) مَالِكُ بْنُ الصَّيْفِ (মালেক বিন সাইফ) حُيَيُّ بْنُ اَخْطَبَ (হুয়াই বিন আখতাব) ও অন্যান্যরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা হলেন ইহুদিরা যারা কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট এসে তাওরাতে উল্লিখিত রাসূলের গুণাবলিকে পরিবর্তন করে ফেলে এরপর বনূ কুরাইযারা তা গ্রহণ করে তাদের কিতাবের সাথে সংমিশ্রণ করে নেয়।

বিকৃতির ধরন : এখানে রয়েছে يَلْوُنَ اَلْسِنَتَهُمْ অন্য আয়াতে রয়েছে يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه-এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা তাওরাতকে উচ্চারণের সময় স্থান হতে ব্যতিক্রম করে পড়ে। এতে ভুল অর্থ বেরিয়ে পড়ে। অথবা মহানবী ﷺ-এর গুণাবলির স্থানগুলো অত্যন্ত কঠিন ছিল বলে তারা অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে মানুষদেরকে ভুল অর্থ বলে বলতো যে, এটাই আল্লাহর (কালামের) উদ্দেশ্য।

অন্য আয়াতে রয়েছে يَكْتُبُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ-এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা নিজ হাতে লিখেও পরিবর্তন করতো তথা তাদের মনগড়া মতবাদ ও রাসূল ﷺ-এর গুণাবলির পরিবর্তন করে নিজ হাতে লিখে নিত এবং একে আল্লাহর কালাম বলে চালিয়ে দিত।

এখন এটা বলা যায় যে, তারা বিকৃতি করে পড়ে এবং সরাসরি পরিবর্তন পরিবর্ধন দ্বারা তাওরাতের (تَحْرِيْف) বিকৃতি সাধন করেছিল।

اَلرَّبَّانِيِّيْنَ এর অর্থ কি? رَبَّانِيِّيْنَ শব্দটি رَبَّانِيٌّ-এর বহুবচন, একে اَلرَّبُّ এর দিকে نِسْبَةً করা হয়েছে, অর্থ হলো– وَهُوَ اَلشَّدِيْدُ التَّمَسُّكُ بِدِيْنِ اللّٰهِ وَطَاعَتِه : তথা শক্তভাবে আল্লাহর দীন ও তার অনুসরণকে আঁকড়ে ধরা। অতএব যারা কঠোরভাবে আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলে তাদেরকে رَبَّانِيٌّ বলা হয়। যেমনি হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মৃত্যুর দিন বলেছিলেন– اَلْيَوْمَ مَاتَ رَبَّانِيُّ هٰذِهِ الْاُمَّةِ আজ এই উম্মতের অতি আল্লাহভীরু ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন।

ইমাম মুবাররাদের মতে رَبَّانِيُّوْنَ বলতে اَرْبَابُ الْعِلْمِ তথা জ্ঞানীদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে যায়েদ বলেন– মানুষের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করে তাদেরকে رَبَّانِيُّوْنَ বলা হয়।

হযরত হাসান (র.) বলেন رَبَّانِيُّوْنَ হলো আলেম ও ফকীহগণ।

কারো মতে رَبَّانِيُّوْنَ হলেন مُعَلِّمُوْنَ তথা শিক্ষকগণ যারা অধিক জানে এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেন। –[কাশশাফ]

اَلْمِيْثَاقُ-এর অর্থ এবং এর প্রকারভেদসমূহ : مِيْثَاقٌ এর অর্থ– অঙ্গীকার বা শপথ, পবিত্র কুরআনের দ্বারা বুঝা যায় যে, مِيْثَاقٌ মোট তিনটি হয়েছে। এই তিনটি আল্লাহর কাছ থেকে নিয়েছে।

১. مِيْثَاقٌ عَلَى الرُّبُوْبِيَّةِ : **একত্ববাদের অঙ্গীকার :** তথা সকল মানব জাতির নিকট হতে মহান আল্লাহ তার অস্তিত্ব ও রবূবিয়াতের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, যেহেতু ধর্মের গোটা প্রাচীর ও ভিত্তির উপরই নির্মিত, যেমন, ইরশাদ হয়েছে– اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى

২. مِيْثَاقٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ : **কিতাবধারীদের থেকে অঙ্গীকার :** এই ওয়াদা শুধু আহলে কিতাবদের আলেমদের থেকে নেওয়া হয়েছে যেন তারা সত্য গোপন না করে। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে– وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ

৩. مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ : **নবীদের অঙ্গীকার** : হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- আল্লাহ তা'আলা সব পয়গাম্বর থেকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে এই অঙ্গীকার নেন যে, তারা তার উপর ঈমান আনবে এবং তাদের উম্মতদেরকেও এই নির্দেশ দিবে। যেমনভাবে রাসূল ﷺ বলেছেন- "আজ যদি হযরত মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তারও গত্যন্তর ছিল না।" -[ইবনে কাছীর, আহমদী]

قوله فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ : এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে-

১. এর দ্বারা নবী এবং তাদের সন্তানদের দিকে اشارة করা হয়েছে, অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের উপর সাক্ষী থাক অন্যের উপর নয়, আর আমি তোমাদের সাথে রয়েছি।

২. অথবা فَاشْهَدُوا দ্বারা ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

৩. অথবা সকলকে অবহিত করণই উদ্দেশ্য যাতে তারা প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করতে না পারে।

قوله طَوْعًا وَكَرْهًا : **ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাকে মানার ব্যাখ্যা** : এর কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

আসমান জমিনের সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে কিন্তু মানবজাতির কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছায় তাকে মানে আর কিছু অনিচ্ছায় মানে। যেমন-

১. মুসলমানগণ স্বেচ্ছায় তাকে মানে আর অমুসলমান মৃত্যুর সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করে। যা তার থেকে গৃহীত হবে না।

২. রোগ, শোক, মৃত্যু, জীবন, দরিদ্রতা ইত্যাদি মুসলমানরা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে, আর অমুসলমানরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করে না।

৩. কিছু সংখ্যক বুঝে শুনে দীন গ্রহণ করে আর কিছু সংখ্যক জোরপূর্বক দীন গ্রহণ করবে। যেমন- বনী ইসরাঈলদের উপর পাহাড় ধরে দীন গ্রহণ করানো হয়েছে। -[কাশশাফ]

শব্দ বিশ্লেষণ

يَلْوُنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার لَيًّا মূলবর্ণ (ل - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- তারা ব্যঙ্গ করে পড়ে।

أَلْسِنَةٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন لِسَانٌ অর্থ- জিহ্বা।

رَبَّانِيِّينَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন رَبَّانِيٌّ অর্থ- আল্লাহওয়ালাগণ, এক আল্লাহর ইবাদতকারীগণ।

كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّعْلِيْمُ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা শিক্ষা দাও।

أَقْرَرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْرَارُ মূলবর্ণ (ق - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তোমরা স্বীকার করেছ।

إِصْرِيْ : অর্থ- আমার প্রতিশ্রুতি।

يَبْغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তারা চায়।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ : এখানে يَقُوْلُوْنَ ফে'ল যমীরে هُمْ যুলহাল عَلَى اللّٰهِ জার মাজরূর মিলে متعلق হয়েছে। আর اَلْكَذِبَ মাফউল واو হালিয়া هُمْ মুবতাদা يَعْلَمُوْنَ ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে খবর। এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة হয়ে حال এবার ذو الحال ও حال মিলে فاعل সুতরাং فعل - فاعل - متعلق ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا : এখানে لَا يَأْمُرُ ফে'ল যমীরে هُوَ ফা'য়েল كُمْ প্রথম মাফউল اَنْ মাসদারিয়া تَتَّخِذُوْا ফে'ল اَلْمَلٰئِكَةَ মা'তূফ আলাইহি واو হরফে আতফ اَلنَّبِيّٖنَ মা'তূফ এবার معطوف عليه ও معطوف মিলে প্রথম মাফউল আর اَرْبَابًا দ্বিতীয় মাফউল। অতএব فعل - فاعل ও দুই مفعول নিয়ে جملة فعلية হলো।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾

অনুবাদ : (৮৪) আপনি বলে দিন, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি আর তার প্রতি যা আমাদের উপর নাজিল করা হয়েছে, আর তার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে ইবরাহীম ও ইসমাঈল ও ইসহাক ও ইয়াকূব এবং ইয়াকূবের সন্তানদের প্রতি, আর তার প্রতিও যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের নিকট হতে, আমরা তাঁদের কারো মধ্যে [ঈমান আনয়নে] পার্থক্য করি না, এবং আমরা তো আল্লাহরই অনুগত।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

(৮৫) আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করবে, তবে সেটা তা হতে গৃহীত হবে না, আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾

(৮৬) আল্লাহ কিরূপে হেদায়েত করবেন এমন কওমকে, যারা কাফের হয়ে গেছে ঈমান আনার পর এবং নিজেদের এই স্বীকৃতির পর যে রাসূল সত্য এবং এর পর যে, তাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ পৌঁছেছিল, আর আল্লাহ তা'আলা এমন জালেম কওমকে হেদায়েত করেন না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾

(৮৭) এরূপ লোকের শাস্তি এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহরও লা'নত এবং ফেরেশতাদেরও আর মানুষেরও- সকলেরই।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৪) قُلْ আপনি বলে দিন اٰمَنَّا بِاللّٰهِ আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا আর তার প্রতি যা আমাদের উপর নাজিল করা হয়েছে وَمَآ اُنْزِلَ আর তার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে عَلٰى প্রতি اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ ইবরাহীম ও ইসমাঈল وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ও ইসহাক ও ইয়াকূব وَالْاَسْبَاطِ এবং ইয়াকূবের সন্তানদের প্রতি وَمَآ اُوْتِيَ আর তার প্রতিও যা দেওয়া হয়েছে مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণকে مِنْ رَّبِّهِمْ তাঁদের রবের নিকট হতে لَا نُفَرِّقُ আমরা তাঁদের [ঈমান আনয়নে] পার্থক্য করি না بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ কারো মধ্যে وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ এবং আমরা তো আল্লাহরই অনুগত।

(৮৫) وَمَنْ يَّبْتَغِ আর যে ব্যক্তি অন্বেষণ করবে غَيْرَ الْاِسْلَامِ ইসলাম ব্যতীত دِيْنًا অন্য কোনো ধর্ম فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ তবে সেটা তা হতে গৃহীত হবে না وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ আর সে পরকালে হবে مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

(৮৬) كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ আল্লাহ কিরূপে হেদায়েত করবেন قَوْمًا এমন কওমকে كَفَرُوْا যারা কাফের হয়ে গেছে بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ঈমান আনার পর وَشَهِدُوْا এবং নিজেদের এই স্বীকৃতির পর যে اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ রাসূল সত্য وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ এবং এর পর যে তাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ পৌঁছেছিল وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা এমন জালেম কওমকে হেদায়েত করেন না।

(৮৭) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ এরূপ লোকের শাস্তি এই যে اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ তাদের প্রতি আল্লাহরও লা'নত وَالْمَلٰٓئِكَةِ এবং ফেরেশতাদেরও وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ আর মানুষেরও- সকলেরই।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٨﴾

অনুবাদ : (৮৮) তারা অনন্তকাল তাতে থাকবে, তাদের উপর হতে শাস্তি লাঘবও করা হবে না। এবং তাদেরকে অবসরও দেওয়া হবে না।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾

(৮৯) হ্যাঁ, যারা তওবা করে, এর পরে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে। তবে নিশ্চয়, আল্লাহ মহা ক্ষমাপরায়ণ, অতীব করুণাময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿٩٠﴾

(৯০) নিশ্চয়, যারা কাফের হয়েছে ঈমান আনার পর অতঃপর অগ্রসর হতে থাকে কুফরিতে, তাদের তওবা কখনো কবুল হবে না, এবং এরূপ লোক সম্পূর্ণ বিপথগামী।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٩١﴾

(৯১) নিশ্চয়, যারা কাফের হয়েছে আবার মৃত্যু হয়েছে সেই কুফরের অবস্থায়ই, তবে কখনো তাদের কারো হতে পৃথিবী-পূর্ণ স্বর্ণও গ্রহণ করা হবে না, যদিও তারা বিনিময়স্বরূপ এটা দিতেও চায়, তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদের কোনো সাহায্যকারীও হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৮) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তারা অনন্তকাল তাতে থাকবে لَا يُخَفَّفُ লাঘবও করা হবে না عَنْهُمُ তাদের উপর হতে الْعَذَابُ শাস্তি وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ এবং তাদেরকে অবসরও দেওয়া হবে না।

(৮৯) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا হ্যাঁ, যারা তওবা করে مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ এর পরে وَاَصْلَحُوْا এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তবে নিশ্চয়, আল্লাহ মহা ক্ষমাপরায়ণ, অতীব করুণাময়।

(৯০) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিশ্চয়, যারা কাফের হয়েছে بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ঈমান আনার পর ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا অতঃপর অগ্রসর হতে থাকে কুফরিতে لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ তাদের তওবা কখনো কবুল হবে না وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ এবং এরূপ লোক সম্পূর্ণ বিপথগামী।

(৯১) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا নিশ্চয়, যারা কাফের হয়েছে وَمَاتُوْا আবার মৃত্যু হয়েছে وَهُمْ كُفَّارٌ সেই কুফরের অবস্থায়ই فَلَنْ يُّقْبَلَ তবে কখনো গ্রহণ করা হবে না مِنْ اَحَدِهِمْ তাদের কারো হতে مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا পৃথিবী-পূর্ণ স্বর্ণও وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ যদিও তারা বিনিময়স্বরূপ এটা দিতেও চায় اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি দেওয়া হবে وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ এবং তাদের কোনো সাহায্যকারীও হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৮৫) قوله وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত এক জামাত সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা ধর্মত্যাগী হয়েছিল। তারা ১২ জন মানুষ। তারা মদিনা ত্যাগ করে মক্কায় কাফেরদের নিকট গমন করেছিল। তাদের মাঝে হারেছ বিন সুয়াইদ আনসারীও ছিল। তাদের এভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরিণতি সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কুরতুবীর বর্ণনা মতে এ আয়াত অবতরণের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। −[রূহুল মা'আনী : ২১৫/২, কুরতুবী : ১২৬/৪]

(৮৬) قوله كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত ঐ সমস্ত ইহুদিদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় যারা প্রথমে মহানবী ﷺ -এর উপর ঈমান আনয়ন করেছিল এবং রাসূলের উপর অবতীর্ণ কুরআন ও মু'জিযাসমূহকে সত্য বলে সাক্ষ্যও প্রদান করেছিল, এরপর রাসূলকে অস্বীকার করলে আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

অথবা এই আয়াত তু'মাহ ইবনে উবাইরেক, ওয়াহ্‌ওয়াহ্ ইবনে আসলাত এবং হারেছ ইবনে সুয়াইয়েদ ইবনে সামেত ও তাদের সঙ্গী সাথীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়. এরা ইসলাম গ্রহণ করে পরে মুরতাদ হয়ে যায় এবং মক্কার কাফেরদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। −[কাশশাফ]

(৮৯) قوله إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত হযরত হারেছ ইবনে সুয়াইদ (রা.) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, তিনি মুরতাদ হয়ে মক্কায় পলায়ন করেন, অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে একজনকে তার কওমের লোকদের নিকট প্রেরণ করলেন যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা কর আমার তওবা কবুল হবে কিনা? তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল হবার সুসংবাদ দিয়ে অত্র আয়াত নাজিল করেন। রাসূল ﷺ অত্র আয়াত দিয়ে তার ভাই জালাসকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। ফলে তিনি মদিনায় এসে তওবা করেন, আর রাসূল ﷺ তার তওবা কবুল করেন। –[কাশশাফ]

(৯১) قوله إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতটি ইহুদিদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা হযরত মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনার পর হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনেনি। এরপর মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার করে তাদের কুফরিকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এরা মহানবী ﷺ-এর নবুয়তের পূর্বে তাঁর রেসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করতো, এরপর তাঁকে ও কুরআনকে অস্বীকার করে ওয়াদা ভঙ্গ করে, তাঁর অপবাদ দিয়ে এবং তাঁর সাথে শত্রুতা করে উত্তরোত্তর তাদের কুফরিকে বৃদ্ধি করেছে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের এসব অপকর্ম প্রকাশ করে দিয়ে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[কাশশাফ]

অথবা অত্র আয়াতটি মুরতাদদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যারা ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং বলে বেড়াতো যে, আমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মৃত্যুর অপেক্ষা করছি, এমনকি তারা সিদ্ধান্ত নেয় আমরা মদিনায় গিয়ে মুখে মুখে তওবা করব এবং অন্তরে মুনাফেকি গোপন রাখব, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়ে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[কাশশাফ]

ইসলামই মুক্তির পথ : ইসলামের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য করা। পরিভাষায় : একটি বিশেষ ধর্মের আনুগত্য করার নাম ইসলাম, যা আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। কেননা সব পয়গম্বরের শরিয়তে ধর্মের মূলনীতি এক ও অভিন্ন।

অতঃপর ইসলাম শব্দটি কখনো উপরিউক্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কখনো শুধু সর্বশেষ শরিয়তের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা শেষ নবী ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনে উভয় প্রকার ব্যবহারই বিদ্যমান। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ নিজেকে 'মুসলিম' এবং নিজ নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমাহ' বলেছেন– একথাও কুরআন থেকেই প্রমাণিত। শেষনবী ﷺ-এর উম্মতেক বিশেষভাবে 'মুসলিম' বলাও কুরআনেই উল্লিখিত রয়েছে। هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا

মোটকথা, যে কোনো পয়গম্বর যে কোনো খোদায়ী ধর্ম নিয়ে জগতে আগমন করেছেন, তাকেই ইসলাম বলা হয় এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের বিশেষ উপাধি হিসেবেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখন প্রশ্ন হয় যে, আলোচ্য আয়াতে ইসলাম শব্দ দ্বারা কোন অর্থ বুঝানো হয়েছে?

বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যে কোনো অর্থই বুঝানো হোক, পরিণামের দিক দিয়ে তাতে কোনো পার্থক্য হয় না। কেননা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ইসলাম একটি সীমিত শ্রেণির জন্য এবং বিশেষ জমানার জন্য ছিল। ঐ শ্রেণির উম্মত ছাড়া অন্যদের জন্য তখনও সেই ইসলাম গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই নবীর পর যখন অন্য নবী প্রেরিত হন, তখন সে ইসলামও বিদায় নেয়। নতুন নবী যা নিয়ে আগমন করতেন, তাই হতো তখনকার ইসলাম। এতে অবশ্য মৌলিক কোনো পরিবর্তন হতো না, শুধু শাখাগত বিধি-বিধান ভিন্ন হতো। শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে যে ইসলাম দেওয়া হয়েছে, তা অপরিবর্তনীয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী তাঁর আবির্ভাবের পর পূর্ববর্তী সব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এখন পূর্বেকার ইসলাম আর ইসলাম নয়; বরং হুজুর ﷺ-এর মাধ্যমে যা পৃথিবীতে পৌঁছেছে, তাই হলো ইসলাম। এ কারণেই বিভিন্ন সহীহ হাদীসে মহানবী ﷺ বলেছেন, আজ যদি হযরত মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অন্য এক হাদীসে বলেন কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আ.) যখন অবতরণ করবেন, তখন নবুয়তের পদে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার শরিয়তেরই অনুসরণ করবেন।

অতএব এ আয়াতে ইসলামের যে কোনো অর্থই নেওয়া হোক, পরিণাম উভয়েরই এক। অর্থাৎ, শেষ নবীর আবির্ভাবের পর একমাত্র তাঁর আনীত ধর্মকেই ইসলাম বলা হবে। এ ধর্মই বিশ্ববাসীর মুক্তির উপায়। আলোচ্য আয়াতে এ ধর্ম সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করে, তবে আল্লাহর কাছে তা গ্রহণীয় নয়।

একটি সন্দেহের অপনোদন : كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ সন্দেহ হয় যে, ধর্মত্যাগী হওয়ার পর কেউ হেদায়েত পায় না। অথচ বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। কেননা অনেক লোক ধর্মত্যাগী হওয়ার পরেও ঈমান এনে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে যায়।

উত্তর এই যে, আয়াতে হেদায়েতের সম্ভাবনা নাকচ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের বাচনভঙ্গিতে এর উদাহরণ, যেন কোনো বিচারক নিজ হাতে কোনো দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিলেন। দুষ্কৃতকারী বলতে লাগল : বিচারক নিজ হাতে আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। এর উত্তরে বিচারক বললেন: এমন দুরাচারকে আমি কেন মর্যাদা দান করতে যাব? অর্থাৎ, এটা মর্যাদা দানের ব্যাপারই নয়। অর্থ এই নয় যে, এ ব্যক্তি শিষ্টতা অবলম্বন করার পরেও মর্যাদাপ্রাপ্তির যোগ্য হতে পারে না। –[বয়ানুল কুরআন]

কাফেরদের শ্রেণিবিভাগ : মুফাসসিরীনে কেরাম অবিশ্বাসীদেরকে তিনভাগে ভাগ করেছেন–

১. যে সব অবিশ্বাসী অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করে, হযরত রাসূল ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সত্য ধর্ম গ্রহণ করে, তারা বিশ্বাসীদের ন্যায় ইহকালে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ লাভ করবে এবং পরকালে মুক্তিপ্রাপ্ত হবে।

২. যে সকল অবিশ্বাসী যারা হুজুর ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও সত্য ধর্ম গ্রহণ করার পর পুনরায় অবিশ্বাসী হয়ে পুনঃ পুনঃ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের বিরোধিতা করে কুফরি বৃদ্ধি করে। তাদের প্রার্থনা কখনো গৃহীত হবে না, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

৩. এই স্তরে ঐ সমস্ত কাফের যারা সারা জীবন পাপ করে তার ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা ব্যতীত মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না।

قَوْلُهُ لَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا : এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, দুনিয়াতে যেরূপ টাকা পয়সা দিয়ে শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, পরকালে কিন্তু এরূপ কোনো সুযোগ নেই। অসংখ্য সোনা-চাঁদী প্রদান করে মুক্তি পেতে চাইলেও তা কোনো কাজে আসবে না, যেমনটি অন্য আয়াতে রয়েছে– يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ الخ

لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ও اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا এর মধ্যকার تعارض বা দ্বন্দ্বের সমাধান : ৯০ নং আয়াতে لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ দ্বারা বুঝা যায় যে, মুরতাদদের তওবা গৃহীত হবে না, পক্ষান্তরে ৮৯ নং আয়াত اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا প্রমাণ করে যে, মুরতাদদের তওবা গৃহীত হবে. উভয়ের সমাধান নিম্নরূপ :

অর্থাৎ মুরতাদ তৎক্ষণাৎ তওবা না করে যদি মৃত্যুর চিহ্ন প্রকাশের পর তওবা করে, তবে তার তওবা গৃহীত হবে না, অথবা মুরতাদ লোক দেখানো ভাবে তওবা করলে তাও কবুল হবে না। কেননা তার অন্তরে কুফরি রয়ে গেছে।

এছাড়া একনিষ্ঠভাবে মৃত্যুর চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে যদি তওবা করে তবে তার তওবা কবুল হবে যা ৯০ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। অতএব উভয়ের মাঝে কোনোরূপ মতদ্বৈততা নেই।

কাফেরদের জন্য তিনটি শাস্তির ঘোষণা : কাফেরদের জন্য তিনটি শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো–

১. পৃথিবী পরিপূর্ণ স্বর্ণ প্রদান করলেও তা কবুল হবে না। যেমন আল্লাহ বলেন– فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا

২. তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি যেমন আয়াতে রয়েছে– وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

৩. এই শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষাকারী, বা সাহায্যকারী থাকবেনা। যেরূপ আল্লাহ বলেন– وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ

শব্দ বিশ্লেষণ

جَاءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئَةُ মূলবর্ণ (ج . ى . ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف يائى অর্থ– সে এসেছে।

تَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা তওবা করল।

اِزْدَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِزْدِيَارُ মূলবর্ণ (ز . ى . د) জিনসে اجوف يائى অর্থ– তারা বৃদ্ধি পেয়েছে।

مَاتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م . و . ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা মৃত্যুবরণ করল।

اِفْتَدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ف . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে ফিদিয়া প্রদান করল।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিলফে'ল اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল كَفَرُوْا ফে'ল যমীর هُوَ ফা'য়েল بَعْدَ মুযাফ اِيْمَانِهِمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে পুনরায় মুযাফ ইলাইহি হলো, এবার بَعْدَ مضاف ও مضاف اليه মিলে ظرف متعلق হলো فاعل . فعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে معطوف عليه হয়েছে ثُمَّ হরফে আতফ اِزْدَادُوْا ফে'ল যমীরে هُمْ ফা'য়েল كُفْرًا মাফউল فعل ও فاعل . مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে معطوف হলো, معطوف عليه ও معطوف মিলে এর ان اسم হলো। এরপর لَنْ تُقْبَلَ ফে'ল تَوْبَتُهُمْ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে نائب فاعل হলো। فعل ও نائب فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে اِنَّ এর خبر হলো। সুতরাং اِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

৪র্থ পারা

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۹۲﴾

অনুবাদ : (৯২) তোমরা পূর্ণ ছওয়াব কখনো পাবে না, যে পর্যন্ত না নিজেদের প্রিয় বস্তু ব্যয় করবে, এবং যা কিছুই ব্যয় করবে আল্লাহ তা'আলা তাও খুব জানেন।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۹۳﴾

(৯৩) তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইয়াকূব নিজের জন্য যা হারাম করেছেন তা ব্যতীত আর সমস্ত খাদ্যবস্তুই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল, আপনি বলে দিন, তবে তাওরাত আনয়ন কর, অতঃপর তা পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۹۴﴾

(৯৪) সুতরাং যে ব্যক্তি অতঃপর আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তবে এই প্রকার লোক অত্যন্ত অন্যায়চারী।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۫ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۹۵﴾

(৯৫) আপনি বলে দিন, আল্লাহ সত্য বলে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসরণ কর যাতে বিন্দুমাত্রও বক্রতা নেই এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না।

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۶﴾

(৯৬) নিশ্চয়, যে ঘর সর্বপ্রথম মানব জাতির জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে, তা সেই ঘর যা মক্কায় অবস্থিত, তার অবস্থা এই যে, তা বরকতবিশিষ্ট এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য পথ-প্রদর্শক।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯২) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ তোমরা পূর্ণ ছওয়াব কখনো পাবে না حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ যে পর্যন্ত না নিজেদের প্রিয়বস্তু ব্যয় করবে وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ এবং যা কিছুই ব্যয় করবে فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ আল্লাহ তা'আলা তাও খুব জানেন।

(৯৩) كُلُّ الطَّعَامِ আর সমস্ত খাদ্যবস্তুই كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ ইয়াকূব নিজের জন্য যা হারাম করেছেন তা ব্যতীত مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে قُلْ আপনি বলে দিন فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ তবে তাওরাত আনয়ন কর فَاتْلُوْهَآ অতঃপর তা পাঠ কর اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(৯৪) فَمَنِ افْتَرٰى সুতরাং যে ব্যক্তি আরোপ করে عَلَى اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার উপর الْكَذِبَ মিথ্যা অপবাদ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ অতঃপর فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ তবে এই প্রকার লোক অত্যন্ত অন্যায়চারী।

(৯৫) قُلْ আপনি বলে দিন صَدَقَ اللّٰهُ আল্লাহ সত্য বলে দিয়েছেন فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ সুতরাং তোমরা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসরণ কর حَنِيْفًا যাতে বিন্দুমাত্রও বক্রতা নেই وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না।

(৯৬) اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ নিশ্চয়, যে ঘর সর্বপ্রথম وُّضِعَ لِلنَّاسِ মানব জাতির জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ তা সেই ঘর যা মক্কায় অবস্থিত مُبٰرَكًا তার অবস্থা এই যে, তা বরকতবিশিষ্ট وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য পথ-প্রদর্শক।

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۷﴾

অনুবাদ : (৯৭) তাতে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান, তন্মধ্যে মাকামে ইবরাহীম একটি, আর যে ব্যক্তি উক্ত গৃহে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়, আর মানুষের দায়িত্ব [ফরজ] আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের হজ করা অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য, যে ঐ ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। আর যে ব্যক্তি অমান্যকারী হয়, তবে নিশ্চয়, আল্লাহ সমস্ত বিশ্ববাসী হতে বে-নিয়াজ।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۸﴾

(৯৮) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন অমান্য করছ আল্লাহর বিধানসমূহ? অথচ আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۹﴾

(৯৯) আপনি বলুন, হে আহলে কিতব! কেন ভ্রষ্ট কর আল্লাহর পথ হতে এমন ব্যক্তিকে যে ঈমান এনেছে? এভাবে যে উক্ত পথের জন্য বক্রতা অন্বেষণ কর, অথচ তোমরা নিজেরাও অবগত আছ, আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে বে-খবর নন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿۱۰۰﴾

(১০০) হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা তাদের কোনো সম্প্রদায়ের কথা মান্য কর, যাদেরকে কিতাব প্রদত্ত হয়েছে, তবে তারা তোমাদের ঈমান আনয়নের পর– তোমাদেরকে কাফের বানিয়ে দিবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৭) فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ তাতে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান مَقَامُ اِبْرٰهِيْمَ তন্মধ্যে মাকামে ইবরাহীম একটি وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا আর যে ব্যক্তি উক্ত গৃহে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায় وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ আর মানুষের দায়িত্ব [ফরজ] আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের হজ করা অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا যে ঐ ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। وَمَنْ كَفَرَ আর যে ব্যক্তি অমান্যকারী হয় فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ তবে নিশ্চয়, আল্লাহ সমস্ত বিশ্ববাসী হতে বে-নিয়াজ।

(৯৮) قُلْ আপনি বলে দিন يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতাব! لِمَ تَكْفُرُوْنَ তোমরা কেন অমান্য করছ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর বিধানসমূহ? وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ অথচ আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।

(৯৯) قُلْ আপনি বলুন يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ হে আহলে কিতব! لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ কেন ভ্রষ্ট কর আল্লাহর পথ হতে مَنْ اٰمَنَ এমন ব্যক্তিকে যে ঈমান এনেছে? تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا এভাবে যে উক্ত পথের জন্য বক্রতা অন্বেষণ কর, وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ অথচ তোমরা নিজেরাও অবগত আছ, وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে বে-খবর নন।

(১০০) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا যদি তোমরা তাদের কোনো সম্প্রদায়ের কথা মান্য কর مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ যাদেরকে কিতাব প্রদত্ত হয়েছে يَرُدُّوْكُمْ তবে তারা তোমাদেবকে বানিয়ে দিবে بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ তোমাদের ঈমান আনয়নের পর– كٰفِرِيْنَ কাফের

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৯৩) قوله كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ الخ **আয়াতের শানে নুযুল** : অত্র আয়াতটি ইহুদিদের মিথ্যা দাবি খণ্ডনের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা হলো ইহুদিগণ রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ দাবি উত্থাপন করল যে, তোমরা বাস্তবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসারী নয়, কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের উপর এমন কিছু বস্তু হারাম ছিল যা তোমরা হারাম মনে করো না। যেমন– উটের গোশত এবং উটের দুধ। তখন মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করে তাদের মিথ্যা দাবিকে খণ্ডন করেন। এতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) সহ সকল নবীর জন্য খাদ্য-সামগ্রী সবই হালাল ছিল। শুধু হযরত ইয়াকূব (আ.) নিজস্ব একটা রোগের কারণে উটের গোশত ও দুধ নিজের উপর হারাম করে নিয়েছেন। –[তাফসীর রূহুল মা'আনী]

(৯৬) قوله إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : বর্ণিত আছে যে, কেবলা পরিবর্তনের পর ইহুদিরা মুসলমানের উপর অভিযোগ উত্থাপন করল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মভূমি ইরাক ত্যাগ করে সিরিয়া হিজরত করে তথায় মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করেন। তথায় অনেক নবী প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সকলের কেবলা ছিল সিরিয়া বা 'বায়তুল মুকাদ্দাস' তোমরা আরবের মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বাকে কেবলা নির্ধারণ করেছ, অথচ মুখে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের অনুসারী হওয়ার দাবি করছ। অধিকন্তু বায়তুল মুকাদ্দাস কা'বার পূর্বে নির্মিত হয়েছে। এটাই হাশরের স্থান, কাজেই কেবলা পরিবর্তন অবান্তর বৈ কিছু নয়, তখন মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।

(১০০) قوله يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতটি 'সাম্মাস ইবনে কায়স' নামক জনৈক ইহুদি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সে মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ ছিল।

ঘটনাটি হলো, সে একবার এক মজলিসে আউস ও খাযরাজ গোত্র দু'টির লোকজনকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে একত্রিত দেখে হিংসায় জ্বলে উঠল এবং তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টির ফন্দি আঁটল। তার ষড়যন্ত্র অনুযায়ী জনৈক ব্যক্তি তাদের মজলিসে পৌঁছে তাদের পূর্বতম যুদ্ধসমূহের গৌরবগাথা কাহিনী আবৃত্তি করতে লাগল, ফলে তাদের উভয় গোত্রের মাঝে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল এবং পরস্পরের মাঝে সংঘর্ষের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে গেল, দেখতে দেখতে যুদ্ধের দিন তারিখও ঠিক হয়ে গেল। এ সংবাদ শুনে রাসূল ﷺ তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে বললেন, একি মূর্খতা! আমার জীবদ্দশায় মুসলমান হয়ে পরস্পর বন্ধু ভাবাপন্ন হওয়ার পর তোমরা একি করছ? তোমরা কি এই অবস্থায়ই কুফরের দিকে ফিরে যেতে চাও? এতে উভয়পক্ষের চৈতন্য ফিরে এলো, তারা বুঝতে পারল যে এটা ছিল শয়তানের প্ররোচনা। এরপর সবাই একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদাকাঁদি করল এবং তওবা করল। এ ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[আসবাবুন নুযূল নাসাপুরী]

আলোচ্য আয়াত ও সাহাবায়ে কেরামের কর্ম প্রেরণা : সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কুরআনি নির্দেশের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যক্ষ সঙ্গী। কুরআনি নির্দেশ পালনের জন্য তাঁরা ছিলেন উন্মুখ। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সহায়-সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, কোনটি তাঁদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এরপর আল্লাহর পথে তা ব্যয় করার জন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আবেদন করতে লাগলেন। মদিনার আনসারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবূ তালহা (রা.)। মসজিদে নববী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তাঁর একটি বাগানে 'বায়রুহা' নামে একটি কূপ ছিল। বর্তমানে বাগানের স্থলে বাবে মজীদীর সামনে **'আস্তফা-মনজিল'** নামে একটি দালান অবস্থিত রয়েছে। এতে মদিনা জিয়ারতকারী হাজীগণ অবস্থান করেন। এর উত্তর পূর্ব কোণে "বায়রুহা" কূপটি অদ্যাবধি স্বনামে বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পণ করতেন এবং বায়রুহা কূপের পানি পান করতেন। এ কূপের পানি পছন্দও করতেন। হযরত আবূ তালহা (রা.)-এর এ বাগান অত্যন্ত মূল্যবান, উর্বর এবং তাঁর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন : আমার সব সম্পত্তির মধ্যে বায়রুহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমি এটি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে চাই। আপনি যে কাজে পছন্দ করেন, এটি তাতেই খরচ করুন, হুজুর ﷺ বলেন, বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে আপনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করে দিন। হযরত আবূ তালহা (রা.) এ পরামর্শ শিরোধার্য করে বাগানটি স্বীয়-আত্মীয় স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, শুধু ফকির-মিসকিনকে দিলেই পুণ্য হয় না– পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করাও বিরাট পুণ্য ও ছওয়াবের কাজ।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) তাঁর আরোহণের প্রিয় ঘোড়াটি নিয়ে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন, আমার সম্পত্তির মধ্যে এটি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। একে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে চাই। মহানবী (সা.) তাঁর ঘোড়াটি গ্রহণ করে তাঁরই পুত্র উসামাকে দান করলেন। দান করা বস্তু স্বগৃহে ফিরে যেতে দেখে যায়েদ ইবনে হারিসা কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার দান গৃহীত হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী, ইবনে জারীর, তাবারানী।]

اَلْبِرَّ : এর অর্থ : بِرٌّ একবচন, বহুবচন اَبْرَارٌ এর দ্বারা পুণ্যকর্ম ও কল্যাণকে বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে।
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

কারো মতে এখানে بِرٌّ দ্বারা জান্নাত বুঝানো হয়েছে।

এছাড়া بِرٌّ এর শব্দটি অন্যের হক পূর্ণরূপে আদায় করা অর্থেও আসে, যেভাবে قُرْآنٌ এ এসেছে, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ এবং وَبَرًّا بِوَالِدَتِي অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যে পিতা-মাতার হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করে। –[মা'আরেফুল কুরআন]

হালালকে হারাম করা বৈধ কি না : সমস্ত ওলামায়ে কেরাম সর্বসম্মত এ কথার উপর যে, হালালকে হারাম করা জায়েজ নেই। অথচ দেখা যায়, হযরত ইয়াকূব (আ.) নিজের উপর কিছু বস্তু হারাম করে নিয়েছিলেন।

ঘটনা এরূপ, ইসরাঈল তথা হযরত ইয়াকূব (আ.) عِرْقُ النَّسَاءِ (ইরকুন নাসা) নামক এক রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তিনি মানত করেন যে, 'যদি মহান আল্লাহ আমাকে এই কঠিন ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করেন। তবে আমার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য উটের গোশত ও দুধ খাব না।' এরপর তিনি রোগ মুক্তি হয়ে যাওয়ার পর উক্ত খাদ্যদ্বয় পরিত্যাগ করেন। মানতের কারণে যে উটের গোশত হারাম হয়েছিল তা ওহীর নির্দেশে বনী ইসরাঈলের জন্য পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল।

এতে বুঝা গেল যে, তাদের শরিয়তে মানতের কারণে হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যেত। আর আমাদের শরিয়তে মানতের কারণে জায়েজ কাজ ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু মান্নত ও শপথ করে হালালকে হারাম করা যায় না, কেউ যদি এরূপ করে তবে সে কাফফারা দিয়ে শপথ ভেঙ্গে ফেলবে। কেননা আল্লাহ বলেন– لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ

ইসরাঈল কে? ইনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক আলাইহিস সালামের ছেলে। তার নাম হলো ইয়াকূব আর উপাধি হলো إِسْرَائِيلُ এটি সুরিয়ানী ভাষার শব্দ إِسْرَاءُ অর্থ– عَبْدٌ আর إِيلُ অর্থ– اَللّٰه অতএব إِسْرَائِيلُ অর্থ– عَبْدُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বান্দা, তিনি এই নামেই সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর বার জন সন্তান ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) এদেরই সর্বকনিষ্ঠ। এই ১২ জনের বংশধরগণকেই বনী ইসরাঈল বলা হয়।

"আল্লাহ সত্য বলেছেন" এর ব্যাখ্যা :

১. এই খাদ্য ইসরাঈল ও তাঁর সন্তানদের জন্য হারাম ছিল, অথচ তা পূর্বে হারাম ছিল না, এটাই আল্লাহ সত্য বলেছেন।
২. অথবা এই কথাটি সত্য বলেছেন যে, উটের গোশত ও দুধ হযরত ইবরাহীমের জন্য হালাল ছিল। কিন্তু ইসরাঈল নিজে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছেন।
৩. অথবা আল্লাহ সত্য বলেছেন যে, যে সকল খাদ্য দ্রব্য বনী ইসরাঈলের জন্য বৈধ ছিল, ইহুদিদের দুষ্কর্মের জন্য সেখান হতে কিছু খাদ্য হারাম করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ আর ইসরাঈল নিজে নিজের উপর কিছু হারাম করেছেন, যা তার বংশধরদের জন্যও হারাম করা হয়েছিল।

بَكَّةَ ও مَكَّةَ এর অর্থ : কাশশাফ গ্রন্থকার বলেন– مَكَّةَ ও بَكَّةَ উভয় একটি। তবে দু' লুগাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে আরবি ভাষায় মীম এর স্থলে বা এবং بَاءٌ এর স্থলে مِيمٌ ব্যবহার করা হয়, যেমন– نَبِيطٌ এর স্থলে نَمِيطٌ উভয় একটি স্থানের নাম। এবং مَغْمَطَةٌ ও مَغْبَطَةٌ উভয়ের অর্থ সর্বক্ষণ।

কেউ বলেন مَكَّةَ হলো শহর, আর بَكَّةَ হলো মসজিদের স্থান।

কারো মতে مَكَّةَ শব্দের উৎপত্তি بَكَّةَ হতে এর অর্থ হলো ভীড়। কেননা এ স্থানে সব সময় মানুষের ভীড় লেগে থাকে।
কিছু সংখ্যক বলেন– مَكَّةَ এর অপর নাম بَكَّةَ এর অর্থ হলো ভেঙ্গে ফেলা, কেননা কা'বা শরীফকে ধ্বংস করার জন্য যে কোনো জালেম এসেছিল তার ঘাড় কা'বা ভেঙ্গে দিয়েছিল, তথা তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। –[কাশশাফ]

মাকামে ইবরাহীম কি? مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ বলতে ঐ পাথরকে বলা হয়, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। এর উপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন রয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) একদা মক্কায় হযরত হাজেরাকে দেখার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু বিবি সারার শপথ অনুযায়ী সেখানে নামতে অস্বীকার করেন। ফলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্ত্রী একটি পাথর নিয়ে আসেন। তিনি তার উপর ডান পা দিয়ে একটু কাত হলে তাঁর মাথার ডান দিকে ধুয়ে দেন। এরপর পাথরকে তাঁর বাম দিকে নিলে তিনি তাঁর বাম পা দিয়ে একটু ঝুঁকলে বাম পার্শ্ব ধুয়ে দেন। ফলে তার উপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে যায়। আর তা-ই "মাকামে ইবরাহীম" নামে খ্যাত হয়। –[কাশশাফ]

স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ কি কি? মুফাসসিরগণদের মতে এখানে দু'টি দিক রয়েছে

১. একটি বস্তুই অনেকগুলো নিদর্শনের স্থলাভিষিক্ত। আর তা হলো مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ তথা পাথরটি এতে অনেকগুলো নির্দশনও রয়েছে–

  ক. শক্ত পাথরে পায়ের চিহ্ন থাকা একটি নিদর্শন।

  খ. টাখনু পর্যন্ত ডুবে যাওয়া একটি নিদর্শন।

  গ. কঠিন পাথরে কিছু অংশ নরম হওয়া এবং কিছু অংশ শক্ত থাকা।

  ঘ. অন্যান্য নবীদের ব্যতীত শুধু তাঁর চিহ্ন অবশিষ্ট থাকা।

  ঙ. হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর অনেক শত্রু থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ হাজার হাজার বৎসর তা অবশিষ্ট রাখলেন।

২. অথবা অনেকগুলো আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ বা মাকামে ইবরাহীম ও যে তথায় প্রবেশ করবে তার নিরাপত্তা এই দু'টি। কেননা দুইও جَمْعٌ -এর এক প্রকার।

অথবা এ দু'টি বর্ণনা করে অনেকগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

কা'বা ঘর কয়বার নির্মিত হয়েছে? : পবিত্র কা'বা ঘর সর্বমোট ১০ বার নির্মাণ করা হয়েছে।

১. সর্বপ্রথম ফেরেশতাগণ আদম ও জমিন সৃষ্টির দু'হাজার বৎসর পূর্বে তৈরি করেছিলেন।

২. হযরত আদম (আ.) নির্মাণ করেছেন।

৩. হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান হযরত শীছ (আ.) তৈরি করেছিলেন।

৪. হযরত নূহ (আ.)-এর প্লাবনে এটা ধ্বংস হয়ে গেলে পুনরায় হযরত ইবরাহীম (আ.) তৈরি করেন।

৫. আমালেকা গোত্র।

৬. জুরহুম গোত্র।

৭. কুসাই বিন কেলাব।

৮. কোরাইশগণ।

৯. বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)।

১০. সর্বশেষ কূফার গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নির্মাণ করেন।

কেউ কেউ তুরস্কের বাদশাহ মুরাদ খানকেও পুনঃ নির্মাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তিনি ১৪০ হিজরিতে এ কাজ করেন।

কোনো বিখ্যাত কবি উল্লিখিত ১০জন নির্মাতাকে কবিতার ছন্দে একত্রিত করে বলেন–

مَلَائِكَةُ اللّٰهِ الْكِرَامُ فَآدَمُ * بَنٰى بَيْتَ رَبِّ الْعَرْشِ عَشْرًا فَخُذْهُمْ
قُصَيٌّ قُرَيْشٌ قَبْلَ هٰذَيْنِ جُرْهُمٌ * فَشِيْثٌ ثُمَّ اِبْرَاهِيْمُ ثُمَّ عَمَالِقٌ
فَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ كَذَا اٰخِرٌ * وَبَنٰى حَجَّاجٌ وَهٰذَا مُتَمِّمٌ

কিভাবে কা'বা প্রথম ঘর হলো?

১. **হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে 'কা'বাই সর্বপ্রথম ঘর' যা হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের পর মানুষ তৈরি করেছে।**

২. **অন্য বর্ণনায় আছে, আসমান জমিন সৃষ্টির সময় পানির উপর সর্বপ্রথম কা'বা ঘরই প্রকাশ পেয়েছে।**

৩. কেউ কেউ বলেন, 'কা'বাই সর্বপ্রথম ঘর যা হযরত আদম (আ.) জমিনের উপর নির্মাণ করেছেন।

৪. অন্য বর্ণনায় আছে যে, হযরত আদম (আ.) কে জমিনে নিক্ষেপ করার পর ফেরেশতাগণ বলল, এই ঘর তওয়াফ করুন। কেননা আমরা আপনার পূর্বে দু'হাজার বৎসর পর্যন্ত এ ঘর তওয়াফ করেছি।

৫. বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল পৃথিবীতে কোন মসজিদ প্রথম তৈরি করা হয়েছে, তিনি বললেন اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ তথা কা'বা ঘর সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়েছে। এর ৪০ বৎসর পর বায়তুল মুকাদ্দাস তৈরি করা হয়েছে। –[কাশশাফ]

কা'বা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য : আলোচ্য ৯৭ নং আয়াতে কাবা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। **প্রথমত** এতে আল্লাহর কুদরতের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম।

দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়; কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না।

তৃতীয়ত সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এতে হজব্রত পালন করা ফরজ; যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌছার শক্তি ও সামর্থ্য থাকে।

কা'বা গৃহ নির্মিত হওয়ার দিন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ তা'আলা এর বরকতে শত্রুর আক্রমণ থেকে মক্কাবাসীদের নিরাপদে রেখেছেন। বাদশাহ আবরাহা বিরাট হস্তীবাহিনীসহ কা'বা গৃহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে পক্ষীকূলের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। মক্কার হরমে প্রবেশকারী মানুষ, এমনকি জীবজন্তু পর্যন্ত বিপদমুক্ত হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়াররাও এ বিষয়ে সচেতন। এ সীমানায় প্রবেশ করে তারাও নিজেদের নিরাপদ মনে করে। সেখানে বন্য ও হিংস্র জন্তু মানুষ দেখে পালায় না। সাধারণভাবে দেখা যায়, কা'বা গৃহের যে পার্শ্বে বৃষ্টি হয়, সে পার্শ্বস্থিত দেশগুলোতে প্রচুর বারিপাত হয়। আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন এই যে, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাজী সেখানে একত্রিত হয়। তারা জামরাত নামক স্থানে প্রত্যেকেই একেকটি প্রতীক লক্ষ্য করে দৈনিক সাতটি করে কঙ্কর তিন দিন পর্যন্ত নিক্ষেপ করে। যদি এসব কঙ্কর সেখানেই জমা থাকতো, তবে এক বৎসরেই কঙ্করের স্তূপের নিচে জামরাত অদৃশ্য হয়ে যেত এবং কয়েক বৎসরে সেখানে কঙ্করের বিরাট পাহাড় গড়ে উঠত। অথচ হজের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেখানে কঙ্করের খুব একটা স্তূপ দেখা যায় না। ইতঃস্তুতঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কঙ্কর দেখা যায় মাত্র। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে হুজুর ﷺ বলেন, ফেরেশতারা এসব কঙ্কর তুলে নেয়। যাদের হজ কোনো কারণে কবুল হয় না, শুধু তাদের কঙ্করই এখানে থেকে যায়। এ কারণেই জামরাত থেকে কঙ্কর তুলে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এগুলো কবুল করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উক্তির সত্যতা প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখেন, জামরাতের আশে পাশে সামান্য কঙ্করই দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ সেগুলো সেখান থেকে সরানোর বা পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকেও নেই; জনগণের পক্ষ থেকেও নেই।

এ কারণেই শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) খাসায়েসে কুবরা নামক গ্রন্থে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতক মু'জিযা তাঁর ওফাতের পরও দেদীপ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। প্রত্যেকেই তা অবলোকন করতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পবিত্র কুরআন। সমগ্র বিশ্ব এ অনন্য কিতাবটির সমতুল্য গ্রন্থ রচনা করতে অক্ষম। এ অক্ষমতা যেমন তাঁর জীবদ্দশায় ছিল, তেমনি আজও রয়েছে এবং কিয়মাত পর্যন্ত থাকবে। প্রতি যুগের মুসলমান বিশ্বকে একথা বলে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যে, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ কুরআনের সূরার মতো একটি সূরা তৈরি কর দেখি! এমনিভাবে জামরাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এসব জামরাতে নিক্ষিপ্ত কঙ্কর অদৃশ্যভাবে ফেরেশতারা তুলে নেন। যাদের হজ কবুল হয় না, শুধু সেসব হতভাগ্যদের কঙ্করই থেকে যায়। তাঁর এ উক্তির সত্যতা প্রতি যুগেই প্রমাণিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবে। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর অক্ষয় মু'জিযা এবং কা'বাগৃহ সম্পর্কিত একটি বিরাট নিদর্শন।

মাকামে ইবরাহীম : মাকামে ইবরাহীম কা'বা গৃহের একটি বড় নিদর্শন। এ কারণেই কুরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মাকামে ইবরাহীম একটি পাথরের নাম। এর উপর দাঁড়িয়েই হযরত ইবরাহীম (আ.) কা'বা গৃহ নির্মাণ করতেন। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, নির্মাণের উচ্চতার সাথে সাথে পাথরটিও আপনা-আপনি উঁচু হয়ে যেত এবং নিচে অবতরণের সময় নিচু হয়ে যেত। এ পাথরের গায়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। একটি অচেতন ও জড় পাথরের পক্ষে প্রয়োজনানুসারে উঁচু ও নিচু হওয়া এবং মোমের মতো নরম হয়ে নিজের মধ্যে পদচিহ্ন গ্রহণ করা– এসবই আল্লাহর অপার কুদরতের নিদর্শন এবং এতে কাবা গৃহের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। এ পাথরটি

কাবা গৃহের নিচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল। যখন কুরআনে মাকামে ইবরাহীমে নামাজ পড়ার আদেশ অবতীর্ণ হয় وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى; তখন তওয়াফকারীদের সুবিধার্থে পাথরটি সেখান থেকে অপসারিত করে কা'বাগৃহের সামনে সামান্য দূরে যমযম কূপের নিকট স্থাপন করা হয়। একে এ স্থানেই একটি নিরাপদ কক্ষে তালাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। কা'বা প্রদক্ষিণের পর দুই রাকাত নামাজ এর পিছনে দাঁড়িয়ে পড়া হয়। অধুনা কক্ষটি সরিয়ে নিয়ে মাকামে ইবরাহীমকে একটি কাঁচ-পাত্রে সংরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। আসলে এ বিশেষ পাথরটিকেই মাকামে ইবরাহীম বলা হয়। তওয়াফ-পরবর্তী নামাজ এর উপরে অথবা আশেপাশে পড়া উত্তম। কিন্তু শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মাকামে ইবরাহীম সমগ্র মসজিদে হারামকেও বুঝায়। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেন : মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে তওয়াফ পরবর্তী নামাজ পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

কা'বা গৃহে প্রবেশকারীর নিরাপত্তা : কা'বা গৃহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়। এ নিরাপত্তা একেতো শরিয়তের আইন হিসেবে– অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, তাকে কষ্ট দিবে না বা হত্যা করবে না। যদি কেউ হত্যাকাণ্ড করে অথবা অন্য কোনো অপরাধ করে এতে প্রবেশ করে, তবুও তাকে সেখানে শাস্তি দিবে না; বরং তাকে হেরেম থেকে বের হতে বাধ্য করবে। বের হওয়ার পর তাকে শাস্তি দিবে। এভাবে হেরেমে প্রবেশকারী ব্যক্তি শরিয়তের আইন অনুযায়ী নিরাপদ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ এ নিরাপত্তা সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরে কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন। ফলে বিস্তর মতবিরোধ সত্ত্বেও তারা সবাই এ বিশ্বাসে একমত যে, কা'বা গৃহে প্রবেশকারী ব্যক্তি যত বড় অপরাধী ও শত্রুই হোক না কেন, কা'বা গৃহের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছুই বলা যাবে না; হেরেম শরীফকে সাধারণ কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। জাহেলিয়াত যুগের আরব ও তাদের বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কাবা গৃহের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত ছিল না। তাদের যুদ্ধপ্রিয়তা ও নিষ্ঠুরতা সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা হত্যাকারীকে দেখেও মাথা হেট করে চলে যেত; কিছুই বলত না।

মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে হেরেমের অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বা গৃহকে পবিত্র করা। বিজয়ের পর হুজুর ﷺ ঘোষণা করেন যে, এ অনুমতি কাবা গৃহকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে কয়েক ঘণ্টার জন্য ছিল। এরপর পূর্বের ন্যায় চিরকালের জন্য হেরেমে যুদ্ধবিগ্রহ করা হারাম হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন : আমার পূর্বে কারো জন্য হেরেমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা হালাল ছিল না, আমার পরেও কারো জন্য হালাল নয়। আমাকেও মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, পরে আবার হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে মক্কায় সৈন্যাভিযান এবং হত্যা ও লুটতরাজ করেছিল। এতে কা'বাগৃহের সাধারণ নিরাপত্তা আইন এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয়নি। কেননা মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা সর্ব সম্মতিক্রমে হাজ্জাজের এ কাজ হারাম ও মহাপাপ ছিল। সমগ্র মুসলিম জাতি এজন্য তাকে ধিক্কার দিয়েছে। এ ঘটনাকে কা'বাগৃহের সৃষ্টিগত সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থিও বলা যায় না। কারণ, হাজ্জাজ স্বয়ং এ কাজের বৈধতায় বিশ্বাসী ছিল না। সে একে একটি জঘন্য অপরাধ মনে করত। কিন্তু রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে, সর্বশ্রেণির মানবমণ্ডলীই কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধকে অত্যন্ত জরুরি মনে করে। তারা হেরেমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুনখারাবিকে জঘন্যতম পাপ বলে গণ্য করে। এটা সারা বিশ্বে একমাত্র কা'বা গৃহেরই বৈশিষ্ট্য।

কা'বা গৃহের হজ ফরজ হওয়া : ৯৭ নং আয়াতে কাবা গৃহের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির প্রতি শর্তাধীনে কা'বা গৃহের হজ ফরজ করেছেন। শর্ত এই যে, সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে

হবে, যা দ্বারা সে কা'বা গৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। দৈহিক দিক দিয়ে হাত পা ও চক্ষু-কর্মক্ষম হতে হবে। কারণ যাদের এসব অঙ্গ বিকল, তাদের পক্ষে স্বীয় বাড়ি-ঘরে চলাফেরাই দুষ্কর। এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও হজের অনুষ্ঠানাদি পালন করা তার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হবে?

মহিলাদের পক্ষে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরিয়ত মতে জায়েজ নয়। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোনো মাহরাম পুরুষ হজে থাকবে; নিজ খরচে করুক অথবা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। এমনিভাবে কা'বা গৃহে পৌছার জন্য রাস্তা নিরাপদ হওয়াও সামর্থ্যের একটি অংশ। যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এবং জান-মালের ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে হজের সামর্থ্য নেই বলে মনে করা হবে।

হজ শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শরিয়তের পরিভাষায় কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফাত ও মুযদালেফায় অবস্থান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে হজ বলা হয়। এ ব্যাখ্যা কুরআন প্রদত্ত। হজের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি রাসূলুল্লাহ ﷺ মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَأْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তোমরা নিয়ে আস।

اُتْلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা তেলাওয়াত কর।

اِفْتَرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে মিথ্যা সৃষ্টি করল।

تَصُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّدُّ মূলবর্ণ (ص . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা বাধা প্রদান কর।

تَبْغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْيُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা এতে অন্বেষণ কর।

عِوَجًا : বাব سمع -এর মাসদার অর্থ– বক্রতা, বাঁকা, দোষ।

يَرُدُّوْكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা ফিরিয়ে দিবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ : এখানে لَنْ تَنَالُوْا ফে'ল যমীরে اَنْتُمْ ফা'য়েল اَلْبِرَّ মাফঊল حَتّٰى হরফে জার تُنْفِقُوْا ফে'ল, যমীরে اَنْتُمْ ফা'য়েল مِنْ হরফে জার مَا ইসমে মাওসূল تُحِبُّوْنَ ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে صلة অতঃপর موصول ও صلة মিলে মাজরূর এবার জার ও মাজরূর মিলে متعلق হয়েছে। এবার فعل . فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে পুনরায় মাজরূর হলো حَتّٰى হরফের জারের। জার ও মাজরূর মিলে متعلق হয়েছে। সুতরাং فعل . فاعل . مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ : এখানে مَا নাফিয়া كَانَ ফে'লে নাকেস যমীরে هُوَ টি كَانَ এর ইসম مِنَ হরফে জার اَلْمُشْرِكِيْنَ মাজরূর, উভয় মিলে متعلق হলো উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে, উহ্য শিবহে ফে'ল তার মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে كَانَ এর خبر হলো। সুতরাং كَانَ তার اسم ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾

অনুবাদ : (১০১) আর কেমন করে তোমরা কুফরি করতে পার? অথচ তোমাদেরকে আল্লাহর বিধানসমূহ পাঠ করে শুনানো হয় আর তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, তবে সে নিশ্চয় সরল পথ প্রদর্শিত হয়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

(১০২) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে [এরূপ] ভয় কর যেরূপ ভয় করা উচিত এবং ইসলাম ব্যতীত আর অন্য কোনো অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করো না।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

(১০৩) এবং তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে [দীনকে] দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এমনিভাবে যে, তোমরা পরস্পর একতাবদ্ধও থাক এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন তোমরা [পরস্পর] শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ, এবং তোমরা দোজখের গর্তের তীরে ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তা হতে রক্ষা করেছেন, এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে স্বীয় বিধানসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যেন তোমরা [সঠিক] পথে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০১) وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ আর কেমন করে তোমরা কুফরি করতে পার? وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ অথচ তোমাদের পাঠ করে শুনানো হয় اٰيٰتُ اللّٰهِ আল্লাহর বিধানসমূহ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ আর তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ তবে সে নিশ্চয় সরল পথ প্রদর্শিত হয়।

(১০২) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে মুমিনগণ! اتَّقُوا اللّٰهَ আল্লাহকে [এরূপ] ভয় কর حَقَّ تُقٰتِهٖ যেরূপ ভয় করা উচিত وَلَا تَمُوْتُنَّ এবং প্রাণ ত্যাগ করো না اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ইসলাম ব্যতীত আর অন্য কোনো অবস্থায়।

(১০৩) وَاعْتَصِمُوْا এবং তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর بِحَبْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রজ্জুকে [দীনকে] جَمِيْعًا এমনিভাবে যে, তোমরা পরস্পর একতাবদ্ধও থাক وَلَا تَفَرَّقُوْا এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না وَاذْكُرُوْا আর স্মরণ কর نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً যখন তোমরা [পরস্পর] শত্রু ছিলে فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ এবং তোমরা দোজখের গর্তের তীরে ছিলে فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তা হতে রক্ষা করেছেন كَذٰلِكَ এমনিভাবে يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন اٰيٰتِهٖ স্বীয় বিধানসমূহ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ যেন তোমরা [সঠিক] পথে থাক।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (١٠٤)

(১০৪) আর তোমাদের মধ্যে একদল এরূপ থাকা আবশ্যক, যেন তারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং নেক কাজের আদেশ করতে ও মন্দ কাজ হতে বারণ করতে থাকে, আর এরূপ লোক পূর্ণ সফলকাম হবে।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٠٥)

(১০৫) আর তোমরা ঐ সমস্ত লোকের মতো হয়ো না, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তাদের নিকট স্পষ্ট বিধানসমূহ পৌঁছার পর, আর তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে।

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (١٠٦)

(১০৬) সেদিন কতিপয় চেহারা সাদা হবে এবং কতিপয় চেহারা কালো হবে, সুতরাং যাদের চেহারা কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি কাফের হয়েছিলে ঈমান আনার পর? কাজেই এখন স্বীয় কুফরির দরুন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (١٠٧)

(১০৭) আর যাদের চেহারা সাদা হয়ে যাবে তারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ (١٠٨)

(১০৮) এটা আল্লাহর আয়াতসমূহ, যা আমি যথাযথভাবে পাঠ করে আপনাকে শুনাচ্ছি, আর আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি জুলুম করতে চান না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৪) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ আর তোমাদের মধ্যে একদল এরূপ থাকা আবশ্যক يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ যেন তারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ এবং নেক কাজের আদেশ করতে وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ও মন্দ কাজ হতে বারণ করতে থাকে وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ আর এরূপ লোক পূর্ণ সফলকাম হবে।

(১০৫) وَلَا تَكُوْنُوْا আর তোমরা হয়ো না كَالَّذِيْنَ ঐ সমস্ত লোকের মতো যারা تَفَرَّقُوْا পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে وَاخْتَلَفُوْا এবং মতবিরোধ করেছে مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ তাদের নিকট স্পষ্ট বিধানসমূহ পৌঁছার পর وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ আর তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে।

(১০৬) يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ সেদিন কতিপয় চেহারা সাদা হবে وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ এবং কতিপয় চেহারা কালো হবে فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ সুতরাং যাদের চেহারা কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে اَكَفَرْتُمْ তোমরা কি কাফের হয়েছিলে بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ঈমান আনার পর? فَذُوْقُوا الْعَذَابَ কাজেই এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ স্বীয় কুফরির দরুন।

(১০৭) وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ আর যাদের চেহারা সাদা হয়ে যাবে فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ তারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকবে هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে।

(১০৮) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ এটা আল্লাহর আয়াতসমূহ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ যা আমি যথাযথভাবে পাঠ করে আপনাকে শুনাচ্ছি وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ আর আল্লাহ সৃষ্টির প্রতি জুলুম করতে চান না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০২) قوله يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ মদিনায় আগমনের পর আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার পূর্বতম শত্রুতা দূরীভূত করে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতা সৃষ্টি করে দেন। একদা দুই সম্প্রদায়ের দুজন লোক পরস্পর আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে আওস গোত্রের সা'লাব বিন গানাম বলল- আমাদের কওমে এমন চারজন লোক আছেন যাদের সমকক্ষ তোমাদের মধ্যে কেউ নেই। তারা হলেন-

১. হযরত খুজাইমা বিন ছাবিত (রা.) যাঁর সাক্ষ্য দু'জন সাক্ষীর সমতুল্য।
২. হযরত হানজালা (রা.) যাঁর শাহাদাতের পর ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছেন।
৩. হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ প্রকম্পিত হয়েছে।
৪. হযরত আসেম বিন ছাবিত (রা.) যিনি দীনের পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন।

তারপর খাযরাজ গোত্রের সা'আদ ইবনে যারারাহ উত্তরে বললেন আমাদের মধ্যেও এমন চারজন লোক রয়েছে যারা পবিত্র কুরআনকে শক্তভাবে ধারণ করেছেন, তারা হলেন-

১. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) যিনি সবচেয়ে বড় ক্বারী।
২. হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)।
৩. হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)।
৪. হযরত আবূ যায়েদ সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) যিনি আনসারদের সর্দার ছিলেন।

এভাবে কথা কাটাকাটির শেষ পর্যায়ে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলো, এমনকি উভয় গোত্র যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসল। এই সংবাদ রাসূলের নিকট পৌছলে তিনি অতিদ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষকে থামিয়ে দিলেন। তখন মহান আল্লাহ প্রথমোক্ত আয়াত দুটি অবতীর্ণ করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দেন।

মুসলমানদের শক্তির ভিত্তি : আলোচ্য ১০২ ও ৩ নং আয়াতের প্রথমটিতে প্রথম মূলনীতি এবং দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথম মূলনীতিটি তাকওয়া বা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা। অর্থাৎ তার অপছন্দনীয় কাজ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা।

'তাকওয়া' শব্দটি আরবি ভাষায় বেঁচে থাকা ও বিরত থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ- 'ভয় করা' ও করা হয়। কারণ যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, সেগুলো ভয় করারই বিষয়। তাতে খোদায়ী শাস্তির ভয় থাকে। এ তাকওয়া তথা বেঁচে থাকার কয়েকটি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকেই 'মুত্তাকী' [আল্লাহভীরু] বলা যায়- যদিও সে গুনাহে লিপ্ত থাকে। এ অর্থ বুঝানোর জন্যও কুরআনে অনেক জায়গায় 'মুত্তাকীন' ও 'তাকওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর যা আসলে কাম্য- তা হলো এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় নয়। কুরআন ও হাদীসে তাকওয়ার যে সব ফজিলত ও কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা এ স্তরের 'তাকওয়ার' উপর ভিত্তি করেই হয়েছে।

তৃতীয় স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁদের বিশেষ উত্তরাধিকারী ওলীগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন। অর্থাৎ, অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। আলোচ্য আয়াতে اِتَّقُوا اللّٰهَ বলার পর حَقَّ تُقٰتِهٖ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাকওয়ার ঐ স্তর অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক।

তাকওয়ার হক কি? : এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, রবী, কাতাদাহ ও হাসান বসরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও এমনি বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হলো, প্রত্যেক কাজে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোনো কাজ না করা, আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা- কখনো বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা- অকৃতজ্ঞ না হওয়া। -[বাহরে মুহীত]

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- 'সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় কর। হযরত ইবনে আব্বাস ও তাঊস (রা.) বলেন- এ আয়াতটি বাস্তবে তাকওয়ার হকেরই ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। এভাবেই

তাকওয়ার হক আদায় হবে। অতএব, কোনো ব্যক্তি অবৈধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও কোনো অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে, তা তাকওয়ার হকের পরিপন্থি হবে না।

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে– وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ এতে বুঝা যায় যে, পূর্ণ ইসলামই প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা।

মুসলমানদের জাতীয় শক্তির দ্বিতীয় ভিত্তি : وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا আয়াতে পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ও বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এতে সর্বপ্রথম মানুষকে পরস্পর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, ঐক্য ও মৈত্রী যে প্রশংসনীয় ও কাম্য, তাতে জগতের জাতি, ধর্ম ও দেশ-কাল নির্বিশেষে সব মানুষই একমত। এতে দ্বিমতের কোনোই অবকাশ নেই। সম্ভবতঃ জগতের কোথাও এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিবাদ-বিসংবাদকে উপকারী ও উত্তম মনে করে। এ কারণে বিশ্বের সব দল ও গোত্রই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, ঐক্য উপকারী ও অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হওয়া সত্ত্বেও মানব জাতি বিভিন্ন দল-উপদল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এর পর দলের ভিতরে উপদল এবং সংগঠনের ভিতরে উপসংগঠন সৃষ্টি করার এমন এক কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে, যাতে সঠিক অর্থে দুই ব্যক্তির ঐক্য কল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হতে চলেছে। সাময়িক স্বার্থের অধীনে কয়েক ব্যক্তি কোনো বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে কিংবা স্বার্থোদ্ধারে অকৃতকার্য হলে শুধু তাদের ঐক্যই বিনষ্ট হয় না; বরং পরস্পর শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

এ কারণে কুআন পাক শুধু মৈত্রী, একতা, শৃঙ্খলা ও দলবদ্ধ হওয়ার উপদেশই দান করেনি; বরং তা অর্জন করা ও অটুট রাখার একটি ন্যায়ানুগ মূলনীতিও নির্দেশ করেছে– যা স্বীকার করে নিতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। মূলনীতিটি এই, কোনো মানুষের মস্তিষ্কনিঃসৃত অথবা কিছুসংখ্যক লোকের রচিত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা যে, তারা এতে একতাবদ্ধ হয়ে যাবে– বিবেক ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থি ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। তবে বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অবশ্যই সব মানুষের একতাবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। একথা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই নীতিগতভাবে অস্বীকার করতে পারে না। এখন মতভেদের একটি মাত্র ছিদ্রপথ খোলা থাকতে পারে যে, বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা কি এবং কোনটি? ইহুদিরা তাওরাতের ব্যবস্থাকে এবং খ্রিস্টানরা ইঞ্জীলের ব্যবস্থাকে আল্লাহ প্রদত্ত অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থা বলে দাবি করে। এমনকি, মুশরিকদের বিভিন্ন দলও স্ব স্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বলেই দাবি করে থাকে। এ ধরনের মতানৈক্য ও বিভেদকেই কুরআন পাক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। বর্তমানে এ কুরআনি মূলনীতিকে পরিত্যাগ করার কারণেই সমগ্র মুসলিম সমাজ শতধাবিভক্ত হয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ বিভেদ মেটানোর অমোঘ ব্যবস্থাই وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا [আল্লাহর রজ্জুকে সবাই মিলে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর।] আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে 'আল্লাহর রজ্জু বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে হুজুর ﷺ বলেন :

كِتَابُ اللّٰهِ هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَمْدُوْدُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ

অর্থাৎ কুরআন হলো আল্লাহ তা'আলার রজ্জু যা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত প্রলম্বিত। –[ইবনে কাছীর]

যায়েদ ইবনে আরকামের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে حَبْلُ اللّٰهِ هُوَ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ আল্লাহর রজ্জু হচ্ছে কুরআন –[ইবনে কাছীর]

আরবি বচন পদ্ধতিতে 'হাবল' এর অর্থ অঙ্গীকারও হয় এবং এমন যে, কোনো বস্তুকেই বলা হয় যা উপায় বা মাধ্যম হতে পারে। কুরআন অথবা দীনকে 'রজ্জু' বলার কারণ এই যে, এটা একদিকে আল্লাহ তা'আলার সাথে বিশ্ববাসী মানুষের সম্পর্ক কায়েম করে এবং অন্যদিকে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করে একদলে পরিণত করে।

ইজতেহাদী মতবিরোধে কোনো পক্ষের নিন্দাবাদ জায়েজ নয় : এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ফুটে উঠেছে। তা এই যে, শরিয়ত সম্মত ইজতেহাদী মতবিরোধে যে ইমাম যে পক্ষ অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে এক পক্ষ ভুল ও অপর পক্ষ সঠিক হলেও তা মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। তিনি হাশরের ময়দানে সঠিক ইজতেহাদকারী আলেমকে দ্বিগুণ ছওয়াব দান করবেন এবং যার ইজতেহাদ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে, তাকে একটি ছওয়াব দান করবেন। ইজতেহাদী মতবিরোধে কারণে একথা বলার অধিকার নেই যে, নিশ্চিতরূপে এপক্ষ সঠিক এবং ও পক্ষ ভ্রান্ত। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধির আলোতে এক পক্ষকে কুরআন ও সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী মনে করে, তবে সে এরূপ বলতে পারে যে, আমার মতে এ পক্ষটি সঠিক; কিন্তু ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং এ পক্ষটি ভ্রান্ত;

কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এ নীতিকথাটি ইমাম ও ফিকহবিদগণের কাছে স্বীকৃত। এতে আরো বুঝা যায় যে, ইজতেহাদী মতবিরোধ কোনো পক্ষ এরূপ অসৎ হয় না যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ-এর নীতি অনুযায়ী তাকে নিন্দা করা যেতে পারে। সুতরাং যা অসৎ নয়, তাকে নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। আজকাল অনেক আলেমকেও এ ব্যাপারে গাফেল দেখা যায়। তাঁরা বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণকারীদের গালি-গালাজ করতেও কুণ্ঠিত হন না। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে যত্রতত্র দ্বন্দ্ব-কলহ, বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

ইজতেহাদী নীতিমালা যথাযথভাবে পালন করার পরও যদি ইজতেহাদী মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আলোচ্য وَلَا تَفَرَّقُوا আয়াতের পরিপন্থি ও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু আজকাল মুসলমানদের মধ্যে কি হচ্ছে? আজকাল এতদসম্পর্কিত আলোচনা ও তর্ক বিতর্ককেই দীনের ভিত্তি মনে করা হচ্ছে এবং এ নিয়ে পারস্পরিক গালি-গালাজ, লড়াই-ঝগড়া, এমনকি মারামারি পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এ সমস্ত আচরণ অবশ্যই আলোচ্য আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী, নিন্দনীয় এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের রীতির পরিপন্থি। পূর্ববর্তী মনীষীগণের মধ্যে ইজতেহাদী মতবিরোধ নিয়ে বিপক্ষ দলের সাথে এরূপ ব্যবহারের কথা কখনো শোনা যায়নি।

মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার অর্থ : মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার কথা কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে।

এসব আয়াতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। বিশিষ্ট তাফসীরবিদগণের মতে শুভ্রতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মুমিনদের মুখমণ্ডল ঈমানের নূরে উদ্ভাসিত, আনন্দাতিশয্যে উৎফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল হবে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণবর্ণনা দ্বারা কুফরের কালোবর্ণ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের মুখমণ্ডল কুফরের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন হবে। তদুপরি পাপাচারের অন্ধকারে আরো অন্ধকারময় হয়ে যাবে।

উজ্জ্বল মুখ ও কালো মুখ কারা : এরা কারা– এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আহলে সুন্নত সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং বিদআতীদের মুখমণ্ডল কালো হবে। হযরত আতা (রা.) বলেন, মুহাজির ও আনসারগণের মুখমণ্ডল সাদা হবে এবং বনূ কুরায়যা ও বনূ নযীরের মুখমণ্ডল কালো হবে। –[কুরতুবী]

তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ উমামাহ (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে খারেজী সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল কালো হবে। আর তারা যাদের হত্যা করবে, তাদের মুখমণ্ডল সাদা হবে।

হযরত আবূ উমামাকে জিজ্ঞেস করা হলো : আপনি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি অঙ্গুলি গুণে উত্তর দিলেন : হাদীসটি যদি অন্ততঃ সাত বার তাঁর কাছ থেকে না শুনতাম, তবে বর্ণনাই করতাম না। –[তিরমিযী]

হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, আহলে কিতাবগণের এক অংশের মুখমণ্ডল কালো হবে অর্থাৎ, যারা হুজুর ﷺ-এর নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি নবী হবেন বলে বিশ্বাস করত কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির পর তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার পরিবর্তে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। –[কুরতুবী]

কতিপয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য : আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে।

এক. আল্লাহ তা'আলা يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ বাক্যের প্রথমে উজ্জ্বলতার উল্লেখ করে পরে মলিন হওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ বাক্যে বর্ণনাভঙ্গি পাল্টে দিয়েছেন। অথচ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এখানেও শুভ্রতাকে আগে উল্লেখ করাই উচিত ছিল। আয়াতের ধারাবাহিকতা পাল্টে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সম্ভবতঃ সৃষ্টির লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সৃষ্টির লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুকম্পা করা, শাস্তি দেওয়া নয়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম শুভ্র মুখমণ্ডলের কথা বর্ণনা করেছেন; কারণ এরাই আল্লাহর অনুকম্পা ও ছওয়াব লাভের যোগ্য। অতঃপর মলিন মুখমণ্ডল উল্লেখ করেছেন। কারণ এরা আল্লাহর শাস্তির যোগ্য। এরপর আয়াতের শেষাংশে فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ বলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুকম্পাও প্রকাশ করেছেন। এভাবে আয়াতের শুরুতে ও শেষাংশে উভয় স্থানেই অনুকম্পা বর্ণনা করেছেন এবং মাঝখানে মলিন মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ করেছেন। এভাবে অসীম অনুকম্পার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, মানবজাতিকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আল্লাহ তা'আলার অনুকম্পা লাভে ধন্য হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

দুই. শুভ্র মুখমণ্ডলবিশিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর অনুকম্পার মধ্যে অবস্থান করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে আল্লাহর অনুকম্পা বলে জান্নাত বুঝানো হয়েছে। তবে জান্নাতকে অনুকম্পা বলার

রহস্য এই যে, মানুষ যত ইবাদতই করুক না কেন, আল্লাহর অনুকম্পা ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ ইবাদত করা মানুষের নিজস্ব পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত সামর্থ্যের বলেই মানুষ ইবাদত করতে পারে। সুতরাং ইবাদত করলেই জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যায় না; বরং আল্লাহর অনুকম্পার দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব। –[তাফসীরে কাবীর]

তিন. আল্লাহ তা'আলা فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ বাক্যাংশের পর পর هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ বলে একথা ব্যক্ত করেছেন যে, বিশ্ববাসীর আল্লাহ তা'আলার যে অনুকম্পায় অবস্থান করবে, তা তাদের জন্য সাময়িক হবে না; বরং সর্বকালীন হবে। এ নিয়ামত কখনো বিলুপ্ত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত করা হবে না। এর বিপরীতে মলিন মুখমণ্ডল বিশিষ্টদের জন্য একথা বলা হয়নি যে, তারা তাদের সে অবস্থায় চিরকালই থাকবে।

মানুষ নিজের গুনাহের শাস্তিই লাভ করে : فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অদ্যকার শাস্তি আমার পক্ষ থেকে নয়; বরং তোমাদের উপার্জিত। তোমরা পৃথিবীতে অবস্থানকালে এসব উপার্জন করেছিলে। কেননা জান্নাত ও দোজখের বিপদ ও নিয়ামত প্রকৃতপক্ষে তোমাদের কর্মেরই পরিবর্তিত চিত্র। এ বিষয়টি বুঝানোর জন্যই আয়াতের শেষাংশে বলেছেন : وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করার কোনো ইচ্ছা করেন না। শাস্তি ও পুরস্কার যা কিছু দেওয়া হয়, সুবিচার ও অনুকম্পার দাবি হিসেবেই দেওয়া হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَاتَمُوْتُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى معروف بانون ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م . و . ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা মৃত্যুবরণ করো না।

اِعْتَصِمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِصَامُ মূলবর্ণ (ع . ص . م) জিনসে صحيح অর্থ– তোমরা শক্ত করে ধর।

حَبْلٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন حبال অর্থ– রশি।

تَهْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

تَسْوَدُّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اَلْاِسْوِدَادُ মূলবর্ণ (س . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– কালো হবে।

وُجُوْهٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন وجه অর্থ– চেহারাসমূহ।

اِسْوَدَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اَلْاِسْوِدَادُ মূলবর্ণ (س . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– কালো হবে।

ذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا : এখানে اِعْتَصِمُوْا ফে'ল যমীরে اَنْتُمْ যুলহাল بَاء হরফে জার حَبْلُ মুযাফ اللّٰهِ শব্দটি মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে মাজরূর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো, আর جَمِيْعًا টি হাল حال আর ذو الحال ও حال মিলে فاعل সুতরাং فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হলো।

قوله وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ : এখানে وَلْتَكُنْ ফে'ল مِنْكُمْ মুতা'আল্লিক اُمَّةٌ মওসূফ يَدْعُوْنَ ফে'ল যমীরে هُمْ ফা'য়েল اِلٰى হরফে জার اَلْخَيْرِ মাজরূর جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে। فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে জুমলা হয়ে সিফাত। موصوف ও صفة মিলে ولتكن-এর ফা'য়েল সুতরাং فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হলো।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

অনুবাদ : (১০৯) আর আল্লাহরই স্বত্বাধিকারে রয়েছে, যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে, এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾

(১১০) তোমরা উত্তম সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায়কে প্রকাশ করা হয়েছে মানবমণ্ডলীর জন্য তোমরা নেক কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ হতে নিবৃত্ত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ, আর যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত, তবে তাদের জন্য অধিক মঙ্গল হতো, এদের মধ্যে কেউ কেউ তো মুসলমান আর এদের অধিকাংশ কাফের।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ۚ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۚ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾

(১১১) তারা কখনো তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সামান্য কিছু কষ্ট প্রদান ব্যতীত, আর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ পালিয়ে যাবে, অতঃপর কারো পক্ষ হতে তাদের সাহায্যও করা হবে না।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ

(১১২) তাদের প্রতি [বিশেষ] লাঞ্ছনার ছাপ লাগানো হয়েছে তারা যেখানেই থাকুক না কেন, হ্যাঁ, তবে এমন একটি উপায়ের দরুন যা আল্লাহর পক্ষ হতে এবং অন্য এমন একটি উপায়ের দরুন যা মানুষের পক্ষ হতে, আর তারা যোগ্য হয়েছে আল্লাহর গজবের

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৯) وَلِلّٰهِ আর আল্লাহরই স্বত্বাধিকারে রয়েছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে وَاِلَى اللّٰهِ এবং আল্লাহরই দিকে تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

(১১০) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ তোমরা উত্তম সম্প্রদায় اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ যে সম্প্রদায়কে প্রকাশ করা হয়েছে মানবমণ্ডলীর জন্য تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ তোমরা নেক কাজের আদেশ কর وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ এবং মন্দ কাজ হতে নিবৃত্ত রাখ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ আর যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনত لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ তবে তাদের জন্য অধিক মঙ্গল হতো مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ এদের মধ্যে কেউ কেউ তো মুসলমান وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ আর এদের অধিকাংশ কাফের।

(১১১) لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ তারা কখনো তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না اِلَّآ اَذًى সামান্য কিছু কষ্ট প্রদান ব্যতীত وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ আর যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ তবে তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ পালিয়ে যাবে ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ অতঃপর কারো পক্ষ হতে তাদের সাহায্যও করা হবে না।

(১১২) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ তাদের প্রতি [বিশেষ] লাঞ্ছনার ছাপ লাগানো হয়েছে اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا তারা যেখানেই থাকুক না কেন اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ হ্যাঁ, তবে এমন একটি উপায়ের দরুন যা আল্লাহর পক্ষ হতে وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এবং অন্য এমন একটি উপায়ের দরুন যা মানুষের পক্ষ হতে وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ আর তারা যোগ্য হয়েছে আল্লাহর গজবের

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾

অনুবাদ : এবং তাদের উপর অবমাননার ছাপ লাগানো হয়েছে, তা এই নিমিত্তে যে, তারা আল্লাহর বিনধানসমূহ অমান্য করত এবং পয়গম্বরদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ফেলত, [আর] তা এই জন্য হয়েছে যে, তারা আনুগত্য করত না এবং সীমা ছাড়িয়ে যেত।

لَيْسُوْا سَوَآءً ۚ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾

(১১৩) তারা সকলে সমান নয়, এই আহলে কিতাবদের মধ্যে এক সম্প্রদায় তারাও যারা [সত্য ধর্মে] সুপ্রতিষ্ঠিত, আল্লাহর আয়াতসমূহ রাত্রিকালে পাঠ করে, আর তারা নামাজও পড়ে থাকে।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾

(১১৪) আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এবং নেক কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে, আর নেক কাজের দিকে ধাবিত হয়, আর তারা সুসভ্য লোকের মধ্যে গণ্য।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾

(১১৫) আর তারা যে নেক কাজ করবে তা হতে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে না। আর আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদেরকে খুব ভালোভাবে জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ এবং তাদের উপর অবমাননার ছাপ লাগানো হয়েছে ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ তা এই নিমিত্তে যে كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ তারা আল্লাহর বিনধানসমূহ অমান্য করত وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ এবং পয়গম্বরদেরকে হত্যা করে ফেলত بِغَيْرِ حَقٍّ অন্যায়ভাবে। ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا এটা এই জন্য হয়েছে যে তারা আনুগত্য করত না وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ এবং সীমা ছাড়িয়ে যেত।

(১১৩) لَيْسُوْا سَوَآءً তারা সকলে সমান নয় مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ এই আহলে কিতাবদের মধ্যে এক সম্প্রদায় তারাও যারা [সত্য ধর্মে] সুপ্রতিষ্ঠিত يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে اٰنَآءَ الَّيْلِ রাত্রিকালে وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ আর তারা নামাজও পড়ে থাকে।

(১১৪) يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ এবং নেক কাজের আদেশ করে وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ আর নেক কাজের দিকে ধাবিত হয় وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ আর তারা সুসভ্য লোকের মধ্যে গণ্য।

(১১৫) وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ আর তারা যে নেক কাজ করবে فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ তা হতে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে না وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদেরকে খুব ভালোভাবে জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১১০) قوله كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতটি ইহুদি মালেক ইবনে মাইক এবং ওহাব ইবনে ইয়াহুমা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলেছিল যে, আমরা 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাবারী উবাই বিন কা'ব মা'আয ইবনে জাবাল ও সালেম হতে উত্তম, এবং আমাদের ইহুদি ধর্ম তোমাদের ধর্ম হতে উত্তম, তখন মহান আল্লাহ তাদের ভ্রান্ত দাবি খণ্ডন করে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[আসবাবুন নুযূল, নীসপুরী, পৃ. ৭১]

(১১১) قوله لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى الخ আয়াতের শানে নুযূল : মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় কখনো ইসলামকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা সর্বক্ষণ ইসলামের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করত, এমনকি মক্কার কুরাইশদের সাথে গোপনে মিলিত হয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত রূহুল মা'আনী ৩/ ১৭৩ তে শানে নুযূল অন্যভাবে আছে আয়াত নাজিল করে মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেন যে, তারা বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না। এই আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইহুদিগণ মদিনা হতে বহিষ্কৃত হয়ে খায়বারে আশ্রয় গ্রহণ করে, অবশেষে খায়বার যুদ্ধে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়। তখন তাদেরকে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।

(১১৩) قوله لَيْسُوا سَوَآءً مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, ইহুদিদের বড় আলেম আব্দুল্লাহ বিন সালাম ছা'লাবা বিন শো'বা সহ বহু সংখ্যক ব্যক্তি ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তখন ইহুদিরা বলাবলি করতে লাগল যে, এরা আমাদের মধ্যে খুব খারাপ লোক ছিল, আবার আচরণও তাদের ভালো ছিল না। যদি তারা ভালো লোক হতো তবে বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করত না। তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে উক্ত আয়াতগুলো নাজিল করেন। –[আসবাবুন নুযূল, নীসফুরী পৃ. ৭২]

মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার কয়েকটি কারণ : মুসলিম সম্প্রদায়কে 'শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়' বলে ঘোষণা করার কারণসমূহ কুরআন পাক একাধিক আয়াতে বর্ণনা করেছে। এতদসম্পর্কিত প্রধান আয়াত সূরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا আয়াতটি। সেখানেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ মধ্যপন্থি হওয়া এবং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যপন্থার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। –[মা'আরেফুল কুরআন]

আলোচ্য ১১০ নং আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা মানব জাতির উপকারার্থে সমুত্থিত হয়েছে। আর তাদের প্রধান উপকার এই যে, মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে 'সৎকাজে আদেশ দান এবং অসৎকাজে নিষেধ' করার দায়িত্ব অধিকতর পূর্ণত্বলাভ করেছে। সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, এ কর্তব্যটি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের দায়িত্বেও ন্যস্ত ছিল, কিন্তু বিগত অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের নির্দেশ ছিলনা। তাই তারা শুধু অন্তর ও মুখের দ্বারাই 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কর্তব্য পালন করতে পারত। মুসলিম সম্প্রদায় বাহুবলেও এ কর্তব্য পালন করতে পারে। সব রকমের জিহাদের এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে ইসলামি আইন কার্যকরী করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যাপক ঔদাসীন্যের দরুন ধর্মের অন্যান্য বিশেষ কার্যাবলির ন্যায় সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করার কর্তব্যটিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে যারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ -এর কর্তব্য পুরোপুরি পালন করে যাবে।

وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ বাক্যাংশে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পূর্ববর্তী সব পয়গম্বর ও উম্মতেরও অভিন্ন গুণ। একে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে কিরূপে আখ্যা দেওয়া হলো? উত্তর এই যে, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় যে স্তরে উন্নীত হয়েছে, তা পূর্ববর্তী উম্মতগণের তুলনায় বিশেষ স্বাতন্ত্রের অধিকারী।

আয়াতের শেষাংশে আহলে কিতাবগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁদের কেউ কেউ মুমিন। বলা বাহুল্য, এরা হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ। এরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আয়াতের লক্ষ্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে নবুয়তের জমানায় কোনো ক্ষেত্রেই মোকাবিলায় বিরুদ্ধবাদিরা জয়লাভ করতে পারেনি। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদি গোত্রগুলো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল। বিশেষ করে তারা পরিণামে মুসলমানদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। কতক নিহত হয়েছে, কতক নির্বাসিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যকের উপর জিযিয়া কর ধার্য করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়েরই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে।

ইহুদিদের প্রতি গজব ও লাঞ্ছনার অর্থ : সূরা বাকরার ৬১তম আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কোনো ব্যতিক্রম নেই। সূরা আলে ইমরানের আলোচ্য আয়াতের إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এর ব্যতিক্রম সম্পর্কেও সেখানে পূর্ণ তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে। –[মা'আরেফুল কুরআন] এখানে পুনর্বার উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, কাশশাফ গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হচ্ছে ইহুদিদের সাথে লাঞ্ছনা ও অপমান লেগেই থাকবে। তবে তারা দুই উপায়ে এ লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে পারবে। ১. আল্লাহর অঙ্গীকার। উদহারণতঃ নাবালেগ বালক অথবা মহিলা হলে আল্লাহর নির্দেশে সে হত্যা থেকে নিরাপদে থাকবে। ২. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ অর্থাৎ, অন্যের সাথে সন্ধিচুক্তির কারণে তাদের লাঞ্ছনা ও অপমান প্রকাশ পাবে না। وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ শব্দের মধ্যে মুসলমান ও কাফের উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আয়াতের অর্থ মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে বিপদমুক্ত হওয়াও হতে পারে এবং কোনো অমুসলিম শক্তির সাথে চুক্তি করে নিরাপদ হওয়াও হতে পারে, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের অবস্থা যে হুবহু তাই, তা জ্ঞানী মাত্রেরই অজানা নয়। ইসরাঈল রাষ্ট্রটি প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টান পাশ্চাত্যের একটি সামরিক ছাউনি। এর যা কিছু শক্তিমত্ততা দেখা যায়, সবই অপরের কৃপায়। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিবর্গ এর উপর থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিলে এটি একদিনও স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُوَلُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাবে।

اَلْاَدْبَارَ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে دُبُرٌ অর্থ– পিছনের অংশ, পিঠ।

ثُقِفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাবে سَمِعَ মাসদার اَلثَّقْفُ মূলবর্ণ(ث ـ ق ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা থাকবে।

بَآءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَوْءُ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام ও اجوف واوى অর্থ– তারা প্রত্যাবর্তন করে।

عَصَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِصْيَانُ মূলবর্ণ (ع ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা নাফরমানি করেছে।

كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সীমালঙ্ঘন করছিল।

يَنْهَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّهْىُ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা বিরত রাখে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ : এখানে واو হরফে আতফ ضُرِبَتْ ফে'ল عَلٰى হরফে জার هُمْ মাজরূর জার ও مجرور মিলে متعلق আর اَلْمَسْكَنَةُ নায়েবে ফা'য়েল। সুতরাং فعل ـ نائب فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

অনুবাদ : (১১৬) নিশ্চয়, যারা কাফের রয়েছে কখনো তাদের ধনরাশি এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তা'আলার [আজাবের] সম্মুখে বিন্দুমাত্রও তাদের কাজে আসবে না। আর তারা দোজখী, তারা অনন্তকাল তাতে থাকবে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

(১১৭) তারা এই পার্থিব জীবনে যা কিছু ব্যয় করে, তার অবস্থা ঐ অবস্থার অনুরূপ যে, এরূপ বাতাস যাতে প্রচণ্ড হিম আছে, ঐ বাতাস এমন লোকের শস্যক্ষেত্র স্পর্শ করল যারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করে রেখেছে, অনন্তর ঐ বাতাস উক্ত শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে ফেলল, আর আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করছিল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

(১১৮) হে মুমিনগণ! নিজেদের [লোক] ব্যতীত কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ো না, তারা তোমাদের সাথে দুষ্টামী করতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করে না, তোমাদের অনিষ্ট কামনা করে, বাস্তবিক, শত্রুতা তাদের মুখ হতে প্রকাশ হয়ে পড়ে, আর যে পরিমাণ তাদের অন্তরে রয়েছে, সে তো অনেক কিছু, আমি লক্ষণসমূহ তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিয়েছি, যদি তোমরা বুদ্ধি রাখ।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৬) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا নিশ্চয় যারা কাফের রয়েছে لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ কখনো তাদের কাজে আসবে না أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ধনরাশি এবং তাদের সন্তান-সন্ততি مِنَ اللَّهِ شَيْئًا আল্লাহ তা'আলার [আজাবের] সম্মুখে বিন্দুমাত্রও وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ আর তারা দোজখী هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ তারা অনন্তকাল তাতে থাকবে।

(১১৭) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ তারা যা কিছু ব্যয় করে তার অবস্থা فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا এই পার্থিব জীবনে كَمَثَلِ رِيحٍ ঐ অবস্থার অনুরূপ যে এরূপ বাতাস فِيهَا صِرٌّ যাতে প্রচণ্ড হিম আছে أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ঐ বাতাস এমন লোকের শস্যক্ষেত্র স্পর্শ করল ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ যারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করে রেখেছে فَأَهْلَكَتْهُ অনন্তর ঐ বাতাস উক্ত শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে ফেলল وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ আর আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেননি وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করছিল।

(১১৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে মুমিনগণ! لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিয়ো না مِنْ دُونِكُمْ নিজেদের [লোক] ব্যতীত لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا তারা তোমাদের সাথে দুষ্টামী করতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করে না وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ তোমাদের অনিষ্ট কামনা করে قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ বাস্তবিক, শত্রুতা প্রকাশ হয়ে পড়ে مِنْ أَفْوَاهِهِمْ তাদের মুখ হতে وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ আর যে পরিমাণ তাদের অন্তরে রয়েছে أَكْبَرُ সে তো অনেক কিছু قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ আমি লক্ষণসমূহ তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিয়েছি إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ যদি তোমরা বুদ্ধি রাখ।

هَاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (١١٩)

অনুবাদ : (১১৯) হ্যাঁ, তোমরা তো এরূপ যে, তাদের সঙ্গে ভালোবাসা রাখ, আর তারা তোমাদের সঙ্গে আদৌ ভালোবাসা রাখে না অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান রাখ, আর তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হলে বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধে নিজেদের অঙ্গুলীসমূহ দংশন করে, আপনি বলে দিন, তোমরা স্বীয় ক্রোধে মরে যাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত।

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ (١٢٠)

(১২০) যদি তোমাদের কোনো মঙ্গলময় অবস্থা উপস্থিত হয়, তবে তাদের মনোবেদনার কারণ হয়, আর যদি তোমাদের কোনো অমঙ্গলজনক অবস্থা উপস্থিত হয়, তবে তারা তাতে আনন্দিত হয়, আর যদি তোমরা অটল ও সংযমী হও, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের কার্যসমূহকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٢١)

(১২১) আর যখন আপনি প্রভাতে বের হলেন স্বীয় গৃহ হতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য যথাস্থানে সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন করছিলেন, আর আল্লাহ্ সব [-ই] শুনছিলেন, জানছিলেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৯) هَاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ হ্যাঁ, তোমরা তো এরূপ যে, তাদের সঙ্গে ভালোবাসা রাখ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ আর তারা তোমাদের সঙ্গে আদৌ ভালোবাসা রাখে না وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান রাখ। وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا আর তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হলে বলে اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি। وَاِذَا خَلَوْا আর যখন পৃথক হয়ে যায় عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ তখন তোমাদের প্রতি নিজেদের অঙ্গুলীসমূহ দংশন করে مِنَ الْغَيْظِ ক্রোধে قُلْ আপনি বলে দিন مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ তোমরা স্বীয় ক্রোধে মরে যাও اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত।

(১২০) اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ যদি তোমাদের কোনো মঙ্গলময় অবস্থা উপস্থিত হয় تَسُؤْهُمْ তবে তাদের মনোবেদনার কারণ হয় وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ আর যদি তোমাদের কোনো অমঙ্গলজনক অবস্থা উপস্থিত হয় يَّفْرَحُوْا بِهَا তবে তারা তাতে আনন্দিত হয় وَاِنْ تَصْبِرُوْا আর যদি তোমরা অটল وَتَتَّقُوْا ও সংযমী হও لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের কার্যসমূহকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

(১২১) وَاِذْ غَدَوْتَ আর যখন আপনি প্রভাতে বের হলেন مِنْ اَهْلِكَ স্বীয় গৃহ হতে تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য যথাস্থানে সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন করছিলেন وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ্ সব [-ই] শুনছিলেন, জানছিলেন

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১১৬) قوله إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এই আয়াতটি মদিনার ইহুদি গোত্র বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যা গোত্রদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে অবতরণ করা হয়েছে। তারা প্রাধান্য পাওয়ার জন্য ধন সম্পদ উপার্জন করত।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, কুরাইশদের অন্যতম নেতা আবূ সুফিয়ান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু তিনি বদর ও ওহুদ যুদ্ধে বহু ধন-সম্পদ ও সৈন্য দিয়ে কাফেরদেরকে সাহায্য করেছিলো।

তাফসীরে খাযেন গ্রন্থকারের মতে সমস্ত কাফের সম্পর্কেই অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। যেহেতু তারা ধন-সম্পদকেই সবকিছুর মূল মনে করে, এবং তা অর্জনের নিমিত্তে নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়।

(১১৮) قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদিদের সাথে আউস খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ব্যক্তিগত ও গোত্রগত উভয় পর্যায়েই তারা একে অন্যের প্রতিবেশি ও মিত্র ছিল। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় মুসলমান হওয়ার পরও ইহুদিদের সাথে পুরাতন সম্পর্ক বহাল রাখে। কিন্তু ইহুদিদের মনে ছিল মহানবী ﷺ ও তাঁর দীনের প্রতি শত্রুতা। তাই তারা এমন কোনো ব্যক্তিকেই আন্তরিকতার সাথে ভালোবাসতে সম্মত হতো না যে, এ ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কাজেই তারা আউস ও খাযরাজ গোত্রের আনসারদের সাথে বাহ্যিক পূর্ব সম্পর্ক বহাল রাখলেও এ সময় মনে মনে তাদের শত্রু হয়ে গিয়েছিল। বাহ্যিক বন্ধুত্বের আড়ালে তারা মুসলমানদের গোপন তথ্য শত্রুদের কাছে পৌঁছ দিতে চেষ্টা করত। ফলে মহান আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে আহলে কিতাবদের এহেন দূরভিসন্ধি থেকে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণনা করেছেন। –[মা'আরেফুল কুরআন]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। بِطَانَةً শব্দের অর্থ অভিভাবক, বন্ধু, বিশ্বস্ত, রহস্যবিদ। কাপড়ের অভ্যন্তর ভাগকেও بِطَانَةً বলা হয়, যা শরীরের সাথে মিশে থাকে। এ শব্দটি بَطْن শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর বিপরীত শব্দ ظَهْر কোনো বস্তুর বাহ্যিক দিককে ظَهْر এবং অভ্যন্তরীণ দিককে بَطْن বলা হয়। এমনিভাবে কাপড়ের উপরের অংশকে ظِهَارَةٌ এবং ভিতরের যে অংশ শরীরের সাথে মিশে থাকে, তাকে بِطَانَةً বলা হয়। আমরা নিজ ভাষায় বলি : সে তার জামা-চাদর। অর্থাৎ সে তার খুব প্রিয়। এমনভাবে بِطَانَةً বলে রূপক অর্থে বন্ধু, বিশ্বস্ত, গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য লোককে বুঝানো হয়। প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ লিসানুল আরবে بِطَانَةً শব্দের অর্থ এরূপ লিখিত আছে : কোনো ব্যক্তির অভিভাবক, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা হয়, এরূপ ব্যক্তিকে তার بِطَانَةً বলা হয়।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য কাউকে এমন মুরব্বি ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করো না, যার কাছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে না।

ইসলাম স্বীয় বিশ্বব্যাপী করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, মানবতা ও উদারতার অসাধারণ নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয়; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলি সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামি আইনে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার বাইরে এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি মুসলমানদের দেওয়া যায় না। কারণ এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুক্তিপূর্ণ, সঙ্গত ও জরুরি ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই হেফাজত হয়। যেসব অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা কিংবা মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জোরদার নির্দেশাবলি ইসলামি আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ -বলেন, যে ব্যক্তি কোনো জিম্মী অর্থাৎ, মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম বাসিন্দাকে কষ্ট দেয়, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হব। আর আমি যে মকদ্দমায় বাদী হবো, তাতে জয়লাভ অবধারিত। অন্য এক হাদীসে বলেন– চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম বাসিন্দা অথবা অন্য কারো প্রতি অত্যাচার করতে আমার পালনকর্তা আমাকে নিষেধ করেছেন। আর এক হাদীসে বলেন "সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো

চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অত্যাচার করে কিংবা তার প্রাপ্য হ্রাস করে কিংবা তার উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোনো জিনিস গ্রহণ করে, তবে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে উকিল হব ।"

কিন্তু এসব উদারতার সাথে সাথে মুসলমানদের নিজস্ব জামাত ও জাতিসত্তার হেফাজতের স্বার্থে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বিশ্বস্ত মুরব্বিরূপে গ্রহণ করো না ।

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ফারূক (রা.)-কে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে । আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুনশী হিসেবে গ্রহণ করে নিলে ভালোই হবে । হযরত ওমর ফারূক (রা.) উত্তরে বলেন : "এরূপ করলে মুসলমানদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করা হবে, যা কুরআনের নির্দেশের পরিপন্থি ।"

ইমাম কুরতুবী হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও তাফসীরবিদ । তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে মুসলমানদের মধ্যে এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ ও তার অশুভ পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেন : "আজকাল অবস্থা এমন পাল্টে গেছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে ওরা মূর্খ বিত্তশালী ও শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে ।"

অধুনা আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশেষ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়– এমন কোনো ব্যক্তিকে উপদেষ্টা ও মুরব্বিরূপে গ্রহণ করা হয় না ।

আলোচ্য ১১৮ নং আয়াতে উপরিউক্ত নির্দেশের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে : لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا অর্থাৎ তারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে কসুর করবে না । তারা তোমাদের বিপদ কামনা করে । এ ধরনের কিছু বিষয় স্বয়ং তাদের মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে । কিন্তু অন্তরে যে শত্রুতা গোপন রাখে, তা আরো মারাত্মক । আমি তোমাদের সামনে সব আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি; এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পার তবে তা থেকে উপকার পেতে পার ।

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদি হোক কিংবা খ্রিস্টান, কপট বিশ্বাসী মুনাফিক হোক কিংবা মুশরিক– কেউ তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী নয় । তারা সর্বদাই তোমাদের বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে । তোমরা কষ্টে থাক, এটাই হলো তাদের কাম্য । তাদের অন্তরে যে শত্রুতা লুক্কায়িত রয়েছে, তা খুবই মারাত্মক । কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমন সব কথাবার্তা বলে ফেলে, যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক । শত্রুতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বের হয়ে পড়ে । সুতরাং এহেন শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় । আল্লাহ তা'আলা শত্রু-মিত্রের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন, সুতরাং মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খুবই উচিত ।

وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ : বাক্যটি কাফেরসুলভ মনোভাবের পূর্ণ পরিচায়ক । এর মধ্যে এ বিষয়ের গভীর শিক্ষা নিহিত আছে যে, কোনো অমুসলিম কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের সত্যিকার বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না ।

এরপর বলা হয়েছে هٰٓاَنْتُمْ اُولَاۤءِ تُحِبُّوْنَهُمْ অর্থাৎ তোমরা তো তাদের ভালোবাস, কিন্তু তারা তো তোমাদের মোটেই ভালোবাসে না । এছাড়া তোমরা সব ঐশী গ্রন্থেই বিশ্বাস কর । তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে : আমরা মুসলমান । কিন্তু যখন একান্তে গমন করে, তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধের আতিশয্যে আঙ্গুল কামড়াতে থাকে । বলে দিন, তোমরা ক্রোধে নিপাত যাও । নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের কথাবার্তা সম্পর্কে সম্যক অবগত । অর্থাৎ এটা কেমন বেখাপ্পা বিষয় যে, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, অথচ তারা তোমাদের বন্ধু নয়; বরং মূলোৎপাটনকারী শত্রু । আশ্চর্যের বিষয় তোমরা সব খোদায়ী গ্রন্থে বিশ্বাসী; তা যে কোনো জাতি, যে কোনো যুগে, যে কোনো পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ হোক না কেন; কিন্তু এর বিপরীতে তারা তোমাদের পয়গম্বর ও গ্রন্থ কুরআনকে বিশ্বাস করে না । এমনকি তাদের নিজ গ্রন্থের প্রতিও তাদের শুদ্ধ বিশ্বাস নেই । এদিক দিয়ে তোমাদের সাথে ওদের অল্পবিস্তর বন্ধুত্ব এবং তাদের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষভাব থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এখানে ব্যাপার হচ্ছে উল্টো ।

এ কাফের সুলভ মনোভাবের আরো ব্যাখ্যা এই যে, اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ অর্থাৎ তাদের অবস্থা এই যে, তোমরা কোনো সুখকর অবস্থার সম্মুখীন হলে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমরা কোনো বিপদে পতিত হলে তারা আনন্দে গদগদ হয়ে উঠে ।

অতঃপর কপট বিশ্বাসীদের চক্রান্ত এবং ঘোর শত্রুদের শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ থাকার জন্য একটি সহজ সুন্দর ব্যবস্থা বাতলে দেওয়া হচ্ছে : "তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে এবং পরহেজগারী অবলম্বন করলে ওদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করতে পারবে না।"

ধৈর্য ও পরহেজগারীর মধ্যেই মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য : যাবতীয় বিপদাপদ ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য কুরআন ধৈর্য ও তাকওয়া-পরহেজগারীকে শুধু এ আয়াতেই নয়, অন্যান্য আয়াতেও একটি কার্যকরী প্রতিষেধক হিসেবে বর্ণনা করেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَنْ تُغْنِيَ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ مضارع معروف نفى بلن বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনসে ناقص يائى অর্থ– কখনো কোনো কাজে আসবে না।

بِطَانَةً : অন্তরের বন্ধুত্ব।

وَدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوِدَادُ মূলবর্ণ (و ـ د ـ د) জিনসে মুরাক্কাব مضاعف ثلاثى এবং مثال واوى অর্থ– তারা কামনা করে।

خَلَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْوَةُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা পৃথক হয়।

مُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اجوف واوى অর্থ- তোমরা মৃত্যুবরণ কর।

غَدَوْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُدُوُّ মূলবর্ণ (غ ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনি সকালে বের হলেন।

تُبَوِّئُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْوِيَةُ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى ও مهموزلام অর্থ– আপনি বিন্যস্ত করলেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ : এখানে قَدْ بَدَتْ ফে'ল اَلْبَغْضَاءُ ফা'য়েল مِنْ হরফে জার اَفْوَاهُ মুযাফ هم মুযাফ ইলাইহি مضاف اليه ও مضاف মিলে مجرور ও جار মিলে মাজরূর متعلق সুতরাং فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

قوله اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ : এখানে اِنْ হরফে শর্ত تَمْسَسْ ফে'ল كُمْ মাফউল حَسَنَةٌ ফা'য়েল فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে شرط হলো, تَسُؤْ ফে'ল যমীরে هِىَ ফা'য়েল هُمْ মাফউল فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে جزاء সুতরাং شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হলো।

قوله اِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَللّٰهَ শব্দটি اِنَّ এর ইসম بَاءُ হরফে জার مَا ইসমে মাওসূল يَعْمَلُوْنَ ফে'ল, ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে صله হয়েছে। موصول ও صلة মিলে মাজরূর ও جار মিলে مجرور হলো مُحِيْطٌ শিবহে فعل -এর সাথে, শিবহে فعل তার فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে اِنَّ এর خبر হলো। অতএব اِنَّ তার اسم ও خبر নিয়ে جملة اسمية হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
(১২২) যখন তোমাদের মধ্য হতে দুটি দল মনে মনে ভগ্নোৎসাহ হওয়ার কল্পনা করল, আর আল্লাহ তো ঐ উভয় দলেরই সহায়ক ছিলেন, আর মুসলমানদের তো আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।	إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾
(১২৩) আর তা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে [বদর যুদ্ধে] সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা সহায়-সম্বলহীন ছিলে, সুতরাং আল্লাহকে ভয় করতে থাক– যেন তোমরা শুকরগুজার হও।	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾
(১২৪) যখন আপনি মুসলমানদেরকে এরূপ বলছিলেন যে, তোমাদের কি এটা যথেষ্ট হবে না যে, তোমাদের রব তিন সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন? যারা [আসমান হতে] অবতারিত হবে।	إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾
(১২৫) হ্যাঁ, কেন হবে না? যদি [যুদ্ধে] অটল থাক এবং খোদভীরু হও আর [যদি] তারা তোমাদের প্রতি নিমিষে এসে পৌছে, তাহলে তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে এক বিশিষ্ট বেশধারী পাঁচ সহস্র ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন।	بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১২২) إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ যখন তোমাদের মধ্য হতে দুটি দল মনে মনে কল্পনা করল أَن تَفْشَلَا ভগ্নোৎসাহ হওয়ার وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا আর আল্লাহ তো ঐ উভয় দলেরই সহায়ক ছিলেন وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ আর মুসলমানদের তো আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

(১২৩) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ আর তা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে [বদর যুদ্ধে] সাহায্য করেছেন وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ অথচ তোমরা সহায়-সম্বলহীন ছিলে فَاتَّقُوا اللَّهَ সুতরাং আল্লাহকে ভয় করতে থাক– لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ যেন তোমরা শুকরগুজার হও।

(১২৪) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ যখন আপনি মুসলমানদেরকে এরূপ বলছিলেন যে أَلَن يَكْفِيَكُمْ তোমাদের কি এটা যথেষ্ট হবে না যে أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم তোমাদের রব তোমাদের সাহায্য করবেন بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ তিন সহস্র ফেরেশতা দ্বারা مُنزَلِينَ যারা [আসমান হতে] অবতারিত হবে।

(১২৫) بَلَىٰ হ্যাঁ, কেন হবে না? إِن تَصْبِرُوا যদি [যুদ্ধে] অটল থাক। وَتَتَّقُوا এবং আল্লাহভীরু হও وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ আর [যদি] তারা তোমাদের প্রতি নিমিষে এসে পৌছে هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم তাহলে তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে সাহায্য করবেন بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ পাঁচ সহস্র ফেরেশতা দিয়ে مُسَوِّمِينَ এক বিশিষ্ট বেশধারী।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾

(১২৬) আর এই সাহায্য আল্লাহ তা'আলা শুধু এই জন্য করেছেন, যেন তোমাদের জন্য সু-সংবাদ হয় আর যেন তোমাদের মনে স্থিরতা আসে, আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, যিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾

(১২৭) যেন কাফেরদের একদলকে ধ্বংস করে দেন অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন, ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾

(১২৮) আপনার কোনো অধিকার নেই, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা হয়তো তাদের তওবা কবুল করবেন অথবা তাদেরকে কোনো শাস্তি প্রদান করবেন। কেননা এরা জুলুমও ভীষণ করছে।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

(১২৯) আর যাকিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যাকিছু জমিনে রয়েছে সবকিছু আল্লাহর স্বত্বাধীন; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, আর আল্লাহ তা'আলা তো অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

(১৩০) হে মুমিনগণ! সুদ খেয়ো না কয়েক গুণ অতিরিক্ত এবং আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১২৭) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا যেন কাফেরদের একদলকে ধ্বংস করে দেন اَوْ يَكْبِتَهُمْ অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায়।

(১২৮) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ আপনার কোনো অধিকার নেই اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা হয়তো তাদের তওবা কবুল করবেন اَوْ يُعَذِّبَهُمْ অথবা তাদেরকে কোনো শাস্তি প্রদান করবেন فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ কেননা এরা জুলুমও ভীষণ করছে।

(১২৯) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ আর যাকিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যাকিছু জমিনে রয়েছে সবকিছু আল্লাহর স্বত্বাধীন يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর আল্লাহ তা'আলা তো অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

(১৩০) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ! لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا সুদ খেয়ো না اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً কয়েক গুণ অতিরিক্ত وَّاتَّقُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহকে ভয় কর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।

(১৩১) আর তোমরা সেই আগুন হতে আত্মরক্ষা কর, যা [মূলতঃ] কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।	وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ (۱۳۱)
(১৩২) আর সানন্দে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ পালন কর, আশা করা যায়, তোমরা অনুগৃহীত হবে।	وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (۱۳۲)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩১) وَاتَّقُوا النَّارَ আর তোমরা সেই আগুন হতে আত্মরক্ষা কর الَّتِيٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ যা [মূলতঃ] কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

(১৩২) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ আর সানন্দে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ পালন কর لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ আশা করা যায়, তোমরা অনুগৃহীত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১২৩) قوله : وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রাথমিক পর্যায়ে গিরিপথ অরক্ষিত রেখে নবীর আদেশ অমান্য করে গনিমত অন্বেষণে লিপ্ত হলে কুরাইশদের অতর্কিত আক্রমণে পরাজয় বরণ করেন। এতে তারা হতাশ ও ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতগুলো অবতরণ করে বদর যুদ্ধের সাহায্য সহযোগিতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের সান্ত্বনা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তোমাদের চরম নিঃস্ব অবস্থায় বদর যুদ্ধে তিন হাজার, পরে পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন। কাজেই সামান্য বিপর্যয়ে হতাশ হবার কোনো কারণ নেই।

(১২৮) قوله لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কাশশাফ গ্রন্থকার বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধের দিন ওতবা বিন আবি ওয়াক্কাছ নামক এক নরপশু পাথর নিক্ষেপ করে রাসূল ﷺ-এর নিম্নের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে ফেলে। ফলে রাসূলের মুখ বেয়ে রক্ত পড়তে থাকে। রাসূল ﷺ রক্ত মুছতে মুছতে বলেন– كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ অর্থাৎ যে জাতি স্বীয় পয়গম্বরের মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত করে। তারা কিভাবে মুক্তি পাবে? অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছেন। তখন আল্লাহ অত্র আয়াত নাজিল করেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। হুজুর ﷺ-এর পরম শ্রদ্ধাভাজন চাচা হযরত হামযা (রা.) ছিলেন তাদের অন্যতম। হত্যার পর কাফেররা তাঁর লাশ মোবারক বিকৃত করে ফেলে। রাসূল ﷺ অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। ফলে মহানবী ﷺ ওহুদের কাফেরদের জন্য বদদোয়া করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে বদ দোয়া করা হতে বারণ করেন। পরবর্তীতে এদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে –[সহীহ বুখারী, লুবাবুন নুকূল, আসবাবুন নুযূল ফী

(১৩০) قوله : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে যে, জাহেলী যুগে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে অসমর্থ হলে সেই ঋণকে মূলধনে পরিণত করে পুনরায় তার উপর সুদ নির্ধারণ করত। এভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের পরিমাণও বাড়ানো হতো। ফলে ঋণ গ্রহীতা যখন অধিক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তো এবং ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়ত তখন সে সুযোগে দাতা গ্রহীতার সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদের মালিক হয়ে যেত এবং ঋণ গ্রহীতাকে ভিক্ষুকে পরিণত করা হতো। কখনো কখনো সম্পদের সাথে তার স্ত্রী পরিজনেরও মালিক হয়ে যেত, মহান আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করে মুসলমানদেরকে অন্ধকার যুগের এই কুসংস্কার হতে বেঁচে থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। –[তাফসীরে রুহুল মা'আনী]

ওহুদ যুদ্ধের পটভূমি : আলোচ্য আয়াতের তাফসীরের পূর্বে ওহুদ যুদ্ধের পটভূমি হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয় হিজরির রমজান মাসে বদর নামক স্থানে কুরাইশ বাহিনী ও মুসলিম মুজাহিদগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কুরাইশদের সত্তর জন খ্যাতনামা ব্যক্তি নিহত হয়। এবং এ পরিমাণই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এর মারাত্মক ও অবমাননাকর

পরাজয়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত আজাবের প্রথম কিস্তি। এতে কুরাইশদের প্রতিশোধস্পৃহা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। নিহত সরদারদের আত্মীয়-স্বজনরা সমগ্র আরবকে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারা প্রতিজ্ঞা করে : আমরা যতদিন এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করব, ততদিন স্বস্তির নিশ্বাস নেব না তারা মক্কাবাসীদের কাছে আবেদন জানালো, তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে যে অর্থ-সম্পদ নিয়ে এসেছে, তা সবই যেন এ অভিযানে ব্যয় করা হয়– যাতে মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ আবেদনে সবাই যোগও দিল। সেমতে তৃতীয় হিজরিতে কুরাইশদের সাথে অন্যান্য কয়েকটি গোত্রও মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। এমনকি, স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের সাথে যোগদান করল, যাতে প্রয়োজন বোধে পুরুষদের উৎসাহিত করে পশ্চাদপসরণে বাধা দিতে পারে। তিন হাজার যোদ্ধার বিরাট বাহিনী অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যখন মদিনা থেকে তিন চার মাইল দূরে ওহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিল মদিনার ভিতরে থেকেই সহজে ও সাফল্যের সাথে শত্রু শক্তিকে প্রতিহত করা। তখন মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বাহ্যতঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রথমবারের মতো তার কাছেও পরামর্শ চাওয়া হলো। তার অভিমতও হুজুর ﷺ -এর অভিমতের অনুরূপ ছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক উৎসাহী তরুণ সাহাবী যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি এবং শাহাদাতের আগ্রহে পাগলপারা ছিলেন, জিদ ধরলেন যে, শহরের বাইরে গিয়েই শত্রু সৈন্যের মোকাবিলা করা উচিত। নতুবা শত্রুরা আমাদের দুর্বল ও কাপুরুষ মনে করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতে এ প্রস্তাবটিই গৃহীত হলো। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং লৌহবর্ম পরিধান করে বের হয়ে এলেন। এতে কেউ কেউ মনে করলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছি। এটা ঠিক হয়নি। তাঁরা নিবেদন করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ইচ্ছা না হলে এখানেই অবস্থান করুন। তিনি বললেন : একবার লৌহবর্ম পরিধান করে এবং অস্ত্রধারণ করার পর যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তা আবার খুলে ফেলা পয়গম্বরের জন্য শোভন নয়। এ বাক্যে পয়গম্বর ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ পয়গম্বর কখনো দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারেন না। এতে উম্মতের জন্যও বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

মহানবী ﷺ যখন মদিনা থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রায় এক হাজার সাহাবী। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই প্রায় তিনশত লোকের একটি দল নিয়ে রাস্তা থেকে এই বলে ফিরে গেল যে, অন্যদের পরামর্শ মতো যখন কাজ করা হয়েছে, তখন আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আমরা অনর্থক নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে চাই না। তার সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। তবে কিছুসংখ্যক মুসলমানও তাদের প্রতারণায় পড়ে তাদের সঙ্গে ফিরে গেল। অবশেষে হুজুরে আকরাম ﷺ সর্বমোট সাতশত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছলেন। তিনি স্বয়ং সামরিক কায়দায় এমনভাবে সৈন্য সমাবেশ করলেন, যাতে ওহুদ পাহাড়টি থাকল পিছনের দিকে। তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের হাতে পতাকা দান করলেন। হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়ামকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। হযরত হামযার হাতে বর্মহীন সৈন্যদের পরিচালনা ভার অর্পণ করলেন। পশ্চাৎদিক থেকে আক্রমণের ভয় থাকায় পঞ্চাশ জন তীরন্দাজের একটি বাহিনী সেদিকে নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন পশ্চাৎদিকে টিলার উপর থেকে হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেন। সৈন্যদের জয়-পরাজয়ের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এবং কোনো অবস্থাতেই তারা স্থানচ্যুত হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) এ তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। কুরাইশরাও বদরযুদ্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। তাই তারাও শ্রেণিবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশ করল

বিজাতির দৃষ্টিতে মহানবী ﷺ -এর সামরিক প্রজ্ঞা : রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ সামরিক কায়দায় সৈন্যদের সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করেন, তা দেখে স্পষ্টতই মনে হয় যে, একজন কামেল পথপ্রদর্শক ও পূত-পবিত্র পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে নিপুণ সেনাদক্ষ হিসেবেও তাঁর তুলনা নেই। তিনি যেভাবে ব্যূহ রচনা করে সৈন্য সংস্থাপন করেছিলেন, তখনকার জগৎ সে সম্পর্কে মোটেই জ্ঞাত ছিল না। বর্তমান যুগে সমরবিদ্যা একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে এ যুগের সমর কুশলীরাও মহানবী ﷺ প্রদর্শিত রণনৈপুণ্যকে প্রশংসার চোখে দেখে থাকে। জনৈক খ্রিস্টান ঐতিহাসিকের ভাষায় : "একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে, অপরিসীম সাহস ও বীরত্বের অধিকারী মুহাম্মদ ﷺ শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় সমরবিদ্যার ক্ষেত্রেও নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। তিনি মক্কাবাসীদের বিশৃঙ্খল ও এলোপাথাড়ি যুদ্ধের মোকাবিলায় চমৎকার দূরদর্শিতা ও কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।' এ কথাটি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ টম এ্যাণ্ডারসনের। লেখকের "লাইফ অব মুহাম্মদ" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

যুদ্ধের সূচনা : অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লাই ভারি ছিল। শত্রুসৈন্য ইতস্তঃ পলায়ন করতে লাগল। বিজয় সমাপ্ত হয়েছে মনে করে মুসলমান সৈন্যরা গনিমতের মালামাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। শত্রুদের পলায়ন করতে দেখে ওহুদ পাহাড়ের পিছন দিকে হুজুর ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত তীরন্দাজ সৈন্যরাও স্থান ত্যাগ করে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে আসতে লাগলেন। অধিনায়ক আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) রাসূলুল্লাহ্– ﷺ-এর কঠোর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের স্থান ত্যাগ করতে বারণ করলেন। কিন্তু কয়েকজন ছাড়া সবাই বলল : হুজুরের নির্দেশটি ছিল সাময়িক : এখন আমাদের সবার সাথে মিলিত হওয়া উচিত। এ সুযোগে কাফের বাহিনীর অধিনায়ক খালেদ ইবনে ওলীদ যিনি তখনও মুসলমান হননি, পাহাড়ের পিছন দিক থেকে ঘুরে এসে গিরিপথে আক্রমণ করে বসলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এ আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। খালেদের সৈন্যবাহিনী ঝড়ের বেগে হঠাৎ মুসলমানদের উপর পতিত হলো। অপরদিকে পলায়নপর শত্রুসৈন্যও ফিরে এসে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এভাবে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। এ আকস্মিক বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুসলিম বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। এতদসত্ত্বেও কিছুসংখ্যক সাহাবী জীবন বাজি যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাহাদাত বরণ করেছেন। এ সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট চেতনাও বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো এবং তাঁরা সাহস হারিয়ে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চারপাশে তখন মাত্র দশ-বারো জন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। হুজুর ﷺ স্বয়ং আহত। পরাজয়-পর্ব সম্পন্ন হওয়ার তেমন কিছুই আর বাকি ছিল না। এমনি সময়ে সাহাবগণ জানতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিতই রয়েছেন, তখন তারা চতুর্দিক থেকে এসে তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন এবং তাঁকে নির্বিঘ্নে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু এ পরাজয়ের দরুন মুসলমানরা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। মুসলমানদের এ সাময়িক পরায়জ ছিল কয়েকটি কারণের ফলশ্রুতি। কুরআন পাক প্রত্যেকটি কারণ সম্পর্কে একান্ত মাপা শব্দে পর্যালোচনা করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকতে আদেশ দিয়েছে।

তাওয়াক্কুল : [আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা] মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। সুফি বুজুর্গগণ এর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে এতটুকু বুঝা দরকার যে, বাহ্যিক উপায়-উকপরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়; বরং তাওয়াক্কুল হলো সামর্থ্য অনুযায়ী যাবতীয় বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করার পর ফলাফলের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা এবং বাহ্যিক উপায়াদির জন্য গর্ব না করে আল্লাহর উপর ভরসা করা। এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ–এর উত্তম নমুনা আমাদের সামনে রয়েছে। স্বয়ং মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করা, সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সমরোপকরণ সংগ্রহ করা, রণাঙ্গণে পৌঁছে স্থানোপোযোগী যুদ্ধের মানচিত্র তৈরি করা, বিভিন্ন ব্যূহ রচনা করে সাহাবায়ে কেরামকে তথায় সংস্থাপিত করা ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা বৈ তো নয়। মহানবী ﷺ স্বহস্তে এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে প্রকারান্তরে এ কথাই বলে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক উপায়াদিও আল্লাহ তা'আলার অবদান। এগুলো থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা তাওয়াক্কুল নয়। এক্ষেত্রে মুসলিম ও অ-মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, মুসলমানরা সব সাজ-সরঞ্জাম বৈষয়িক শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ করার পরও ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই করে। পক্ষান্তরে অমুসলিমরা এ আধ্যাত্মিকতা থেকে বঞ্চিত। তারা বৈষয়িক শক্তির উপরই ভরসা করে। সবগুলো ইসলামি যুদ্ধে এ পার্থক্যটি প্রকাশ পেতে দেখা গেছে।

অতঃপর ঐ যুদ্ধের দিকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে– যাতে মুসলমানরা পুরোপুরি তাওয়াক্কুলের পরিচয় দিয়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের সাফল্য দান করেছিলেন। وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা বদরে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন অথচ তোমরা সংখ্যায় ছিলে অতি নগণ্য।

বদরের গুরুত্ব ও অবস্থান : মদিনা থেকে প্রায় ষাট মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম বদর। তখনকার দিনে এখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। এখানেই তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে সর্বপ্রথম সংঘর্ষ ঘটে দ্বিতীয় হিজরি, ১৭ই রমজান মোতাবেক ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে, ১১ই মার্চ শুক্রবার দিন। এটি বাহ্যতঃ একটি স্থানীয় যুদ্ধ মনে হলেও বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এর ফলে একটি সুমহান বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। এ কারণেই কুরআনের ভাষায় একে 'ইয়াওমুল ফুরকান' বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদরাও এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

আমেরিকার প্রফেসর হিট্টি 'আরব জাতির ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন এটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বিজয়।

وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ; – অর্থাৎ তোমরা সংখ্যা অল্প ও সাজ-সরঞ্জামে নগণ্য ছিলে। সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তাদের সঙ্গে অশ্ব ছিল মাত্র ২টি এবং উট ছিল ৭০ টি। সৈন্যরা পর্যায়ক্রমে এগুলোর উপর সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করছেন।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে : فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও

কুরআন পাক স্থানে স্থানে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও শত্রুদের শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ধৈর্য ও আল্লাহভীতিকে প্রতিকার হিসেবে বর্ণনা করেছে বলাবাহুল্য, এ দু'টি বিষয়ের মধ্যেই সমগ্র সাংগঠনিক তৎপরতা ও প্রকাশ্য বিজয়ের রহস্য নিহিত। পূর্বেও একথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি ভয় এ উভয়টিকে উল্লেখ না করে শুধু তাকওয়া বা আল্লাহর প্রতি ভয় এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ তাকওয়া প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যাপক গুণ। ধৈর্যও এর অন্তর্ভুক্ত।

ফেরেশতা প্রেরণের রহস্য : এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের প্রভূত শক্তি দান করেছেন একজন ফেরেশতা একাই গোটা জনপদ উল্টে দিতে পারেন। উদাহরণতঃ কওমে লূতের বস্তি একা হযরত জিবরাঈল (আ.) উল্টে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় এখানে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

এছাড়া ফেরেশতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণই করেছিল, তখন একটি কাফেরেরও প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এসব প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং কুরআন পাক وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ আয়াতে দিয়েছে অর্থাৎ ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য তাঁদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করানো ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে সান্ত্বনা প্রদান করা, তাদের মনোবল দৃঢ় করা এবং বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া। আয়াতের শব্দ إِلَّا بُشْرَىٰ এবং وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ থেকে এ কথাই ফুটে উঠেছে এ ঘটনা সম্পর্কেই সূরা আনফালে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে : فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা মুসলমানদের অন্তর স্থির রাখ অস্থির হতে দিও না। অন্তর স্থির রাখার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সূফীবাদী সাধকগণের নিয়মমাফিক 'তাসাররুফ' তথা অবস্থান্তরকরণের মাধ্যমে অন্তরকে সুদৃঢ় করে দেওয়া।

আরেকটি পন্থা, কোনো না কোনো উপায়ে মুসলমানদের সামনে একথা ফুটিয়ে তোলা যে, আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যেমন কখনো দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে, কখনো আওয়াজ দিয়ে এবং কখনো অন্য কোনো উপায়ে। বদরের রণক্ষেত্রে এসব উপায়ই ব্যবহৃত হয়েছে فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ –আয়াতের এক তাফসীর অনুযায়ী এতে ফেরেশতাদের সম্বোধন করা হয়েছে কোনো কোনো হাদীসে আছে, ফেরেশতারা কোনো মুশরিকের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করাতেই আপনা-আপনি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো– [হাকেম]

কোনো কোনো সাহাবী হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আওয়াজ শুনেছেন যে, তিনি أَقْدِمْ حَيْزُومُ বলেছেন কেউ কেউ কতক ফেরেশতাকে দেখেছেনও। –[মুসলিম]

উপরিউক্ত ঘটনাবলি এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, তারাও যেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাজ ছিল মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং সান্ত্বনা দেওয়া। ফেরেশতাদের দ্বারা যুদ্ধ করানো কখনো উদ্দেশ্য ছিল না। এর আরো একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, এ জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জিহাদের দায়িত্ব মানুষের কাছে অর্পণ করা হয়েছে সে কারণেই তারা ছওয়াব, ফজিলত ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। ফেরেশতা-বাহিনী দ্বারা দেশ জয় করা যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো, তাহলে পৃথিবীতে কাফেরদের রাষ্ট্র দূরের কথা, তাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না এ বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তা নয় এখানে কুফর, ঈমান, ইবাদত ও গুনাহ মিশ্রিতভাবেই চলতে থাকবে। এদের পরিষ্কার পৃথকীকরণের জন্য হাশরের দিন নির্ধারিত রয়েছে।

قوله أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً **এর অর্থ :** এর অর্থ হলো দ্বিগুণ দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ সুদ খেয়ো না এর অর্থ এই নয় যে, চক্রবৃদ্ধি হারে না হলে সুদ জায়েজ। কেননা সুদ কম হোক বা বেশি হোক দ্বিগুণ চতুর্গুণ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় হারাম। এখানে ইসলামের পূর্ব যুগের সুদের স্বরূপ বর্ণনা করে তা নিষিদ্ধ করেছেন। অন্য আয়াতে মুতলাকভাবে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

সমাজ জীবনে ربوا বা সুদের অপকারিতা : সমাজ জীবনে সুদের ক্ষতিকর দিকগুলো নিম্নরূপ-

১. সুদ ধনীকে আরো ধনী আর গরিবকে আরো গরিব করে দেয়।
২. সুদের ফলে সমাজ জীবনে পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ বেড়ে যায়।
৩. সুদের কারণে দয়া-মায়া মমত্ববোধ উঠে যায় এবং সমাজ জীবনে নির্দয় ও নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি হয়।
৪. এর ফলে মানুষের মাঝে স্বার্থপরতা, কপটতা ও কুটিলতার জন্ম দেয়।
৫. এর কারণে দীন দরিদ্রের দুঃখ-দুর্দশা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায়।
৬. সুদ দান ও গ্রহণের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে খোদায়ী নির্দেশের অমান্য করা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَمَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَمُّ মূলবর্ণ (ه ـ م ـ م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ইচ্ছ পোষণ করল।

تَفْشَلَا : সীগাহ تثنية مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفَشَلُ মূলবর্ণ (ف ـ ش ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা দুজন হিম্মত হারিয়ে ফেলবে।

اَذِلَّةٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন ذليل অর্থ– দুর্বল। অস্ত্রশস্ত্রহীন।

مُسَوِّمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر سالم বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْوِيْمُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– নিশানধারী, তারকা খচিত।

خَائِبِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَيْبَةُ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– অকৃতকার্য।

اُعِدَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْدَادُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তৈরি করে রাখা হয়েছে।

اَطِيْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা অনুসরণ কর।

تُرْحَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلرَّحْمَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ح ـ م) জিনস صحيح অর্থ–তোমাদের উপর রহম করা হবে।

سَارِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُسَارَعَةُ মূলবর্ণ (س ـ ر ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা প্রতিযোগিতা কর। তোমরা দৌড়াও।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قوله تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ : এখানে تُبَوِّئُ ফে'ল যমীরে اَنْتَ ফা'য়েল اَلْمُؤْمِنِيْنَ প্রথম مفعول আর مَقَاعِدَ জার মাজরূর মিলে উহ্য شبه فعل-এর সঙ্গে متعلق হয়ে مقاعد এর সিফত। দ্বিতীয় মাফউল, সুতরাং فعل ـ فاعل ও দুই مفعول মিলে جملة فعلية হলো।

قوله وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ : এখানে لَ তাকিদের قَدْ টি قريب এর জন্য نَصَرَ ফে'ল كُمْ যুলহাল اللّٰهُ শব্দটি ফা'য়েল بَاء হরফে জার بَدْرٍ মাজরূর ও جار مجرور মিলে متعلق হলো আর واو হালিয়া اَنْتُمْ মুবতাদা اَذِلَّةٌ খবর, مبتدأ ও خبر মিলে جملة হয়ে حال হয়েছে حال ও ذو الحال মিলে مفعول হলো। অতএব فعل ـ فاعل ـ مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হলো।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৩৩) আর ধাবন কর ক্ষমার দিকে যা তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে হয়– আর সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা এরূপ যেমন সমস্ত আসমান এবং জমিন, তা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।	وَسَارِعُوٓا اِلٰى مَغۡفِرَةٍ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالۡاَرۡضُ اُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِيۡنَ ﴿١٣٣﴾
(১৩৪) এরূপ লোক যারা স্বচ্ছলতা এবং অভাবের অবস্থায় [সৎ কাজে] ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংরবণকারী ও লোকের [অপরাধ] ক্ষমাকারী, আর আল্লাহ এরূপ সদাচারীদেরকেই ভালোবাসেন।	اَلَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالۡكٰظِمِيۡنَ الۡغَيۡظَ وَالۡعَافِيۡنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿١٣٤﴾
(১৩৫) আর তারা এমন লোক যে, যখন এমন কোনো কাজ করে বসে যাতে অন্যায় হয় অথবা নিজের ক্ষতি করে বসে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে অতঃপর নিজের গুনাহসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, এবং আল্লাহ ভিন্ন আর কে আছে, যে গুনাহ মাফ করবে? আর তারা স্বীয় [মন্দ] কর্মে হঠকারিতা করে না আর তারা অবগত আছে।	وَالَّذِيۡنَ اِذَا فَعَلُوۡا فَاحِشَةً اَوۡ ظَلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسۡتَغۡفَرُوۡا لِذُنُوۡبِهِمۡ وَمَنۡ يَّغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمۡ يُصِرُّوۡا عَلٰى مَا فَعَلُوۡا وَهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿١٣٥﴾
(১৩৬) তাদের পুরস্কার হবে মার্জনা তাদের প্রভুর নিকট হতে এবং এমন উদ্যান যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে, এবং [এটা] উত্তম প্রতিদান ঐসব কর্মীদের।	اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ مِّنۡ رَّبِّهِمۡ وَجَنّٰتٌ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ؕ وَنِعۡمَ اَجۡرُ الۡعٰمِلِيۡنَ ﴿١٣٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৩) وَسَارِعُوٓا اِلٰى مَغۡفِرَةٍ আর ধাবন কর ক্ষমার দিকে مِّنۡ رَّبِّكُمۡ যা তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে হয়– وَجَنَّةٍ আর সেই জান্নাতের দিকে عَرۡضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالۡاَرۡضُ যার প্রশস্ততা এরূপ যেমন সমস্ত আসমান এবং জমিন اُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِيۡنَ এটা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

(১৩৪) اَلَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ এরূপ লোক যারা ব্যয় করে فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ স্বচ্ছলতা এবং অভাবের অবস্থায় [সৎ কাজে] وَالۡكٰظِمِيۡنَ الۡغَيۡظَ এবং ক্রোধ সংরবণকারী وَالۡعَافِيۡنَ عَنِ النَّاسِ ও লোকের [অপরাধ] ক্ষমাকারী وَاللّٰهُ يُحِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ আর আল্লাহ এরূপ সদাচারীদেরকেই ভালোবাসেন।

(১৩৫) وَالَّذِيۡنَ اِذَا فَعَلُوۡا فَاحِشَةً আর তারা এমন লোক যে, যখন এমন কোনো কাজ করে বসে যাতে অন্যায় হয় اَوۡ ظَلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ অথবা নিজের ক্ষতি করে বসে ذَكَرُوا اللّٰهَ তখন আল্লাহকে স্মরণ করে فَاسۡتَغۡفَرُوۡا لِذُنُوۡبِهِمۡ অতঃপর নিজের গুনাহসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে وَمَنۡ يَّغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ اِلَّا اللّٰهُ এবং আল্লাহ ভিন্ন আর কে আছে, যে গুনাহ মাফ করবে وَلَمۡ يُصِرُّوۡا عَلٰى مَا فَعَلُوۡا আর তারা স্বীয় [মন্দ] কর্মে হঠকারিতা করে না وَهُمۡ يَعۡلَمُوۡنَ এবং তারা অবগত আছে

(১৩৬) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمۡ তাদের পুরস্কার হবে مَّغۡفِرَةٌ মার্জনা مِّنۡ رَّبِّهِمۡ তাদের প্রভুর নিকট হতে وَجَنّٰتٌ এবং এমন উদ্যান تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে وَنِعۡمَ اَجۡرُ الۡعٰمِلِيۡنَ এবং [এটা] উত্তম প্রতিদান ঐসব কর্মীদের।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (١٣٧)

(১৩৭) নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন পন্থা [অবলম্বী] অতীত হয়েছে, অতএব, তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর এবং দেখে নাও যে, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٨)

(১৩৮) এই বর্ণনা যথেষ্ট সকল মানুষের জন্য এবং হেদায়েত ও নসিহত বিশেষ করে পরহেজগারদের জন্য।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣٩)

(১৩৯) আর তোমরা হিম্মত হারাইয়ো না এবং বিষণ্ন হয়ো না, বস্তুত তোমরাই বিজয়ী থাকবে যদি তোমরা পূর্ণ মুমিন থাক।

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (١٤٠)

(১৪০) যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে সেই সম্প্রদায়েরও তদ্রূপই আঘাত লেগেছিল, আর আমি এই দিবসসমূহকে অদল বদল করতে থাকি লোকদের মধ্যে, আর যেন আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কতিপয় লোককে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন, আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৭) قَدْ خَلَتْ নিশ্চয় অতীত হয়েছে مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্বে سُنَنٌ বিভিন্ন পন্থা [অবলম্বী] فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ অতএব, তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর। فَانْظُرُوا এবং দেখে নাও যে, كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

(১৩৮) هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ এই বর্ণনা যথেষ্ট সকল মানুষের জন্য وَهُدًى এবং হেদায়েত وَمَوْعِظَةٌ ও নসিহত لِلْمُتَّقِينَ বিশেষ করে পরহেজগারদের জন্য।

(১৩৯) وَلَا تَهِنُوا আর তোমরা হিম্মত হারাইয়ো না। وَلَا تَحْزَنُوا এবং বিষণ্ন হয়ো না وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ বস্তুত তোমরাই বিজয়ী থাকবে إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ যদি তোমরা পূর্ণ মুমিন থাক।

(১৪০) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ তবে সেই সম্প্রদায়েরও তদ্রূপই আঘাত লেগেছিল وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا আর আমি এই দিবসসমূহকে অদল বদল করতে থাকি بَيْنَ النَّاسِ লোকদের মধ্যে। وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا আর যেন আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ এবং তোমাদের মধ্য হতে কতিপয় লোককে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৩৯) قوله وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে ওহুদে মুসলমানদের পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের মনে এই ধারণা জন্মিল যে, আমরা সত্যের উপর রয়েছি ; সত্যের জন্য লড়াই করছি আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা অসত্যের উপর রয়েছে। আল্লাহর দীন ধ্বংসের জন্য তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারপরেও আমাদের পরাজয় এবং তাদের বিজয় কেন? সাহাবাগণ কেন নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করলেন? স্বয়ং রাসূলই বা কেন দুর্বৃত্তদের হাতে পর্যুদস্ত হলেন? তখন মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সান্ত্বনা দেওয়ার লক্ষ্যে উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

১৩৩ নং আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পর এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ এমন সৎকর্ম, যা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, 'কর্তব্য পালন'। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'ইসলাম', আবুল আলিয়া 'হিজরত', হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) 'নামাজের প্রথম তাকবীর', সায়ীদ ইবনে জুবায়ের 'ইবাদত পালন', যাহ্হাক 'জিহাদ' এবং ইকরিমা 'তওবা' বলেছেন।

এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক. আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্য এক আয়াতে وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ -যে কাজের দৌলতে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বাসনা করতে নিষেধও করা হয়েছে।

উত্তর এই যে, শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকার ১. ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। উদাহরণতঃ শ্বেতাঙ্গ হওয়া, সুশ্রী হওয়া, বুজুর্গ পরিবারভুক্ত হওয়া ইত্যাদি। ২. ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। এগুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ স্বীয় হিকমত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বণ্টন করেছেন। এতে কারো চেষ্টার কোনো দখল নেই। সুতরাং যত চেষ্টা ও বাসনাই করা হোক না কেন এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। চেষ্টাকারীর মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জ্বলা ছাড়া আর কোনো ফায়েদা হবে না। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গ। সে যদি শ্বেতাঙ্গ হওয়ার বাসনা করতে থাকে, এতে লাভ কি? তবে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছাধীন সেগুলোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা শুধু এক আয়াতে নয়– বহু আয়াতে এ নির্দেশ এ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে : فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ পুণ্য অর্জনে একে অন্যকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাও। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ জনৈক বুজুর্গ বলেন : যদি কারো মধ্যে এমন কোনো সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ত্রুটি থাকে, যা দূর করা তার সাধ্যাতীত, তবে এ ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে অন্যের গুণের দিকে না তাকিয়ে স্বীয় কাজ করে যাওয়াই তার উচিত। কেননা সে যদি নিজ ত্রুটির জন্য অনুতাপ ও অন্যের গুণের জন্য হিংসা করতে থাকে, তবে যতটুকু কাজ করা সম্ভব ততটুকুও করতে পারবে না এবং একেবারে অথর্ব হয়ে পড়বে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ তা'আলা আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মূল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের পন্থা মাত্র একটি। তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

সততা ও সত্য অবলম্বন কর মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর, এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর। কারো কর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। শ্রোতারা বলল : আপনাকেও নয়কি– ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তর হলো আমার কর্ম আমাকেও জান্নাতে নিবে না। তবে আল্লাহ যদি স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।'

মোটকথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ তা'আলার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ঐ বান্দাকেই দান করেন, যে সৎকর্ম করে; বরং সৎকর্মের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষণ। অতএব

সৎকর্ম সম্পাদনে ত্রুটি করা উচিত নয়। আল্লাহর ক্ষমাই জান্নাতে প্রবেশের আসল কারণহেতু এর প্রতি গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে একে এককভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ বলা হয়েছে। 'পালনকর্তা' বিশেষণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য আরো কৃপা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করা।

আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমান। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের চাইতে অধিক বিস্তৃত কোনো বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে বুঝাবার জন্য জান্নাতের প্রশস্ততাকে এ দুটির সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত। প্রশস্ততায় এটা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহ মা'লূম। আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন عَرْضٌ শব্দের অর্থ طُوْلٌ তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীত নেওয়া হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় মূল্য, তবে আয়াতের অর্থ হবে যে, জান্নাত কোনো সাধারণ বস্তু নয়। এর মূল্য সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও। তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে–

'আবূ মুসলিম বলেন : আয়াতে উল্লিখিত عَرْضٌ শব্দের অর্থ ঐ বস্তু যা বিক্রীত বস্তুর মোকাবিলায় মূল্য হিসেবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য। এতে করে জান্নাত যে বিশাল ও অমূল্য বিষয় তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য।"

জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছে : أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ, জান্নাত মুত্তাকীগণের জন্য নির্মিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, জান্নাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত এবং সপ্তম আকাশই তার জমিন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসী মুত্তাকীদের বিশেষ গুণাবলি ও লক্ষণাদি বর্ণনা করেছেন। এসব গুণ ও লক্ষণের সাথে অনেক তাৎপর্য নিহিত। উদাহরণতঃ কুরআন পাক স্থানে স্থানে সৎলোকদের সংসর্গ ও তাদের শিক্ষা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রতি জোর দিয়েছে। কোথাও صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ বলে দীনের সরল ও বিশুদ্ধ পথ তাদের কাছ থেকে শিক্ষা করার প্রতি ইশারা করেছে এবং কোথাও وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ বলে তাদের সংসঙ্গের বিশেষ কার্যকারিতা নির্দেশ করেছে। জগতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার লোকই রয়েছে। ভালো লোকদের পোশাকে মন্দরাও অনেক সময় তাদের স্থান দখল করে বসে। এ কারণে সৎ ও মুত্তাকীদের বিশেষ লক্ষণ ও গুণাবলি বর্ণনা করে একথা বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ যেন ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক ও নেতাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে এবং সাচ্চা লোকদের লক্ষণ চিনে নিয়ে তাদের অনুসরণ করে। বিশ্বাসী মুত্তাকীদের গুণাবলি ও লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও জান্নাতের উচ্চস্তর বিধৃত করে সৎলোকদের সুসংবাদ এবং অসৎ লোকদের জন্য উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানের পথ খোলা হয়েছে। উপসংহারে هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের যেসব গুণ ও লক্ষ্য এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রাথমিক আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার ও পারস্পরিক জীবন-যাপন সম্পর্কিত গুণাবলি ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কিত গুণাবলি উল্লিখিত হয়েছে। শব্দান্তরে প্রথমোক্ত গুণাবলিকে 'হুকূকুল ইবাদ' (বান্দার হক) এবং শেষোক্ত গুণাবলিকে 'হুকূকুল্লাহ' (আল্লাহর হক) বলা যেতে পারে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলি এবং আল্লাহর অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলিকে পরে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আসলের দিক দিয়ে যদিও আল্লাহর অধিকার সব অধিকারের চাইতে অগ্রগণ্য, তবুও এতদুভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্য, কিন্তু এতে আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব কোনো লাভ বা স্বার্থ নাই এবং এসব অধিকারের প্রয়োজনও তাঁর নাই। বান্দা এসব হক আদায় না করলে আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তাঁর সত্তা সব কিছুর উর্ধ্বে। তাঁর ইবাদত দ্বারা স্বয়ং ইবাদতকারীই উপকৃত। তদুপরি তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দাতাও বটেন। তাঁর অধিকারে সর্বাধিক ত্রুটিকারী ব্যক্তি যখনই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হয় এবং তওবা করে, তখনই তাঁর দয়ার দরবার থেকে এক নিমিষের মধ্যে তওবাকারীর সব গুনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে। হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হক কিন্তু এমন নয়। কেননা বান্দা স্বীয় অধিকারের প্রতি মুখাপেক্ষী। তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করা না হলে তার ভয়ানক ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি মাফ করে দেওয়াও বান্দার পক্ষে সহজ নয়। এ কারণেই বান্দার অধিকার বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত পারস্পরিক অধিকার আদায়ের উপরই বিশ্বজগতের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মানব সমাজের সংশোধন সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। এর সামান্য ক্রটিই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও গোলযোগের পথ খুলে দেয়। পক্ষান্তরে পারস্পরিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে পারলে শত্রু ও মিত্রে পরিণত হয়ে পড়ে এবং শতাব্দীকালের যুদ্ধ ও শান্তি সখ্যতায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। এসব কারণেও মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলিকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে :

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ : অর্থাৎ মুত্তাকী তারাই, যারা আল্লাহ তা'আলার পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত। স্বচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখে। বেশি হলে বেশি এবং কম হলে কমই ব্যয় করে। এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না। কেননা হাজার টাকা থেকে এক টাকা ব্যয় করার যে মর্তবা আল্লাহর কাছে হাজার পয়সার এক পয়সা ব্যয় করারও একই মর্তবা। কার্যক্ষেত্রে হাজার টাকার মালিকের পক্ষে এক টাকা আল্লাহর পথে ব্যয় করা যেমন কঠিন নয়, তেমনি হাজার পয়সার মালিকের পক্ষে এক পয়সা ব্যয় করতেও কোনো কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

অপরদিকে আয়াতে এ নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখলে আল্লাহর পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবতঃ এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

আয়াতে তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। তা এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অন্যের উপকার ও দরিদ্রদের সাহায্য করার অভ্যাস গড়ে তোলে, সে কখনো অপরের অধিকার খর্ব করতে প্রবৃত্ত হবে না এবং অপরের সম্পদ সম্মতি ব্যতিরেকে হজম করে ফেলার ইচ্ছা করবে না। অতএব প্রথমোক্ত এ গুণটির সারমর্ম হলো এই যে, বিশ্বাসী, আল্লাহভীরু এবং আল্লাহর প্রিয়বান্দারা অপরের উপকার সাধনের চিন্তায় সদা ব্যাপৃত থাকেন; তারা স্বচ্ছলই হোক কিংবা অভাবগ্রস্ত। হযরত আয়েশা (রা.) একবার মাত্র একটি আঙ্গুরের দানা খয়রাত করেছিলেন তখন তাঁর কাছে এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আল্লাহর পথে শুধু অর্থ ব্যয় করাই জরুরি নয় : আয়াতে আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআন يُنْفِقُوْنَ বলে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু কি ব্যয় করবে, তার কোনো উল্লেখ নেই। এ ব্যাপকতা থেকে বুঝা যায় যে, শুধু অর্থ সম্পদই নয়; বরং ব্যয় করার মতো প্রত্যেক বস্তুই এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণতঃ কেউ যদি তার সময়, কিংবা শ্রম আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাহলে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরো একটি রহস্য : এ দু' অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহকে বিস্মৃত হয়। অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আল্লাহর প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহকে ভুলে না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না।

আলোচ্য সূরায় ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে জানা গেছে যে, কতিপয় ক্রটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে। সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ আহত হন। কিন্তু এ সবের পর আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়।

এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। এক. রাসূলুল্লাহ ﷺ তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। কেউ বলল, আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার। অধিকাংশের মত ছিল এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোনো প্রয়োজন নেই। সবার সাথে মিলিত হয়ে শত্রুদের পরিত্যক্ত সামগ্রী আহরণ করা উচিত। দুই. স্বয়ং নবী করীম ﷺ-এর নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। তিন. মদিনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে

বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিল। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দু'টি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক. অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ ও বিষাদ। দুই. আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্য মুসলমানগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি অঙ্কুরেই না মনোবল হারিয়ে ফেলে। এ দুটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য কুরআন পাকের এ বাণী অবতীর্ণ হয়।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, 'ভবিষ্যতের জন্য তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিও না এবং অতীতের জন্যও বিমর্ষ বিষণ্ণ হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য ও আল্লাহর পথে জিহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।"

উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ সংশোধনের চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রাসূলের আনুগত্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিও না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।"

কুরআন পাকের এ বাণী ভগ্ন হৃদয়কে জুড়ে দিল এবং মৃতপ্রায় দেহে সঞ্জীবনীর কাজ করল। চিন্তা করুন! আল্লাহ তা'আলা কিভাবে সাহাবায়ে কেরামের আত্মিক চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছেন। তিনি চিরদিনের জন্য তাদের একটি মূলনীতি দিয়ে দিলেন যে, অতীত বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ শক্তি ও প্রভাব সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সাথে সাথে একথাও বলে দিলেন যে, বিজয় ও প্রাধান্য অর্জনের মূল সহায়ক একটিই। অর্থাৎ, ঈমান ও তার দাবিসমূহ পূরণ করা। যুদ্ধের জন্য যেসব প্রস্তুতি নেওয়া হয়, সেগুলোও ঈমানের দাবির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, সামরিক শক্তির দৃঢ়তা, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বাহ্যিক উপায়াদি দ্বারা সামর্থ্য অনুযায়ী সুসজ্জিত হওয়া। ওহুদ যুদ্ধের সমগ্র ঘটনাবলি এসব বিষয়েরই সাক্ষ্য বহন করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْكٰظِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَظْمُ মূলবর্ণ (ك . ظ . م) জিনস صحيح অর্থ– দমনকারী।

قَدْ خَلَتْ : সীগাহ واحد مونث غائب বহছ ماضى قريب معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُلُوُّ . اَلْخَلَاءُ মূলবর্ণ (خ . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নিশ্চয় অতিবাহিত হয়েছে।

لَا تَهِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَهْنُ মূলবর্ণ (و . ه . ن) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা বিচলিত হয়ো না।

لَا تَحْزَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحُزْنُ মূলবর্ণ (ح . ز . ن) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা পেরেশান হয়ো না।

يَتَّخِذُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (ا . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– গ্রহণ করে, ধরে।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾

অনুবাদ : (১৪১) আর যেন আল্লাহ তা'আলা ঈমানাদারদেরকে আবিলতা ও আবর্জনা হতে নির্মল করে দেন এবং কাফেরদেরকে নিপাত করে দেন।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾

(১৪২) হ্যাঁ, তোমরা কি এই ধারণা কর যে, জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ করবে? অথচ এখন পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে তো দেখে নেননি যারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং তাদেরকেও দেখেননি যারা [জিহাদে] দৃঢ়পদ থাকে।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾

(১৪৩) আর তোমরা তো মৃত্যু কামনা করছিলে– মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব হতে, অনন্তর এটাকে তো তোমরা উন্মীচিত চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছ।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

(১৪৪) আর মুহাম্মদ তো শুধু রাসূলই তাঁর পূর্বে আরো অনেক রাসূল অতীত হয়েছেন। অনন্তর যদি তাঁর মৃত্যু হয় অথবা তিনি শহীদই হন তবে কি তোমরা উল্টা ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি উল্টা ফিরে যায় তবে আল্লাহর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না, এবং আল্লাহ সত্বরই বিনিময় প্রদান করবেন কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৪১) وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যেন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে আবিলতা ও আবর্জনা হতে নির্মল করে দেন وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ এবং কাফেরদেরকে নিপাত করে দেন।

(১৪২) اَمْ حَسِبْتُمْ হ্যাঁ, তোমরা কি এই ধারণা কর যে اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ বেহেশতে গিয়ে প্রবেশ করবে? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ অথচ এখন পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে তো দেখে নেননি الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ যারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ এবং তাদেরকেও দেখেননি যারা [জিহাদে] দৃঢ়পদ থাকে।

(১৪৩) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ আর তোমরা তো মৃত্যু কামনা করছিলে– مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব হতে فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ অনন্তর এটাকে তো তোমরা উন্মীলিত চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছ।

(১৪৪) وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ আর মুহাম্মদ তো শুধু রাসূলই قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ তাঁর পূর্বে আরো অনেক রাসূল অতীত হয়েছেন اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ অনন্তর যদি তাঁর মৃত্যু হয় اَوْ قُتِلَ অথবা তিনি শহীদই হন انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ তবে কি তোমরা উল্টা ফিরে যাবে? وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ আর যে ব্যক্তি উল্টা ফিরে যায় فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا তবে আল্লাহর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না وَسَيَجْزِى اللّٰهُ এবং আল্লাহ সত্বরই বিনিময় প্রদান করবেন الشّٰكِرِيْنَ কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

(১৪৫) আর কারো মৃত্যু আসা সম্ভব নয় আল্লাহর আদেশ ব্যতীত, এভাবে যে, তার নির্দিষ্ট সময় লিখিত থাকে, আর যে ব্যক্তি পার্থিব ফল কামনা করে, আমি তাকে পার্থিব অংশ প্রদান করে থাকি, আর যে ব্যক্তি পারলৌকিক ফল কামনা করে, আমি তাকে পারলৌকিক অংশ প্রদান করব, এবং আমি সত্বরই বিনিময় প্রদান করব কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

(১৪৬) আর অনেক নবী হয়েছেন, যাঁদের সাথী হয়ে বহু আল্লাহভক্ত লোক জিহাদ করেছেন, সুতরাং না সাহস হারিয়েছেন তাঁরা ঐ বিপদের কারণে যা আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের উপর পতিত হয়েছে, আর না তাঁদের শক্তি খর্ব হয়েছে আর না তাঁরা দমিত হয়েছেন, আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ দৃঢ়-চেতা লোকদেরকে ভালোবাসেন।

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

(১৪৭) আর তাদের জবান হতেও তো এটা ব্যতীত আর কিছুই বের হয়নি যে, তারা আরজ করল হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহসমূহ এবং আমাদের কর্মসমূহে আমাদের সীমা অতিক্রমকে মাফ করে দিন এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন আর আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী করুন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৫) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ আর কারো মৃত্যু আসা সম্ভব নয় اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর আদেশ ব্যতীত كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا এভাবে যে, তার নির্দিষ্ট সময় লিখিত থাকে وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا আর যে ব্যক্তি পার্থিব ফল কামনা করে نُؤْتِهٖ مِنْهَا আমি তাকে পার্থিব অংশ প্রদান করে থাকি وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ আর যে ব্যক্তি পারলৌকিক ফল কামনা করে نُؤْتِهٖ مِنْهَا আমি তাকে পারলৌকিক অংশ প্রদান করব وَسَنَجْزِى এবং আমি সত্বরই বিনিময় প্রদান করব الشّٰكِرِيْنَ কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে।

(১৪৬) وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ আর অনেক নবী হয়েছেন قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ যাঁদের সাথী হয়ে বহু আল্লাহ ভক্ত লোক জিহাদ করেছেন فَمَا وَهَنُوْا সুতরাং না সাহস হারিয়েছেন তাঁরা لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ঐ বিপদের কারণে যা আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের উপর পতিত হয়েছে وَمَا ضَعُفُوْا আর না তাঁদের শক্তি খর্ব হয়েছে। وَمَا اسْتَكَانُوْا আর না তাঁরা দমিত হয়েছেন وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ দৃঢ়-চেতা লোকদেরকে ভালোবাসেন।

(১৪৭) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا আর তাদের জবান হতেও তো এটা ব্যতীত আর কিছুই বের হয়নি যে, তারা আরজ করল رَبَّنَا হে আমাদের রব! اغْفِرْ لَنَا আমাদের মাফ করে দিন ذُنُوْبَنَا আমাদের গুনাহসমূহ وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا এবং আমাদের কর্মসমূহে আমাদের সীমা অতিক্রমকে وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ আর আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী করুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪২) قوله اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধে শহীদদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে যখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন। তখন সাহাবাগণ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, যদি আমাদের অনুরূপ সুযোগ আসত তবে আমরাও যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করে সৌভাগ্যশীল হতাম, একান্তই যদি আমরা শহীদ না হতাম তবে আমরা বিজয়ী হয়ে গনিমতের মালসহ গাজী হয়ে ফিরে যেতাম এর পর যখন ওহুদের যুদ্ধ শুরু হলো যুদ্ধের তীব্রতা দেখে কয়েকজন সাহাবা ব্যতীত সবাই সাহস হারিয়ে ফেলেন, এবং যুদ্ধের মাঠ ত্যাগ করেন তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতরণ করেন।

(১৪৪) قوله وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন ইবনে কামিয়ার পাথরে রাসূল ﷺ-এর সম্মুখের দুটি দাঁত শহীদ হয়ে যায় এবং তাঁর মাথা ফেটে যায় ফলে তিনি গর্তে পড়ে যান, অপর দিকে ইসলামের পতাকাবাহী রাসূল ﷺ-এর কাছাকাছি আকৃতির হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। হযরত মুসআব (রা.)-এর লাশ দেখে দুশমনরা এই খবর ছড়িয়ে দেয় যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন।" এতে কিছু সংখ্যক সাহাবী সাহস হারা হয়ে পড়লেন এ সুযোগে মুনাফিকরা বলতে শুরু করল যে, চল আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর নিকট যাই, সে আমাদেরকে আবূ সুফিয়ান হতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেবে। এমনকি কোনো কোনো মুনাফিক এতদূর পর্যন্ত বলে ফেলল যে, মুহাম্মদ ﷺ যদি আল্লাহর রাসূল হতেন তাহলে সে নিহত হলো কিরূপে? চল আমরা পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে যাই? তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সমস্ত কথোপকথনের তিরস্কার করে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। -[লুবাবুন নুকূল]

(১৪৬) قوله : وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উল্লিখিত আছে যে, ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের কিছু সংখ্যক যুদ্ধের ভয়াবহতায় দুর্বলতা প্রকাশ করেছিল। এমনকি 'রাসূলের মৃত্যু হয়েছে' এই অপপ্রচারে কিছু সংখ্যক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মধ্যস্থতায় আবূ সুফিয়ানের নিকট নিরাপত্তার কথা ভাবছিল। তখন মহান আল্লাহ অত্র আয়াত অবতরণ করে বলছেন যে, এখন পরিস্থিতি শুধু তোমাদের জন্য নয়; বরং ইতঃপূর্বে অন্যান্য নবী ও তাদের সঙ্গী সাথীদের এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তারা এরূপ পরিস্থিতিতে দুর্বলতা প্রকাশ করেনি। তাদের মনোবলও ছিল অটুট; বরং তারা বীরদর্পে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিল, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উভয় জাহানের সফলতা দান করেছেন। কাজেই তোমাদেরও অনুরূপ হওয়া আবশ্যক।

এ আয়াতে ভিন্ন ভঙ্গিতে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে : এ যুদ্ধে তোমরা আহত ও নিহত হয়েছ ঠিকই; কিন্তু তোমাদের প্রতিপক্ষও তো ইতঃপূর্বে এ ধরনের দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। ওহুদে তোমাদের সত্তর জন শহীদ ও অনেক আহত হয়েছে। এক বৎসর পূর্বে তাদেরও সত্তর জন লোক জাহান্নামবাসী ও অনেক আহত হয়েছিল। স্বয়ং এ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েও তাদের অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। তাই কুরআন বলে :

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

অর্থাৎ "তোমাদের গায়ে ক্ষত লেগে থাকলে তাদের গায়েও ইতঃপূর্বে এমনি ক্ষত লেগেছে। আমি এ দিনগুলোকে পালাক্রমে পরিক্রমণ করাই। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে।"

আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত রীতি হচ্ছে যে, তিনি কঠোরতা, নম্রতা, সুখ-দুঃখ, কষ্ট ও আরামের দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে চক্রবৎ ঘুরিয়ে আনেন। যদি কোনো কারণে কোনো মিথ্যা সাময়িকভাবে বিজয় ও সাফল্য অর্জন করে ফেলে, তবে তাতে সত্যপন্থিদের হতোদ্যম হয়ে পড়া সঙ্গত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এখন থেকে পরাজয়ই তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে; বরং এ পরাজয়ের সঠিক কারণ খোঁজ করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিণামে সত্যপন্থিরাই জয়যুক্ত হবে।

আলোচ্য আয়াতগুলোও ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব ঘটনা অনেক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই কুরআন পাক সূরা আলে ইমরানের চার পাঁচ রুকূ পর্যন্ত ওহুদ যুদ্ধে জয়-পরাজয় ও এতদুভয়ের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক নির্দেশাবলি অব্যাহতভাবে বর্ণনা করেছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে কতিপয় সাহাবীর একটি বিচ্যুতির জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে মৌলিক বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ বিষয়টিতে মুসলমানদের কার্যতঃ পাকাপোক্ত করার জন্যও ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়, হুজুর ﷺ-এর আহত হওয়া, তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়া, তজ্জন্যে কতিপয় সাহাবীর হতোদ্যম হয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনাবলি সংঘটিত হয়েছে। বিষয়টি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

প্রতি ভালোবাসা রাখা ও তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার করা মুসলমানের ঈমানের অংশবিশেষ। ইসলামি মূলনীতিতে এ বিষয়টির গুরুত্ব অত্যধিক। এ ব্যাপারে সামান্য দুর্বলতাকেও কুফরের নামান্তর বলা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এর সাথে সাথে এ বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, মুসলমানরাও যেন ঐ রোগে আক্রান্ত না হয়ে পড়ে, যাতে খ্রিস্টান ও ইহুদিরা আক্রান্ত হয়েছিল। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ভালোবাসা ও মাহাত্ম্যকে ইবাদত ও আরাধনার সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে এবং তাঁকে আল্লাহর সাথে শরিক করে নিয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধের সাময়িক পরাজয়ের সময় কেউ একথা রটিয়ে দিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয়ে গেছে। তখন সাহাবায়ে কেরামের যে কি অবস্থা হয়েছিল এবং হওয়া উচিত ছিল, তা সামান্য অনুমান করাও সবার পক্ষে সহজ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বতে যে সাহাবায়ে কেরাম স্বীয় ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করাকে জগতের সবচাইতে বড় সৌভাগ্য মনে করেছেন এবং কার্যক্ষেত্রে তার পরিচয়ও দিয়েছেন, তাঁদের আত্মনিবেদন ও এশকে-রাসূলের খবর যারা কিছুটা রাখেন, একমাত্র তারাই তাঁদের সে সময়কার মর্মন্তুদ অবস্থা কিছুটা অনুমান করতে পারেন। এসব আশেকানে রাসূল ﷺ-এর কানে যখন এ সংবাদ প্রবেশ করেছিল, তখন তাঁদের অনুভূতি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। বিশেষ করে যখন যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তেজনা বিরাজ করছে, বিজয়ে পর পরাজয়ের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে, মুসলমান যোদ্ধাদের পা উপড়ে যাচ্ছে ; এমনি সংকটময় মুহূর্তে যিনি ছিলেন সব প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মূল কেন্দ্র, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, তিনিও তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি ছিল এই যে, সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দল ভয়ার্ত হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করতে লাগলেন। এ পলায়ন জরুরি অবস্থা ও সাময়িক ভয় ভীতির পরণতি ছিল। আল্লাহ না করুক, এতে ইসলাম পরিত্যাগ করার কোনো ইচ্ছা বা প্ররোচনা কার্যকর ছিল না। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রাসূলের সাহাবীদের এমন পবিত্র ফেরেশতা-তুল্য দল করতে চান, যারা হবে বিশ্বের জন্য আদর্শ। এ কারণে তাদের সামান্য বিচ্যুতিকে বিরাট আকারে দেখা হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার কারণে সাহাবীগণকে এমন কঠোর ভাষায় সম্বোধন করা হয়েছে, যেমন ইসলাম ত্যাগ করার কারণে করা যেতে পারে। তীব্র অসন্তোষ প্রকাশের সাথেই এ মৌলিক বিষয়টির প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে যে, ধর্ম, ইবাদত ও জিহাদ আল্লাহ তা'আলার নিমিত্ত যিনি চিরঞ্জীবি ও সদাপ্রতিষ্ঠিত। মহানবী ﷺ-এর মৃত্যু সংবাদ সত্য হলেও তাতে অসাধারণ কি? তাঁর মৃত্যু তো একদিন হবেই। এতে মনোবল হারিয়ে ফেলা এবং দীনের কাজ ত্যাগ করা সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে শোভা পায় না। এ কারণেই বলা হয়েছে :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন। তাঁর পরও মুসলমানদের ধর্মের উপর অটল থাকতে হবে। এতে আরো বুঝা যায় যে, সাময়িক বিপর্যয়ের সময় হুজুর ﷺ-এর আহত হওয়া এবং তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পিছনে যে রহস্য ছিল, তা হলো তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের সম্ভাব্য অবস্থার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা, যাতে তাদের মধ্যে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে হুজুর ﷺ স্বয়ং তা সংশোধন করে দেন এবং পরে সত্যসত্যই যখন তাঁর ওফাত হবে, তখন আশেকানে রাসূল ﷺ যেন সম্বিত হারিয়ে না ফেলেন। বাস্তবেও তাই হয়েছে। হুজুর ﷺ -এর ওফাতের সময় যখন প্রধান প্রধান সাহাবীগণও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এ আয়াত তেলাওয়াত করেই তাদের সান্ত্বনা দেন।

অপতঃপর দ্বিতীয় আয়াতেও বিপদাপদের সময় অটল থাকার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৃত্যুর দিন, তারিখ, সময় সবই নির্ধারিত, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কারো মৃত্যু হবে না, এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরেও কেউ জীবিত থাকবে না। এমতাবস্থায় কারো মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কোনো অর্থ নেই।

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا : আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, গনিমতের মাল আহরণের চিন্তায় হুজুর ﷺ-এর অর্পিত কাজ ছেড়ে তারা ভুল করেছিল। স্মর্তব্য যে, গনিমতের মাল আহরণ করাও প্রকৃতপক্ষে নির্ভেজাল দুনিয়া কামনা নয়– যা শরিয়তে নিন্দনীয়; বরং যুদ্ধক্ষেত্রে গনিমতের মাল আহরণ করে সংরক্ষিত করা এবং নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাও জিহাদের অংশবিশেষ এবং ইবাদত। উপরিউক্ত সাহাবীগণ শুধু জাগতিক লালসার বশবর্তী হয়ে এতে অংশগ্রহণ করেননি। কেননা তাঁরা যদি এ মাল আহরণে অংশগ্রহণ নাও করতেন, তবুও শরিয়তের আইন অনুযায়ী তাঁরা ঐ অংশই পেতেন, যা অংশ গ্রহণের পর পেয়েছেন। কাজেই তাঁরা জাগতিক লোভ-লালসার কারণে স্থান ত্যাগ করেছিলেন এ কথা বলা যায় না। কিন্তু পূর্বোক্ত আয়াতের তাফসীরেও বলা হয়েছে যে, বড়দের সামান্য বিচ্যুতিকেই অনেক বড় মনে করা হয়। মামুলী অপরাধকে কঠোর অপরাধ গণ্য করে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গনিমতের মাল আহরণ করার সাথে কিছু না কিছু জাগতিক ফায়েদার সম্পর্ক অবশ্য ছিল। এ সম্পর্কের মন্দ প্রভাব অন্তরে প্রতিফলিত হওয়াও অসম্ভব ছিল না? কাজেই সাহাবায়ে কেরামের চারিত্রিক মানকে সমুন্নত রাখার জন্য তাদের এ কার্যকে 'দুনিয়া কামনা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে : যাতে জাগতিক লালসার সামান্য ধুলিকণাও তাঁদের অন্তরে স্থান লাভ করতে না পারে।

رِبِّيُّوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : رِبِّيُّوْنَ শব্দটি رَبٌّ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত, এর অর্থ হলো রবওয়ালা অর্থাৎ আল্লাহওয়ালা। এর উদ্দেশ্য নিয়ে কয়েকটি মত পাওয়া যায় :

১. ইমাম زَجَّاجٌ সহ কিছু সংখ্যকের মতে رِبٌّ অর্থ : দল, কাজেই رِبِّيُّوْنَ অর্থ অনেকগুলো দল।
২. ইবনে যায়েদ বলেন, দায়িত্বশীলদেরকে رَبَّانِيُّوْنَ এবং কর্মী ও প্রজাদেরকে رِبِّيُّوْنَ বলা হয়।
৩. আখফাশ বলেন, যারা رَبٌّ -এর ইবাদত করে তাদেরকে رِبِّيُّوْنَ বলা হয়।
৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে رِبِّيُّوْنَ তথা আল্লাহ ভক্ত বলে আল্লাহ তা'আলা আলেম ও ফিকহবিদগণকে বুঝিয়েছেন। -[মা'আরেফুল কুরআন]

صَبْرٌ এর অর্থ ও তার প্রকারভেদ : اَلصَّبْرُ এটি বাব ضَرَبَ -এর মাসদার অর্থ হলো اَلْحِلْمُ বা ধৈর্য।
পরিভাষায় এর পরিচয় সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) বলেন اَلصَّبْرُ هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَلٰى مَا تَكْرَهُ অর্থাৎ নাস থেকে পছন্দ করে না তার উপর নাসকে আ
কেউ কেউ বলেন, اَلصَّبْرُ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
صَبْرٌ -এর প্রকারভেদ : صَبْر বা ধৈর্য মোট তিন প্রকার। যেমন–
১. صَبْرٌ عَلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ তথা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যমূলক কাজ পালনে ধৈর্যধারণ করা।
২. صَبْرٌ عَنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ বা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিমূলক কাজ হতে দূরে থাকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা।
৩. صَبْرٌ عَلَى النَّائِبَاتِ বা বিপদ মসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করা। এখানে এটি উদ্দেশ্য তথা যুদ্ধের ময়দানে স্থির থেকে ধৈর্যধারণ করা।

পূর্ববর্তী যোদ্ধাদের গুণাবলি

১. যুদ্ধের ময়দানে অটল থাকা।
২. যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও হীনবল না হওয়া।
৩. দুর্বল না হওয়া।
৪. এবং শত্রুর সম্মুখে মাথা নত না করা। এরূপ ভাবে যুদ্ধ করার পর ও তারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলত :
(ক) হে আল্লাহ আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন।
(খ) বর্তমান জিহাদকালে আমরা যেসব ক্রটি করেছি তা মার্জনা করুন।
(গ) আমাদের দৃঢ়তা বহাল রাখুন।
(ঘ) শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী করুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّمَنِّى মূলবর্ণ (م ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা আকাঙ্ক্ষা করতে।

مَاوَهَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَهْنُ মূলবর্ণ (و ـ ه ـ ن) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা হিম্মত হারায়নি।

مَا اسْتَكَانُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكَانُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা দমেনি।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ : এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা لَا يُحِبُّ ফে'ল উহ্য যমীরে هُوَ ফা'য়েল اَلظّٰلِمِيْنَ মাফউল এবার فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে খবর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

قوله فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ : এখানে قد رأيتموه ফে'ল যমীরে اَنْتُمْ যুলহালা ‌ه টি مفعول আর واو হালিয়া اَنْتُمْ মুবতাদা تَنْظُرُوْنَ জুমলা হয়ে খবর مبتدأ ও خبر মিলে হাল حال ও ذو الحال মিলে فاعل হলো।
فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হলো।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৪৮) অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব বিনিময়ও দিয়েছেন এবং পরকালেরও উত্তম বিনিময় দিয়েছেন, আর এরূপ সদাচারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।	فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (۱۴۸)
(১৪৯) হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা কাফেরদের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাদেরকে উল্টা দিকে ফিরিয়ে দিবে, ফলে তোমরা অকৃতকার্য হয়ে যাবে;	يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ (۱۴۹)
(১৫০) বরং আল্লাহ তোমাদের দোস্ত এবং তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী।	بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ (۱۵۰)
(১৫১) আমি এখনই ভীতির সৃষ্টি করে দিচ্ছি কাফেরদের অন্তরে এ কারণে যে, তারা আল্লাহর শরিক এমন বস্তুকে সাব্যস্ত করেছে যার অনুকূলে আল্লাহ কোনোই প্রমাণ নাজিল করেননি, এবং তাদের বাসস্থান জাহান্নাম, বস্তুত তা অনাচারীদের নিকৃষ্ট বাসস্থান।	سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ (۱۵۱)
(১৫২) আর নিশ্চয় আল্লাহ তো তোমাদের সাথে স্বীয় প্রতিশ্রুতিকে সত্য করে দেখিয়েছিলেন যখন তোমরা ঐ কাফেরদেরকে আল্লাহর হুকুমে হত্যা করছিলে– অনন্তর যখন তোমরা নিজেরাই দুর্বল হয়ে পড়লে, এবং পরস্পর আদেশ পালনে মতবিরোধ করতে লাগলে এবং তোমরা নাফরমানি করলে তোমাদেরকে তোমাদের বাঞ্ছিত বিষয় প্রদর্শন করানোর পর, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো এরূপ ছিল যারা দুনিয়া কামনা করছিল,	وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৪৮) فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব বিনিময়ও দিয়েছেন وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ এবং পরকালেরও উত্তম বিনিময় দিয়েছেন وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আর এরূপ সদাচারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।

(১৪৯) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে ঈমানদারগণ! اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যদি তোমরা কাফেরদের কথা মেনে নাও يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ তবে তারা তোমাদেরকে উল্টা দিকে ফিরিয়ে দিবে فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ফলে তোমরা অকৃতকার্য হয়ে যাবে;

(১৫০) بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ বরং আল্লাহ তোমাদের দোস্ত وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ এবং তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

(১৫১) سَنُلْقِيْ আমি এখনই সৃষ্টি করে দিচ্ছি فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا কাফেরদের অন্তরে الرُّعْبَ ভীতির بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ এ কারণে যে, তারা আল্লাহর শরিক এমন বস্তুকে সাব্যস্ত করেছে مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا যার অনুকূলে আল্লাহ কোনোই প্রমাণ নাজিল করেননি وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ এবং তাদের বাসস্থান জাহান্নাম وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ বস্তুত তা অনাচারীদের নিকৃষ্ট বাসস্থান।

(১৫২) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ আর নিশ্চয় আল্লাহ তো তোমাদের সাথে স্বীয় প্রতিশ্রুতিকে সত্য করে দেখিয়েছিলেন اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ যখন তোমরা ঐ কাফেরদেরকে আল্লাহর হুকুমে হত্যা করছিলে– حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ অনন্তর যখন তোমরা নিজেরাই দুর্বল হয়ে পড়লে وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ এবং পরস্পর আদেশ পালনে মতবিরোধ করতে লাগলে وَعَصَيْتُمْ এবং তোমরা নাফরমানি করলে مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ তোমাদেরকে তোমাদের বাঞ্ছিত বিষয় প্রদর্শন করানোর পর مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো এরূপ ছিল যারা দুনিয়া কামনা করছিল

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (١٥٢)

এবং কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে এরূপ ছিল যারা [শুধু] পরকালকামী ছিল, তৎপর আল্লাহ তোমাদেরকে সেই কাফেরগণ [-এর উপর বিজয়লাভ] হতে হটিয়ে দিলেন– তোমাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে দৃঢ়রূপে জেনে নাও যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর আল্লাহ তা'আলা অতি অনুগ্রহশীল মুমিনদের প্রতি।

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٥٣)

(১৫৩) স্মরণ কর, যখন তোমরা [পলায়নার্থে] আরোহণ করছিলে এবং কারো প্রতি ফিরেও দেখছিলে না, আর রাসূল পশ্চাৎ দিক হতে তোমাদেরকে ডাকছিলেন, অনন্তর আল্লাহ তোমাদেরকে তৎবিনিময় দুঃখ দিলেন দুঃখ দেওয়ার দরুন, যেন তোমরা বিষণ্ন না হও, না ঐ বস্তুর জন্য যা তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, আর না তার জন্য যে বিপদ তোমাদের উপর পতিত হয়, আর আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের পূর্ণ খবর রাখেন।

শাব্দিক অনুবাদ

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ এবং কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে এরূপ ছিল যারা [শুধু] পরকালকামী ছিল ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ তৎপর আল্লাহ তোমাদেরকে সেই কাফেরগণ হতে হটিয়ে দিলেন– لِيَبْتَلِيَكُمْ তোমাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ দৃঢ়রূপে জেনে নাও যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ আর আল্লাহ তা'আলা অতি অনুগ্রহশীল عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদের প্রতি।

(১৫৩) اِذْ تُصْعِدُوْنَ স্মরণ কর, যখন তোমরা [পলায়নার্থে] আরোহণ করছিলে وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ এবং কারো প্রতি ফিরেও দেখছিলে না وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ اُخْرٰىكُمْ আর রাসূল পশ্চাৎ দিক হতে তোমাদেরকে ডাকছিলেন فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ অনন্তর আল্লাহ তোমাদেরকে তৎবিনিময় দুঃখ দিলেন দুঃখ দেওয়ার দরুন। لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا যেন তোমরা বিষণ্ন না হও عَلٰى مَا فَاتَكُمْ না ঐ বস্তুর জন্য যা তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ আর না তার জন্য যে বিপদ তোমাদের উপর পতিত হয় وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ আর আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের পূর্ণ খবর রাখেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪৯) قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানরা পরাজয় বরণ করল তখন মুনাফিকগণ মুসলমানদেরকে বলতে লাগল যে, চল আমরা আমাদের অমুসিলম ভাইদের নিকট ফিরে যাই এবং তাদের ধর্মে প্রবেশ করি। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়ে অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[কাশশাফ]

(১৫১) قوله سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হওয়া সত্ত্বেও কাফেররা বাহ্যিক কোনো কারণ ছাড়াই মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর কিছু দিন যাওয়ার পর তারা অনুভব করল যে, মৃতপ্রায় মুসলমানদের মরণ পর্ব শেষ না করে চলে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। এই মনে করে মদিনার দিকে ধাবিত হওয়ার ইচ্ছা করতেই আল্লাহ তা'আলা তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেন, ফলে তারা মদিনার দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় তারা জনৈক বেদুইনকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বলল : তুমি মদিনায় পৌঁছে মুসলমানদের ভয় প্রদর্শন করো যে, মক্কাবাসীরা আবার মদিনার পথে অগ্রসর হচ্ছে। মহানবী ﷺ ওহীর মাধ্যমে এসব ঘটনা জানতে পেরে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে 'হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু শত্রু সৈন্য পূর্বেই পলায়ন করেছিল। এ ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –আসবাবুন নুযূল, নীসপুরী]

(১৫২) قوله وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সহযোগিতার পূর্ণতা দেখে মদিনার ইহুদিরা হিংসায় জ্বলে মরতে লাগল, আবার ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণের সাময়িক ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যয় দেখে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল। এমনকি তারা বলতে লাগল যে, 'তোমাদের আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য ও বিজয়ের যে সকল প্রাণভরা ওয়াদা দিয়েছিল তা এখন কোথায় গেল? বস্তুত ঐ সকল প্রতিশ্রুতির কোনোই বিশ্বাস নেই। নিজেদের ভাগ্য এবং সময় অথবা সুযোগ অনুসারে জয় পরাজয় হয়ে থাকে। কাফেরদের এরূপ অপপ্রচারে দুর্বল মুমিনগণ হতাশ হয়ে পড়ে। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

(১৫৩) قوله إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** রাসূল ﷺ ওহুদ যুদ্ধে গিরিপথ সংরক্ষণ করার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তারা যখন দেখল যে, মুসলমানদের আক্রমণে কুরাইশদের দল রণাঙ্গণ ত্যাগ করতেছিল। তখন তাদের অধিকাংশই রাসূলের আদেশ অমান্য করে গনিমতের মাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। এমতাবস্থায় মুশরিকরা গিরিপথ অরক্ষিত দেখে পিছনের দিক থেকে হামলা করে মুসলমানদেরকে পর্যদুস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলল। এরূপ পরাজয়ের ফলে যখন অনেকেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল উর্ধশ্বাসে দৃষ্টি ছিল, তাদের সে পরিস্থিতি এ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী আল্লাহ ভক্তদের দৃঢ়তা, বিপদাপদে অস্থির ও দুর্বল না হওয়ার কথা বর্ণনা করার পর তাদের একটি বিরাট গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা এ অপূর্ব আত্মত্যাগের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার দরবারে কয়েকটি দোয়া করতেন।

এক. আমাদের বিগত অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন। **দুই.** বর্তমান জিহাদকালে আমরা যেসব ত্রুটি করছি, তা মার্জনা করুন।
তিন. আমাদের দৃঢ়তা বহাল রাখুন। **চার.** শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী করুন।

এসব দোয়ায় মুসলমানদের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে।

নিজেদের সৎকাজের জন্য গর্ব করা উচিত নয় : প্রথম এই যে, সত্যধর্মী মুমিন ব্যক্তি যত বড় সৎকর্মই করুক এবং আল্লাহর পথে যত কর্মতৎপরতাই প্রদর্শন করুক, সৎকর্মের জন্য গর্ব করার অধিকার তার নেই। কারণ তার সৎকর্মও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপারই ফলশ্রুতি। এ কৃপা ব্যতীত কোনা সৎকর্ম হওয়াই সম্ভব নয়। হাদীসে বলা হয়েছে : فَوَاللّٰهِ لَوْ لَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা না হলে আমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতাম না এবং আমরা জাকাত ও নামাজ আদায় করতে পারতাম না।

এতদ্ব্যতীত মানুষ যে সৎকর্ম করে, তা যতই সঠিকভাবে করুক না কেন, আল্লাহর শানের উপযুক্ত করে সম্পাদন করা মানুষের সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় আল্লাহর প্রাপ্য আদায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। তাই কর্ম সম্পাদনের সময়ও মাগফেরাতের দোয়া করা প্রয়োজন।

এছাড়া উপস্থিত ক্ষেত্রে মানুষ যে সৎকর্ম করছে ভবিষ্যতেও তা করার সামর্থ্য হবে এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায়না। কাজেই বর্তমান কর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতেও এর উপর কায়েম থাকার দোয়া মুসলমানদের দৈনিক প্রার্থনা হওয়া দরকার।

আল্লাহর কাছে সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্তবা : এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ওহুদ যুদ্ধে কতিপয় সাহাবীর মতামত ভুল ছিল। এ কারণে পূর্ববর্তী অনেক আয়াতে হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য অব্যাহতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতসব অসন্তোষ প্রকাশ ও হুশিয়ারীর মধ্যেও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ দর্শনীয়। প্রথমতঃ لِيَبْتَلِيَكُمْ বলে প্রকাশ করেছেন যে, সাময়িক পরাজয়টি সাজা হিসেবে নয়; বরং পরীক্ষার জন্য। অতঃপর وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ বলে পরিষ্কার ভাষায় ত্রুটি মার্জনার কথা ঘোষণা করেছেন।

কতিপয় সাহাবীর ইহকাল কামনার অর্থ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম তখন দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল ইহকাল কামনা করেছিলেন এবং এক দল শুধু পরকালের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোন কর্মের ভিত্তিতে একদল সাহাবীকে ইহকালের প্রত্যাশী বলা হয়েছে? এটা জানা কথা যে, গনিমতের মাল আহরণের ইচ্ছাকেই 'ইহকাল কামনা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন চিন্তা করা দরকার যে, যদি তাঁরা স্বীয় রক্ষাব্যূহেই থেকে যেতেন এবং গনিমতের মাল আহরণে অংশগ্রহণ না করতেন, তবে কি তাঁদের প্রাপ্য অংশ হ্রাস পেত? কিংবা অংশগ্রহণের ফলে কি তাঁদের প্রাপ্য অংশ বেড়ে গেছে? কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, গনিমতের আইন যাদের জানা আছে, তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, মাল আহরণে শরিক হওয়া ও রক্ষাব্যূহে অবস্থান করা উভয় অবস্থাতেই তারা সমান অংশ পেতেন।

এতে বুঝা যায় যে, তাদের এ কর্ম নির্ভেজাল ইহকাল কামনা হতে পারে না; বরং একে জিহাদের কাজেই অংশগ্রহণ বলা যায়। তবে স্বাভাবিকভাবে তখন গনিমতের মালের কল্পনা অন্তরে জাগ্রতা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় পয়গম্বরের সহচরদের অন্তর এ থেকেও মুক্ত ও পবিত্র দেখতে চান। এ কারণেই একে ইহকাল কামনা রূপে ব্যক্ত করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

উল্লিখিত ১৫৩ তম আয়াত থকে কিছু সংখ্যক সাহাবীর যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়া এবং স্বয়ং হুজুরে আকরাম ﷺ কর্তৃক আহবান করার পরও ফিরে না আসা আর সে জন্য হুজুরের দুঃখিত হওয়া এবং সে কারণে শেষ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের দুঃখিত হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.)-এর ডাকে সাহাবীগণ পুনরায় সমবেত হয়েছিলেন।

তাফসীরে রুহুল মা'আনী প্রণেতা এই ঘটনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রথমে রাসূলে কারীম (সা.) আহবান করেন যা সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পাননি এবং তাঁরা বহুদূরে চলে যান। শেষ পর্যন্ত হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর ডাকে সবাই এসে সমবেত হয়েছিলেন।

তাফসীর বয়ানুল কুরআনে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, সাহাবীগণের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়ার মূল কারণ ছিল হুজুরে আকরাম ﷺ-এর শাহাদাতের সংবাদ। পক্ষান্তরে হুজুর যখন ডাকলেন, তখন তাতে একে তো দুঃসংবাদের কোনো খণ্ডন ছিল না, তদুপরি আওয়াজ যদি পৌঁছেও থাকে, তাঁরা তা চিনতে পারেননি। তারপর যখন হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) ডাকেন, তখন তাতে সে সংবাদের খণ্ডন এবং সাথে সাথে হুজুর (সা.)-এর বেঁচে থাকার কথাও বলা হয়েছিল। কাজেই একথা শুনে সবাই শান্ত হলেন এবং ফিরে এসে একত্রে সমবেত হলেন। তবে প্রশ্ন থাকে যে, এতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ভৎর্সনা এবং রাসূলে কারীম ﷺ দুঃখিত হলেন কেন? তার কারণ এই হতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরাম যদি সে সময়টায় মনের দিক দিয়ে দৃঢ় থাকতেন, তাহলে হুজুরের ডাকের শব্দ চিনতে পারতেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

سُلْطَانٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন سَلَاطِيْنُ অর্থ– দলিল, প্রমাণ।

مَأْوٰهُمْ : শব্দটি একবচন, বহুবচন ماوى অর্থ– ঠিকানা।

فَشِلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفَشَلُ মূলবর্ণ (ف . ش . ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলে।

تَنَازَعْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাবে مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلتَّنَازُعُ মূলবর্ণ (ن . ز . ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতবিরোধ করছিলে।

لِيَبْتَلِيَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِلَاءُ মূলবর্ণ (ب . ل . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি পরীক্ষা করেন।

لَا تَلْوٗنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার لَوِىٌ মূলবর্ণ (ل . ى . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তোমরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখনি।

اَثَابَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِثَابَةُ মূলবর্ণ (ث . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি তৎ বিনিময়ে দিয়েছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ : سَنُلْقِيْ ফে'ল যমীরে نَحْنُ ফা'য়েল فِيْ হরফে জার قُلُوْبِ মুযাফ الَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল كَفَرُوْا ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে সিলাহ হয়েছে موصول ও صلة মিলে মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে মাজরূর جار ও مجرور মিলে متعلق আর اَلرُّعْبَ মাফঊল সুতরাং فعل ـ فاعل ـ مفعول ও متعلق মিলে جملة فعلية হলো।

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا
يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ
أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
الْجٰهِلِيَّةِ ۖ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ
شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ۗ يُخْفُوْنَ فِيْٓ
أَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ۖ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ
لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ۗ قُلْ لَّوْ
كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقَتْلُ إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِيْ
صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَاللهُ
عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٥٤﴾

অনুবাদ : (১৫৪) অনন্তর আল্লাহ সেই দুঃখের পর তোমাদের প্রতি নাজিল করলেন শান্তি অর্থাৎ তন্দ্রা, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করছিল, আর একদল তারা ছিল যারা স্বীয় প্রাণেরই চিন্তায় বিব্রত ছিল, তারা আল্লাহর সাথে অবাস্তব ধারণা করছিল যা ছিল নিছক মূর্খতাসুলভ ধারণা, তারা এরূপ বলছিল– আমাদের কি কোনো অধিকার আছে? আপনি বলে দিন, সমস্ত অধিকার তো আল্লাহরই, তারা স্বীয় অন্তরসমূহে এমন বিষয় গোপন রাখে, যা আপনার সমীপে প্রকাশ করে না, বলে, যদি আমাদের কোনো এখতিয়ার চলত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না, আপনি বলে দিন, যদি তোমরা নিজেদের গৃহেও থাকতে, তথাপিও যাদের জন্য নিহত হওয়া নির্ধারিত ছিল, তারা বের হয়ে পড়ত ঐ স্থানের দিকে যে স্থানে তারা নিপতিত আছে, আর এসমস্ত যা কিছু ঘটেছে, এই জন্য যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের বিষয় পরীক্ষা করেন, আর যেন তোমাদের অন্তরের বিষয় নির্মল করে দেন, অবশ্য আল্লাহ তা'আলা অন্তরের সমস্ত গোপনীয় বিষয় পূর্ণরূপে অবগত আছেন

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৫৪) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ অনন্তর আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাজিল করলেন مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ সেই দুঃখের পর أَمَنَةً শান্তি نُعَاسًا অর্থাৎ তন্দ্রা يَغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করছিল وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ আর একদল তারা ছিল যারা স্বীয় প্রাণেরই চিন্তায় বিব্রত ছিল يَظُنُّوْنَ بِاللهِ তারা আল্লাহর সাথে ধারণা করছিল غَيْرَ الْحَقِّ অবাস্তব ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ যা ছিল নিছক মূর্খতাসুলভ ধারণা يَقُوْلُوْنَ তারা এরূপ বলছিল– هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ আমাদের কি কোনো অধিকার আছে? قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ সমস্ত অধিকার তো আল্লাহরই يُخْفُوْنَ فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ তারা স্বীয় অন্তরসমূহে এমন বিষয় গোপন রাখে مَا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ যা আপনার সমীপে প্রকাশ করে না يَقُوْلُوْنَ বলে لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ যদি আমাদের কোনো এখতিয়ার চলত مَا قُتِلْنَا هٰهُنَا তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না قُلْ আপনি বলে দিন لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ যদি তোমরা নিজেদের গৃহেও থাকতে لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ তথাপিও যাদের জন্য নিহত হওয়া নির্ধারিত ছিল, তারা বের হয়ে পড়ত إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ঐ স্থানের দিকে যে স্থানে তারা নিপতিত আছে وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ আর এসমস্ত যা কিছু ঘটেছে, এই জন্য যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের বিষয় পরীক্ষা করেন وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ আর যেন তোমাদের অন্তরের বিষয় নির্মল করে দেন وَاللهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অবশ্য আল্লাহ তা'আলা অন্তরের সমস্ত গোপনীয় বিষয় পূর্ণরূপে অবগত আছেন।

(১৫৫) নিশ্চয়, তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল- যে দিন উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল, এটা ভিন্ন আর কিছু নয় যে, শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছিল, কতিপয় আমলের দরুন এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাপরায়ণ, অতীব ধৈর্যশীল।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

(১৫৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা কাফের এবং নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে- যখন তারা ভূপৃষ্ঠের কোথাও ভ্রমণ করে কিংবা কোথাও গাজী হয় [যুদ্ধে গমন করে], যদি তারা আমাদের নিকট থাকত, তবে মরতও না এবং নিহতও হতো না, ফলে আল্লাহ এই উক্তিকে তাদের অন্তরে পরিতাপের কারণ করে দেন, বস্তুতঃ আল্লাহই মারেন এবং বাঁচান, এবং তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ সবই দেখছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

(১৫৭) আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ হতে প্রাপ্ত মার্জনা ও করুণা তা হতে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে।

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৫) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ নিশ্চয়, তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল- يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ যে দিন উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল إِنَّمَا এটা ভিন্ন আর কিছু নয় যে اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছিল। بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا কতিপয় আমলের দরুন وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাপরায়ণ, অতীব ধৈর্যশীল।

(১৫৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে ঈমানদারগণ! لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা কাফের وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ এবং নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে- إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ যখন তারা ভূপৃষ্ঠের কোথাও ভ্রমণ করে أَوْ كَانُوا غُزًّى কিংবা কোথাও গাজী হয় [যুদ্ধে গমন করে] لَوْ كَانُوا عِندَنَا যদি তারা আমাদের নিকট থাকত। مَا مَاتُوا তবে মরতও না وَمَا قُتِلُوا এবং নিহতও হতো না لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ ফলে আল্লাহ এই উক্তিকে করে দেন حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ তাদের অন্তরে পরিতাপের কারণ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ বস্তুতঃ আল্লাহই মারেন এবং বাঁচান وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ এবং তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ সবই দেখছেন।

(১৫৭) وَلَئِن قُتِلْتُمْ আর যদি তোমরা নিহত হও فِي سَبِيلِ اللَّهِ আল্লাহর পথে أَوْ مُتُّمْ কিংবা মৃত্যুবরণ কর لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ তবে নিশ্চয় আল্লাহ হতে প্রাপ্ত মার্জনা وَرَحْمَةٌ ও করুণা خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ তা হতে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫৫) قوله إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের যুদ্ধে তিনজন সাহাবী পলায়নের ক্ষেত্রে সর্ব প্রাধান্য ছিলেন। তারা হলেন, একজন মুহাজির ও দুজন আনসারী যথা– উসমান, রাফে বিন মুআল্লা ও খারেজা বিন যায়েদ। তারা পালিয়ে যাবার পর দীর্ঘ সময় পার হলে অর্থাৎ যুদ্ধের সময় পার হয়ে যাবার পর ফিরে আসেন। রুহুল মা'আনীর বর্ণনানুযায়ী তারা তিনদিন পর রাসূল ﷺ-এর নিকট ফিরে আসেন। অন্যান্য পর্যুদস্ত সাহাবীগণ সে দিনই পাহাড়ের উপর একত্রিত হন। উক্ত তিনজন সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী প্রসিদ্ধ পর্যুদস্ত যারা ছিলেন, তারা হলেন, উসমান, রাফে বিন মুআল্লা, খারেজা বিন যায়েদ, আবূ হুযাইফা বিন উতবা, ওলীদ বিন উকবা, সা'আদ বিন উসমান ও উকবা বিন উসমান, বনূ রজীক গোত্রের আনসারীর দুই পুত্র। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন জনই প্রসিদ্ধ। তাদের পালিয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

(১৫৪) قوله ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ওহুদ যুদ্ধে কিছু সংখ্যক সাহাবী শাহাদত বরণ করলেন আর কিছু সংখ্যক পলায়ন করলেন। তারপর যারা ময়দানে ছিলেন তাদের উপর আল্লাহ প্রশান্তি তথা তন্দ্রা দ্বারা তাদেরকে ঢেকে ফেলেন; যাতে যুদ্ধের অবসাদ, ক্লান্তি ও বিমর্ষতা দূর হয়ে সাহস ও কর্মক্ষমতা ফিরে আসে। অবস্থা এমন হয়েছিল যে সাহাবাদের থুতনি বক্ষস্থল পর্যন্ত এসে যায়। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন-"আমি তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্নের মতো মা'তাব বিন কোশাইরের কথা শুনছিলাম যে, সে বলছে هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ তখন মহান আল্লাহ তা'আলা ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم হতে بِذَاتِ الصُّدُورِ পর্যন্ত নাজিল করেন। -[লুবাবুন নুকূল পৃ. : ৭০]

(১৫৬) قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا الخ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, মুসলমানরা যখন কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে গিয়ে মৃত্যুবরণ করত, তখন মদিনার মুনাফিকগণ অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলত, "যদি তারা আমাদের নিকট থাকত তবে তারা মরত না এবং নিহতও হতো না। এসব কথা বলে মুসলমানদেরকে নিরুৎসাহিত করত, এমনকি এসব কথাবার্তার ফলে দুর্বল মুসলমানদের মাঝে অনুরূপ ভীরুতা এবং দুর্বলতা ও দেখা দিয়েছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে মুসলমানদেরকে তাদের কথা শুনতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কেননা মৃত্যু তার নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে আসবেই।

ওহুদের মহাপরীক্ষার তাৎপর্য : وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ –আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল, ওহুদের যুদ্ধে যে বিপদ এসেছিল এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর যে মসিবত এসে পতিত হয়েছিল তা শাস্তি হিসেবে নয়; বরং পরীক্ষাস্বরূপ ছিল। এই পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্ঠাবান মুমিন এবং মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল। আর فَأَثَابَكُمْ غَمًّا বাক্যের দ্বারা যে শাস্তির কথা বুঝা যায়, তার ব্যাখ্যা এই যে, এর প্রকৃত রূপটি ছিল শাস্তির মতোই, কিন্তু এই শাস্তিটি যে অভিভাবকসুলভ এবং সংশোধনের জন্য ছিল, তা সুস্পষ্ট। যে কোনো পিতা তার পুত্রকে এবং উস্তাদ তাঁর শাগরেদকে যে যৎসামান্য শাসন করে থাকেন, তাকেও প্রচলিত পরিভাষায় শাস্তি বলেই উল্লেখ করা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা প্রশিক্ষণ ও সংশোধনেরই একটা রূপ এবং শাসকসুলভ শাস্তি থেকে ভিন্নতর।

ওহুদের ঘটনায় মুসলমানদের উপর বিপদ আসার কারণ : উল্লিখিত বাক্য لِيَبْتَلِيَكُمْ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে, তাতে তো একথাই বুঝা যায় যে, এসব বিপদের কারণ ছিল একান্তই আল্লাহর ইচ্ছা, কিন্তু পরবর্তী আয়াতে إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই সাহাবীগণের পূর্ববর্তী কোনো কোনো পদস্খলনই এই প্রতিক্রিয়ার কারণ

এর উত্তর এই যে, বাহ্যিক কারণ অবশ্য সে পদস্খলনই ছিল, যার ভিত্তিতে তাদের দ্বারা আরো কিছু পাপ করিয়ে নেওয়ার জন্য শয়তান প্রলুব্ধ হয় এবং ঘটনাচক্রে তার সে লোভ চরিতার্থও হয়ে যায়। কিন্তু এই পদস্খলন এবং তার পশ্চাদবর্তী ফলাফলের মাঝে নিহিত ছিল এই মৌলিক তাৎপর্য لِيَبْتَلِيَكُمْ বাক্যে যা বর্ণনা করা হয়েছে। রুহুল মা'আনী গ্রন্থে زَجَّاجٌ (যাজ্জাজ) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, শয়তান তাঁদেরকে এমন কতিপয় পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেগুলো নিয়ে

আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়া সমীচীন মনে হয়নি। সে কারণেই তারা জিহাদ থেকে সরে পড়েন, যাতে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করে পছন্দনীয় অবস্থায় জিহাদ করতে পারেন এবং শহীদ হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে পারেন।

এক পাপও অপর পাপের কারণ হতে পারে : উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে টেনে আনে। যেমন একটি পুণ্য আরেকটি পুণ্যকে টেনে আনে। অর্থাৎ, পাপকর্ম ও পুণ্যকর্মের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ যখন কোনো একটা পুণ্য বা নেকী সম্পাদন করে, অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তখন তার পক্ষে অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায়। তার মনে নেক কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তেমনিভাবে মানুষ যখন কোনো পাপ কার্য সম্পাদন করে ফেলে তখন তা অন্যান্য পাপের পথও সুগম করে দেয়; মনের মধ্যে পাপের আগ্রহ বেড়ে যায়।

আল্লাহর নিকট সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা : ওহুদের ঘটনায় কোনো কোনো সাহাবীর দ্বারা যেসব পদস্খলন ও অপরাধ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত কঠিন। পঞ্চাশ জন সাহাবীকে যে অবস্থানে সেখান থেকে না সরার নির্দেশ দিয়ে বসানো হয়েছিল, তাঁদের অধিকাংশই সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন। এই সরে পড়ার পিছনে যদিও তাঁদের এই ধারণা কার্যকর ছিল যে, এখন বিজয় অর্জিত হয়ে গেছে এবং এই নির্দেশ পালন করার প্রয়োজনীয়তা আর অবশিষ্ট নেই। কাজেই এখন নিচে নেমে গিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মহানবী ﷺ-এর পরিষ্কার হেদায়েতের বিরুদ্ধাচরণই ছিল। এই অন্যায় ও ত্রুটির ফলেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের ভুলটি সংঘটিত হয়; যদিও এ ব্যাপারেও কোনো কোনো বিশ্লেষণের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন– زَجَّاجُ (যাজ্জাজ) থেকে উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারপর এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এমন এক অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়, যখন রাসূলে কারীম ﷺ স্বয়ং তাদের সাথে রয়েছেন এবং পিছন থেকে তাদেরকে ডাকছেন। এসব বিষয়কে যদি ব্যক্তিত্ব এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পৃথক করে দেখা যায়, তবে নিঃসন্দেহে এটা এত কঠিন ও ভয়ানক অপরাধ ছিল যে, সাহাবীগণ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরা যেসব অপবাদ আরোপ করে থাকে, এটা সেসব অপবাদগুলোর মধ্যকার কঠিন অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলন সত্ত্বেও এদের সাথে কি আচরণ করেছেন, উল্লিখিত আয়াতে সে প্রসঙ্গটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ বাহ্যিক নিয়ামত তন্দ্রা অবতরণ করে তাদের ক্লান্তি শ্রান্তি ও হতাশা দূর করে দেওয়া। তারপর বলে দেওয়া হয় যে, তখন মুসলমানদের উপর যে বিপদ এসেছিল, তা শাস্তি কিংবা আজাব ছিল না; বরং তাতে কিছুটা অভিভাবকসুলভ শাসনের লক্ষ্যও নিহিত ছিল। অতঃপর পরিষ্কার ভাষায় তাঁদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে একটি শিক্ষা : এখান থেকেই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সেই আকীদা ও বিশ্বাসের সমর্থন হয় যে, যদিও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্পূর্ণভাবে নিষ্পাপ নন, তাঁদের দ্বারা বড় কোনো পাপ সংঘটিত হয়ে যাওয়া সম্ভব এবং হয়েছেও, কিন্তু তা সত্ত্বেও উম্মতের জন্য তাঁদের কোনো দোষচর্চা কিংবা দোষ আরোপ করা জায়েজ নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যখন তাঁদের এত বড় পদস্খলন ও অপরাধ মার্জনা করে তাঁদের প্রতি দয়া ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তাঁদেরকে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু ওয়া রাযূ আনহু' এর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তখন তাঁদেরকে কোনো প্রকার অশালীন উক্তিতে স্মরণ করার কোনো অধিকার অপর কারো পক্ষে কেমন করে থাকতে পারে?

সে জন্যই এক সময় কোনো এক সাহাবী যখন হযরত উসমান ও অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কে ওহুদ যুদ্ধের এই ঘটনার আলোচনায় বলেছেন যে, এরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে গিয়েছিলেন; তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আল্লাহ নিজে যে বিষয়ের ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে সমালোচনা করার কোনো অধিকার কারো নেই। –[সহীহ বুখারী]

হাফেজ ইবনে তাইমিয়াহ (র.) বলেছেন : 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেসব মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে, সে সম্পর্কে কারো প্রতি কোনো আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা। কারণ ইতিহাসে যেসব রেওয়ায়েতে তাঁদের ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহকে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যা ও ভ্রান্ত যা শত্রুরা রটিয়েছে। আর কোনো কোনো ব্যাপার রয়েছে যেগুলোতে কম বেশি করে মূল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা সংযুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো প্রকৃতই শুদ্ধ সেগুলোও একান্তই সাহাবীগণের স্ব স্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে

সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাঁদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। বস্তুতঃ ঘটনা বিশেষের মধ্যে যদি তারা সীমালঙ্ঘন করেও থাকেন, তবুও আল্লাহ তা'আলার রীতি হলো إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ অর্থাৎ, সৎকাজের মাধ্যমে অসৎ কর্মের কাফফারা হয়ে যায়। বলাবাহুল্য সাহাবায়ে কেরামের সৎকর্মের সমান অন্য কারো কর্মই হতে পারে না। কাজেই তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার যতটুকু যোগ্য, তেমন অন্য কেউ নয়। সে জন্যই তাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার অন্য কারো নেই। তাদের ব্যাপারেও কটূক্তি বা অশালীন মন্তব্য করার অধিকারও অন্য কারো নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَغْشٰى সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَشْيُ মূলবর্ণ (غ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাদের উপর ঝিমুনি আরোপ হয়েছে।

لِيُمَحِّصَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّمْحِيْصُ মূলবর্ণ (م ـ ح ـ ص) জিনস صحيح অর্থ– তিনি পরিচ্ছন্ন করেন।

اِسْتَزَلَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِزَالُ মূলবর্ণ (ز ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিচ্যুতি আচরণ করিয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله . ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا الخ এখানে ثم হরফে আতফ, اَنْزَلَ ফে'ল যমীরে هُوَ ফা'য়েল عَلَيْكُمْ প্রথম متعلق আর مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ দ্বিতীয় متعلق আর اَمَنَةً মুবদাল মিনহু نُعَاسًا বদল مبدل منه ও بدل মিলে مفعول এবার مفعول . فاعل . فعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হলো।

قوله وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ : এখানে اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা عَلِيْمٌ শিবহে ফে'ল با হরফে জার ذَاتِ মুযাফ الصُّدُوْرِ মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে হলো متعلق এবার شبه فعل তার متعلق মিলে শিবহে জুমলা হয়ে خبر হলো অতএব مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

অনুবাদ : (১৫৮) আর যদি তোমরা [স্বাভাবিকভাবেও] মৃত্যুবরণ কর কিংবা নিহত হও, [তবুও] নিশ্চয়, তোমাদেরকে আল্লাহরই সমীপে একত্রিত করা হবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

(১৫৯) অতঃপর আল্লাহর করুণায় আপনি তাদের প্রতি বিনম্র রয়েছেন, আর যদি আপনি কর্কশ ও কঠোর-স্বভাব হতেন, তবে তারা সকলে আপনার নিকট হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত, সুতরাং আপনি তাদেরকে মাফ করে দিন এবং আপনি তাদের মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করুন, আর তাদের নিকট হতে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে পরামর্শ নিতে থাকুন, অনন্তর যখন আপনি সংকল্প দৃঢ় করে নেন, তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর করুন, নিশ্চয় আল্লাহ এমন নির্ভরশীলদেরকে ভালোবাসেন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

(১৬০) যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে তো কেউই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারে না, আর যদি তিনি তোমাদেরকে সহায়তা না করেন, তবে তাঁর পর এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে? আর শুধু আল্লাহরই উপর মুমিনদের ভরসা রাখা চাই।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৫৮) وَلَئِنْ مُّتُّمْ আর যদি তোমরা [স্বাভাবিকভাবেও] মৃত্যুবরণ কর اَوْ قُتِلْتُمْ কিংবা নিহত হও لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ [তবুও] নিশ্চয়, তোমাদেরকে আল্লাহরই সমীপে একত্রিত করা হবে।

(১৫৯) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ অতঃপর আল্লাহর করুণায় لِنْتَ لَهُمْ আপনি তাদের প্রতি বিনম্র রয়েছেন وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ আর যদি আপনি কর্কশ ও কঠোর-স্বভাব হতেন لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ তবে তারা সকলে আপনার নিকট হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত فَاعْفُ عَنْهُمْ সুতারাং আপনি তাদের মাফ করে দিন وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ এবং আপনি তাদেরকে মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করুন وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ আর তাদের নিকট হতে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে পরামর্শ নিতে থাকুন فَاِذَا عَزَمْتَ অনন্তর যখন আপনি সংকল্প দৃঢ় করে নেন فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর করুন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ এমন নির্ভরশীলদেরকে ভালোবাসেন।

(১৬০) اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন فَلَا غَالِبَ لَكُمْ তবে তো কেউই তোমাদের উপর জয়ী হতে পারে না وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ আর যদি তিনি তোমাদেরকে সহায়তা না করেন فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ তবে তাঁর পর এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে وَعَلَى اللّٰهِ আর শুধু আল্লাহরই উপর فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ মুমিনদের ভরসা রাখা চাই।

(১৬১) আর নবীর শান এই নয় যে, তিনি খেয়ানত করেন, অথচ যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে সে ব্যক্তি নিজের এই খেয়ানতকৃত বস্তু কিয়ামতের দিন উপস্থিত করবে, অতঃপর প্রত্যেকে তার কৃত-কর্মের পূর্ণ বিনিময় প্রাপ্ত হবে এবং তাদের প্রতি মোটেই জুলুম করা হবে না।	وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۚ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (١٦١)
(১৬২) সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত, তিনি কি সেই ব্যক্তির সদৃশ হতে পারেন যে, আল্লাহর গজবের যোগ্য? আর তার বাসস্থান জাহান্নাম, এবং তা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।	اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (١٦٢)
(১৬৩) এ সমস্ত লোক মর্যাদায় বিভিন্ন স্তরের হবে আল্লাহর নিকট, আর আল্লাহ পূর্ণরূপে দেখেন তাদের আমলসমূহ।	هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ (١٦٣)
(১৬৪) বস্তুতঃ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য হতে এমন এক নবী প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শুনান এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে থাকেন এবং কিতাব ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিতে থাকেন, এবং নিশ্চয় তারা পূর্ব হতে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।	لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (١٦٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬১) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ আর নবীর শান এই নয় যে, اَنْ يَّغُلَّ তিনি খেয়ানত করেন وَمَنْ يَّغْلُلْ অথচ যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে يَاْتِ بِمَا غَلَّ সে ব্যক্তি নিজের এই খেয়ানতকৃত বস্তু উপস্থিত করবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ অতঃপর প্রত্যেকে পূর্ণ বিনিময় প্রাপ্ত হবে مَا كَسَبَتْ তার কৃত-কর্মের وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ এবং তাদের প্রতি মোটেই জুলুম করা হবে না।

(১৬২) اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত كَمَنْ তিনি কি সেই ব্যক্তির সদৃশ হতে পারেন بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ যে আল্লাহর গজবের যোগ্য? وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ আর তার বাসস্থান জাহান্নাম وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ এবং তা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।

(১৬৩) هُمْ دَرَجٰتٌ এ সমস্ত লোক মর্যাদায় বিভিন্ন স্তরের হবে عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহর নিকট وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ আর আল্লাহ পূর্ণরূপে দেখেন بِمَا يَعْمَلُوْنَ তাদের আমলসমূহ।

(১৬৪) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ যখন তাদের প্রতি তাদেরই মধ্য হতে এমন এক নবী প্রেরণ করেছেন يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শুনান وَيُزَكِّيْهِمْ এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে থাকেন وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ এবং কিতাব ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিতে থাকেন। وَاِنْ كَانُوْا এবং নিশ্চয় তারা مِنْ قَبْلُ পূর্ব হতে لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।

(১৬৫) আর যখন তোমাদের এরূপ পরাজয় হলো যা অপেক্ষা দ্বিগুণ তোমরা বিজয় লাভ করেছিলে, তবে কি এমন সময় তোমরা এরূপ বলছ যে, এটা কোথা হতে হলো? আপনি বলে দিন, এ পরাজয় বিশেষ করে তোমাদের পক্ষ হতে হয়েছে, নিশ্চয় সর্ববিষয়োপরি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬৫) أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ আর যখন তোমাদের এরূপ পরাজয় হলো قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا যা অপেক্ষা দ্বিগুণ তোমরা বিজয় লাভ করেছিলে قُلْتُمْ তবে কি এমন সময় তোমরা এরূপ বলছ যে, أَنَّىٰ هَٰذَا এটা কোথা হতে হলো? قُلْ আপনি বলে দিন هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ এ পরাজয় বিশেষ করে তোমাদের পক্ষ হতে হয়েছে إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ নিশ্চয় সর্ববিষয়োপরি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫৯) قوله فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : ওহুদ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর আদেশ অমান্য করে নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করে গনিমতের মাল অন্বেষণে লিপ্ত হবার ফলে মুসলমানরা বিপর্যয়ের শিকার হয়। রাসূল ﷺও রক্তাক্ত হন, ফলে তিনি মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কাউকেও কোনোরূপ ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করেননি; বরং তাদের সাথে অত্যন্ত কোমল ব্যবহার করেন, এ প্রসঙ্গেই মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

(১৬১) قوله : وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১** : আল্লামা ওয়াহেদী বর্ণনা করেন, কালবী ও মুকাতিল হতে বর্ণিত রয়েছে, তীর নিক্ষেপকারীরা যখ তাদের কেন্দ্রস্থল সরু গিরিপথ ছেড়ে দিলেন গনিমতের মাল সংগ্রহের জন্য। তারা বলেন, আমাদের ভয় ছিল যে, নবী করীম ﷺ হয়তো ঘোষণা দিয়ে দিবেন যে, যে যা সংগ্রহ করবে সে মাল তার জন্য এবং বদরের ন্যায় গনিমতের মাল বণ্টন করা হবে না। তখন রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের কি বিশ্বাস ছিল যে, আমি এ মাল আত্মসাৎ করে নেব, তা তোমাদের মাঝে বণ্টন করা হবে না। তখন সে অবস্থাতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : অথবা রাসূল ﷺ-এর প্রতি বদরের দিনে কোনো কোনো মুনাফিক আত্মসাতের অপবাদ রটিয়েছিল। কাজেই রাসূলের চরিত্রের নিষ্কলুষতা বর্ণনা করার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, বদরের দিন গনিমতের মালের মধ্যে একটি লাল রং -এর চাদর ছিল এবং সে চাদরটি নিখোঁজ হয়েছিল। তখন কোনো কোনো মানুষ বলতেছিল যে, রাসূল ﷺ হয়তো চাদরটি নিয়ে গেছেন। তখন রাসূল ﷺ –এর নিষ্কলুষতা বর্ণনা করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : কোনো কোনো মানুষের ধারণা ছিল যে, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে ওহী আদায় সম্পর্কে। রাসূল ﷺ কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, যাতে রয়েছে মুশরিকদের মন, বানানো ধর্মের মন্দাচারী ও তাদের অলিক মা'বূদের প্রতি ভর্ৎসনা। সুতরাং মুশরিকরা রাসূল ﷺ-এর নিকট সে বিষয়গুলো মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি জানাল। তখন তাদের এ দাবিটি পালন করা যে রাসূল ﷺ-এর ক্ষমতাধীন নয় সে বর্ণনা দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১০৯/২/৪, আসবাবুন নুযূল লসাপুরী পৃ.৭৭]

(১৬৫) قوله أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : আবূ যামীল বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর বরাত দিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন, ওহুদের দিনে মক্কার মুশরিকদের সাথে মুখামুখিভাবে যখন বিক্ষিপ্তভাবে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো, তখন বদরের অভিযানকালে কুরাইশদের থেকে যে ফিদিয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ করা হয়েছিল, তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মুসলমানরা আক্রান্ত হলেন। তারা ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম মাঠ ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ-এর দাঁত মোবারক ভেঙ্গে গেল। মাথায় আঘাত পেয়ে মাথা থেকে চেহারার উপর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলো। তখন এহেন পর্যদুস্ত অবস্থায় রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতরণ করেন। –[ইবনে কাছীর : ১ : ৪২৪, ফাতহুল কাদীর ১ : ৩৯৭]

ওহুদ যুদ্ধে কোনো কোনো সাহাবী পদস্খলন এবং তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়ার দরুন হুজুরে আকরাম ﷺ অন্তরে যে আঘাত পেয়েছিলেন যদিও স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমা, করুণা ও চারিত্রিক কোমলতার দরুণ তিনি সেজন্য সাহাবীগণের প্রতি কোনো প্রকার ভর্ৎসনা করেননি এবং কোনো রকম কঠোরতাও অবলম্বন করেননি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের সঙ্গী-সাথীগণের মনসন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ভুলের দরুন তাঁদের মনে যে দুঃখ ও অনুতাপ হয়েছিল, সে সমস্ত বিষয় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়ার লক্ষ্যেই আয়াতে মহানবী ﷺ-কে অধিকতর কোমলতা ও করুণা প্রদর্শনের হেদায়েত করা হয়েছে এবং কাজে-কর্মে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুর্শিদ ও অভিভাবকদের কয়েকটি গুণ : যে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হুজুর আকরাম ﷺ-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং যারা তাঁকে নিজেদের জান-মাল অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করতেন, তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে যখন তাঁদের দ্বারা একটি পদস্খলন ঘটে যায়, তখন একদিকে নিজেদের পদস্খলন ও বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পর তাঁদের অনুতাপ সীমাহীনভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, যা তাদের মন-মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণভাবে অকেজো করে দিতে পারত কিংবা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ করে তুলতে পারতো। এরই প্রতিকারে পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ এই পদস্খলনের শাস্তি দুনিয়াতেই দেওয়া হয়ে গেছে।

অপরদিকে এই ত্রুটি ও পদস্খলনের ফলে রাসূলে কারীম ﷺ আহত হয়ে পড়েন এবং দৈহিক কষ্টও হয়। আত্মিক কষ্ট তো পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল। কাজেই দৈহিক ও আত্মিক কষ্টের কারণে সাহাবীগণের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল, যা তাঁদের হেদায়েত ও দীক্ষার পথে অন্তরায় হতে পারত। সেজন্যে মহানবী ﷺ-কে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাঁদের পদস্খলন ও ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং ভবিষ্যতের জন্য ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে থাকুন।

এ বিষয়টিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক বিস্ময়কর বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে বিবৃত করেছেন যাতে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এক. হুজুরে আকরাম ﷺ-কে এসব বিষয়ের নির্দেশ এমন ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁর প্রশংসা ও গুণ বৈশিষ্ট্যের বিকাশও ঘটে যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য পূর্ব থেকেই আপনার মাঝে বিদ্যমান ছিল।

দুই. এর আগে فَبِمَا رَحْمَةٍ শব্দটি বাড়িয়ে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে আপনার মধ্যে থাকা আমারই রহমতের ফলশ্রুতি, কারো ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়। তদুপরি রহমত শব্দটিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করে রহমতের মহত্ত্ব ও ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে একথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ রহমত শুধু সাহাবায়ে কেরামের জন্যই নয়; বরং স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ-এর জন্যও রয়েছে। সে কারণেই আপনাকে গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে।

অতঃপর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরবর্তী বাক্যগুলোর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই কোমলতা, সদ্ব্যবহার, ক্ষমা প্রদর্শন এবং দয়া ও করুণা করার সে গুণ যদি আপনার মধ্যে না থাকত, তবে মানুষের সংশোধনের যে দায়িত্ব আপনার উপর সমর্পণ করা হয়েছে তা যথা উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হতো না। মানুষ আপনার মাধ্যমে আত্ম-সংশোধন ও চারিত্রিক সংস্কার সাধনের উপকারিতা লাভ করার পরিবর্তে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত।

এ সমস্ত বিষয়ের দ্বারা দীক্ষাদান, সংস্কার সাধন এবং ধর্ম প্রচারের রীতি পদ্ধতি সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল। যে ব্যক্তি দীক্ষাদান, সমাজ সংস্কার এবং ধর্ম প্রচারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করার সংকল্প করবে, তার পক্ষে উল্লিখিত গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে যখন আল্লাহ তা'আলার প্রিয়তম রাসূলের কঠোরতাই সহ্য করা হয়নি, তখন কোনো প্রকার কঠোরতা বা চারিত্রিক অনমনীয়তার মাধ্যমে মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং তাদের সংস্কার ও দীক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতে পারবে এমন সাধ্য কার হতে পারে।

সবশেষে বলা হয়েছে : وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ অর্থাৎ ইতঃপূর্বে যেমন কাজে-কর্মে এবং কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তেমনিভাবে এখনও তাদের সাথে পরামর্শ করুন, যাতে তাদের মনে প্রশান্তি আসতে পারে। এতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, কল্যাণ কামনার যে অনুরাগ তাঁদের অন্তরে বিদ্যমান, তা তাদেরকে পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রকাশ করবেন।

এই সমুদয় আয়াতে সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম প্রচারকদের জন্য কয়েকটি বিষয়কে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

- প্রথমতঃ আচার ব্যবহার ও কথা-বার্তায় রূঢ়তা ও কর্কশতা পরিহার করা।
- দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকদের দ্বারা কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে কিংবা কষ্টদায়ক কোনা বিষয় সংঘটিত হলে সেজন্য প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে বরং ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং সদয় ব্যবহার করা।

◈ তৃতীয়তঃ তাদের পদস্খলন ও ভুলভ্রান্তির কারণে তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত না থাকা ; তাদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করতে থাকা এবং বাহ্যিক আচার আচরণে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার পরিহার না করা : উল্লিখিত আয়াতে মহানবী ﷺ-কে প্রথমে তো সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অতঃপর আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে কুরআনে কারীম দু' জায়গায় সরাসরি নির্দেশ দান করেছে : একটি হলো এই আয়াতে এবং দ্বিতীয়টি হলো সূরা শূরার সে আয়াতে যাতে সত্যিকার মুসলমানদের গুণবৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গুণ এই বলা হয়েছে যে, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ; অর্থাৎ, [যারা সত্যিকার মুসলমান] তাঁদের প্রতিটি কাজ হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।

এতদুভয় আয়াতে যেভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শের অপরিহার্যতা প্রতীয়মান হয়, তেমনিভাবে এতে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিধান সংক্রান্ত কয়েকটি মূলনীতিও সামনে এসে যায়। তা হলো এই যে, ইসলামি রাষ্ট্র হলো একটি পরামর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র যাতে পরামর্শের ভিত্তিতে নেতা বা রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে; বংশগত উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নয়। অধুনা ইসলামি শিক্ষারই দৌলতে সমগ্র বিশ্বে এই মূলনীতি সর্বজনস্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। তদুপরি ব্যক্তি-শাসিত রাজতন্ত্রী সাম্রাজ্যসমূহও জোরে হোক জবরদস্তিতে হোক এ দিকেই চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দ শ বছর আগেকার যুগের প্রতি লক্ষ্য করুন, যখন সমগ্র বিশ্বের উপর বর্তমান তিন বৃহত্তের স্থলে দুই বৃহত্তের শাসন বিদ্যমান ছিল। তার একটি হলো কিসরার শাসন আর অপরটি হলো কায়সারের শাসন। এতদুভয়ের বিধি-বিধানই ব্যক্তি রাষ্ট্র ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য হিসেবে একই পর্যায়ভুক্ত ছিল। এতে এক ব্যক্তি লক্ষ কোটি বনী আদমের উপর শাসন করত নিজের মেধা ও যোগ্যতার বলে নয়; বরং উত্তরাধিকারের নৃশংস ও উৎপীড়নমূলক নীতির ভিত্তিতে। আর মানুষকে গৃহপালিত জানোয়ারের মর্যাদা দেওয়াকেও মনে করা হতো একান্ত রাষ্ট্রীয় সম্মান ও এনাম। রাষ্ট্রীয় এই মতবাদই দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকার উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছিল। শুধুমাত্র গ্রীসে গণতন্ত্রের কিছু নমুনার একটা অসম্পূর্ণ রেখা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাও ছিল এতই অস্পষ্ট ও ক্ষীণ যে, তার উপর কোনো রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা ছিল একান্তই দূরূহ ব্যাপার। সে কারণেই গ্রীক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে কোনো স্থিতীশিলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়নি; বরং সে সমস্ত মূলনীতি এরিষ্টটলের দর্শনের একটি শাখা হিসেবে বিদ্যমান রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারে অপ্রাকৃতিক নীতিপদ্ধতি সমূহকে বাতিল করে দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োগ ও অপসারণের বিষয়টি একান্তভাবে জনসাধারণের অধিকারে তুলে দিয়েছে। যে অধিকারকে তারা নিজেদের প্রতিনিধি এবং বিচক্ষণ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের পথে আটকে পড়া পৃথিবী ইসলামের শিক্ষারই দৌলতে এই ন্যায়সঙ্গত ও প্রকৃতি গ্রাহ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। আজকের পৃথিবী যাকে গণতন্ত্র নামে অভিহিত করছে, সে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণই হলো এটি।

কিন্তু বর্তমান ধাচের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ যেহেতু রাজতান্ত্রিক উৎপীড়ন-নিপীড়নেরই প্রতিক্রিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তাও এত অসামঞ্জস্যভাবে বিকাশ লাভ করেছে যে, জনসাধারণকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সাব্যস্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় আইন ও শাসন-বিধানের মুক্ত মালিকানা দান করেছে। ফলে তাদের মন মস্তিষ্ক, আসমান, জমিন ও মানবজাতির স্রষ্টা আল্লাহ এবং তাঁর প্রকৃত মালিকানা ও রাষ্ট্রাধিকারের কল্পনা থেকেও বিমুক্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাদের গণতন্ত্র আল্লাহ তা'আলারই দেওয়া গণঅধিকারের উপর আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত ব্যবধাকতাসমূহকে পর্যন্ত মনের উপর কঠিন চাপ এবং ন্যায়ের পরিপন্থি বলে ধারণা করতে শুরু করেছে।

ইসলামি সংবিধান যেভাবে বনী আদমকে 'কায়সার' ও 'কিসরার' এবং ব্যক্তি শাসনের নিপীড়ন-নির্যাতনের নিগড় থেকে মুক্ত করেছে, তেমনিভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকেও দেখিয়েছে আল্লাহর আনুগত্যের পথ। কোনো দেশের বিধিব্যবস্থা হোক কিংবা জনসাধারণ– সবাইকে একথা বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা সবাই আল্লাহ তা'আলার আইনেরই অনুগত। জনসাধারণ এবং গণসংসদের অধিকার, আইন প্রণয়ন, মনোনয়ন অপসারণ সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরে হতে হবে। শাসক বা নেতার নির্বাচনে, পদ ও দফতর বন্টনের ব্যাপারে একদিকে তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার প্রতি যেমন পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনিভাবে তাদের আমানতদারী এবং বিশ্বস্ততারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। এমন লোককেই নিজেদের শাসক বা নেতা নির্বাচন করতে হবে, যিনি ইলম ও পরহেজগারী, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে হবেন সর্বোত্তম। তদুপরি এ নেতা নির্বাচনে স্বেচ্ছাচারমূলক হবে না; বরং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সৎলোকদের পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হবে।

কুরআনে কারীমের উল্লিখিত আয়াত এবং রাসূলে কারীম ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতিই তার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.) ইরশাদ করেছেন لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشْوَرَةٍ অর্থাৎ, পরামর্শকরণ ব্যতীত খেলাফত হতে পারে না। –[কানযুল উম্মাল]

আলোচনা ও পরামর্শ করাকে ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য একটি মৌলিক বিষয় হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোনো সময় পরামর্শের ঊর্ধ্বে চলে যায় কিংবা এমন ধরনের লোকের সাথে পরামর্শে প্রবৃত্ত হয়, যারা শরিয়তের দৃষ্টিতে পরামর্শের যোগ্য নয়, তবে তাকে অপসারিত করা অপরিহার্য।

পরামর্শ অপরিহার্য হওয়ার কারণে ইসলামি রাষ্ট্র এবং তার অধিবাসীবৃন্দের যে সুফল লাভ হবে, তার অনুমান এভাবে করা যায় যে, রাসূলে কারীম ﷺ পরমার্শকে 'রহমত' বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে আদী ও বায়হাকী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, উল্লিখিত আয়াতটি যখন নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য এর পরামর্শের কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু আল্লাহ এই পরামর্শকে আমার উম্মতের জন্য রহমত সাব্যস্ত করেছেন। –[বয়ানুল কুরআন]

সারমর্ম এই যে, আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে তাঁর রাসূলকে প্রতিটি কাজের ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে বলে দিতেন, পরামর্শের কোনো প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট রাখতেন না। কিন্তু হুজুরের মাধ্যমে পরামর্শ রীতির প্রচলন করার মাঝেই নিহিত ছিল উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গল। কাজেই আল্লাহ বহু বিষয় এমন রেখে দিলেন, যাতে সরাসরি কোনো পরিষ্কার ওহী নাজিল হয়নি; বরং সেগুলোর ব্যাপারে হুজুরে আকরাম ﷺ-কে পরামর্শ করে নেওয়ার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে লক্ষণীয় যে, এতে রাসূলে কারীম ﷺ-কে পরামর্শ করার নির্দেশ দেওয়ার পর বলা হয়েছে فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, পরামর্শ করার পর আপনি যখন কোনো একটি দিক সাব্যস্ত করে নিয়ে সে মতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। এতে عَزَمْتَ শব্দে عَزْم অর্থাৎ, নির্দেশ বাস্তবায়নে দৃঢ়সংকল্প হওয়াকে শুধুমাত্র মহানবী ﷺ -এর প্রতিই সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। عَزَمْتُمْ [আযামতুম] বলা হয়নি, যাতে সংকল্প ও তা বাস্তবায়নে সাহাবায়ে কেরামের সংযুক্ততাও বুঝা যেতে পারত। এই ইঙ্গিতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরামর্শ করে নেওয়ার পর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমীর যা করবেন তাই হবে গ্রহণযোগ্য। কোনো কোনো সময় হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে যদি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর অভিমত বেশি শক্তিশালী হতো, তখন সেমতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন। অথচ পরামর্শ সভায় অধিকাংশ সময় এমনসব মনীষী উপস্থিত থাকতেন, যাঁরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর তুলনায় বয়স, জ্ঞান ও সংখ্যার দিক দিয়ে ছিলেন গরিষ্ঠ। হুজুরে আকরাম ﷺ ও অনেক সময় শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) এবং হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীদের মতের উপর প্রাধান্য দান করেছেন; এমন কি এমন ধারণাও করা হতে লাগল যে, উল্লিখিত আয়াতটি এতদুভয়ের সাথে পরামর্শ করার জন্যই নাজিল হয়ে থাকবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, এটা তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিপন্থি এবং ব্যক্তিশাসনের রীতি। তাছাড়া এতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষতির আশঙ্কাও বিদ্যমান।

উত্তর এই যে, ইসলামি আইন পূর্বাহ্নেই এর প্রতি লক্ষ্য করেছে। কারণ যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্র প্রধান বা আমীর বানিয়ে দেওয়ার অধিকারই জনসাধারণকে সে দেয়নি; বরং সে জ্ঞান-গরিমা, যোগ্যতা কর্মক্ষমতা, আল্লাহভীতি ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে যাকে সবচেয়ে ভালো মনে করা হবে, শুধুমাত্র তাকেই তো নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা জনগণের জন্য অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে। তবে যে ব্যক্তিকে এ সমস্ত উচ্চতর গুণ-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে, তার উপর যদি এমন সব দায়িত্ব আরোপ করা হয় যা অবিশ্বাসী, ফাসেক ও ফাজের ব্যক্তির উপর আরোপ করা হয়, তবে তা বুদ্ধি-বিবেচনা ও ন্যায়নীতিকে হত্যা করারই নামান্তর এবং যারা কাজের লোক তাদের উৎসাহ ভঙ্গ করা ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অন্তরায় সৃষ্টি করার শামিল হবে।

গনিমতের মাল চুরি করা মহাপাপ : কোনো নবীর পক্ষে এমন পাপের সম্ভাব্যতাও নেই وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গনিমতের মাল চুরি করার বিষয়টিও এসে গেছে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ঘটনাটি ছিল, বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মালের মধ্য থেকে একটি চাদর খোয়া যায়। কোনো কোনো লোক বলল, হয়তো সেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়ে থাকবেন। এসব কথা যারা বলত, তারা যদি মুনাফিক হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। আর তা কোনো অবুঝ মুসলমানের পক্ষে বলাও অসম্ভব কিছু নয়।

তবে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, সে হয়তো মনে করে থাকবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তা করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে غُلُوْلٌ বা গনিমতের মালের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা মহাপাপ হওয়া এবং কিয়ামতের দিন সেজন্য কঠিন শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, কোনো নবী সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তিনিই এহেন পাপ কাজ করে থাকবেন, একান্তই অনর্থক ধৃষ্টতা। কারণ নবীগণ হলেন যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত।

غُلُوْلٌ শব্দটি সাধারণভাবে খেয়ানত অর্থে এবং বিশেষ করে গনিমতের মালে খেয়ানত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর গনিমতের মাল চুরি করা কিংবা তাতে খেয়ানত করা সাধারণ চুরি অথবা খেয়ানত অপেক্ষা বেশি পাপের কাজ। তার কারণ গনিমতের মালের সাথে গোটা ইসলামি সেনাবাহিনীর অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক এতে চুরি করবে, সে চুরি করবে শত সহস্র লোকের সম্পদ। যদি কখনো কোনো সময় তার মনে তা সংশোধন করার খেয়াল হয়, তখন সবাইকে তাদের অধিকার প্রত্যার্পণ করা কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেওয়া একান্তই দুরূহ ব্যাপার। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরির মালের মালিক সাধারণত পরিচিতি ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কখনো কোনো সময় আল্লাহ তা'আলা যদি তওবা করার তৌফিক দান করেন, তবে তার হক আদায় করে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিয়ে মুক্ত হতে পারে। সে কারণেই কোনো এক যুদ্ধে এক লোক যখন কিছু পশম নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, গনিমতের মাল বণ্টন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন তার মনে হলো, 'তখন সেগুলো নিয়ে গিয়ে হুজুর ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হলো। তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন এবং উম্মতের জন্য পিতা-মাতা অপেক্ষা সদয় হওয়া সত্ত্বেও তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এখন এগুলো কেমন করে আমি সমগ্র সেনাবাহিনীর মাঝে বণ্টন করব? কাজেই কিয়ামতের দিনই তুমি এগুলো নিয়ে উপস্থিত হইও।

'গলূল' তথা গনিমতের মাল চুরি করার ব্যাপারটি অন্যান্য চুরি অপেক্ষা কঠিন পাপ এজন্যই যে, হাশরের ময়দানে যেখানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হবে, সবার সামনে তাকে সেখানে এমনভাবে লাঞ্ছিত করা হবে যে, চুরি করার বস্তু সমাগ্রী তাঁর কাঁধে চাপানো থাকবে। বুখারী ও মুসলিম শরিফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েতক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, দেখ কিয়ামতের দিন কারো কাঁধে একটি উট চাপানো অবস্থায় থাকবে এবং ঘোষণা করা হবে যে, এ লোক গনিমতের মালের উট চুরি করেছিল, এমন যেন না হয়। যদি সে লোক আমার শাফা'আতের কামনা করে, তবে আমি তাকে পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিয়ে দেব যে, আমি আল্লাহর যা কিছু নির্দেশ পেয়েছিলাম, তা সবই পৌঁছে দিয়েছিলাম, এখন আমি কিছুই করতে পারব না।

আল্লাহ রক্ষা করুন! হাশর মাঠের এই লাঞ্ছনা এমনই কঠিন হবে যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, যাদের সাথে এসব ঘটনা ঘটবে, তারা কামনা করবে যে, আমাদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, তবু যেন এহেন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা থেকে বেঁচে যাই।

ওয়াকফ ও সরকারি ভাণ্ডারে চুরি করা 'গুলূলেরই পর্যায়ভুক্ত : মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ এবং ওয়াকফের মালের অবস্থাও একই রকম, যাতে হাজার-হাজার মুসলমানের চাঁদা বা দান অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমাও যদি করাতে হয়, তবে কার কাছ থেকে ক্ষমা করাবে? এমনিভাবে রাষ্ট্রের সরকারি কোষাগারে [বায়তুল মাল] এর হুকুমও তাই। কারণ এতে সমগ্র দেশবাসীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত। যে লোক এতে চুরি করে, সে সবারই অধিকার চুরি করে থাকে। কিন্তু যেহেতু এ সমস্ত মালেরই কোনো একক বা ব্যক্তি-মালিকানা থাকে না; বরং যারা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত, তারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং চুরির সুযোগ-সুবিধাও অধিক থাকে, কাজেই ইদানিংকালে সমগ্র বিশ্বে সবচাইতে বেশি চুরি ও খেয়ানত এ সমস্ত মালেই হচ্ছে। পক্ষান্তরে মানুষ এর কঠিন পরিণতি ও ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে একান্ত নিস্পৃহ। তারা যেন এতটুকুও বুঝতে চায় না যে, এতে জাহান্নাম ছাড়াও হাশরের ময়দানে রয়েছে চরম লাঞ্ছনা। তদুপরি হুজুরে আকরাম ﷺ-এর শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা। –[নাউযুবিল্লাহ]

মহানবী (সা.)-এর আগমন সমগ্র মানবতার জন্য সর্ববৃহৎ অনুগ্রহ : لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়েরই একটি আয়াত সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ আয়াতে একটি শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ এ প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআন কারীমের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মহানবী ﷺ হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য সবচাইতে বড় নিয়ামত ও মহা অনুগ্রহ। কিন্তু এখানে এই আয়াতে শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট করাটা কুরআনের অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে কুরআন সমগ্র বিশ্বের জন্য হেদায়েত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বলারই অনুরূপ যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে মুত্তাকীনদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার কারণ, উভয়

ক্ষেত্রেই এক। তা হলো এই যে, যদিও রাসূলে মাকবুল ﷺ -এর অস্তিত্ব মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের জন্যই মহা নিয়ামত এবং বিরাট অনুগ্রহ, তেমনিভাবে কুরআন কারীমও সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য হেদায়েত। কিন্তু যেহেতু এই হেদায়েত ও নিয়ামতের ফল শুধু মুমিন মুত্তাকীরাই উপভোগ করেছে, সেহেতু কোনো কোনো স্থানে একে তাঁদেরই সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো রাসূলে কারীম ﷺ -কে মুমিনদের জন্য কিংবা সমগ্র বিশ্বের জন্য মহা নিয়ামত ও বিরাট অনুগ্রহ হিসেবে বিশ্লেষণ করা। আধুনিককালের মানুষ যদি আধ্যাত্মিকতাবিমুখ এবং বস্তুবাদের দাসে পরিণত না হতো, তবে এ বিষয়টি কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখত না; যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষই এই মহা অনুগ্রহের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারত। কিন্তু আধুনিককালের মানুষ যেহেতু পৃথিবীর জীব-জন্তুসমূহের মধ্যে একটি অতি বিচক্ষণ জীব অপেক্ষা অধিক কিছু হয়নি, কাজেই তাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও এনাম বলতেও সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকেই মনে করা হয়, যাতে তাদের পেট ও জৈবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উপকরণ মজুদ থাকে। তারা সেগুলোর অস্তিত্বের মূল তাৎপর্য বা তার প্রাণ ও ভালো মন্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। সে কারণেই এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানুষকে প্রথম একথা বাতলে দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে যে, তাদের মূল সত্তা শুধু কয়েকটি হাড় গোড় ও চর্ম-মাংশের সমষ্টি নয়; বরং মানুষের প্রকৃত তাৎপর্য হলো সে আত্মা, যা তার দেহের সাথে যুক্ত। যতক্ষণ এ আত্মা তার দেহে বর্তমান রয়েছে, ততক্ষণই সে মানুষ এবং ততক্ষণই তার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে যতই দুর্বল, সামর্থ্যহীন ও মুমূর্ষু হোক না কেন, দেহে আত্মা থাকা পর্যন্ত তার সম্পত্তি করায়ত্ত করে নেওয়ার কিংবা তার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কারোরই নেই। পক্ষান্তরে যখনই তার দেহ থেকে এই আত্মা পৃথক হয়ে যায়, তখন সে যত বড় বীর-পালোয়ানই হোক না কেন, তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতই সুগঠিত ও সুসংহত থাক না কেন, সে আর মানুষ থাকে না। নিজের বিষয়-সম্পত্তিতেও আর তার কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকে না।

হযরত আম্বিয়া (আ.) পৃথিবীতে আগমন করেছেন, মানবাত্মার যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করার জন্য, যাতে তাদের দেহের দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি কাজকর্ম মানবতার পক্ষে কল্যাণকর প্রপিতপন্ন হতে পারে। তারা যেন বিষাক্ত হিংস্র জীব-জানোয়ারের মতো অন্যান্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে না বেড়ায় এবং নিজের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য নিজেই যেন উপাদান সংগ্রহ করে নিতে পারে। আর মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজেও মহানবী হযরত রাসূলে মাকবুল ﷺ -এর মর্যাদা অন্যান্য নবী-রাসূলগণ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। তিনি তাঁর মক্কী জীবনে শুধু মানব সমাজের জন্য কর্মী গঠনের কাজই সম্পাদন করেছেন এবং মানব সম্প্রদায়কে এমন এক সমাজ গঠন করে দিয়েছেন, যার মর্যাদা ফেরেশতাদের চাইতেও উর্ধ্বে। সারা দুনিয়া এর পূর্বে আর কখনো এমন ধরনের মানুষ প্রত্যক্ষ্য করেনি। তাঁদের একেকজন রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রত্যক্ষ মু'জিযার ফসল প্রতীয়মান হয়েছেন। তাঁদের পরবর্তীদের জন্যও তিনি যে শিক্ষা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি রেখে গেছেন, তার পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হলে সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ স্থান লাভ করা যেতে পারে। আর যেহেতু এই শিক্ষা সারা বিশ্বেরই জন্য, সেহেতু তার অস্তিত্ব সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ। অবশ্য এর দ্বারা প্রকৃত মুমিনগণই পরিপূর্ণ উপকার লাভ করেছে।

দ্বিতীয় ও প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করা হয়েছে আয়াতের শেষ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ বাক্যে। এতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, বিপদাপদ যাই এসেছে তা শত্রুর শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে আসেনি; বরং তোমাদের নিজেদেরই কোনো কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুন এসেছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ পালনে তোমাদের শৈথিল্য হয়ে যাওয়া।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَظًّا : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَفْظَاظٌ অর্থ– দুশ্চরিত্র, রুক্ষ, কর্কশ।

لَانْفَضُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفِضَاضُ মূলবর্ণ (ف . ض . ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ঐ সমস্ত লোক ছিটকে যেত সঙ্গ ত্যাগ করত।

يَغُلَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُلُوْلُ মূলবর্ণ (غ . ل . ل) জিনসে مضاعف ثلاثى অর্থ– সে খেয়ানত করবে।

تُوَفّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّوْفِيَةُ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– প্রতিদান দেওয়া হবে।

وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾

অনুবাদ : (১৬৬) আর যে বিপদ তোমাদের উপর পতিত হয়েছে, যেদিন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল, তা আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই হয়েছিল, এবং যেন তিনি মুমিনদেরকেও দেখে নেন।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾

(১৬৭) আর ঐ সকল লোকদেরকেও দেখে নেন যারা মুনাফেকীর কাজ করেছে এবং তাদেরকে এরূপ বলা হয়েছিল যে, আস, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা শত্রুদের প্রতিরোধকারী হয়ে যাও, তারা বলল যদি আমরা কোনো নিয়মিত যুদ্ধ দেখতাম তবে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গী হয়ে যেতাম। এই মুনাফিকরা সে দিন কুফরেরই অধিক নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল ঈমানের নিকটবর্তী হওয়া অপেক্ষা, এরা মুখে এমন উক্তি করে যা তাদের অন্তরে নেই। আর আল্লাহ সমধিক জ্ঞাত আছেন যা কিছু তারা অন্তরে পোষণ করে।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾

(১৬৮) তারা এমন লোক যারা স্বীয় ভাইদের সম্বন্ধে [গৃহে] বসে সমালোচনা করে যদি আমাদের কথা মানত, তবে নিহত হতো না, আপনি বলে দিন আচ্ছা তবে নিজেদের উপর হতে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾

(১৬৯) আর যারা আল্লাহ তা'আলার পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে [অনান্য মৃতের ন্যায়] ধারণা করো না; বরং তারা জীবিত, স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, তারা রিজিকও প্রাপ্ত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৬৬) وَمَآ اَصَابَكُمْ আর যে বিপদ তোমাদের উপর পতিত হয়েছে يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ যেদিন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল فَبِاِذْنِ اللّٰهِ তা আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই হয়েছিল وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং যেন তিনি মুমিনদেরকেও দেখে নেন।

(১৬৭) وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا আর ঐ সকল লোকদেরকেও দেখে নেন যারা মুনাফেকীর কাজ করেছে وَقِيْلَ لَهُمْ এবং তাদেরকে এরূপ বলা হয়েছিল যে। تَعَالَوْا আস قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। اَوِ ادْفَعُوْا অথবা শত্রুদের প্রতিরোধকারী হয়ে যাও। قَالُوْا তারা বলল لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا যদি আমরা কোনো নিয়মিত যুদ্ধ দেখতাম لَّاتَّبَعْنٰكُمْ তবে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গী হয়ে যেতাম هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ এই মুনাফিকরা সে দিন কুফরেরই অধিক নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ঈমানের নিকটবর্তী হওয়া অপেক্ষা يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ এরা মুখে এমন উক্তি করে مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ যা তাদের অন্তরে নেই। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ আর আল্লাহ সমধিক জ্ঞাত আছেন بِمَا يَكْتُمُوْنَ যা কিছু তারা অন্তরে পোষণ করে।

(১৬৮) اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا তারা এমন লোক যারা স্বীয় ভাইদের সম্বন্ধে [গৃহে] বসে সমালোচনা করে لَوْ اَطَاعُوْنَا যদি আমাদের কথা মানত। مَا قُتِلُوْا তবে নিহত হতো না قُلْ আপনি বলে দিন। فَادْرَءُوْا আচ্ছা তবে সরিয়ে দাও عَنْ اَنْفُسِكُمْ নিজেদের উপর হতে الْمَوْتَ মৃত্যুকে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

(১৬৯) وَلَا تَحْسَبَنَّ আর ধারণা করো না। الَّذِيْنَ قُتِلُوْا যারা নিহত হয়েছে فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার পথে اَمْوَاتًا মৃত بَلْ اَحْيَآءٌ বরং তারা জীবিত عِنْدَ رَبِّهِمْ স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত يُرْزَقُوْنَ তারা রিজিকও প্রাপ্ত হয়।

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾

(১৭০) তারা পরিতুষ্ট ঐ সমস্ত বস্তুতে যা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন, আর যারা তাদের নিকট পৌছেনি, পিছনে [দুনিয়াতে] রয়ে গিয়েছে, তাদের এই অবস্থার প্রতিও তারা [শহীদগণ] সন্তুষ্ট হয় যে, তাদেরও কোনো ভয় [জনক অবস্থা] ঘটবে না, এবং তারা বিষণ্ণও হবে না।

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾

(১৭১) তারা আনন্দিত হয় আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের দরুন, আর এই জন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের আমলের প্রতিদান ব্যর্থ করেন না।

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٢﴾

(১৭২) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তার পর যে, তারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, তন্মধ্যে যারা নেককার ও মুত্তাকী তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

(১৭৩) তারা এমন লোক যে, [কোনো কোনো] মানুষ তাদেরকে বলল, নিশ্চয় তারা [কাফেররা] তোমাদের [বিরুদ্ধে যুদ্ধের] জন্য আয়োজন করেছে, সুতরাং তোমাদের তাদেরকে ভয় করা উচিত, পরন্তু তা তাদের ঈমানকে আরো বর্ধিত করে দিল, আর তারা বলল যে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, এবং তিনি যাবতীয় কর্ম সমর্পণের জন্য উত্তম।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৭০) فَرِحِيْنَ তারা পরিতুষ্ট بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ঐ সমস্ত বস্তুতে যা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন مِنْ فَضْلِهٖ স্বীয় অনুগ্রহে وَيَسْتَبْشِرُوْنَ আর তারা ঐসকলের অবস্থার প্রতিও একারণে সে সন্তুষ্ট بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ যারা তাদের নিকট পৌছেনি مِّنْ خَلْفِهِمْ পিছনে রয়ে গিয়েছে اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ তাদেরও কোনো ভয় [জনক অবস্থা] ঘটবে না وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এবং তারা বিষণ্ণও হবে না।

(১৭১) يَسْتَبْشِرُوْنَ তারা আনন্দিত হয় بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের দরুন وَّاَنَّ اللّٰهَ আর এই জন্য যে, আল্লাহ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদের আমলের প্রতিদান ব্যর্থ করেন না।

(১৭২) اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে مِنْ بَعْدِ তার পর যে مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ তারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ তন্মধ্যে যারা নেককার وَاتَّقَوْا ও মুত্তাকী اَجْرٌ عَظِيْمٌ তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।

(১৭৩) اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ তারা এমন লোক যে, [কোনো কোনো] মানুষ তাদেরকে বলল اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ নিশ্চয় তারা [কাফেররা] তোমাদের [বিরুদ্ধে যুদ্ধের] জন্য আয়োজন করেছে فَاخْشَوْهُمْ সুতরাং তোমাদের তাদেরকে ভয় করা উচিত فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا পরন্তু তা তাদের ঈমানকে আরো বর্ধিত করে দিল وَّقَالُوْا আর তারা বলল যে حَسْبُنَا اللّٰهُ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এবং তিনি যাবতীয় কর্ম সমর্পণের জন্য উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৬৮) قوله الَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** অত্র আয়াতটি মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। ওহুদের যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলমানরা বিজয় লাভ করলে পরে তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের কারণে মুসলমানরা কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এমনকি মুসলমানদের কিছু সংখ্যক শাহাদাতও বরণ করেন। ফলে মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগল যে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত এবং যুদ্ধে গমন না করত। তাহলে মৃত্যুবরণ করত না। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত উক্তিকে খণ্ডন করে উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

(১৭১) قوله وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কথিত আছে, আলোচ্য আয়াত বীরে মাউনায় শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মতান্তরে সকল শহীদগণ সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : সুনানে আবূ দাউদ মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা গ্রন্থে বিশুদ্ধতম সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ওহুদ অভিযানে আমাদের যে সকল ভাইয়েরা শাহাদাত বরণ করেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সবুজ পাখির অভ্যন্তরে স্থান করে দেন। পাখিগুলো জান্নাতের উদ্যানসমূহে ও নদ-নদীতে গমন করে। জান্নাতের উদ্যান থেকে ফল-মূল খায় এবং নিচে ঝুলন্ত স্বর্ণের প্রদীপটির দিকে আসে। অতঃপর তারা যখন তাদের খাদ্য-পানীয় ও বিশ্রামের স্থানে আনন্দ-উপভোগ করে, তখন তারা বলে, আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের ভাইদেরকে এ সু-সংবাদ পৌছে দিবে কে যে, আমরা জান্নাতে রিজিক প্রাপ্ত হয়ে জীবিত আছি। তারাও যেন জিহাদের প্রতি উদাসীন না থাকে ও ক্লান্ততা বোধ না করে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের পক্ষ থেকে এ খবর আমি নিজেই পৌছে দিব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

শানে নুযূল– ৩ : বাকী বিন মুখাল্লাদ হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার সাথে রাসূল ﷺ -এর সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বলেন, হে জাবের! তোমাকে আমি এত হতোদ্যম ও ভগ্ন হৃদয় দেখতে পাচ্ছি কেন? তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা শাহাদাত বরণ করেছেন এবং ছেলেমেয়ে রেখে গেছেন, তদুপরি তার উপর রয়ে গেছে ঋণের বোঝা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি কি তোমাকে সু-সংবাদ শুনাব না? তোমার পিতার সাথে আল্লাহ তা'আলার কিভাবে সাক্ষাৎ হয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! বলুন, তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, আল্লাহ তোমার পিতাকে জীবিত করে পর্দাহীনভাবে মুখোমুখি কথা বলেছেন। তা ছাড়া আর কারো সাথে এমনভাবে কথা বলেননি। তখন তাকে বলেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমাকে যা দিয়েছি, তা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেই করেছি। তখন সে বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দুনিয়াতে আবার প্রেরণ কর, তা হলে আবারও আমি তোমার পথে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করব। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমার পক্ষ থেকে তা পূর্ব নির্ধারিত যে তারা দুনিয়াতে পুনরায় প্রত্যাবর্তিত হবে না। তখন সে বলল, হে আল্লাহ! তা হলে আমার পিছনে যারা রয়েছে তাদের নিকট তুমিই আমার সংবাদটুকু পৌছে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৪ : হযরত আবূ যুহা বলেন, বিশেষ করে ওহুদের যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৫ : কারো মতে বদর অভিযানে শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা ছিলেন সর্বমোট ১৪ জন সাহাবী। (৮ জন আনসারী, ৬ জন মুহাজির)

শানে নুযূল– ৬ : হযরত সাঈদ বিন জুবাইর বলেন, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব ও মুসআব বিন উমাইয়ার (রা.) যখন শাহাদাত বরণ করলেন, তখন তাদেরকে যে রিজিক প্রদান করা হচ্ছে তা তারা দেখতে পাচ্ছে। অবস্থা দৃষ্টে তারা বলল, হায়, আফসোস! আমাদের ভাইয়েরা যদি জানতে পারত আমরা কি ধরনের কল্যাণমূলক প্রতিদান পেয়েছি, তা হলে জিহাদে তাদের আগ্রহ অতি বেড়ে যেত। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমাদের পক্ষ থেকে আমি এ সংবাদটুকু পৌছে দিচ্ছি। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত– ৩ : ১১৭, কুরতুবী–৪ : ২৬১, ফাতহুল কাদীর–১ : ৪০১, রুহুল মা'আনী– ২-৪ : ১২১, ইবনে কাছীর–১ : ৪২৭, আসবাবুন নুযূল নাসাপুরী, ৭৮-৭৯]

(১৭২) قوله الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত আবূ হাতেম ও তাবারানী বিশুদ্ধতম সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা যখন ওহুদ থেকে ফিরে এলো, তখন তারা পরস্পরে বলল, তোমরা মুহাম্মদকে তো হত্যা করনি। পিছনে তাড়াও করনি, তোমরা কতইনা জঘন্যতরের কাজ করেছ।

কাজেই তোমরা ফিরে চল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে ফেলেন। সুতরাং রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য আহবান করেন। তারাও যুদ্ধের জন্য সাড়া দিয়ে হামরাউল আসাদ অথবা আবূ উৎবা কূপের সন্নিকট পর্যন্ত পৌছেন। তখন মুশরিকরা বলল, আগামী বৎসর আসবে। ফলে রাসূল ﷺ ফিরে চলে গেলেন। এ অভিযানকেও গাযওয়া বলা হয়। তখন সে অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর ও বায়হাকী আব্দুল্লাহ বিন আবূ বকর বিন মুহাম্মদ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হামরাউল আসাদের উদ্দেশ্যে বের হন। আবূ সুফিয়ানও রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্য তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে একত্রিত হয়ে বলল, আমরা ইতঃপূর্বে তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্য গিয়েছিলাম, তাদের স্থায়িত্বতাকে আমরা কখনো সহ্য করি না। তার নিকট খবর পৌছল যে, রাসূল ﷺ তদ্বীয় সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তাদের অনুসন্ধানে বের হয়েছেন। আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীদের মাঝে ভয়ের সঞ্চার হলো, এমতাবস্থায় আব্দে কায়স থেকে এক দল অশ্বারোহী আসছিল, তখন আবূ সুফিয়ান তাদেরকে বলে দিল, মুহাম্মদকে তোমরা বলে দিও যে, তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ সকলকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য আমরা জমায়েত হচ্ছি। অতঃপর সে অশ্বারোহীদল যখন হামরাউল আসাদ হয়ে রাসূল ﷺ-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তারা রাসূল ﷺ-কে আবূ সুফিয়ান যা বলেছিল, সে সম্পর্কে সংবাদ জানাল ফলে রাসূল ﷺ এবং সকল মুসলমানরা এক সাথে বললেন حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ সাহাবায়ে কেরামের সে দৃঢ় মনোবল দেখানোর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুলকাদীর ১ : ৪০১]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আবূ সুফিয়ান ও তার সহচররা অনেক মুসলমানকে হতাহত করে ফিরে গেল। রাসূল ﷺ তখন বললেন, আবূ সুফিয়ান তো অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তার অন্তরে ভয় ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং তাকে উদ্দেশ্য করে কে বের হবে। তখন নবী করীম ﷺ নিজে দাঁড়ালেন, সাথে সাথে হযরত আবূ বকর, ওমর, উসামন, আলী এবং আরো অনেক সাহাবী তাঁর সাথে চললেন। তখন আবূ সুফিয়ান জানতে পারল যে, রাসূল ﷺ তাঁর সাথীগণকে নিয়ে তার অনুসন্ধান করছেন। ফলে একটি বণিক দলের সাথে সাক্ষাৎ হলে সে বলে দিল যে, তোমরা মুহাম্মদকে জানিয়ে দিবে যে, তোমাদের জন্য এমন বিশাল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে, পক্ষান্তরে তারাও জানে আমরা জমায়েত হচ্ছি। পরন্তু তাদের প্রতি অভিযানে আমিও যাব নিশ্চিত। সুতরাং তারা রাসূল ﷺ কে এ সংবাদ জানাল তিনি বলেন حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ১ : ৪৩০]

কুরাইশ বাহিনী যখন ওহুদ যুদ্ধ শেষে মদিনা হতে ফেরার পথে রওহা নামক স্থানে অবস্থান করল, তখন তাদের ধারণা জাগল যে, আমাদের কাজ অসম্পন্ন থেকে গেল। মুহাম্মদের অনেক অনুচরকে হত্যা করলাম এবং শত শত লোককে ক্ষত বিক্ষতও করলাম, সুতরাং মদিনায় ফিরে গিয়ে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করার উপযুক্ত সময় এখন। কারণ মুসলমানরা এসময়ে সম্পূর্ণরূপেই ক্ষত বিক্ষত। এ অবস্থায় মোকাবিলা করার কোনো সাহস পাবে না। সাফওয়ান বিন উমাইয়া বলল, এখন মক্কায় ফিরে যাওয়াই সমীচীন। মুহাম্মদের সাথীরা এ মুহূর্তে উদ্যোপিত হয়ে রয়েছে। দ্বিতীয়বার আক্রমণে তোমরা সফল নাও হতে পার।

১৫ই শাওয়াল শনিবার দিন সন্ধ্যাবেলা কুরাইশ বাহিনী রওহা নামক স্থানে এবং শনিবার রাতে এ আলোচনা হয়েছিল। সে রাতেই ফজরের সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংবাদ বাহক এ সুসংবাদ নিয়ে এলো। হযরত রাসূল ﷺ তৎক্ষণাত হযরত বিলাল (রা.)-কে পাঠিয়ে মদিনায় ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, জিহাদে বের হওয়ার জন্য তোমরা প্রস্তুতি নিয়ে নাও। আর এ অভিযানে ওহুদে অংশগ্রহণকারী যারা কেবল তারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! ওহুদ যুদ্ধে আমার পিতা শাহাদাত বরণ করেছেন। আমার বোনদের দেখাশুনা করার কারণে ওহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। এবার আমি আপনার সাথে যাওয়ার অনুমতি চাই। রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। এ অভিযান দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুপক্ষ যেন মুসলমানরা দুর্বল হয়ে গেছে এমন কোনো ধারণা না করে। যার দরুন তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়েও একটি রাত্র বিশ্রাম গ্রহণ না করে সে সাহাবীগণসহ আবারো দাঁড়িয়ে গেলেন।

১৬ই শাওয়াল রবিবার সারাদিন পথ চলে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌছে অবস্থান গ্রহণ করেন। হামরাউল আসাদ ও মদিনার মাঝে ব্যবধান ছিল ৮/১০ মাইলের দূরত্ব। খুযাআ গোত্রের দলপতি মা'বাদ খুযাই ওহুদের পরাজয়ের কথা শুনে

সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য উপস্থিত হয়। রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণের সমবেদনা জ্ঞাপনের পর মা'বাদ বিদায় নিয়ে আবূ সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করে। আবূ সুফিয়ান পুনরায় মদিনায় আক্রমণ করার কথা ব্যক্ত করল। মা'বাদ বলল, মুহাম্মদ তো বিশাল বাহিনী নিয়ে মোকাবিলা ও পশ্চাদ্ধাবনের জন্য বের হয়ে পড়েছে। আবূ সুফিয়ান এ কথা শুনেই মক্কা ফিরে গেল। রাসূল ﷺ তিন দিন অপেক্ষা করে শুক্রবার দিন ফিরে এলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতদ্বয় নাজিল করেন। –[সীরাতে মুস্তফা–২ : ২৫৫] –[আসবাবুন নুযূল নাসা]

(১৭৩) قوله اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ الخ আয়াতের শানে নুযূল : কিছু সংখ্যক মুফাসসিরীনের মতে উক্ত আয়াতটি ছোট বদর যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান বদর যুদ্ধের দিন বলেছিল যে, 'আগামী বছর তোমাদের ও আমাদের মাঝে বদর ময়দানে ফয়সালা হবে।' পরের বৎসর আবূ সুফিয়ান নাঈম বিন মাসউদ আশজায়ীকে কিছু দেওয়ার বিনিময়ে ঠিক করে যে, মুসলমানদেরকে আমাদের সম্পর্কে ভয় দেখাবে, যাতে তারা বদর আগমন স্থগিত রাখে, নাঈদ মদিনায় এসে নানারূপ ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। তখন মুসলমানরা حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ছাড়া অন্য কোনো কথা বলল না। রাসূল ﷺ ওহুদের গাজী ও অন্যান্য সাহাবীদের নিয়ে বদরে পৌঁছলেন এবং সেখানে ৮দিন অবস্থান করেন। ইসলামি বাহিনীর ভয়ে কুরাইশরা আর সেখানে আসেনি। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

অতঃপর فَبِاِذْنِ اللّٰهِ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব যা কিছু হয়েছে, সবই আল্লাহর ইচ্ছা ও সমর্থনে হয়েছে যাতে নিহিত রয়েছে বহু হিকমত ও রহস্য। সেসব রহস্যের কিছু কিছু ইতঃপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তবে একটি রহস্য হচ্ছে এই যে, এভাবে আল্লাহ নিঃস্বার্থ মুমিনগণকেও দেখে নিবেন। অর্থাৎ, যাতে মুমিনদের নিঃস্বার্থতা এবং মুনাফিকদের প্রতারণা এমনভাবে প্রকৃষ্ট হয়ে যায় যাতে যে কোনো লোক তা দেখে নিতে পারে। এখানে আল্লাহর দেখে নেওয়ার অর্থ হলো এই যে, পৃথিবীতে দেখার যেসব উপায় প্রচলিত রয়েছে, সে অনুযায়ী দেখে নেওয়া। অন্যথা আল্লাহ তো সর্বক্ষণই প্রত্যেক বস্তু ও বিষয় দেখছেন। বস্তুতঃ এই রহস্যটি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, কঠিন বিপদের সময় মুনাফিকরা সরে দাঁড়িয়েছে, আর নিঃস্বার্থ মুমিনরা যুদ্ধে অনড়-অটল রয়েছেন।

এভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার আরো একটি কারণ এই যে, এ যুদ্ধে যেসব মুসলমান শহীদ হয়েছেন, তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমন সব প্রতিদান দিয়েছেন, অন্যান্যদেরও তার প্রতি ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا আয়াতে শহীদদের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণকারীদের বিশেষ মর্যাদা : এ আয়াতে শহীদগণের বিশেষ মর্যাদার বিবরণ বিধৃত হয়েছে। এছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, শহীদদের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। কাজেই হাদীসের রেওয়ায়েতে যেসব দিক বর্ণিত হয়েছে, তাও বিভিন্ন অবস্থারই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

এ আয়াতে শহীদদের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, তাঁদের অনন্ত জীবন লাভকে। অতঃপর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁদের রিজিক প্রাপ্তি।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ আয়াতে, বলা হয়েছে তারা সদা-সর্বক্ষণ আনন্দমুখর থাকবেন। যে সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ তাঁদেরকে দান করবেন সেগুলোর মধ্যে চতুর্থটি হলো وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ অর্থাৎ, তাঁরা নিজেদের যেসব উত্তরসুরিকে পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারেও তাদের এ আনন্দ অনুভূত হয় যে, তাঁরাও পৃথিবীতে থেকে সৎকাজ ও জিহাদে নিয়োজিত রয়েছেন। ফলে তাঁরাও এখানে এসে এমনি সব নিয়ামত এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন।

আর সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেছেন, শহীদের আত্মীয়-বন্ধুর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তি এখন তোমার নিকট আসছেন। তখন তিনি তেমনি আনন্দিত হন, যেমন পৃথিবীতে বহু দূরের কোনো বন্ধুর সাথে সুদীর্ঘ সময়ের পর সাক্ষাৎ হলে হয়ে থাকে।

এ আয়াতের যে শানে নুযূল হযরত আবূ দাউদ (র.) বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তা হলো এই, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে বললেন, ওহুদের ঘটনায় যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হন তখন আল্লাহ তাঁদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখির পালকের ভিতরে স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের ঝর্ণা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিজিক আহরণ করেন এবং অতঃপর তারা সেই আলোক ধারায় ফিরে আসেন। যা

তাঁর জন্য আল্লাহর আরশের নিচে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন তারা নিজেদের জন্য আনন্দ ও শান্তিময় এ জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, আমাদের আত্মীয়-আপনজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত; আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, 'যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জিহাদে অংশগ্রহণের চেষ্টা করে।' তখন আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের এ সংবাদ তাদেরকে পৌছে দিচ্ছি।' এর প্রেক্ষিতে وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

এ যুদ্ধের ঘটনাটি এই , মক্কার কাফেররা যখন ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে এলো, তখন পথে এসে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটি কঠিন আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত মুসলমানকে খতম করে দেওয়াই উচিত ছিল। সুতরাং তারা পুনরায় মদিনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তারা সোজা মক্কার পথ ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদিনাযাত্রী কোনো কোনো পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল যে, তোমরা সেখানে গিয়ে কোনো প্রকারে মুসলমানদের মনে আমাদের ভয় বিস্তার করবে যে, তারা আবার এদিকে ফিরে আসছে। এ ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে হুজুর ﷺ জানতে পারলেন। কাজেই তিনি হামরাউল আসাদ পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। –[ইবনে জারীর, রূহুল বয়ান]

আর সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন, কে আছে, যারা মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন সত্তর জন সাহাবী প্রস্তুত হলেন, যাঁদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যাঁরা গত কালকের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করছিলেন। এরাই রাসূলে মাকবূল ﷺ -এর সাথে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। যখন তাঁরা হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়ে পৌছলেন, তখন সেখানে নোআইম ইবনে মাসউদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে সংবাদ দিল যে, আবূ সুফিয়ান নিজের সাথে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মদিনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত দুর্বল সাহাবায়ে কেরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা তা জানি না। حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।

এদিকে মুসলমানদেরকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এ সংবাদ দেওয়া হলো, কিন্তু মুসলমানগণ তাতে কোনোরূপ প্রভাবান্বিত হলেন না; অপরদিকে বনী খোযাআহ গোত্রের মা'বাদ ইবনে খোযা'আহ নামক এক ব্যক্তি মদিনা থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিল। যদিও সে লোকটি মুসলমান না কিন্তু মুসলমানদের হিতার্থী ছিল এবং তার গোত্র ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ। কাজেই রাস্তায় মদিনা প্রত্যাগত আবূ সুফিয়ানকে যখন দেখতে পেল যে সে নিজেদের প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করছে এবং পুনরায় মদিনা আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা করছে। তখন সে আবূ সুফিয়ানকে বলল, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ যে, মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি তাদের বিরাট বাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখে এসেছি, যারা কিনা পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। এ সংবাদ আবূ সুফিয়ানের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিল।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে এ ঘটনারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহর উপর রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের চাইতে অধিক তাওয়াক্কুল তো দুনিয়ার অন্য কারো মধ্যে থাকতেই পারে না, কিন্তু তাঁদের তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা এমন ছিল না যে, বাহ্যিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি পরিহার করে বসে থাকতেন এবং বলতেন যে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি বসিয়ে বসিয়েই আমাদেরকে বিজয় দান করবেন। কিন্তু তা নয়; বরং তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত করলেন, আহত মানুষে মনে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করলেন, জিহাদের জন্য তাদেরকে তৈরি করলেন এবং রওয়ানা হয়ে গেলেন। বস্তুতঃ নিজের আয়ত্তে যত রকম ব্যবস্থা ছিল সে সবই তিনি করলেন এবং তারপরে বললেন, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এটাই হলো সেই সঠিক ও যথার্থ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা, যার শিক্ষা কুরআনে দেওয়া হয়েছে। আর রাসূলে কারীম ﷺ ও এরই উপর আমল করেছেন এবং করিয়েছেন। তাছাড়া বাহ্যিক ও পার্থিব উপকরণসমূহও আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহের দান। এগুলোকে বর্জন করা তাঁর অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। তদুপরি স্বাভাবিক উপকরণাদি বর্জন করে তাওয়াক্কুল করা রাসূলে কারীম ﷺ -এর সুন্নত নয়।

রাসূলে কারীম ﷺ স্বয়ং কোনো এক ঘটনার প্রেক্ষিতে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ এ আয়াত সম্পর্কেই পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন–

হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দু' ব্যক্তির মোকদ্দমা উপস্থিত হলে তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন। এই মীমাংসটি যে লোকের বিরুদ্ধে গেল তিনি গভীর মনোযোগের সাথে তা শুনলেন এবং এ কথা বলতে বলতে চলে যেতে লাগলেন حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ হুজুর ﷺ বললেন, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আস। তারপর বললেন "আল্লাহ হাত-পা ভেঙ্গে বসে থাকা পছন্দ করেন না; বরং তোমাদের উচিত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর নরম হয়ে যাওয়া এবং 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কারক' বলে ঘোষণা করা।"

তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জিহাদের জন্য রওয়ানা হওয়া এবং হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' বলার উপকারিতা, ফলশ্রুতি ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে– 'এরা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এলো। তাতে তাদের কোনো রকম অসন্তোষ হলো না। আর তারা হলো আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত।

আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে তিনটি নিয়ামত দান করেছেন।

প্রথম নিয়ামত হলো এই যে, কাফেরদের মনে তাঁদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন এতে তারা পালিয়ে গেল। ফলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিরাপদ রইলেন। এ নিয়ামতকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত শব্দেই উল্লেখ করলেন। **দ্বিতীয় নিয়ামত এই যে,** হামরাউল আসাদের বাজারে তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্যের যে সুযোগ হয়েছিল এবং তাতে তাঁরা যে লাভবান হয়েছিলেন, তাকেই বলা হয়েছে 'ফযল'।

তৃতীয় নিয়ামতটি হলো : আল্লাহর রেজামন্দী বা সন্তুষ্টি লাভ যা সমস্ত নিয়ামতের উর্ধ্বে এবং যা এই জিহাদে তাঁদেরকে বিশেষ ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে।

কুরআনে কারীম حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আয়াতে যেসব লাভ ও উপকারিতার কথা বর্ণনা করেছে, তা শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না; বরং যে কেউ পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা সহকারে এর জপ করবে, সেই এ সমস্ত বরকত লাভে সমর্থ হবে।

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পাঠের উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ওলামা ও মাশায়েখগণ লিখেছেন যে, এ আয়াতটি পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা ও স্থির বিশ্বাসের সাথে এক হাজার বার পাঠ করে কোনো দোয়া করা হলে আল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করেন না। দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদের সময় حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পাঠ করা পরীক্ষিত।

শব্দ বিশ্লেষণ

اِلْتَقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِلْتِقَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পরস্পরে মুখোমুখি হলো।

اِدْرَءُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلدَّرْءُ মূলবর্ণ (د ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তোমরা দূর কর।

اَمْوَاتًا : শব্দটি বহুচন, একবচন ميت অর্থ– মৃত, মৃত্যুবরণকারী।

اَحْيَاءٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন حى অর্থ– জীবিত।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا : এখানে لَا تَحْسَبَنَّ ফে'ল যমীরে هو ফা'য়েল الذين ইসমে মাওসূল قُتِلُوْا ফে'ল যমীরে هُمْ নায়েবে ফা'য়েল فِيْ হরফে জার سَبِيْل মুযাফ اللّٰهِ শব্দটি মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور হলো। جار ও مجرور মিলে متعلق হলো। فعل ـ نائب فاعل ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে صله। অতঃপর موصول ও صله মিলে প্রথম مفعول আর اموات দ্বিতীয় মাফউল। فعل তার দুটি মাফউল মিলে جُمْلَه فِعْلِيَّه হলো।

قوله وَاَنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ : এখানে ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اللّٰهَ শব্দটি اِنَّ এর ইসম لَا يُضِيْعُ ফে'ল যমীরে هُوَ ফা'য়েল اَجْرَ মুযাফ اَلْمُؤْمِنِيْنَ মুযাফ ইলাইহ। مضاف ও مضاف اليه মিলে مفعول হলো। فعل ـ فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে ان এর খবর। সুতরাং ان তার اسم ও خبر নিয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة হলো।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ (١٧٤)

অনুবাদ : (১৭৪) সুতরাং তারা প্রত্যাবর্তন করল আল্লাহর নিয়ামত এবং অনুগ্রহে পরিপুষ্ট হয়ে, তাদেরকে অসুবিধা মোটেই স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত রয়েছে, আর আল্লাহ অতি অনুগ্রহশীল।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۠ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٧٥)

(১৭৫) তারা শয়তান ভিন্ন আর কিছু নয়, সে [তোমাদেরকে] স্বীয় বন্ধুদের ভয় প্রদর্শন করে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٧٦)

(১৭৬) আর আপনার জন্য ঐ সমস্ত লোক চিন্তার কারণ না হওয়া উচিত, যারা দ্রুত কুফরিতে লিপ্ত হয়, নিশ্চয়, তারা আল্লাহর [দীনের] একটুও অনিষ্ট করতে পারবে না, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাদেরকে পরকালে আদৌ কোনো অংশ না দেন, এবং তাদের কঠোর শাস্তি হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٧٧)

(১৭৭) নিশ্চয় যারা ঈমানের স্থলে কুফরকে গ্রহণ করেছে, তারা আল্লাহর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না, আর তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।

শাব্দিক নুবাদ

(১৭৪) فَانْقَلَبُوْا সুতরাং তারা প্রত্যাবর্তন করল بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ আল্লাহর নিয়ামত এবং অনুগ্রহে পরিপুষ্ট হয়ে لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ তাদেরকে অসুবিধা মোটেই স্পর্শ করেনি وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত রয়েছে وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ আর আল্লাহ অতি অনুগ্রহশীল।

(১৭৫) اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ তারা শয়তান ভিন্ন আর কিছু নয় يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ সে [তোমাদেরকে] স্বীয় বন্ধুদের ভয় প্রদর্শন করে فَلَا تَخَافُوْهُمْ সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না وَخَافُوْنِ এবং আমাকেই ভয় কর اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা মুমিন হও।

(১৭৬) وَلَا يَحْزُنْكَ আর আপনার জন্য ঐ সমস্ত লোক চিন্তার কারণ না হওয়া উচিত الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ যারা দ্রুত কুফরিতে লিপ্ত হয় اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا নিশ্চয়, তারা আল্লাহর [দীনের] একটুও অনিষ্ট করতে পারবে না يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ তাদেরকে আদৌ না দেন حَظًّا কোনো অংশ فِى الْاٰخِرَةِ পরকালে وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ এবং তাদের কঠোর শাস্তি হবে।

(১৭৭) اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ নিশ্চয় যারা কুফরকে গ্রহণ করেছে بِالْاِيْمَانِ ঈমানের স্থলে لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا তারা আল্লাহর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ আর তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

অনুবাদ : (১৭৮) আর যারা কুফরি করছে তারা যেন কখনো এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছি, তা তাদের উপকারের জন্য আমি তাদেরকে অবকাশ দেই। যেন তাদের পাপ আরো বৃদ্ধি পায়, আর তাদের লাঞ্ছনাময় শাস্তি হবে।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

(১৭৯) আল্লাহ মুসলমানদেরকে এই অবস্থায় রাখতে চান না যে অবস্থায় তোমরা এখন [বর্তমান] আছ, যে পর্যন্ত না অপবিত্রকে পবিত্র হতে পৃথক করেন, এবং আল্লাহ এরূপ অদৃশ্য বিষয় তোমাদেরকে অবহিত করেন না, হ্যাঁ, তবে আল্লাহ স্বয়ং যাকে চান তাঁকে [পরিজ্ঞাত করার জন্য] মনোনীত করেন– আর তাঁরা আল্লাহর পয়গম্বর হবেন, সুতরাং এখন আল্লাহর এবং তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ঈমান আন, আর যদি তোমরা ঈমান আন, এবং পরহেজ কর তা হলে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾

(১৮০) আর কখনো যেন ধারণা না করে এরূপ লোক, যারা কৃপণতা করে ঐ বস্তুতে যা তাদেরকে আল্লাহ স্বীয় করুণায় দান করেছেন– তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে; বরং তা তাদের জন্য খুবই অমঙ্গলজনক, তাদেরকে কিয়ামতের দিন তওক পরিয়ে দেওয়া হবে, তার [ঐ মালের] যাতে তারা কৃপণতা করেছিল, বস্তুত অবশেষে আসমান ও জমিন আল্লাহ তা'আলারই থেকে যাবে, আর আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

(১৭৮) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا আর যারা কুফরি করেছে তারা যেন কখনো এ ধারণা না করে যে اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছি خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ আমি তাদেরকে শুধুমাত্র এজন্য অবকাশ দিচ্ছি لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا যেন তাদের পাপ আরো বৃদ্ধি পায় وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ আর তাদের লাঞ্ছনাময় শাস্তি হবে।

(১৭৯) مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ আল্লাহ মুসলমানদেরকে এই অবস্থায় রাখতে চান না عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ যে অবস্থায় তোমরা এখন [বর্তমান] আছ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ যে পর্যন্ত না অপবিত্রকে পবিত্র হতে পৃথক করেন وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ এবং আল্লাহ এরূপ অদৃশ্য বিষয় তোমাদেরকে অবহিত করেন না مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ তার রাসূলগণ থেকে যাকে চান وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ হ্যাঁ, তবে আল্লাহ স্বয়ং মনোনীত করেন– فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ সুতরাং এখন আল্লাহর এবং তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ঈমান আন। وَاِنْ تُؤْمِنُوْا আর যদি তোমরা ঈমান আন। وَتَتَّقُوْا এবং পরহেজ কর فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ তা হলে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।

(১৮০) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ আর কখনো যেন ধারণা না করে এরূপ লোক, যারা কৃপণতা করে ঐ বস্তুতে بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ যা তাদেরকে আল্লাহ স্বীয় করুণায় দান করেছেন– هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ বরং তা তাদের জন্য খুবই অমঙ্গলজনক سَيُطَوَّقُوْنَ তাদেরকে তওক পরিয়ে দেওয়া হবে مَا بَخِلُوْا بِهٖ তার [ঐ মালের] যাতে তারা কৃপণতা করেছিল يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ বস্তুত অবশেষে আসমান ও জমিন আল্লাহ তা'আলারই থেকে যাবে وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৭৪) قوله فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আতিয়্যা ও জমহুরে মুফাসসিরীন বলেন, সঠিক মতানুসারে এ আয়াত গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ সেখান থেকে নিরাপদভাবে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং সাথে সাথে বাণিজ্য করে লাভবান হয়ে তারা প্রত্যাবর্তন করেন। সে প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত– ৩ : ১২৪]

(১৭৬) قوله وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** এ আয়াতে এমন সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর মুশরিকদের ভয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। এতে রাসূল ﷺ অত্যন্ত চিন্তিত হন। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : কালবী বলেন, আলোচ্য আয়াতে যাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তারা হলো মুনাফিক ও ইহুদি দলপতি ও নেতৃবর্গ যারা রাসূল ﷺ-এর পরিচিতিসমূহকে গোপন করে রেখেছিল, তখন আলাচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : আহলে কিতাব সম্প্রদায় যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে, তখন তা রাসূল ﷺ-এর নিকট অত্যন্ত কষ্টদায়ক অনুভব হলো। কারণ অন্য সকল মানুষেরা তাদের প্রতি লক্ষ্য করে অপেক্ষমান ছিল। পক্ষান্তরে মানুষেরা বলত যে, তারা তো আহলে কিতাব। তাঁর কথা যদি সত্য হতো, তাহলে তারা তো ইসলাম গ্রহণ করত। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে এ আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী– ৪ : ২৭৭, বাহরে মুহীত– ৩ : ১২৬]

(১৭৮) قوله وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত ইহুদি খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত আতা (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত বনূ কুরাইযা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মুকাতিল বলেন, মক্কার মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। হযরত যাজ্জাজ (র.) বলেন, এরা এমন একটি সম্প্রদায় যে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তদীয় নবীকে জানিয়ে দিলেন যে, এরা কখনো ঈমান গ্রহণ করবে না। –[বাহরে মুহীত– ৩ : ১২৮]

(১৭৯) قوله مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আবুল আলিয়া বলেন, মুমিন লোকেরা ঈমানদার এবং মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য করা যায় মতো কতিপয় পরিচিতি প্রদান করার জন্য আবেদন জানালেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তন্মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যাহহাক, মুকাতিল, কালবী ও অধিকাংশ কুরআন ব্যাখ্যা কারকগণ বলেন যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাফের ও মুনাফিকদের কে সম্বোধন করা হচ্ছে। ওরা নবী করীম ﷺ কে বলত, যে ব্যক্তি আপনার ধর্ম ত্যাগ করে তাকে আপনি জাহান্নামী বলেন আর যে ব্যক্তি আপনার ধর্মের অনুসরণ করে তাকে আপনি জান্নাতী বলছেন। অতএব, আপনি বলুন এ সংবাদ আপনি কোথা হতে পেলেন? আমাদের হতে কারা আপনার পাশে আসবে? আর কারা আপনার নিকট আসবে না? তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী : ৪ : ১৮০, বাহরে মুহীত : ৩ : ১৩০]

(১৭৯) قوله وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** এখানে গায়েব দ্বারা যা মানুষ থেকে অনুপস্থিত রয়েছে তাকে বুঝানো হয়েছে। ভবিষ্যত বিষয় সংক্রান্ত যা আল্লাহ তা'আলার নিজ ইলমে এবং মুনাফিকদের অন্তরে গোপনে যে কুটচাল নিহিত রয়েছে ও লোক সমাজের অন্তরালে গিয়ে এরা যা কিছু বলে এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শানে নুযূল–২ : যাজ্জাজ ও কতিপয় কুরআন ব্যাখ্যাকার বলেন, তা মক্কার কোনো কোনো কাফেরের দাবি ছিল। আমরা সকলেই নবী হলাম না কেন? তখন তাদের এ অযৌক্তিক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কারো মতে এরা বলেছিল যে, মুহাম্মদ বিষয়ে আমাদের নিকট কোনো ওহী আসছে না কেন? তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কারো মতে তারা বলত, আমরা তো দলবল ও জনবল দিয়ে তদাপেক্ষা শক্তিশালী। তদুপরি আমাদের প্রতি কেন ওহী আসে না? তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। কারো মতে জিন শয়তানেরা

আসমানে আরোহণ করত। তখন সেখান থেকে চুরি করে ফেরেশতাদের কথা শুনে আসত। অতঃপর অজানা অনেক কথা তাদের জ্যোতিষী ও গণকদের নিকট এসে সম্প্রচার করত। তা ছিল নবী করীম ﷺ আগমনের পূর্বে। তবে নবী করীম ﷺ আগমনের পর তাদের জন্য উচ্চাকাশে আরোহণ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়, সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[বাহরে মুহীত : ২ : ১৩২]

(১৮০) قوله وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : সুদ্দী ও এক জামাত কুরআন ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, মাল নিয়ে কার্পণ্যতা করা ও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কৃপণতা করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস, আতিয়ার এক বর্ণনা, মুজাহিদ ইবনে জুরাইজ এক জামাত মুফাসসিরীন এবং আল্লামা মাজ্জাজ অভিমত হলো, আলোচ্য আয়াত আহলে কিতাবের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের কার্পণ্য হলো মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা জানিয়েছেন, তা সঠিকভাবে বর্ণনা করতে কার্পণ্য করত। সে কার্পণ্য করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে জাকাত প্রদান করতে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। হযরত ইবনে মাসঊদ ও হযতর আবূ হুরায়রা (রা.)-এর অভিমত তা-ই।

শানে নুযূল –৩ : হযরত ইবনে আব্বাস, আবূ সালেহের এক বর্ণনা, শা'বী, মুজাহিদ প্রমুখ- এর মতানুসারে নিজের পারিবারিক ব্যয়ে এবং আত্মীয় স্বজনের পিছনে ব্যয় করতে কার্পণ্য কারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।–[বাহরে মুহীত– ৩ : ১৩৩, রূহুল মা'আনী ৪ : ১৪০, কুরতুবী : ৪ : ২৮২]

হযরত ইবনে জারীর ও ইবনে আবূ হাতেম, ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, এ আয়াত আহলে কিতাবের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাওরাতে উল্লিখিত রাসূল ﷺ -এর পরিচিতি ও তাঁর নবীত্বের প্রমাণাদিকে গোপন করেছে। সুতরাং بُخْل দ্বারা كِتْمَانُ الْعِلْمِ তথা ইলমকে গোপন করা এবং তাওরাতের মর্যাদাকে গোপন করা যে মর্যাদা তাকে দেওয়া হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৪০/২/১]

কাফেরদের পার্থিব ভোগ-বিলাসও প্রকৃতপক্ষে আজাবেরই পরিপূর্ণতা : এ ক্ষেত্রে কেউ যেন এমন কোনো সন্দেহ না করে যে, আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে অবকাশ, দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য-সামর্থ্য ও আরাম-আয়েশের উপকরণ এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের অপরাধ প্রবণতায় অধিকতর এগিয়ে যায়, তাহলে তো কাফেররা নির্দোষ। কারণ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এই যে, কাফেরদের সামান্য কয়েক দিনের এ অবকাশ ও ভোগ-বিলাসে যেন মুসলমানরা পেরেশান না হয়। কেননা কুফর ও পাপ সত্ত্বেও তাদেরকে পার্থিব শক্তি সামর্থ্য ও বৈভব দান করাটাও তাদের শাস্তিরই একটি পন্থা, যার অনুভূতি আজকে নয় এই পৃথিবী থেকে যাবার পরই হবে যে, তাদেরকে দেওয়া পার্থিব ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তারা পাপকর্মে ব্যয় করেছে প্রকৃত পক্ষে সেসবই ছিল নরকাঙ্গার। এ বিষয়টিই কতিপয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন। বলা হয়েছে : إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا অর্থাৎ, কাফেরদের ধন-সম্পদ এবং ভোগ-বিলাস তাদের জন্য গৌরবের বস্তু নয়; এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আজাবেরই একটি কিস্তি যা আখেরাতে তাদের আজাব বৃদ্ধির কারণ হবে।

ওহীর পরিবর্তে কার্যকর পদ্ধতিতে মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য বিধানের তাৎপর্য : এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিঃস্বার্থ মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য বিধানের উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা এমন জটিলতা ও দুর্ঘটনার অবতারণা করেন, যাতে বাস্তব ও কার্যকরভাবে মুনাফিকের প্রতারণা প্রকৃষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এ পার্থক্য বিধান যদি ওহীর মাধ্যমে মুনাফিকদের নামোল্লেখ করেও করা যেতে পারত, কিন্তু হেকমতের দাবি তা নয়। আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ হিকমত তিনিই জানেন। তবে এখানে একটি হিকমত এটাও হতে পারে যে, মুসলমানদেরকে যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হতো যে, অমুক ব্যক্তি মুনাফিক, তাহলে তার সাথে মুসলমানদের সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তার সাথে আচার-আচরণে সতর্কতার ব্যাপারে এমন কোনো প্রকৃষ্ট প্রমাণ থাকত না, যা মুনাফিকরাও সমর্থন করতে পারত। তখন তারা বলত যে, তোমরা ভুল বলছ। আমরা প্রকৃতই মুসলমান।

পক্ষান্তরে বিপদাপদ ও জটিলতা আরোপের মাধ্যমে যে বাস্তব ও কার্যকর পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে; তাতে মুনাফিকরা সরে পড়তে বাধ্য হয়েছে; তাদের প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর তাদের এ দাবি করার সুযোগ থাকেনি যে, তারাও নিঃস্বার্থ মুমিন।

এভাবে মুনাফিক প্রকাশিত হয়ে পড়ায় একটি ফায়দা এও হয়েছে যে, তাদের সাথে মুসলমানদের বাহ্যিক মেলামেশাও বন্ধ হয়ে যায়। অন্যথা মানসিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক মেলামেশা যদি বিদ্যমান থাকত, তবুও তা ক্ষতিকর হতো।

গায়েবি ব্যাপারে কাউকে অবহিত করে দেওয়া হলে তা গায়েব থাকে না : এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা গায়েবি ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে যে কাউকে অবহিত করেন না। অবশ্য নিজে নবী-রাসূল নির্বাচিত করে তাদেরকেই গায়েবি ব্যাপারে অবহিত করেছেন। এতে এমন সন্দেহ করা উচিত নয় যে, তাই যদি হয়, তবে নবীগণও তো ইলমে গায়েবের অংশীদার এবং আলেমে গায়েব। কারণ ইলমে গায়েব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সত্তার সাথে সংযুক্ত, কোনোও সৃষ্টিকে তার অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক। আর তা হলো দুটি শর্তসাপেক্ষে। এক. সে ইলমকে হতে হবে 'ইলমে জাতি' যা অপর কারো মাধ্যমে আগত বা শেখানো হয়। দুই. সে ইলমকে সমগ্র বিশ্বজগত ও ভূত-ভবিষ্যতের উপর পরিব্যাপ্ত হতে হবে, যাতে কোনো একটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত গোপন থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবী রাসূলগণকে যে সমস্ত গায়েবি বিষয়ে অবহিত করেছেন, সেগুলো প্রকৃত পক্ষে ইলমে গায়েব নয়; বরং গায়েবি বিষয়ের সংবাদ যা নবী-রাসূলগণকে দেওয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমও একে কয়েক স্থানে اَنْبَآءُ الْغَيْبِ তথা গায়েবের সংবাদ বা অবগতি শব্দে বিশ্লেষণ করেছে। বলা হয়েছে مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ অর্থাৎ, সেগুলো ছিল গায়েবি সংবাদের অন্তর্ভুক্ত যা ওহীর মাধ্যমে আপনাকে অবহিত করা হয়েছে।

উল্লিখিত সাতটি আয়াতের প্রথম আয়াতে কার্পণ্যের নিন্দাবাদ এবং তার উপর অভিসম্পাতের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

কার্পণ্যের সংজ্ঞা এবং সে জন্য শাস্তি বিধানের বিস্তারিত বিশ্লেষণ : 'বোখল' বা কার্পণ্যের শরিয়ত নির্ধারিত অর্থ হলো– যা আল্লাহর রাহে ব্যয় করা কারো উপর ওয়াজিব, তা ব্যয় না করা।' এ কারণেই কার্পণ্য বা বোখল হারাম এবং এজন্য জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব, তাতে ব্যয় না করা হারাম-কার্পণ্যের আওতাভুক্ত নয়। অবশ্য সাধারণ অর্থে তাকেও কার্পণ্যই বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কার্পণ্য বা বোখল হারাম নয়। তবুও অনুত্তম।

'বোখল বা কার্পণ্য অর্থেই আরো একটি শব্দ হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলো شُحٌّ -এর সংজ্ঞা হলো এই যে, যে ব্যয় নিজের দায়িত্বে ওয়াজিব ছিল, তা ব্যয় না করা। তদুপরি সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে লোভের বশবর্তী হওয়া। এটি কার্পণ্য অপেক্ষাও অধিক অপরাধ। সে কারণেই রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন।

لَا يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَاِيْمَانٌ فِىْ قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اَبَدًا

অর্থাৎ, 'শুহ' বা কৃপণতা এবং 'ঈমান' কোনো মুসলমানের অন্তরে কখনো একত্রে অবস্থান করতে পারে না। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ

نُمْلِيْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمْلَاءُ মূলবর্ণ (م ـ ل ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আমরা সুযোগ দেই।

لِيَذَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– সে ছেড়ে দেয়।

يَمِيْزُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَيْزُ মূলবর্ণ (م ـ ى ـ ز) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে পার্থক্য করে।

يَجْتَبِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِجْتِبَاءُ মূলবর্ণ (ج ـ ب ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তিনি নির্বাচিত করেন।

يُطَوَّقُوْنَ সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّطْوِيْقُ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– বেড়ি পরানো হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ : এখানে لٰكِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَللّٰهَ শব্দটি لٰكِنَّ এর اسم আর يَجْتَبِيْ ফে'ল, উহ্য هُوَ ফা'য়েল مِنْ হরফে জার رُسُلِ মুযাফ ه মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور এবার جار ও مجرور মিলে متعلق হলো يَجْتَبِىْ এর সাথে। مَنْ ইসমে মাওসূল يَشَآءُ ফে'ল ও ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে সিলাহ, موصول ও صلة মিলে مفعول আর متعلق ـ فاعل ـ فعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে لٰكِنَّ-এর خبر হয়েছে। لٰكِنَّ তার اسم ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হলো।

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (١٨١)

অনুবাদ : (১৮১) নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণ করেছেন ঐ সকল লোকের কথা যারা ঐরূপ বলে– আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনবান। আমি তাদের উক্তিগুলোকে লিখে রাখব এবং তাদের অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করাকেও, আর আমি বলব, স্বাদ গ্রহণ কর আগুনের– আজাবের।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (١٨٢)

(১৮২) এটা ঐ কর্মসমূহের দরুন যা তোমরা নিজ হাতে সঞ্চয় করেছিলে, আর এটা সুপ্রমাণিত যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নন।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١٨٣)

(১৮৩) তারা এমন লোক যে– বলে, আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছিলেন, যেন আমরা কোনো নবীর প্রতি ঈমান না আনি, যে পর্যন্ত না আমাদের সম্মুখে আল্লাহর জন্য কুরবানি করার মু'জিযা প্রকাশ করে, যাকে অগ্নি গ্রাস করে নেয়, আপনি বলে দিন নিশ্চয় আমার পূর্বে তোমাদের প্রতি বহু রাসূল বহু প্রমাণাদিসহ এসেছিলেন এবং হুবহু তোমাদের কথিত মু'জিযাসহও, তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ (١٨٤)

(১৮৪) সুতরাং যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, তবে বহু পয়গম্বরকে যাঁরা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন, মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাঁরা এসেছিলেন মু'জিযাসমূহ এবং সহীফাসমূহ ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮১) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রবণ করেছেন قَوْلَ الَّذِيْنَ ঐ সকল লোকের কথা । قَالُوْا যারা ঐরূপ বলে– اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ আল্লাহ দরিদ্র আর وَنَحْنُ اَغْنِيَآءُ আমরা ধনবান । سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا আমি তাদের উক্তিগুলোকে লিখে রাখব وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ এবং তাদের অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করাকেও وَنَقُوْلُ আর আমি বলব । ذُوْقُوْا স্বাদ গ্রহণ কর عَذَابَ الْحَرِيْقِ আগুনের– আজাবের ।

(১৮২) ذٰلِكَ এটা ঐ কর্মসমূহের দরুন بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ যা তোমরা নিজ হাতে সঞ্চয় করেছিলে وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ আর এটা সুপ্রমাণিত যে, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নন ।

(১৮৩) اَلَّذِيْنَ قَالُوْا তারা এমন লোক যে– বলে اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছিলেন اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ যেন আমরা কোনো নবীর প্রতি ঈমান না আনি حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ যে পর্যন্ত না আমাদের সম্মুখে আল্লাহর জন্য কুরবানি করার মু'জিযা প্রকাশ করে تَاْكُلُهُ النَّارُ যাকে অগ্নি গ্রাস করে নেয় قُلْ আপনি বলে দিন قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ নিশ্চয় তোমাদের প্রতি বহু রাসূল এসেছিলেন مِّنْ قَبْلِيْ আমার পূর্বে بِالْبَيِّنٰتِ বহু প্রমাণাদিসহ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ এবং হুবহু তোমাদের কথিত মু'জিযাসহও فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে? اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক ।

(১৮১) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রবণ করেছেন قَوْلَ الَّذِيْنَ ঐ সকল লোকের কথা । قَالُوْا যারা ঐরূপ বলে– اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ আল্লাহ দরিদ্র আর وَنَحْنُ اَغْنِيَآءُ আমরা ধনবান । سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا আমি তাদের উক্তিগুলোকে লিখে রাখব وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ এবং তাদের অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করাকেও وَنَقُوْلُ আর আমি বলব । ذُوْقُوْا স্বাদ গ্রহণ কর عَذَابَ الْحَرِيْقِ আগুনের– আজাবের ।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

(১৮৫) প্রত্যেক প্রাণ [-ধারী] কেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, আর নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান কিয়ামত দিবসেই পাবে, অতএব, যাকে দোজখ হতে রক্ষা করা হলো, এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো ফলতঃ সে পূর্ণ সফলকাম হলো, এবং পার্থিব জীবন তো কিছুই নয় প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত।

لَتُبْلَوُنَّ فِىْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۚ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨٦﴾

(১৮৬) অবশ্য ভবিষ্যতে তোমরা স্বীয় ধনসমূহে ও স্বীয় প্রাণসমূহে আরো পরীক্ষিত হবে এবং ভবিষ্যতে আরো বহু বেদনাদায়ক কথা অবশ্যই শুনবে তাদের নিকট হতে– যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং তাদের হতে [-ও] যারা মুশরিক, আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং পরহেজ করতে থাক, তবে [তোমাদের জন্য উত্তম কেননা] তা তাকীদী নির্দেশাবলির অন্তর্ভুক্ত।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮২) ذٰلِكَ এটা ঐ কর্মসমূহের দরুন بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ যা তোমরা নিজ হাতে সঞ্চয় করেছিলে وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ আর এটা সুপ্রমাণিত যে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নন।

(১৮৩) اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا তারা এমন লোক যে– বলে اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছিলেন اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ যেন আমরা কোনো নবীর প্রতি ঈমান না আনি حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ যে পর্যন্ত না আমাদের সম্মুখে আল্লাহর জন্য কুরবানি করার মু'জিযা প্রকাশ করে تَأْكُلُهُ النَّارُ যাকে অগ্নি গ্রাস করে নেয় قُلْ আপনি বলে দিন قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ নিশ্চয় তোমাদের প্রতি বহু রাসূল এসেছিলেন مِّنْ قَبْلِىْ আমার পূর্বে بِالْبَيِّنٰتِ বহু প্রমাণাদিসহ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ এবং হুবহু তোমাদের কথিত মু'জিযাসহও فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে? اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

(১৮৪) فَاِنْ كَذَّبُوْكَ সুতরাং যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ তবে বহু পয়গম্বরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে مِّنْ قَبْلِكَ যাঁরা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ যাঁরা এসেছিলেন মু'জিযাসমূহ وَالزُّبُرِ এবং সহীফাসমূহ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে।

(১৮৫) كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেক প্রাণ [-ধারী] কেই ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ আর নিশ্চয় তোমরা পাবে اُجُوْرَكُمْ তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসেই فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ অতএব, যাকে দোজখ হতে রক্ষা করা হলো وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো فَقَدْ فَازَ ফলতঃ সে পূর্ণ সফলকাম হলো وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ এবং পার্থিব জীবন তো কিছুই নয় اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত।

(১৮৬) لَتُبْلَوُنَّ অবশ্য ভবিষ্যতে আরো পরীক্ষিত হবে তোমরা فِىْٓ اَمْوَالِكُمْ স্বীয় ধনসমূহে وَاَنْفُسِكُمْ ও স্বীয় প্রাণসমূহে وَلَتَسْمَعُنَّ এবং ভবিষ্যতে অবশ্যই শুনবে مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ তাদের নিকট হতে– যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্বে। وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا এবং তাদের হতে [-ও] যারা মুশরিক। اَذًى كَثِيْرًا আরো বহু বেদনাদায়ক কথা। وَاِنْ تَصْبِرُوْا আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর। وَتَتَّقُوْا এবং পরহেজ করতে থাক فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ তবে [তোমাদের জন্য উত্তম কেননা] তা তাকীদী নির্দেশাবলির অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮১-১৮২) قوله لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ الخ আয়াতদ্বয়ের শানে নুযূল– ১ : ইবনে মারদুভিয়া ও আবূ হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) মিদরাসের ঘরে গমন করে ফিনহাস নামক এক ব্যক্তির নিকট অনেক ইহুদিকে একত্রিত হতে দেখতে পান। সে ছিল ইহুদি আলেম/ওলামাদের একজন এবং ইহুদি পণ্ডিত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ফিনহাসকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ফিনহাস! তোমার দূর্ভাগ্য, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম! তুমি তো জান নিশ্চিতভাবে যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল। তাঁর কাছ থেকে তিনি সত্যসহ এসেছেন। তোমরা তোমাদের কাছে রক্ষিত ইঞ্জিল ও তাওরাতেও তা পেয়েছ। তখন ফিনহাস বলল, আল্লাহর কসম! হে আবূ বকর! আল্লাহর নিকট আমাদের কোনো মুখাপেক্ষীতা নেই। পক্ষান্তরে তিনিই তো আমাদের প্রতি মুহতাজ। তিনি আমাদের কাছে যেভাবে বাকতী মিনীত করেন আমরা সেভাবে তাঁর কাছে মিনীত করিনা, আমরা তার থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি যদি আমাদের থেকে সম্পদশালী বা ধনী হতেন, তাহলে আমাদের নিকট কর্জ তলব করতেন না। তোমাদেরকে যেমন বলে থাকেন। তিনি তোমাদেরকে সুদ থেকে নিষেধ করেন অথচ আমাদেরকে তা প্রদান করেছেন। তিনি যদি সম্পদশালী হতেন, তাহলে তিনি আমাদেরকে সুদ দিতেন না। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) ক্রোধান্বিত হয়ে ফিনহাসের চেহারায় প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তোমাদের ও আমাদের মাঝে যদি কোনো মৈত্রিতা না থাকত. আল্লাহর কসম! আমি তোর শিরচ্ছেদ করে দিতাম। ক্ষমতা থাকলে তুই আমাদের প্রতি মিথ্যা আরোপিত করতে। অতঃপর ফিনহাস রাসূল ﷺ -এর দরবারে গিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! লক্ষ্য কর তোমার সাথী আমার সাথে কি আচরণ করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ বকর! এমনটি তুমি করলে কেন? তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর এ দুশমন জঘন্যতর মন্তব্য করেছে। তার বিশ্বাস আল্লাহ ফকির, আর ওরা তদপেক্ষা সম্পদশালী। সে যখন এমন মন্তব্য করল, তখন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্রোধান্বিত হয়ে তার কথার শাস্তিস্বরূপ তার চেহারায় চপেটাঘাত করেছি। ফিনহাস তা অস্বীকার করে বলল, তুমি এগুলো কি বলছ? তখন আল্লাহ তা'আলা ফিনহাসের এ মন্তব্যকে নিয়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সত্যায়নে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর– ১ : ৪৩৪, রুহুল মা'আনী ১৪০/৪/২, বাহরে মুহীত ৩ : ১৩৫]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে মুনযির হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে জানানো হচ্ছে যে, আলোচ্য আয়াত হুয়াই বিন আখতাব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে– مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰه الخ যখন নাজিল হয়, তখন সে বলল, আমাদের নিকট কর্জ চায়। কর্জ তলব করে তো দরিদ্র ধনাঢ্যের নিকট। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর]

শানে নুযূল– ৩ : আয-যিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থ সাঈদ বিন জুবাইরের মধ্যস্থতায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰه الخ আয়াত যখন আল্লাহ নাজিল করেন, তখন ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার রব তো দরিদ্র, তাঁর বান্দার কাছে কর্জ চান তিনি, তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রুহুল মা'আনী ১৪১/২/২. ফাতহুল কাদীর ৪০৭/১০]

(১৮৩-১৮৪) قوله اَلَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا الخ আয়াতদ্বয়ের শানে নুযূল : হযরত কালবী বলেন, আলোচ্য আয়াত কা'আব বিন আশরাফ, মালেক বিন সাইফ, ওহাব বিন ইয়াহুযা, যাইদ বিন মানুহ, ফিনহাস বিন ইযুরা ও হুয়াই বিন আখতাব প্রমুখ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আপনি ধারণা করছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমাদের প্রতি রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আপনার নিকট কিতাব প্রেরণ করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাওরাতে আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূল বলে দাবি করে, তার প্রতি আমরা যেন ঈমান না আনি, যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো কুরবানি পেশ করবে এবং আসমান হতে আগুন এসে তাকে গ্রাস করবে। আপনি যদি এমন করতে পারেন তাহলে আপনার প্রতি ঈমান আনব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী, আলফী]

(১৮৬) قوله لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল– : যুহরী আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, কা'আব বিন আশরাফ একজন ইহুদি কবি ছিল। সে নবী করীম ﷺ-এর সম্পর্কে ব্যঙ্গকাব্য রচনা করত এবং তার কবিতা দ্বারা কুরাইশ কাফেরদেরকে রাসূল ﷺ-এর প্রতি উত্তেজিত করে তুলত। পক্ষান্তরে নবী করীম ﷺ যখন মদিনায় গমন করেন, তখনকার মদিনা ছিল, মুসলিম, মুশরিক ও ইহুদি জাতীত্রয়ের সম্মিলিত অধিবাস। সুতরাং নবী করীম ﷺ তাদের পারস্পরিকভাবে সন্ধি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কারণ ইহুদি ও মুশরিকরা রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণকে কঠোর কষ্ট দিচ্ছিল। সে জন্য আল্লাহ তা'আলা তদ্বীয় নবীকে তাদের কর্তৃক প্রদেয় দুঃখ-কষ্ট ধৈর্য ধারণ করে তা বরণ করে নিতে হুকুম দেন। এবং তাদের এ প্রেক্ষাপট সম্পর্কেই এ আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। (রূহুল মা'আনী ১৪৯/২/৪, কুরতুবী ২৯৫/৪)

(১৮৭) قوله وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইমাম বুখারী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় উরওয়া বিন জুবায়ের কর্তৃক বর্ণিত যুহরি হতে লম্বা এক হাদীস বর্ণনা করেন। উসামা বিন যায়েদ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা গাধার উপরে আরোহী ছিলেন, সে সময় রাসূল ﷺ-এর গায়ে ছিল ফদকী একটি চাদর, তার সাওয়ারীর পিছনে আরোহী ছিলেন হযরত উসামা বিন যায়েদ। তিনি বনূ হারেছ বিন খাযরাজে অসুস্থ সা'আদ বিন উবায়দাহকে দেখার জন্য বদর অভিযানের পূর্বে যাচ্ছিলেন। তাঁরা যাত্রা কালে এমন একটি মজলিস দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, সে মজলিসে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূলও ছিল। আর সে মজলিসটি মুসলমান ও মূর্তি পূজারি, মুশরিক, আহলে কিতাব ইহুদিদের সম্মিলিত মজলিস ছিল। সে বৈঠকে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাও উপস্থিত ছিল। সাওয়ারীর পায়ের দ্বারা মজলিসের উপর ধুলা-বালিও উড়ছিল। সে জন্য আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল তার চাদর দ্বারা তার নাক ঢেকে ফেলে বলল, আমাদের উপর ধুলা-বালি উড়াবেননা। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদের প্রতি সালাম জানালেন, অতঃপর বিরতি গ্রহণ করেন। তিনি সাওয়ারি থেকে নেমে তাদেরকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এর দিকে আহবান জানালেন এবং তাদের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করেন। তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলল, হে মহা মানব! আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে তা অত্যন্ত উত্তম বিষয়। কাজেই আপনি ধুলা-বালি দ্বারা আমাদের মজলিসকে কষ্ট দিবেন না। আপনি সাওয়ারির নিকট চলে যান। অতঃপর আপনার নিকট যারা আসবে, তাদেরকে আপনি বুঝিয়ে বলুন। তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহও বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! এ ধূলা-বালি দ্বারা আমাদের বৈঠকটি ঢেকে দিন। কারণ সে ধূলা-বালি আমি প্রাণ ভরে ভালোবাসি। সে পরিস্থিতিতে মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদিদের মাঝে বাক-বিতণ্ডা আরম্ভ হয়ে ফেতনার এক ধূলো উড়ার উপক্রম হয়েছিল। তখন রাসূল ﷺ তাদের থামাতে লাগলেন এতে অবস্থা শান্ত হয়। অতঃপর নবী করীম ﷺ সাওয়ারিতে আরোহণ করে সা'আদ বিন উবাদাহকে বললেন, হে সা'আদ! আবূ আব্বার কি বলল, তুমি কি তা শুননি? এর দ্বারা আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে বুঝানো হয়েছে। সে তো এমন-এমন বলেছে। সা'আদ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো মন থেকে ছেড়ে ক্ষমা করে দিন। কসম আল্লাহর! আল্লাহ আপনার প্রতি যা নাজিল করেছেন, তা অতি সত্য। আর নগর বাসীরা তো সন্ধি স্থাপন করেছে এই মর্মে যে, সন্ধির প্রতি যাতে মনোযোগী থাকে এবং আত্মীয়তার প্রতি যেন যত্নবান থাকে। অতঃপর সেই মহা সত্য যেহেতু আল্লাহ আপনাকে অর্পণ করেছেন, এর দ্বারা ওরা ক্রোধান্বিত। আর সে ওয়াদার প্রতি এমন আচরণ করল, যা আপনি নিজেই দেখতে পেলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন। রাসূল ﷺ ও তদ্বীয় সাহাবায়ে কেরাম মুশরিক ও আহলে কিতাবদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ক্ষমা করে দিলেন এবং ধৈর্য্য ধারণ করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। (ইবনে কাছীর ৪৩৫/১, রুহুল মাআনী ১৪৮/২/৪, কুরতুবী ২৯৬/৪)

* কারো বর্ণনা মতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও ফিনহাস নামক ইহুদিদের মধ্যে সংগঠিত বাদানুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।
* কাআব বিন আশরাফ রাসূল ﷺ ও তদ্বীয় সাহাবীগণের প্রতি মুশরিকদেরকে তার কবিতা দ্বারা যুদ্ধের জন্য প্রেরণা যোগাত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। (বাহরে মুহীত : ১৪১/৩)

১৮১ নং আয়াতে ইহুদিদের একটি কঠিন ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে সতর্কীকরণ ও শাস্তির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা এরূপ যে, মহানবী ﷺ যখন কুরআনে হাকীম থেকে জাকাত ও সদকার বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন উদ্ধত ইহুদিরা

বলতে আরম্ভ করে যে, আল্লাহ তা'আলা ফকির ও গরিব হয়ে গেছেন, আর আমরা হচ্ছি ধনী ও আমীর। সে জন্যই তো তিনি আমাদের কাছে চাইছেন। বলাবাহুল্য, তাদের বিশ্বাস তাদের এ উক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মোটেই নয়। কিন্তু হুজুরে আকরাম ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই হয়তো বলেছিল যে, কুরআনের এ আয়াত যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার মর্ম এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ ফকির ও পরমুখাপেক্ষী। তাদের এই অহেতুক প্রমাণটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাতিল বলে সাব্যস্ত হওয়ার দরুন তার কোনো উত্তরের প্রয়োজন ছিল না; কারণ জাকাত ও সদকা সংক্রান্ত আল্লাহর নির্দেশ তাঁর নিজের কোনো লাভের জন্য নয়; বরং যারা মালদার তাদেরই পার্থিব ও আখেরাতের ফায়দার জন্য ছিল। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বিষয়টি 'আল্লাহকে ঋণদান' শিরোনামে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একথা বুঝা যায় যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য অপরিহার্য ও সন্দেহাতীত হয়ে থাকে, তেমনিভাবে যে সদকা মানুষ দিয়ে থাকে তার প্রতিদান ও আল্লাহ নিজ দায়িত্বে পরিশোধ করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক বলে জানে, তার মনে এ শব্দের ব্যবহারে কস্মিনকালেও এমন কোনো সন্দেহ উদয় হতে পারে না, যেমনটি উদ্ধত ইহুদিদের উক্তিতে বিদ্যমান। কাজেই কুরআনে কারীম এই সন্দেহের উত্তর দান করেছে। শুধুমাত্র তাদের ঔদ্ধত্য ও হুজুরে আকরাম ﷺ-এর প্রতি মিত্যারোপ এবং তাঁর প্রতি উপহাস করার একাধিক অপরাধের শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে, আমি তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিসমূহ লিখে রাখব যাতে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করে আজাবের ব্যবস্থা করা যায়। অন্যথা আল্লাহর জন্য লেখার কোনোই প্রয়োজন নেই।

অতঃপর ইহুদিদের এ সমস্ত ঔদ্ধত্যের আলোচনার সাথে সাথে তাদের আরো একটি অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা হলো এমন লোক, যারা নবী-রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিংবা তাদের উপহাস করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং এরা তাদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। কাজেই এমন লোকদের দ্বারা কোনো নবীর প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাস করা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়।

কুফরি ও পাপের ব্যাপারে মনে-প্রাণে সম্মত থাকাও মহাপাপ : এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআনের লক্ষ্য হলেন মহানবী ﷺ ও মদিনাবাসী ইহুদিবর্গ। আর নবীদের হত্যার ঘটনাটি হলো হযরত ইয়াহইয়া ও যাকারিয়া (আ.)-এর সময়ের। সুতরাং এ আয়াতে নবী হত্যার অপরাধ এ সময়ের ইহুদিদের উপর আরোপ করা হলো কেমন করে? তার কারণ এই যে, মদিনার ইহুদিরাও তাদের পূর্ববর্তী ইহুদিদের সে কাজের ব্যাপারে সম্মত এবং আনন্দিত ছিল বলে তারাও সেই হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে বলেছেন, এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কুফরের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনও কুফরি ও মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলে কারীম ﷺ-এর এক বাণীতে এ বিষয়ের অধিকতর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, জমিনের উপর যখন কোনো পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, যে লোক সেখানে উপস্থিত থাকে এবং সে পাপের প্রতিবাদ করে আর সে কাজকে মন্দ জ্ঞান করে, তখন সে যেন সেখানে উপস্থিত থাকে না। অর্থাৎ, সে ব্যক্তি তাদের পাপের অংশীদার হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঘটনাস্থলে না থেকেও তাদের কৃত পাপের প্রতি সমর্থন দান করে, তাকে অংশীদার বলেই গণ্য করা হবে।

এ আয়াতের শেষাংশে এবং তৃতীয় আয়াতে সে উদ্ধতদের শাস্তিস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাদের দোজখে নিক্ষেপ করে বলা হবে, এবার আগুনে জ্বলার স্বাদ আস্বাদন কর, যা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল; আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা কোনো অন্যায় আচরণ নয়।

চতুর্থ আয়াতে এসব ইহুদিদের অপবাদ ও মিথ্যারোপের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হলো এই যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যারোপকল্পে এই ছল উদ্ভাবন করে যে, পূর্ববর্তী নবীদের সদকার বস্তু-সামগ্রী কোনো মাঠে কিংবা পাহাড়ে রেখে দেওয়ার নিয়ম ছিল, তখন আকাশ থেকে একটা আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। এটাই সদকা কবুল হওয়ার লক্ষণ। রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা এ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যে, সদকার দ্রব্যসামগ্রীকে আগুনের গ্রাসে পরিণত করার পরিবর্তে তা মুসলমান গরিব-দুঃখীদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের রীতির সাথে এ রীতিটির কোনো মিল ছিল না, সেহেতু একে মুশরিকরা বাহানা বানিয়ে নিল যে, যদি

আপনি নবীই হতেন, তাহলে আপনিও এমন মু'জিযাপ্রাপ্ত হতেন, যাতে আকাশ থেকে আগুণ এসে সদকার বস্তু-সামগ্রীকে গ্রাস করে ফেলত। অধিকন্তু তারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে গিয়ে আল্লাহর প্রতিও অপবাদ আরোপ করেছে যে, তিনি আমাদের নিকট থেকে এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়েছেন যে, আমরা যেন এমন কোনো লোকের প্রতি ঈমান না আনি, যার দ্বারা আকাশ থেকে আগুণ এসে সদকার দ্রব্য-সামগ্রীকে জ্বালিয়ে দেওয়া মু'জিযা অনুষ্ঠিত হবে না।

ইহুদিদের এ দাবি যেহেতু আদৌ প্রমাণভিত্তিক ছিল না যে, আল্লাহ তাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, কাজেই তার কোনো উত্তর দেওয়াও নিস্প্রয়োজন। তাদের নিজেদের বক্তব্যের দ্বারাই তাদেরকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ইরশাদ করা হয়েছে, তোমরা যদি এ দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক যে, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তবে পূর্ববর্তী যেসব নবী-রাসূল তোমাদের কথা মতো এই মু'জিযাও দেখিয়েছিলেন, তখন তোমাদের কর্তব্য ছিল তাদের প্রতি ঈমান আনা, কিন্তু তোমরা তাদেরকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ; বরং তাদেরকে হত্যা করে দিয়েছ। তা কেমন করে করলে?

এখানে এমন সন্দেহ করা যায় না যে, ইহুদিদের এ দাবি যদিও সর্বৈব ভ্রান্ত ছিল, কিন্তু যদি মহানবী ﷺ -এর মাধ্যমে এ মু'জিযা প্রকাশিত ও হতো, তবে হয়তো তারা ঈমান এনে নিত। কারণ আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, তারা শুধুমাত্র বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশতঃই এসব কথা বলছে। কথামতো মু'জিযা প্রকাশিত হলেও এরা ঈমান গ্রহণ করত না পঞ্চম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এমনি ধরনের আচরণ সব নবী-রাসূলের সাথেই হয়ে এসেছে।

আখেরাতের চিন্তা যাবতীয় দুঃখ-বেদানার প্রতিকার এবং সমস্ত সংশয়ের উত্তর : ষষ্ঠ আয়াতে এই বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, যদি কখনো কোথাও কাফেররা বিজয়ীও হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ পার্থিব আরাম-আয়েশ লাভ করে আর তারই বিপরীতে মুসলমানগণ যদি বিপদাপদ, জটিলতা ও পার্থিব উপকরণের সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়, তাহলে তা তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়। তাতে দুঃখিত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ এ বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো ধর্ম, কোনো মতাবলম্বী কিংবা কোনো দার্শনিকই অস্বীকার করতে পারে না যে, পার্থিব দুঃখ-কষ্ট বা আরাম- আয়েশ উভয়টিই কয়েকদিনের জন্য মাত্র। কোনো জানদার বা প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। তাছাড়া পার্থিব দুঃখ-কষ্ট কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পৃথিবীতেই আবর্তিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। আর পৃথিবীতে যদি শেষ নাও হয়, মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। কাজেই কয়েকদিনের সুখ-দুঃখ নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে থাকা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়; বরং মৃত্যুর পরবর্তী চিন্তা করাই উচিত যে, সেখানে কি হবে?

এজন্যই এ আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে। আর আখেরাতে নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে, যা কঠিনও হবে আবার দীর্ঘও হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে সে চিন্তা করাই উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে লোকই সত্যিকার কৃতকার্য, যে দোজখ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। তা প্রাথমিক পর্যায়ে হোক– যেমন, সৎকর্মশীল আবেদগণের সাথে যেরূপ আচরণ করা হবে– অথবা কিছু শাস্তি ভোগের পরেই হোক– যেমন, পাপী মুসলমানদের অবস্থা। কিন্তু সমস্ত মুসলমানই শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লাভ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও সুখ–শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কাজেই তারা যদি সামান্য কয়েক দিনের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে গর্বিত হয়ে উঠে, তবে সেটা একান্তই ধোঁকা। সেজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে, 'দুনিয়ার জীবন তো হলো ধোঁকার উপকরণ।' তার কারণ এই যে, সাধারণত এখানকার ভোগ-বিলাসেই হবে আখেরাতে কঠিন যন্ত্রণার কারণ। পক্ষান্তরে এখানকার দুঃখ-কষ্ট হবে আখেরাতের সঞ্চয়।

সবর দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার : সপ্তম আয়াতটি নাজিল হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে, যার মোটামুটি আলোচনা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কুরআন কারীমে যখন مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا আয়াতটি নাজিল হয় এবং যাতে অত্যন্ত সালঙ্কার বর্ণনাভঙ্গিতে সদকা ও খয়রাতকে আল্লাহকে করজ দেওয়া বলে অভিহিত করা হয়। আর সে বর্ণনায় ইঙ্গিত করা হয় যে, যাই কিছু এখানে দান করবে, আখেরাতে তার প্রতিদান তেমনি নিশ্চিত– যেন অন্যের ঋণ পরিশোধ করা হয়।

একথা শুনে কোনো মূর্খ বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদি বলল– "আল্লাহ ফকির আর আমরা হলাম আমীর।" এতে হযরত আবূ বকর (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং সে ইহুদিকে এক চড় বসিয়ে দিলেন। ইহুদি এসে রাসূলে কারীম (সা.)-এর দরবারে অভিযোগ পেশ করল। তারই প্রেক্ষিতে নাজিল হলো– لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ এতে মুসলমানদেরকে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, দীনের জন্য জান-মালের কুরবানি দিতে হবে এবং কাফের,মুশরিক ও আহলে কিতাবদের কটূক্তি এবং কষ্ট দানের কারণে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্তই হলো তাদের জন্য পরীক্ষা। এতে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাকওয়ার পরাকাষ্ঠা সাধনে নিয়োজিত থাকাই হলো তাদের পক্ষে উত্তম। তাদের সাথে বাদানুবাদ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَأْكُلُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (ا . ك . ل) জিনস مهموز فاء অর্থ– সে খেয়ে ফেলে।

زُحْزِحَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَة মাসদার اَلزَّحْزَحَةُ মূলবর্ণ (ز.ح.ز.ح) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– বাঁচিয়ে রাখা হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ : এখানে كُلُّ মুযাফ نَفْسٍ মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে মুবতাদা ذَائِقَةُ মুযাফ اَلْمَوْتِ মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف اليه মিলে খবর। সুতরাং مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হলো।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ : এখানে لَتُبْلَوُنَّ ফে'ল যমীরে اَنْتُمْ ফা'য়েল فِىْ হরফে জার اَمْوَالِ মুযাফ كُمْ মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে معطوف عليه আর و হরফে আতফ اَنْفُسِ মুযাফ كُمْ মুযাফ ইলাইহি উভয়ে মিলে মা'তূফ। معطوف ও معطوف عليه মিলে মাজরূর جار ও مجرور মিলে متعلق হলো فعل ـ فاعل ও متعلق মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হলো।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ (۱۸۷)

অনুবাদ : (১৮৭) আর যখন আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের নিকট হতে এই অঙ্গীকার নিলেন যে, ঐ কিতাব জনগণের সম্মুখে প্রকাশ করে দিবে এবং তা গোপন করবে না অনন্তর তারা তাকে স্বীয় পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং তার পরিবর্তে নগণ্য বিনিময় গ্রহণ করল, সুতরাং তা নিকৃষ্ট বস্তু যা তারা গ্রহণ করছে।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۱۸۸)

(১৮৮) যারা এরূপ যে, স্বীয় [অসৎ] কর্মে আনন্দিত হয়, এবং যেই [সৎ] কাজ করেনি তাতে প্রশংসিত হওয়ার বাসনা রাখে, সুতরাং এরূপ লোক সম্বন্ধে কখনো ধারণা করো না যে, তারা [দুনিয়ায়] বিশেষ রকমের আজাব হতে পরিত্রাণ পাবে, [কখনো নয়] বস্তুতঃ তাদের [আখেরাতেও] যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ (۱۸۹)

(১৮৯) আর আল্লাহরই জন্য রয়েছে আসমানসমূহের ও জমিনের রাজত্ব এং আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়োপরি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ (۱۹۰)

(১৯০) নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ এবং জমিনের সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির গমনাগমনে নির্দশনসমূহ রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৮৭) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ আর যখন আল্লাহ তা'আলা নিলেন مِيْثَاقَ এই অঙ্গীকার الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাবদের নিকট হতে যে لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ ঐ কিতাব জনগণের সম্মুখে প্রকাশ করে দিবে وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ এবং তা গোপন করবে না فَنَبَذُوْهُ অনন্তর তারা তাকে নিক্ষেপ করল وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ স্বীয় পশ্চাতে وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا এবং তার পরিবর্তে নগণ্য বিনিময় গ্রহণ করল فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ সুতরাং তা নিকৃষ্ট বস্তু যা তারা গ্রহণ করছে।

(১৮৮) لَا تَحْسَبَنَّ কখনো ধারণা করো না الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا যারা এরূপ যে, স্বীয় [অসৎ] কর্মে আনন্দিত হয় وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا এবং প্রশংসিত হওয়ার বাসনা রাখে بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا যেই [সৎ] কাজ করেনি তাতে فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ সুতরাং এরূপ লোক সম্বন্ধে কখনো ধারণা করো না যে بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ তারা বিশেষ রকমের আজাব হতে পরিত্রাণ পাবে وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ বস্তুতঃ তাদের [আখেরাতেও] যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।

(১৮৯) وَلِلّٰهِ আর আল্লাহরই জন্য রয়েছে مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহের ও জমিনের রাজত্ব وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ এবং আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়োপরি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(১৯০) اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ এবং জমিনের সৃজনে وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির গমনাগমনে لَاٰيٰتٍ নির্দশনসমূহ রয়েছে لِّاُولِی الْاَلْبَابِ জ্ঞানবানদের জন্য।

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)

(১৯১) যাদের অবস্থা এরূপ যে, তারা আল্লাহর জিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে, শয়ন করেও, এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে [বলে] হে আমাদের রব! আপনি তাকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি, আমরা আপনাকে [অনর্থক সৃষ্টি করা হতে] পবিত্র মনে করি, সুতরাং আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব হতে রক্ষা করুন।

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ (١٩٢)

(১৯২) হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি যাকে জাহান্নামে দাখিল করেন, তাকে বাস্তবিকই লাঞ্ছিত করে দিলেন, আর এরূপ জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ (١٩٣)

(১৯৩) হে আমাদের রব! আমরা এক আহ্বানকারী [রাসূলুল্লাহ ﷺ]এর [আহ্বান] শুনেছি, তিনি ঈমান আনয়নের জন্য আহ্বান করছেন যে, তোমরা স্বীয় রবের প্রতি ঈমান আন, সুতরাং আমরা ঈমান আনলাম, হে আমাদের রব! অতএব, আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং ভুলত্রুটিগুলোকেও আমাদের হতে মোচন করে দিন এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সাথে করুন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯১) الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ যাদের অবস্থা এরূপ যে, তারা আল্লাহর জিকির করে قِيَامًا দাঁড়িয়ে وَّقُعُوْدًا বসে وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ শয়ন করেও وَيَتَفَكَّرُوْنَ এবং চিন্তা করে فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টির ব্যাপারে [বলে] رَبَّنَا হে আমাদের রব! مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا আপনি তাকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি سُبْحٰنَكَ আমরা আপনাকে [অনর্থক সৃষ্টি করা হতে] পবিত্র মনে করি فَقِنَا সুতরাং আমাদেরকে রক্ষা করুন عَذَابَ النَّارِ জাহান্নামের আজাব হতে।

(১৯২) رَبَّنَا হে আমাদের রব! اِنَّكَ নিশ্চয় আপনি مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ যাকে জাহান্নামে দাখিল করেন فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ তাকে বাস্তবিকই লাঞ্ছিত করে দিলেন وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ আর এরূপ জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

(১৯৩) رَبَّنَا হে আমাদের রব! اِنَّنَا سَمِعْنَا আমরা শুনেছি مُنَادِيًا يُّنَادِيْ এক আহ্বানকারী আহ্বান করছেন لِلْاِيْمَانِ ঈমান আনয়নের জন্য اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ তোমরা স্বীয় রবের প্রতি ঈমান আন فَاٰمَنَّا সুতরাং আমরা ঈমান আনলাম رَبَّنَا হে আমাদের রব! فَاغْفِرْ لَنَا অতএব, আমাদের মাফ করে দিন ذُنُوْبَنَا আমাদের গুনাহসমূহ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا এবং ভুলত্রুটিগুলোকেও আমাদের হতে মোচন করে দিন وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সাথে করুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৮৭) قوله وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো গাযওয়া বা যুদ্ধ অভিযানে বের হতেন, তখন কতিপয় মুনাফিক অভিযান থেকে পিছনে থেকে যেত এবং রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে বসে থাকার কারণে আনন্দ উপভোগ করত। রাসূল ﷺ যখন ফিরে আসতেন, তখন শপথ করে ওজর বা অপারগতার কথা প্রকাশ করত এবং তারা যে কাজ করত না সে কাজের জন্য প্রশংসা কামনা করত। মুনাফিকদের এ আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : অপর এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত ফিনহাস, 'আশআ' এবং তাদের ন্যায় হতভাগা যারা রয়েছে, তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : হযরত মালেক ইবনে সা'আদ তাবারানী ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাম্মদ বিন ছাবেত হতে বর্ণনা করেন, ছাবেত বিন কায়স বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে ভয় করি। তিনি বললেন, কেন? জবাবে ছাবেত বললেন যে, আমরা যে কাজ করিনি, সে কাজের জন্য প্রশংসা কামনা করাকে পছন্দ করে থাকি অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছেন। আমি আমার মাঝে প্রশংসা করাকে পছন্দ করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দাম্ভিকতা থেকে নিষেধ করেছেন। আমার মাঝে আমি পেয়ে থাকি সৌন্দর্যের ভালোবাসা। আমরা যেন আপনার অপেক্ষায় আপনার সামনে উচ্চ আওয়াজ না করি, আল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে আমিই উচ্চ আওয়াজকারী ব্যক্তি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে ছাবেত! তুমি প্রশংসিত হয়ে জীবন যাপন করতে, শহীদী মৃত্যু গ্রহণ করতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে কি ভালোবাসনা? সুতরাং তিনি প্রশংসিত হয়ে জীবন যাপন করেছেন এবং নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার মুসাইলামাতুল কাজ্জাব -এর সাথে যুদ্ধে শাহাদাতও বরণ করেছেন। –[ফাতহুল কাদীর : ২ : ৪১০]

শানে নুযূল –৪ : মুহাম্মদ বিন কা'ব যীকুরা বলেন, আলোচ্য আয়াত বনী ইসরাঈল (ইহুদি) ওলামায়ে কেরামের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সত্যকে গোপন করে রাখত এবং বাতেল পন্থায় অসৎ উদ্দেশ্যে রাজা-বাদশাহদের মতানুসারে তারা তাদের ইসলামকে ব্যবহার করত, তাদের এহেন মন্দ স্বভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ৪ : ২৯৮]

(১৮৮) قوله لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম ﷺ যে সকল অভিযানে বের হতেন মুনাফিক সে সকল যুদ্ধ ময়দান হতে বিরত থাকত এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে তাদের বাসস্থানে বসে থেকে আনন্দ প্রকাশ করত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফিরে আসতেন, তখন সে শপথ করে নিজের অপারগতা প্রকাশ করত। পরন্তু যে কাজটি সে করেনি তার জন্য প্রশংসিত হওয়াকে ভালোবাসত। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ৪ : ২৯৭, রুহুল মা'আনী ২ : ১৫১, বাহরে মুহীত ৩ : ১৪৩]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী, ইবনে যায়েদ এবং অধিকাংশ কুরআন ব্যাখ্যাদাতাগণ বলেন, আলোচ্য আয়াত ইহুদি ওলামা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ৩ : ১৪৩]

(১৯০) قوله إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইমাম তাবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কুরাইশরা ইহুদিদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের প্রতি হযরত মূসা (আ.) কি নিয়ে আগমন করেছিলেন? তারা বলল, দর্শকদের জন্য লাঠি ও শুভ্র হাত নিয়ে? তারা খ্রিস্টানদের নিকটও এসে জিজ্ঞেস করল, হযরত ঈসা (আ.) তোমাদের নিকট কি মু'জিযা নিয়ে আগমন করেছিলেন? তারা বলল , তিনি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরুগীকে আরোগ্য করে দিতেন এবং মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম ছিলেন। অতঃপর তারা নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এসে আবেদন করল যে, সাফা পর্বতটি স্বর্ণ বানিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। ফলে তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ১ : ৪৩৭, রুহুল মা'আনী ১৫৭/২/৪]

ধর্মীয় জ্ঞান গোপন করা হারাম এবং কোনো কাজ না করেই তার জন্য প্রশংসার অপেক্ষা করা দূষণীয় : আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে কিতাবদের দুটি অপরাধ এবং তার শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো এই যে, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কিতাবের বিধি-বিধানসমূহকে কোনো রকম হেরফের বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে জনসম্মুখে বিবৃত করে দিবে এবং কোনো নির্দেশই গোপন করবে না। কিন্তু তারা নিজেদের পার্থিব স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে সে প্রতিজ্ঞার কোনো পরোয়া করেনি; ববং বহু বিধি-নিষেধ তারা গোপন করেছে।

দ্বিতীয়তঃ তারা সৎকর্ম তো করেই না তদুপরি কামনা করে যে, সৎকাজ না করা সত্ত্বেও তাদের প্রশংসা করা হোক।

তাওরাতের বিধি-বিধান গোপন করার ঘটনা সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে উদ্ধৃতি রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদের কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কি

তাওরাতে আছে? তারা তা গোপন করল এবং যা তাওরাতে ছিল, তার বিপরীত বলে দিল। আর তাদের এ অসৎকর্মের জন্য আনন্দিত হয়ে ফিরে এলো যে, আমরা চমৎকার ধোঁকা দিয়ে দিয়েছি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হলো, যাতে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় ব্যাপার, না করা কাজের জন্য প্রশংসার আগ্রহী হওয়া। তা হলো মুনাফিক ইহুদিদের একটি কর্মপন্থা যে, কোনো জিহাদ সমাগত হলে তারা কোনো ছলছুতারভিত্তিতে ঘরে বসে থাকত এবং এভাবে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আনন্দ উদযাপন করত। আর রাসূলে কারীম ﷺ যখন ফিরে আসতেন, তখন তাঁর সমানে উপস্থিত হয়ে মিথ্যা কসম খেয়ে নানা অজুহাত বর্ণনা করত এবং আশা করত যে, তাদের এহেন কাজের জন্য প্রশংসা করা হোক। -[সহীহ বুখারী]

কুরআনে কারীমে এতদুভয় বিষয়ে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ধর্মীয় জ্ঞান ও আল্লাহর রাসূলের বিধি-বিধান গোপন করা হারাম। তবে এ গোপন করার ব্যাপারটি হলো তেমনিভাবে গোপন করা যা ইহুদিদের কাজ ছিল। অর্থাৎ, পার্থিব স্বার্থে আল্লাহর আহকাম গোপন করা। তারা তা করে মানুষের নিকট থেকে অর্থ-কড়ি গ্রহণ করত। অবশ্য কোনো ধর্মীয় কল্যাণ বিবেচনায় যদি কোনো বিশেষ হুকুম জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ করা না হয়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, ইমাম শাফেয়ী (র.) স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদ এ ব্যাপারে হাদীসের উদ্ধৃতি সহকারে বিবৃত করেছেন যে, অনেক সময় কোনো কোনো হুকুম প্রকাশ করতে গেলে সাধারণ জনগণের মাঝে ভুল-বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে এবং এতে নানা ফেতনা-ফ্যাসাদে পতিত হয়ে পড়ারও আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এমন আশঙ্কায় কোনো হুকুম গোপন করা হলে, তাতে কোনো দোষ নেই।

কোনো সৎকাজ করে সেজন্য প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের অপেক্ষা করা হলে সৎকাজ করা সত্ত্বেও শরিয়তের নিয়মানুযায়ী তা দূষণীয় এবং কাজ না করা সত্ত্বেও এরূপ আচরণ তো আরো বেশি দূষণীয়। আর মনের দিক দিয়ে এমন বাসনা সৃষ্টি হওয়া যে, আমিও অমুক কাজটি করব এবং তাতে সুনাম হবে, তাহলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য যদি সুনামের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থা করা না হয়। -[বয়ানুল কুরআন]

এ আয়াতগুলোতে চিন্তা-ভাবনার প্রসঙ্গেই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ভাবতে হবে।

এক. আসমান-জমিন সৃষ্টি বলতে কি বুঝায় : خَالِق শব্দের অর্থে নতুন আবিষ্কার ও সৃষ্টি। অর্থ হচ্ছে, আসমান এবং জমিন সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান। এ দুয়ের মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টিরাজিকেও এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এ বিরাট সৃষ্টজগতের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই স্ব স্ব সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

আরো একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে اَلسَّمٰوٰت শব্দ দ্বারা যেমন উর্ধ্বজগত তথা সকল উন্নতি বুঝায়, তেমনি اَرْض বলতে নিম্নজগত তথা নিম্নমুখী সব কিছুকেই বুঝায়। সে মতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন সকল উচ্চতা ও উন্নতির সৃষ্টিকর্তা, তেমনি নিম্নজগত তথা সকল নিম্নমুখিতারও সৃষ্টিকর্তা।

দুই. দিন রাত্রির আবর্তন : চিন্তা-ভাবনার দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, দিন-রাত্রির আবর্তন অর্থে কি বুঝানো হয়েছে। এখানে اِخْتِلَافٌ শব্দটি আরবি ভাষায় اِخْتَلَفَ فُلَانٌ فُلَانًا [অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির পরে এসেছে।] থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সে মতে وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ বাক্যের অর্থ হবে, রাত্রির গমন এবং দিবসের আগমন।'

اِخْتِلَافٌ শব্দ দ্বারা কম-বেশিও বুঝায়। যেমন, শীতকালে রাত্র হয় দীর্ঘ এবং দিন হয় ছোট, গরমকালে দিন বড় হয় এবং রাত্রি হয় ছোট। অনুরূপ এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিবস এবং রাত্রির দৈর্ঘের তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন, উত্তর মেরুর সন্নিকটবর্তী দেশগুলোতে দিবাভাগ উত্তর মেরু থেকে দূরবর্তী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘ হয়। এসবগুলো বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরতের একেকটি অতি উজ্জ্বল নিদর্শন।

তিন. "আয়াত" শব্দের অর্থ : তৃতীয় ভাবনার বিষয় হচ্ছে 'আয়াত' বা নিদর্শন বলতে কি বুঝায় اٰيَةٌ - اٰيٰتٌ -এর বহুবচন। শব্দটি কয়েকটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা মু'জিযাকে যেমন 'আয়াত' বলা হয়, তেমনি কুরআন শরীফের বাক্যকেও 'আয়াত' বলা হয়। তৃতীয় অর্থে দলিল প্রমাণও বুঝানো হয়ে থাকে। এখানে তৃতীয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, এসব বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বিরাট নিদর্শনাবলি রয়েছে।

চার. أُولُو الْأَلْبَابِ চতুর্থ বিবেচ্য বিষয় হলো– أُولُو الْأَلْبَابِ শব্দের অর্থ। এ সম্পর্কে ভাবনার বিষয় হচ্ছে, এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

أَلْبَابُ শব্দটি لُبٌّ শব্দের বহুবচন। অর্থ– মগজ। প্রত্যেক বস্তুরই মগজ অর্থে তার সারবস্তুকে বুঝায় এবং সে সারটুকু দ্বারা সংশ্লিষ্ট বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়। এ কারণেই মানুষের বুদ্ধি ও মেধাকে لُبٌّ বলা হয়। কেননা বুদ্ধিই মানুষের প্রধান সারবস্তু। সেমতে أُولُو الْأَلْبَابِ শব্দের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিসম্পন্ন লোকজন।

বুদ্ধিমান শুধুমাত্র তারাই যারা ঈমান গ্রহণ করে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করে : এ বিষয়টি ছিল লক্ষ্যণীয় যে, বুদ্ধিমান বলতে কাদেরকে বুঝায়? কারণ সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি মানুষই বুদ্ধিমান হওয়ার দাবিদার। কোনো একজন একান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও নিজেকে নির্বোধ বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সেজন্যই কুরআনে কারীম বুদ্ধিমানের এমন কয়েকটি লক্ষণ বাতলে দিয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষেই বুদ্ধির মাপকাঠি হিসেবে গণ্য হতে পারে।

প্রথম লক্ষণটি হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অনুভূত বিষয়ের জ্ঞান কান, নাক, চোখ, জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও লাভ করা যায়। নির্বোধ জীব-জন্তুর মধ্যেও তা রয়েছে। পক্ষান্তরে বুদ্ধির কাজ হলো লক্ষ্যণীয় নিদর্শনাদির মধ্য থেকে গৃহীত দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে এমন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীতি হওয়া যা অনুভবযোগ্য নয় এবং যার দ্বারা বাস্তবতার সর্বশেষ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

এই মূলনীতির প্রেক্ষিতে সৃষ্ট-জগতের প্রতি লক্ষ্য করলে আসমান জমিন এবং এর অন্তর্গত যাবতীয় সৃষ্টি ও সেগুলোর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সামগ্রীর সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা বুদ্ধিকে এমন এক সত্তার সন্ধান দেয়, যা জ্ঞান অভিজ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত এবং যিনি যাবতীয় বস্তু সামগ্রীকে বিশেষ হেকমতের দ্বারা তৈরি করেছেন। তাঁর ইচ্ছায়ই এই সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুতঃ সে সত্তা একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুরই হতে পারে।

মানুষের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বদা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কাজেই তাকে এই ব্যবস্থার পরিচালক বলা চলে না। সেজন্যই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তাতে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুদ্ধির সামনে একটিমাত্র পরিণতি সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর তা হলো আল্লাহর পরিচয় লাভ, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁরই জিকির করা। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে সে বুদ্ধিমান বলে কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কাজেই কুরআন মাজীদ বুদ্ধিমানের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে–

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ অর্থাৎ, বুদ্ধিমান হলো সে সমস্ত লোক যারা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে ডানে ও বায়ে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার স্মরণে নিয়োজিত থাকে।

এতে বুঝা গেল, বর্তমান পৃথিবী যে বিষয়টিকে বুদ্ধি এবং বুদ্ধিমানের মাপকাঠি বলে গণ্য করে নিয়েছে, তা শুধুমাত্র একটা ধোঁকা। কেউ ধন-সম্পদ গুটিয়ে নেওয়াকে বুদ্ধিমত্তা সাব্যস্ত করেছে, কেউ বিভিন্ন ধরনের কল-কব্জা তৈরি করা কিংবা বাষ্প-বিদ্যুৎকে প্রকৃত শক্তি মনে করার নামই রেখেছে বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু সুস্থ বিবেক ও সুষ্ঠু বুদ্ধির কথা হলো তাই, যা আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন। যাতে করে ইলম ও হিকমতের আলোকে পার্থিব ব্যবস্থা পরম্পরা নিম্ন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে গিয়ে মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোকে উপেক্ষা করেছে। বিজ্ঞান তোমাদেরকে কাঁচা মাল থেকে কল-কারখানা পর্যন্ত এবং কল-কারখানা থেকে বাষ্প-বিদ্যুতের শক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু বুদ্ধির কাজ হলো আরো একটু এগিয়ে দেওয়া যাতে তোমরা বুঝতে পার, উপলব্ধি করতে পার যে, আসল কাজটি কি মাটি, পানি বা লোহা-তামার, না মেশিনের; আর নাইকি সেগুলোর মাধ্যমে তৈরি বাষ্পের; বরং কাজটি তাঁরই যিনি আগুন, পানি ও বায়ুকে সৃষ্টি করেছেন– যার ফলে এই বিদ্যুৎ, এই বাষ্প তোমরা পেতে পারছ।

এ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, সেসব লোকই শুধু বুদ্ধিমান বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য, যারা আল্লাহকে চিনবেন এবং সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ তাঁকে স্মরণ করবেন।

সারকথা, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও সৃষ্টজগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তার মাহাত্ম্য ও কুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ও উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। সেগুলোর মধ্যে গভীর মনোনিবেশ করে তা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ না করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা উল্লিখিত আয়াতের শেষ বাক্যে আল্লাহর নির্দেশসমূহে চিন্তা গবেষণা করার ফলাফল বাতলে দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন সৃষ্টির উপর যে লোক চিন্তা-ভাবনা করে সে

লোক এই অবস্থায় না পৌঁছে পারে না যে, এসব বস্তু-সামগ্রীকে আল্লাহ নিরর্থক সৃষ্টি করেননি; বরং এসবের সৃষ্টির পেছনে হাজারো তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সে সমস্তকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়ে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবী তাদের কল্যাণের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত আরাধনার উদ্দেশ্যে। এটাই হলো তাদের জীবনের লক্ষ্য। তারপর চিন্তা-গবেষণা করে এই তাৎপর্য আবিষ্কারের সমর্থ হয়েছে যে, গোটা এই বিশ্ব-সৃষ্টি নিরর্থক নয়; বরং এগুলো সবই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসীম কুদরতে ও হেকমতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পরবর্তীতে সে সমস্ত লোকের কয়েকটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা উল্লেখ করা হয়েছে যা তারা নিজেদের পালনর্তাকে চিনে নিয়ে তাঁর মহান দরবারে পেশ করেছিলেন।

প্রথম আবেদনটি ছিল এই যে, فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা কর।

দ্বিতীয় আবেদনে আমাদেরকে আখেরাতের লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি দান কর। কারণ যাদেরকে তুমি জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবে, তাদেরকে সমগ্র বিশ্বের সামনে লাঞ্ছিত করা হবে। কোনো কোনো ওলামা লিখেছেন হাশরের মাঠের লাঞ্ছনা এমন এক আজাব হবে যার ফলে মানুষ কামনা করবে যে, হায়! যদি তাকে জাহান্নামেই দিয়ে দেওয়া হতো, তবুও যদি তার অপকর্মের প্রচার গোটা হাশরের সামনে করা না হতো।

তৃতীয় আবেদন, আমরা তোমার পক্ষ থেকে আগত আহ্বানকারী রাসূলে মাকবূল ﷺ-এর আহবান শুনেছি এবং তাতে ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের বড় গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের অন্যায় ও দোষ ত্রুটি কাফফারা করে দাও আর আমাদেরকে নেককার ও সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যু দান কর। অর্থাৎ তাদের শ্রেণিভুক্ত করে দাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَدْ اَخْزَيْتَهٗ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِخْزَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তুমি তাকে অপদস্থ করে দিয়েছ।

كَفِّرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْفِيْرُ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তুমি দূর করে দাও।

تَوَفَّنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّى মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তুমি মৃত্যু দাও, মিটিয়ে দাও।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ : এখানে نَبَذُوْا ফে'ল যমীর ফা'য়েল, ه মাফউল وَرَاءَ মুযাফ ظُهُوْر মুযাফ ইলাইহি হয়ে পনুরায় مضاف ও مضاف اليه মিলে পুনরায় مضاف এবার هِمْ মুযাফ ইলাইহি মুযাফ مضاف اليه মিলে ظرف হলো। সুতরাং فعل ـ فاعل ـ مفعول ও ظرف মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হলো।

قوله وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر : এখানে اللّٰهُ শব্দটি مبتدأ পরের قَدِيْرٌ শিবহে ফে'ল عَلٰى হরফে জার كل মুযাফ شَيْءٍ মুযাফ ইলাইহি। مضاف ও مضاف اليه মিলে مجرور জার ও মাজরূর মিলে متعلق হলো قَدِيْرٌ শিবহে ফে'লের সাথে। شبه فعل তার متعلق মিলে شبه جملة হয়ে خبر হলো। সুতরাং مبتدأ ও خبر মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হলো।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (١٩٤)

অনুবাদ : (১৯৪) হে আমাদের রব! আর আমাদেরকে তাও দান করুন যার প্রতিশ্রুতি আপনি স্বীয় পয়গম্বরদের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়েছেন, আর কিয়ামত দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না, নিশ্চয় আপনি ওয়াদার খেলাফ করেন না।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥)

(১৯৫) অনন্তর মঞ্জুর করলেন তাদের প্রার্থনা তাদের পরওয়ারদেগার এই জন্য যে, আমি তোমাদের মধ্য হতে কোনো আমলকারীর আমলকে বিফল করিনা, চাই সে পুরুষই হোক বা নারী, তোমরা একে অন্যের অংশ, সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং নিজেদের ঘরবাড়ি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং জিহাদ করেছে ও শহীদ হয়েছে, নিশ্চয় তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিব এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে এমন উদ্যানে [জান্নাতে] দাখিল করব, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, এই বিনিময় প্রাপ্ত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর আল্লাহরই নিকট উত্তম বিনিময় রয়েছে।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ (١٩٦)

(১৯৬) [হে সত্যান্বেষী!] তোমাকে যেন নগরসমূহে কাফেরদের গমনাগমন প্রতারিত না করে।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٩٧)

(১৯৭) মাত্র কয়েক দিনের উপভোগ। অতঃপর তাদের বাসস্থান হবে দোজখ, এবং এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯৪) رَبَّنَا হে আমাদের রব! وَاٰتِنَا আর আমাদেরকে তাও দান করুন مَا وَعَدْتَّنَا যার প্রতিশ্রুতি আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন عَلٰى رُسُلِكَ স্বীয় পয়গম্বরদের মাধ্যমে وَلَا تُخْزِنَا আর আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ নিশ্চয় আপনি ওয়াদার খেলাফ করেন না।

(১৯৫) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ অনন্তর মঞ্জুর করলেন তাদের প্রার্থনা رَبُّهُمْ তাদের পরওয়ারদেগার اَنِّيْ لَا اُضِيْعُ এই জন্য যে, আমি বিফল করিনা عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ তোমাদের মধ্য হতে কোনো আমলকারীর আমলকে مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى চাই সে পুরুষই হোক বা নারী بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ তোমরা একে অন্যের অংশ। فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا সুতরাং যারা হিজরত করেছে وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ এবং নিজেদের ঘরবাড়ি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ এবং আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে। وَقٰتَلُوْا এবং জিহাদ করেছে وَقُتِلُوْا ও শহীদ হয়েছে لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ নিশ্চয় তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিব وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে এমন উদ্যানে দাখিল করব تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ এই বিনিময় প্রাপ্ত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ আর আল্লাহরই নিকট حُسْنُ الثَّوَابِ উত্তম বিনিময় রয়েছে।

(১৯৬) لَا يَغُرَّنَّكَ তোমাকে যেন প্রতারিত না করে। تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেরদের গমনাগমন فِي الْبِلَادِ নগরসমূহে।

(১৯৭) مَتَاعٌ قَلِيْلٌ মাত্র কয়েক দিনের উপভোগ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ অতঃপর তাদের বাসস্থান হবে দোজখ وَبِئْسَ الْمِهَادُ এবং এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান।

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ (۱۹۸)	(১৯৮) কিন্তু যারা স্বীয় রবকে ভয় করে তাদের জন্য উদ্যানসমূহ রয়েছে, যার নিম্নে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তারা এটাতে অনন্তকাল থাকবে, এটা মেহমানী হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যাকিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে তা নেককারদের জন্য বহুগুণে উত্তম।
وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (۱۹۹)	(১৯৯) আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য এমনও আছে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং এই কিতাবের প্রতিও যা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল, এরূপে যে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করে না এরূপ লোকদের উত্তম বিনিময় মিলবে তাদের প্রতিপালকের নিকট, নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই হিসাব করে দিবেন।
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (۲۰۰)	(২০০) হে ঈমানদারগণ! স্বয়ং ধৈর্য অবলম্বন কর ও জিহাদে ধৈর্য রাখ এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যেন তোমরা পূর্ণ সফলকাম হও।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯৮) لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا কিন্তু যারা ভয় করে رَبَّهُمْ স্বীয় রবকে لَهُمْ جَنّٰتٌ তাদের জন্য উদ্যানসমূহ রয়েছে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তারা এটাতে অনন্তকাল থাকবে نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ তাতে মেহমানী হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ আর যাকিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ তা নেককারদের জন্য বহুগুণে উত্তম।

(১৯৯) وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য এমনও আছে لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ এবং এই কিতাবের প্রতিও যা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ এরূপে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের পরিবর্তে গ্রহণ করে না ثَمَنًا قَلِيْلًا তুচ্ছ বিনিময় اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ এরূপ লোকদের উত্তম বিনিময় মিলবে عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিকট اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই হিসাব করে দিবেন।

(২০০) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে ঈমানদারগণ! اصْبِرُوْا স্বয়ং ধৈর্য অবলম্বন কর। وَصَابِرُوْا ও জিহাদে ধৈর্য রাখ। وَرَابِطُوْا এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাক وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ যেন তোমরা পূর্ণ সফলকাম হও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৯৫) قوله فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির, ইবনে আবী হাতেম তাবারানী ও হাকেম হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ পুরুষদের হিজরত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, মহিলাদের হিজরত করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু বর্ণনা করেছেন তা তো শুনতে পাইনি। তখন আল্লাহ তা'আল আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ১ : ৪১৩, বাহরে মুহীত ৩ : ১৫০, কাশশাফ– ১ : ৪৮৫, বায়যাভী ১ : ৫৫ : ইবনে কাছীর : ১ : ৪৪১, রূহুল মা'আনী ১৬৮/২/৪]

(১৯৫) قوله لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, কোনো এক ব্যক্তি কোনো মহিলাকে চুমু খেয়ে অনুতপ্ত হয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন রাসূল ﷺ নীরব থাকেন। এ সময় আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৭০/২/৪-সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে]

(১৯৭) قوله لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ওয়াহেদী বর্ণনা করেন যে, মুশরিক সম্প্রদায় তারা স্বচ্ছলতায়, ভোগ-বিলাসিতায় জীবন যাপন করছিল। আর তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিলাসিতায় মত্ত ছিল। সুতরাং কোনো কোনো মুমিন মন্তব্য করল যে, আল্লাহ তা'আলার শত্রুদেরকে সাচ্ছন্দে বসবাস করতে দেখতে পাচ্ছি। আমরা ক্ষুধা ও দুঃখ কষ্টে নিস্পেষিত হচ্ছি। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। কারো মতে মুশরিকের স্থলে ইহুদি হবে।

শানে নুযূল– ২ : আরো বর্ণিত আছে যে, ইহুদি কিংবা মুশরিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে বিভিন্ন দেশে বিচরণ করত এবং ধন-সম্পদের পাহাড় সংগ্রহ করত। আর ঈমানদার মানুষেরা কষ্ট ক্লেশে কালাতিপাত করত। ফলে ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দান করার লক্ষ্যে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৭২/২/৪]

(১৯৯) قوله وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম নাসায়ী (র.) বাযযার, ইবনে মুনযির , ইবনে আবূ হাতেম ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবিসিনিয়ার [বর্তমান ইরেত্রীয়া] বাদশাহ নাজ্জাশী যখন ইন্তেকাল করেন, তখন রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা তার জানাযার নামাজ আদায় কর। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন হাবশী [আবিসিনিয়া আফ্রেকী] গোলামের জন্য? তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর হযরত জাবের (রা.) হতে مَرْفُوْعًا বর্ণনা করেন, মুনাফিক সম্প্রদায় একদা বলল, তোমরা এ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর! তিনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ খ্রিস্টানের উপর জানাযা আদায় করছেন। তখন মুনাফিকদের এ দূরভিসন্ধিমূলক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : হাকেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত নাজ্জাশী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ১ : ৪১৫]

শানে নুযূল– ৪ : ইবনে জারীর হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণনা করেন, নাজ্জাশী যখন ইন্তেকাল করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা বের হয়ে তোমাদের ভাইদের জন্য জানাযা আদায় কর। ফলে তিনি আমাদেরকে নিয়ে চার তাকবীরের সহিত জানাযা আদায় করেন। তখন মুনাফিকেরা বলল, তোমরা এ মানুষটির প্রতি লক্ষ্য কর তিনি একজন অনারবি খ্রিস্টানের প্রতি জানাযা আদায় করছেন। যা কখনো দৃষ্টিগোচর হয়নি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ১ : ৪৪৩, রূহুল মা'আনী ১৭৩/২/৪]

শানে নুযূল– ৫ : হযরত আতা (রা.) হতে বর্ণিত যে, এ আয়াত ৪০ জন নাজরানবাসী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। যারা হলেন বনূ হারেছ বিন কা'আব এর লোকজন, ৩২ জন আবেসিনীয় এবং আটজন রোমীয়দের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা সকলই হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর তারা নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন।

শানে নুযূল–৬ : ইবনে জুরাইজ ইবনে যায়েদ ও ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে এক জামাত ইহুদি সম্পর্কে, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও তাঁর অনুসারীরা।

শানে নুযূল– ৭ : হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত রয়েছে যে, যে সকল আহলে কিতাব ঈমান গ্রহণ করেছেন, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে তবে প্রসিদ্ধ মতামত হলো, আলোচ্য আয়াত নাজ্জাশী বাদশাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী ১৭৩/২/৪]

শানে নুযূল– ৮ : ইবনে আবী হাতেম ও হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাজ্জাশী যখন ইন্তেকাল করেন, তখন রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের ভাইদের জন্য এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা কর। তখন কোনো কোনো মানুষ বলল, তিনি অনারবী একজন কাফের। আবিসিনিয়া ভূখণ্ডে ইন্তেকাল করেছেন। রাসূল ﷺ বললেন, তার ব্যাপারে এস্তেগফার করার জন্য আমাকে নির্দেশ করা হচ্ছে। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর– ১ : ৪৪৩]

(২০০) قوله يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে মারদুভিয়া হযরত সালামা বিন আব্দুর রহমান হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একদিন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর নিকট আসলাম, তখন তিনি বললেন, হে ভাতিজা! يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا আয়াত কাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, তুমি কি তা জান? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, প্রকারান্তরে রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় এমন কোনো গাযওয়া বা যুদ্ধ অভিযান সংঘটিত হয়নি যার মধ্যে পাহারাদারি করার কোনো প্রয়োজন ছিল। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন সে সম্প্রদায় সম্পর্কে, যারা যথাসময়ে নামাজ আদায় করার লক্ষ্যে মসজিদসমূহ নির্মাণ করছে এবং সে জন্য অপেক্ষামান থাকে, তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী ১৭৬/২/৪, ইবনে কাছীর ৪৪৪/১]

শানে নুযূল– ২ : হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে এবং ইবনে জারীর হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, শোন! যে সকল বিষয় পাপ-পঙ্কিলতা মিটিয়ে দেয়, সে সকল বিষয় আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব কি? তাহলো পরিপূর্ণভাবে অজু করা কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও। এক নামাজের পর পরবর্তী নামাজের জন্য অপেক্ষমান থাকা। সুতরাং তাই হলো রিবাত্ব। সে সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[রুহুল মা'আনী]

قوله رَبَّنَا اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا الخ : উপরিউক্ত তিনটি আবেদন ছিল আজাব, কষ্ট এবং অনিষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য। পরবর্তীতে চতুর্থ আবেদনটি করা হয়েছে কল্যাণ লাভ সম্পর্কে যে, নবী রাসূলগণের মাধ্যমে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের যে প্রতিশ্রুতি তুমি দান করেছ, তা আমাদেরকে দান কর। কিয়ামতের দিন যেন লাঞ্ছনাও না হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক জবাবদিহী ও বদনামীর পর মাফ করার পরিবর্তে প্রথম পর্যায়েই আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তুমি তো ওয়াদা ভঙ্গ কর না, কিন্তু এই আবেদন নিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আমাদেরকে এমন যোগ্যতা দান কর যাতে আমরা তোমার সে ওয়াদা লাভের অধিকারী হতে পারি এবং শেষ পর্যন্ত যেন তাতে স্থির থাকতে পারি। আমাদের মৃত্যু যেন ঈমান ও আ'মালে ছালেহার সাথে হয়।

হিজরত ও শাহাদাতের দ্বারা হক্কুল ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়: لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ আয়াতের আওতায় এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, আল্লাহর হকের বেলায় যে সমস্ত ত্রুটি গাফলতি ও পাপ-তাপ হয়ে থাকবে তা হিজরত ও শাহাদাতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ, স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ হাদীসে ঋণ-ধারকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন; বরং তাঁর ক্ষমার নিয়ম হলো স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তার ওয়ারিশদেরকে প্রাপ্য পরিশোধ করে দিবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাজি করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কারো কারো ব্যাপারে এমন হবেও বটে।

এ আয়াতটিতে মুসলমানদেরকে তিনটি বিষয়ে নসিহত করা হয়েছে।

১. সবর, ২. মুসাবারাহ, ৩. মুরাবাতা ও তাকওয়া, যা এ তিনের সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত।

'সবর' শব্দের অর্থ বিরত রাখা ও বাধা। আর কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এর অর্থ নফসকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে।

এক. اَلصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল যে সমস্ত কাজের হুকুম দিয়েছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা।

দুই. اَلصَّبْرُ عَنِ الْمَعَاصِىْ অর্থাৎ, যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, যত স্বাদেরই হোক না কেন, তা থেকে মনকে বিরত রাখা।

তিন. اَلصَّبْرُ عَلَى الْمَصَائِبِ অর্থাৎ, বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহরই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মস্তিষ্ককে সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা।

'মোসাবারাহ' শব্দটি সবর থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ, শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। আর মোরাবাতা অর্থ হলো ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ অর্থেই কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. ইসলামি সীমান্তের হেফাজতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, যাতে ইসলামি সীমান্তের প্রতি শত্রুরা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়।
২. জামাতের নামাজের এমন নিয়ামানুবর্তিতা করা যে, এক নামাজান্তেই দ্বিতীয় নামাজের জন্য অপেক্ষমান থাকা। এ দু'টি বিষয়ই ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মকবুল ইবাদত। এর মাহাত্ম্য অসংখ্য অগণিত। এখানে কয়েকটি মাত্র লিখে দেওয়া হলো।

রেবাত বা ইসলামি সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা : ইসলামি সীমান্তের হেফাজত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষারত থাকাকেই 'রেবাত ও মোরাবাতাহ বলা হয়। এর দুটি রূপ হতে পারে। প্রথমতঃ যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনাই নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত, এমতাবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রিম হেফাজত হিসেবে তার দেখাশুনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সেখানে [সীমান্তে] বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষ-বাস করে রুজি-রোজগার করাও জায়েজ। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুজি-রোজগার করা যদি তারই আনুষাঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন ব্যক্তিরও اَلرِّبَاطُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর ছওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনো যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের হেফাজত না হয়; বরং রুজি-রোজগারই হয় মুখ্য, তবে দৃশ্যতঃ সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন ব্যক্তি 'মোরাবিত ফী-সাবিলীল্লাহ' হবে না। অর্থাৎ, সে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না। দ্বিতীয়তঃ সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদেরকে সেখানে রাখা জায়েজ নয়। তখন সেখানে তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। -[কুরতুবী]

এতদুভয় অবস্থাতে 'রেবাত' বা সীমান্তরক্ষার অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর পথে একদিনের রেবাত' (সীমান্ত প্রহরা) সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সে সমুদয় থেকেও উত্তম।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত সালমান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, 'একদিন ও একরাতের রেবাত (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত এক মাসের রোজা এবং সমগ্র রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাও উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক ছওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রিজিক জারি থাকবে এবং সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) ফাযালাহ ইবনে ওবায়েদ এর রেওয়ায়েতক্রমে এ মর্মে এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় শুধুমাত্র মোরাবেত [ইসলামি সীমান্তরক্ষী] ছাড়া। অর্থাৎ তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে। এবং সে কবরে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী থেকে নিরাপদ থাকবে।

এসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'রেবাত' বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সমস্ত সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষাও উত্তম। কারণ সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সদকাকৃত বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, রচিত গ্রন্থরাজি কিংবা ওয়াকফকৃত জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যখন উপকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার

ছওয়াবও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে সীমান্ত প্রহরার ছওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। কারণ সমস্ত মুসলমানদের সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে। ফলে একজন সীমান্তরক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলমানদের সৎকাজের কারণ হয়। সে কারণে কিয়ামত পর্যন্ত তার রেবাত কর্মের ছওয়াব অব্যাহত থাকবে। তা ছাড়াও সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করতো, সেগুলোর ছওয়াবও আমল করা ছাড়াই সর্বদা জারি থাকবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اٰتِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا . ت . ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– তুমি আমাদেরকে দাও।

لَاتُخْزِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْزَاءُ মূলবর্ণ (خ . ز . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তুমি অপদস্থ করো না।

اُوْذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْذَاءُ মূলবর্ণ (ا . ذ . ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء ও ناقص يائى অর্থ– কষ্ট দেওয়া হয়েছে।

لَايَغُرَّنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نهى معروف بانون ثقيلة বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُرُوْرُ মূলবর্ণ (غ . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে যেন কখনো ধোঁকা দিতে না পারে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا : এখানে لَا يَشْتَرُوْنَ ফে'ল যমীরে هُمْ ফা'য়েল باء হরফে জার اٰيَاتِ মুযাফ اللّٰهِ শব্দটি মুযাফ ইলাইহি। مضاف ও مضاف اليه মিলে মাজরূর جار ও مجرور মিলে متعلق আর ثَمَنًا মাওসূফ قَلِيْلًا সিফাত, মাওসূফ ও সিফাত মিলে مفعول সুতরাং فعل متعلق . فاعل ও مفعول মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হলো।

قوله اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اللّٰهَ শব্দটি اِنَّ-এর اسم আর سَرِيْعُ মুযাফ الْحِسَابِ মুযাফ ইলাইহি مضاف ও مضاف اليه মিলে اِنَّ এর খবর اِنَّ তার اسم ও خبر নিয়ে جُمْلَة اِسْمِيَّة হলো।

سُوْرَةُ النِّسَآءِ

সূরা নিসা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত- ১৭৬, রুকূ'- ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (١)

অনুবাদ : (১) হে মানব! স্বীয় প্রতিপালক [-এর বিরোধিতা]-কে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক-ই প্রাণী [আদম আ.] হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং ঐ প্রাণী হতে তাঁর জোড়া [বিবি হাওয়াকে] সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হতে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট [স্বীয় হকের] দাবি করে থাক এবং আত্মীয়তা [-এর হক বিনষ্ট করা] হতেও ভয় কর, নিশ্চয়, আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا (٢)

(২) আর এতিমদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে দিতে থাক এবং তোমরা উত্তম বস্তুর সাথে নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময় করো না। আর এতিমদের ধন-সম্পত্তি ভোগ করো না নিজেদের ধন-সম্পত্তি থাকা পর্যন্ত, এরূপ করা গুরুতর পাপ।

শাব্দিক অনুবাদ

(১) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে মানব! اتَّقُوْا رَبَّكُمُ স্বীয় প্রতিপালক [-এর বিরোধিতা]-কে ভয় কর الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ যিনি তোমাদেরকে এক-ই প্রাণী [আদম আ.] হতে সৃষ্টি করেছেন وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا এবং ঐ প্রাণী হতে তাঁর জোড়া [বিবি হাওয়াকে] সৃষ্টি করেছেন وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً এবং এতদুভয় হতে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট [স্বীয় হকের] দাবি করে থাক وَالْاَرْحَامَ এবং আত্মীয়তা [-এর হক বিনষ্ট করা] হতেও ভয় কর اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন।

(২) وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ আর এতিমদের ধন সম্পত্তি তাদেরকে দিতে থাক وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ এবং তোমরা উত্তম বস্তুর সাথে নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময় করো না وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ আর এতিমদের ধন-সম্পত্তি ভোগ করো না اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ নিজেদের ধন-সম্পত্তি থাকা পর্যন্ত اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا এরূপ করা গুরুতর পাপ।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৩) আর যদি তোমাদের এ বিষয়ের আশঙ্কা থাকে যে, তোমরা এতিম বালিকাদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না। তাহলে অন্যান্য নারী হতে যারা তোমাদের মনঃপুত হয় বিবাহ করে নাও, দুই দুইটি, তিন তিনটি এবং চার চারটি নারীকে, অতঃপর যদি তোমাদের এই আশঙ্কা থাকে যে, ইনসাফ করতে পারবে না তাহলে একই বিবিতে ক্ষান্ত থাকবে অথবা যে দাসী তোমাদের স্বত্বাধিকারে আছে তাই যথেষ্ট, এই উল্লিখিত বিধানে অন্যায় না হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক।	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾
(৪) আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও, হ্যাঁ, তবে যদি স্ত্রীগণ সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদেরকে উক্ত মহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তা মর্যাদার-তৃপ্তিকর মনে করে উপভোগ কর।	وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾
(৫) আর তোমরা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন [বালেগ এতিম]-দেরকে [তাদের] স্বীয় ঐ মাল প্রদান করো না যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের [সকল মানবের] জন্য জীবন ধারণের উপকরণ করে দিয়েছেন এবং ঐ ধন-সম্পত্তির মধ্য হতে তাদেরকে খাওয়াতে থাক ও পরাতে থাক এবং তাদের সাথে যুক্তিসঙ্গত কথা বলতে থাক।	وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৩) وَإِنْ خِفْتُمْ আর যদি তোমাদের এ বিষয়ের আশঙ্কা করা যে أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰمٰى তোমরা এতিম বালিকাদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ তাহলে অন্যান্য নারী হতে যারা তোমাদের মনঃপুত হয় বিবাহ করে নাও مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ দুই দুইটি, তিন তিনটি এবং চার চারটি নারীকে فَإِنْ خِفْتُمْ অতঃপর যদি তোমাদের এই আশঙ্কা থাকে যে أَلَّا تَعْدِلُوا ইনসাফ করতে পারবে না فَوَاحِدَةً তাহলে একই বিবিতে ক্ষান্ত থাকবে أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ অথবা যে দাসী তোমাদের স্বত্বাধিকারে আছে তাই যথেষ্ট ذٰلِكَ أَدْنٰى أَلَّا تَعُولُوا এই উল্লিখিত বিধানে অন্যায় না হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক।

(৪) وَآتُوا النِّسَاءَ আর তোমরা স্ত্রীদেরকে দিয়ে দাও صَدُقٰتِهِنَّ তাদের মহর نِحْلَةً সন্তুষ্টচিত্তে فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا হ্যাঁ, তবে যদি স্ত্রীগণ সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদেরকে উক্ত মহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয় فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا তবে তোমরা তা মর্যাদার-তৃপ্তিকর মনে করে উপভোগ কর।

(৫) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ আর তোমরা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন [বালেগ এতিম]-দেরকে [তাদের] স্বীয় ঐ মাল প্রদান করো না الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের [সকল মানবের] জন্য জীবন ধারণের উপকরণ করে দিয়েছেন وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا এবং ঐ ধন-সম্পত্তির মধ্য হতে তাদেরকে খাওয়াতে থাক وَاكْسُوهُمْ ও পরাতে থাক وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا এবং তাদের সাথে যুক্তিসঙ্গত কথা বলতে থাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা আল বাকারাহ ও আলে ইমরানে যেসব কথার বিবরণ রয়েছে তার কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা এ সূরায় সন্নিবেশিত হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের শেষ আয়াতে তাকওয়া ও পরহেজগারি অবলম্বনের নির্দেশ ছিল, আর এ সূরাকেও তাকওয়া অবলম্বন তথা আল্লাহর ভয়ের তাগিদ দ্বারাই আরম্ভ করা হয়েছে। এর দ্বারা পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো।

নামকরণ : اَلنِّسَاءُ শব্দটি বহুবচন, একবচন اِمْرَأَةٌ অর্থ– নারীগণ বা রমণীগণ। এটা جَمْعٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهٖ তথা একবচনের ভিন্ন শব্দের বহুবচন। অত্র সূরাতে اَلنِّسَاءُ শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে রমণীদের প্রসঙ্গে বহু হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– রমণীদের অধিকার, উত্তরাধিকার, স্বামীর নিকট স্ত্রীদের মর্যাদা ইত্যাদি। এ সমস্ত কারণে উল্লিখিত সূরাকে সূরা 'আননিসা' নামকরণ করা হয়েছে। সূরার নামকরণ 'আননিসা' করার অর্থ এই নয় যে, এতে শুধু রমণীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; বরং অপরাপর বিষয়ের মধ্যে রমণী সম্পর্কিত আলোচনাও এতে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা নিসা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট : হিজরতের পর প্রিয়নবী ﷺ-এর সামনে যেসব কাজ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে সেসব কাজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. **একটি নতুন ইসলামি সমাজ গঠন ও এর বিকাশ সাধন :** হিজরতের পরপরই রাসূল ﷺ-এর প্রচেষ্টায় সব গোত্রকে একত্রিত করে مِيْثَاقُ مَدِيْنَةَ নামে একটি মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে মদিনা তাইয়্যেবা ও তার আশেপাশের এলাকা নিয়ে একটি আন্তগোত্রীয় সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের পুরাতন পদ্ধতি নির্মূল করে নৈতিকতা, তামাদ্দুন, সামাজিক রীতি-নীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যবস্থায় নতুন নিয়ম-নীতি প্রচলনের আবশ্যকতা দেখা দেয়।

২. **তাওহীদের ভিত্তিতে অনাচারমুক্ত একটি শক্তিশালী সমাজ গঠন :** আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদি গোত্রসমূহ ও খ্রিস্টানদের বাতিল আকিদাসমূহের মূল-উৎপাটন ও তাদের সামাজিক অপরাধসমূহের উচ্ছেদ সাধন এবং مِيْثَاقُ مَدِيْنَةَ এর যাবতীয় নীতিমালা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

৩. **শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা :** বিরোধী শক্তিগুলোর সকল বাধা উপেক্ষা করে ইসলামের দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকা এবং এজন্য নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে মদিনায় ইসলামকে বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতঃ শোষণমুক্ত একটি সমাজ গঠন ছিল এ সময়ের অন্যতম দাবি। এ সময় আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে যতগুলো নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা সবই উল্লিখিত তিনটি বিভাগের সাথে সম্পর্কিত।

ইসলামের সামাজিক কাঠামো নির্মাণে এবং বাস্তবে এ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথম অবস্থায় জাহেলী চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত যে সমস্ত নির্দেশ ও বিধানের প্রয়োজন ছিল সেগুলো পূর্ববর্তী সূরাসমূহে আলোচনা করা হয়েছে। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত এ সমাজ আগের চেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে এখানে আরো নতুন নতুন বিধান ও নির্দেশের প্রয়োজন দেখা দেয়। এসব প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এবং মুসলমানরা কিভাবে ইসলামি পদ্ধতিতে তাদের সামাজিক জীবনধারার সংশোধন ও সংস্কার সাধন করতে পারে তা আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে এ সূরার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। যেমন– এ সূরায় পরিবার গঠনের রীতি-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, বিয়েকে পাত্র-পাত্রীভেদে বিধি-নিষেধের আওতাধীন করা হয়েছে, সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে, এতিমদের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মিরাস বণ্টনের নিয়ম-কানুন নির্ধারিত হয়েছে। অর্থনৈতিক লেনদেন পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘরোয়া বিবাদ মেটানোর পদ্ধতি শেখানো হয়েছে, অপরাধ দমনে দণ্ডবিধির ভিত গড়ে তোলা হয়েছে। মদ্যপানের উপর বিধি-নিষেধ কর্মধারা কেমন হতে পারে, মুসলমানদেরকে তার ধারণা দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দলীয় সংগঠন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধান দেওয়া হয়েছে। আহলে কিতাবের নৈতিক, ধর্মীয় মনোভাব ও কর্মনীতি বিশ্লেষণ করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে। মুনাফিকদের কর্মনীতির সমালোচনা করে যথার্থ ও খাঁটি ঈমানদারির এবং ঈমান ও নিফাকের পার্থক্যসূচক চেহারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

তাছাড়া জিহাদের নির্দেশাবলি, মুনাফিক ও আহলে কিতাবের অবস্থা এবং মুশরিকদের আকিদা খণ্ডন, ইসলাম বিরোধীদের পরিণতি, মুসলমানদের পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি, নারী জাতির মর্যাদা ইত্যাদি বহু সমস্যার সমাধানকল্পে এ সূরার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

বিষয়বস্তু : সূরা আন নিসা মদিনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ১৭৬টি আয়াত, ৩০৪৫টি বাক্য, ৬০৩০ টি অক্ষর এবং ২৪টি রুকূ' রয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে বদর এবং ওহুদ যুদ্ধের পর মুসলিম জাতির অভ্যুত্থান শুধু আরববাসীকেই নয়; বরং সমগ্র বিশ্বকে আকৃষ্ট করেছিল। বিভিন্ন জাতির সঙ্গে মুসলমানদের উঠা-বসা ও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়েছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ণ বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছিল এবং যুগে যুগে সমস্ত কুসংস্কারের যে অন্ধকার আরববাসীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে পরিহার করার নির্দেশ এসেছিল। যুদ্ধে যাঁরা শাহাদাত বরণ করেন তাঁদের উত্তরাধিকারের যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল এবং শহীদদের এতিম শিশুদের প্রসঙ্গ ও তাঁদের বিধবা স্ত্রীদের বিষয়, এতিমদের হক, বিয়ে-শাদীর নিয়ম-কানুন, মুহাজির ও আনসারদের ঐক্য, আর সে ঐক্যে ফাটল ধরাবার মুনাফেকী অপচেষ্টা, আত্মীয়-স্বজনের হক, প্রতিবেশির অধিকার, পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালনের তাগিদ, আত্মসংশোধনের শিক্ষা, যুদ্ধ অবস্থায় নামাজের প্রশিক্ষণ, মুনাফিকের ষড়যন্ত্র ও তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী, অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তি প্রভৃতি বিষয়ই এ সূরায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত ওহুদের যুদ্ধের পর যেসব সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলোর সমাধানই পেশ করা হয়েছে সূরার প্রারম্ভে এবং এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম এতিমদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সূরার শুরুতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র মানবজাতি একই বাপ-মায়ের সন্তান। ভ্রাতৃত্বের এ বন্ধনকে সুদৃঢ় করা মানবতার মানোন্নয়নের পূর্বশর্ত। বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য, মানুষের পরস্পরের মমত্ববোধ এবং সহমর্মিতার উপর এ সূরায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরার চারটি অংশ মদিনা মুনাওয়ারায় চার সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে–

প্রথম অংশ : সূরার প্রথম হতে চতুর্থ রুকূর দু' আয়াত পর্যন্ত। এ অংশ সম্ভবত বদর যুদ্ধের পরবর্তী কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ : চতুর্থ রুকূ'র তৃতীয় আয়াত থেকে ষষ্ঠ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত। নবম হিজরিতে নাজরান প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় এ অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

তৃতীয় অংশ : সপ্তম রুকূ'র প্রথম হতে দ্বাদশ রুকু'র শেষ পর্যন্ত। সম্ভবত প্রথম অংশের সময়েই এ অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

চতুর্থ অংশ : ত্রয়োদশ রুকূ' হতে শেষ পর্যন্ত। এ অংশ ওহুদ যুদ্ধের সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল : ইমাম কুরতুবী (র.) এর মতানুসারে সূরা নিসা মদনী তার একটি আয়াত মক্কা বিজয়কালে উসমান বিন তালহা বিন হাজরামী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর সে আয়াতটি হলো সূরা নিসার ৫৮ নং আয়াত إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا الخ

শানে নুযূল : নাক্কাশ অন্যান্য মতানুসারে মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করে যাবার পথে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল : আলকামা বিন কায়স আন নাখয়ী [তাবেয়ী] এর মতে يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الخ মক্কী। সুতরাং প্রথমাংশ মক্কী বাকি সূরা মদনী। নাহহাস বলেন এ সূরাটি মক্কী।

আল্লামা কুরতুবী (র.) এর সঠিক মতামত হচ্ছে একটি আয়াত ব্যতিরেকে এ সূরাটি মদনী। কারণ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, আমি যখন রাসূল ﷺ -এর নিকট অবস্থান করি তখনই সূরা নিসা অবতীর্ণ হয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এতে একমত যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর সাথে রাসূল ﷺ-এর বাসর রাত্র মদিনাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এতে প্রতিভাত হয় যে, এ সূরায় যে সকল বিধি-বিধান বর্ণিত হবে সবই মদনী হবে।

অতএব يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الخ আয়াতকে যারা মক্কী বলে মন্তব্য করেছেন তাদের মন্তব্য ঠিক নয়।

(২) قوله وَاٰتُوا الْيَتٰمٰىٓ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, গিতফান গোত্রের এক লোকের নিকট তার এতিম ভ্রাতুষ্পুত্র (ভাতিজা)

-এর বিপুল পরিমাণ মাল ছিল। অতঃপর এতিম যখন বালেগ হলো, তখন চাচার নিকট রক্ষিত মাল ভাতিজার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করল। ফলে তার এ বিবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হয়। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর : ৪২৩/১, বাহরে মুহীত ১৬৭, কাশশাফ- ১ : ৪৯৫]

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, আইয়ামে জাহেলিয়াতের প্রথা বিলুপ্ত করে তাদেরকে তাদের মালের ওয়ারিশ বানাবার নির্দেশ দিয়েছেন। -[বাহরে মুহীত ১৬৮/৩]

قوله وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ : সহীহ** মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত এতিমদের অভিভাবক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাদের লালন-পালন করার কারণে তাদের সৌন্দর্য ঈর্ষান্বিত হয়ে দাঁড়ায়। তারা তাদেরকে লালন-পালন করার কারণে এতিমদের মহর হ্রাস করে। কাজেই তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, তাদেরকে মহর প্রদান করার ক্ষেত্রে ন্যায়নীতির পন্থা অবলম্বন কর। সুতরাং যারা ন্যায় সঙ্গতভাবে মহর প্রদান করবেনা, তাদের জন্য অপরিহার্য হলো পছন্দসই অন্য নারীদেরকে বিবাহ করা, যারা নিজেদের অধিকার সংরক্ষণে ক্ষমতাবান হবে। বারীয়াও এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইকরিমা বলেন, কুরাইশদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে, তাদের একেক জন পুরুষ দশ জন করে মহিলা বিবাহ করত, এমন কি তদপেক্ষা বেশিও বিবাহ করত। আর কম বিবাহও করত, যদি আর্থিকভাবে সংকটাপন্ন থাকত। সে ক্ষেত্রে তারা সকলের মধ্যে ন্যায় সঙ্গতভাবে তাদের অধিকার আদায় করত না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন, আরবরা এতিমের মাল নিয়ে সংকটাপন্নভাব অনুভব করত। কিন্তু একাধিক স্ত্রীদের মাঝে ন্যায় নীতি অবলম্বন করাতে কোনো সংকট মনে করত না তারা দশ বা দশোর্ধ বিবাহ করত। তাদের এ সকল আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : হযরত মুজাহিদ বলেন, জেনা ব্যভিচার করা থেকে সতর্ক করণার্থে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা এতিমদের মাল থেকে যেরূপভাবে বেঁচে থাক অনুরূপভাবে জেনা করা থেকেও বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। -[বাহরে মুহীত ১৬৯/৩, ফাতহুল কাদীর ৪২৩/১]

(৪) قوله وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে আবী হাতেম আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কোনো পুরুষ যদি কোনো এতিমা মহিলাকে বিবাহ দিয়ে সে মহিলা ব্যতীত অন্য মহিলা বিবহ করতো তাহলে এতিমদের জন্য নির্ধারিত মহর মেয়েকে না দিয়ে নিজেই তা হস্তগত কিরে নিত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এতিমা মহিলাদের মহর হস্তগত করতে নিষেধ করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী, ইবনে কাছীর ৪৫২/১, ফাতহুল কাদীর ৪২৫/১]

শানে নুযূল– ২ : কালবীর বর্ণনানুযায়ী, জাহেলি যুগে অভিভাবক যখন কোনো মেয়েকে বিবাহ দিত তখন সে মেয়েটি অভিভাবকের সাথে যদি স্বচ্ছলতার সাথে থাকত, তাহলে তার মহর থেকে কিছুই তাকে প্রদান করত না। আর যদি দরিদ্র হতো, তাহলে সে মহিলাটিকে একটি উটের উপর আরোহণ করিয়ে স্বামীর বাড়ি পাঠিয়ে দিত। সে উট ব্যতীত তাঁকে মহর হিসেবে আর কিছুই প্রদান করত না। এতিমা নারীদের প্রতি অভিভাবকদের এহেন আচরণের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[কুরতুবী ২৬/৫]

শানে নুযূল– ৩ : আবূ সালেহ হতে বর্ণিত, কোনো পুরুষ যখন তার কন্যা বিবাহ দিত, তখন পিতা তদ্বীয় কন্যার মহরের বস্তু হস্তগত করে নিত, মেয়ে সে মহরের অধিকারী হতো না। পিতা কন্যার মহরের টাকা হস্তগত না করার নির্দেশ দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

(৪) قوله فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ الخ : **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হাযরামী বলেন, স্বামীরা স্ত্রীদেরকে আদায় যোগ্য মহরের টাকা পরিশোধ করলে স্ত্রীরা তা পাওয়ার পর সে মহরের টাকা থেকে আনন্দচিত্তে স্বেচ্ছায় স্বামীদেরকে আংশিক বা পূর্ণটাই ফেরত দিত। স্বামীরা এ টাকা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকত এবং তা গ্রহণ করাকে অমঙ্গলজনক বলে মনে করত। ফলে তাদের এ ধারণা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। -[বাহরে মুহীত : ১৭৪/৩]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর হাযরামীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সাধারণত মানুষেরা স্ত্রীদেরকে মহরের টাকা যা প্রদান করত, সে টাকা হতে কিছু ফিরিয়ে দিলে তা গ্রহণ করাকে গুনাহ বলে মনে করত। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

(৫) قوله وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيٰمًا الخ : **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ইবনে মাসউদ, হাসান, যাহহাক ও সুদ্দী (র.) বলেন, ছোট ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, একমাত্র মহিলাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী]

শানে নুযূল – ৩ : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) ও তাবারী প্রমুখ বলেন, আলোচ্য আয়াত ঐ সকল মানুষ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নির্বুদ্ধিতার গুণাবলি দিয়েছেন। তারা আরো বলেন মুজাহিদ উপরিউক্ত আয়াতকে শুধু মহিলাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, মূলত তা সঠিক নয়। –[বাহরে মুহীত ১৭৭/৩]

প্রথমোক্ত সূরায় বিভিন্ন যুদ্ধ-জিহাদ, শত্রুপক্ষের সাথে আচার-আচরণ, যুদ্ধলব্ধ বস্তু সামগ্রীর (গনিমতের মাল) অপচয় ও আত্মসাতের ভয়াবহ পরিণাম প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে। যেমন– অনাথ এতিমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হক্কুল ইবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণত দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে।

সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরি প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার যা মূলতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এসব অধিকার যদি কোনো এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ হয় অথবা সেক্ষেত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে।

কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের এতিম ছেলে মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এসব অধিকারকে তোলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোনো চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো উত্তম উপায় নেই। আর একেই বলা হয়েছে 'তাকওয়া'। বস্তুতঃ এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়। তাই আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে– .... يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ অর্থাৎ, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকে ভয় কর। সম্ভবতঃ এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়ের খোতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। বিয়ের খোতবায় এই আয়াতটি পাঠ করা সুন্নত।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখানে হে মানবমণ্ডলী বলে সম্বোধন করা হয়েছে যাতে সমগ্র মানুষই পুরুষ হোক অথবা মহিলা, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে হোক অথবা দুনিয়ার প্রলয় দিবস পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী হোক প্রতিটি মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহর অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে 'রব' শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ, এমন এক সত্তার বিরুদ্ধাচরণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের লালন-পালনের জিম্মাদার এবং যার রবূবিয়াত বা পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান।

এরপরই আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, তিনি বিশেষ কৌশল ও দয়ার মাধ্যমে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া হতে পারত, কিন্তু আল্লাহ একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র মানুষ তথা হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন। আল্লাহভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়াও

এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন একে অন্যের অধিকারের প্রতি পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন করে এবং উঁচু-নিচু, আশরাফ-আতরাফ তথা ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ভুলে গিয়ে যেন সবাই একই মানদণ্ডে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে নেয়।

الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً قوله

অর্থাৎ, সে মহান সত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদের সকলকে একটি মানুষ তথা আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। আদম থেকে সৃষ্টি করার অর্থ এই যে, প্রথমতঃ হযরত আদম (আ.)-এর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই যুগল থেকেই পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতএব, বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতটি মূলতঃ পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত আয়াতসমূহের ভূমিকা হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই ভূমিকায় একদিকে আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচণের পরিণাম সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে একই পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

অতঃপর আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নাম উচ্চারণ করে তোমরা অন্যের থেকে অধিকার দাবি কর এবং যাঁর নামে শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাক। এ পর্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্কে তা পিতার দিক থেকেই হোক, অথবা মায়ের দিক থেকেই হোক, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাক, তা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর।

দ্বিতীয় আয়াতে এতিম শিশুদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তাকিদ করা হয়েছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের বিধানও জারি করা হয়েছে।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক : আলোচ্য সূরার সূচনাতেই আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। 'আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা সব রকম আত্মীয় বুঝানো হয়েছে। কালামে পাকে 'আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলতঃ একটি বহুবচন বোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে 'রেহম'। আর 'রেহম' অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয়। অর্থাৎ, জন্মের প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলত মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক বুনিয়াদকে ইসলামি পরিভাষায় 'সেলায়ে রেহমী' বলা হয়। আর এতে কোনো রকম ব্যত্যয় সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় 'ক্বাতয়ে রেহমী'।

হাদীস শরীফে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রিজিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। –[মিশকাত ৪১৯] সহীহ বুখারী ও সহীহ নাসায়ী থেকে]

এ হাদীসে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখার দুটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখলে পরকালে তো কল্যাণ লাভ হবেই, ইহকালেও সম্পদের প্রাচুর্য এবং দ্বিতীয় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘ জীবন লাভের আশ্বাস সম্পর্কিত সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, মহানবী ﷺ-এর মদিনায় আগমনের প্রায় সাথে সাথেই আমিও তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তাঁর যে কথাটি প্রবেশ করল, তা হলো এই–

"হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশি বেশি সালাম দাও। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল এবং এমন সময়ে নামাজে মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। স্মরণ রেখ, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" –[মিশকাত ১০৮, সুনানে তিরমিযী থেকে]

অন্য এক হাদীসে আছে : উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনাহ (রা.) তাঁর এক বাঁদীকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর মহানবী ﷺ-এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, তুমি যদি বাঁদীটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে অধিক পুণ্য লাভ করতে পারতে। –[মিশকাত– ১৭১, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে]

ইসলাম দাস-দাসীদের আজাদ করে দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছে এবং একে অতীব পুণ্যের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখাকে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী ﷺ এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন :

কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদকার ছওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনো নিকটাত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সঙ্গে সদকা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত্য পুণ্য লাভ করা যায়। -[মিশকাত- ১৭১, মুসনাদে আহমদ, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে নাসায়ী থেকে]

আয়াতের শেষাংশে মানুষের অন্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে।, 'আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে খবুই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী'। আল্লাহ তোমাদের অন্তরের ইচ্ছার কথাও ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোকলজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয় স্বজনের প্রতি সুব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে এর কোনো মূল্য নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহকে ভয় করার কি তাৎপর্য রয়েছে, তাও অনুধাবন করতে কোনো বেগ পেতে হয় না। কারণ তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তিনি সর্বক্ষণই মানুষের আচার-আচরণ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

কুরআনে কারীমের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে যে সব বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোকে দুনিয়ার সাধারণ আইন-কানুনের মতো বর্ণনা করা হয়নি।

কুরআনে বর্ণিত আইন-কানুনগুলোকে জনগণের হৃদয়গ্রাহী করার জন্য বিশেষ আন্তরিকতার সাথে এবং প্রশিক্ষণমূলক পন্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। আইনগুলো বর্ণনা করার সাথে সাথে মানুষের মন-মানসিকতারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে তাদের মধ্যে সেগুলোর গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এতিমের অধিকার : আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে : وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ এতিমের সম্পদ তাদেরকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দাও। আরবি এতিম শব্দটির অর্থ হচ্ছে, নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 'দুররে এতিম' বা নিঃসঙ্গ মুক্তা বলা হয়ে থাকে।

ইসলামি পরিভাষায় যে শিশু সন্তানের পিতা ইন্তেকাল করে, তাকে এতিম বলা হয়ে থাকে। অবশ্য জীব-জন্তুর ব্যাপারে এর বিপরীতভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, যে সব জীব-জন্তুর মা মরে যায়, সেগুলোকে এতিম বলা হয়।

ছেলে মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামি পরিভাষায় এতিম বলা হয় না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, বালেগ হওয়ার পর আর কেউ এতিম থাকে না। -[মিশকাত- ২৮৪-শরহুস সুন্নাহ থেকে

এতিম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসেবে কিছু সম্পদপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এতিমের অভিভাবকদের দায়িত্ব হচ্ছে সে সব মালেরও হেফাজত করা। এতিমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত অভিভাবককে মনোনীত করুক না কেন, তার উপরই এতিমের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। উক্ত অভিভাবকের উচিত, এতিমের যাবতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধন-সম্পদ থেকে নির্বাহ করা। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এতিম বালেগ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট তার সম্পত্তি অর্পণ না করা। কারণ বালেগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মতো না হওয়াই স্বাভাবিক।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, এতিমের ধন-সম্পদ তার নিকট পৌঁছে দাও। আর এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বালেগ হলেই কেবল তার নিকট তার গচ্ছিত মালামাল পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে।

অতএব, এতিমের মালামাল তার নিকট পৌঁছে দেওয়ার পন্থা হলো এতিমের মালামাল পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা এবং সে বালেগ হলে যথাসময় তার নিকট তার সম্পত্তি হস্তান্তর করা।

কুরআনের এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো অভিভবাক ব্যক্তিগতভাবে এতিমের মাল অপচয় ও আত্মসাৎ করবে না, এটাই যথেষ্ট নয়; বরং তার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে তার ধন-সম্পদের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা এবং এতিম বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তার নিজস্ব দায়িত্বে তা সংরক্ষণ করা।

মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ : জাহেলি যুগে এতিম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা হতো। যদি কোনো অভিভাবকের অধীনে কোনো এতিম মেয়ে থাকতো আর তারা যদি সুন্দরী হতো এবং তাদের কিছু সম্পদ-সম্পত্তিও থাকত, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিত অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ফিকির করত। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করত না। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী ﷺ-এর যুগে ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বধানে একটি এতিম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত এতিম বালিকাটির অংশ ছিল, সে ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিল এবং নিজের পক্ষ থেকে দেন-মহর আদায় তো করলই না; বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিল। এ ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

وَإِنْ خِفْتُمْ .... مِّنَ النِّسَاءِ : অর্থাৎ, মেয়ের তো অভাব নেই; বিয়ে যদি করতেই হয়, তবে অন্য স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে একাধিক বিয়ে করতে পার।

নাবালেগের বিয়ে প্রসঙ্গে : আলোচ্য আয়াতে যে 'ইয়াতামা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে এতিম মেয়ে। আর শরিয়তের পরিভাষায় সে বালক অথবা বালিকাকেই এতিম বলা হয়ে থাকে, যে এখনো বালেগ হয়নি। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এতিমের অভিভাবকের এখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে বালেগ হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে-শাদী দিতে পারে। তবে তাদের ভবিষ্যত মঙ্গল ও কল্যাণকে সামনে রেখেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বয়সের সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। এমনকি অনেক বড় বড় মেয়েকেও ছোট ছোট ছেলেদের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। ছেলের স্বভাব-চরিত্র যাচাই-বাছাই না করেই কোনো একটি মেয়েকে তার নিকট সোপর্দ করা হয়– এটা কোনোক্রমেই ঠিক হবে না।

এ ছাড়া এমন অনেক বালেগ অবিবাহিতা মেয়েও পাওয়া যায়, বিয়ের পূর্বেই যাদের বাপ মারা গেছে। এসব মেয়ে বালেগ হলেও মেয়ে সুলভ লজ্জা-শরমের কারণে তাদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের সামনে কোনো প্রকার উচ্চ-বাচ্য করতে পারে না এবং অভিভাবক যা কিছু করে সেটাই তারা নতশিরে গ্রহণ করে নেয়। এমতাবস্থায় অভিভাবকদের অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তাদের অধিকার কোনোক্রমেই ক্ষুণ্ন না হয়।

এ আয়াতে এতিম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানুনের মতো তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহভীতির অনুভূতির জাগ্রত করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তা হলে এতিম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েকেই বিয়ে করে নিবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে এতিম ছেলেমেয়েদের কোনো প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বহু বিবাহ : বহু বিবাহের প্রথাটি ইসলামপূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্ম মতেই বৈধ বলে বিবেচিত হতো। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি সব দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত।

বর্তমানকালে ইউরোপের এক শ্রেণির চিন্তাবিদ বহু বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোনো সুফল হয়নি; বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই বহু বিবাহ পুনঃপ্রচলন করার জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন।

ইসলামপূর্ব যুগে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধর্ম এবং দেশের ইতিহাস থেকে একথা জানা যায় যে, এর প্রতি কোনো প্রকার বাধা-নিষেধও ছিল না। ইহুদি, খ্রিস্টান, আর্য, হিন্দু এবং পারসিকদের মধ্যে

বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও কোনো সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। তবে তৎকালে সীমা-সংখ্যাহীন বহু বিবাহের জন্য অনেকের লোভ-লালসার অন্ত ছিল না। অন্য দিকে এ থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্যের ব্যাপারেও তারা সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারত না; বরং এসব স্ত্রীকে তারা রাখত দাসী-বাঁদির মতো এবং তাদের যথেচ্ছা ব্যবহার করত। তাদের প্রতি কোনো প্রকার ইনসাফ করা হতো না। চরম বৈষম্য বিরাজ করত পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। অনেক সময় পছন্দসই দু'একজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অবশিষ্টদের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হতো।

ইসলামের বিধান: কুরআন এই সামাজিক অনাচার এবং জুলুমের প্রতিরোধ করেছে। বহু বিবাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধও জারি করেছে। ইসলাম একই সময় চার এর অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের পছন্দমতো দুই, তিন, অথবা চার জন স্ত্রীও গ্রহণ করতে পার। আলোচ্য আয়াতে مَا طَابَ [যা তোমাদের ভালো লাগে] শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের এবং ইবনে মালেক (র.) শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন مَا حَلَّ শব্দ দ্বারা: যার অর্থ হচ্ছে, যে সব মেয়ে তোমাদের জন্য বৈধ। আর অনেক তাফসীরকার উপরিউক্ত শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'পছন্দ' দ্বারাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তবে উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো প্রকার বৈপরীত্য নেই। অর্থাৎ, এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, যেসব মেয়ে প্রকৃতিগতভাবে তোমাদের মনঃপূত এবং শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হয় কেবল তাদেরকেই বিয়ে করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ, চার জন স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ অবশ্য দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই চার পর্যন্ত কথাটি আরোপ করে তার উর্ধ্ব সংখ্যক কোনো স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না; বরং তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ– তাও ব্যক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

যদি সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয় : চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি দেওয়ার পর বলা হয়েছে:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً অর্থাৎ, যদি আশঙ্কা কর যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক।

পবিত্র কুরআনে চার জন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায়বিচার করতে না পার। তাহলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর কর। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরিয়ত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে; তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে অপারগ হলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ।

রাসূলে কারীম ﷺ একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন এবং যারা এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ ব্যবহারের আদর্শ স্থাপন করেছেন, যে ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না।

এক হাদীসে হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে। –[মিশকাত শরীফ : ২৭৮ -সূনানে আরবা'আ থেকে]

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভালোবাসা ও অন্তরের আকর্ষণ মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয়। তাই অসাধ্য বিষয়টিতেও সমতা রাখার অতঃপর বলা হয়েছে : فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ অর্থাৎ, কোনো এক স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ বেশি হয়ে যায়, তবে সেটা তোমার সাধ্যায়ত্ব ব্যাপার নয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্যজনের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েজ হবে না। আলোচ্য আয়াতে فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً অর্থাৎ, যদি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখতে পারবে না বলে

ভয় কর, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক, বলে সে সমস্ত ব্যাপারেই ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ব। এসব ব্যাপারে বে-ইনসাফি করা মহাপাপ। আর যাদের এরূপ পাপে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাদের পক্ষে একাধিক বিয়ে না করাই কর্তব্য।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : সূরা নিসার এ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে না পারার আশঙ্কার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই তৃপ্ত থাকার নির্দেশ এবং পরবর্তী আয়াতে 'তোমরা কোনো অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না' এ দু' আয়াতের মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পেরে অনেকেই এমন একটা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কার ক্ষেত্রে যেহেতু এক বিয়েরই নির্দেশ এবং স্বয়ং কুরআনই যখন বলে যে, তোমরা কোনো অবস্থাতেই স্ত্রীর মধ্যে সমান ব্যবহার বজায় রাখতে সমর্থ হবে না, সুতরাং পরোক্ষভাবে কুরআন এক বিয়েরই অনুমোদন দেয় এবং বহু বিবাহ রহিত করে।

উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত যে ভুল তা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়, কেননা একাধিক বিয়ে বন্ধ করাই যদি আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় হতো, তবে 'নারীদের মধ্যে যাদের ভালো লাগে তাদের মধ্য থেকে তোমরা দুই, তিন, চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার।' এরূপ বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً বলে ইনসাফ কায়েম না করার সম্ভাবনা ব্যক্ত করারও কোনো অর্থ হয় না।

এছাড়া স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবীগণের কর্মধারা ও মৌখিক বর্ণনা এবং পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে মুসলিম সমাজে বিনা দ্বিধায় একাধিক বিয়ের রীতি প্রচলিত থাকাই প্রমাণ করে যে, বহু বিবাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন না।

প্রকৃত প্রস্তাবে সূরা নিসার এ আয়াত দ্বারা মানুষের সাধ্যায়ত্ব ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ, আন্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দুটি আয়াতের মর্মে যেমন কোনো বৈপরীত্য নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের অবৈধতাও প্রমাণিত হয় না।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا এতে দু'টি শব্দ রয়েছে। একটি أَدْنَىٰ এটি دُنُوٌّ ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হয় নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে لَا تَعُولُوا = عَالَ - يَعِيلُ ঝুঁকে পড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে শব্দটি অসঙ্গতভাবে ঝুঁকে পড়া এবং দাম্পত্য জীবনে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হচ্ছে এই যে, এ আয়াতে তোমাদের যা বলা হলো যে, সমতা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা থাকলে এক স্ত্রী নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর কিংবা শরিয়ত সম্মত ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার কর, এটা এমন এক পথ যা অবলম্বন করলে তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘনের সম্ভাবনাও দূর হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এক স্ত্রী হলে তো আর অবিচার কিংবা জুলুমের কোনো অবকাশই থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'তোমরা জুলুম না করার নিকটে থাকবে, এরূপ বলার অর্থ কি? বরং এখানে বলা উচিত ছিল যে, এক বিবাহের ক্ষেত্রে তোমরা অবিচারের পথ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যাবে।

জবাব হচ্ছে এই যে, যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে লোকেরা এক স্ত্রীকেও নানাভাবে জ্বালাযন্ত্রণার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে রাখে সুতরাং এক স্ত্রীর সংসার করলে তোমরা জুলুম বা সীমালঙ্ঘন থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে যাবে এরূপ না বলে أَدْنَىٰ [আদনা] শব্দটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, এটা অবিচারের পথ পরিহার করার নিকটবর্তী পন্থা। এ পথ অবলম্বন করলে তোমরা ইনসাফের কাছাকাছি পৌছতে পারবে। আর পরিপূর্ণ ইনসাফ তখনই হবে, যখন তোমরা স্ত্রীর বদ-মেজাজী, উদ্ধত আচরণ প্রভৃতি সবকিছু ধৈর্য সহকারে বরদাশত করতে পারবে।

قوله وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً الخ স্ত্রীদের মহরের ব্যাপারে তখনকার দিনে অনেক ধরনের অবিচার ও জুলুমের পন্থা প্রচলিত ছিল।

এক. স্ত্রীর প্রাপ্য মহর তার হাতে পৌঁছাতো না; মেয়ের অভিভাবকগণই তা আদায় করে আত্মসাৎ করত। যা ছিল নিতান্তই একটা নির্যাতনমূলক রেওয়াজ। এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কুরআন নির্দেশ দিয়েছে–

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ

এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মহর তাকেই পরিশোধ কর; অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মহর আদায় হলে তা যার প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ কর। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

দুই. স্ত্রীর মহর পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি হতো। প্রথমতঃ মহর পরিশোধ করতে হলে মনে করা হতো যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যেই আয়াতে نِحْلَةً শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হৃষ্টমনে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা অভিধানে نِحْلَةً বলা হয় সে দানকে যা খুবই আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়।

মোটকথা, আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মহর অবশ্য পরিশোধ্য একটা ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরি। পরন্তু অন্যান্য ওয়াজিব ঋণ যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মহরের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য।

তিন. অনেক স্বামীই তার বিবাহিতা স্ত্রীকে অসহায় মনে করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মহর মাফ করিয়ে নিত। এভাবে মাফ করিয়ে নিলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হতো না। অথচ স্বামী মনে করত যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেওয়া গেছে, সুতরাং মহরের ঋণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরনের জুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে : فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا অর্থাৎ, যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহরের কোনো অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পার।

অর্থ হচ্ছে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার অর্থ কোনো অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায়, খুশি মনে মহরের অংশবিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোনো অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই কেবল তা তোমাদের পক্ষে ভোগ করা জায়েজ হবে।

এ ধরনের বহু নির্যাতনমূলক প্রথা জাহেলি যুগে প্রচলিত ছিল। কুরআন এসব জুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজও মুসলিম সমাজে মহর সম্পর্কিত এ ধরনের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

আয়াতে 'হৃষ্টচিত্তে' প্রদানের শর্ত আরোপ করার পিছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা মহর স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ। হৃষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবি ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোনো অবস্থাতেই হালাল হবে না। হুজুর ﷺ এ হাদীসে শরিয়তের মূল নীতিরূপে ইরশাদ করেছেন– اَلَا لَا تَظْلِمُوْا اَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ

অর্থাৎ, 'সাবধান' জুলুম করো না। মনে রেখ, কারো পক্ষে অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না।' –[মিশকাত : ২৫৫ -শুয়াবুল ঈমান বায়হাকী, দারাকুতনী থেকে]

এ হাদীসটি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির নির্দেশ দেয় যা সর্বপ্রকার প্রাপ্য ও লেন-দেনের ব্যাপারে হালাল এবং হারামের সীমারেখা নির্দেশ করে।

সম্পদের হেফাজত জরুরি : এ আয়াতে ধন-সম্পদের গুরুত্ব এবং মানুষের জীবন ধারণ ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তদসঙ্গে সম্পদের হেফাজতের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ ত্রুটির সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকেই স্নেহান্ধ হয়ে অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং যা দারিদ্র্য ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়।

অর্বাচীন ও অনভিজ্ঞদের হাতে সম্পদ তুলে দেওয়া নিষিদ্ধ : রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কুরআনে পাকের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেক না; বরং আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তোমাকে অভিভাবক এবং দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেজন্য তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে তাদের খাওয়া পরার দায়-দায়িত্ব পালন করতে থাক। যদি তারা অর্থ সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেওয়ার আব্দার করে, তবে তাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা না দেয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ ব্যাখ্যা মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা এবং অনভিজ্ঞ যে কোনো স্ত্রীলোকের হাতেই ধন-সম্পদ তুলে না দেওয়ার নির্দেশ প্রমাণ হয়– যাদের হাতে পড়ে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে এতিম শিশু বা নিজের সন্তানের কোনো পার্থক্য নেই। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)ও এ আয়াতের এরূপ তাফসীরই বর্ণনা করেছেন। ইমামে তাফসীর হাফেজ তাবারীও এ মতই গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে এ আয়াতের নির্দেশ এতিমদের বেলাতেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কিন্তু আয়াতে যে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং 'তোমাদের সম্পদ' বলে যে ইশারা করা হয়েছে, তাতেও এতিম এবং সাধারণ বালক-বালিকা নির্বিশেষে সবার বেলাতেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য বলে মনে হয়। মোটকথা, মালের হেফাজত অত্যন্ত জরুরি এবং অপচয় করা গুনাহের কাজ।

নিজের সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। যেমন, জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সেও শহীদের মর্যাদা পাবে বলে হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ "নিজের মালের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদ।" অর্থাৎ, ছওয়াবের দিক দিয়ে শহীদের মর্যাদা পাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

শব্দের বিশ্লেষণ :

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اَلْاَرْحَامُ : শব্দটি বহুচন, একবচন رَحِمٌ অর্থ– আত্মীয়।

رَقِيْبًا : শব্দটি فعيل এর ওজন صفت مشبه এর সীগাহ। অর্থ– তত্ত্বাবধায়ক।

صَدُقٰتٍ : শব্দটি বহুবচন, একবচন صَدَقَةٌ অর্থ– মহর।

نِحْلَةً : শব্দটি একবচন, বহুবচন نِحَلٌ অর্থ– আনন্দচিত্তে।

هَنِيْئًا : এটি صفت مشبه এর সীগাহ, বাব فَتَحَ ও كَرُمَ. سَمِعَ অর্থ– সুস্বাদু।

مَرِيْئًا : এটি صفت مشبه এর সীগাহ, বাব كَرُمَ . سَمِعَ . فَتَحَ অর্থ– সুস্বাদু খাবার পাওয়া।

বাক্যের বিশ্লেষণ :

قوله اٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ : এখানে اٰتُوْا ফে'ল উহ্য যমীর اَنْتُمْ তার ফা'য়েল এবং الْيَتٰمٰى প্রথম মাফউল অতঃপর اموال মুযাফ هم মুযাফ ইলাইহি, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে দ্বিতীয় মাফউল, ফে'ল তার ফা'য়েল ও দু' মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٦﴾

অনুবাদ : (৬) আর তোমরা এতিমদের কে পরীক্ষা করে নাও, এপর্যন্ত যে, যখন তারা বিবাহে [-র বয়সে] পৌছে যায়, অনন্তর যদি তাদের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ বুদ্ধিমত্তা দেখ, তবে তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করে দাও, আর ঐ সমস্ত সম্পত্তি ভক্ষণ করো না অপব্যায়ে এবং তাড়াতাড়ি করে এই ধারণায় যে, তারা বালেগ হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত হবে সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবী হবে সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে, অতঃপর যখন তাদের মাল তাদের হাতে সমর্পণ করবে তখন তাদের [মাল সমর্পণের] উপর সাক্ষ্য রেখ, এবং আল্লাহই হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿٧﴾

(৭) পুরুষদের জন্যও [তারা ছোট হোক বা বড় হোক] অংশ [নির্ধারিত] রয়েছে তা হতে যা পিতামাতা এবং নিকট আত্মীয়তাগণ ছেড়ে যায়– এবং নারীদের জন্যও [ছোট হোক বা বড় হোক] অংশ [নির্ধারিত] রয়েছে, যা পিতামাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছেড়ে যায়, সে বস্তু অল্পই হোক আর বেশি হোক, অংশ অকাট্য।

শাব্দিক অনুবাদ

(৬) وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى আর তোমরা এতিমদের কে পরীক্ষা করে নাও حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ এপর্যন্ত যে, যখন তারা বিবাহে [-র বয়সে] পৌছে যায় فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا অনন্তর যদি তাদের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ বুদ্ধিমত্তা দেখ فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ তবে তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করে দাও وَلَا تَاْكُلُوْهَآ আর ঐ সমস্ত সম্পত্তি ভক্ষণ করো না اِسْرَافًا وَّبِدَارًا অপব্যয়ে এবং তাড়াতাড়ি করে اَنْ يَّكْبَرُوْا এই ধারণায় যে, তারা বালেগ হয়ে যাবে وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا আর যে ব্যক্তি অভাবমুক্ত হবে فَلْيَسْتَعْفِفْ সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا আর যে ব্যক্তি অভাবী হবে فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ অতঃপর যখন তাদের মাল তাদের হাতে সমর্পণ করবে فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ তখন তাদের [মাল সমর্পণের] উপর সাক্ষ্য রেখ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا এবং আল্লাহই হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট।

(৭) لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ পুরুষদের জন্যও [তারা ছোট হোক বা বড় হোক] অংশ [নির্ধারিত] রয়েছে مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ তা হতে যা পিতামাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছেড়ে যায়– وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ এবং নারীদের জন্যও [ছোট হোক বা বড় হোক] অংশ [নির্ধারিত] রয়েছে مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ যা পিতামাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছেড়ে যায় مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ সে বস্তু অল্পই হোক আর বেশি হোক نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا অংশ অকাট্য।

(৮) وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ আর যখন বন্টনকালে উপস্থিত হয়– [দূর সম্পর্কীয়] اُولُوا الْقُرْبٰى স্বজনগণ وَالْيَتٰمٰى ও এতিমগণ وَالْمَسٰكِيْنُ ও মিসকিনগণ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ তখন তাদেরকেও তা হতে কিছু প্রদান কর وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا এবং তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বল।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৮) আর যখন বন্টনকালে উপস্থিত হয়– [দূর সম্পর্কীয়] স্বজনগণ ও এতিমগণ ও মিসকিনগণ, তখন তাদেরকেও তা হতে কিছু প্রদান কর, এবং তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বল।	وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)
(৯) আর এরূপ লোকদের ভয় করা উচিত যে, যদি তারা নিজেদের পিছনে ছোট ছোট সন্তান ত্যাগ করে [মারা] যায় তবে তাদের জন্য তাদের [কেমন] ভাবনা হবে, সুতরাং [এই বিষয়টি চিন্তা করে] তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং সুসঙ্গত কথা বলা।	وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)
(১০) নিশ্চয়, যারা এতিমদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের উদরে অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই পুরছে না, এবং অতি সত্বরই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।	إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)

শাব্দিক অনুবাদ

(৯) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ আর এরূপ লোকদের ভয় করা উচিত যে। لَوْ تَرَكُوا যদি তারা ত্যাগ করে [মারা] যায় مِنْ خَلْفِهِمْ নিজেদের পিছনে ذُرِّيَّةً ضِعَافًا ছোট ছোট সন্তান خَافُوا عَلَيْهِمْ তবে তাদের জন্য তাদের [কেমন] ভাবনা হবে فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ সুতরাং [এই বিষয়টি চিন্তা করে] তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা। وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا এবং সুসঙ্গত কথা বলা।

(১০) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا নিশ্চয়, যারা এতিমদের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে। إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا তারা নিজেদের উদরে অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই পুরছে না। وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا এবং অতি সত্বরই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬) قوله وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** বর্ণিত আছে যে, হযরত রেফাহ (রা.) তার ছাবেত নামক এক পুত্র সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেন। তখন তার ভাই জানতে চান যে, আমার ভাতিজা আমার ঘরে লালিত পালিত হচ্ছে। সুতরাং তার মাল থেকে ব্যয় করা আমার জন্য জায়েজ হবে কি? তাঁর মাল কখন দেব তার হাতে? তখন ছাবেত তদ্বীয় ভাতিজার মালে তসররুফ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : কারো কারো মতে আউস বিন ছাবেত তাকে আউস বিন সুওয়াইদও বলা হয়, তিনি তার স্ত্রী উম্মে কুজ্জাহ, তিন কন্যা সন্তান এবং সুওয়াইদের দু'জন চাচাতো ভাই রেখে ইন্তেকাল করেন। কারো মতে আউস বিন সুওয়াইদের স্থলে কাতাদাহ ও আরফুজা হবে। তখন চাচাতো ভাই দুজনে তার সমুদয় মালামাল দখল করে নেয়। তার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে কিছুই দেয়নি। মতান্তরে তাদের ওয়ারিশত্ব থেকে বাধা প্রদান করেছে, মৃতের দুজন চাচাতো ভাই। যার নাম ছা'লাবাহ। জাহেলি যুগে তারা স্ত্রী, কন্যা সন্তান, ছোট পুত্র সন্তানকেও ওয়ারিশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করত না। সুতরাং উম্মে কুজ্জাহ রাসূল ﷺ এর নিকট গিয়ে তাদের সম্পর্কে অভিযোগ আরোপ করল। ফলে রাসূল ﷺ তাদেরকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করার পর তারা জাবাবে বলল, হে আল্লাহ রাসূল! সে মহিলার সন্তানেরা তো ঘোড়ায় চড়তে পারে না। কোনো বোঝা বহন করতে পারে না। কোনো শত্রুকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা চলে যাও। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কি অবতীর্ণ করেন, তার জন্য অপেক্ষা কর। অতঃপর এতিমের সম্পদের সাথে কি আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কীয় বিধান সম্বলিত আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ৩ : ১৭৯]

(৭) قوله لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আলোচ্য আয়াত আউস বিন ছাবেত আনসারী (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আউস বিন ছাবেত আনসারী (রা.) তার স্ত্রী উম্মে কুজ্জাহ, তিন কন্যা সন্তান এবং সুওয়াইদ ও আরফুজা নামে দুজন চাচাতো ভাইও রেখে ইন্তেকাল করেন। সুওয়াইদ ও আরফজ্জা আউসের সমুদয় মাল দখল করে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী ও কন্যা সন্তানদেরকে কিছুই দেয়নি। কারণ জাহেলি যুগে তারা স্ত্রী ও ছোট সন্তান-সন্ততিকে ওয়ারিশ বানাতো না; বরং তারা বলত, যারা অশ্বারোহী হয়ে যুদ্ধ করতে সক্ষম, যারা তীর নিক্ষেপে সক্ষম, তলোয়ার দ্বারা আঘাত করতে সক্ষম এবং গনিমত সংরক্ষণ করতে সক্ষম, তারা ছাড়া অন্য কাউকে মালের অধিকারী বানানো যায় না। সুতরাং উম্মে কুজ্জাহ এ বিষয়টি নিয়ে রাসূল ﷺ-এর শরণাপন্ন হলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তারা জবাবে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তার কন্যারাতো যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। বোঝাও বহন করতে সক্ষম হবে না। শত্রুকেও প্রতিহত করতে সক্ষম নয়। ফলে রাসূল ﷺ বললেন যে, তোমরা চলে যাও যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের সমম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আমাকে কোনো হুকুম দিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অপেক্ষমান থাকব। তখন আল্লাহ তা'আলাহ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কীয় বিধি-বিধান সম্বলিত আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[কুরতুবী : ৫ : ৪৫]

শানে নুযূল– ২ : আইয়ামে জাহেলিয়াতে অংশীদারিত্ব আইন প্রচলিত ছিল যে, তারা স্ত্রী ও ছোট সন্তান-সন্ততিদেরকে ওয়ারিশ হিসেবে স্বীকৃতি দান করত না; বরং তাদের দাবি ছিল, যারা যুদ্ধ করতে পারে না, যুদ্ধ ময়দান হতে পালাতে পারে না। তারা কোনো সম্পদের অংশীদারিত্ব লাভ করতে পারে না। তাদের মাঝে এ ধরনের অমানবিক প্রচলিত বিধানের বিপক্ষে নারীদের অধিকার সংরক্ষিত ও সুনিশ্চিত করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে জুবাইর ও অন্যান্যদের মতে আউস বিন ছাবেত আবার কারো মতে আউস বিন সামেত তবে এ মতটি সঠিক নয় করণ তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। তিনি দু' কন্যা ও ছোট এক পুত্র সন্তান এবং উম্মে কুহা নাম্মী এক স্ত্রী রেখে ইন্তেকাল করেন। স্ত্রীর নামের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে; মতান্তরে যথাক্রমে বিন্তে কুহা, উম্মে কুহলা উম্মে কুলসুম। অতঃপর মৃত ব্যক্তির চাচাতো ভাইয়েরা খালেদ, সুওয়াইদ, আরাফাতা অথবা কাতাদাহর ও আরফোজা এসে তার পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পদ দখল করে নিয়ে যায়। তখন স্ত্রী তাদেরকে বলল, তোমরা দু'টি কন্যাকে বিবাহ করে নাও। আর মৃতের মেয়ে দুটি কালো ছিল। তারা তাতে অসম্মতি জানাল বিধায় সে মহিলা রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে রাসূল ﷺ-কে এ সম্পর্কে অবগত করেন। ফলে রাসূল ﷺ বলেন : আমি জানি না কি যে বলব? অতঃপর لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ আয়াত নাজিল হয়। রাসূল ﷺ তৎক্ষণাত মৃতের চাচাতো ভাইয়ের নিকট খবর পাঠালেন যে, তোমরা তার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোনো প্রকারে হস্তক্ষেপ করবে না। এ সম্পর্কে আমার নিকট ওহী এসেছে। এ সম্পর্কে আমি ব্যাখ্যা দিব। পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্যই নির্ধারিতা অংশ রয়েছে। অতঃপর وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ....إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا নাজিল হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ মিরাশের অধিকারীদেরকে ডেকে স্ত্রীকে $\frac{১}{৮}$ অংশ এবং অবশিষ্ট সম্পদ এক ছেলের জন্য দু'জন মেয়ের সমপরিমাণ সম্পদ প্রদান করেন। এবং চাচাতো ভাইদেরকে কিছুই দেননি। –[রূহুল মা'আনী ২১০/২/৪]

(৮) قوله وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে সে সকল সম্পদশালী মানুষদের সম্পর্কে, যারা তাদের মৃত্যুকালে যারাই তাদের নিকট উপস্থিত থাকত, তাদের মাঝে অসিয়ত স্বরূপ নিজ সম্পদ বন্টন করে দিত এবং উপস্থিত লোকজনের পরামর্শক্রমে বিভিন্নভাবে তা বন্টন করে দিত। সে সাথে যারা [ওয়ারিশত্ব থেকে বঞ্চিত] তারাও উপস্থিত হতো। তখন নিকটতম ব্যক্তিদেরকে অসিয়ত করে যেত এবং বঞ্চিতদেরকে কিছুই প্রদান করত না। তাদেরকেও যেন কিছু দেওয়া হয় সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনুল মুসাইয়িব, ইবনে যায়েদ ও আবূ জাফরও এ মত পোষণ করেছেন।

শানে নুযূল– ২ : কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে যাদের কোনো অংশ নির্ধারিত রয়েছে তাদের সম্পর্কে। মাল বন্টনকালে আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে তাদেরকেও যৎসামান্য প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাদের কোনো অংশ নির্ধারিত নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনুল মুসায়্যিবের মতানুসারে আলোচ্য আয়াতের হুকুম বা বিধান রহিত করা হয়েছে মিরাসের আয়াত দ্বারা। ইকরিমা ও যাহহাক এমত প্রকাশ করেছেন। অতঃপর মিরাসের আয়াত দ্বারা তা রহিত করা হয়েছে এবং সকল অংশীদারদের নির্ধারিত অংশ প্রদান করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত ৩ : ১৮৪]

(১০) قوله اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** মুশরিকদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এরা এতিমদের মাল ভোগ দখল করে খেত। মৃত ব্যক্তির স্ত্রীদেরকে তারা ওয়ারিশ বানাতো না। এটা হচ্ছে ইবনে যায়েদের মতানুসারে।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে হযরত হানযালা বিন শামারদাল, একজন এতিমের তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন, ফলে তিনি তার সম্পদের মাল ভোগ করলেন। মতান্তরে যায়েদ বিন যাইদ গিত্বফানী তার এতিম ভাতিজার অভিভাবক ছিল সে ব্যক্তি তার মাল ভোগ করেছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। হযরত মুকাতিল (র.) এ মত পোষণ করেছেন। অধিকাংশ লোকজন বলেন, আলোচ্য আয়াত এমন লোকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যাদের জন্য এতিমের মাল ভোগ করা বৈধ ছিল না। –[রূহুল মা'আনী ১৮৭/২/৪]

শানে নুযূল– ৩ : অপর এক বরাতে বর্ণিত আছে যে, মারছাদ বিন যাইদ গিত্বফানি তার ছোট্ট ভাতিজার অভিভাবক ছিলেন, অতঃপর তিনি তার ভাতিজার সম্পদ নিজ মালিকানায় নিয়ে যান। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। মুকাতিল বিন হাইয়ান এ মত প্রকাশ করেছেন। –[কুরতুবী : ৫ : ৫৩]

শানে নুযূল– ৪ : হযরত ইবনে জারীর যাইদ বিন আসলাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এ আয়াতগুলো মুশরিকদের সম্পর্কীয়। যখন তারা এতিমদেরকে ওয়ারিশ না বানিয়ে তাদের মাল ভক্ষণ করত। তাদের ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনাসহ আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী]

শানে নুযূল– ৫ : কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন এতিম লালন-পালন করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়াল এবং এতিমদের সাথে সংযুক্তি হওয়া থেকে বিরত থাকল, ফলে এতিমদের জন্য তা অসহায়ত্বের রূপ ধারণ করল। অতঃপর তাদের অসহায়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ২১৬/২/৪]

প্রথমতঃ আয়াত দ্বারা যখন বুঝা গেল যে, যে পর্যন্ত সাংসারিক ব্যাপারে নাবালেগদের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণিত না হবে, সে পর্যন্ত তাদের হাতে ধন-সম্পদের দায়িত্ব অর্পণ করা সমীচীন নয়। সেজন্য দ্বিতীয় আয়াতে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে; বলা হয়েছে–

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ অর্থাৎ, বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে, অর্থাৎ বালেগ হয়। মোটকথা, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছে, শিশুদের বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। **এক.** বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়, **দুই.** বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়, **তিন.** বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ।

এতিম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁরা শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ কারবার এবং লেন-দেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى বাক্যের অর্থ এটাই। এ থেকে ইমাম আবূ হানীফা দলিল গ্রহণ করেছেন যে, কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যদি তার অভিভাবকের অনুমতিক্রমে লেন-দেন বা ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে তা বৈধ ও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে : শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়-বুদ্ধি পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা যায়, সে তার ভালোমন্দ বুঝবার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও।

বুদ্ধি-বিবেচনার সংজ্ঞা : আয়াতে উল্লিখিত آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا বাক্য দ্বারা কুরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, এতিম শিশুদের মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ 'বুদ্ধি-বিবেচনার' সময়সীমা কি? কুরআনের অন্য কোনো আয়াতেও এর কোনো শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ জন্য কোনো কোনো ফিকহবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোনো এতিমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয় সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখতে হলেও না।

এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, এখানে বুদ্ধি-বিবেচনা না থাকার অর্থ হচ্ছে শিশুসুলভ চপলতা। বালেগ হওয়ার পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে এ চপলতা স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যায়। সেমতে বালেগ হওয়ার বয়স পনের বছর এবং তারপর দশ বছর, এভাবে পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার পর অভিভাবককে ধরে নিতে হবে যে, এতদিনে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ অবশ্যই ঘটেছে, সুতরাং তার বিষয় সম্পত্তি তখন তার হাতেই তুলে দিতে হবে। কেননা অনেকের মধ্যে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্তও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না। তাই বলে তাকে সারাজীবন তার বিষয়-সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। আর যদি সে লোক বদ্ধ পাগল কিংবা একেবারেই নির্বোধ হয়, তবে তার হুকুম স্বতন্ত্র। এ ধরনের লোকের ব্যাপারে নাবালেগ শিশুদের হুকুমই কার্যকর হবে। পাগলামির এ অবস্থায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়ে গেলেও অভিভাবককে সারা জীবনই তার সহায় সম্পত্তির দেখা-শোনা করতে হবে।

ওলী কতটুকু গ্রহণ করতে পারে : শেষ আয়াত এতিমের বিষয়-সম্পত্তি হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এ সম্পদ থেকে তার পারিশ্রমিক বাবদ কিছু গ্রহণ করতে পারে, এ সম্পর্কিত নির্দেশ বলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভাবী নয় কিংবা তার প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের ব্যবস্থা অন্যত্র থেকে সংস্থান করতে পারে, তার উচিত এতিমের মাল থেকে তার পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা। কেননা ওলী হিসেবে এতিমের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করার দায়িত্ব তার উপর 'ফরজ' কর্তব্য। সুতরাং এ দায়িত্ব পালন করার বিনিময়ে তার পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ হবে না।

পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার স্বত্ব : ইসলাম-পূর্বকালে আরব ও অনারব জাতিসমূহের মধ্যে দুর্বল শ্রেণি, এতিম বালক-বালিকা ও অবলা নারীরা চিরকালই জুলুম নির্যাতনের শিকার ছিল। প্রথমতঃ তাদের কোনো অধিকারই স্বীকার করা হতো না। কোনো অধিকার স্বীকার করা হলেও পুরুষদের কাছ থেকে তা আদায় করে নেওয়ার সাধ্য কারো ছিল না।

ইসলাম সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে। এরপর এসব অধিকার সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা করে। উত্তরাধিকার আইনেও জগতের সাধারণ জাতিসমূহ সমাজের উভয় প্রকার দুর্বল অঙ্গকে তাদের স্বাভাবিক ও নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। আরবদের নিয়মই ছিল এই যে, যারা অশ্বারোহণ করে এবং শত্রুদের মোকাবিলা করে তাদের অর্থ– সম্পদ লুট করার যোগ্যতা রাখে, তারাই শুধুমাত্র উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে পারে। -[রূহুল মা'আনী ২১০ : ৪] বলাবাহুল্য, বালক-বালিকা ও নারী উভয় প্রকার দুর্বল শ্রেণি এ নিয়মের আওতায় পড়ে না। তাই তাদের নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র যুবক ও বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রই ওয়ারিশ হতে পারত। কন্যা কোনো অবস্থাতেই ওয়ারিশ বলে গণ্য হতো না, প্রাপ্তবয়স্কা হোক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা। পুত্র সন্তানও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে উত্তরাধিকারের যোগ্য বলে বিবেচিত হতো না।

উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভের বিধি : আলোচ্য আয়াত উত্তরাধিকারের কতিপয় বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে উত্তরাধিকারের আইন ব্যক্ত করে দিয়েছে مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ এর শব্দদ্বয় উত্তরাধিকারের দুটি মৌলিক নীতি ব্যক্ত করেছে। এক. জন্মের সম্পর্ক, যা পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে রয়েছে এবং যা وَالِدَانِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. সাধারণ আত্মীয়তা, যা أَقْرَبُونَ শব্দের মর্ম। বিশুদ্ধ মত অনুসারে أَقْرَبُونَ শব্দটি সর্ব প্রকার আত্মীয়তার পরিব্যাপ্ত; পারস্পরিক জন্মের সম্পর্ক হোক, যেমন পিতামাতা সন্তানদের মধ্যে কিংবা অনান্য প্রকার সম্পর্ক হোক, যেমন সাধারণ পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক হোক। সবগুলোই أَقْرَبُونَ শব্দের আওতাভুক্ত। কিন্তু পিতামাতার গুরুত্ব অধিক। তাই তাদের কথা বিশেষভাবে পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর এ শব্দটি আরো ব্যক্ত করেছে যে, আত্মীয়তার যে কোনো সম্পর্কই ওয়ারিশ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং কোনো নিকটতম আত্মীয় হওয়া শর্ত। কেননা নিকটতম হওয়াকে যদি মাপকাঠি

করা না হয়, তবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিই সমগ্র ভূপৃষ্ঠের মানুষের মধ্যে বন্টন করা জরুরি হয়ে পড়বে। কেননা সব মানুষই এক পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার সন্তান। মূল রক্তের দিক দিয়ে কিছু না কিছু সম্পর্ক সবার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। এর বাস্তবায়ন প্রথমতঃ সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি কোনোরূপ চেষ্টা করে এর ব্যবস্থা করেও নেওয়া যায়, তবে ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করতে করতে অবিভাজ্য অংশ পর্যন্ত পৌঁছাবে, যা কারো কাজে আসবে না। তাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যখন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তখন এরূপ নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া জরুরি ছিল, যার ফলে নিকট ও দূরের বিভিন্ন সম্পর্ক একত্রিত হলে নিকটের আত্মীয়কে দূরের আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আত্মীয় বিদ্যমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করতে হবে। অবশ্য যদি কিছু আত্মীয় এমন থেকে থাকে যে, একই সময়ে সবাই নিকটবর্তী সাব্যস্ত হয়, যদিও নিকটতম হওয়ার কারণ বিভিন্ন, তবে সবাই ওয়ারিশ হবে। যেমন, সন্তানদের সাথে পিতামাতা কিংবা স্ত্রী থাকা এরা সবাই নিকটতম ওয়ারিশ, যদিও ঐ নৈকট্যের কারণ বিভিন্ন।

اَقْرَبُوْنَ শব্দটি আরো একটি বিষয় ব্যক্ত করেছে যে, পুরুষদেরকে যেমন উত্তরাধিকারের হকদার মনে করা হয়, তেমনি নারী ও শিশুদেরকেও এ হক থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেননা সন্তানের সম্পর্ক হোক কিংবা পিতামাতার সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কোনো সম্পর্ক হোক, প্রত্যেকটিতেই সম্পৃক্ততার মর্যাদা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমান। ছেলে যেমন পিতামাতা থেকে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি মেয়েও পিতামাতারই সন্তান। উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কের উপর ভিত্তিশীল। কাজেই ছোট ছেলে কিংবা মেয়েকে বঞ্চিত করার কোনো কারণই থাকতে পারে না।

اَقْرَبُوْنَ শব্দ থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে, ত্যাজ্য সম্পত্তির বন্টন প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নয়; বরং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে হবে। তাই আত্মীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত, তাকে বেশি হকদার মনে করা জরুরি নয়; বরং সম্পর্ক যে ব্যক্তি মৃতের অধিক নিকটবর্তী হবে, সে দূরবর্তীর তুলনায় অধিক হকদার হবে, যদিও প্রয়োজন ও অভাব দূরবর্তীর বেশি হয়। আর যদি নিকটতম আত্মীয়তার মাপকাঠির পরিবর্তে কোনো কোনো আত্মীয় অভাবগ্রস্ত ও উপকারী হওয়াকে মাপকাঠি করে নেওয়া হয়, তবে তা কোনো বিধানই হতে পারে না কিংবা একটি সুনির্দিষ্ট অটল আইনের আকার ধারণ করতে পারে না। কেননা নিকটতম আত্মীয়তা ছাড়া অন্য যে কোনো মাপকাঠি সাময়িক চিন্তাপ্রসূত হবে। কারণ দারিদ্র্য ও অভাব চিরস্থায়ী নয়। অবস্থা ও স্তর সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় হকের দাবিদার অনেক বের হয়ে আসবে এবং ফয়সালাকারীদের পক্ষে এর ফয়াসালা করা কঠিন হবে।

এতিম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্ন : আজকাল এতিম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নটিকে একটি অহেতুক বিতর্কিত প্রশ্নে পরিণত করা হয়েছে। অথচ কুরআনে উল্লিখিত মূলনীতির ভিত্তিতে এ প্রশ্নটির অকাট্য সমাধান আপনা-আপনি বের হয়ে আসে। পুত্রের তুলনায় পৌত্র অধিক অভাবগ্রস্ত হলেও اَقْرَبُوْنَ এর আইনের দৃষ্টিতে সে ওয়ারিশ হতে পারে না। কেননা পুত্রের উপস্থিতিতে সে নিকটতম আত্মীয় নয়। তবে তার অভাব দূর করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনি এক ব্যবস্থা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে।

এ প্রশ্নে বর্তমান যুগের পাশ্চাত্যভক্ত নব্য শিক্ষিতদের ছাড়া কেউ দ্বিমত করেনি। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে একথাই বুঝে এসেছে যে, পুত্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পৌত্র উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না; তার পিতা বিদ্যমান থাকুক অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হোক।

উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে মীমাংসিত : আয়াতের শেষে বলা হয়েছে نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا এতে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বিভিন্ন ওয়ারিশের জন্য যে বিভিন্ন অংশ কুরআন নির্দিষ্ট করেছে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অংশ। এতে কারো নিজস্ব অভিমত ও অনুমানের ভিত্তিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোনো অধিকার নেই।

উত্তরাধিকারিত্ব একটি বাধ্যতামূলক মালিকানা : مَّفْرُوْضًا শব্দ থেকে আরো একটি মাসআলা জানা যায় যে, উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ওয়ারিশরা সে মালিকানা লাভ করে, তা বাধ্যতামূলক। এতে ওয়ারিশের কবুল করা এবং সম্মত হওয়া জরুরি ও শর্ত নয়; বরং সে যদি মুখে স্পষ্টতঃ বলে যে, সে তার অংশ নেবে না, তবুও আইনতঃ সে নিজের অংশের মালিক হয়ে যায়। এটা ভিন্ন কথা যে, মালিক হওয়ার পর শরিয়তের বিধি অনুযায়ী অন্য কাউকে দান, বিক্রি, অথবা বিলি-বন্টন করে দিতে পারবে।

বঞ্চিত আত্মীয়দের মনস্তুষ্টি বিধান করা জরুরি : মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে এমন কিছু লোকও থাকবে, যারা শরিয়তের বিধি অনুযায়ী তার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশ পাবে না। বলাবাহুল্য, ফারায়েজের বিস্তারিত আইন-কানুন সম্পর্কে প্রত্যেকেই জ্ঞাত নয়। সাধারণভাবে প্রত্যেক আত্মীয়ই অংশ পাওয়ার আশা পোষণ করতে পারে। তাই যেসব আত্মীয় নিয়মানুযায়ী বঞ্চিত সাব্যস্ত হয়, বন্টনের সময় তারা বিষণ্ণ ও দুঃখিত হতে পারে; যদি তারা বন্টনের সময় মজলিসে উপস্থিত থাকে এবং বিশেষতঃ যখন তাদের মধ্যে কিছু এতিম, মিসকিন ও অভাবগ্রস্তও থাকে। এমতাবস্থায় যখন অন্যান্য আত্মীয় নিজ নিজ অংশ নিয়ে যায় আর তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখে তখন তাদের বেদনা, নৈরাশ্য ও মনোকষ্ট ভুক্তভোগী মাত্রই অনুমান করতে পারে।

এখন কুরআনি ব্যবস্থার সৌন্দর্যও লক্ষ্য করুন। একদিকে স্বয়ং কুরআনেরই বর্ণিত সুবিচারভিত্তিক বিধান এই যে, নিকটবর্তী আত্মীয় বর্তমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হবে, অপরদিকে বঞ্চিত দূরবর্তী আত্মীয় মনোবেদনা ও নৈরাশ্যকেও উপেক্ষা করা হয়নি। এর জন্য একটি স্বতন্ত্র আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

"যেসব দূরবর্তী এতিম, মিসকিন ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যদি তারা বন্টনের সময় উপস্থিত থাকে, তবে অংশীদারদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এ মাল থেকে স্বেচ্ছায় তাদেরকে কিছু দিয়ে দেওয়া এটা তাদের জন্য এক প্রকার সদকা ও ছওয়াবের কাজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَنَسْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْنَاسُ মূলবর্ণ (ا ـ ن ـ س) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা দেখেছ, অনুভব করছ।

لِيَسْتَعْفِفْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعْفَافُ মূলবর্ণ (ع ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যেন সে নিবৃত থাকে।

سَيَصْلَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّلْيُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা অচিরেই প্রবেশ করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله اَنْ يَّكْبَرُوْا : এখানে এর পূর্বে مَخَافَةَ পদ উহ্য আছে, اَنْ يَّكْبَرُوْا পদ সেই مَخَافَةَ পদের مضاف اليه হিসেবে محلا মাজরূর হয়েছে।

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۱﴾

অনুবাদ : (১১) আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমাদের সন্তানদের [অংশ পাওয়া] সম্বন্ধে- পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান হবে, আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই-এর অধিকও হয়, তবে তারা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয়, তবে সে অর্ধাংশ পাবে, আর পিতামাতা অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে- যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান থাকে, আর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকে এবং কেবল পিতামাতাই তার ওয়ারিশ হয়, তবে তার মাতার প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ, আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে, তবে তার মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে, অসিয়ত আদায় করার পর যা মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করেছে, অথবা ঋণ [অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ]-এর পর, তোমাদের মূল ও শাখাসমূহ যারা আছে, তোমরা পুরাপুরি জানতে পার না যে, তন্মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমাদের উপকার সাধনে অধিকতর নিকটবর্তী এই আদেশ আল্লাহর নিকট হতে নির্ধারিত করা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১১) يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ তোমাদের সন্তানদের [অংশ পাওয়া] সম্বন্ধে- لِلذَّكَرِ পুত্রের অংশ দুই مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ কন্যার অংশের সমান হবে فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই-এর অধিকও হয় فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ তবে তারা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয় فَلَهَا النِّصْفُ তবে সে অর্ধাংশ পাবে وَلِاَبَوَيْهِ আর পিতামাতা لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকে السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে- اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান থাকে فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ আর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকে وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ এবং কেবল পিতামাতাই তার ওয়ারিশ হয় فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ তবে তার মাতার প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ তবে তার মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ অসিয়ত আদায় করার পর يُّوْصِيْ بِهَآ যা মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করেছে اَوْ دَيْنٍ অথবা ঋণ [অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ]-এর পর, اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ তোমাদের মূল ও শাখাসমূহ যারা আছে لَا تَدْرُوْنَ তোমরা পুরাপুরি জানতে পার না যে اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا তন্মধ্যে কোনো ব্যক্তি তোমাদের উপকার সাধনে অধিকতর নিকটবর্তী فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ এই আদেশ আল্লাহর নিকট হতে নির্ধারিত করা হয়েছে اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(১২) আর তোমরা অর্ধেক পাবে ঐ সম্পত্তির যা তোমাদের পত্নীগণ ত্যাগ করে যায় যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে, আর যদি ঐ পত্নীগণের কোনো সন্তান থাকে তবে তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে তোমরা এক চতুর্থাংশ পাবে, অসিয়ত পৃথক করে নেওয়ার পর যা তারা অসিয়ত করে যায় অথবা ঋণ [পরিশোধ] -এর পর; আর তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে এক চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, আর যদি তোমাদের কোনো সন্তান থাকে তবে তারা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পাবে, তোমাদের কৃত অসিয়ত পৃথক করার পর অথবা ঋণ [পরিশোধ]-এর পর, আর এমন মৃত্য ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী, যার ওয়ারিশ অন্যে হবে, মূল ও শাখাবিহীন হয় এবং তার এক [বৈপিত্রেয়] ভ্রাতা অথবা এক ভগ্নী থাকে, তবে এতদুভয়ের প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে, আর যদি তারা তদপেক্ষা [একের] বেশি হয়, তবে এরা সকলে এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে, অসিয়ত পূর্ণ করার পর যেই অসিয়ত করা হয়েছে, অথবা ঋণ [শোধ] - এর পর, এই শর্তে যে, [অসিয়তকারী ওয়ারিশদের] কারোও ক্ষতি না করে, এই নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে করা হয়েছে, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতীব সহনশীল।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১২) وَلَكُمْ نِصْفُ আর তোমরা অর্ধেক পাবে مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ ঐ সম্পত্তির যা তোমাদের পত্নীগণ ত্যাগ করে যায় اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ আর যদি ঐ পত্নীগণের কোনো সন্তান থাকে فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ তবে তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে তোমরা এক চতুর্থাংশ পাবে مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا অসিয়ত পৃথক করে নেওয়ার পর যা তারা অসিয়ত করে যায় اَوْ دَيْنٍ অথবা ঋণ [পরিশোধ] -এর পর وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ আর তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে এক চতুর্থাংশ পাবে اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ আর যদি তোমাদের কোনো সন্তান থাকে فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ তবে তারা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পাবে مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا তোমাদের কৃত অসিয়ত পৃথক করার পর اَوْ دَيْنٍ অথবা ঋণ [পরিশোধ] - এর পর وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ আর এমন মৃত্য ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী, যার ওয়ারিশ অন্যে হবে, মূল ও শাখাবিহীন হয় وَلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ এবং তার এক [বৈপিত্রেয়] ভ্রাতা অথবা এক ভগ্নী থাকে فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ তবে এতদুভয়ের প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ আর যদি তারা তদপেক্ষা [একের] বেশি হয় فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ তবে এরা সকলে এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ অসিয়ত পূর্ণ করার পর যেই অসিয়ত করা হয়েছে اَوْ دَيْنٍ অথবা ঋণ [শোধ] -এর পর غَيْرَ مُضَآرٍّ এই শর্তে যে, [অসিয়তকারী ওয়ারিশদের] কারোও ক্ষতি না করে وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ এই নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে করা হয়েছে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতীব সহনশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১১) قوله يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِىٓ اَوۡلَادِكُمۡ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَيَيۡنِ الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : আবদ বিন হুমাইদ হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমার অসুস্থতাবস্থায় আমাকে দেখার জন্য আসেন। ফলে আমি বললাম, আমার সন্তান-সন্ততিদের মাঝে কিরূপভাবে বন্টন করব? তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে বন্টনের নীতিমালাসহ আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী– ২১৬/২/৪, বাহরে মুহীত– ১৮৭/২/৪, ফাতহুল কাদীর– ১ : ৪৩৬, ইবনে কাছীর– ১ : ৪৫৭]

শানে নুযূল– ২ : হযরত জাবের ইবেন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। সা'আদ বিন রবী এর স্ত্রী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সা'আদ তার দু'কন্যা ও এক ভাই জীবিত রেখে ইন্তেকাল করেছেন। সা'আদের পরিত্যাজ্য মাল যা আছে, সবই তারা দখল করে নিতে চাচ্ছে। কন্যাদেরকে বিবাহ দিতে হলে মালের প্রয়োজন রয়েছে। রাসূল ﷺ তাকে তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দেননি। অতঃপর কিছুক্ষণ পর সা'আদের স্ত্রী এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সা'আদ কন্যাদের বিষয়টি? তখন রাসূল ﷺ বলনে, তার ভাইকে আমার নিকট নিয়ে আস। সা'আদের ভাই আসলে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, সা'আদের কন্যানদেরকে $\frac{২}{৩}$ এবং সা'আদের স্ত্রীকে $\frac{১}{৮}$ অংশ দিয়ে দাও। অবশিষ্ট যা থাকবে, তা হলো তোমার জন্য। রাসূল ﷺ কর্তৃক বন্টনের পরিপ্রেক্ষিতে মিরাশের আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা.) পায়ে হেটে বনী সালামায় আমাকে দেখতে যান। তখন তারা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমাকে পেয়েছেন। অতঃপর রাসূল ﷺ পানি এনে অজু করে আমার উপর পানি ছিটিয়ে দেন। এতে আমি আরোগ্য লাভ করি। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাল সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? হযরত জাবের (রা.)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী – ৫ : ৭৫]

শানে নুযূল– ৪ : হযরত মুকাতিল ও কালবী বলেন, আলোচ্য আয়াত উম্মে কুজ্জাহের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সুদ্দী বলেন, হাসসান বিন সাবেতের ভাই আব্দুর রহমান বিন ছাবেত সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কারো মতে জাহেলি যুগে যারা শত্রুর মোকাবিলা করতে সক্ষম নয় তাদের ওয়ারিশ বানানো হতো না। তখন ছোট বড় সকলের অংশ সুনিশ্চিত করে দেওয়ার জন্যই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী– ৫ : ৫৮]

সম্পদ বন্টনের পূর্বে করণীয় : শরিয়তের নীতি এই যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরিয়তানুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়টি নিষিদ্ধ। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি ঋণ সম্পত্তির সমপরিমাণ কিংবা তারও বেশি হয়, তবে কেউ ওয়ারিশী স্বত্ব পাবে না এবং কোনো অসিয়ত কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা ঋণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোনো অসিয়ত করে থাকলে এবং তা গুনাহর অসিয়ত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা কার্যকর হবে। যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তি অসিয়ত করে যায় তবুও এক তৃতীয়াংশের অধিক অসিয়ত কার্যকর হবে না। এমনটি করা সমীচীন নয় এবং ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার নিয়তে অসিয়ত করা পাপ কাজ বটে।

ঋণ পরিশোধের পর এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে অসিয়ত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরিয়তসম্মত ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ফারায়েজ গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব। অসিয়ত না থাকলে ঋণ পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

কন্যাদেরকে অংশ দেওয়ার গুরুত্ব : কুরআন পাক কন্যাদেরকে অংশ দেওয়ার প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, কন্যাদের অংশকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্রদের অংশ ব্যক্ত করেছে এবং لِلۡاُنۡثَيَيۡنِ مِثۡلُ حَظِّ الذَّكَرِ [দুই কন্যার অংশ এক পুত্রের অংশের সমপরিমাণ] বলার পরিবর্তে لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَيَيۡنِ [এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ] বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেকেই বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনরা একথা চিন্তা করে

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে দেয় যে, পাওয়া যখন যাবেই না, তখন ভাইদের সাথে মন কষাকষির দরকার কি? এরূপ ক্ষমা শরিয়তের আইনে ক্ষমাই নয়; ভাইদের জিম্মায় তাদের হক পাওনা থেকে যায়। যারা এভাবে ওয়ারিশী স্বত্ব আত্মসাৎ করে, তারা কঠোর গুনাহগার। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাবালেগ কন্যাও থাকে। তাদেরকে অংশ না দেওয়া দ্বিগুণ গুনাহ। এক গুনাহ শরিয়তসম্মত ওয়ারিশের অংশ আত্মসাৎ করার এবং দ্বিতীয় গুনাহ এতিমের সম্পত্তি হজম করে ফেলার।

এরপর আরো ব্যাখ্যা সহকারে কন্যাদের অংশ বর্ণনা করে বলা হয়েছে– فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ অর্থাৎ, যদি পুত্র সন্তান না থাকে, শুধু একাধিক কন্যাই থাকে, তবে তারা ত্যাজ্য সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। এতে সব কন্যাই সমান অংশীদার হবে। অবশিষ্ট তিন ভাগের এক অন্যান্য ওয়ারিশ যেমন মৃত ব্যক্তির পিতামাতা, স্ত্রী অথবা স্বামী প্রমুখ পাবে। কন্যাদের সংখ্যা দুই বা তার বেশি হলে দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে তারা সমান অংশীদার হবে।

স্বামী ও স্ত্রীর অংশ : উপরিউক্ত বর্ণনায়ও স্ত্রীর অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে স্বামীর অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। একে প্রথমে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এর গুরুত্ব প্রকাশ করা। কেননা স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী ভিন্ন পরিবারের লোক হয়ে যায়। যদি পিত্রালয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং তার সম্পত্তি সেখানেই থাকে, তবে স্বামীর অংশ দেওয়া থেকে গা বাঁচানোর চেষ্টা হতে পারে। এ অন্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্যই বোধ হয় স্বামীর অংশ প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। মৃতা স্ত্রীর যদি কোনো সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত কার্যকর করার পর স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে অন্যান্য ওয়ারিশ যেমন মৃতার পিতা-মাতা, ভাই-বোন যথারীতি অংশ পাবে।

মৃতার যদি সন্তান থাকে, এক বা একাধিক– পুত্র বা কন্যা, এ স্বামীর ঔরসজাত হোক বা পূর্ববর্তী কোনো স্বামীর ঔরসজাত, তবে বর্তমান স্বামী ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত কার্যকর করার পর মৃতার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অন্য ওয়ারিশরা পাবে।

পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোনো সন্তান না থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী মোট সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে, এ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর হোক, তবে ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও উপরিউক্ত বিবরণ অনুযায়ী এক অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বণ্টন করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীই এক চতুর্থাংশ কিংবা এক অষ্টমাংশ পাবে না; বরং সবাই মিলে এক চতুর্থাংশ কিংবা এক অষ্টমাংশের অংশীদার হবে। উভয় অবস্থাতে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

মাসআলা : প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতোই প্রথমে মোট ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে মোহরানা পরিশোধ করার পর ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

মোহরানা দেওয়ার পর স্ত্রীর ওয়ারিশী স্বত্বে অংশীদার হবার দরুন এ অংশও নিবে। মোহরানা পরিশোধ করার পর যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতো সম্পূর্ণ সম্পত্তি মোহরানা বাবদ স্ত্রীকে সমর্পণ করা হবে এবং কোনো ওয়ারিশই অংশ পাবে না।

কালালা'র ওয়ারিশী স্বত্ব : আলোচ্য আয়াতে 'কালালা'র পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। 'কালালার' অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী (র.) এগুলো স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হচ্ছে অর্থাৎ, যে মৃত ব্যক্তির ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কেউ নেই, সেই কালালাহ।

রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার লিখেন কালালা শব্দটি আসলে كَلَالٌ অর্থে মাসদার। এর অর্থ পরিশ্রান্ত হওয়া, যা দুর্বলতার পরিচায়ক। পিতা-পুত্রের আত্মীয়তা ব্যতীত অন্য আত্মীয়তাকে কালালা বলা হয়েছে। কেননা এ আত্মীয়তা পিতা-পুত্রের আত্মীয়তার তুলনায় দুর্বল।

غَيْرَ مُضَارٍّ -এর তাফসীর : কালালা'র ওয়ারিশী স্বত্বের উপসংহারে এই ওয়ারিশী স্বত্ব অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর কার্যকর হবে বলে উল্লেখ করার পর غَيْرَ مُضَارٍّ বলা হয়েছে এ শর্তটি যদিও শুধু এখানেই উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এর পূর্বে অন্য যে দু'জায়গায় অসিয়ত ও ঋণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও এ হুকুমই গ্রহণীয় ও কার্যকর হবে। এর

উদ্দেশ্য এই যে, মৃত ব্যক্তির জন্য অসিয়ত কিংবা ঋণের মাধ্যমে ওয়ারিশদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বৈধ নয়। অসিয়ত করা কিংবা নিজের জিম্মায় ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকার করার মধ্যে ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুক্কায়িত থাকা এবং সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবিরা গুনাহ।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلذَّكَرُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন ذُكُوْرٌ অর্থ– ছেলে।

حَظٌّ : শব্দটি একবচন, বহুবচন حُظُوْظٌ অর্থ– অংশ।

اَلسُّدُسُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَسْدَاسٌ অর্থ– এক ষষ্ঠাংশ।

اَلرُّبُعُ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَرْبَاعٌ অর্থ– এক চতুর্থাংশ।

اَلثُّمُنُ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَثْمَانٌ অর্থ– এক অষ্টমাংশ।

كَلٰلَةٌ : ঐ ব্যক্তি যার উর্ধ্বতন কিংবা অধঃস্তন কোনো পুরুষ নেই অর্থাৎ, যার পিতা, দাদা এবং ছেলে বা নাতী নেই।

مُضَارٍّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلضَّرَرُ মূলবর্ণ– (ض . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ক্ষতিকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ

قوله نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ : আয়াতে نِسَاءً মাওসূফ আর فَوْقَ اثْنَتَيْنِ উহ্য شبه فعل -এর সাথে متعلق হয়ে সিফাত উভয়ে মিলিত হয়ে كَانَ এর খবর, আর فَلَهُنَّ জাওয়াবে শর্ত।

قوله مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ : বাক্যটি كائنة উহ্য شبه فعل -এর সাথে متعلق হয়েছে যা উহ্য মুবতাদার খবর উহ্য ইবারতটি ছিল এরকম قِسْمَةُ هٰذِهِ الْاَنْصِبَاءِ كَائِنَةٌ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ।

قوله اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ : বাক্যটি মুবতাদা لَا تَدْرُوْنَ বাক্যটি খবর। اَيُّهُمْ মুবতাদা اَقْرَبُ মুমাইয়ায نَفْعًا তামীয, তামীয, মুমাইয়্যাযা মিলিত হয়ে খবর। فَرِيْضَةً মাসদার হলো উহ্য ফে'লের। অর্থাৎ فَرِيْضَةً يَفْرِضُ اللهُ فَرِيْضَةً যা يُوْصِيْكُمْ দ্বারা বুঝা যায়।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৩) এই বর্ণিত নির্দেশনাবলি আল্লাহর আহকাম, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এরূপ জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তারা অনন্তকাল তাতে অবস্থান করবে, আর তা বিরাট সফলতা।	تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ ۚ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾
(১৪) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করবে এবং সম্পূর্ণরূপেই তাঁর বিধানসমূহ লঙ্ঘন করে চলবে, আল্লাহ তাকে অগ্নিতে [দোজখে] দাখিল করে দিবেন এরূপে যে, সে তাতে অনন্তকাল থাকবে, এবং তার এরূপ শাস্তি হবে, যাতে লাঞ্ছনাও রয়েছে।	وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾
(১৫) এবং যেসব স্ত্রীলোক অশ্লীল কাজ [ব্যভিচার] করে তোমাদের পত্নীদের মধ্য হতে, তবে তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদের উপর নিজেদের মধ্য হতে চার ব্যক্তিকে সাক্ষী করে নাও। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তোমরা তাদেরকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ ঐ পর্যন্ত যে, [হয়] মৃত্যু তাদের অবসান ঘটিয়ে দেয় অথবা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোনো পথ নির্ধারণ করেন।	وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩) تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ এই বর্ণিত নির্দেশনাবলি আল্লাহর আহকাম وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ আল্লাহ তাকে এরূপ জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তারা অনন্তকাল তাতে অবস্থান করবে وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ আর তা বিরাট সফলতা।

(১৪) وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করবে وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ এবং সম্পূর্ণরূপেই তাঁর বিধানসমূহ লঙ্ঘন করে চলবে। يُدْخِلْهُ نَارًا আল্লাহ তাকে অগ্নিতে [দোজখে] দাখিল করে দিবেন এরূপে যে خَالِدًا فِيْهَا সে তাতে অনন্তকাল থাকবে وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ এবং তার এরূপ শাস্তি হবে, যাতে লাঞ্ছনাও রয়েছে।

(১৫) وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ এবং যেসব স্ত্রীলোক অশ্লীল কাজ [ব্যভিচার] করে مِنْ نِّسَآئِكُمْ তোমাদের পত্নীদের মধ্য হতে فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ। তবে তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদের উপর নিজেদের মধ্য হতে চার ব্যক্তিকে সাক্ষী করে নাও فَاِنْ شَهِدُوْا। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ তবে তোমরা তাদেরকে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ ঐ পর্যন্ত যে, [হয়] মৃত্যু তাদের অবসান ঘটিয়ে দেয় اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا অথবা আল্লাহ তা'আলা তাদেব জন্য অন্য কোনো পথ নির্ধারণ করেন।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৬) আর যে কোনো দুই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্য হতে এই নির্লজ্জতার কাজ করবে, তবে তাদেরকে কষ্ট প্রদান কর, অনন্তর যদি তারা তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের পিছনে লেগে থেক না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তওবা কবুলকারী, করুণাময়।	وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾
(১৭) তওবা, যা কবুল করা আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে, তা তো কেবল তাদেরই জন্য যারা বোকামি বশতঃ কোনো পাপ করে ফেলে, অতঃপর অবিলম্বে [মৃত্যু আসার পূর্বেই] তওবা করে সুতরাং এরূপ লোকের তওবাই আল্লাহ কুবল করে থাকেন, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧﴾
(১৮) আর এরূপ লোকের জন্য তওবা নেই যারা পাপ করতে থাকে, এ পর্যন্ত যে, যখন তাদের মধ্যে কারো সম্মুখে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন বলে- আমি তওবা করছি, আর না ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা মৃত্যুর সম্মুখীন হয় কুফরি অবস্থায় তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰىٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ أُولٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১৬) وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ আর যে কোনো দুই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্য হতে এই নির্লজ্জতার কাজ করবে فَاٰذُوْهُمَا তবে তাদেরকে কষ্ট প্রদান কর فَإِنْ تَابَا অনন্তর যদি তারা তওবা করে وَأَصْلَحَا এবং সংশোধন করে নেয় فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَا তাহলে তাদের পিছনে লেগে থেক না إِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ তওবা কবুলকারী رَّحِيْمًا করুণাময়।

(১৭) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ তওবা, যা কবুল করা আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ তা তো কেবল তাদেরই জন্য যারা বোকামি বশতঃ কোনো পাপ করে ফেলে ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ অতঃপর অবিলম্বে [মৃত্যু আসার পূর্বেই] তওবা করে فَأُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ সুতরাং এরূপ লোকের তওবাই আল্লাহ কুবল করে থাকেন وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(১৮) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ আর এরূপ লোকের জন্য তওবা নেই لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ যারা পাপ করতে থাকে, এ পর্যন্ত যে حَتّٰىٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ যখন তাদের মধ্যে কারো সম্মুখে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় قَالَ তখন বলে- إِنِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ আমি তওবা করছি وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ আর না ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা মৃত্যুর সম্মুখীন হয় وَهُمْ كُفَّارٌ কুফরি অবস্থায় أُولٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি عَذَابًا أَلِيْمًا এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৫) قوله وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সকল মহিলাদের অপকর্ম জেনা-ব্যভিচার, ন্যায়পরায়ণ চারজন স্বাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যেত তাদেরকে গৃহবন্দি করে রাখা হতো। বের হবার মতো কোনো সুযোগ তাদের ছিল না। মৃত্যু কাল পর্যন্ত এমনভাবে বন্দী জীবনই তাদের কাটাতে হতো। ইসলামের প্রাথমিক কালের সে বিধান বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। তবে সূরায়ে নূরের আয়াত দ্বারা এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইকরিমা, আত্বা, হাসান ও আব্দুল্লাহ বিন কাছীর (র.) বলেন, وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا আয়াত ভিন্ন নর-নারীর অবৈধ যৌন মিলন তথা জেনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা সুদ্দী (র.) বলেন, যুবক-যুবতীর অবৈধ মিলন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ (র.) বলেন, দু'জন পুরুষে সমকামিতা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতানুসারে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কাউকে যদি সমকামিতায় লিপ্ত দেখতে পাও, তাহলে তাদের উভয়জনকে হত্যা করে ফেল। উল্লেখ্য উপরিউক্ত ২য় আয়াতটি মুমিনদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ৩য় আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং ৪র্থ আয়াত মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১৪০ : ২-৪]

কুরআনে পাকের বর্ণনা-পদ্ধতি এই যে, বিধানাবলি বর্ণনা করার পর পরিশিষ্ট হিসেবে মান্যকারীদের জন্য উৎসাহবাণী এবং তাদের ফজিলত উল্লেখ করা হয় আর অমান্যকারীদের জন্য ভীতি প্রদর্শন, শাস্তি ও তাদের নিন্দা উল্লেখ করা হয়।

এখানেও বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য ১৩ নং আয়াতে আনুগত্যকারী ও অবাধ্যতাকারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

ওয়ারিশি স্বত্বের বিধানাবলির পরিশিষ্ট মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না: ওয়ারিশি স্বত্ব বণ্টনের ভিত্তি বংশগত আত্মীয়তার উপর রচিত। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথম, যার ওয়ারিশ এবং যে ওয়ারিশ তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বি হতে পারবে না। কাজেই মুসলমান কোনো কাফেরের এবং কাফের কোনো মুসলমানের ওয়ারিশ হবে না, তাদের পরস্পরের মধ্যে যে কোনো ধরনের বংশগত সম্পর্কই থাক না কেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ অর্থাৎ মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারবে না। –[মিশকাত]

এ বিধান তখনকার জন্য যখন জন্মের পর থেকেই একজন ব্যক্তি মুসলমান অথবা কাফের হয়। কিন্তু কেউ যদি পূর্বে মুসলমান থাকে, এরপর নাউযুবিল্লাহ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে এরূপ ব্যক্তি মারা গেলে কিংবা নিহত হলে তার মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত মাল বায়তুল মালে জমা হবে।

কিন্তু কোনো স্ত্রী লোক ধর্মত্যাগ করলে তার উভয় অবস্থার উপার্জিত ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিশরা পাবে। কিন্তু স্বয়ং ধর্মত্যাগী ব্যক্তি পুরুষ কিংবা স্ত্রী কোনো মুসলমানের কাছ থেকে অথবা ধর্মত্যাগীর কাছ থেকে ওয়ারিশি স্বত্ব পাবে না।

হত্যাকারীর স্বত্ব : যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে সে স্বত্বাধিকারী ছিল, তবে এ হত্যাকারী তার ওয়ারিশি স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ অর্থাৎ, হত্যাকারী ওয়ারিশ হবে না। –[মিশকাত] তবে ভুলবশতঃ হত্যার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে। [বিস্তারিত তথ্য ফিকহ গ্রন্থেদ্রষ্টব্য]

গর্ভস্থ সন্তানের স্বত্ব : যদি কোনো ব্যক্তি কয়েকজন সন্তান রেখে যায় এবং স্ত্রীর গর্ভেও সন্তান থাকে, তবে এই গর্ভস্থ সন্তানও ওয়ারিশদের তালিকাভুক্ত হবে। কিন্তু সন্তানটি পুত্র না কন্যা, একজন না বেশি, তা জানা যেহেতু দুষ্কর, তাই গর্ভের এ সন্তান জন্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত বণ্টন মুলতবি রাখা উচিত। কোনো কারণে যদি তাৎক্ষণিকভাবেই বণ্টন জরুরি হয়, তবে গর্ভস্থ সন্তানকে এক পুত্র অথবা এক কন্যা উভয়ের মধ্য থেকে যা ধরে বণ্টন করলে ওয়ারিশরা কম পায়, সেই প্রকার স্বত্ব তাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি গর্ভস্থ সন্তানের জন্য রেখে দিতে হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পুরুষ ও নারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা নির্লজ্জ কাজ অর্থাৎ, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যেসব নারী দ্বারা এমন কুকর্ম সংঘটিত হয়, তাদের এ কাজ প্রমাণ করার জন্য চার জন পুরুষ সাক্ষী তলব করতে হবে। অর্থাৎ যেসব বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্য চার জন যোগ্য সাক্ষী তলব করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুষ শ্রেণিভুক্ত হওয়াও জরুরি। এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যভিচারের সাক্ষীদের ব্যাপারে শরিয়ত দু'রকম কঠোরতা করেছে যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এতে ইজ্জত ও আবরু আহত হয় এবং পারিবারিক মানসম্ভ্রমের প্রশ্ন দেখা দেয়, তাই প্রথমে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এমন ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই সাক্ষী হতে হবে। নারীদের সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয়তঃ চার জন পুরুষ হওয়া জরুরি সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ শর্তটি খুবই কঠোর দৈবাৎ ও কদাচিৎ তা পাওয়া যেতে পারে। এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অথবা অন্য স্ত্রী অথবা ভাই-বোন ব্যক্তিগত জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না

পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকারী লোকেরা শত্রুতা–বশতঃ অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়। কেননা চার জন পুরুষ সাক্ষীর কমে ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। এমতাবস্থায় বাদি ও সাক্ষীরা সকলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় এবং একজন মুসলমানের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার দায়ে তাদেরক 'হদ্দে-কযফ' বা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত গুনাহ মাফ হয় কি না : এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুরআনে بِجَهَالَةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায়, অজ্ঞাতসারে এবং না জেনে-শুনে গুনাহ করলে তওবা কবুল হবে এবং জ্ঞাতসারে জেনে-শুনে গুনাহ করলে তওবা কবুল হবে না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন তা এই যে, এখানে এর جَهَالَةٌ অর্থ এই নয় যে, সে গুনাহর কাজটি যে গুনাহ তা জানে না কিংবা গুনাহর ইচ্ছা নেই; বরং অর্থ এই যে, গুনাহর অশুভ পরিণাম ও পারলৌকিক আজাবের প্রতি তার সাময়িক অনীহাই তার গুনাহের কাজ করার কারণ; যদিও গুনাহটি যে গুনাহ তা সে জানে এবং তার ইচ্ছাও করে।

পক্ষান্তরে جَهَالَةٌ শব্দটি এখানে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা ইউসুফে এর নজির বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদেরকে বলেছিলেন : هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ এতে ভাইদেরকে জাহেল বলা হয়েছে, অথচ তারা যে কাজ করেছিল, তা কোনো ভুল অথবা ভুলে যাওয়াবশতঃ ছিল না; বরং ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে-শুনেই করেছিল। কিন্তু এ কাজের পরিণতি সম্পর্কে গাফেল হওয়ার কারণে তাদেরকে জাহেল বলা হয়েছে।

আবুল আলিয়াও কাতাদাহর বর্ণনা মতে সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, كُلُّ ذَنْبٍ اَصَابَهُ عَبْدٌ فَهُوَ جَهَالَةٌ عَمْدًا كَانَ اَوْ غَيْرَهُ অর্থাৎ বান্দা যে গুনাহ করে অনিচ্ছাকৃত করুক কিংবা ইচ্ছাকৃত, সর্বাবস্থায়ই তা মূর্খতা। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন كُلُّ عَامِلٍ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَهُوَ جَاهِلٌ حِيْنَ عَمِلَهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো কাজে আল্লাহর নাফরমানি করছে, সে দৃশ্যতঃ বড় আলেম ও বিশেষ জানা-শোনা বিচক্ষণ হলেও সে কাজ করার সময় মূর্খই হয়ে যায়। –[ইবনে কাছীর]

আবূ হাইয়ান তাফসীরে বাহরে মুহীতে বলেন এটা এমনই, যেমন হাদীসে বলা হয়েছে لَا يَزْنِي الزَّانِيْ অর্থাৎ ব্যভিচারী ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করে না। উদ্দেশ্য এই যে, যখন সে এই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তখন সে ঈমানের তাগিদ থেকে দূরে সরে পড়ে।

তাই হযরত ইকরিমা (র.) বলেন : দুনিয়ার যেসব কাজ আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে, সেগুলো সবই মূর্খতা। কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করে, সে ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। যে ব্যক্তি এ ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে চিরস্থায়ী আজাব ক্রয় করে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। তাকে সবাই মূর্খ বলবে, যদিও সে ভালোভাবে জানা ও বুঝার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সে কুকর্ম সম্পাদন করে।

মোটকথা, গুনাহর কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক, কিংবা ভুলক্রমে, উভয় অবস্থাতেই তা মূর্খতাবশতঃ সম্পন্ন হয়। এ কারণেই সাহাবা, তাবেয়ীন ও সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো গুনাহ করে, তার তওবাও কবুল হতে পারে। –[বাহরে মুহীত]

শব্দ বিশ্লেষণ

حُدُوْدٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন حد অর্থ– সীমানা, চৌহদ্দি।

يَعْصِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِصْيَانُ মূলবর্ণ (ع . ص . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে নাফরমানি করে।

يَتَعَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّعَدِّيْ মূলবর্ণ (ع . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে অমান্য করে।

يَتَوَفّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّيْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে মৃত্যু বরণ করে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾

অনুবাদ : (১৯) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য তা বৈধ নয় যে, বলপূর্বক নারীদের মালিক হয়ে যাও, আর ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকদেরকে এই জন্য আবদ্ধ করো না যে, যা কিছু তোমরা তাদেরকে দিয়েছ তন্মধ্য হতে কিছু অংশ আদায় করে নিবে, কিন্তু তারা কোনো প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে [আবদ্ধ রাখা বা মাল আদায় করা যেতে পারে] আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর, আর যদি তারা তোমাদের মনঃপূত না হয়, তবে [এই ভেবে ধৈর্য ধর যে,] তোমরা কোনো এক বস্তুকে অপছন্দ কর, অথচ হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে [পার্থিব বা পারলৌকিক] কোনো বড় উপকার নিহিত রেখেছেন।

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۲۰﴾

(২০) আর যদি তোমরা এক পত্নীর স্থলে অন্য পত্নী গ্রহণ করতে চাও, আর তোমরা সেই একজনকে রাশি রাশি ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবুও তোমরা তা হতে কিছুই [ফেরৎ] নিও না, তোমরা কি তা [ফেরৎ] নিবে [তার প্রতি] অপবাদ আরোপ করে এবং প্রকাশ্য পাপাচারী হয়ে?

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿۲۱﴾

(২১) আর তোমরা তা কেমন করে গ্রহণ করবে! অথচ তোমরা একে অন্যের সাথে অবাধ মেলামেশা করেছ, আর এই নারীগণ তোমাদের নিকট হতে একটি দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৯) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا يَحِلُّ لَكُمْ তোমাদের জন্য তা বৈধ নয় যে اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا বলপূর্বক নারীদের মালিক হয়ে যাও وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ আর ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকদেরকে এই জন্য আবদ্ধ করো না যে لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ তন্মধ্য হতে কিছু অংশ আদায় করে নিবে مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ যা কিছু তোমরা তাদেরকে দিয়েছ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ কিন্তু তারা কোনো প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করবে [আবদ্ধ রাখা বা মাল আদায় করা যেতে পারে] وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ আর যদি তারা তোমাদের মনঃপূত না হয় فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا তবে [এই ভেবে ধৈর্য ধর যে,] তোমরা কোনো এক বস্তুকে অপছন্দ কর وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا অথচ হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে [পার্থিব বা পারলৌকিক] কোনো বড় উপকার নিহিত রেখেছেন।

(২০) وَاِنْ اَرَدْتُّمُ আর যদি তোমরা চাও اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ এক পত্নীর স্থলে অন্য পত্নী গ্রহণ করতে وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا আর তোমরা সেই একজনকে রাশি রাশি ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا তবুও তোমরা তা হতে কিছুই [ফেরত] নিও না اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا তোমরা কি তা [ফেরত] নিবে [তার প্রতি] অপবাদ আরোপ করে وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا এবং প্রকাশ্য পাপাচারী হয়ে?

(২১) وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ আর তোমরা তা কেমন করে গ্রহণ করবে! وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ অথচ তোমরা একে অন্যের সাথে অবাধ মেলামেশা করেছ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ আর এই নারীগণ তোমাদের নিকট হতে নিয়ে রেখেছে مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا একটি দৃঢ় অঙ্গীকার।

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا (২২)

অনুবাদ : (২২) আর তোমরা ঐ সমস্ত নারীকে বিবাহ করো না যাদেরকে তোমাদের পিতৃগণ [অর্থাৎ বাপ, দাদা, বা নানা] বিবাহ করেছেন, কিন্তু যা অতীত হয়েছে– নিশ্চয় তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও খুব ঘৃণার বিষয় এবং খুব নিকৃষ্ট প্রথা।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (২৩)

(২৩) তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতৃগণ এবং তোমাদের কন্যাগণ এবং তোমাদের ভগ্নীগণ এবং তোমাদের ফুফুগণ এবং তোমাদের খালাগণ এবং ভ্রাতৃ-কন্যাগণ এবং ভগিনী-কন্যাগণ এবং তোমাদের ঐ মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছেন, আর তোমাদের ঐ ভগ্নীগণ যারা স্তন্য পানের দরুন [ভগ্নী] হয়েছে এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ এবং তোমাদের স্ত্রীদের কন্যাগণ যারা তোমাদের প্রতিপালনে রয়েছে এরূপ পত্নীগণ হতে, যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ আর যদি তোমরা ঐ স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম না করে থাক, তবে তোমাদের কোনো পাপ নেই, আর তোমাদের ঐ পুত্রগণের স্ত্রীগণ যারা তোমাদের ঔরসজাত, আর এই যে, তোমরা দুই ভগ্নীকে একত্রে [বিবাহে] রাখ কিন্তু যা [এই হুকুমের] পূর্বে হয়েছে [তা মাফ] নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাপরায়ণ, অতীব করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

(২২) وَلَا تَنْكِحُوْا আর তোমরা বিবাহ করো না مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ ঐ সমস্ত নারীকে যাদেরকে তোমাদের পিতৃগণ [অর্থাৎ বাপ, দাদা, বা নানা] বিবাহ করেছেন اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ কিন্তু যা অতীত হয়েছে– اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً নিশ্চয় তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা وَّمَقْتًا ও খুব ঘৃণার বিষয় وَسَآءَ سَبِيْلًا এবং খুব নিকৃষ্ট প্রথা।

(২৩) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে اُمَّهٰتُكُمْ তোমাদের মাতৃগণ وَبَنٰتُكُمْ এবং তোমাদের কন্যাগণ وَاَخَوٰتُكُمْ এবং তোমাদের ভগ্নীগণ وَعَمّٰتُكُمْ এবং তোমাদের ফুফুগণ وَخٰلٰتُكُمْ এবং তোমাদের খালাগণ وَبَنٰتُ الْاَخِ এবং ভ্রাতৃ-কন্যাগণ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ এবং ভগিনী-কন্যাগণ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ এবং তোমাদের ঐ মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছেন وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ আর তোমাদের ঐ ভগ্নীগণ যারা স্তন্য পানের দরুন [ভগ্নী] হয়েছে وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ এবং তোমাদের স্ত্রীদের কন্যাগণ যারা তোমাদের প্রতিপালনে রয়েছে مِّنْ نِّسَآئِكُمْ এরূপ পত্নীগণ হতে, الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ যাদের সাথে তোমরা সঙ্গম করেছ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ আর যদি তোমরা ঐ স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম না করে থাক فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তবে তোমাদের কোনো পাপ নেই وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ আর তোমাদের ঐ পুত্রগণের স্ত্রীগণ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ যারা তোমাদের ঔরসজাত। وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ আর এই যে, তোমরা দুই ভগ্নীকে একত্রে [বিবাহে] রাখ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ কিন্তু যা [এই হুকুমের] পূর্বে হয়েছে [তা মাফ] اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাপরায়ণ, অতীব করুণাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৯) قوله يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الخ **: আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** জাহেলি যুগে প্রচলিত ছিল যে, কোনো পুরুষ যদি মারা যেত, তাহলে তার ওয়ারিশগণ তার স্ত্রীর উপর তাদের কর্তৃত্ব বিস্তার করত। কেউ ইচ্ছা করলে তাকে নিজে বিবাহ করত, কেউ ইচ্ছা করলে তাকে অন্যের নিকট বিবাহ দিত, কেউ ইচ্ছা করলে তাকে বিবাহ করত না। মোদ্দাকথা, সে নারীদের অভিভাবক অপেক্ষা তারা অধিক বেশি অধিকারী হয়ে যেত। তখন নারীদের দূরবস্থাগত সে প্রথা রহিত করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইমাম ওয়াকী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, জাহেলি যুগে কোনো মহিলার স্বামী যখন মৃত্যুবরণ করত, তখন কোনো পুরুষ এসে তার উপর কাপড় ফেলে দিলেই সে মৃতের স্ত্রী বিধবা মহিলাটি তার অধিকারভুক্ত হয়ে যেত। নারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অপরের কর্তৃত্ব এবং স্বামী বিয়োগান্তিক মর্ম ব্যাথা, অপর দিকে অন্য পুরুষ আক্রান্ত গনিমতের মাল তুল্যতার অধিকারত্ব লাভ করা নারীর সাথে এহেন আচরণ করা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ ঘোষণা করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : আল্লামা আউফী (র.) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে– মদিনার কোনো পুরুষের বন্ধু যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন তার বন্ধুর স্ত্রীর উপর গিয়ে তার একটি কাপড় ফেলে দিল, কিন্তু সে তাকে বিবাহ করেনি; বরং সে বিধবা মহিলাকে বন্দি করে রেখে দেয় যাতে করে তার নিকট থেকে মুক্তিলাভের জন্য মুক্তিপণ প্রদান করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে নারীর সাথে এমন আচণ করা অবৈধতার বিধান সম্বলিত উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করা হয়।

শানে নুযূল– ৪ : আবূ বকর ইবনে মারদুভিয়া বলেন, আবূ কায়স বিন আসলাতু ইন্তেকাল করল, তখন জাহেলি যুগের প্রথা হিসেবে তার পুত্র তার স্ত্রীকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করল। এহেন অপমান, সভ্যতা বিবর্জিত ও নির্লজ্জজনক কাজটি আল্লাহ তা'আলা অবৈধ করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৫ : ইবনে জুরাইজ ও মুজাহিদ বলেন, জাহেলি যুগে কোনো পুরুষ যদি ইন্তেকাল করত, তাহলে মৃতের পুত্র তার স্ত্রী অর্থাৎ বি-মাতাকে বিবাহ করার কোনা প্রকারের ইচ্ছা থাকলে তাকে বিবাহ করার সর্বাধিক অধিকারী হতো। নতুবা তার ভাইদের মধ্যে যার ইচ্ছা হতো অথবা তার ভাতিজাদের মধ্য হতে যার ইচ্ছা হতো সেই বিবাহ করতে পারত। ফলে এ অপমান ও নির্লজ্জজনক প্রথা বিলুপ্তি করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ৪৬৫/১, রূহুল মা'আনী ২৪১/২/৪, বাহরে মুহীত– ২১১/৩, কুরতুবী– ৯১/৫]

(২২) قوله وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে সা'আদ মুহাম্মদ বিন কা'ব কর্তৃক হাদীস বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রী রেখে ইন্তেকাল করত, তাহলে তার স্ত্রীকে মৃত ব্যক্তির অন্য পক্ষের পুত্র বিবাহ করার ইচ্ছা থাকলে জাহেলি যুগের প্রথা অনুযায়ী বিবাহ করার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক অধিকারী হতো। কিংবা যা ইচ্ছা তা করত, সুতরাং আবূ কায়স বিন আসলাত যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তার পুত্র হাসান তার বি-মাতাকে বিবাহ করার অধিকার লাভ করে। কিন্তু তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি এবং আবূ কায়েসের পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিশত্ব প্রদান করেনি। সুতরাং বিধবা স্ত্রী নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে সে বিষয়ে আলোচনা করল, তখন রাসূল ﷺ বললেন, ফিরে যাও, আল্লাহ হয়তো খুব শীঘ্রই তোমার সম্পর্কে কোনো বিধান অবতীর্ণ করবেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। ওয়াহেদী ও অন্যান্যরা বলেন, আলোচ্য আয়াত হাসান বিন কায়স, আসওয়াদ বিন খালফ তার বি-মাতাকে বিবাহ করে, সাফওয়ান বিন উমাইয়া বিন খালফ তার বি-মাতা মুলাইকা বিনতে খারেজাকে বিবাহ করে। সৎমাতাকে বিবাহকারী কতিপয় ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৪৫/৪/২, কুরতুবী– ১০০/৫৫, ইবনে কাছীর– ৪৬৮/১]

(২৩) قوله وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ الخ **: আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আব্দুর রাজ্জাক তদীয় মুসান্নাফ গ্রন্থে ও ইবনে জারীর হযরত আতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন যায়েদের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী

যয়নবকে বিবাহ করেন, তখন মক্কার মুশরিকরা এ সম্পর্কে সমালোচনা করতে লাগল। মুশরিকদের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : রাসূল ﷺ যখন যয়নব বিনতে জাহাশ আল-আসাদীয়াহ বিনতে উমাইয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিবকে বিবাহ করেন, যয়নব বিনতে জাহাশকে যায়েদ বিন হারেছা তখন তালাক দিয়েছিলেন। সে জন্য মক্কার কাফের মুশরিকরা রাসূল ﷺ -এর সমালোচনায় লেগে পড়ল। সুতরাং মুমিনগণ পরবর্তীতে মুখে বানানো পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের ব্যাপারে নতুন করে কোনো সমস্যার সম্মুখীন যাতে না হয়, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[কাশশাফ– ৫২৮ : ১]

ইসলাম পূর্বযুগের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ : আলোচ্য আয়াত তিনটিতে সেসব নির্যাতন প্রতিরোধ করা হয়েছে, যেগুলো ইসলাম পূর্বকালে অবলাদের প্রতি নিতান্ত সাধারণ আচরণ বলে মনে করা হতো। তন্মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ নির্যাতন ছিল এই যে, পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করত। স্ত্রী যার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করত। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশরা যেমন তার ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ ও মালিক হতো, তেমনি তার স্ত্রীর ওয়ারিশ ও মালিক বলে গণ্য হতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করত কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে নিজেই তাকে বিয়ে দিত। স্বামীর [অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত] পুত্র নিজেও পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারত। স্ত্রীর প্রাণেরই যখন এই আস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো বলাই বাহুল্য। এই একটি মাত্র মৌলিক ভ্রান্তির ফলশ্রুতিতে নারীদের উপর নানা ধরনের অগণিত নির্যাতন চালাত। উদাহরণতঃ

এক. যেসব অর্থ–সম্পদ স্ত্রী উত্তরাধিকারীসূত্রে অথবা পিত্রালয় থেকে উপঢৌকন হিসেবে লাভ করত, সেগুলো হজম করে ফেলা হতো।

দুই. যদি কোনো নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিত, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিত, যাতে ধন-সম্পদ বাইরে নিয়ে যেতে না পারে; বরং এখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভুক্ত থেকে যায়।

তিন. মাঝে মাঝে স্ত্রীর কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও শুধু স্বভাবগতভাবে স্বামী তাকে অপছন্দ করত এবং স্ত্রীর প্রাপ্য প্রদান করত না। অপরপক্ষে তালাক দিয়ে তাকে মুক্তও করত না। যাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে অলঙ্কার ও মোহরানা বাবদ প্রদত্ত টাকা ফেরত দেয় কিংবা অপ্রদত্ত মোহরানা ক্ষমা করে দেয়। মাঝে মাঝে স্বামী তালাক দিয়েও তালাকপ্রাপ্তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিতো না, যাতে সে বাধ্য হয়ে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দিয়ে কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা ক্ষমা করে দেয়।

চার. কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিশরা বিধবাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিত না মূর্খতাপ্রসুত লজ্জার কারণে কিংবা কিছু অর্থ আদায় করার লোভে।

এসব নির্যাতনের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা নিজেদেরকে স্ত্রীর সম্পত্তি এমন কি, তার প্রাণেরও মালিক মনে করত। কুরআন পাক এসব অনর্থের সে মূলটি উৎপাটন করে দিয়েছে এবং এর আওতায় সংঘটিত নির্যাতনসমূহের প্রতিকারকল্পে ঘোষণা করেছে : يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের মালিক হয়ে বস।'

'বলপূর্বক' কথাটি এখানে শর্ত হিসেবে বলা হয়নি, যাতে এমন মনে করে নেওয়া যাবে যে, নারীদের সম্মতিক্রমে তাদের মালিক হওয়া হয়তো শুদ্ধ হবে; বরং বাস্তব ঘটনা বর্ণনার জন্য সংযুক্ত হয়েছে। শরিয়ত-সম্মত ও যুক্তিগত কারণ ছাড়াই নারীদের মালিক হয়ে যাওয়া বলপূর্বকই হতে পারে। কোনো বুদ্ধিমতি ও জ্ঞানী নারী এতে সম্মত হতে পারে না।

–[বাহরে মুহীত]

এ কারণেই শরিয়ত এ ব্যাপারে তার সম্মতিকে গুরুত্ব দেয়নি। কোনো নারী নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কারো মালিকানাধীন হতে রাজি হলেও ইসলামি আইন এতে রাজি নয় যে, কোনো স্বাধীন মানুষ কারো মালিকানাধীন চলে যাবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো হারাম নারী কোনো অবস্থাতেই হালাল হয় না, তাদেরকে 'মোহাররামাতে আবদিয়্যা' [চিরতরে হারাম] বলা হয়। কোনো কোনো নারী চিরতরে হারাম নয়, কোনো কোনো অবস্থায় তারা হালালও হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত তিন প্রকার : ১. বংশগত হারাম নারী, ২. দুধের কারণে হারাম নারী এবং ৩. শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী, চিরতরে হারাম। শেষোক্ত এক প্রকার অর্থাৎ, পর-স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে তখন পর্যন্ত হারাম।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ; জাহেলি যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্রেরা বিনা দ্বিধায় বিয়ে করে নিত। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই নির্লজ্জ কান্ডটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং একে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ বলে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য, যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব-চরিত্রের জঘন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

মাসআলা : আয়াতে পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম বলা হয়েছে। এতে এরূপ কোনো কথাই নেই যে, পিতা যদি তার সাথে সহবাসও করে। কাজেই যে কোনো স্ত্রীলোকের সাথে পিতার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে পুত্রের পক্ষে তাকে বিয়ে করা কখনো হালাল নয়।

এমনিভাবে পুত্রের স্ত্রীকে পিতার পক্ষে বিয়ে করা হালাল নয়; যদিও পুত্র শুধু বিবাহ করে– সহবাস না করে। আল্লামা শামী (র.) বলেন–

وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ الْاَصْلِ لِلْفَرْعِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ دَخَلَ بِهَا اَوْلَا

মাসআলা : যদি পিতা কোনো স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করে,তবুও তাকে বিয়ে করা পুত্রের পক্ষে হালাল নয়।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ অর্থাৎ আপন জননীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। اُمَّهٰتُ শব্দের ব্যাপকতায় দাদী, নানী, সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

وَبَنٰتُكُمْ; স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম।

মোটকথা, কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী এদের সবাইকে বিয়ে করা হারাম এবং বিয়ে করা স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা জায়েজ কিনা; সে সম্পর্কে পরে বর্ণনা করা হবে। যে পুত্র-কন্যা ঔরসজাত নয়; বরং পালিত, তাদের এবং তাদের সন্তানকে বিয়ে করা জায়েজ। যদি অন্য কোনো পথে অবৈধতা না থাকে। এমনিভাবে ব্যভিচারের মাধ্যমে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেও কন্যারই পর্যায়ভুক্ত। তাদের বিয়ে করাও দুরস্ত নয়।

وَاَخَوٰتُكُمْ; সহোদরা ভাগিনিকে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া ভাগিনিকেও বিয়ে করা হারাম।

وَعَمّٰتُكُمْ; পিতার সহোদরা, বৌমত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনকে বিয়ে করা হারাম। তিন প্রকার ফুফুকেই বিয়ে করা যায় না।

وَخٰلٰتُكُمْ; আপন জননীর তিন প্রকার বোন, প্রত্যেকের সাথেই বিয়ে করা হারাম।

وَبَنٰتُ الْاَخِ; ভ্রাতুস্পুত্রীর সাথেও বিয়ে হারাম; আপন হোক, বৈমাত্রেয় হোক বা বৈপিত্রেয়ের হোক– বিয়ে হালাল নয়।

وَبَنٰتُ الْاُخْتِ; বোনের কন্যা অর্থাৎ, ভাগ্নেয়ীর সাথেও বিয়ে হারাম। এখানেও বোনকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে।

وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْۤ اَرْضَعْنَكُمْ; যেসব নারীর স্তন্য পান করা হয়, তারা জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিয়ে হারাম। অল্প দুধ পান করুক কিংবা বেশি, একবার পান করুক কিংবা একাধিকবার। সর্বাবস্থায় তারা হারাম হয়ে যায়। ফিকহবিদগণের পরিভাষায় এটাকে 'হুরমতে রেযাআত' বলা হয়।

তবে এটতুকু স্মরণ রাখা জরুরি যে, শিশু অবস্থায় দুধ পানের সময় দুধ পান করলেই এই حُرْمَتْ رَضَاعَتْ কার্যকরী হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন اِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ অর্থাৎ, দুধ পানের কারণে যে অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তা সে সময়ে দুধ পান করলে হবে, যে সময় দুধ পান করে শিশু শারীরিক দিক দিয়ে বর্ধিত হয়। –[সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এই সময়কাল হচ্ছে শিশুর জন্মের পর থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদসহ অন্যান্য ফিকহবিদগণের মতে মাত্র দুই বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করলে অবৈধতা প্রমাণিত হয়। ইমাম মুহাম্মদের ফতোয়াও তাই। কোনো বালক-বালিকা যদি এ বয়সের পর কোনো স্ত্রী লোকের দুধ পান করে, তবে এতে দুধ পানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ **অর্থাৎ, দুধ পানের সাথে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ এই যে, দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোনো বালক অথবা বালিকা কোনো স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে তাদের মা এবং** তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদেরই ভাই-বোন হয়ে যায়। অনুরূপ সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয় এবং সে স্ত্রীলোকের জেঠ্য-দেবররা তাদের চাচা হয়ে যায়। তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধতা স্থাপিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পর যেসব বিয়ে হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও সেসব সম্পর্কীয়দের সাথে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ.

لَعَلَّ هٰذَا الْمَتْنَ مُرَكَّبٌ مِنْ حَدِيْثَيْنِ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ فِىْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَالْجُزْءُ الْاٰخِرُ مُسْنَدُ الْاِمَامِ اَحْمَدَ (رح)

মাসআলা : একটি বালক ও একটি বালিকা কোনো মহিলার দুধ পান করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনিভাবে দুধ ভাই ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

عَاشِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُعَاشَرَةُ মূলবর্ণ (ع . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জীবন-যাপন কর।

قِنْطَارًا শব্দটি একবচন, বহুবচন قَنَاطِيْرُ অর্থ– অধিক মাল, অনেক সরঞ্জাম।

اِثْمًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন اٰثَامٌ অর্থ– গুনাহ, পাপ।

مِيْثَاقًا শব্দটি একবচন, বহুবচন مَوَاثِيْقُ অর্থ– অঙ্গীকার।

فَاحِشَةً শব্দটি একবচন, বহুবচন فَوَاحِشُ অর্থ– নির্লজ্জ কাজ, মন্দ কাজ।

৫ম পারা

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۚ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾

অনুবাদ : (২৪) এবং ঐ স্ত্রীগণ [হারাম করা হয়েছে] যারা সধবা, কিন্তু হ্যাঁ, যারা [ধর্ম ব্যবস্থায়] তোমাদের মালিকানাধীন হয়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এই ব্যবস্থাসমূহ ফরজ করে দিয়েছেন, আর ঐ নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমরা স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে [বিবাহ করতে] চাও, এভাবে যে, তোমরা পত্নী করে নাও, শুধু কাম-প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্যই নয়, অতঃপর যে পন্থায় তোমরা তাদেরকে উপভোগ করলে তজ্জন্য উক্ত নারীদেরকে তাদের নির্ধারিত মহর প্রদান কর, আর নির্ধারিত হওয়ার পর যে পরিমাণে তোমরা পরস্পর সম্মত হয়ে যাও তাতে কোনো পাপ নেই, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَاللهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ

(২৫) আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পূর্ণ সামর্থ্য না রাখে স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করার, তবে সে নিজেদের মধ্য হতে মুসলমান ক্রীতদাসীদেরকে যারা তোমাদের অধিকারে রয়েছে, বিবাহ করে নিবে, এবং তোমাদের ঈমানের সম্যক অবস্থা আল্লাহই জানেন, তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সমতুল্য, সুতরাং তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর,

শাব্দিক অনুবাদ

(২৪) وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ এবং ঐ স্ত্রীগণ [হারাম করা হয়েছে] যারা সধবা اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ কিন্তু হ্যাঁ, যারা [ধর্ম ব্যবস্থায়] তোমাদের মালিকানাধীন হয় كِتٰبَ اللهِ عَلَيْكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এই ব্যবস্থাসমূহ ফরজ করে দিয়েছেন وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ আর ঐ নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ তোমরা স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে [বিবাহ করতে] চাও مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ এভাবে যে, তোমরা পত্নী করে নাও, শুধু কাম-প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্যই নয় فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ অতঃপর যে পন্থায় তোমরা তাদেরকে উপভোগ করলে فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً তজ্জন্য উক্ত নারীদেরকে তাদের নির্ধারিত মহর প্রদান কর وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ আর তাতে কোনো পাপ নেই فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ যে পরিমাণে তোমরা পরস্পর সম্মত হয়ে যাও مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ নির্ধারিত হওয়ার পর اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(২৫) وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পূর্ণ সামর্থ্য না রাখে اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করার فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ তবে সে নিজেদের মধ্য হতে মুসলমান ক্রীতদাসীদেরকে যারা তোমাদের অধিকারে রয়েছে, বিবাহ করে নিবে وَاللهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ এবং তোমাদের ঈমানের সম্যক অবস্থা আল্লাহই জানেন بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সমতুল্য فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ সুতরাং তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾

অনুবাদ : এবং তাদেরকে তাদের মহর নিয়মানুযায়ী দিয়ে দাও, এই হিসেবে যে, তারা বিবাহিতারূপে গৃহীত হয়েছে, এই হিসেবে নয় যে, তারা প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী বা গুপ্ত প্রেমিকা, অনন্তর যখন ঐ ক্রীতদাসীগণ বিবাহিতা পত্নী হয়ে যায়, অতঃপর যদি তারা জঘন্য অশ্লীল কাজ করে তাহলে তাদের জন্য ঐ শাস্তির অর্ধেক হবে, যা স্বাধীনা নারীদের হয়ে থাকে, এটা [অর্থাৎ ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা] ঐ ব্যক্তির জন্য যে, তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারে [লিপ্ত হওয়া]-র আশঙ্কা করে, এবং [দাসীদেরকে বিবাহ করা অপেক্ষা] তোমাদের সংযমী হওয়া অতি উত্তম, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাপরায়ণ, পরম করুণাময়।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾

(২৬) আল্লাহর ইচ্ছা এই যে, তোমাদেরকে [তোমাদের কল্যাণকর নির্দেশসমূহ] বর্ণনা করে দেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণের অবস্থা তোমাদেরকে বলে দেন এবং তোমাদের প্রতি [কৃপা] দৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾

(২৭) আর আল্লাহ তো তোমাদের অবস্থার প্রতি তাওয়াজ্জুহ করতে ইচ্ছা করেন। আর যারা প্রবৃত্তির পূজারী তারা চায় যে, তোমরা অত্যন্ত বক্রতায় নিপতিত হও।

শাব্দিক অনুবাদ

এবং তাদেরকে তাদের মহর নিয়মানুযায়ী দিয়ে দাও مُحْصَنٰتٍ এই হিসেবে যে, তারা বিবাহিতারূপে গৃহীত হয়েছে غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ এই হিসেবে নয় যে, তারা প্রকাশ্য ব্যভিচারিণী বা গুপ্ত প্রেমিকা فَاِذَآ اُحْصِنَّ অনন্তর যখন ঐ ক্রীতদাসীগণ বিবাহিতা পত্নী হয়ে যায় فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ অতঃপর যদি তারা জঘন্য অশ্লীল কাজ করে فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ তাহলে তাদের জন্য ঐ শাস্তির অর্ধেক হবে مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ যা স্বাধীনা নারীদের হয়ে থাকে ذٰلِكَ এটা [অর্থাৎ ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা] ঐ ব্যক্তির জন্য لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারে [লিপ্ত হওয়া]-র আশঙ্কা করে। وَاَنْ تَصْبِرُوْا এবং তোমাদের সংযমী হওয়া خَيْرٌ لَّكُمْ অতি উত্তম وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাপরায়ণ, পরম করুণাময়।

(২৬) يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহর ইচ্ছা لِيُبَيِّنَ لَكُمْ এই যে তোমাদেরকে [তোমাদের কল্যাণকর নির্দেশসমূহ] বর্ণনা করে দেন وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণের অবস্থা তোমাদেরকে বলে দেন وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ এবং তোমাদের প্রতি [কৃপা] দৃষ্টি করেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(২৭) وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ আর আল্লাহ তো তোমাদের অবস্থার প্রতি তাওয়াজ্জুহ করতে ইচ্ছা করেন وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ আর যারা প্রবৃত্তির পূজারী তারা চায় যে اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا তোমরা অত্যন্ত বক্রতায় নিপতিত হও।

অনুবাদ : (২৮) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেন, বস্তুত মানুষকে দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(২৮) يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেন وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا বস্তুত মানুষকে দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(২৪) قوله وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম মুসলিম (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) উভয়ে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, আউতাস অভিযানে যুদ্ধ বন্দীদের মাঝে সাহাবায়ে কেরাম কিছু নারীও যুদ্ধ বন্দী হিসেবে লাভ করেন। যাদের স্বামীরা ছিল মুশরিক। সাহাবায়ে কেরাম সে সকল বাদীদেরকে ব্যবহার করতে সংকোচবোধ এবং গুনাহ মনে করে তাঁরা রাসূল ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে বিধান জানতে চান, তখন সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধ বন্দী মুশরিক রমণী বাদীদের সম্পর্কীয় বিধান বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর– ৪৫৪ : ১, রূহুল মা'আনী– ২/৩-৫, ইবনে কাছীর– ৪৭৩/১, বাহরে মুহীত– ১১৬/৫]

(২৭) قوله وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا الخ **: আয়াতের শানে নুযূল :** মুজাহিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ দ্বারা ব্যভিচারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর সুদ্দী (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, তারা হলো ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা। কারো মতে يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ দ্বারা একমাত্র ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল তাওরাত অনুসারে বৈমাত্রিক বোনদেরকে বিবাহ করা হালাল। এর মধ্যে রক্ত সম্পর্কে সম্মিলিত হয় না বলে তাদের ধারণা ছিল। ভাতিজী এবং ভাগ্নিকে ফুফু এবং খালার উপর কিয়াস করে মুমিনদের মাঝে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার লক্ষ্যে অগ্নিপূজারীরা বলত যে, তোমরা কেন তাদের থেকে কতককে জায়েজ মনে কর এবং কতককে বিবাহ করা জায়েজ মনে কর না। আবার কতক কন্যাকে হালাল মনে কর মা-দেরকে হালাল মনে কর না। তাদের এমন বিভ্রান্তিকর উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৩৪/৫], মুশরিকরা ভাতিজি এবং ভাগ্নিকেও হালাল মনে করত সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বায়যাবী ৭০/২]

طَوْلٌ এর অর্থ– শক্তি-সামর্থ্য। আয়াতের অর্থ– এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ্য নেই কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই, সে ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করতে পারে। এতে বুঝা গেল যে, যতটা সম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করা উচিত। দাসীকে বিয়ে না করাই বাঞ্ছনীয়। অগত্যা যদি দাসীকে বিয়ে করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবও তাই। তিনি বলেন, স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দাসীকে অথবা ইহুদি-খ্রিস্টান দাসীকে বিয়ে করা মাকরূহ।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য ইমামদের মতে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিয়ে করা হারাম এবং ইহুদি বা খ্রিস্টান দাসী বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ।

মোটকথা, দাসীকে বিয়ে করা থেকে বেঁচে থাকা স্বাধীন পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় উত্তম। অগত্যা যদি করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসীকে করবে। কারণ দাসীর গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে ঐ ব্যক্তির গোলাম হয় যে দাসীর মালিক। অমুসলমান দাসীর গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে জননীর চাল-চলন অনুযায়ী ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়ে যেতে পারে। অতএব, সন্তানকে গোলামীর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ঈমানদার বানানোর জন্য সন্তানের মাতার স্বাধীন হওয়া জরুরি। দাসী হলে কমপক্ষে ঈমানদার হওয়া দরকার, যাতে সন্তানের ঈমান সংরক্ষিত থাকে। এ কারণেই

ওলামায়ে কেরাম বলেন : স্বাধীন ইহুদি-খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা ইহুদি ও খ্রিস্টান রমণীরা আজকাল সাধারণত স্বয়ং স্বামীকে ও স্বামীর সন্তানদেরকে স্বধর্মে আনার উদ্দেশ্যেই মুসলমানদেরকে বিয়ে করে।

বিয়ের অনেকগুলো বিধান বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে তোমাদের বিধানাবলি বলে দেন এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও পুণ্যবানগণের অনুসৃত পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা মনে করবে না যে, হারাম ও হালালের এই বিবরণ শুধু তোমাদের জন্যই; বরং তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদেরকেও এ ধরনের বিধান বলা হয়েছিল। তারা এসব বিধান পালন করে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছে।

কামপ্রবৃত্তির অনুসারী জেনাকার এবং মিথ্যা ধর্মাবলম্বীদের কাছে হারাম-হালাল বলে কোনো কিছুই নেই। তারা তোমাদেরকেও সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে নিজেদের মিথ্যা পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করতে চায়। তোমরা তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকবে।

এরপর বলা হয়েছে : يُرِيْدُ اللّٰهُ اَن يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হাল্কা ও সহজ বিধান দিতে চান। তোমাদের অসুবিধা দূর করার জন্য বিয়ের ব্যাপারে এমন সরল বিধান তিনি দিয়েছেন, যা সবাই পালন করতে পার। স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে বাঁদিদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন। উভয়পক্ষকে পরস্পরিক সম্মতিক্রমে মহর নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনসাফও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে : وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মাঝে কাম-বাসনার উপাদানও নিহিত রয়েছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেওয়া হতো, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ত। তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়নি; বরং উৎসাহিত করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلْمُحْصَنٰتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْصَانُ মূলবর্ণ (ح ـ ص ـ ن) জিনস صحيح অর্থ– স্বাধীন মহিলাগণ।

تَبْتَغُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা চাও, তোমরা খোঁজ কর।

تَرَاضَيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّرَاضِىْ মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তোমরা আপসে রাজি হয়েছ।

مُتَّخِذٰتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– গ্রহণকারী।

سُنَنٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন سُنَّةٌ অর্থ– পথ, রাস্তা, প্রচলিত নিয়ম।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

অনুবাদ : (২৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যে যা পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয়, তাহলে দোষ নেই। আর তোমরা একে অন্যকে হত্যাও করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতীব করুণাশীল।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

(৩০) আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে সীমালঙ্ঘন করে এবং জুলুম করে, তাহলে আমি সত্বরই তাকে আগুনে [দোজখে] দাখিল করব, এবং এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সহজ।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

(৩১) যে সমস্ত কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়ে থাকে, তন্মধ্যে যেগুলো বড় বড় কাজ [গুনাহ] যদি তোমরা তা হতে পরহেজ কর, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গুনাহগুলো তোমাদের হতে মোচন করে দিব এবং তোমাদেরকে একটি সম্মানিত স্থানে দাখিল করব।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْاَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾

(৩২) আর তোমরা এমন কোনো মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করো না, যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাউকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন, পুরুষদের জন্য তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে, এবং নারীদের জন্য তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে, আর আল্লাহ তা'আলার হুজুরে তাঁর অনুগ্রহের আবেদন কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে মহজ্ঞানী।

শাব্দিক অনুবাদ

(২৯) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ তোমরা পরস্পরে একে অন্যের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যে যা পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয়, তাহলে দোষ নেই وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ আর তোমরা একে অন্যেকে হত্যাও করো না اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতীব করুণাশীল।

(৩০) وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে عُدْوَانًا وَّظُلْمًا সীমালঙ্ঘন করে এবং জুলুম করে। فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا তাহলে আমি সত্বরই তাকে আগুনে [দোজখে] দাখিল করব। وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا এবং এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সহজ।

(৩১) اِنْ تَجْتَنِبُوْا যদি তোমরা তা হতে পরহেজ কর كَبَآئِرَ তন্মধ্যে যেগুলো বড় বড় কাজ [গুনাহ] مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ যে সমস্ত কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়ে থাকে نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গুনাহগুলো তোমাদের হতে মোচন করে দিব وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا এবং তোমাদেরকে একটি সম্মানিত স্থানে দাখিল করব।

(৩২) وَلَا تَتَمَنَّوْا আর তোমরা এমন কোনো মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করো না مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাউকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا পুরুষদের জন্য তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ এবং নারীদের জন্য তাদের আমলসমূহের অংশ রয়েছে وَاسْاَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ আর আল্লাহ তা'আলার হুজুরে তাঁর অনুগ্রহের আবেদন কর اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾

(৩৩) আর প্রত্যেক ঐ ধন-সম্পত্তির জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি যা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ পরিত্যাগ করে যায়, আর যাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

(৩৪) পুরুষগণ নারীদের শাসনকর্তা, এই জন্য যে, আল্লাহ কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, এবং এই জন্য যে, পুরুষগণ স্বীয় অর্থ ব্যয় করেছে, সুতরাং পুণ্যশীলা নারীগণ অনুগত হয়, পুরুষের অবর্তমানে [তার ধন ও মানের] রক্ষণাবেক্ষণ করে আল্লাহ তা'আলার হেফাজত অনুসারে, এবং যে কোনো নারী এরূপ হয় যে, তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তবে তাদেরকে মৌখিক উপদেশ দাও, এবং তাদেরকে তাদের শয্যাস্থানে একা পরিত্যাগ কর এবং তাদেরকে [লঘু] প্রহার কর, অতঃপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করতে আরম্ভ করে, তবে তাদের প্রতি বাহানা অন্বেষণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি মহান, মর্যাদাশালী।

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৩) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ আর প্রত্যেক ঐ ধন-সম্পত্তির জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ যা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ পরিত্যাগ করে যায় وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ আর যাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছে فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।

(৩৪) اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ পুরুষগণ নারীদের শাসনকর্তা بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ এই জন্য যে, আল্লাহ কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ এবং এ জন্য যে, পুরুষগণ স্বীয় অর্থ ব্যয় করেছে فَالصّٰلِحٰتُ সুতরাং পুণ্যশীলা নারীগণ قٰنِتٰتٌ অনুগত হয় حٰفِظٰتٌ রক্ষণাবেক্ষণ করে لِّلْغَيْبِ পুরুষের অবর্তমানে بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলার হেফাজত অনুসারে وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ এবং যে কোনো নারী এরূপ হয় যে, তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর فَعِظُوْهُنَّ তবে তাদেরকে মৌখিক উপদেশ দাও وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ এবং তাদেরকে তাদের শয্যাস্থানে একা পরিত্যাগ কর وَاضْرِبُوْهُنَّ এবং তাদেরকে [লঘু] প্রহার কর فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ অতঃপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করতে আরম্ভ করে فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا তবে তাদের প্রতি বাহানা অন্বেষণ করো না। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি মহান, মর্যাদাশালী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৪) قوله وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী পত্নী উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) একদা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষেরা তো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে থাকে, আমরা মহিলারা তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারি না। এদিকে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে আমরা মহিলারা পুরুষের অর্ধেক অংশ পেয়ে থাকি। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[আসবাবুন নুযূল লীসপুরী, পৃ.]

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইকরিমা হতে বর্ণিত, মহিলারা জিহাদে অংশগ্রহণ করা সম্পর্কীয় আগ্রহ প্রকাশ করে আবেদন করে বলত, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার বৈধতার হুকুম দান করবেন বলে আমাদের কামনা। তাহলে পুরুষের মতো আমরাও গনিমত ও ছওয়াব লাভ করতে পারব। তাদের এ অযৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[আসবাবুন নুযূল, পৃ. ৯১]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত কাতাদাহ ও সুদ্দী হতে বর্ণিত, তারা উভয়েই বলেন, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ আয়াত যখন নাজিল হলো, তখন পুরুষেরা বলল, মহিলাদের উপর পুরুষদেরকে উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ছওয়াবের দিক দিয়েও মহিলাদের অপেক্ষা আমাদেরকে দ্বিগুণ ছওয়াব দান করার কামনা করে থাকি। তাহলে মহিলাদের প্রতিদান অপেক্ষা আমাদের প্রতিদান দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আর মহিলারা বলতে লাগল, আমরা মিরাশ তথা উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে পুরুষের অপেক্ষা আমারা অর্ধেকের অধিকারী হয়ে থাকি, অনুরূপভাবে পরজগতের শাস্তিও পুরুষ অপেক্ষা অর্ধেক হবার জন্য কামনা করি। সুতরাং নারী পুরুষের পক্ষ থেকে এহেন অযৌক্তিক কামনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ২০/৩/৫, ইবনে কাছীর ৪৮৭/১, বাহরে মুহীত– ২৪৫/৩, কুরতুবী– ১০০/৫, ফাতহুল কাদীর ৪৬১/১]

শানে নুযূল– ৪ : শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ যখন নির্ধারিত করে দিলেন, তখন মহিলারা বলল, পুরুষ অপেক্ষা আমরা অত্যন্ত মুহতাজ। কারণ আমরা দুর্বল। সুতরাং আমাদের জন্য দুটি অংশ এবং পুরুষ যেহেতু আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী, জীবিকা অর্জনেরও ক্ষমতা সম্পন্ন সেহেতু তাদের একটি অংশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাদের এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী– ১৯/৩/৫]

শানে নুযূল– ৫ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এক পুরুষের দু'জন মহিলার সমপরিমাণ মিরাশের অংশ, দুজন মহিলার সাক্ষী একজন পুরুষের সমপর্যায়ের। সুতরাং মহিলাদের আমলের ক্ষেত্রেও কি অনুরূপভাবে অর্ধেক ছওয়াব লেখা হবে? তাদের এহেন হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা বিদূরিত করার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৬ : অপর এক বর্ণনা মতে মহিলারা আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, হায়! আমরা যদি পুরুষ হতাম, তাহলে পুরুষদের ন্যায় আমরা যুদ্ধ-জিহাদে অংশ গ্রহণ করতাম! তাদের এ আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ নির্ধারিত সৃষ্টি কৌশলের পরিপন্থি ছিল বিধায়, তাদের এ প্রত্যাশার জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৪৮৮/১, বাহরে মুহীত ২৪৫/৩]

(৩৩) قوله وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী বহু মুহাজির এমন ছিলেন যে, তাদের নিকটাত্মীয়রা কাফের ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এদেরকে মুসলমানদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এরা একে অপরের ওয়ারিশ হতো। এদের আত্মীয় ও আপনজন মুসলমান হলে এই আয়াত নাজিল হয়। (কানযুল নুকূল)

২. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (র.) বলেন, যারা ধর্মপুত্র কিংবা পালকপুত্রকে মিরাশের ভাগ দেন তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ পাক এদেরকে অসিয়তের মাধ্যমে সম্পদের অধিকারী বানানোর অনুমোদন দিয়েছেন; ذَوِى الرَّحْم কিংবা عُصْبَة হিসেবে নয়। মোদ্দাকথা, ধর্মপুত্র বা পালকপুত্রকে সম্পদের অংশীদার বানালে অসিয়তের মাধ্যমেই হতে হবে। [তাবারী : ৫/ ৩৫ আসবাবে নুযূল : পৃষ্ঠা ১৬১]

(৩৪) قوله اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হাসান বসরী (র.) বলেন, মহানবী ﷺ-এর খেদমতে এক মহিলা উপস্থিত হয়ে স্বীয় স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ আরোপ করে বলল যে, তার স্বামী তাকে চপেটাঘাত করেছে। ফলে রাসূল ﷺ বললেন, প্রতিশোধ নেওয়া হবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : জাফর বিন মুহাম্মদ হযরত আলী (রা.)-এর বরাত দিয়ে বলেন যে, তিনি [হযরত আলী (রা.)] বলেন, এক আনসারী তার স্ত্রীকে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তখন মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অমুকের পুত্র অমুক আনসারী আমার স্বামী। সে আমার চেহারায় প্রহার করার কারণে আমার চেহারায় দাগ পড়ে যায়। রাসূল ﷺ বললেন, তা তার জন্য ঠিক হয়নি। তখন সে অপ্রীতিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ৪৯১/১]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত মুকাতিল বলেন, আলোচ্য আয়াত সা'আদ বিন রবী বিন আমর (আর তিনি ছিলেন একজন বিশেষ ব্যক্তি) এবং তার স্ত্রী হাবীবা বিনতে যায়দ বিন আবী যুহাইর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ঘটনা হলো যে, তার স্ত্রী তার অবাধ্যতায় মেতে উঠল, তখন তিনি তাকে চপেটাঘাত করেন। ফলে তার পিতা তাকে সাথে করে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল যে, সে তাকে চেহারায় চপেটাঘাত করেছে। রাসূল ﷺ বললেন, তার স্বামী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। ফলে মহিলা তার পিতার সাথে চলে গেল স্বামীর নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য। তৎক্ষণাৎ রাসূল ﷺ তাদেরকে ডেকে পাঠালেন ফিরে এসো, এ হলো জিবরাঈল। আমার নিকট এ মুহূর্তে আগমন করল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেছেন। অতঃপর এ আয়াত পাঠ করেন। –[রূহুল মা'আনী– ২৩/৩/৫, বাহরে মুহীত– ২৪৮/৩, কুরতুবী– ১৬১/৫]

নিজের সম্পদও অন্যায় পন্থায় ব্যয় করা বৈধ নয় : আলোচ্য আয়াতের মধ্যে اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ "তোমাদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে" এর দ্বারা তাফসীরকারকগণ সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

আবূ হাইয়ান 'তাফসীরে বাহরে মুহীত'-এ বলেন, আয়াতে এ শব্দগুলো দ্বারা নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আয়াতে لَا تَاْكُلُوْا বলা হয়েছে। যার অর্থ 'খেয়ো না'। পরিভাষার বিচারে 'খেয়ো না' বলতে যে কোনোভাবে ভোগদখল বা হস্তক্ষেপ করো না বুঝানো হয়েছে। সেটা খেয়ে, পরিধান করে কিংবা অন্য যে কোনো পন্থায় ব্যবহার করেই হোক না কেন। কেননা সাধারণ পরিভাষায় সম্পদে যে কোনো হস্তক্ষেপকেই 'খেয়ে ফেলা' বলা হয়, যদি সংশ্লিষ্ট বস্তুটি আদৌ খাদ্যবস্তু নাও হয়।

بَاطِل শব্দটির তরজমা করা হয়েছে 'অন্যায় পন্থায়' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং না-জায়েজ সবগুলো পন্থাকেই বাতেল বলা হয়। যেমন– চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাসভঙ্গ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। –[বাহরে মুহীত]

বাতিল পন্থায় খাওয়া : কুরআন পাক একটিমাত্র শব্দ بِالْبَاطِلِ বলে অন্যায় পন্থায় অর্জিত সকল প্রকার সম্পদকে হারাম করে দিয়েছে। লেনদেন এর ব্যাপারে অন্যায় পন্থা কি কি হতে পারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, লেনদেন এর ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ যেসব বিষয়কে হারাম বলে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কুরআনে উল্লিখিত 'বাতেল' শব্দের ব্যাখ্যামাত্র। ফলে হাদীসে উল্লিখিত অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ক বিধি-নিষেধগুলোও প্রকৃতপক্ষে কুরআনেরই নির্দেশ।

সৎ রোজগারের শর্তাবলি : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সর্বাপেক্ষা পবিত্র রোজগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের রোজগার। তবে শর্ত হচ্ছে, তারা যখন কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে না। কোনো আমানতের খেয়ানত করবে না। কোনো পণ্য ক্রয় করার সময় সেটাকে মন্দ সাব্যস্ত করে মূল্য কম দেওয়ার চেষ্টা করবে না। নিজের মাল বিক্রয় করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করবে না। তার নিজের নিকট অন্যের ধার থাকলে পাওনাদারকে অযথা ঘুরাবে না। অপরপক্ষে, সে কারো কাছে কিছু পাওনা হলে তাকে উত্ত্যক্ত করবে না। –[ইসফাহানী, তাফসীরে মাযহারী]

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ . أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎভাবে লেন-দেন করে এবং সত্য বলে– সেসব লোক ছাড়া কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের গুনাহগারদের কাতারে উত্থিত হবে।

অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার দু'টি শর্ত : আলোচ্য আয়াতে عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ বাক্যটি সংযুক্ত করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম।

পাপের প্রকারভেদ : উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, পাপের প্রকারভেদ দু'রকম। কিছু কবিরা, অর্থাৎ কঠিন ও বড় রকমের পাপ, আর কিছু সগিরা অর্থাৎ, হালকা ও ছোট পাপ। এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি কেউ সাহস করে কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের সগিরা গুনাহগুলো নিজেই ক্ষমা করে দিবেন।

যাবতীয় ফরজ ওয়াজিবসমূহ সম্পাদন করাও কবিরা গুনাহ থেকে বাঁচার অন্তর্ভুক্ত। কারণ ফরজ ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবিরা গুনাহ। বস্তুতঃ যে লোক ফরজ ওয়াজিবসমূহ পালনের ব্যাপারে যথাযথ অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং যাবতীয় কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ স্বয়ং তার সগিরা গুনাহসমূহের কাফফারা করে দিবেন।

সৎকর্মসমূহ সগিরা গুনাহর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ : প্রায়শ্চিত্ত অর্থ এই যে, কর্তার সৎ-কর্মসমূহকে সগিরা গুনাহের ক্ষতিরপূরণ হিসেবে দেখিয়ে তার হিসাব সমান সমান করে দেওয়া হবে। জাহান্নামের পরিবর্তে সে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, কোনো লোক যখন নামাজ পড়ার জন্য অজু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত হওয়ার সাথে সাথে তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলে চোখ, কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমূহের কাফফারা হয়ে যায়। কুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার পাপের কাফফারা হয়ে যায়; আর পা ধোয়ার সাথে সাথে ধুয়ে যায় পায়ের পাপসমূহ। তারপর যখন সে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফফারা হতে থাকে।

কবিরা গুনাহ শুধু তওবা দ্বারাই মাফ হয় : আলোচ্য আয়াতের দ্বারা একথা বুঝা গেল যে, অজু-নামাজ প্রভৃতি সৎকর্মের মাধ্যমে গুনাহর কাফফারা হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ হলো সগিরা গুনাহ। কবিরা গুনাহ একমাত্র তওবা ছাড়া মাফ হয় না। বস্তুতঃ সগিরা গুনাহ, মাফের শর্ত হলো, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, যদি কোনো লোক কবিরাহ গুনাহে লিপ্ত থেকেও অজু নামাজ আদায় করতে থাকে, তবে শুধুমাত্র অজু নামাজ কিংবা অন্যান্য সৎকর্মের দ্বারা তার সগিরা গুনাহের কাফফারাও হবে না কবিরা গুনাহ তো থাকলই। কাজেই কবিরা গুনাহের একটা বিরাট অনিষ্ট স্বয়ং সে সমস্ত পাপের অস্তিত্ব, যার প্রতি কুরআন ও হাদীসে কঠোর সাবধান বাণী বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো সত্যিকার তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না।

মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় এমন বিষয়ের আকাঙক্ষা করা : এ আয়াতে অন্যের এমনসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। কারণ মানুষ যখন নিজেকে অন্যের চাইতে ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ, বিদ্যা-বুদ্ধি শারীরিক সৌন্দর্য-সৌষ্ঠবে খাটো অনুভব করে, তখন স্বভাবগতভাবেই তার অন্তরে হিংসার বীজ উপ্ত হতে শুরু করে। এত কম করে হলেও তার মনে সেসব বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত লোকের সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়া কিংবা তার চাইতেও কিছুটা উপরে উঠবার একটা বাসনা সৃষ্টি হতে থাকে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার মতো নয়। কেননা তা অর্জন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। যেমন, কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা বা কোনো সাধারণ ঘরের সন্তানের পক্ষে দেশের সেরা কোনো পরিবারের সন্তান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা কারো পক্ষে অত্যন্ত সুশ্রী হওয়ার বাসনা ইত্যাদি। যদি কেউ আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে জন্মগতভাবে এসব বৈশিষ্ট্য লাভ করতে না পারে, তবে সারা জীবন সাধ্য-সাধনা করেও তার পক্ষে সেটা লাভ করা সম্ভব হবে না। উদাহরণতঃ কোনো বেঁটে কাদাকার লোক সুন্দর-সুঠাম হওয়ার জন্য কিংবা কোনো সাধারণ ঘরের সন্তান মহান সৈয়দ বংশের সন্তান হওয়ার জন্য যদি আজীবন সাধনা করে, তবে তার সে সাধনা সফল হওয়ার নয়। এটা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়, কোনো দাওয়া-তাদবীরও এ ব্যাপারে ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এমতাবস্থায় যদি তার অন্তরে এরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, আমার পক্ষে যখন এরূপটি হওয়া সম্ভব

নয়, তখন অন্য আরো একজন কেন এরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে? এরূপ মনোভাবকে 'হাসাদ' বা হিংসা বলা হয়। এটা মানব চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও লজ্জাজনক রোগবিশেষ। দুনিয়ার অধিকাংশ ঝগড়া-ফ্যাসাদ এবং হত্যা লুণ্ঠনের উদগাতাই হচ্ছে মানব-চরিত্রের এ কুৎসিৎ ব্যাধি।

কুরআন কারীম সে অশান্তি অনাচারের পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই ইরশাদ করেছে–

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কোনো হেকমতের কারণেই মানুষের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্ন জনের মধ্যে বন্টন করেছেন। তার কল্যাণহস্তই এক একজনের মধ্যে এক এক ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য বিতরণ করেছে। সুতরাং প্রত্যেককেই তার নিজের ভাগ্যের প্রতি তুষ্ট এবং রাজি থাকা উচিত। অন্যের গুণ-বৈশিষ্ট্যের আকাঙ্ক্ষায় অন্তর বিষিয়ে তোলা কোনো অবস্থাতেই সমীচীন নয়। কেননা এতে নিজেকে অর্থহীন মাসনিক পীড়া এবং হিংসারূপী কঠিন গুনাহে লিপ্ত করা ছাড়া আর কোনো ফল লাভ হয় না।

আল্লাহ তা'আলা যাকে নররূপে সৃষ্টি করেছেন তাতেই তার শোকরগুজারী করা কর্তব্য। অপরপক্ষে যাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন তারও কর্তব্য এতে রাজি থাকা এবং চিন্তা করা যে, যদি তাকে পুরুষরূপে সৃষ্টি করা হতো তবে হয়তো সে পুরুষের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হতো না; বরং উল্টো গুনাহগার হতে হতো। যাকে আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষে এ নিয়ামতের শুকরিয়া করা উচিত। অপরপক্ষে যে কদাকার তার পক্ষেও অনর্থক দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয়ে বরং চিন্তা করা উচিত যে, হয়তো কোনো মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই চেহারা অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এরূপ না হয়ে যদি আমি সুশ্রী হতাম, তবে হয়তো কোনো ফেতনার সম্মুখীন হতে হতো। অনুরূপ সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করে যেমন কারো পক্ষে অহঙ্কারী হওয়া উচিত নয়, তেমনি সাধারণ বংশে জন্মগ্রহণকারী কোনো লোকের পক্ষেও রক্ত–ধারার দিক দিয়ে সৈয়দ হওয়ার দুরাশা পোষণ করা উচিত নয়। কেননা হাজার চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারাও তা অর্জিত হওয়ার নয়। সুতরাং এরূপ অর্থহীন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে মানসিক যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। তাই বংশ মর্যাদা লাভের দুরাশার চাইতে নেক আমল ও সদগুণের মাধ্যমে যদি কেউ প্রাধান্য অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, তবেই তার সে চেষ্টা ফলপ্রসু হবে। এটা মানুষের সাধ্যায়াত্ত। এ চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ শুধু সাফল্যই লাভ করতে পারে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার স্তরকে ছাড়িয়ে আরো অনেক উর্ধ্বে উঠতে পারে।

কুরআনের কোনো কোনো আয়াত এবং একাধিক সহীহ হাদীসের বর্ণনায় সৎকর্মে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ, অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ অন্যের মধ্যে যে গুণ-গরিমা রয়েছে, তা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ শুধু ঐ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত, যেগুলো চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। যেমন, কারো গভীর জ্ঞান কিংবা চারিত্রিক মহত্ত্ব দেখে তাঁর কাছ থেকে তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। আলোচ্য এ আয়াতে সেরূপ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে :

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ অর্থাৎ, পুরুষরা যা কিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে এবং নারীরা যা কিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং কর্মে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই লাভ করবে।

সূরা নিসার শুরু থেকে এ পর্যন্ত অধিকাংশ হুকুম ও হেদায়েত ছিল নারী শ্রেণির অধিকার সম্পর্কিত। ইসলাম-পূর্ব যুগে দুনিয়ার সর্বত্র অবলা নারীদের প্রতি ব্যাপকভাবে যেসব নির্যাতনমূলক অন্যায় আচরণ প্রচলিত ছিল, এসব নির্দেশের মাধ্যমে কুরআন সেগুলো উচ্ছেদ সাধন করেছে। বস্তুতঃ পুরুষেরা যেসব অধিকার ভোগ করে, ইসলাম নারীদেরকেও সেরূপ সমান অধিকার দিয়েছে। নারীদের জিম্মায় যেমন পুরুষের প্রতি কিছু বিশেষ ধরনের কর্তব্য আরোপ করেছে, তেমনি পুরুষদের উপরও নারীদের প্রতি কিছু বিশেষ দায়িত্ব পালন ফরজ করেছে।

নাফরমান স্ত্রী ও তার সংশোধনের উপায় : অতঃপর সেসব স্ত্রীলোকের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যারা স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। কুরআনে কারীম তাদের সংশোধনের জন্য পুরুষদের যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছে। বলা হয়েছে–

وَالّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ

অর্থাৎ, স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানি সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হলো যে, নরমভাবে তাদের বুঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দিবে। যাতে এই পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। কুরআন কারীমে এ প্রসঙ্গে فِی الْمَضَاجِعِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ফিকহশাস্ত্রবিদগণ এই মর্মোদ্ধার করেছেন যে, পৃথকতা শুধু বিছানাতেই হবে, বাড়ি বা থাকার ঘর পৃথক করবে না। যাতে স্ত্রীকে সে ঘরে একা থাকতে হয়। কারণ তাতে তার দুঃখও বেশি হবে এবং এতে কোনো রকম অঘটন ঘটে যাওয়ারও সম্ভাবনা অধিক।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে যে, এই তিনটি পন্থা প্রয়োগে যদি স্ত্রী অনুগত হয়ে যায়, তবে তোমরাও সহনশীলতার আশ্রয় নাও; সাধারণ কথায় কথায় দোষারোপের পন্থা খুঁজে বেড়িয়ো না। আর জেনে রেখ, আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা সবার উপরই পরিব্যাপ্ত।

বিষয় সংক্ষেপ : এই আয়াতের দ্বারা মূলনীতিস্বরূপ যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বক্তব্য অনুসারে পুরুষ ও নারীদের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ; বরং পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ নারীরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই সমতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদার কোনো পার্থক্যও থাকবে না; বরং এ দু'টি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথমত : পুরুষকে তার জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারী জাতির উপর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। দৈবাৎ কিংবা ব্যক্তি বিশেষের কথা স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়ত: নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে।

প্রথম কারণটি হলো, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও মানুষে নিজস্ব ক্ষমতা বহির্ভূত। আর দ্বিতীয় কারণটি নিজের উপার্জিত ও ক্ষমতাভিত্তিক। তাছাড়া একথাও বলা যেতে পারে যে, একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে কাউকে শাসক, কাউকে শাসিত বানানোর জন্য বুদ্ধি ও ন্যায়ের আলোকে দু'টি বিষয় অপরিহার্য ছিল।

১. যাকে শাসক বানানো হবে, তার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের নিরিখে শাসনকার্যের যোগ্যতা ।
২. তার অভিভাবকত্বে শাসিতের সম্মতি। প্রথম কারণটি পুরুষের শাসকোচিত যোগ্যতার পরিচায়ক। আর দ্বিতীয় কারণ শাসিত হওয়ার ব্যাপারে নারীদের স্বীকারোক্তি। কারণ নারীরা যখন বিয়ের সময় নিজের খোরপোষ ও মহরের শর্তে বিয়ের অনুমতি দান করে, তখনই সে তাদের অভিভাবকত্ব মেনে নেয়।

সারকথা, এ আয়াতের প্রথম বাক্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-ব্যবস্থার একটি মূলনীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে। তাহলো এই যে, অধিকাংশ বিষয়ে অধিকারের সমতাবিধান সত্ত্বেও নারীর উপর পুরুষের একটি শাসকোচিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নারীরা হলো পুরুষের শাসিত ও অধীন।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে নারীদের দু'টি শ্রেণি রয়েছে। একটি হলো তাদের শ্রেণি যারা আলোচ্য মূলনীতি এবং স্থিরীকৃত চুক্তির অনুবর্তী রয়েছে এবং পুরুষের অভিভাবকত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার আনুগত্য অবলম্বন করেছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণি হলো সে সমস্ত নারীরা, যারা যথার্থভাবে এ মূলনীতির অনুবর্তী থাকেনি। প্রথম শ্রেণির নারীরা পারিবারিক ও বৈষয়িক শান্তি ও স্বস্তির জন্য নিজেরাই জিম্মাদার। তাদের কোনো সংশোধনের প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণির নারীদের সংশোধনকল্পে এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে এমন এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা বাতলানো হয়েছে, যার মাধ্যমে ঘরের বিষয় ঘরের ভিতরই সংশোধিত হয়ে যেতে পারে এবং স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসংবাদ তাদের দু'জনের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে; তৃতীয় কোনো লোকের যেন প্রয়োজনই না হয়। এতে পুরুষদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি নারীদের অবাধ্যতা কিংবা অনুগত্যের কিছু অভাব অনুভব কর, তবে সর্বাগ্রে বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাদের মানসিক সংশোধন কর। এতেই যদি ফলোদয় হয়ে যায়, তবে বিষয়টি এখানেই মিটে গেল। এতে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকটি সব সময়ের জন্য পাপ থেকে বেঁচে গেল। আর পুরুষরা মানসিক যাতনা থেকেও রেহাই পেল। এভাবে উভয়ে দুঃখ-বেদনার কবল থেকে মুক্তি পেল। পক্ষান্তরে যদি বুঝিয়ে শুনিয়ে কাজ না হয়, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এবং নিজের অসন্তুষ্টি

প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নিজে পৃথক বিছানায় শোবে। এটা একটা মামুলি শাস্তি এবং উত্তম সতর্কীকরণ। এতে যদি স্ত্রী সতর্ক হয়ে যায়, তবে বিবাদটিও এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে। আর যদি সে এ ভদ্রজনোচিত শাস্তির পরেও স্বীয় অবাধ্যতা ও দুষ্কর্ম থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে সাধারণভাবে মারধর করারও অনুমতি রয়েছে। আর তার সীমা হলো এই যে, শরীরে যেন সে মারধরের প্রতিক্রিয়া কিংবা জখম না হয়। কিন্তু এই পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রাসূলে কারীম ﷺ পছন্দ করেননি; বরং তিনি বলেছেন, 'ভালো লোক এমন করে না'।

যা হোক, এ সাধারণ মারধরের মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল। এতে যেমন স্ত্রীদের সংশোধনকল্পে পুরুষদেরকে তিনটি অধিকার দান করা হয়েছে। তেমনিভাবে আয়াতের শেষাংশে এ কথাও বলা হয়েছে যে, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا অর্থাৎ, যদি এ তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরম্ভ করে, তবে তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষানুসন্ধান করতে যেয়ো না; বরং কিছু সহনশীলতা অবলম্বন কর। আর একথা খুব ভালো করে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নারীর উপর তেমন কোনো উচ্চ মর্যাদা দান করেননি। আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব তোমাদের উপরও বিদ্যমান রয়েছে, তোমরা কোনো রকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا تَتَمَنَّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّمَنِّىْ মূলবর্ণ (م . ن . ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তোমরা আশা করো না।

مَوَالِىَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَوْلٰى অর্থ- ঐ সমস্ত নিকট আত্মীয়, যাদের [কুরআনে] মিরাশের কোনো অংশ নির্দিষ্ট করা হয়নি।

قَوَّامُوْنَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন قَوَّامٌ অর্থ- অভিভাবক।

اُهْجُرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَجْرُ মূলবর্ণ (ه . ج . ر) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ত্যাগ কর।

لَا تَبْغُوْا : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা অমান্য করো না।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৩৫) আর যদি তোমরা উপরস্থগণ এই স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কা কর, তবে তোমরা প্রেরণ কর স্বামীর বংশ হতে মীমাংসা করার যোগ্যতাসম্পন্ন এক ব্যক্তিকে এবং স্ত্রীর বংশ হতে মীমাংসা করার যোগ্যতা সম্পন্ন এক ব্যক্তিকে যদি এতদুভয় ব্যক্তি সংশোধন কামনা করে তবে আল্লাহ এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করে দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী সর্ববিষয়ে খবরদার।	وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾
(৩৬) আর তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর, এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় স্বজনের সাথেও এবং এতিমদের সাথেও এবং দরিদ্রগণের সাথেও এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও এবং দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও এবং সহচরদের সাথেও এবং পথিকদের সাথেও এবং তাদের সাথেও যারা তোমাদের মালিকানাধীন আছে, নিশ্চয়, আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে ভালোবাসেন না যারা নিজেকে বড় মনে করে ও আত্ম-গর্ব করে।	وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ﴿٣٦﴾
(৩৭) যারা কৃপণতা করে, এবং অন্যকে কৃপণতা শিক্ষা দেয় এবং ঐ বস্তুকে গোপন করে যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রদান করেছেন, আর আমি এরূপ অকৃতজ্ঞদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।	الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৫) وَاِنْ خِفْتُمْ আর যদি তোমরা উপরস্থগণ আশঙ্কা কর شِقَاقَ بَيْنِهِمَا এই স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের فَابْعَثُوْا তবে তোমরা প্রেরণ কর حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ স্বামীর বংশ হতে মীমাংসা করার যোগ্যতাসম্পন্ন এক ব্যক্তিকে وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا এবং স্ত্রীর বংশ হতে মীমাংসা করার যোগ্যতা সম্পন্ন এক ব্যক্তিকে اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا যদি এতদুভয় ব্যক্তি সংশোধন কামনা করে يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا তবে আল্লাহ এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করে দিবেন اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী সর্ববিষয়ে খবরদার।

(৩৬) وَاعْبُدُوا اللّٰهَ আর তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করো না وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর وَبِذِى الْقُرْبٰى এবং আত্মীয় স্বজনের সাথেও وَالْيَتٰمٰى এবং এতিমদের সাথেও وَالْمَسٰكِيْنِ এবং দরিদ্রগণের সাথেও وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও وَالْجَارِ الْجُنُبِ এবং দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ এবং সহচরদের সাথেও وَابْنِ السَّبِيْلِ এবং পথিকদের সাথেও وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ এবং তাদের সাথেও যারা তোমাদের মালিকানাধীন আছে اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ নিশ্চয় আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে ভালোবাসেন না। مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا যারা নিজেকে বড় মনে করে ও আত্ম-গর্ব করে।

(৩৭) الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ যারা কৃপণতা করে وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ এবং অন্যকে কৃপণতা শিক্ষা দেয় وَيَكْتُمُوْنَ এবং ঐ বস্তুকে গোপন করে مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রদান করেছেন وَاَعْتَدْنَا আর আমি প্রস্তুত রেখেছি لِلْكٰفِرِيْنَ এরূপ অকৃতজ্ঞদের জন্য عَذَابًا مُّهِيْنًا অপমানজনক শাস্তি।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৩৮) আর যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আর যার মোসাহেব হয়, শয়তান, বস্তুতঃ সে নিকৃষ্ট মোসাহেব।	وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (٣٨)
(৩৯) এবং তাদের প্রতি কি বিপদ নাজিল হয়ে যাবে, যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং আল্লাহ এদেরকে যা প্রদান করেছেন তা হতে কিছু ব্যয় করতে থাকে, আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞাত আছেন।	وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٣٩)
(৪০) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করেন না, আর যদি একটি নেকী হয়, তবে তাকে কয়েকগুণে বর্ধিত করে দিবেন এবং নিজ সন্নিধান হতে আরো মহান বিনিময় প্রদান করবেন।	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (٤٠)
(৪১) সুতরাং এ সময়েই বা কি অবস্থা হবে? যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে এক একজন সাক্ষী উপস্থাপিত করব এবং আপনাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব।	فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا (٤١)

শাব্দিক অনুবাদ

(৩৮) وَالَّذِينَ আর যারা يُنْفِقُونَ ব্যয় করে أَمْوَالَهُمْ স্বীয় ধন-সম্পদ رِئَاءَ النَّاسِ মানুষকে দেখানোর জন্য وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখে না وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ও শেষ দিবসের প্রতি وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا আর যার মোসাহেব হয় শয়তান فَسَاءَ قَرِينًا বস্তুতঃ সে নিকৃষ্ট মোসাহেব।

(৩৯) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ এবং তাদের প্রতি কি বিপদ নাজিল হয়ে যাবে لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ এবং আল্লাহ এদেরকে যা প্রদান করেছেন তা হতে কিছু ব্যয় করতে থাকে وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞাত আছেন।

(৪০) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করনে না وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً আর যদি একটি নেকী হয় يُضَاعِفْهَا তবে তাকে কয়েকগুণে বর্ধিত করে দিবেন وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ এবং নিজ সন্নিধান হতে আরো প্রদান করবেন أَجْرًا عَظِيمًا মহান বিনিময়।

(৪১) فَكَيْفَ সুতরাং এ সময়েই বা কি অবস্থা হবে? إِذَا جِئْنَا যখন আমি উপস্থাপিত করব مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ প্রত্যেক উম্মত হতে بِشَهِيدٍ এক একজন সাক্ষী وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا এবং আপনাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৩৭) قوله الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির বিশুদ্ধতম সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– কারদম বিন যায়েদ, কা'আব বিন আশরাফের হালীফ [মিত্র] : উসামা বিন হাবীব, নাফে' বিন আবূ নাফে', বাহরী বিন আমর, হুওয়াই বিন আখতাব,

রেফা'আহ বিন যায়েদ বিন তাবুত কতিপয় ব্যক্তিবর্গ আনসারীদের নিকট এসে তাদেরকে উপদেশ করে বলত যে, তোমরা নিজেদের মাল ব্যয় করে ফেলো না। কারণ মাল চলে যাওয়ায় তোমাদের দরিদ্র হয়ে যাবার আশঙ্কা বোধ করছি। দান খয়রাতে তোমরা প্রতিযোগিতায় নেমে যেয়ো না। তোমরা তো জান না পরিণতি কি হবে। তাদের এ প্ররোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। কারো মতে, যে সকল ইহুদিরা হযরত নবী করীম ﷺ-এর পরিচিতি গোপন করেছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী- ৩০/৩/৫, বাহরে মুহীত- ২৫৮/৩, ফাতহুল কাদীর- ৪৬৭/১, কাশশাফ- ৫৪২/১]

(৩৮) قوله وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কারো মতে, উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে। যারা রাসূল ﷺ-এর শত্রুতায় নিজেদের মাল ব্যয় করেছে। কারো মতে, মুনাফিকদের সম্পর্কে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। -[কাশশাফ- ৫৪৩/১, বায়যাভী- ৭৪/৩]

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, উপরিউক্ত আয়াতের শানে নুযূলের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যতা রয়েছে। জমহুর মুফাসসিরীনের মতে উক্ত আয়াত মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, উক্ত আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তবে ইমাম তাবারী সে মতকে দুর্বল বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কারো মতে, মক্কার দলপতিদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। যারা বদর যুদ্ধে মানুষের অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রচুর মাল ব্যয় করেছিল। ইবনুল আরাবী ও এ মত প্রকাশ করেন। -[কুরতুবী- ১৮৬/৫]

বিবাদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় পরিবারের সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করার বিধান : উল্লিখিত ব্যবস্থাটি ছিল এ কারণে যাতে ঘরের ব্যাপার ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িতও হয়ে যায়। তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা কিংবা পুরুষের পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি প্রভৃতি যে কোনো কারণেই হোক এমতাবস্থায় ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না, বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমর্থকরা একে অপরকে মন্দ বলে এবং পারস্পরিক অপবাদারোপ করে বেড়ায়। যার ফলে উভয় পক্ষের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দু'জনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিবাদই পারিবারিক বিসংবাদের রূপ পরিগ্রহ করে।

আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে কুরআনে কারীম এ ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সমসাময়িক শাসকবর্গ উভয়পক্ষের সমর্থক ও পক্ষাবলম্বী এবং মুসলমান দলকে সম্বোধন করে এমন এক পূত-পবিত্র পন্থা বাতলে দিয়েছে, যাতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে পরস্পর অপবাদারোপের পথও বন্ধ হয়ে গিয়ে আপস-মীমাংসার পথ বেরিয়ে আসতে পারে। আর ঘরের বিবাদ ঘরে মীমাংসা না হতে পারলেও অন্ততঃ পরিবারের মধ্যেই যেন তা হয়ে যায়; আদালতে মামলা-মোকদ্দমা রুজু করার ফলে যেন বিষয়টি হাটে-ঘাটে বিস্তার লাভ না করে।

আর তা হলো এই যে, সরকার, উভয়পক্ষের মুরব্বী অভিভাবক অথবা মুসলমানদের কোনো শক্তিশালি সংস্থা তাদের অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপষ করিয়ে দেওয়ার জন্য দু'জন সালিস নির্ধারণ করে দিবেন। একজন পুরুষের পরিবার থেকে এবং একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। এতদুভয় ক্ষেত্রে সালিস অর্থে حَكَمٌ (হাকাম) শব্দ প্রয়োগ করে কুরআন নির্বাচিত সালিসদ্বয়ের প্রয়োজনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এতদুভয়ের মধ্যেই বিবাদ মীমাংসা করার গুণ থাকতে হবে। বলা বাহুল্য, এ গুণটি সে ব্যক্তির মধ্যেই থাকতে পারে, যিনি বিজ্ঞও হবেন এবং তৎসঙ্গে বিশ্বস্ত দীনদারও হবেন।

সারকথা, একজন সালিস পুরুষের [স্বামীর] পরিবার থেকে এবং একজন মহিলার [স্ত্রীর] পরিবার থেকে নির্বাচিত করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে পাঠানো হবে। যেখানে গিয়ে এতদুভয় কি কি কাজ করবেন এবং এদের দায়িত্বই বা কি হবে কুরআনে কারীম তা স্থির করে দেয়নি। অবশ্য বর্ণনা শেষে একটি বাক্য اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا অর্থাৎ, যদি এতদুভয় সালিস সমস্যার সমাধান এবং পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করে দিবেন।

এ বাক্যটি দ্বারা দু'টি বিষয় বুঝা যাচ্ছে :

এক. আপস-মীমাংসাকারী সালিসদ্বয়ের নিয়ত যদি সৎ হয় এবং সত্যিকারভাবেই যদি তারা স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা কামনা করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের গায়েবি সাহায্য হবে। ফলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হবে। আর তাতে করে তাদের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মনেও আল্লাহ তা'আলা সম্প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন। এতে আরো একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোথাও পারস্পরিক মীমাংসা না হয়, তবে বুঝতে হবে। সালিসদ্বয়ের যে কোনো একজনের মনে নিঃস্বার্থতার অভাব ছিল।

দুই. এ বাক্যের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, দু'পক্ষের সালিসকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করা, এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। অবশ্য একথা স্বতন্ত্র যে, উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে এতদুভয় ব্যক্তিকে নিজেদের উকিল, প্রতিনিধি অথবা সালিস নির্ধারণ করবে এবং এ কথা স্বীকার করে নিবে যে, তোমরা মিলেমিশে যে সিদ্ধান্ত নিবে, আমরা তাই মেনে নিব। এক্ষেত্রে এই সালিসদ্বয় সম্পূর্ণভাবে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। তারা দু'জন তালাকের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলে তালাকই হয়ে যাবে। আবার তারা 'খোলা' প্রভৃতি যে কোনো সিদ্ধান্তে একমত হলে, তাই হবে এবং পুরুষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অধিকার অনুসারে যদি তারা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাই মেনে নিতে হবে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের মধ্যে হযরত হাসান বসরী ও ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখেরও এমনি অভিমত। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত আলী (রা.)-এর সামনে একবার এমনি এক ঘটনা উপস্থিত হয়। তাতেও প্রমাণ হয় যে, একমাত্র আপস মীমাংসা ছাড়া উল্লিখিত সালিসদ্বয়ের অন্য কোনো অধিকার থাকে না, যতক্ষণ না উভয়পক্ষ তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দান করে। ঘটনাটি সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত আবীদা সালমানীর রেওয়ায়েতক্রমে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে।

একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হযরত আলী (রা.)-এর খেদমতে হাজির হলো। তাদের উভয়ের সাথেই ছিল বহু লোকের এক এক দল। হযরত আলী (রা.) নির্দেশ দিলেন যে, পুরুষের পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন 'হাকাম' বা সালিস নির্ধারণ করা হোক। অতঃপর সালিস নির্ধারিত হয়ে গেলে তাদের সম্বোধন করে হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জান? আর তোমাদের কি করতে হবে সে ব্যাপারে কি তোমরা অবগত? শোন! তোমরা যদি এ স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যাপারে এবং তাদের পারস্পরিক আপস মীমাংসা করে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হতে পার, তবে তাই করো। পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে, তাদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করা সম্ভব নয়, কিংবা তা করে দিলে টিকতে পারবে না এবং তোমরা উভয়েই তাদের পৃথক করে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে এতেই মঙ্গল বিবেচনা কর, তবে তাই করবে। একথা শুনে মহিলাটি বলল, আমি এটা স্বীকার করি। এতদুভয় সালিস আল্লাহর আইন অনুসারে যে ফয়সালা করবে, তা আমার মতের পক্ষে হোক অথবা বিরোধী হোক, আমি তাই মানি।

কিন্তু পুরুষটি বলল, পৃথক হয়ে যাওয়া কিংবা তালাক হয়ে যাওয়া তো আমি কোনোক্রমেই সহ্য করব না। অবশ্য সালিসদের এ অধিকার দিচ্ছি যে, তারা আমার উপর যে কোনো রকম আর্থিক জরিমানা আরোপ করে তাকে [স্ত্রীকে] সম্মত করিয়ে দিতে পারেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, না তা হয় না। তোমারও সালিসদেরকে তেমনি অধিকার দেওয়া উচিত যেমন স্ত্রী দিয়েছে। –[রূহুল মাআনী] এ ঘটনার দ্বারা কোনো কোনো মুজতাহিদ ইমাম উদ্ভাবন করেছেন যে, সলিসদের অধিকারসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। যেমন, হযরত আলী (রা.) উভয় পক্ষকে বলে তাদেরকে তাদের অধিকার সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা ও হযরত হাসান বসরী (র.) সাব্যস্ত করেছেন যে, উল্লিখিত সালিসদ্বয়ের অধিকার সম্পন্ন হওয়াই যদি অপরিহার্য হতো, তবে হযরত আলী (রা.) কর্তৃক উভয় পক্ষের সম্মতি লাভের চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং উভয় পক্ষকে সম্মত করার চেষ্টাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সালিসদ্বয় অধিকার সম্পন্ন নয়। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী যদি অধিকার দান করে, তবে অধিকার সম্পন্ন হয়ে যায়।

কুরআনে কারীমের এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে অতি চমৎকার এক নতুন পথের উন্মোচন হয়ে যায়।

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে তাওহীদের আলোচনার কারণ : হক বা অধিকার সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদত-বন্দেগী ও তাওহীদের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত কর এবং ইবাদতের বেলায় তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না।

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে ইবাদত-বন্দেগী ও তাওহীদ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করার বেশ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তার একটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার ভয় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের প্রতি যাদের মধ্যে নিষ্ঠা না থাকে, তাদের দ্বারা দুনিয়ার অন্য অধিকার রক্ষায়ও নিষ্ঠা আশা করা যায় না। মানবগোষ্ঠী, সমাজের রীতি-নীতি কিংবা রাষ্ট্রের আইন-কানুন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হাজারো পন্থা আবিষ্কার করে নেয়। কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে মানুষের অধিকারের প্রতি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে, তাহলো আল্লাহর ভয় ও পরহেজগারী। আর এই আল্লাহভীতি ও পরহেজগারী শুধুমাত্র তাওহীদের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। কাজেই বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক ও আত্মীয়-স্বজনের হক বা অধিকারসমূহের বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে তাওহীদ ও ইবাদত বন্দেগী সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা একান্তই সঙ্গত।

তাওহীদের পর পিতামাতার অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা : অতঃপর সমস্ত আত্মীয়-আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিতামাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইবাদত-বন্দেগী ও হকসমূহের পর-পরই পিতামাতার হক সম্পর্কিত বিবরণ দানের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নিয়ামত ও অনুগ্রহ একান্তই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণের দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলার পরে মানুষের প্রতি সর্বাধিক ইহসান বা অনুগ্রহ থাকে পিতামাতার। সাধারণ উপকরণসমূহের মাঝে মানুষের অস্তিত্বের পিছনে পিতামাতই বাহ্যিক কারণ। তাছাড়া জন্ম থেকে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্ত কঠিন বন্ধুর পথ ও স্তর রয়েছে, তাতে বাহ্যতঃ পিতামাতাই তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখেন, তার প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের জামানতদার হয়ে থাকেন। সে জন্যই কুরআনে কারীমের অন্যান্য জায়গায়ও পিতামাতার হকসমূহকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে : أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ আমার এবং তোমার পিতামাতার শুকরিয়া আদায় কর।

হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ দশটি অসিয়ত করেছিলেন। তন্মধ্যে ১. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করবে না, যদি তোমাদেরকে সে জন্য হত্যা কিংবা অগ্নিদগ্ধও করা হয়।

২. নিজের পিতামাতার নাফরমানি কিংবা তাদের মনে কষ্ট দিবে না, যদি তারা এমন নির্দেশও দিয়ে দেন যে, তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ ত্যাগ কর। -[মুসনাদে আহমদ]

রাসূলে কারীম ﷺ-এর বাণীসমূহে যেমন পিতামাতার আনুগত্য ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার সীমাহীন ফজিলত, মর্তবা ও ছওয়াবের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, মহানবী ﷺ বলেছেন, যে লোক নিজের রিজিক ও আয়ুতে বরকত কামনা করবে, তার পক্ষে সেলায়ে-রেহমী, অর্থাৎ, নিজের আত্মীয়-স্বজনের হকসমূহ আদায় করা উচিত।

তিরমিযী শরীফের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতামাতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

শো'আবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত বায়হাকী (র.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে পুত্র স্বীয় পিতামাতার অনুগত, সে যখনই নিজের পিতামাতার প্রতি সম্মান ও মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তখন প্রতিটি দৃষ্টিতে সে একটি মকবুল হজের ছওয়াব প্রাপ্ত হয়।

বায়হাকীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন, কিন্তু যে লোক পিতামাতার নাফরমানি এবং তাঁদের মনে কষ্টদায়ক কাজ করে, তাকে আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই বিভিন্ন বিপদাপদে লিপ্ত করে দেওয়া হয়।

নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ : উল্লিখিত আয়াতে পিতামাতার পর পরেই সাধারণ ذِي الْقُرْبٰى অর্থাৎ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকিদ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমের প্রসিদ্ধ এক আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা হুজুর ﷺ প্রায়শঃই বিভিন্ন ভাষণের পর তেলাওয়াত করতেন। বলা হয়েছে– إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى

অর্থাৎ, আল্লাহ সবার সাথে ন্যায় ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার জন্য : এতে সামর্থ্যানুযায়ী আত্মীয়-আপনজনদের কায়িক ও আর্থিক সেবা-যত্ন করা, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাঁদের খবরা-খবর নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

হযরত সালমান ইবনে আমের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, সদকার মাল সাধারণ গরিব-মিসকিনকে দান খয়রাত করলে তাতে তো শুধু সদকার ছওয়াবই পাওয়া যায়, অথচ তা যদি নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-আপনজনকে দান করা হয়, তাহলে তাতে দু'টি ছওয়াব পাওয়া যায়। একটি হলো সদকার ছওয়াব এবং আরেকটি হলো সেলায়ে রেহমীর ছওয়াব। অর্থাৎ, আত্মীয়তার হক আদায় করার ছওয়াব। –[মুসনাদে আহমদ, সুনানে নাসায়ী, সুনানে তিরমিযী]

উল্লিখিত আয়াতে প্রথমে পিতামাতার হকের ব্যাপারে তাকীদ দেওয়া হয়েছে এবং তারপরেই আত্মীয়-স্বজনের হকের কথা বলা হয়েছে।

এতিম মিসকিনের হক : তৃতীয় পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে– وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ এতিম ও মিসকিনদের হক সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ যদিও সূরার প্রথমভাগে এসে গেছে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের হক বর্ণনা প্রসঙ্গে এখানে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লা ওয়ারিস তথা অনাথ শিশু এবং অসহায় মানুষের সাহায্য সহায়তাকেও এমনি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিবেচনা করবে, যেমন আত্মীয়-আপনজনদের বেলায় করে থাক।

প্রতিবেশীর হক : চতুর্থ পর্যায়ে বলা হয়েছে وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى এবং নিকট প্রতিবেশীর। পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে وَالْجَارِ الْجُنُبِ এখানে جَارٌ শব্দের অর্থ প্রতিবেশী। এ আয়াতে দু'রকম প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে।

১. جَارُ ذِى الْقُرْبٰى ২. جَارُ الْجُنُبِ এতদুভয় প্রকার প্রতিবেশীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন جَارُ ذِى الْقُرْبٰى বলতে সেসব প্রতিবেশীকে বুঝায়, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়ও বটে। এভাবে এতে দু'টি হক সমন্বিত হয়ে যায়। আর جَارٌ جُنُبٌ বলতে শুধুমাত্র সে প্রতিবেশীকে বুঝায় যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। আর সে জন্যই তার উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে।

কোনো কোনো তাফসীরকার মনীষী বলেছেন, جَارُ ذِى الْقُرْبٰى এমন প্রতিবেশীকে বলা হয়, যে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলমান। আর جَارُ جُنُبٌ বলা হয় অমুসলমান প্রতিবেশীকে।

কুরআনে ব্যবহৃত শব্দে অবশ্য এ সমুদয় সম্ভাব্যতাই বিদ্যমান। তাছাড়া বাস্তবতার দিক দিয়েও প্রতিবেশীদের মাঝে স্তরভেদ থাকাটা একান্তই যুক্তিসঙ্গত এবং নির্ভরযোগ্যও বটে। আর প্রতিবেশীদের আত্মীয় অথবা অনাত্মীয় হওয়ার দিক দিয়েও। প্রতিবেশী চাই নিকটবর্তী হোক অথবা দূরবর্তী, আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান, যে কোনো অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খবরা-খবর নেওয়া কর্তব্য।

অবশ্য প্রতিবেশী হওয়া ছাড়াও যার অন্যান্য হক রয়েছে, অন্যান্য প্রতিবেশীর তুলনায় তাকে মর্যাদাগত অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, স্বয়ং হুজুরে আকরাম ﷺ এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, "কোনো কোনো প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক মাত্র একটি, আবা কোনো কোনো প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক দু'টি এবং কোনো কোনো প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক তিনটি। এক হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো এমন অমুসলমান যাদের সাথে কোনো আত্মীয়তা নেই। দুই হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো তারা, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানও বটে। আর তিন হকবিশিষ্ট প্রতিবেশি হলো তারা, যারা প্রতিবেশি ও মুসলমান এবং সেই সঙ্গে আত্মীয়ও বটে।' –[ইবনে কাছীর]

সহকর্মীদের হক : ষষ্ঠ পর্যায়ে বলা হয়েছে وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ -এর শাব্দিক অর্থ– হলো সহকর্মী। এতে সেসব সফর সঙ্গীরাও অন্তর্ভুক্ত যারা রেল, জাহাজ, বাস, মোটর প্রভৃতিতে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করবে এবং সে সমস্ত লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা কোনো সাধারণ বা বিশেষ বৈঠক বা অধিবেশনে আপনার সাথে উপবেশন করে থাকে।

ইসলামি শরিয়ত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থায়ী প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষণকে যেমন ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনিভাবে সে ব্যক্তির সাহচর্যের অধিকার বা হককেও অপরিহার্য করে দিয়েছে, যে সামান্য সময়ের জন্য হলেও কোনো মজলিস, বৈঠক অথবা সফরের সময় আপনার সমপর্যায়ে উপবেশন করে। তাদের মধ্যে মুসলমান, অমুসলমান, আত্মীয়, অনাত্মীয় সবাই সমান– সবার সাথেই সদ্ব্যবহার করার হেদায়েত করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে এই যে, আপনার কোনো

কথায় বা কাজে যেন সে কোনো রকম কষ্ট না পায়। এমন কোনো কথা বলবেন না, যাতে সে মর্মাহত হতে পারে। এমন কোনো আচরণ করবেন না, যাতে তার কষ্ট হতে পারে। যেমন, সিগারেট পান করে তার দিকে ধোঁয়া ছাড়া, পান খেয়ে তার দিকে পিক ফেলা এবং এমনভাবে বসা যাতে তার বসার জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় প্রভৃতি।

কুরআনে কারীমের এ হেদায়েত অনুযায়ী যদি সবাই আমল করতে শুরু করে, তাহলে রেল, জাহাজ, বাস প্রভৃতি সফরক্ষেত্রে সংঘটিত সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, আমার শুধুমাত্র একজনের জায়গারই অধিকার রয়েছে; তার বেশি জায়গা দখল করে রাখার কোনো অধিকার নেই। রেলে বা অন্যান্য যানবাহনে অন্য কোনো যাত্রী পাশে বসতে গেলে একথা ভাবা উচিত যে, এখানে তারও ততটুকুই অধিকার রয়েছে যতটা রয়েছে আমার।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এমন প্রতিটি লোকই صَاحِبْ بِالْجَنْبِ-এর অন্তর্ভুক্ত যে কোনো কাজে, কোনো পেশায় বা কোনো বিষয়ে আপনার সাথে জড়িত বা আপনার অংশীদার; তা শিল্পশ্রমেই হোক অথবা অফিস-আদালতের চাকরিতেই হোক কিংবা কোনো সফরে বা স্থায়ী বসবাসেই হোক। –[রূহুল মা'আনী]

পথিকের হক : সপ্তম পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে وَابْنِ السَّبِيْلِ; অর্থাৎ, পথিক। এতে এমন লোককে বুঝানো হয়েছে, যে সফরের অবস্থায় আপনার নিকট এসে উপস্থিত হয় কিংবা আপনার মেহমান হয়ে যায়। যেহেতু এই অজানা অচেনা লোকটির কোনো আত্মীয় বা সম্পর্কীয় লোক এখানে উপস্থিত থাকে না, সেহেতু কুরআন ইসলামি তথা মানবীয় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার হকও আপনার উপর অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে। তাহলো, সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী তার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

গোলাম, বাঁদি ও কর্মচারীর হক : অষ্টম পর্যায়ে বলা হয়েছে وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ; এতে অধিকারভুক্ত গোলাম-বাঁদীকে বুঝানো হয়েছে। তাদের ব্যাপারেও এ হক সাব্যস্ত ও অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী তাদের খাওয়া -দাওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করবে না। তাছাড়া তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজ তাদের দ্বারা করাবে না।

এখানে আয়াতের বাক্যগুলো যদিও সরাসরিভাবে অধিকারভুক্ত গোলাম-বাঁদিকেই বুঝাচ্ছে, কিন্তু কারণ-উপকরণের সামঞ্জস্য এবং রাসূলে কারীম ﷺ-এর বিভিন্ন বক্তব্যের ভিত্তিতে আলোচ্য নির্দেশ ও বিধি-বিধান দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী ও অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। তাদের হকও একই রকম। নির্ধারিত বেতন-ভাতা খানাপিনা প্রভৃতির ব্যাপারে বিলম্ব বা কার্পণ্য করা যাবে না এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত কোনো কাজও চাপানো যাবে না।

অধিকার প্রদানে তারাই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মনে দাম্ভিকতা বিদ্যমান : আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا অর্থাৎ, আল্লাহ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে দাম্ভিক এবং নিজেকে অন্যের চাইতে বড় প্রতিপন্ন করে।

আয়াতের এই শেষ বাক্যটি পূর্ববর্তী সমস্ত বক্তব্যের উপসংহার। কারণ পূর্ববর্তী আটটি পর্যায়ে যে সমস্ত লোকের হক সম্পর্কে তাকিদ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সেসব লোকই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মন মানসিকতায় আত্মগর্ব, অহমিকা, তাকাব্বুর ও দাম্ভিকতা বিদ্যমান। আল্লাহ সমস্ত মুসলমানকে এর অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখুন।

অতঃপর اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ বাক্যে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত লোক দাম্ভিক তারা ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য অবলম্বন করে। নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে না এবং অন্যান্য লোককেও নিজের অশোভন কথা এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে এহেন মন্দ অভ্যাস করার প্রতি উৎসাহিত করে।

আয়াতে যে بُخْل শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, প্রচলিত অর্থে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার বা হক আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে। কিন্তু আয়াতের শানে নুযূল পর্যালোচনা করতে গেলে বুঝা যায়, এখানে بُخْل বা কার্পণ্য শব্দটিতে অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্পণ্যই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি মদিনায় বসবাসরত ইহুদিদের প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছিল। এরা ভীষণ দাম্ভিক ও অসম্ভব রকম কৃপণ ছিল। অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের বেলায় যেমন কৃপণতা করত, তেমনি সে সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ও গোপন করত, যা তারা নিজেদের ইলহামী গ্রন্থের মাধ্যমে অর্জন করেছিল এবং সে সমস্ত জ্ঞানও গোপন করত যাতে মহানবী ﷺ-এর আগমন সংক্রান্ত সুসংবাদ ও লক্ষণসমূহের উল্লেখ ছিল। কিন্তু ইহুদিরা এসব বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নেওয়ার পরও কার্পণ্যের আশ্রয় নিত। না তারা নিজেরা সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করত, আর না অন্যকে সে অনুযায়ী আমল করতে বলত।

পরবর্তীতে বলা হয়েছে, যে সমস্ত লোক আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদের বেলায়ও কার্পণ্য করে এবং ইলম ও ঈমানের ব্যাপারেও কার্পণ্য করে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ; তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে অপমানজনক আজাব।

দান-খয়রাতের ফজিলত এবং কার্পণ্যের ক্ষতি সম্পর্কে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন।

"প্রতিদিন ভোর বেলায় দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! সৎপথে ব্যয়কারীকে শুভ প্রতিদান দান কর। আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দাও।" –[সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

অতঃপর وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ বাক্যের দ্বারা দাম্ভিকের আরেকটি দোষের কথা বলা হয়েছে। তা হলো এই যে, এসব লোক আল্লাহর পথে নিজেরাও ব্যয় করে না এবং অন্যকেও ব্যয় না করার প্ররোচনা দেয়। অবশ্য তারা ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর যেহেতু এরা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে না। সেহেতু তাদের পক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের ছওয়াবের নিয়তে ব্যয় করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ ধরনের লোক শয়তানের দোসর। অতএব, তাদের পরিণতিও তাই হবে, যা হবে তাদের দোসর শয়তানের পরিণতি।

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শিরক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যথা–

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ল সে শিরক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে রোজা রাখল সে শিরক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদকা-খয়রাত করল সে শিরক করল।'-[মুসনাদে আহমদ]

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ অর্থাৎ, তাদের ক্ষতিটা কি হবে এবং তাদের এমন বিপদই বা হবে, যদি তারা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নেয় এবং আল্লাহ-প্রদত্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে ব্যয় করে? এগুলো সবই যে একান্ত সহজ কাজ। এগুলো গ্রহণ করা বা বাস্তবায়ন করা কোনোই কষ্টের বিষয় নয়, তবুও কেন নাফরমান ও অকৃতজ্ঞ থেকে আখেরাতে ধ্বংসের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছে।

অতঃপর বলা হয়েছে اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কারো সৎকর্মের ছওয়াব এবং অশুভ প্রতিদানের বেলায় বিন্দু-বিসর্গও অন্যায় করেন না; বরং নিজের পক্ষ থেকে এতে অধিকতর বৃদ্ধি করে দেন এবং আখেরাতে এগুলোকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তার ছওয়াব দান করবেন এবং নিজের পক্ষ থেকেও দিবেন মহান দান।

আল্লাহ তা'আলার নিকট নিম্নতম ছওয়াবের পরিমাণ হচ্ছে এই যে, সেখানে একটি সৎ কাজের জন্য দশ-দশটি ছওয়াব লেখা হয়, তদুপরি নানা বাহানায় বৃদ্ধির পরেও বৃদ্ধি হতে থাকে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু সৎকাজ এমনও রয়েছে, যেগুলোর ছওয়াব বিশ লক্ষ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে যায়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা হলেন মহাদাতা। তিনি তাঁর অসীম রহমতে [সৎ কাজের বিনিময়] এমনভাবে বাড়িয়ে দেন, যা কোনো হিসাব বা সীমা-পরিসীমায় আসে না। বলা হয়েছে- وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ কাজেই আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে যে কি মহাদান হতে পারে, তার কি কল্পনা করা যেতে পারে?

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত ذرة শব্দের একটি অর্থ তো সুবিদিত, যা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো মনীষী বলেছেন যে, লাল রঙ্গের সর্বাধিক ক্ষুদ্র পিঁপড়াকে ذرة [যাররাতুন] বলা হয়। আরবরা নিকৃষ্টতা ও ওজনহীনতা বুঝানোর জন্য শব্দটি উদাহরণস্বরূপ বলে থাকে।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ বলে আখেরাতের ময়দানের দৃশ্যকে সামনে উপস্থিত করার প্রতি লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে। এতে মক্কাবাসী কাফেরদের ভীতি প্রদর্শনও উদ্দেশ্য বটে।

তাদের কি অবস্থা হবে, যখন হাশরের ময়দানে প্রত্যেক উম্মতের নবীগণকে নিজ নিজ উম্মতের নেক-বদ ও সৎ অসৎ আমলের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করা হবে এবং যখন আপনিও নিজের উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আর বিশেষ করে সেই কাফের-মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহর আদালতে সাক্ষ্য দান করবেন যে, তারা প্রকাশ্য সব মু'জিযা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও মিথ্যারোপ করেছে এবং আল্লাহর তাওহীদ ও আপনার রেসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুর ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমাকে কুরআন শোনাও। হযরত আব্দুল্লাহ নিবেদন করলেন, আপনি কি আমার কাছ থেকে শুনতে চান, অথচ কুরআন আপনারই উপর অবতীর্ণ হয়েছে। হুজুর ﷺ বললেন, হ্যাঁ, পড়। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, অতঃপর আমি সূরা আন-নিসা পড়তে আরম্ভ করলাম। فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ পর্যন্ত পৌঁছার পর তিনি বললেন, এবার থাম। তারপর যখন আমি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালাম, দেখলাম, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

আল্লামা কাস্তাল্লানী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত পাঠে, হুজুর ﷺ-এর সামনে আখেরাতের দৃশ্যাবলি উদ্ভাসিত হয়ে যায় এবং স্বীয় উম্মতের শৈথিল্যপরায়ণ ব্যক্তিদের কথা স্মরণ হয়। আর সে জন্যই তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।

জ্ঞাতব্য : কোনো কোনো মনীষী বলেছেন هَٰؤُلَاءِ এর দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ-এর সময়ে উপস্থিত কাফের মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার অনেকের মতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা উম্মতের প্রতিই এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, হুজুরের উম্মতের যাবতীয় আমল হুজুরের সামনে উপস্থাপিত করা হতে থাকে।

যা হোক, এতে বুঝা গেল যে, বিগত উম্মতসমূহের নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপিত হবেন এবং স্বয়ং মহানবী ﷺ-ও স্বীয় উম্মতের কৃতকর্মের সাক্ষ্যদান করবেন। কুরআনে কারীমের এই বর্ণনারীতির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুজুর ﷺ-এর পর আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না, যিনি স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষ্যদান করতে পারেন। অন্যথা কুরআনে কারীমে তাঁর [অর্থাৎ সে নবীর এবং তাঁর সাক্ষ্যদানের] বিষয়ও উল্লেখ থাকত। এ হিসেবে উক্ত আয়াতটি খতমে নবুয়তেরও একটি প্রমাণ।

শব্দের বিশ্লেষণ :

يُوَفِّقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْفِيْقُ মূলবর্ণ (و . ف . ق) জিনস مثال واوى অর্থ– তিনি তৌফিক দান করেন।

مُخْتَالًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِخْتِيَالُ মূলবর্ণ (خ . ى . ل) জিনসে اجوف يائى অর্থ– অহংকারী, দাম্ভিক।

أَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِعْتَادُ মূলবর্ণ (ع . ت . د) জিনস صحيح অর্থ– আমরা প্রস্তুত করেছি।

قَرِيْنًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন قُرَنَاءُ অর্থ– সাথী।

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

অনুবাদ : (৪২) যারা কুফরি করেছে এবং রাসূলের কথা অমান্য করেছে– তারা ঐদিন কামনা করবে যে, হায়! যদি আমরা মাটির সাথে বিলীন হয়ে যেতাম, আর তারা আল্লাহর নিকট কোনো কথা গোপন করতে পারবে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

(৪৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নামাজের নিকটেও যেয়ো না, নেশার অবস্থায়– যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা নিজেদের মুখের কথাগুলো উপলব্ধি করতে পার এবং জানাবাতের অবস্থায়ও তোমাদের মুসাফিরী অবস্থা ব্যতীত যে পর্যন্ত না গোসল করে নাও। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা মুসাফিরী অবস্থায় থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ এস্তেঞ্জা হতে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী-সঙ্গম করে থাক, অতঃপর তোমরা পানি না পাও, তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের মাসেহ কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতিশয় মার্জনাকারী, মহা ক্ষমাপরায়ণ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿٤٤﴾

(৪৪) তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনি! যাদেরকে কিতাবের এক বড় অংশ প্রদত্ত হয়েছে, তারা গোমরাহীকে গ্রহণ করেছে এবং এই কামনা করে যে, তোমরা [-ও সরল] পথ হতে পথহারা হয়ে যাও।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪২) يَوْمَئِذٍ ঐদিন يَوَدُّ তারা কামনা করবে الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কুফরি করেছে وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ এবং রাসূলের কথা অমান্য করেছে– لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ যে, হায়! যদি আমরা মাটির সাথে বিলীন হয়ে যেতাম وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا আর তারা আল্লাহর নিকট কোনো কথা গোপন করতে পারবে না।

(৪৩) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ তোমরা নামাজের নিকটেও যেয়ো না وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى নেশার অবস্থায়– حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা নিজেদের মুখের কথাগুলো উপলব্ধি করতে পার وَلَا جُنُبًا এবং জানাবাতের অবস্থায়ও اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ তোমাদের মুসাফিরী অবস্থা ব্যতীত حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا যে পর্যন্ত না গোসল করে নাও وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى আর যদি তোমরা পীড়িত হও اَوْ عَلٰى سَفَرٍ অথব মুসাফিরী অবস্থায় থাক اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ এস্তেঞ্জা হতে আসে اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ অথবা তোমরা স্ত্রী-সঙ্গম করে থাক فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً অতঃপর তোমরা পানি না পাও فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের মাসেহ কর اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতিশয় মার্জনাকারী, মহা ক্ষমাপরায়ণ।

(৪৪) اَلَمْ تَرَ তুমি কি লক্ষ্য করনি! اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ তাদেরকে যাদেরকে কিতাবের এক বড় অংশ প্রদত্ত হয়েছে يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ তারা গোমরাহীকে গ্রহণ করছে وَيُرِيْدُوْنَ এবং এই কামনা করে যে اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ তোমরা [-ও সরল] পথ হতে পথহারা হয়ে যাও।

(৪৫) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদেরকে পূর্ণরূপে জানেন وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا এবং আল্লাহ ওলী হিসেবে যথেষ্ট। وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا এবং আল্লাহ মদদগার হিসেবেও যথেষ্ট।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا (٤٥)

অনুবাদ : (৪৫) আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদেরকে পূর্ণরূপে জানেন, এবং আল্লাহ ওলী হিসেবে যথেষ্ট এবং আল্লাহ মদদগার হিসেবেও যথেষ্ট।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (٤٦)

(৪৬) এই [বর্ণিত] ব্যক্তিরা ইহুদিদের মধ্যকার লোক,কালাম [তাওরাত]-কে তার স্থান হতে [শব্দ বা অর্থের দিক দিয়ে] অন্য দিক ফিরিয়ে দেয়, আর [রাসূলুল্লাহর সঙ্গে] এই বাক্যগুলো ব্যবহার করে سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا এবং اِسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ এবং رَاعِنَا এইভাবে যে, নিজেদের ভাষা [ভঙ্গি] বদলে এবং [অন্তরে] ধর্মের প্রতি দোষারোপের ইচ্ছায়, আর যদি তারা سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا এবং اِسْمَعْ ও اُنْظُرْنَا এই বাক্যগুলো ব্যবহার করত, তবে এটা তাদের জন্য উত্তম এবং স্থানোপযোগী কথা হতো। কিন্তু আল্লাহ এদেরকে এদের কুফরির দরুন স্বীয় করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন। অতএব, তারা ঈমান আনবে না অল্প কয়েকজন ব্যতীত।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৬) مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا এই [বর্ণিত] ব্যক্তিরা ইহুদিদের মধ্যকার লোক يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ –কালাম [তাওরাত]-কে তার স্থান হতে [শব্দ বা অর্থের দিক দিয়ে] অন্য দিক ফিরিয়ে দেয়, وَيَقُوْلُوْنَ আর [রাসূলুল্লাহর সঙ্গে] এই বাক্যগুলো ব্যবাহর করে سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا এবং اِسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعٍ এবং رَاعِنَا এইভাবে যে, নিজেদের ভাষা [ভঙ্গি] বদলে وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ এবং ধর্মের প্রতি দোষারোপের ইচ্ছায় وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا আর যদি তারা سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا এবং اِسْمَعْ ও اُنْظُرْنَا এই বাক্যগুলো ব্যবহার করত, لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ তবে এটা তাদের জন্য উত্তমকথা হতো وَاَقْوَمَ এবং স্থানোপযোগী وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ কিন্তু আল্লাহ এদেরকে স্বীয় করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন بِكُفْرِهِمْ এদের কুফরির দরুন فَلَا يُؤْمِنُوْنَ তারা ঈমান আনবে না اِلَّا قَلِيْلًا অল্প কয়েকজন ব্যতীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪৩) قوله يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ الخ : **আয়াতের শানে নুযূল :** আব্দ বিন হুমাইদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী , ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির প্রমুখ হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আব্দুর রহমান বিন আউফ আমাদের জন্য খাদ্য তৈরি করে আমাদের কয়েকজন আনসার ও মুহাজিরকে খাবারের দাওয়াত দেন। অতঃপর আমরা আহার করে মদ্যপান করে মাতাল হয়ে গেলাম। পরক্ষণেই আমরা মাগরিবের নামাজ আদায়ের জন্য একত্রিত হলাম। ফলে তাঁরা আমাকে নামাজ পড়ানোর জন্য আগে বাড়িয়ে দিলেন। ফলে আমি মাগরিবের নামাজে কেরাত পাঠ করলাম এরূপভাবে যে–

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ

তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল – ২ : হযরত ইবনে মুনযির ইকরিমা হতে বর্ণনা করেন, এ আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত আবূ বকর , ওমর, আলী আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) প্রমূখের সম্পর্কে। হযরত আলী (রা.) তাদের জন্য খাবার ও মদ প্রস্তুত করেন (তখন মদ হারাম হয়নি) সুতরাং তারা আহার করলেন এবং মদ পান করলেন। অতঃপর হযরত আলী (রা.) তাদের নিয়ে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। তখন কেরাত পাঠ করেন قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ শেষ করে পড়েন لَيْسَ لِىْ دِيْنٌ وَلَيْسَ لَكُمْ دِيْنٌ সে পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর -৪৭২/১, ইবনে কাছীর-৫০০/১]

(৪৩) قوله وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ الخ : আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে জারীর, মুসান্নাফ, আবূ সালেহ, লাইছ ও ইয়াযিদ বিন আবূ হাবীব প্রমূখের বরাত দিয়ে বলেন যে, অনেক আনসারীদের ঘরের দরজা ছিল মসজিদের অভ্যন্তর দিয়ে। তারা জানাবাত তথা শুক্রক্ষরণজনিত অপবিত্র হতেন কিন্তু তাদের কাছে পানি থাকত না। তখন পানিতে যাবার জন্য মসজিদের ভিতর ছাড়া তাদের অন্য কোনো পথ ছিলনা। পবিত্রতা অর্জনের জন্য মসজিদের ভিতর দিয়ে পানির নিকটে যাওয়ার বৈধতা বর্ণনা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৫০১/১, লুবাবুন নুযূল, পৃ. ৮২]

(৪৩) قوله فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : হযরত ইবনে মুনযির ও আবূ হাতেম মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন, উপরিউক্ত আয়াত একজন আনসারী পুরুষ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি অসুস্থ ছিলেন, হেটে গিয়ে অজু করতে সক্ষম ছিলেন না। তার কোনো খাদেমও ছিল না, যার দ্বারা পানি সংগ্রহ করবেন, সুতরাং তিনি রাসূল ﷺ -এর খেদমতে গমন করে এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তখন উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৪৭৩/১, ইবনে কাছীর ৫০২/১, লুবাবুন নুযূল পৃ. ৮২]

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে জারীর, ইবরাহীম নাখয়ী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সাহাবীগণ আহত ও ক্ষত হলেন। সে ক্ষত পচন ধরে, এর মধ্যে জানাবাত তথা শুক্ররক্ষণ জনিত অপবিত্র হয়ে যান। সুতরাং সাহাবী এ সমস্যা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর নিকট জানতে চান। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৪৭৩/১]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আসমা (রা.) থেকে গলার হার নিয়েছিলেন, যা হারিয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবীকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠালেন। ফলে তারা সে হারটি পেলেন। সেখানে তাদের নামাজের সময় হয়ে গেল কিন্তু তাদের সাথে কোনো পানি ছিল না। কাজেই তারা সে ওয়াক্তের নামাজ অজু ছাড়াই আদায় করেন। পরবর্তীতে তারা রাসূল ﷺ-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন, তখন فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে।

(৪৪) قوله أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا الخ : আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির, আবূ হাতেম এবং বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রেফা'আহ বিন যায়দ বিন তাবুত ইহুদিদের মাঝে খ্যাতিমান একজন ব্যক্তি ছিল। রাসূল ﷺ -এর সাথে যখন কথা বলত, তখন নম্রতার সাথে কথা বলত। তখন সে বলত رَاعِنَا سَمْعَنَا يَا مُحَمَّدُ حَتَّى نَفْهَمَكَ আমাদের প্রতি মনোযোগী হন, হে মুহাম্মদ! যাতে আমরা আপনাকে বুঝতে পারি। পরবর্তীতে ইসলামের প্রতি অর্পপ্রচার করত এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৪৭৬/১, কুরতুবী– :২৩২/৫, রূহুল মা'আনী– ৪৪/৩/৫, বাহরে মুহীত– ২৭১/৩]

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا –আয়াতে ময়দানে আখেরাতে কাফেরদের দূরবস্থার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এরা কিয়ামতের দিন কামনা করবে যে, হায়! আমরা যদি ভূমির সাথে মিশে যেতাম, ভূমি যদি দ্বিধা হয়ে যেত আর আমরা তাতে ঢুকে গিয়ে মাটি হয়ে যেতাম এবং এখানকার জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাব-নিকাশ থেকে যদি অব্যাহতি লাভ করতে পারতাম।

হাশরের ময়দানে কাফেররা যখন দেখবে, সমস্ত জীব-জন্তু একে অপরের কাছ থেকে কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার পর মাটিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের আক্ষেপ হবে এবং কামনা করবে– হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। যেমন সূরা 'নাবা'তে বলা হয়েছে وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا [আর কাফেররা বলবে, কতই না উত্তম হতো যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম।]

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا অর্থাৎ এই কাফেররা নিজেদের বিশ্বাস ও কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই গোপন রাখতে পাবরে না। তাদের হাত পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে, নবী রাসূলগণ, সাক্ষ্য দান করবেন এবং আমলনামাসমূহেও সবকিছু বিধৃত থাকবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'কাফেররা কোনো কিছুই গোপন করতে পারবে না। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তারা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ [আল্লাহর কসম! আমরা শিরক করিনি] বাহ্যতঃ এ দু'টি আয়াতের মাঝে যে বৈপরীত্য দেখা যায়, তার কারণ কি? তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উত্তরে বললেন, ব্যাপারটি হবে এমন যে, যখন প্রথমে কাফেররা লক্ষ্য করবে শুধুমাত্র মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে না, তখন তারা একথা স্থির করে নিবে যে, আমাদেরকেও নিজেদের শিরক ও অসৎকর্মের বিষয় অস্বীকার করা উচিত। হয়তো আমরা এভাবে মুক্তি পেয়েও যেতে পারি। কিন্তু এ অস্বীকৃতির পর স্বয়ং তাদের অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গগুলোই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করবে এবং গোপন করার যে মতলব তারা স্থির করেছিল, তাতে সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য হয়ে পড়বে এবং তখন সবাই স্বীকার করে নিবে। এজন্যই বলা হয়েছে– وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيْثًا; কোনো কিছুই গোপন করতে পারবে না।

শরাব হারাম হওয়ার ধারাবাহিক নির্দেশাবলি : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামি শরিয়তকে একটি বৈশিষ্ট্য এই দান করেছেন যে, এর প্রতিটি বিধি-বিধানকে তিনি সরল ও সহজ করেছেন। তারই এক বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাঁদের মন-মানসকে একান্ত নিষ্পাপ করে তৈরি করেছিলেন এমন বিশেষ বিশেষ কিছু লোক ছাড়া মদ্যপান ছিল সমগ্র আরববাসীর পুরাতন অভ্যাস। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকেরা কখনো এ দুষ্ট বস্তুর ধারে কাছেও যেতেন না। যেমন, মহানবী ﷺ নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও কখনো মদ স্পর্শ করেননি। এছাড়া বলতে গেলে সমগ্র জাতিই ছিল এ বদভ্যাসে লিপ্ত। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কোনো বস্তু একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মদ্যপান কিংবা অন্যান্য নেশাজনিত অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে কাবু করে বসে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসাকে মৃত্যুর শামিল মনে করতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট মদ্যপান ও নেশা করা ছিল হারাম। বিশেষত ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমানদেরকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা ছিল আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়,কিন্তু সহসা একে হারাম করে দেওয়া হলে, মানুষের পক্ষে এ নির্দেশ পালন করা একান্তই কঠিন হতো। কাজেই প্রথমে এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো এবং এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কীকরণের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ককে একে পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হলো। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শুধু এ হুকুমই দেওয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজের ধারে কাছেও যেয়ো না। যার মর্ম ছিল এই যে, নামাজের সময়ে নামাজের প্রতি মনোনিবেশ করা ফরজ। এ সময় মদ্যপান করা যাবে না। এতে মুসলমানগণ উপলব্ধি করলেন যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা মানুষকে নামাজে বাধা দান করে। [কাজেই দেখা গেল] অনেকে তখন থেকেই অর্থাৎ এ নির্দেশ আসার সাথে সাথেই মদ্যপান পরিহার করলেন এবং অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত সূরা মায়েদার আয়াতে শরাবের অপবিত্রিতা ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ অবতীর্ণ হলো এবং যে কোনো অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল।

মাসআলা : নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়া যেমন হারাম, তেমনি কোনো কোনো মুফাসসির মনীষী এমনও বলেছেন যে, নিদ্রার এমন প্রবল চাপ হলেও নামাজ পড়া জায়েজ নয়, যাতে মানুষ নিজের মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

তায়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার– যা এ উম্মতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য : আল্লাহ তা'আলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি অজু-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এমন এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ। বলাবাহুল্য, ভূমি ও মাটি সর্বত্রই বিদ্যমান। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীকেই দান করা হয়েছে। তায়াম্মুম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ফিকহের কিতাব ছাড়াও সাধারণ বাংলা উর্দু পুস্তিকায় বর্ণিত রয়েছে। প্রয়োজনে সেগুলো পাঠ করা যেতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাকওয়া ও পরহেজগারীর বিষয় আলোচনা করা হয় এবং তাতে অধিকাংশই ছিল পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত। এরই মাঝে প্রসঙ্গক্রমে নামাজ তার সাথে সম্পৃক্ত কিছু হুকুম-আহকামও বলে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের মনে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের চিন্তা সৃষ্টি করে এবং তাতে করে পারস্পরিক লেনদেনের সুষ্ঠুতা সূচিত হয়। উল্লিখিত আয়াতে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে পালনীয় কর্তব্য ও আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে ইহুদিদের দুষ্কর্মের প্রতিকার এবং বাক্য প্রয়োগের রীতি-নীতি সম্পর্কেও মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَوَدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوِدَادُ মূলবর্ণ (و ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– সে কামনা করে।

تُسَوّٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْوِيَةُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তা সমান করা হবে।

لٰمَسْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُلَامَسَةُ মূলবর্ণ (ل ـ م ـ س) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা স্পর্শ করেছ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا (٤٧)

অনুবাদ : (৪৭) হে কিতাব প্রাপ্ত লোকগণ! তোমরা ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান আন, যা আমি নাজিল করেছি, এরূপে যে, তা তোমাদের নিকটস্থ কিতাবের সত্যতা সমর্থন করে এবং পূর্বে যে, আমি তোমাদের চেহারাগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেই, বস্তুতঃ তাদেরকে তাদের বিপরীত দিকের ন্যায় করে দেই অথবা আমি তাদের প্রতি এরূপ অভিসম্পাত করি যেরূপ অভিসম্পাত শনিবার পালনকারীদের প্রতি করেছিলাম, আর আল্লাহর আদেশ সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا (٤٨)

(৪৮) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শরিক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না এবং এটা ব্যতীত অন্যান্য পাপগুলো তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশী সাব্যস্ত করে, সে গুরুতর পাপী হলো।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا (٤٩)

(৪৯) তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনি! যারা নিজেদেরকে পবিত্র বলে প্রকাশ করে; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন, আর তাদের প্রতি সূতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا (٥٠)

(৫০) লক্ষ্য কর! তারা আল্লাহর প্রতি কিরূপ মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, এবং এটা স্পষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

শাব্দিক অনুবাদ

(৪৭) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ হে কিতাব প্রাপ্ত লোকগণ! اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا তোমরা ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান আন যা আমি নাজিল করেছি, مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ এরূপে যে, তা তোমাদের নিকটস্থ কিতাবের সত্যতা সমর্থন করে مِّنْ قَبْلِ اَنْ এবং পূর্বে যে نَّطْمِسَ وُجُوْهًا আমি তোমাদের চেহারাগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেই فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَا বস্তুতঃ তাদেরকে তাদের বিপরীত দিকের ন্যায় করে দেই اَوْ نَلْعَنَهُمْ অথবা আমি তাদের প্রতি এরূপ অভিসম্পাত করি كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِ যেরূপ অভিসম্পাত শনিবার পালনকারীদের প্রতি করেছিলাম وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا আর আল্লাহর আদেশ সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

(৪৮) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শরিক স্থির করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ এবং এটা ব্যতীত অন্যান্য পাপগুলো তিনি ক্ষমা করে দিবেন لِمَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশী সাব্যস্ত করে فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا সে গুরুতর পাপে পাপী হলো।

(৪৯) اَلَمْ تَرَ তুমি কি লক্ষ্য করনি! اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ তাদেরকে যারা নিজেদেরকে পবিত্র বলে প্রকাশ করে بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا আর তাদের প্রতি সূতা পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

(৫০) اُنْظُرْ লক্ষ্য কর! كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ তারা আল্লাহর প্রতি কিরূপ মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا এবং এটা স্পষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

(৫১) তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনি, যাদেরকে কিতাবের এক বড় অংশ প্রদত্ত হয়েছে, তারা জিব্‌ত [মূর্তি] ও শয়তানকে মান্য করে, আর তারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সঠিক পথে রয়েছে।	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا (٥١)
(৫২) এরাই সে সকল লোক, আল্লাহ যাদেরকে লা'নত করেছেন, আর আল্লাহ তা'আলা যাকে লা'নত করেন, তার জন্য কোনোই সাহায্যকারী পাবে না।	اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا (٥٢)
(৫৩) তবে কি তাদের নিকট রাজত্বের কোনো অংশ রয়েছে? তবে এমতাবস্থায় তো তারা লোকদেরকে সামান্য বস্তুও দিত না।	اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا (٥٣)
(৫৪) নাকি তারা অন্য লোকদের [যেমন রাসূলুল্লাহর] প্রতি হিংসায় জ্বলে মরছে ঐ সমস্ত বস্তুর দরুন, যা আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে প্রদান করেছেন, সুতরাং [আপনার এরূপ বস্তু প্রাপ্ত হওয়া কোনো নতুন বিষয় নয়, কেননা] আমি [ইতঃপূর্বে] ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাবও দান করেছি এবং জ্ঞানও দান করেছি, আর আমি তাদেরকে সুবিশাল রাজ্যও প্রদান করেছি।	اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا (٥٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(৫১) اَلَمْ تَرَ তুমি কি লক্ষ্য করনি اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ তাদেরকে যাদেরকে কিতাবের এক বড় অংশ প্রদত্ত হয়েছে يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ তারা জিব্‌ত [মূর্তি] ও শয়তানকে মান্য করে। وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর তারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলে هٰۤؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সঠিক পথে রয়েছে।

(৫২) اُولٰۤئِكَ এরাই সে সকল লোক الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ যাদেরকে লা'নত করেছেন وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা যাকে লা'নত করেন। فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا তার জন্য কোনোই সাহায্যকারী পাবে না।

(৫৩) اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ তবে কি তাদের নিকট রাজত্বের কোনো অংশ রয়েছে? فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا তবে এমতাবস্থায় তো তারা লোকদেরকে সামান্য বস্তুও দিত না।

(৫৪) اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ নাকি তারা অন্য লোকদের প্রতি হিংসায় জ্বলে মরছে عَلٰى مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ঐ সমস্ত বস্তুর দরুন, যা আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে প্রদান করেছেন فَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ সুতরাং আমি ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাবও দান করেছি এবং জ্ঞানও দান করেছি وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا আর আমি তাদেরকে সুবিশাল রাজ্যও প্রদান করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৪৭) قوله يَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে ইসহাক (র.) বলেন, রাসূল ﷺ ইহুদি ধর্মজাযকদের সাথে কথা বলছিলেন, তাদের মধ্যে ছিল আব্দুল্লাহ বিন সুরিয়া আল আ'ওয়ার ও কা'ব বিন আসাদ। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ইহুদিরা তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর। আল্লাহর শপথ! তোমরা একথা নিশ্চিতভাবে জান যে, আমি যা নিয়ে তোমাদের প্রতি আগত হয়েছি, তা অতি সত্য। এরা বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা তা জানি না: বরং তারা যা কিছু জানত সব কিছু অস্বীকার করে বসল এবং কুফরির উপর অটল থেকে গেল। তাদের এহেন আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী- ২৩৪/৫, ফাতহুল কাদীর ৪৭৬/১, বাহরে মুহীত- ২৭৭/৩, রূহুল মা'আনী- ৪৯/৩/৫]

(৪৮) قوله إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** হযরত ইবনে আবী হাতেম (র.) ও ইমাম তাবারী (র.) হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার এক ভাতিজা সে হারাম থেকে ফিরে আসে না। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, সে কোন ধর্মের অনুসারী? উত্তরে বলল, সে তো নামাজ পড়ে, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী, রাসূল ﷺ বললেন, তাকে ধর্ম পরিপূর্ণভাবে পালন করতে বল। সে যদি তাতে অসম্মত হয়, তাহলে সে ধর্মীয় কাজে নতুন কিছু আবিষ্কারক হবে। ফলে তাকে পরিপূর্ণভাবে ধর্ম পালন করতে বললে, সে অমত প্রকাশ করে। সুতরাং সে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর খেদমতে এসে সে সম্পর্কে অবহিত করল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন যে, তুমি তো তাকে ধর্মীয় ব্যাপারে একজন কপট মানুষ হিসেবে পেলে। তখন ধর্মীয় কাজে নিজ মতকে প্রাধান্য দানকারী সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল- ২ : ইবনে মুনযির ও ইবনে জারীর হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! শিরক করলেও নাকি? রাসূল ﷺ তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ তেলাওয়াত করলেন। ইবনুল মুনযির আবূ মিজলায হতে বর্ণনা করেন যে, এ ব্যক্তির জিজ্ঞাসাই মূলত إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ আয়াত নাজিল হবার কারণ। -[ফাতহুল কাদীর- ৪৭৬/১, ইবনে কাছীর- ৫১০/১]

(৪৯) قوله أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১** কালবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত কয়েকজন ইহুদি ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা কয়েকজন তাদের ছোট সন্তানদেরকে সাথে করে নিয়ে রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমাদের এ সকল বাচ্চা-কাচ্চাদের কোনো পাপ আছে কি? রাসূল ﷺ বললেন, না। তখন তারা বলল, আমরা শপথ করে বলছি, আমরাও এ বাচ্চাদের তুল্যই। আমরা দিনের বেলায় যে পাপ-পঙ্কিলতা করে থাকি রাতের বেলায় আমাদের থেকে তা ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং রাতের বেলায় যে পাপ-পঙ্কিলতা করি, দিনের বেলায় তা আমাদের থেকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এভাবেই তারা নিজেদের পবিত্রতার দাবি করত। তাদের এহেন ভ্রান্ত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল- ২ : হযরত ইবনে জারীর হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত ইহুদি এবং নাসারাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা দাবি করত যে, نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ 'আমরা হলাম আল্লাহর সন্তান ও বন্ধু মহল' আরো বলত لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى 'ইহুদি অথবা খ্রিস্টান ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' -[রূহুল মা'আনী- ৫৪/৩/৫, বাহরে মুহীত- ২৮১/৩]

শানে নুযূল- ৩ : আল্লামা আউফী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, ইহুদিরা বলে থাকত আমাদের ছোট সন্তান-সন্ততি যারা মৃত্যু বরণ করেছে, তারা আমাদের জন্য নৈকট্যে কারণ হয়ে রয়েছে। আমাদের জন্য সুপারিশ করবে আমাদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা বর্ণনা করবে। মুশরিকদের এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৪ : ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, ইহুদিরা তাদের ছোট সন্তান-সন্ততিদেরকে আগে বাড়িয়ে নামাজ তথা ইবাদত পালন করত এবং তারা ধারণা করত যে, তাদের ভ্রান্তি ও পাপ নেই। তারা মিথ্যাও বলত। আল্লাহ বলেন, এক নিষ্পাপের দ্বারা অন্য পাপীকে আমি ক্ষমা করবো না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[ইবনে কাছীর– ৫১১/১, ফাতহুল কাদীর– ৪৭৮/১]

(৫১) قوله اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াত হুয়াই বিন আখতাব, কা'আব বিন আশরাফ এবং সকল ইহুদিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের পর ইহুদিদের একটি দল মক্কা গমন করে। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাথে তারা মৈত্রি স্থাপন করবে এবং তাদের ও রাসূল ﷺ -এর মধ্যে যে আপসমূলক সন্ধি স্থাপন হয়েছিল, তা ভেঙ্গে দিবে। সে উদ্দেশ্যে কা'আব আবূ সুফিয়ানের নিকট অবস্থান গ্রহণ করে আর অন্যান্য ইহুদিরা অন্যান্য কুরাইশের বাসভবনে মেহমান হিসেবে অবস্থান করে। মক্কাবাসীরা বলল, তোমরা হলে আহলে কিতাব, মুহাম্মদও কিতাবধারী। সুতরাং বিশ্বাস করা যায় না। তোমাদের পক্ষ থেকে এটা একটি চক্রান্ত বা প্রতারণাও হতে পারে। আমরা তোমাদের সাথে যদি যেতে হয়, তাহলে তুমি এ দুটি প্রতিমাকে সেজদা কর এবং তাদের প্রতি ঈমান আন। তখন কা'আব তা-ই করল। অতঃপর কা'ব মক্কাবাসীকে লক্ষ্য করে বলল, হে মক্কাবাসীরা! তোমাদের থেকে তিনজন আস, আমরাও আমাদের থেকে তিনজন আসব এবং কাবাগৃহে নিজেদের বক্ষ লাগিয়ে আমরা কাবাগৃহের রবের সাথে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হব যে, আমরা অবশ্যই মুহাম্মদের বিপক্ষে সর্বাত্মকভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। তারা তা-ই করল। তারা যখন এ সকল কাজ থেকে অবসর হলো, তখন আবূ সুফিয়ান কা'আবকে বলল, আপনি তো কিতাব সম্পর্কে অবগত রয়েছেন এবং আপনি যা জানেন আমরা তা জানি না। আমরা এবং মুহাম্মদের মাঝে কারা সঠিক পথ প্রাপ্ত ও সত্যের অতি দ্বারপ্রান্তে? কা'আব বলল, তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে আমাকে অবগত কর। ফলে আবূ সুফিয়ান বলল, আমরা হজের উদ্দেশ্যে কুরবানি করে থাকি। হাজীদেরকে পানি পান করিয়ে থাকি। মেহমানদের আপ্যায়ন করি। বন্দীদেরকে মুক্ত করিয়ে আনি। আত্মীয়তা অক্ষুণ্ন রাখি। কাবাগৃহের তওয়াফ ও ওমরা পালন করি তদুপরি আমরা হলাম হেরেম অধিবাসী। আর মুহাম্মদ ﷺ নিজ পৈত্রিক ধর্মকে ছেড়ে দিয়েছে। আত্মীয়তা ছিন্ন করেছে। পরিত্যাগ করেছে হেরেম এবং বিচ্ছেদ করে দিয়েছে আমাদের পুরাতন সনাতন ধর্মকে। পক্ষান্তরে মুহাম্মদের ধর্ম হলো নতুন ধর্ম। তখন কা'আব বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্ম অপেক্ষা তোমরা অধিক সঠিক পথে রয়েছে। তাদের এমন কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী– ৫৫/৩/৫]

শানে নুযূল– ২ : ইমাম তাবারানী ও বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হুয়াই বিন আখতাব ও কা'আব বিন আশরাফ মক্কার কুরাইশদের নিকট গমন করল। তখন তাদেরকে মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য তারা উত্তেজিত করে তুলে। সে সময় তারা ইহুদিদেরকে জিজ্ঞেস করল যে, তোমরা তো হলে পুরাতন জ্ঞানী এবং কিতাবেরও অধিকারী। কাজেই আমরা এবং মুহাম্মদ উভয় সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করে দাও। তারা জবাবে বলল, তোমরা কে? আর মুহাম্মদ কে? তারা বলল, আমরা হজের উপলক্ষে কুরবানি করি, পানির পরিবর্তে দুধ পান করাই, দাস মুক্ত করি, হাজীদেরকে পানি পান করাই, আত্মীয়তা অক্ষুণ্ন রাখি। তখন জিজ্ঞেস করল বস্তুতঃ মুহাম্মদের ধর্মীয় বিষয়াদি কি? তারা বলল, মুহাম্মদ অত্যন্ত দুর্বল, আমাদের আত্মীয়তা ছিন্ন করে দিয়েছে। বনূ গেফারের লোকজন তার অনুসারী হয়ে গেল। তখন হুয়াই বিন আখতাব, কা'আব বিন আশরাফ বলল, তোমরাইতো অতি উত্তম ও অধিক সৎপথ প্রাপ্তির নিকটবর্তী। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর ৪৭৯/১, ইবনে কাছীর ৫১৩/১]

(৫৪) قوله اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব যারা, তারা ঈর্ষাপরায়ণভাবে বলত, মুহাম্মদের ধারণা তাকে নবুয়ত হিসেবে যা কিছু প্রদান করা হয়েছে তা তার বিনয়ের কারণে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাঁর নিকট রয়েছে নয়জন স্ত্রী। তাঁর তো অধিক স্ত্রী ভোগ ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নেই। সুতরাং তার নিকট রাজ্য অপেক্ষা আর কি উত্তম পন্থা হতে পারে? আহলে কিতাবদের এহেন ঈর্ষাপরায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী– ৫৭/৩/৫, বাহরে মুহীত– ২৮৪/৩, ফাতহুল কাদীর– ৪৭৯/১]

আল্লাহর বাণী– فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ [অর্থাৎ, তাদের ঘুরিয়ে দেব পশ্চাৎ দিকে] ঘুরিয়ে দেওয়া বা উল্টে দেওয়ার মধ্যে দু'টি সম্ভাবনাই থাকতে পারে। মুখমণ্ডলের আকার-অবয়ব মুছে দিয়ে গোটা চেহারাকে পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়ে দেওয়াও হতে পারে আবার মুখমণ্ডলকে গর্দানের মতো সমান্তরাল করে দেওয়াও হতে পারে।

অর্থাৎ, মুখমণ্ডলকে গর্দানের দিকে উল্টে না দিয়ে; বরং গর্দানের মতো পরিষ্কার ও সমান্তরাল করে দেওয়া। –[মাযহারী, রূহুল মা'আনী]

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এমন ধরনের বিকৃতি সাধনের ব্যাপারটি কবে সংঘটিত হবে? কারো কারো মতে এ আজাব কিয়ামতের প্রাক্কালে ইহুদিদের উপর অবতীর্ণ হবে। আবার কারো কারো মতে এ আজাব সংঘটিত হবার নয়। কারণ তাদের কেউ কেউ ঈমান নিয়ে এসেছিল।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (র.) বলেন, আমার মতে এ প্রশ্নই আসতে পারে না। কারণ কুরআনে এমন কোনো শব্দের উল্লেখ নেই, যাতে বুঝা যায় যে, ঈমান যদি না আন তবে অবশ্যই এ আজাব আসবে; বরং সম্ভাবনার উল্লেখ রয়েছে মাত্র। অর্থাৎ, যদি তাদের অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয় তারা এমনি আজাবের যোগ্য। যদি আজাব দেওয়া না হয়, তবে সেটা তাঁর একান্ত অনুগ্রহের ব্যাপার।

শিরকের সংজ্ঞা ও তার কয়েকটি দিক : إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে যেসব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, তেমন কোনো বিশ্বাস সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে পোষণ করাই হলো শিরক। এরই কিছু বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :

জ্ঞানের ক্ষেত্রে শরিক সাব্যস্ত করা : অর্থাৎ, ১. কোনো বুজুর্গ বা পীরের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, আমাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি সর্বদা অবহিত। ২. কোনো জ্যোতিষ-পণ্ডিতের কাছে গায়বের সংবাদ জিজ্ঞেস করা কিংবা। ৩. কোনো বুজুর্গের বাক্যে মঙ্গল দেখে তাকে অনিবার্য মনে করে নেওয়া অথবা ৪. কাউকে দূর থেকে ডাকা এবং সাথে সাথে এ কথা বিশ্বাস করা যে, সে আমার ডাক শুনে নিয়েছে অথবা ৫. কারো নামে রোজা রাখা।

ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরিক করা : অর্থাৎ কাউকে হিত কিংবা অহিত তথা ক্ষতি-বৃদ্ধি সাধনের অধিকারী মনে করা। কারো কাছে উদ্দেশ্যে যাচনা করা। কারো কাছে রুজি রোজগার বা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করা।

ইবাদতে শরিক সাব্যস্ত করা : কাউকে সেজদা করা, কারো নামে কোনো পশু মুক্ত করা, কারো নামে মানত করা, কারো কবর কিংবা বাড়ি-ঘরের তওয়াফ করা, আল্লাহ তা'আলার কোনো হুকুমের তুলনায় অপর কারো কথা কিংবা কোনো প্রথাকে প্রাধান্য দেওয়া, কারো সামনে রুকূ' করার মতো অবনত হওয়া, কারো নামে জীব কুরবানি করা, পার্থিব কাজ-কারবার কিংবা বিবর্তনকে নক্ষত্রের প্রভাব বলে বিশ্বাস করা এবং কোনো কোনো মাসকে অশুভ মনে করা প্রভৃতি।

আত্মপ্রশংসা করা এবং নিজেকে ত্রুটিমুক্ত মনে করা বৈধ নয় : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ ইহুদিরা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে বর্ণনা করত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলেছেন, তাদের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখ, যারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হওয়াই উচিত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কারো পক্ষে নিজের কিংবা অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করা জায়েজ নয়। এই নিষিদ্ধতার তিনটি কারণ রয়েছে–

১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে কিবির তথা অহমিকা বা আত্মগর্ব। কাজেই মূলত এই নিষিদ্ধতাও কিবিরেরই জন্য হয়ে থাকে।

২. দ্বিতীয়তঃ শেষ পরিণতি সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত যে, তা পবিত্রতা কিংবা পরহেজগারীর মধ্যেই হবে কি না। কাজেই নিজে নিজেকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা আল্লাহভীতির পরিপন্থি। এক রেওয়ায়েতে হযরত সালামা বিনতে যয়নব (রা.) বলেছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তখন যেহেতু আমার নাম ছিল بَرَّةُ [বাররাহ অর্থাৎ পাপমুক্ত], কাজেই আমি তাই বললাম। তাতে হুজুর ﷺ বললেন– لَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ اللّٰهُ أَعْلَمُ الْبِرَّ مِنْكُمْ অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা নিজেকে পাপমুক্ত বলে বর্ণনা করো না। কারণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র। অতঃপর বাররাহ, নামটি পাল্টে তিনি যয়নব রেখে দিলেন। –[মাযহারী]

৩. নিষিদ্ধতার তৃতীয় কারণটি হলো এই যে, অধিকাংশ সময় এ ধরনের দাবি করতে গিয়ে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে, সেলোক আল্লাহ তা'আলার দরবারে এজন্য প্রিয় যে, সে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। অথচ কথাটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কারণ মানুষের মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে। –[বয়ানুল কুরআন]

মাসআলা : যদি উল্লিখিত কারণগুলো না থাকে, তাহলে নিয়ামতের প্রকাশকল্পে নিজের গুণ বর্ণনা করার অনুমতি রয়েছে। –[বয়ানুল কুরআন]

'জিবত' ও 'তাগুত'-এর মর্ম : উল্লিখিত একান্নতম আয়াতে 'জিবত' ও 'তাগুত' শীর্ষক দু'টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। শব্দ দু'টির মর্ম সম্পর্কে তাফসীরকার মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় 'জিবত' বলা হয় জাদুকরকে। আর 'তাগুত' বলা হয় গণক বা জ্যোতিষীকে।

হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, 'জিবত' অর্থ জাদু এবং 'তাগুত' অর্থ শয়তান। হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.) বলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয়, সে সবই 'তাগুত' বলে অভিহিত হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, মালেক ইবনে আনাস (রা.)-এর উক্তিটিই অধিক পছন্দনীয়। তার কারণ, কুরআন থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে : أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [আল্লাহর ইবাদত কর এবং 'তাগুত' থেকে বেঁচে থাক।] কিন্তু উলিখিত বিভিন্ন মতের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কাজেই এর যে কোনোটিই অর্থ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে 'জিবত' প্রতিমাকেই বুঝাত, পরে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য পূজ্য বস্তুতে এর প্রয়োগ হতে আরম্ভ করে। –[রূহুল মা'আনী]

রিপুর কামনা-বাসনা অনেক সময় মানুষকে দীন ও ঈমান থেকে বঞ্চিত করে দেয় : কা'আব ইবনে আশরাফ ছিল বিশিষ্ট ইহুদি পণ্ডিত। সে আল্লাহতে বিশ্বাস পোষণ করত এবং তাঁরই ইবাদত বন্দেগী করত। কিন্তু তার মন-মস্তিষ্কে যখন রৈপিক কামনা-বাসনার পিশাচ চেপে বসল, তখন সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে প্ররোচিত হয়। কুরাইশরা তার সাথে ঐক্যজোট করার জন্য শর্ত আরোপ করল যে, তাদেরকে আমাদের দেব-দেবির সামনে সেজদা করতে হবে। সে তা মেনে নিল, যা আগেই বলা হয়েছে। সে নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে কুরাইশদের শর্ত বাস্তবায়িত করল বটে, কিন্তু স্বীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে ঠিক রাখার জন্য তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া পছন্দ করল না। কুরআনে কারীম অন্য জায়গায় বাল'আম ইবনে বাউরার ব্যাপারেও এমন ধরনের ঘটনা বিবৃত করেছে। ইরশাদ হয়েছে : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শুধু কিতাব সম্পর্কিত ইলম বা জ্ঞান থাকাটাই কল্যাণ ও মঙ্গলকর হতে পারে না, যে পর্যন্ত না যথার্থভাবে তার অনুসরণ করা হবে এবং যে পর্যন্ত না হীন পার্থিব লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণভাবে বর্জন করতে পারবে। তা না হলে মানুষ তার ধর্ম এমনকি এহেন প্রিয় বস্তুকেও স্বীয় রৈপিক কামনা-বাসনার বলিতে পরিণত করা থেকে বাঁচতে পারবে না। ইদানিংকালেও কোনো কোনো লোক এমন সত্য মতকে অতি সহজে বর্জন করে বসে এবং ধর্ম বিবর্জিত বিশ্বাস ও মতবাদকে ইসলামের ছদ্মাবরণে উপস্থিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। না তাদের মনে আল্লাহর সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কোনো পরোয়া থাকে, আর না থাকে আখেরাতের কোনো রকম ভয়-ভীতি। বস্তুতঃ সমস্ত কিছুই সত্য সঠিক মতবাদকে বর্জন করে শয়তানের ইঙ্গিতে চলার পরিণতি।

তাফসীকারগণ লিখেছেন, বালআম-বাউরা একজন বিশিষ্ট ইহুদি আলেম ও উচ্চ স্তরের দরবেশ ছিল। কিন্তু যখন সে নিজের রৈপিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে অশুভ চক্রান্ত করতে আরম্ভ করল, তখন হযরত মূসা (আ.)-এর কোনোই ক্ষতি হলো না। কিন্তু সে নিজে গোমরাহ হয়ে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হলো।

আল্লাহর অভিসম্পাত ইহ ও পরকালীন অপমানের কারণ : লা'নত বা অভিসম্পাত অর্থ হলো আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে দূরে সরে পড়া-চরম অপমান-অপদস্থতা। যার উপর আল্লাহর লা'নত পতিত হয় সে কখনো আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে অতি কঠিন ভর্ৎসনার কথা বলা হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا

অর্থাৎ যাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হয়েছে, তারা যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই নিহত অথবা ধৃত হবে। এই তো গেল তাদের পার্থিব অপমান। আখেরাতে তাদের অপমান এর চেয়েও কঠিন হবে।

আল্লাহর লা'নতের অধিকারী কারা : وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا; আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, যার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়, তার কোনো সাহায্যকারী থাকে না। এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, আল্লাহর লা'নতের যোগ্য কারা?

এক হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম ﷺ সুদগ্রহীতা এবং সুদদাতা, সুদ সংক্রান্ত দলিল সম্পাদনকারী এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষী সবার প্রতিই অভিসম্পাত করেছেন। এদের সবাই পাপের ক্ষেত্রে সমান।-[সহীহ মুসলিম]

অন্য এক হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে লোক হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হবে সে অভিশপ্ত হবে।"

অতঃপর তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা চোরদের প্রতিও অভিসম্পাত করেন। যে ডিম কিংবা রশির মতো সাধারণ বস্তুও চুরি থেকে বিরত থাকে না, তারও হস্তকর্তন করা হয়। -[মিশকাত, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে]

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে 'সুদগ্রহীতা ও দাতার উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত এবং সে সমস্ত নারীর উপর যারা নিজের শরীরে উল্কি আঁকে, যে অন্যের শরীরেও উল্কি এঁকে দেয়, তেমনিভাবে চিত্রকরের উপরও আল্লাহর লা'নত।'

অপর এক হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন মদ্যপায়ীর প্রতি, মদ যে ব্যক্তি পান করায় তার প্রতি, তার বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রতি, যে মদের জন্য নির্যাস বের করে তার প্রতি এবং যারা মদ বহন করে তাদের সবার প্রতি। -[মিশকাত, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে]

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- ছয় প্রকার লোক রয়েছে যাদের প্রতি আমি অভিসম্পাত করেছি এবং আল্লাহ তা'আলাও লা'নত করেছেন। আর প্রত্যেক নবীই মুস্তাজাবুদদআ'ওয়াত হয়ে থাকেন। সে ছয় প্রকার লোক নিম্নরূপ :

১. আল্লাহর কিতাবে যারা কাট-ছাঁট করে,
২. যারা বলপূর্বক ক্ষমতা লাভ করে এবং এমন সব লোককে সম্মানে ভূষিত করে, যাদেরকে আল্লাহ অপদস্থ করেছেন আর এমন লোককে অপমানিত করে যাদেরকে আল্লাহ সম্মান দান করেছেন।
৩. যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর বা নিয়তিকে অবিশ্বাস করে।
৪. যারা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুসামগ্রীকে হালাল মনে করে।
৫. বিশেষত আমার বংশধরগণের মধ্যে সে সমস্ত লোক যারা হারামকে হালাল করে নেয় এবং
৬. যে লোক আমার সুন্নতকে বর্জন করে। -[বায়হাকী]

মাসআলা : নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যদি সে ফাসেকও হয়ে থাকে, যে পর্যন্ত একথা নিশ্চিতভাবে জানা না যায় যে, তার মৃত্যু কুফরি অবস্থায় হয়েছে, সে পর্যন্ত তার উপর লা'নত করা জায়েজ নয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই আল্লামা শামী এযিদের উপর লা'নত করতে বারণ করেছেন। তবে কুফরি অবস্থায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত জানা থাকলে তার উপর লা'নত করা জায়েজ। যেমন, আবূ জাহল, আবূ লাহাব প্রভৃতি। -[শামী- ২ : ৮৩৬]

মাসআলা : কারো নাম না করে এভাবে লা'নত করা জায়েজ যে, জালেমদের উপর কিংবা মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।

মাসআলা : লা'নতের আভিধানিক অর্থ আল্লাহর রহমত হতে দূর হয়ে যাওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ কাফেরদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে, রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর মুমিনদের ক্ষেত্রে হলে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী [সৎকর্মশীলদের] মর্যাদা থেকে নিচে পড়ে যাওয়া। সে জন্যই কোনো মুসলমানের জন্য তার নেক আমল কমে যাওয়ার দোয়া করা জায়েজ নয়। -[কাহতানী থেকে শামী কর্তৃক উদ্ধৃত : ২ : ৮৩৬]

ইহুদিদের হিংসা ও তার কঠোর নিন্দা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম ﷺ -কে যে জ্ঞানৈশ্বর্য ও শান-শওকত দান করেছিলেন, তা দেখে ইহুদিরা হিংসার অনলে জ্বলে মরত। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য ৫০ ও ৫৪ নং আয়াতে ওদের হিংসা-বিদ্বেষের কঠোর নিন্দা করেছেন এবং তাদের বিদ্বেষকে একান্ত অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে তার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি কারণ ব্যক্ত হয়েছে ৫৩তম আয়াতে এবং দ্বিতীয় কারণটি ৫৪তম আয়াতে। কিন্তু এ দু'টির মর্ম মূলতঃ একই। তা হলো এই যে, আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের এই হিংসা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ-এর কারণটা কি? যদি এ কারণে

হয়ে থাকে যে, তোমরাই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী অথচ তা তোমাদের হাতে না এসে তিনি পেয়ে গেছেন, তাহলে তোমাদের এ ধারণা যে একান্তই ভ্রান্ত তা সুস্পষ্ট। কারণ এখন তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তোমরা যদি তা থেকে কোনো অংশ প্রাপ্ত হতে, তাহলে তোমরা তো অন্য কাউকে একটি কড়িও দিতে না। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের এ বিদ্বেষ এ কারণে হয়ে থাকে যে, রাজক্ষমতা না হয় আমরা না-ই পেলাম, কিন্তু তাঁর হাতে কেন যাবে? রাষ্ট্রের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক। তাহলে তার উত্তর হলো এই যে, ইনিও নবীগণেরই বংশধর, যাঁদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পূর্ব থেকেই ছিল। কাজেই রাষ্ট্র কোনো অপাত্রে অর্পিত হয়নি। অতএব, তোমাদের ঈর্ষা একান্তভাবেই অযৌক্তিক।

ঈর্ষার সংজ্ঞা ও তার বিধান এবং অপকারিতাসমূহ : সহীহ্ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা নববী (র.) হাসাদ বা ঈর্ষার সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বলেছেন–

'অন্যের প্রাপ্ত নিয়ামতের অপসারণ কামনা করার নামই হলো হাসাদ বা ঈর্ষা। আর এটি সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

"তোমরা পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না; বরং আল্লাহর বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোনো মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তিন দিনের বেশি সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েজ নয়।" –[সহীহ মুসলিম– : ২]

"তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক। কারণ হিংসা মানুষের সৎকর্মসমূহকে তেমনিভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন করে আগুন খেয়ে ফেলে কাঠকে।" –[সুনানে আবূ দাউদ]

শব্দের বিশ্লেষণ :

إِثْمًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন آثَامٌ অর্থ– পাপ

يَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা মিথ্যাচার করে, অপবাদ দেয়।

يَلْعَنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَللَّعْنُ মূলবর্ণ (ل . ع . ن) জিনস صحيح অর্থ– সে অভিসম্পাত করে।

نَقِيْرًا : খেজুর বিচির উপরের আবরণ অর্থাৎ সামান্য জিনিস।

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾

অনুবাদ : (৫৫) অনন্তর তাদের কেউ কেউ তো তার প্রতি ঈমান আনল, আর কেউ কেউ এমনও ছিল যে, তা হতে বিমুখ রইল, এবং দোজখের জ্বলন্ত অগ্নি [-র শাস্তি তাদের জন্য] যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾

(৫৬) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, আমি সত্বরই তাদেরকে এক ভীষণ অগ্নিতে দাখিল করব, যখনই একবার তাদের চর্ম জ্বলে যাবে তৎক্ষণাৎই আমি তাদের পূর্ব-চর্মের স্থলে অন্য চর্ম সৃষ্টি করে দিব যেন তারা আজাবই ভুগতে থাকে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٧﴾

(৫৭) আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আমি সত্বরই তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করব যার নিম্নে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে, তাদের জন্য তাতে পাক-ছাফ বিবিগণ থাকবে এবং আমি তাদেরকে অত্যন্ত ঘন ছায়ায় দাখিল করব।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

(৫৮) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই বিষয়ে আদেশ করছেন যে, হকদারকে তাদের হক পৌঁছে দাও, আর যখন জনগণের মীমাংসা কর তখন ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন তা অতি উত্তম, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পূর্ণরূপে শুনেন, পূর্ণরূপে দেখেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৫) فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ অনন্তর তাদের কেউ কেউ তো তার প্রতি ঈমান আনল وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ আর কেউ কেউ এমনও ছিল যে, তা হতে বিমুখ রইল। وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا এবং দোজখের জ্বলন্ত অগ্নি [-র শাস্তি তাদের জন্য] যথেষ্ট।

(৫৬) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا আমি সত্বরই তাদেরকে এক ভীষণ অগ্নিতে দাখিল করব كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ যখনই একবার তাদের চর্ম জ্বলে যাবে بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا তৎক্ষণাৎই আমি তাদের পূর্ব-চর্মের স্থলে অন্য চর্ম সৃষ্টি করে দিব لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ যেন তারা আজাবই ভুগতে থাকে। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৫৭) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে سَنُدْخِلُهُمْ আমি সত্বরই তাদেরকে দাখিল করব جَنّٰتٍ এমন উদ্যানসমূহে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নে নহরসমূহ বইতে থাকবে। خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ তাদের জন্য তাতে পাক-ছাফ বিবিগণ থাকবে وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا এবং আমি তাদেরকে অত্যন্ত ঘন ছায়ায় দাখিল করব।

(৫৮) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই বিষয়ে আদেশ করছেন যে اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا হকদারকে তাদের হক পৌঁছে দাও وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ আর যখন জনগণের মীমাংসা কর اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ তখন ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করবে اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন তা অতি উত্তম اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পূর্ণরূপে শুনেন, পূর্ণরূপে দেখেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩

অনুবাদ : (৫৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা উপরস্থ তাদেরও, অনন্তর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে পরস্পর দ্বিমত হও, তবে ঐ বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর হাওয়ালা করে দাও, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখ, এই বিষয়গুলো উত্তম এবং তার পরিণামও খুব ভালো।

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ۝٦٠

(৬০) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা দাবি করে যে, তারা ঐ কিতাবের প্রতিও ঈমান রাখে, যা আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা আপনার পূর্বে নাজিল করা হয়েছে, এই অবস্থায় তারা নিজেদের মকদ্দমাগুলো শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে এই আদেশ করা হয়েছে, যেন তাকে না মানে, আর শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়।

শাব্দিক অনুবাদ

(৫৯) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ হে ঈমানদারগণ! أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ এবং তোমাদের মধ্যে যারা উপরস্থ তাদেরও فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ অনন্তর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে পরস্পর দ্বিমত হও فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ তবে ঐ বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর হাওয়ালা করে দাও إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا এই বিষয়গুলো উত্তম এবং তার পরিণামও খুব ভালো।

(৬০) أَلَمْ تَرَ আপনি কি লক্ষ্য করেননি إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ তাদের প্রতি যারা দাবি করে যে أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ তারা ঐ কিতাবের প্রতিও ঈমান রাখে, যা আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা আপনার পূর্বে নাজিল করা হয়েছে يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ এই অবস্থায় তারা নিজেদের মকদ্দমাগুলো শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায় وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ অথচ তাদেরকে এই আদেশ করা হয়েছে أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ যেন তাকে না মানে وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ আর শয়তান চায় أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে যেতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৫৮) قوله إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির ও ইবনে আসাকির (র.) ইবনে জুরাইজ হতে বর্ণনা করেন যে, উসমান বিন তালহা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূল ﷺ যখন তার নিকট হতে কা'বা গৃহের চাবি নিলেন। তখন এ চাবি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ নিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। সুতরাং রাসূল ﷺ তাকে ডেকে এনে তার নিকট চাবি বুঝিয়ে দেন। ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়কালে উসমান বিন তালহা -এর নিকট থেকে যখন কা'বা গৃহের চাবি নিয়ে নেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তা ফিরিয়ে দেওয়ার হুকুম নিয়ে অবতরণ করেন। ফলে রাসূল ﷺ উসমান বিন তালহাকে ডেকে চাবি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন। –[ফাতহুল কাদীর– ৪৮০/১]

শানে নুযূল– ২ : আবূ তুলাইহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, যাদের হাতে কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এই মর্মে তারা যেন নিজেদের অধীনস্থদের সকল প্রকারের অধিকার ও হক যথাযথভাবে আদায় করে যান। –[বাহরে মুহীত– ২৮৯/৩]

(৫৯) قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর ও ইবনে আবূ হাতেম সুদ্দী হতে এবং ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী দিয়ে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। সে বাহিনীতে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)ও ছিলেন, সুতরাং তারা যে গোত্রকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন, সে দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তারা যখন সে গোত্রের সন্নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন গোয়েন্দো এসে তাদেরকে খবর করে দিল, ফলে তারা পালিয়ে গেল, রয়ে গেল তাদের মধ্য থেকে শুধু একজন মানুষ। অতঃপর সে অন্ধকার রাতে খালেদ বাহিনীর নিকট এসে হযরত আম্মার (রা.)-এর সাথে দেখা করে। তখন সে তাঁকে বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই,হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমার গোত্রবাসী আপনাদের কথা শুনতে পেয়েই তারা পালিয়ে গিয়েছে। আমি কেবল রয়েছি। আমার ইসলাম গ্রহণ কি আগামী কাল উপকারজনক হবে নুতবা আমি পালিয়ে যাব? হযরত আম্মার বললেন, তা তোমার জন্য উপকারজনক হবে। কাজেই তুমি থেকে যাও সুতরাং সে থেকে গেল। অতঃপর যখন প্রভাত হলো, তখন খালেদ (রা.) অভিযান চালালেন। তখন একটি মানুষ ছাড়া আর কাউকেই পেলেন না। কাজেই তাকে তার মালামালসহ বন্দী করে নিয়ে এলেন। অতঃপর হযরত আম্মার (রা.)-এর নিকট খবর পৌঁছতেই তিনি হযরত খালেদ (রা.)-এর নিকট এসে বললেন, তাকে ছেড়ে দিন, সে ইসলাম গ্রহণ করে আমার নিরাপত্তায় রয়েছে. খালেদ (রা.) বললেন তুমি কিরূপে আমান দাও? ফলে উভয়ের মাঝে কথা কাটাকাটি হয়। অতঃপর উভয়ই রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। রাসূল ﷺ হযরত আম্মার (রা.)-এর দেওয়া নিরাপত্তা অনুমোদন করলেন। আমীরের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বার এ ধরনের নিরাপত্তা দান করতে তাকে নিষেধ করেন। এ দিকে তারা রাসূল ﷺ-এর নিকটেই কথা কাটাকাটি করেন। হযরত খালেদ (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে আমাকে গালা-গালি করেছে, তাকে কি এমনিতে ছেড়ে দেওয়া যায়? তখন রাসূল ﷺ বললেন, হে খালেদ! আম্মারকে গালি দিবে না, কারণ যে আম্মারকে গালি দিবে আল্লাহ তা'আলা তাকে গালি দিবেন। যে আম্মারের প্রতি ক্রোধান্বিত হবে, তার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করবেন। তৎক্ষণাৎ হযরত আম্মারও দাঁড়িয়ে গেলেন, অপর দিকে হযরত খালেদও দাঁড়িয়ে সংশোধিত হবার পর রাসূল ﷺ সন্তুষ্ট হলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী– ৬৫/৩/৫, ইবনে কাছীর– ৫১৮/১]

শানে নুযূল– ২ : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা বিন কায়স বিন আদী সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ তাকে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। তখন রাসূল ﷺ সকলকে হুকুম করেছিলেন, সকলেই যেন আমীরের আনুগত্য করে। কোনো কারণবশতঃ আব্দুল্লাহ বিন হুযায়ফা সকলের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে সকল সাথীকে বললেন যে, তোমরা কাষ্ঠ সংগ্রহ করে জমায়েত করে তাতে অগ্নি প্রজ্বলন কর। তারা সকলে তা-ই করল। অতঃপর তিনি বললেন যে, রাসূল ﷺ আমীরের আনুগত্য করার কথা বলেনি? সকলেই জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তখন আব্দুল্লাহ বিন হুযায়ফা (রা.) বললেন যে, তোমরা তাতে ঝাপ দিয়ে পড়। তাঁরা সকলেই পরামর্শ করে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ-এর দরবারে এ সম্পর্কে আলোচনা করলে, তিনি বললেন, তোমরা যদি অগ্নিতে ঝাপ দিতে, তাহলে চিরকাল সেখানেই থাকতে সে সময় আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৪৮১/১, সহীহ বুখারী]

৬০. قوله اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** সা'লাবী ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিশর নামক এক মুনাফিক এক ইহুদির সাথে ফয়সালা করার জন্য নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে যেতে বলল, কিন্তু মুনাফিক কা'আব বিন আশরাফের নিকট বিষয়টি নিয়ে যেতে ইচ্ছা করল। পরক্ষণে উভয়ে মিলে মহানবী ﷺ-এর দরবারেই বিষয়টি উত্থাপন করল। রাসূল ﷺ সর্বদিক বিবেচনা করে ইহুদির পক্ষে ফয়সালা দিলেন। মুনাফিক ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট হতে পারল না বিধায় সে বলল, চল এ বিষয়টি নিয়ে ওমর বিন খাত্তাবের শরণাপন্ন হই। তখন ইহুদি ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট ঘটনার বিবরণ বর্ণনা করে বলল যে, রাসূল ﷺ আমার পক্ষে ফয়সালা দিয়েছিলেন কিন্তু সে তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা নিজ স্থানে অবস্থান কর, আমি আসছি। তিনি ঘরে প্রবেশ করে তরবারি নিয়ে মুনাফিকের মাথা উড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ

ও তদ্বীয় রাসূল ﷺ-এর ফয়সালাতে যারা পরিতৃপ্ত হবে না, তাদের পরিণতি এমনভাবে হওয়া উচিত। তখন, সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। সেদিন রাসূল ﷺ বললেন, হে ওমর! তুমি হলে সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী। –[রুহুল মা'আনী ৬৭/৩/৫, কুরতুবী– ২৫৪/৪, বাহরে মুহীত : ২৯২/৩]

সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারগণ এতদসঙ্গে একথাও লিখেছেন যে, এপরপর নিহত মুনাফিকের ওয়ারিশরা হযরত ওমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছিল যে, তিনি শরিয়তসিদ্ধ কোনো দলিল ছাড়াই একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। তদুপরি নিহত লোকটিকে মুসলমান বলে প্রমাণ করার জন্য তার কথা ও কার্যগত কুফরির বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপনা করল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য এবং নিহত ব্যক্তির মুনাফিক হওয়ার কথা প্রকাশ করে হযরত ওমর (রা.) কে মুক্ত করে দিয়েছেন।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে জারীর ও সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেন, বনূ কুরাইযা এবং বনূ নযিরের ইহুদিদের থেকে কতজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন আর কতজন মুনাফিক হয়েছে। তাদের পরস্পরের হত্যা সংঘটিত বিষয়ে একটি মোকদ্দমা ছিল, মুনাফিক যারা ছিল তারা আবূ বারযা আসলামী ছাড়া অন্য কারোর নিকট যাওয়াকে মেনে নিতে রাজি হলো না। কাজেই তারা তার নিকট গিয়ে সমাধান যখন চায় তখন সে বলল, অর্থ দাও, তখন তারা বলল আপনাকে দশ وَسْقٌ প্রদান করা হবে। সে বলল আমাকে একশত وَسْقٌ দিতে হবে। তারা দশ وَسْقٌ এর অধিক দিতে অসম্মতি প্রকাশ করল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী– ৬৮/৩/৫]

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত মু'আয (রা.) বলেছেন যে, তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন সেগুলো পাল্টে দেওয়া হবে এবং এ কাজটি এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে। আর হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন,

"আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজার বার খাবে। যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে, অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা পূর্ববাস্থায় ফিরে যাও। সাথে সাথে সেগুলো পূর্বের মতো হয়ে যাবে। –[মাযহারী : ২]

আমানত পরিশোধের তাকিদ : বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যার দায়িত্বে কোনো আমানত থাকবে, সে আমানত প্রাপককে পৌঁছে দেওয়া তার একান্ত কর্তব্য। রাসূলে কারীম ﷺ আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ প্রদান করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, এমন খুব কম হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ কোনো ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি– لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার ধর্ম নেই।" –[শো'আবুল ঈমান]

খেয়ানত মুনাফিকের লক্ষণ : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মুনাফেকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোনো আমনাত রাখা হয় তখন সে তাতে খেয়ানত করে।

আমানতের প্রকারভেদ : এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআনে কারীম আমানতের বিষয়টিকে أَمَانَاتٌ বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, কারো নিকট অপর কারো কোনো বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধুমাত্র 'আমানত' নয়; যাকে সাধারণত আমানত বলে অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয়; বরং আমানতের আরো কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে এখনই যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কোনো বস্তুগত আমানত ছিল না। কারণ বায়তুল্লাহর চাবি বিশেষ কোনো বস্তু নয়; বরং তা ছিল বায়তুল্লাহর খেদমতের একটা পদের নিদর্শন।

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাসমূহ আল্লাহ তা'আলার আমানত : এতে প্রতীয়মান হয়, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ তা'আলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সে সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোনো পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েজ নয়, যে লোক তার যোগ্য নয়; বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

কোনো পদে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগকর্তা অভিসম্পাতযোগ্য : যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোনো লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যাকে সাধারণ মুসলমানের কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি কাউকে তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়াই একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের কারণে কোনো পদে নিয়োগ প্রদান

করে, তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত হবে। না তার ফরজ [ইবাদত] কবুল হবে, না নফল। এমন কি সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। قال الهيثمي في مجمع الزوائد : وفيه رجل لم يسم وهو شيخ من قريش أسناده بقية بن الوليد وتلميذ رحمه من حيوة مسند احمد رقم الحديث - ١ مسند ابي بكر رضي - [মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ৩২৫, মুসনাদে আহমদ]

ন্যায়বিচার বিশ্ব-শান্তির জামিন : আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে আমানত পরিশোধের এবং দ্বিতীয় বাক্যে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে আমানত পরিশোধের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এর অবর্তমানে কোথাও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। কাজেই যাদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা থাকবে, তাদেরকে প্রথমে গচ্ছিত এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অর্থাৎ সরকারি পদসমূহে সেসব লোককেই নিয়োগ করতে হবে যাদেরকে সর্বাধিক যোগ্য বলে মনে করবে। কোনো প্রকার স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোনো সুপারিশ অথবা ঘুষ উৎকোচ যেন কোনোক্রমেই প্রশ্রয় পেতে না পারে। অন্যথায় এর ফলে অযোগ্য, অথর্ব, আত্মসাৎকারী ও অত্যাচারী লোক সরকারি পদের অধিকারী হয়ে আসবে। অতঃপর শাসকবর্গ যদি একান্তভাবেও দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কামনা করেন, তবুও তাদের পক্ষে সে লক্ষ্য অর্জন কোনো অবস্থাতেই সম্ভবপর হবে না। কারণ এসব সরকারি কর্মচারীই হলো সমগ্র রাষ্ট্রের হাত-পা। এরাই যখন অন্যায় ও আত্মসাৎকারী হবে, তখন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার আর কি উপায় থাকবে।

এ আয়াতে বিশেষভাবে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, এতে মহান আল্লাহ সরকারি পদসমূহকেও আমানত বলে সাব্যস্ত করে প্রথমেই একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমানত যেমন শুধুমাত্র তাদেরকে প্রত্যার্পণ করতে হয় যারা তার প্রকৃত মালিক, কোনো ফকির মিসকিনকে কারো আমানত দয়াপরবশ হয়ে দিয়ে দেওয়া কিংবা কোনো আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধবের প্রাপ্য হক আদায় করতে গিয়ে অন্য কারো আমানত তাদেরকে দিয়ে দেওয়া জায়েজ নয়। তেমনিভাবে সরকারি পদ যার সাথে সর্বসাধারণের অধিকার জড়িত, তাও আমানতের অন্তর্ভুক্ত এবং একমাত্র সে সমস্ত লোকই এসব আমানতের অধিকারী, যারা নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে এসব পদের জন্য উপযোগী এবং উপস্থিত লোকদের মধ্যে উত্তম। আর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর দিক দিয়ে যারা অন্যান্যদের তুলনায় অগ্রগণ্য। এদের ছাড়া অন্য কাউকে এসব পদ অর্পণ করা হলে আমানতের মর্যাদা রক্ষিত হবে না।

এলাকার ভিত্তিতে সরকারি পদ বণ্টন : এতদসঙ্গে কুরআনে হাকীমে উল্লিখিত বাক্যের দ্বারা সেই সাধারণ ভুলেরও অপনোদন করে দিয়েছে, যা অধিকাংশ দেশের সংবিধানে প্রচলিত রয়েছে যে, সরকারি পদসমূহকে দেশের অধিবাসীবৃন্দের হক বা অধিকার বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বস্তুতঃ এই মূলনীতিগত ভুলের ভিত্তিতে আইন রচনা করতে হয়েছে যে, সরকারি পদসমূহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে। দেশের প্রত্যেক প্রদেশ বা জেলার জন্য পৃথক পৃথক কোটা নির্ধারিত থাকবে। এক এলাকার কোটায় অপর এলাকার লোক নিয়োগ করা যাবে না, তা প্রার্থী যতই যোগ্য হোক না কেন। পক্ষান্তরে নির্ধারিত এলাকার প্রার্থী যতই অযোগ্য ও অকর্মন্য হোক না কেন, তাকেই নিয়োগ করতে হবে। কুরআনে হাকীম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এসব পদ কারোরই ব্যক্তিগত বা এলাকাগত অধিকার নয়; বরং এগুলো হলো রাষ্ট্রীয় আমানত, যা শুধুমাত্র এর যোগ্য প্রাপককেই অর্পণ করা যেতে পারে, তা সে যে কোনো এলাকারই হোক। অবশ্য কোনো বিশেষ এলাকা বা প্রদেশের শাসনকল্পে সে এলাকার মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে, যাতে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত থাকবে। কিন্তু তাতে শর্ত হলো এই যে, কাজের যোগ্যতা এবং আমানতদারীর ব্যাপারে তার উপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে।

সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মূলনীতি : এভাবে এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক নীতির আলোচনাও এসে গেছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. প্রথমতঃ আয়াতের প্রথম বাক্য إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ এর দ্বারা আরম্ভ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ তা'আলা। পৃথিবীর শাসকবর্গ তাঁর আজ্ঞাবহ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই।

২. দ্বিতীয়তঃ সরকারি পদসমূহ দেশের অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখ্যার হারে বণ্টন করা যেতে পারে; বরং এগুলো হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত আমানত, যা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ লোককেই দেওয়া যেতে পারে।

৩. তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে সে সমস্ত নীতিমালার অনুসরণে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেওয়া হয়েছে।

৪. চতুর্থতঃ তাদের নিকট যখন কোনো মকদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমনকি ধর্ম ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দেওয়া শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফরজ।

এ আয়াতে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে এসব মূলনীতি বর্ণনার পর ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। কারণ আল্লাহ তা'আলা সবার ফরিয়াদই শোনেন এবং যে লোক বলার কিংবা ফরিয়াদ করার সামর্থ্য রাখে না, তিনি তার অবস্থাও উত্তমভাবে দেখেন। অতএব, তাঁর রচিত নীতিমালাই সর্বদা সকল রাষ্ট্রের জন্য সর্বযুগে উপযোগী হতে পারে। পক্ষান্তরে মানবরচিত নীতিমালা ও সংবিধান শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রথম আয়াতের লক্ষ্য যেমন শাসনকর্তৃপক্ষ ছিল, তেমনি দ্বিতীয় আয়াতে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, রাসূল এবং তোমাদের সচেতন নেতৃবর্গের অনুসরণ কর।

'উলিল আমর' কাকে বলা হয় :

'উলিল আমর' আভিধানিক অর্থে সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোনো বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ ও হাসান বসরী (র.) প্রমুখ মুফাসসিরগণ ওলামা ও ফোকাহা সম্প্রদায়কে 'উলিল আমর' সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরাই হচ্ছেন মহানবী ﷺ-এর নায়েব বা প্রতিনিধি। তাঁদের হাতেই দীনি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত।

মুফাসসিরীনের অপর এক জামাত যাদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন– বলছেন যে, 'উলিল আমর'-এর অর্থ হচ্ছে সে সমস্ত লোক যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত।

এছাড়া তাফসীরে ইবনে কাছীর এবং তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা [ওলামা ও শাসক] উভয় শ্রেণিকেই বুঝায়। কারণ নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত।

طاغوت শব্দের অর্থ ঔদ্ধত প্রকাশকারী। আর প্রচলিত অর্থে 'তাগুত' বলা হয় শয়তানকে। এ আয়াতে বিরোধীয় বিষয়টিকে কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট নিয়ে যাওয়াকে শয়তানের নিকট নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, কা'ব নিজেই ছিল এক শয়তান। কিংবা এ কারণে যে, শরিয়তের ফয়সালা বর্জন করে শরিয়ত বিরোধী মীমাংসার দিকে ধাবিত হওয়া শয়তানেরই শিক্ষা হতে পারে। বস্তুতঃ যে লোক সে শিক্ষার অনুসরণ করেছে সে শয়তানেরই নিকট যেন নিজের মকদ্দমা নিয়ে গেছে। সেজন্য আয়াতের শেষাংশে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, যে লোক শয়তানের অনুসরণ করবে, শয়তান তাকে পথভ্রষ্টতার সুদূর প্রান্তে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদের সময় রাসূলে কারীম ﷺ কৃত মীমাংসাকে অমান্য করা কোনো মুসলমানের কাজ হতে পারে না। যে কেউ এমন কাজ করবে, সে মুনাফিক ছাড়া আর কিছু নয়। আর যখন সে মুনাফিকের কাফের হওয়া কার্যতঃ এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, সে মহানবী ﷺ-এর মীমাংসায় সম্মত হয়নি, তখন হযরত ফারূকে আজম কর্তৃক তাকে হত্যা করাও বৈধ হয়ে যায়। কারণ তখন আর সে মুনাফিক থাকেনি; বরং প্রকাশ্য মুরতাদ হয়ে যায়। কাজেই বলা হয়েছে– এরা এমন লোক, যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে নির্দেশের প্রতি চলে এসো, যা আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন এবং চলে এসো তাঁর রাসূলের দিকে, তখন এসব মুনাফিক আপনার দিকে আসতে অনীহা প্রকাশ করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

- نُصْلِي : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصْلَاءُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমরা প্রবেশ করাব।
- نَضِجَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّضْجُ মূলবর্ণ (ن ـ ض ـ ج) জিনস صحيح অর্থ– সে দগ্ধ হলো।
- جُلُوْدٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন جِلْدٌ অর্থ– চামড়া।
- تَنَازَعْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّنَازُعُ মূলবর্ণ (ن ـ ز ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা মতবিরোধ করেছ।
- يَزْعُمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلزَّعْمُ মূলবর্ণ (ز ـ ع ـ م) জিনস صحيح অর্থ– তারা মনে করে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾

অনুবাদ : (৬১) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আস এই হুকুমের দিকে যা আল্লাহ নাজিল করেছেন এবং [আস] তাঁর রাসূলের দিকে, তখন আপনি মুনাফিকদের এই অবস্থা দেখবেন যে, তারা আপনার নিকট আসতে বিরত থাকছে।

فَكَيْفَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّاۤ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾

(৬২) অনন্তর কি দশা হবে, যখন তাদের উপর কোনো বিপদ উপনীত হয়, তাদের ঐ কর্মের দরুন যা কিছু তারা পূর্বে করেছিল, অতঃপর আপনার নিকট আসে আল্লাহর নামে শপথ করে– এতদ্ভিন্ন আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না যে, [উভয় দলের মধ্যে] কোনো কল্যাণ [-এর পন্থা] বের হয় এবং পরস্পর মিলন হয়ে যায়।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾

(৬৩) এরা ঐ সকল লোক আল্লাহ অবগত আছেন যা কিছু তাদের অন্তরে আছে, সুতরাং আপনি তাদের [ত্রুটির] প্রতি লক্ষ্য করবেন না এবং তাদেরকে সদুপদেশ দিতে থাকুন। আর তাদেরকে বিশেষ করে তাদের নিজেদের [সংশোধন] সম্বন্ধে যথোপযোগী বাণী বলে দিন।

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ

(৬৪) আর আমি পয়গম্বরগণকে বিশেষ করে এই জন্যই প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর আদেশে তাঁদের আনুগত্য করা হয়, আর যদি তারা নিজেদের ক্ষতি সাধনের পর আপনার নিকট উপস্থিত হতো এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত

শাব্দিক অনুবাদ

(৬১) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন তাদেরকে বলা হয় تَعَالَوْا আস اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ এই হুকুমের দিকে যা আল্লাহ নাজিল করেছেন وَاِلَى الرَّسُوْلِ এবং [আস] তাঁর রাসূলের দিকে رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ তখন আপনি মুনাফিকদের এই অবস্থা দেখবেন যে يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا তারা আপনার নিকট আসতে বিরত থাকছে।

(৬২) فَكَيْفَ অনন্তর কি দশা হবে اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ যখন তাদের উপর কোনো বিপদ উপনীত হয় بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ তাদের ঐ কর্মের দরুন যা কিছু তারা পূর্বে করেছিল ثُمَّ جَآءُوْكَ অতঃপর আপনার নিকট আসে يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ আল্লাহর নামে শপথ করে– اِنْ اَرَدْنَاۤ এতদ্ভিন্ন আমাদের জন্য অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না যে, اِلَّاۤ اِحْسَانًا কোনো কল্যাণ [-এর পন্থা] বের হয় وَّتَوْفِيْقًا এবং পরস্পর মিলন হয়ে যায়।

(৬৩) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ এরা ঐ সকল লোক يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ আল্লাহ অবগত আছেন যা কিছু তাদের অন্তরে আছে فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ সুতরাং আপনি তাদের [ত্রুটির] প্রতি লক্ষ্য করবেন না وَعِظْهُمْ এবং তাদেরকে সদুপদেশ দিতে থাকুন وَقُلْ لَّهُمْ আর তাদেরকে বলে দিন فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ বিশেষ করে তাদের নিজেদের [সংশোধন] সম্বন্ধে قَوْلًاۢ بَلِيْغًا যথোপযোগী বাণী

(৬৪) وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ আর আমি পয়গম্বরগণকে বিশেষ করে এই জন্যই প্রেরণ করেছি اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ যেন আল্লাহর আদেশে তাঁদের আনুগত্য করা হয় وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ আর যদি তারা নিজেদের ক্ষতি সাধনের পর جَآءُوْكَ আপনার নিকট উপস্থিত হতো فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾

অনুবাদ : এবং রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা চাইতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

(৬৫) অতএব, আপনার পরওয়ারদেগারের শপথ! এরা ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না তাদের মধ্যে যে-সব ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হয়, তার মীমাংসা আপনার দ্বারা করিয়ে নেয়, অতঃপর আপনার এই মীমাংসায় তারা নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং পুরোপুরি মেনে নেয়।

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ۗ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٦﴾

(৬৬) আর যদি আমি মানুষের প্রতি ফরজ করে দিতাম যে, তোমরা আত্মহত্যা কর কিংবা স্বীয় দেশ হতে বের হয়ে যাও, তবে অল্প কয়েকজন ব্যতীত এই আদেশ কেউই পালন করত না, আর যদি তারা তাদেরকে যেরূপ উপদেশ দেওয়া হয়, তদনুযায়ী আমল করত, তবে তাদের জন্য উত্তম হতো এবং ঈমানে অধিকতর দৃঢ়কারী হতো।

وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٧﴾

(৬৭) আর এই অবস্থায় আমি তাদেরকে বিশেষ করে নিজ সন্নিধান হতে মহা পুরস্কার প্রদান করতাম।

وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾

(৬৮) এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ এবং রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা চাইতেন لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী, করুণাময় পেত।

(৬৫) فَلَا وَرَبِّكَ অতএব, আপনার পরওয়ারদেগারের শপথ! لَا يُؤْمِنُوْنَ এরা ঈমানদার হবে না حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ যে পর্যন্ত না তার মীমাংসা আপনার দ্বারা করিয়ে নেয় فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ তাদের মধ্যে যে-সব ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হয় ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا অতঃপর তারা নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ সংকীর্ণতা বোধ না করে مِّمَّا قَضَيْتَ আপনার এই মীমাংসায় وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا এবং পুরোপুরি মেনে নেয়।

(৬৬) وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ আর যদি আমি মানুষের প্রতি ফরজ করে দিতাম যে اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ তোমরা আত্মহত্যা কর اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ কিংবা স্বীয় দেশ হতে বের হয়ে যাও مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ তবে অল্প কয়েকজন ব্যতীত এই আদেশ কেউই পালন করত না। وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا আর যদি তারা তদনুযায়ী আমল করত مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ তাদেরকে যেরূপ উপদেশ দেওয়া হয় لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ তবে তাদের জন্য উত্তম হতো وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا এবং ঈমানে অধিকতর দৃঢ়কারী হতো।

(৬৭) وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ আর এই অবস্থায় আমি তাদেরকে প্রদান করতাম مِّنْ لَّدُنَّآ বিশেষ করে নিজ সন্নিধান হতে اَجْرًا عَظِيْمًا মহা পুরস্কার

(৬৮) وَّلَهَدَيْنٰهُمْ এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রদর্শন করতাম صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا সরল পথ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৫) قوله فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** উতবা বিন যুমরাহ বলেন, আমার পিতা বলেন, দু'জন মানুষ তাদের পারস্পরিক বিরোধ নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়। রাসূল ﷺ অসত্যের পরিবর্তে সত্যের পক্ষে রায় প্রদান করেন। যার বিপক্ষে রায় হয়েছে, সে বলল, আমি এতে সম্মত নই। তার সাথি তাকে বলল, তুমি কি চাও? সে জবাবে বলল, আমি আবূ বকরের নিকট যাব। সুতরাং তারা, উভয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট গিয়ে যার পক্ষে রায় হয়েছিল সে ব্যক্তি বলল, আমরা এ বিষয়টি নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর দরবারে গিয়েছিলাম, তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন, এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন যে, তোমরা রাসূল ﷺ-এর রায়কে মেনে নাও। তখন তার সাথি তাতে সম্মত না হয়ে বলল যে, আমরা এ বিষয়টি নিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট যাব। সুতরাং যার পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছিল সে ব্যাক্তি সেখানে গিয়ে বলল, আমরা এ বিষয়টি নিয়ে হযরত রাসূল ﷺ-এর নিকট গিয়েছিলাম, তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু সে তাতে সম্মত হচ্ছেনা। হযরত ওমর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, ঘটনা বাস্তবে কি তাই? সে উত্তরে বলল, জী-হ্যাঁ। তখন ঘরে গিয়ে তরবারি এনে তার মাথা উড়িয়ে দিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ৫২১/১]

শানে নুযূল– ২ : বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে হযরত উরওয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবাইর ইবনুল আওয়াম আনসারী এক পুরুষের সাথে হাররার পানির ঝর্ণা সম্পর্কীয় এক বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্যে রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলেন। রাসূল ﷺ বললেন, হে যুবাইর! তোমার জমিন পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করার পর তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দিবে। আনসারী বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কারণ সে তো আপনার ফুফাত ভাই, তখন রাসূল ﷺ-এর চেহারা মুবারকের রং পরিবর্তন হয়ে গেল। অতঃপর রাসূল বললেন, হে যুবাইর! তোমার জমিন পানি দ্বারা পূর্ণ করার পর তা বন্ধ করে রাখবে। যাতে সে পানি বিভিন্ন দিকে গিয়ে জমি পুরে যায়। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জন্যে পানি ছাড়বে। হযরত যুবাইর (রা.) বলেন যে, আমার বিশ্বাস এক মাত্র এ বিরোধ সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ৫২০/১, রূহুল মা'আনী ৭২/৩/৫, ফাতহুল কাদীর ৪৮৪/১, কুরতুবী ২৫৬/৫, কাশ্শাফ ৫৬১/১, বায়যাভী ৪২/২, মুহীত্ব ২৯৬]

(৬৬) قوله وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** বর্ণিত আছে, ছাবেত বিন কায়স বিন শাম্মাস আর একজন ইহুদি পরস্পরে গর্ব প্রকাশ করে বেড়াত। সুতরাং সে ইহুদি একদা বলতে লাগল, আল্লাহর শপথ আমাদের উপর আমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করার নির্দেশ করা হয়েছিল। আমরা তা পালন করেছি। ফলে সত্তর হাজার ইহুদি নিহত হয়েছিল। অতঃপর ছাবেত বললেন, আল্লাহর শপথ! আমাদের উপরও যদি আল্লাহ এমন হুকুম আরোপতি করতেন, তাহলে আমরাও এরূপ হুকুম পালন করতাম। সে কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী –২৫৯/৫, ইবনে কাছীর ৫২২/১, ফাতহুল কাদীর ৪৯৫/১, বাহরে মুহীত : ৪৯৭/৩]

রাসূলে কারীম ﷺ-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা কুফর : এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর মহত্ত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের অসংখ্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত মহানবী ﷺ-এর আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কসম খেয়ে বলেছেন যে, কোনো মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন কিংবা মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে ধীরস্থির মস্তিষ্কে মহানবী ﷺ-কে এভাবে স্বীকার করে নিবে যাতে তাঁর কোনো সিদ্ধান্তেই মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা না থাকে।

মহনবী ﷺ রাসূল হিসেবে গোটা উম্মতের শাসক এবং যে কোনো বিবাদের মীমাংসার জিম্মাদার। তাঁর শাসন ও সিদ্ধান্ত অপর কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল নয়। তার পরেও এ আয়াতে মুসলমানগণকে বিচারক সাব্যস্ত করে নিতে বলা হয়েছে। তার কারণ, সরকারিভাবে সাব্যস্তকৃত বিচারক এবং তার মীমাংসার উপর অনেকেরই সন্তুষ্টি আসে না, যেমনটি আসে নিজের মনোনীত বা সাব্যস্তকৃত সালিস বা বিচারকের উপর। কিন্তু মহানবী ﷺ শুধুমাত্র একজন শাসকই নন; বরং তিনি একজন নিষ্পাপ রাসূল, রাহমাতুল লিল-আলামীন এবং উম্মতের জন্য একান্ত দয়ালু পিতাও বটেন।

জই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যখনই কোনো বিষয়ে, কোনো সমস্যার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখনই রাসূলে ম. .বূল ﷺ কে বিচারক সাব্যস্ত করে তার থেকে মীমাংসা করিয়ে নেওয়া এবং অতঃপর তাঁর মীমাংসাকে স্বীকার করে নিয়ে সেমতে কাজ করা উভয় পক্ষের উপর ফরজ।

মতবিরোধের ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ-কে বিচারক সাব্যস্ত করা : কুরআনের তাফসীরকারগণ বলেছেন, কুরআনের বাণীসমূহের উপর আমল করা মহানবী ﷺ-এর যুগের সাথেই সীমিত নয়। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র শরিয়তের মীমাংসাই হলো তাঁর মীমাংসা। কাজেই এ নির্দেশটি কেয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবে বলবৎ থাকবে, যেমন ছিল তাঁর যুগে। তখন যেমন সরাসরি [কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্তকল্পে] তাঁর কাছে উপস্থিত করা হতো, তেমনিভাবে তাঁর পরে তাঁর শরিয়তের মীমাংসা নিতে হবে। আর এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুসরণ।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা : প্রথমতঃ সে ব্যক্তি আদৌ মুসলমান নয়, যে নিজের যাবতীয় বিবাদ ও মোকদ্দমায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে কারণেই হযরত ফারূকে আজম (রা.) সে লোকটিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন, যে মহানবী ﷺ-এর মীমাংসায় রাজি হয়নি এবং পুনরায় বিষয়টি ফারূকে আজমের দরবারে নিয়ে গিয়েছিল। এই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশবর্গ রাসূলে কারীম ﷺ-এর আদালতে হযরত ফারূকে আজমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যে, তিনি একজন মুসলমানকে অকারণে হত্যা করেছেন। এই মামলা হুজুরের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ عُمَرَ يَجْتَرِئُ عَلٰى قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ [অর্থাৎ, আমার ধারণা ছিল না যে, ওমর কোনো মুমিনকে হত্যা করতে পারবে] এতে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চতর বিচারকের নিকট যদি কোনো অধঃস্তন বিচারকের মীমাংসার ব্যাপারে আপিল করা হয়, তবে তাঁকে স্বীয় অধঃস্তন বিচারকের পক্ষপাতিত্ব করার পরিবর্তে ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করা কর্তব্য। যেমন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানবী ﷺ হযরত ওমর (রা.)-এর মীমাংসার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অতঃপর যখন এ আয়াত নাজিল হয়, তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আয়াতের ভিত্তিতে সে লোক মুমিনই ছিল না।

দ্বিতীয় মাসআলা : এ আয়াতের দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, شَجَرَ بَيْنَهُمْ বাক্যটি শুধু আচার-অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয়। আকিদা, মতবাদ এবং অপরাপর বৈষয়িক বিষয়েও ব্যাপক। –[বাহরে মুহীত] অতএব, কোনো সময় কোনো বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিয়ে বিবাদ পরিহার করে উভয়পক্ষকে রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে তৎপ্রবর্তিত শরিয়তের আশ্রয়ে গিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ।

তৃতীয় মাসআলা : এতে এ কথাও জানা গেল যে, যে কাজ বা বিষয় মহানবী ﷺ-এর কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। উদাহরণতঃ যে ক্ষেত্রে শরিয়ত তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে কেউ যদি সম্মত না হয়, তবে একে পরহেজগারী বলে মনে করা যাবে না; বরং এটা একান্তই মানসিক ব্যাধি। রাসূলে কারীম ﷺ অপেক্ষা কেউ বেশি পরহেজগার হতে পারে না। যে অবস্থায় মহানবী ﷺ বসে নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং নিজেও বসে নামাজ আদায় করেছেন, কারো মন যদি এতে সম্মত না হয় এবং অসহনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, তার মন ব্যাধিগ্রস্ত। অবশ্য সাধারণ প্রয়োজন কিংবা কষ্টের সময় যদি প্রদত্ত অব্যাহতিকে পরিহার করে কষ্টের উপর আমল করে, তাবে তা মহানবীর শিক্ষা অনুসারেই বৈধ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই শরিয়ত প্রদত্ত অব্যাহতির প্রতি সংকীর্ণতা অনুভব করা তাকওয়া নয়।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় : বিগত বিশ্লেষণের দ্বারা এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য শুধুমাত্র একজন সংস্কারক এবং নৈতিক পথপ্রদর্শকই ছিলেন না; বরং তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকও ছিলেন। তদুপরি এমন শাসকও ছিলেন যাঁর সিদ্ধান্তকে ঈমান ও কুফরের মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, মুনাফিক বিশরের ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়। আর এ বিষয়টি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থের একাধিক জায়গায় স্বীয় আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলে কারীম ﷺ-এর আনুগত্যকেও অপরিহার্য বলে অভিহিত করেছেন।

সে প্রথমে কা'আব বিন আশরাফ ইহুদিকে প্রস্তাব করে এবং পরে বাধ্য হয়ে মহানবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়। আর হুজুরে আকরাম ﷺ-এর মীমাংসা যেহেতু তার বিরুদ্ধে হয়েছিল, সেহেতু সে তাতে আশ্বস্ত না হয়ে; বরং পুনর্বার মীমাংসা করার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলো। এ ঘটনা মদিনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদিরা মুসলমানগণকে ধিক্কার দিতে লাগল। পূর্ব কারণে আলোচিত বিশর ইবনে আহবারের ঘটনা মদিনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদিরা মুসলমানদেরকে এই বলে ভর্ৎসনা করত যে, তোমরা কেমন মানুষ! যাকে তোমরা রাসূল বলে মান্য কর এবং তার অনুসরণ কর বলেও দাবি কর, তাঁর মীমাংসাসমূহকে স্বীকার কর না। ইহুদিদের প্রতি লক্ষ্য কর, তাদের গুনাহর তওবাকল্পে

তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছিল যে, তোমাদের মধ্য থেকে একে অপরকে হত্যা কর, আমরা এহেন কঠিন নির্দেশ পর্যন্ত পালন করেছি। এমন কি এভাবে আমাদের সত্তর হাজার ব্যক্তি নিহত হয়। তোমাদেরকে যদি এমন কোনো হুকুম দেওয়া হতো, তবে তোমরা কি করতে? আয়াতটিতে তারও উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এই অবস্থা মুনাফিকদেরই হতে পারে, পাক্কা মুসলমানদের নয়। তার প্রমাণ হলো, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে একজন বললেন, আল্লাহ আমাদেরকে এহেন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেননি। সাহাবীর এ বাক্যটি রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যাদের অন্তরে পাহাড়ের মতো সুদৃঢ় মজবুত ঈমান রয়েছে।" ইবনে ওহাব বলেন যে, এ বাক্য হলো হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এ আয়াত শুনে বলেছিলেন যে, আল্লাহর কসম! এ হুকুম নাজিল হলে আমি নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে এর জন্য কুরবান করে দিতাম। অবশ্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.) দেশত্যাগের নির্দেশ আমল করে দেখিয়েও দিয়েছেন। তাঁরা স্বীয় জন্মভূমি মক্কা, নিজেদের সমস্ত সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করে মদিনা অভিমুখে হিজরত করেছিলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَصُدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصُّدُوْدُ মূলবর্ণ (ص . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা ফিরিয়ে নিবে।

عِظْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و . ع . ظ) জিনস مثال واوى অর্থ- তুমি উপদেশ দাও।

يُحَكِّمُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْكِيْمُ মূলবর্ণ (ح . ك . م) জিনস صحيح অর্থ- তারা হাকিম বানাবে।

يُوْعَظُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و . ع . ظ) জিনস مثال واوى অর্থ- তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (৬৯) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়, তবে এরূপ ব্যক্তিগণও সেই মহান ব্যক্তিগণের সহচর হবেন যাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং নেককারগণ, আর এই মহাপুরুষগণ অতি উত্তম সহচর।	وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا
(৭০) এটা [শুধু] অনুগ্রহ আল্লাহর হুযূর হতে, এবং সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।	ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا
(৭১) হে ঈমানদারগণ! নিজেরা সতর্কতা অবলম্বন কর, অতঃপর [জিহাদের জন্য] বের হও, পৃথক পৃথকভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا
(৭২) আর তোমাদের দলে কতক এমন লোক আছে যারা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে, অনন্তর যদি তোমাদের কোনো বিপদ উপস্থিত হয়, তবে বলে, নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতি খুব অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত হইনি।	وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا
(৭৩) আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর কোনো অনুগ্রহ হয়, তবে এরূপভাবে বলে- যেন তোমাদের মধ্যে এবং তার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই- হায়! কতই না চমৎকার হতো যদি আমিও তাদের সঙ্গী হতাম। তা হলে আমারও খুব সফলতা লাভ হতো।	وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا

শাব্দিক অনুবাদ

(৬৯) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয় فَاُولٰٓئِكَ তবে এরূপ ব্যক্তিগণও مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ সেই মহান ব্যক্তিগণের সহচর হবেন যাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন مِّنَ النَّبِيّٖنَ অর্থাৎ নবীগণ وَالصِّدِّيْقِيْنَ এবং সিদ্দীকগণ وَالشُّهَدَآءِ এবং শহীদগণ وَالصّٰلِحِيْنَ এবং নেককারগণ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا আর এই মহাপুরুষগণ অতি উত্তম সহচর।

(৭০) ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ তা [শুধু] অনুগ্রহ আল্লাহর হুযূর হতে وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا এবং সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(৭১) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! خُذُوْا حِذْرَكُمْ নিজেরা সতর্কতা অবলম্বন কর فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ অতঃপর [জিহাদের জন্য] বের হও, পৃথক পৃথকভাবে اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا অথবা সম্মিলিতভাবে।

(৭২) وَاِنَّ مِنْكُمْ আর তোমাদের দলে কতক এমন লোক আছে لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ যারা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ অনন্তর যদি তোমাদের কোনো বিপদ উপস্থিত হয় قَالَ তবে বলে قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতি খুব অনুগ্রহ করেছেন যে اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا আমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত হইনি।

(৭৩) وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর কোনো অনুগ্রহ হয় لَيَقُوْلَنَّ তবে এরূপভাবে বলে- كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ যেন তোমাদের মধ্যে এবং তার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই- يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ হায়! কতই না চমৎকার হতো যদি আমিও তাদের সঙ্গী হতাম فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا তা হলে আমারও খুব সফলতা লাভ হতো।

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا	অনুবাদ : (৭৪) তবে সেই ব্যক্তির উচিত আল্লাহর পথে জিহাদ করা সেসব লোকদের বিরুদ্ধে যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করে নিয়েছে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, অনন্তর সে নিহত হোক বা বিজয়ী হোক, আমি তাকে মহা বিনিময় প্রদান করব।
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا	(৭৫) আর তোমাদের নিকট কি ওজর আছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে না এবং ঐ দুর্বল দের জন্য যাদের মধ্যে কতক পুরুষও আছে, কতক নারীও আছে, কতক শিশুও আছে, যারা প্রার্থনা করছে যে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই নগর হতে বের করুন, যার অধিবাসীরা ভয়ঙ্কর জালেম এবং আমাদের জন্য গায়েব হতে কোনো ওলী দাঁড় করিয়ে দিন এবং আমাদের জন্য গায়েব হতে কোনো সাহায্যকারী প্রেরণ করুন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৪) فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তবে সেই ব্যক্তির উচিত আল্লাহর পথে জিহাদ করা সেসব লোকদের বিরুদ্ধে الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করে নিয়েছে وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করবে فَيُقْتَلْ অনন্তর সে নিহত হোক اَوْ يَغْلِبْ বা বিজয়ী হোক فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا আমি তাকে মহা বিনিময় প্রদান করব।

(৭৫) وَمَا لَكُمْ আর তোমাদের নিকট কি ওজর আছে যে لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে না وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ এবং ঐ দুর্বলদের জন্য مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ যাদের মধ্যে কতক পুরুষও আছে, কতক নারীও আছে, وَالْوِلْدَانِ কতক শিশুও আছে الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ যারা প্রার্থনা করছে যে رَبَّنَآ হে আমাদের রব! اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ আমাদেরকে এই নগর হতে বের করুন الظَّالِمِ اَهْلُهَا যার অধিবাসীরা ভয়ঙ্কর জালেম وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا এবং আমাদের জন্য গায়েব হতে কোনো ওলী দাঁড় করিয়ে দিন وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا এবং আমাদের জন্য গায়েব হতে কোনো সাহায্যকারী প্রেরণ করুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৬৯) قوله وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল- ১ :** কালবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর দাস হযরত ছাওবান (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর প্রতি প্রেমের অনল শিখার প্রজ্বলিত প্রাণ। রাসূল ﷺ-এর বিচ্ছেদকে তিনি কোনো প্রকারেই মেনে নিতে পারতেন না। সুতরাং একদা রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি অত্যন্ত ভগ্ন স্বাস্থ্যের এবং ফেকাসে চেহারার এক ব্যক্তি। তার চেহারা থেকেই মানসিক ক্লেশ ও স্নায়ুচাপ ও অস্থির বলে মনে হচ্ছিল। ফলে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, হে ছাওবান! কি হলো তোমার। তোমাকে এমন দেখা যাচ্ছে কেন? উত্তরে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কোনো প্রকার অসুস্থতা নেই। একমাত্র কারণ এটাই যে, আমি যখন আপনাকে দেখতে পাইনা, তখন আমি আপনার প্রতি অধীর ও ব্যাকুল হয়ে পড়ি আপনার সাক্ষাৎ লাভ না করা পর্যন্ত। পরক্ষণে আবার যখন পরকালের কথা মনে পড়ে, তখন বিব্রতকর অবস্থায় পরে যাই যে, সেখানেও তো আপনাকে দেখতে পাব না। কারণ আমি তো জানি আপনি নবীগণের সুউচ্চ আসনে সমাসীন

থাকবেন। আমি যদিও জান্নাতে যেতেও পারি, তাহলেও আমার স্থান থাকবে আপনার অপেক্ষা অনেক অনেকাংশ নিম্নে। আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ হয়তো জান্নাতে যেতে নাও পারি, তাহলে আপনাকে দেখতে পাব না। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ২৬১/৫, বাহরে মুহীত : ২৯৯/৩, রূহুল মা'আনী ৭৫/৩/৫, বায়যাভী ৮৩/২, কাশশাফ ৫৬৩/১]

শানে নুযূল– ২ : তাবারানী, আবূ নুয়াইম ও জিয়া আলমাকাদিসী (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতেও বর্ণিত রয়েছে যে, একদা নবী করীম ﷺ -এর নিকট এক লোক উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার নিকট, আমার প্রাণ, আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক প্রিয় পাত্র। আমি যখন ঘরে থাকি, তখন আমি নিজকে নিজে সামাল দিয়ে রাখতে পারি না। আমাকে আপনার দরবারে এসে আপনাকে দেখতে হয়। আবার যখন আমার মৃত্যু ও আপনার ইন্তেকালের কথা মনে পড়ে, তখন আমার অকাট্য বিশ্বাস জন্মে আপনি তো জান্নাতে গমন করবেন, তাতেও নবীগণের উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবেন। আর আমি যদিও জান্নাতে প্রবেশ করি, তবে আমার স্থান তো হবে আপনার অনেক নিচে। ভয় হচ্ছে আপনাকে সেখানে দেখতে পাব কিনা। তখন নবী সে ব্যক্তির আবেগ ভরা ব্যকুলতা প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ৭৫/৩/৫, ইবনে কাছীর– ৫২৩/১]

শানে নুযূল– ৩ : একাধিক সাহাবী হতে বর্ণিত, তারা বলেন, আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্দে রাব্বিহী আল আনসারী যাকে আজানের ধ্বনি স্বপ্নযোগে দেখানো হয়েছিল। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ও আমরা সকলেই যখন ইন্তেকাল করব, আপনার স্থান হবে সর্বোচ্চ স্থানে। আমরা তখন আপনাকে দেখতে পাব না, এ কারণে তিনি নিজের ব্যকুলতা প্রকাশ করেন। তার হৃদয় নিংড়ানো এহেন ব্যথাভরা আবেগ প্রকাশের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ৪ : আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি বলেন اَللّٰهُمَّ اَعْمِنِىْ حَتّٰى لَا اَرٰى شَيْـئًا بَعْدَهٗ [হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অন্ধ করে দাও, তাঁর পর যেন আমি আর অন্য কিছু দেখতে না পারি] সুতরাং তিনি সে স্থানেই অন্ধ হয়ে যান। আল্লামা কুশাইরি (র.) এরূপ বর্ণনা করেন যে, তখন তিনি বলেন, اَللّٰهُمَّ اَعْمِنِىْ فَلَا اَرٰى شَيْـئًا بَعْدَ حَبِيْبِىْ حَتّٰى اَلْقٰى حَبِيْبِىْ [হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অন্ধ করে দাও আমি যেন আমার হাবিব ﷺ কে দেখার পর আর অন্য কাউকে দেখতে না পাই। যত দিন না পর্যন্ত তার সাথে সাক্ষাৎ করব।] তখন তিনি সে জায়গাতেই অন্ধ হয়ে যান। –[কুরতুবী- ২৬০/৫]

শানে নুযূল– ৫ : হযরত ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা হুজুর ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন, আমি আপনাকে প্রাণ ভরে ভালোবাসি। যখন ঘরে থেকে আপনার কথা স্মরণ হয়, তখন তা আমার নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। আপনার সাথে আমার অবস্থান হবে, এ-ই হলো আমার প্রাণের দাবি। রাসূল ﷺ তার কোনো জবাব দেননি। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ৫২৩/১]

قوله : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ الخ – ٧١ : **আয়াতের শানে নুযূল– :** কোনো কোনো তাফসীরকারকগণ আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানেরা যখন কোনো অভিযানে বের হতেন, তখন মুনাফিকরা ছল-চাতুরি করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকত এবং পরবর্তীতে নিজের অপারগতা প্রকাশ করে আক্ষেপ প্রকাশ করত। মুসলমানেরা কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হলে আনন্দ ভোগ করত। আর মুসলমানেরা বিজয়ী হলে সম্পদের লোভে অনুতপ্ত হতো, গনিমতের মালে অংশীদার না হবার কারণে। বিশেষ করে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের এ ভাব ছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[নুরুল কুলূব]

জান্নাতের পদমর্যাদাসমূহ আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে : যে সমস্ত লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত বিষয়ের উপর আমল করবেন এবং আল্লাহ ও রাসূলের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকবেন, তাঁদের পদমর্যাদা তাঁদেরই আমল তথা কৃতকর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। প্রথম শ্রেণির লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলগণের সাথে জান্নাতের উচ্চতর স্থানে জায়গা দিবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির লোকদেরকে নবীগণের পরবর্তী মর্যাদার লোকদের সাথে স্থান দিবেন। তাঁদেরকেই বলা হয় সিদ্দীকীন। অর্থাৎ, তাঁরা হলেন সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা কোনো রকম দ্বিধা-সংকোচ ও বিরোধিতা না করে প্রাথমিক পর্যায়েই ঈমান এনেছেন। যেমন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) প্রমুখ।

অতঃপর তৃতীয় শ্রেণির লোকেরা থাকবেন শহীদগণের সাথে। শহীদ সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাঁরা আল্লাহর রাহে নিজেদের জান-মাল কুরবান করে দিয়েছেন। আর চতুর্থ শ্রেণির লোকগণ থাকবেন সালেহীনদের সাথে। বস্তুতঃ সালেহীন হলেন সেসব লোক, যাঁরা জাহের ও বাতেন, প্রকাশ্য ও গোপন সব ক্ষেত্রেই সৎকর্মসমূহের যথাযথ অনুবর্তী।

সারকথা, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাগণ সে সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন, যাঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও মকবুল।

জান্নাতে দেখা সাক্ষাতের কয়েকটি দিক : ১. নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই একে অন্যকে দেখবেন। যেমন, মুয়াত্তা ইমাম মালেক গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসীরা নিজেদের জানালা দিয়ে উপরের শ্রেণির লোকদেরকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমনিভাবে পৃথিবীতে তোমরা তাদেরকে দেখ।

২. উপরের শ্রেণির লোকেরা নীচের শ্রেণিতে নেমে এসেও সাক্ষাৎ করবেন। যেমন, হযরত ইবনে জারীর (র.) হযরত রবী' (রা.) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন যে, উপরের শ্রেণির লোকেরা নিচের শ্রেণিতে নেমে আসবেন এবং তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও উঠা-বসা হবে।

তাছাড়া নিচের শ্রেণির অধিবাসীদের জন্য উপরের শ্রেণিতে যাওয়ার অনুমতি লাভও হতে পারে। আলোচ্য আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলে কারীম ﷺ বহু লোককে জান্নাতে নিজের সাথে অবস্থানের সুসংবাদ দিয়েছেন।

প্রেম নৈকট্যের শর্ত : হুজুরে আকরাম ﷺ-এর সান্নিধ্য ও নৈকট্য তাঁর সাথে প্রেম ও মহব্বতের মাধ্যমেই লাভ হবে। সহীহ বুখারীতে হাদীসে মুতাওয়াতের সাহাবায়ে কেরামের এক বিপুল জামাত কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে : রাসূলে কারীম ﷺ-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো যে, "সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে? যে লোক কোনো জামাত বা দলের সাথে ভালোবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এ দলের নির্ধারিত মান পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি? হুজুর ﷺ বললেন, اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ। অর্থাৎ, হাশরের মাঠে প্রতিটি লোকই যার সাথে তার ভালোবাসা, তার সাথে থাকবে।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, পৃথিবীতে কোনো কিছুতেই আমি এতটা আনন্দিত হইনি যতটা এ হাদীসের কারণে আনন্দিত হয়েছি। কারণ এ হাদীসে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যাঁদের গভীর ভালোবাসা রয়েছে তাঁরা হাশরের মাঠেও হুজুরের সাথেই থাকবেন।

রাসূলে কারীম ﷺ-এর সান্নিধ্য লাভ কোনো বর্ণ-গোত্রের উপর নির্ভরশীল নয় : ইমাম তাবারানী (র.) মুজামে কবির গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক হাবশী ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর দরবারে এসে নিবেদন করলেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের চাইতে আকার-আকৃতি, রং উভয়দিক দিয়েই সুন্দর ও অনন্য এবং নবুয়তের দিক দিয়েও। এখন যদি আমি এ ব্যাপারেও ঈমান নিয়ে আসি, যাতে আপনার ঈমান রয়েছে এবং সেরূপ আমলও করি, যা আপনি করে থাকেন, তাহলে কি আমিও জান্নাতের মাঝে আপনার সাথে থাকতে পারব।"

মহানবী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি তোমার হাবশীসুলভ কদাকৃতির জন্য চিন্তিত হয়ো না। সে সত্তার কসম, যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ, জান্নাতের মাঝে কাল রংয়ের হাবশীও সাদা ও সুন্দর হয়ে যাবে এবং এক হাজার বছরের দূরত্ব থেকেও চমকাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' [কালেমায়] বিশ্বাস হবে, তার মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহর দায়িত্বে এসে যায়। আর যে লোক 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পড়ে, তার আমলনামায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়।" –[মুজামে কবির তাবরানী হাদীস নং ১৩৫৯৫]

সিদ্দীক-এর সংজ্ঞা : দ্বিতীয় স্তর হলো সিদ্দিকীনের। আর সিদ্দীক হলেন সে সমস্ত লোক যাঁরা মা'রেফাত বা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে নবীগণের কাছাকাছি। এর উদাহরণ এই যে, কোনো লোক যেন কোনো বস্তুকে দূর থেকে অবলোকন করছে। হযরত আলী (রা.)-এর নিকট কোনো এক লোক জিজ্ঞেস করলেন যে, "আপনি কি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন?" তিনি বলেছিলেন, "আমি এমন কোনো কিছুর ইবাদত করতে পারি না, যা আমি দেখিনি।" অতঃপর আরো বললেন, "আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেনি সত্য, কিন্তু মানুষের অন্তর ঈমানের আলোকে তাঁকে উপলব্ধি করে নেয়।" এখানে 'দেখা' বলতে হযরত আলী (রা.)–এর উদ্দেশ্য হলো স্বীয় জ্ঞানের গভীরতা সূক্ষ্মতার মাধ্যমে দেখার মতোই উপলব্ধি করে নেওয়া।

শহীদের সংজ্ঞা : তৃতীয় স্তর হলো শহীদগণের। আর শহীদ হলেন সে সমস্ত লোক, যাঁরা বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হন; তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেন না। তাঁদের উদাহরণ হলো এমন, যেন কোনো লোক কোনো বস্তুকে আয়নার কাছে থেকে অবলোকন করছে। যেমন, হযরত হারেসা (রা.) বলেছেন, "আমার মনে হয় আমি যেন আমার মহান পরওয়ারদেগারের আরশ প্রত্যক্ষ করছি।"

তাছাড়া أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ হাদীসটিতেও এমন ধরনের দেখার কথা বলা হয়েছে।

সালেহীনের সংজ্ঞা : চতুর্থ স্তর হলো সালেহীনের। যাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য লক্ষ্যকে অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিশ্চিত জেনে নেন। তাদের উদাহরণ হলো, কোনো বস্তুকে দূর থেকে আয়নার মধ্যে দেখা। আর হাদীসে فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ যে বলা হয়েছে, তাতেও দেখা বা প্রত্যক্ষ করার এই স্তরের কথাই বুঝানো হয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর এই পর্যালোচনার সার-নির্যাস হচ্ছে, এগুলোই হলো 'মা'রেফাতে রব' বা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভের স্তর। বস্তুতঃ এই মা'রেফাতের স্তরের পার্থক্যহেতু মর্যাদাও বিভিন্ন। যাহোক, আয়াতের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। এতে মুসলমানদেরকে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল অনুসারীগণ তাঁদেরই সাথে থাকবে যাঁরা অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদের সবাইকে তোমার এমনি ভালোবসা লাভের তৌফিক দান কর। আমীন।

কতিপয় অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের এবং অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জিহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে একটি বিষয় বুঝা যাচ্ছে এই যে, কোনো ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থি নয়; এ বিষয়টি আরো কয়েক জায়গায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বুঝা যাচ্ছে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেওয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অলম্বন করাটা মূলতঃ মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে– قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا

অর্থাৎ, "হে নবী! আপনি বলে দিন, আমাদের উপর এমন কোনো বিপদাপদই আসে না, যা আল্লাহ আমাদের তাকদীর বা নিয়তিতে নির্ধারিত করে দেননি।"

এ আয়াতে প্রথমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ অতঃপর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সুশৃঙ্খল নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে দুটি বাক্য فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ব্যবহার করা হয়েছে। ثُبَاتٌ শব্দটি ثُبَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ– ক্ষুদ্র দল। অর্থাৎ তোমরা যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে, তখন একা একা বেরোবে না; বরং ছোট ছোট দলে বেরোবে কিংবা [সম্মিলিত] বড় সৈন্যদল নিয়ে বেরোবে। তার কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই শৈথিল্য করে না।

উৎপীড়িতের সাহায্য করা ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ : মক্কা নগরীতে এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যারা দৈহিক দুর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে কাফেররাও তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দান করছিল এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করেছিল, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদের কারো কারো নামও তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও তাঁর মাতা, সালামা ইবনে হেশাম, ওলীদ ইবনে ওলীদ, আবূ জানদাল ইবনে সাহল প্রমুখ। –[কুরতুবী] এসব সাহাবী নিজের ঈমানি বলিষ্ঠতার দরুন কাফেরদের অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করেও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তাঁরা এসব অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বরাবরই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মোনাজাত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেন, যাতে তাঁরা জিহাদের মাধ্যমে সেই নির্পীড়িতদেরকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন।

এ আয়াতে বুঝা যায়, মুমিনরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দুটি বিষয়ে দোয়া করেছিলেন। একটি হলো এই যে, আমাদেরকে এই [মক্কা] নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা কর এবং দ্বিতীয়টি হলো যে, আমাদের জন্য কোনো সহায় বা সাহায্যকারী পাঠাও। আল্লাহ তাঁদের দু'টি প্রার্থনাই কবুল করে নিয়েছিলেন। তা এভাবে যে, কিছু লোককে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তাদের প্রথম প্রার্থনাটি পূরণ হয়েছিল। অবশ্য কোনো কোনো লোক সেখানেই রয়ে যান এবং বিজয়ের পর রাসূলে মাকবুল ﷺ আত্তাব ইবনে আসীদ (রা.)-কে সেসব লোকের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি এসব উৎপীড়িতদেরকে অত্যাচারীদের উৎপীড়ন-অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। আর এভাবেই পূর্ণ হয় তাদের দ্বিতীয় প্রার্থনাটি।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় জিহাদ করার নির্দেশ দানের পরিবর্তে وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ বাক্য ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন পরিস্থিতিতে জিহাদ করাটাই স্বাভাবিক দায়িত্ব, যা না করা কোনো ভালো মানুষের পক্ষে একান্তই অসম্ভব।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা সর্ববিপদের অমোঘ প্রতিকার : يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا আয়াতে বলা হয়েছে যে, জিহাদের নির্দেশ দানের পিছনে একটি কারণ ছিল সে সমস্ত অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষের প্রার্থনা। মুসলমানগণকে জিহাদ করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে সে প্রার্থনা মঞ্জুরির কথাই ঘোষণা করা হয়েছে। আর তাতে যথাশীঘ্র তাদের বিপদাপদ শেষ হয়ে যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

خُذُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ أَمْر حَاضِرْ مَعْرُوفْ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْأَخْذُ মূলবর্ণ (ا ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা ধর।

لَيُبَطِّئَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة در فعل مستقبل معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْطِئَةُ মূলবর্ণ (ب ـ ط ـ ء) জিনসে مهموز لام অর্থ– সে অবশ্যই গড়িমসি করবে।

يَشْرُونَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلشِّرَاءُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা বিক্রি করবে।

مُسْتَضْعَفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر سالم বহছ اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِسْتِضْعَافُ মূলবর্ণ (ض ـ ع ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– দুর্বল ব্যক্তিগণ।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

অনুবাদ : (৭৬) যারা পূর্ণ ঈমানদার তারা তো আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আর যারা কাফের তারা শয়তানের পথে সংগ্রাম করে, অতএব, [হে মুমিনগণ!] তোমরা শয়তানের সহচরদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর, বস্তুত শয়তানের প্রচেষ্টা দুর্বলই হয়ে থাকে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾

(৭৭) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি! যাদের বলা হয়েছে যে, স্বীয় হাতসমূহকে বিরত রাখ এবং নামাজের পাবন্দি কর এবং জাকাত প্রদান করতে থাক, অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফরজ করে দেওয়া হলো, তখন ঘটনা এই দাঁড়ালো যে, তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ মানুষকে এরূপ ভয় করতে লাগল, যেরূপ আল্লাহকে ভয় করে; বরং তদপেক্ষাও অধিক এবং এরূপ বলতে লাগল, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের উপর জিহাদ কেন ফরজ করে দিলেন? আমাদের যদি আরো কিছু সময় অবকাশ দিতেন, আপনি বলে দিন, পার্থিব ভোগ-বিলাস কেবল কয়েক দিনের জন্য, আর পরকাল ঐ ব্যক্তির জন্য সর্বদিক দিয়ে উত্তম, যে আল্লাহর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাকে এবং তোমাদের প্রতি সূত্র-পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৬) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা পূর্ণ ঈমানদার يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তারা তো আল্লাহর পথে জিহাদ করে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কাফের يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ তারা শয়তানের পথে সংগ্রাম করে فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ অতএব, [হে মুমিনগণ!] তোমরা শয়তানের সহচরদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ বস্তুত শয়তানের প্রচেষ্টা كَانَ ضَعِيْفًا দুর্বলই হয়ে থাকে।

(৭৭) اَلَمْ تَرَ তুমি কি লক্ষ্য করনি! اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ তাদের প্রতি যাদের বলা হয়েছে যে كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ স্বীয় হাতসমূহকে বিরত রাখ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজের পাবন্দি কর وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করতে থাক فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফরজ করে দেওয়া হলো তখন ঘটনা এই দাঁড়ালো যে اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ يَخْشَوْنَ النَّاسَ মানুষকে এরূপ ভয় করতে লাগল كَخَشْيَةِ اللّٰهِ যেরূপ আল্লাহকে ভয় করে اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً বরং তদপেক্ষাও অধিক وَقَالُوْا এবং এরূপ বলতে লাগল رَبَّنَا হে আমাদের রব! لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ আপনি আমাদের উপর জিহাদ কেন ফরজ করে দিলেন? لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ আমাদের যদি আরো কিছু সময় অবকাশ দিতেন قُلْ আপনি বলে দিন مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ পার্থিব ভোগ-বিলাস কেবল কয়েক দিনের জন্য وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ আর পরকাল ঐ ব্যক্তির জন্য সর্বদিক দিয়ে উত্তম لِّمَنِ اتَّقٰى যে আল্লাহর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাকে وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا এবং তোমাদের প্রতি সূত্র-পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨)

(৭৮) তোমরা যেখানেই থাক, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু আসবে, যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যেই থাক না কেন, আর যদি তাদের [মুনাফিকদের] কোনো ভালো অবস্থা উপস্থিত হয়, তবে বলে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে, আর যদি তাদের মন্দ অবস্থা উপস্থিত হয়, তবে বলে, তা আপনার দরুন হয়েছে, আপনি বলে দিন, সমস্ত কিছু আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়, তবে এ সমস্ত লোকের কি হয়েছে যে, কথা বুঝার কাছেও যায় না।

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (٧٩)

(৭৯) হে মানব! তোমাদের প্রতি যে কোনো মঙ্গল উপস্থিত হয়, তা কেবল আল্লাহর পক্ষ হতে, আর যে কোনো অমঙ্গল উপস্থিত হয়, তা তোমাদেরই [বদ আমলের] কারণে হয়ে থাকে, আর আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য নবীরূপে প্রেরণ করেছি, এবং আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে।

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (٨٠)

(৮০) যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করেছে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি বিমুখ থাকে, তবে আমি তো আপনাকে তাদের প্রতি রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি।

শাব্দিক অনুবাদ

(৭৮) أَيْنَمَا تَكُونُوا তোমরা যেখানেই থাক يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ সেখানেই তোমাদের মৃত্যু আসবে وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যেই থাক না কেন وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ আর যদি তাদের কোনো ভালো অবস্থা উপস্থিত হয়। يَقُولُوا তবে বলে هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ তা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ আর যদি তাদের মন্দ অবস্থা উপস্থিত হয়। يَقُولُوا তবে বলে هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ তা আপনার দরুন হয়েছে قُلْ আপনি বলে দিন كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ সমস্ত কিছু আল্লাহর পক্ষ হতেই হয় فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ তবে এ সমস্ত লোকের কি হয়েছে যে لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا কথা বুঝার কাছেও যায় না।

(৭৯) مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ হে মানব! তোমাদের প্রতি যে কোনো মঙ্গল উপস্থিত হয় فَمِنَ اللَّهِ তা কেবল আল্লাহর পক্ষ হতে وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ আর যে কোনো অমঙ্গল উপস্থিত হয় فَمِن نَّفْسِكَ তা তোমাদেরই কারণে হয়ে থাকে وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا আর আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য নবীরূপে প্রেরণ করেছি। وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا এবং আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে।

(৮০) مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করেছে فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল وَمَن تَوَلَّىٰ আর যে ব্যক্তি বিমুখ থাকে فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا তবে আমি তো আপনাকে তাদের প্রতি রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৭৭) قَوْلُهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কালবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত আব্দুর রহমান বিন আওফ যুহরি, মিকদাদ বিন আছওয়াদ আল কিন্দী, কুদামা বিন মাযউন আল যাহমী ও সা'আদ বিন আবূ ওয়াক্কাস প্রমুখ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা মুশরিকদের কর্তৃক বহু দুঃখ-কষ্ট বহন করেছেন, তারা হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থান করেছেন। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিজেদের দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের মোকাবিলায় আমাদের সশস্ত্র যুদ্ধ করার অনুমতি দান করুন। ওরা তো আমাদের ভীষণ কষ্ট দিয়েছে।

তখন নবী করীম ﷺ বলতেন, তোমাদের হাত নিবৃত্ত রাখ, যুদ্ধ থেকে বিরত থাক। কারণ আমি এখনো তার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইনি। অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, ক্ষমা করে দিতে আমি আদিষ্টিত হয়েছি। উক্ত সাহাবীদের জিহাদের দাবির প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে যে, মক্কায় থেকে জিহাদ করার সুযোগ নেই। –[আসবাবুন নুযূল, নীসপুরী, পৃ. ১০২]

(৭৮) قوله وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الخ **আয়াতে শানে নুযূল–** : হাসান ও ইবনে যিয়াদের বর্ণনানুযায়ী আলোচ্য আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তার প্রেক্ষাপট হলো তারা আর্থিকভাবে অত্যন্ত সাবলম্বী ছিল। নবী করীম ﷺ যখন মদিনায় গমন করেন, তখন রাসূল ﷺ তাদের ঈমান গ্রহণ করার প্রতি আহবান জানান। তারা অসম্মতি প্রকাশ করে ঈমান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। অতঃপর তারা বলতে লাগল যে, আমাদের ফল-ফলাদি এবং ফসলের ক্ষেত্রসমূহের এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে আর কখনো দেখতে পাইনি। কিন্তু এ লোকটি যখন মদিনায় গমন করেছেন, তখন থেকে আমাদের এ দুর্যোগ ও ক্ষতিগ্রস্থতা দেখা দিল। রাসূল ﷺ-কে অলক্ষুণে বলে প্রকাশ করেছে। তাদের এহেন ভ্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : কারো কারো মতে উক্ত আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা হলো আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার অনুচরেরা, যারা ওহুদের অভিযান থেকে বিরত ছিল। আর যারা যুদ্ধে নিহত হতো তাদের উদ্দেশ্যে বলত, তারা যদি আমাদের কাছে থাকত, তহালে আজ ওরা নিহত হতো না এবং মৃত্যুবরণও করত না। তার মর্মার্থ হচ্ছে যে, গনিমতের মাল যদি তাদের অর্জন হতো, তখন বলত যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর পরাজিত হলে বলতো যে, তা হচ্ছে তোমার কৌশলগত অজ্ঞতার কারণে এ পরাজয়। মুনাফিকদের এ ধরনের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদাহ আরো অন্যান্যদর মতে আলোচ্য আয়াত ইহুদি এবং মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ যখন মদিনায় সুভাগমন করেন এবং দুর্ভিক্ষও দেখা দিল তখন তারা তাঁর আগমনকে অলক্ষুণে ও অমঙ্গলজনক মনে করতে লাগল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী – ৮৮/৩/৫]

শানে নুযূল– ৪ : ইহুদি ও মুনাফিকদের মাল ও ধন সম্পত্তিতে যে কোনো ধরনের দুর্যোগ ও ধ্বংস দেখা দিলে, তারা মদিনায় হুজুর ﷺ-এর আগমনকে অলক্ষুণে বলে অভিযোগ আরোপ করে বলতে লাগল যে, এ পরিণতি হচ্ছে আপনার কারণে। আমাদের ধর্ম ছেড়ে মুহাম্মদের অনুসরণ করার কারণে আমাদের উপর এ বিপদ আগত হয়েছে। তখন قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ তথা আপনি বলুন, সবই আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে। আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর– : ৫২৭/১]

(৮০) قوله مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল–** : মুকাতিল (র.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ একদা বলেছিলেন مَنْ اَحَبَّنِىْ فَقَدْ اَحَبَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ تَعَالٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসবে সে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাকেই ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করবে সে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আল্লাহরই আনুগত্য করল। তখন মুনাফিকরা বলতে লাগল যে, তোমরা তো শুনতে পেলে এ ব্যক্তি কি বলছে। সে তো শিরকের পথ উন্মুক্ত করছে। অথচ তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন। সে তো আমাদের থেকে কামনা করে যে, আমরা যেন তাকে মা'বুদ হিসেবে মেনে নেই। যেমনিভাবে খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) কে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তখন রাসূলের কথার সমর্থনে এবং ইহুদিদের বাতুলতা প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত- : ৯১/৩-৫, বাহরে মুহীত : ৩১৭/৩]

যুদ্ধক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা : আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মুমিন বা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। এতে পরিষ্কারভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যতঃ মুমিনদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য। কারণ আল্লাহই সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ভেজাল ও ন্যায়ভিত্তিক। তাছাড়া ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশ্বশান্তির জন্যও সমগ্র বিশ্বে এমন সংবিধানের প্রচলন অপরিহার্য, যাকে আল্লাহর কানূনী সংবিধান বলা হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ কোনো মুমিন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সামনেই এ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফের তাদের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈশাচিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে বিশ্বময় কুফর ও শিরক বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফর ও শিরক যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেররা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে।

শয়তানের চক্রান্তের দুর্বলতা : إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا আয়াতে বলা হয়েছে যে, শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল হয় দুর্বল। ফলে তা মু'মিনের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারে না। অতএব, মুসলমানগণকে শয়তানের বন্ধুবর্গ অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোনো রকম দ্বিধা করা উচিত নয়। তার কারণ তাদের সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং। পক্ষান্তরে শয়তানের কলাকৌশল কাফেরদের কিছুই মঙ্গল সাধন করবে না।

এ আয়াতে শয়তানের কলাকৌশলকে যে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেজন্য আয়াতের মাধ্যমেই দু'টি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। এক. যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে, তাকে মুসলমান হতে হবে এবং দুই. সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহর জন্য হতে হবে; কোনো পার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা কিংবা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হলে হবে না। প্রথম শর্ত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বাক্যের দ্বারা এবং দ্বিতীয় শর্ত يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। এ দু'টি শর্তের যে কোনো একটির অবর্তমানে শয়তানের কলাকৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী নয়।

জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানগণ কর্তৃক তা মুলতবির আকাঙ্ক্ষার কারণ : জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানদের পক্ষ থেকে তা স্থগিত থাকার বাসনা কোনো আপত্তির কারণে ছিল না; বরং এটা ছিল একটি আনন্দমিশ্রিত অভিযোগ। তার কারণ, স্বভাবতঃ মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে একা একা কোনো চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন তার উত্তেজনা হঠাৎ উথলে উঠে এবং তখন কোনো বিষয়ের প্রতিশোধ নেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। কিন্তু আরাম-আয়েশের সময় তাদের মন-মানস কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে উদ্বুদ্ধ হতে চায় না। এটা হলো মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। সুতরাং এসব মুসলমান যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন কাফেরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অসহ্য হয়ে তারা জিহাদের নির্দেশ কামনা করতেন। কিন্তু মদিনায় হিজরত করে চলে আসার পর যখন তারা শান্তি ও আরাম-আয়েশ লাভে সমর্থ হন, আর এমনি অবস্থায় যখন জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের পুরাতন সে প্রতিশোধ স্পৃহা অনেকটা প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মন-মস্তিষ্কে সেই উন্মাদনা ও উত্তেজনা বিদ্যমান ছিল না। সেজন্য তারা শুধু বাসনা করল যে, এক্ষণই যদি জিহাদের নির্দেশটি না আসত, তবেই ভালো হতো, এই বাসনাকে আপত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে সে সমস্ত মুসলমানকে পাপী সাব্যস্ত করা আদৌ সমীচীন নয়। মুসলমানগণ যদি উল্লিখিত অভিযোগটি মুখেই প্রকাশ করে থাকেন, তবে উল্লিখিত বক্তব্যটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যদি অভিযোগটি মুখে প্রকাশ না করে থাকেন এবং তা শুধু মনে মনেই কল্পনাস্বরূপ এসে থাকে তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে তা অপরাধ বা পাপ বলে গণ্যই হয় না। এক্ষেত্রে উভয় অবস্থারই সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আয়াতে উল্লিখিত قَالُوْا শব্দের দ্বারা এমন কোনো সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, তাঁরা মনের কল্পনাকে মুখেও প্রকাশ করেছিলেন। কারণ এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তাঁরা হয়তো মনে মনেই বলে থাকবেন। –[বয়ানুল কুরআন] কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে এ আয়াতের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে নয়; বরং মুনাফিকদের সাথে। সেক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নই থাকে না। –[তাফসীরে কাবীর]

রাষ্ট্রশুদ্ধি অপেক্ষা আত্মশুদ্ধি অগ্রবর্তী : وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রথমে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রশুদ্ধির উপকরণ। অর্থাৎ, এতে অত্যাচার, উৎপীড়নের প্রশমন করা যায়। এতেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র দেশময় শান্তি ও শৃঙ্খলা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে অপরের সংশোধন করার পূর্বে নিজের সংশোধন করা কর্তব্য। বস্তুতঃ মর্যাদার দিক দিয়েও প্রথম পর্যায়ের হুকুমটি হলো ফরজে-আইন, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের হুকুম হচ্ছে ফরজে কেফায়াহ। এতে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও অগ্রবর্তিতাই প্রতীয়মান হয়। –[মাযহারী]

দুনিয়া ও আখেরাতের নিয়ামতের পার্থক্য : আয়াতে দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নিয়ামতসমূহকে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। তা হলো এই–

১. দুনিয়ার নিয়ামত অল্প এবং আখেরাতের নিয়ামত অধিক।
২. দুনিয়ার নিয়ামত অনিত্য এবং আখেরাতের নিয়ামত নিত্য-অফুরন্ত।
৩. দুনিয়ার নিয়ামতসমূহের সাথে নানা রকম অস্থিরতাও রয়েছে, কিন্তু আখেরাতের নিয়ামত এ সমস্ত জঞ্জালমুক্ত।
৪. দুনিয়ার নিয়ামত লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু আখেরাতের নিয়ামত প্রত্যেক মুত্তাকী-পরহেজগার ব্যক্তির জন্য একান্ত নিশ্চিত। –[তাফসীরে কাবীর]

পাকা ও সুদৃঢ় বাসস্থান নির্মাণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয় : وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সুদৃঢ় প্রাসাদে হলেও মৃত্যু তোমাদেরকে বরণ করতেই হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, বসবাস করার জন্য কিংবা ধন-সম্পদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় ও উত্তম গৃহ নির্মাণ করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসার পরিপন্থি কিংবা শরিয়তবিরুদ্ধ নয়। –[কুরতুবী]

মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই নিয়ামত লাভ করে :

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ এখানে حَسَنَةٍ [হাসানাতিন] এর দ্বারা নিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করে তা তাদের প্রাপ্য নয়; বরং একান্ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হয়। মানুষ যত ইবাদত-বন্দেগী করুক না কেন, তাতে সে কোনো নিয়ামত লাভের অধিকারী হতে পারে না। কারণ ইবাদত করার যে সামর্থ্য, তাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই লাভ হয়। তদুপরি আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত তাতে রয়েছেই । এ সমস্ত নিয়ামত সীমিত ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে কেমন করে লাভ করা সম্ভব? বিশেষ করে আমাদের ইবাদত-বন্দেগী যদি আল্লাহ তা'অলার শান মোতাবেক না হয়। যে কারণেই মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন। "আল্লাহ তা'আলার রহমত ব্যতীত কোনো একটি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" বলা হলো, 'আপনিও কি যেতে পারবেন না?' তিনি বললেন, "না আমিও না"। –[মাযহারী]

বিপদাপদ মানুষের কৃতকর্মের ফল : এখানে وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ অর্থ হলো বিপদাপদ। –[মাযহারী]

বিপদাপদ যদিও আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার কারণ হয় মানুষের কৃত অসৎকর্ম। মানুষটি যদি কাফের হয়ে থাকে, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ তার জন্য সে সমস্ত আজাবের একটা সামান্য নমুনা হয়ে থাকে যা আখেরাতে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের আজাব এর চাইতে বহুগুণ বেশি। আর যদি লোকটি ঈমানদার হয়, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ হয় তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যা আখেরাতে তার মুক্তির কারণ। অতএব, এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেছেন : "কোনো বিপদ এমন নেই, যা কোনো মুসলমানের উপর পতিত হয়, অথচ তাতে আল্লাহ সে লোকের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন না। এমন কি যে কাঁটাটি পায়ে ফোটে তাও।" –[মাযহারী]

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– হযরত আবূ মূসা (রা.) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, বান্দার উপর যে সমস্ত লঘু বা গুরু বিপদ আসে, সে সবই হয় তাদের পাপের ফলে। অথব তাদের বহু পাপ ক্ষমাও করে দেওয়া হয়। –[মাযহারী]

মহানবী ﷺ-এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক : وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ -কে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি শুধু আরবদের জন্যই রাসূল ছিলেন না; বরং তাঁর রেসালাত ছিল সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য ব্যাপক। চাই তা তারা তখন উপস্থিত থাকুক অথবা না-ই থাকুক। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই -এর আওতাভুক্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ

- كُفُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَفُّ মূলবর্ণ (ك . ف . ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা প্রতিহত কর।
- بُرُوْجٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন بُرْجٌ অর্থ– মজবুত দুর্গসমূহ।
- مُشَيَّدَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّشْيِيْدُ মূলবর্ণ (ش . ي . د) জিনস اجوف يائى অর্থ– মজবুত করা।
- حَفِيْظًا : এটি فَعِيْلٌ এর ওজনে صفت مشبه এর সীগাহ। অর্থ– রক্ষক, হেফাজতকারী।

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

অনুবাদ : (৮১) আর এ সমস্ত লোক বলে আমাদের কাজ আনুগত্য করা, অনন্তর যখন তারা চলে যায়, আপনার নিকট হতে, তখন তাদের একদল রাত্রিকালে পরামর্শ করে তার বিপরীত যা কিছু তারা মুখে বলেছিল, আর আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করছেন যা তারা রাত্রিকালে পরামর্শ করে থাকে, অতএব, আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না এবং [সর্ববিষয়ে] আল্লাহর হাওয়ালা করুন, আর আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট, কার্য সম্পাদনে।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

(৮২) তবে কি তারা কুরআনে মনঃসংযোগ করে না? আর যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে হতো, তবে তার মধ্যে তারা বহু বৈসাদৃশ্য পেত।

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

(৮৩) আর যখন তাদের নিকট কোনো বিষয়ের খবর পৌছে, তা নিরাপত্তার হোক বা ভয়েরই হোক, তবে তা [তৎক্ষণাৎ] প্রচার করে দেয়, আর যদি তারা তাকে রাসূলের উপর এবং তাদের মধ্যে যারা এরূপ বিষয় বুঝতে সক্ষম তাদের উপর সমর্পণ করত, তা হলে তাকে তারা জেনেই নিত, যারা তাদের মধ্যে সংবাদের সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করে নেয়, আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমত না হতো, তবে তোমরা সকলেই শয়তানের অনুগামী হতে অল্প কয়েকজন ব্যতীত।

শাব্দিক অনুবাদ

(৮১) وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ আর এ সমস্ত লোক বলে আমাদের কাজ আনুগত্য করা। فَإِذَا بَرَزُوا অনন্তর যখন তারা চলে যায় مِنْ عِنْدِكَ আপনার নিকট হতে بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ তখন তাদের একদল রাত্রিকালে পরামর্শ করে غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ তার বিপরীত যা কিছু তারা মুখে বলেছিল وَاللَّهُ يَكْتُبُ আর আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করছেন مَا يُبَيِّتُونَ যা তারা রাত্রিকালে পরামর্শ করে থাকে فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ অতএব, আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ এবং [সর্ববিষয়ে] আল্লাহর হাওয়ালা করুন وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا আর আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট, কার্য সম্পাদনে।

(৮২) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ তবে কি তারা কুরআনে মনঃসংযোগ করে না? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ আর যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে হতো لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا তবে তার মধ্যে তারা বহু বৈসাদৃশ্য পেত।

(৮৩) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ আর যখন তাদের নিকট কোনো বিষয়ের খবর পৌছে مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ তা নিরাপত্তার হোক বা ভয়েরই হোক أَذَاعُوا بِهِ তবে তা [তৎক্ষণাৎ] প্রচার করে দেয় وَلَوْ رَدُّوهُ আর যদি তারা তাকে সমর্পণ করত إِلَى الرَّسُولِ রাসূলের উপর وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ এবং তাদের মধ্যে যারা এরূপ বিষয় বুঝতে সক্ষম তাদের উপর لَعَلِمَهُ তা হলে তাকে তারা জেনেই নিত الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ যারা তাদের মধ্যে সংবাদের সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করে নেয় وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমত না হতো, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ তবে তোমরা সকলেই শয়তানের অনুগামী হতে إِلَّا قَلِيلًا অল্প কয়েকজন ব্যতীত।

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا (٨٤)

অনুবাদ : (৮৪) অতএব, আপনি আল্লাহর পথে জিহাদ করুন! আপনার প্রতি আপনার নিজের কর্ম ব্যতীত কোনো আদেশ নেই এবং মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করুন, আল্লাহ থেকে এই আশা যে, তিনি কাফেরদের সংগ্রাম শক্তিকে প্রতিরোধ করে দিবেন, আর আল্লাহ তা'আলা সংগ্রাম শক্তিতে অধিক দৃঢ় এবং শাস্তি প্রদানেও অধিক কঠোর।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا (٨٥)

(৮৫) যে ব্যক্তি সৎ সুপারিশ করবে, সে এর দরুন [ছওয়াবের] অংশ প্রাপ্ত হবে, এবং যে ব্যক্তি অসৎ সুপারিশ করবে, সে তার দরুন [গুনাহর] অংশ প্রাপ্ত হবে, বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়োপরি শক্তিমান।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا (٨٦)

(৮৬) আর যখন কেউ তোমাদেরকে সালাম করে, তখন তোমরা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বাক্যে সালাম [এর উত্তর] অথবা সেই শব্দটাই [উত্তরে] বলে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ের হিসাব নিবেন।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا (٨٧)

(৮৭) আল্লাহ এরূপ যে, তিনি ভিন্ন কেউই মা'বূদ হওয়ার যোগ্য নয়, তিনি নিশ্চয় তোমাদেরকে একত্র করবেন কিয়ামত দিবসে– তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর আল্লাহ তা'আলার চেয়ে কার কথা অধিক সত্য হবে?

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৪) فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অতএব, আপনি আল্লাহর পথে জিহাদ করুন! لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ আপনার প্রতি আপনার নিজের কর্ম ব্যতীত কোনো আদেশ নেই وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করুন عَسَى اللّٰهُ আল্লাহ হতে এই আশা যে اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তিনি কাফেরদের সংগ্রাম শক্তিকে প্রতিরোধ করে দিবেন وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا আর আল্লাহ তা'আলা সংগ্রাম শক্তিতে অধিক দৃঢ় وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا এবং শাস্তি প্রদানেও অধিক কঠোর।

(৮৫) مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً যে ব্যক্তি সৎ সুপারিশ করবে يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا সে এর দরুন [ছওয়াবের] অংশ প্রাপ্ত হবে وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً এবং যে ব্যক্তি অসৎ সুপারিশ করবে يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا সে তার দরুন [গুনাহর] অংশ প্রাপ্ত হবে وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়োপরি শক্তিমান।

(৮৬) وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ আর যখন কেউ তোমাদেরকে সালাম করে فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ তখন তোমরা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বাক্যে সালাম কর اَوْ رُدُّوْهَا অথবা সেই শব্দটাই [উত্তরে] বলে দাও اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয় আল্লাহ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا সকল বিষয়ের হিসাব নিবেন।

(৮৭) اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আল্লাহ এরূপ যে, তিনি ভিন্ন কেউই মা'বূদ হওয়ার যোগ্য নয় لَيَجْمَعَنَّكُمْ তিনি নিশ্চয় তোমাদেরকে একত্র করবেন اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে– لَا رَيْبَ فِيْهِ তাতে কোনো সন্দেহ নেই وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا আর আল্লাহ তা'আলার চেয়ে কার কথা অধিক সত্য হবে?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৮৩) قوله وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুসলিম শরীফের বর্ণনা মতে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল যে, রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনি ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসেন। সেখানে তিনি অন্যান্য মানুষদেরকে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পেলেন। কাজেই তিনি আর কাল বিলম্ব না করেই রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট গিয়ে রাসূল ﷺ –কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি কি নিজ পত্নীদেরকে তালাক দিয়েছেন? রাসূল ﷺ বললেন, না। হযরত ওমর (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম الله اكبر আল্লাহ অতি মহান। অতঃপর আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিয়ে বললাম, রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর : ৫৩০/১, ফাতহুল কাদীর : ৪৯১/১, বাহরে মুহীত : ৩১৮/৩]

(৮৪) قوله فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সে জন্যে জিলকদ মাসে কাফেরদের ওয়াদা অনুযায়ী বদরে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে যাওয়া অত্যাবশ্যকীয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে তা বদরে সুগরা বলে খ্যাত। সে সময়ে অনেক সাহাবীই ওহুদে অংশ গ্রহণ করার কারণে ক্ষত বিক্ষত ছিলেন। আবার অনেকেই উড়ো খবর বা গুজবের ভিত্তিতে তাতে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। সে প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। তাতে রাসূল ﷺ কে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন যে, অন্য কেউ অভিযানে অংশ গ্রহণ না করলেও আপনি একাই যাবেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাহায্য করবেন। এ নির্দেশ পেয়েই ৭০ জন সাথি নিয়ে বদরে সুগরার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা আবূ সুফিয়ান ও কাফের কুরাইশদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করে দিলেন। ফলে কোনো মোকাবিলা ছাড়াই রাসূল ﷺ সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে নিজ সঙ্গী-সাথিদেরকে সাথে নিয়ে ফিরে আসেন। –[মা'আরেফুল নুযূল : ৩৩২/১]

নেতৃত্বদানকারীদের প্রতি বিশেষ হেদায়েত : فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا মুনাফিকরা যখন আপনার নিকট আসে, তখন বলে যে, আমরা আপনার নির্দেশ কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা নাফরমানি করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, তখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর বড় কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ কে হেদায়েত দান করেছেন যে, এসব বিষয়ে আপনি কোনো পরোয়া করবেন না। আপনি আপনার যাবতীয় কাজ আল্লাহর উপর ভরসা করে চালিয়ে যেতে থাকুন। কারণ আপনার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মানুষের নেতৃত্ব দান করতে যাবে, তাদেরকে নানা রকম জটিলতা অতিক্রম করতেই হবে। মানুষ তাদের প্রতি নানারকম উল্টা-সিধা অপবাদ আরোপ করবে। বন্ধুরূপি বহু শত্রুও থাকবে। এসব সত্ত্বেও সে নেতার পক্ষে সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত। যদি তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সঠিক হয়, তবে ইনশাআল্লাহ কৃতকার্যতা অবশ্যই তার পদচুম্বন করবে।

কুরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা : أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মানবকুলকে আহ্বান জানিয়েছেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ তা'আলা أَفَلَا يَقْرَءُونَ না বলে أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ বলেছেন এতে বাহ্যতঃ একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলেই বুঝা যায়। তা হলো এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা যদি গভীর মনোযোগের সাথে কুরআনের প্রতি লক্ষ্য করে, তাহলে তারা এর অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাবে না। আর এ বিষয়টি একমাত্র চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। শুধুমাত্র তেলাওয়াত বা আবৃত্তির দ্বারা– যাতে তাদাব্বুর বা চিন্তা-গবেষণা অনুপস্থিত থাকবে, তাতে বহুবিধ বৈপরীত্য দেখা যাবে, যা বাস্তবের পরিপন্থি।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রতিটি মানুষ কুরআনের উপর গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করুক, এটাই হলো কুরআনের চাহিদা। কাজেই কুরআন সম্পর্কিত চিন্তা-গবেষণা কিংবা তার পর্যালোচনা করা শুধুমাত্র ইমাম-মুজতাহিদগণেরই একক দায়িত্ব– এমন মনে করা যথার্থ নয়। জ্ঞান-বুদ্ধির পর্যায়ের মতোই অবশ্যই চিন্তা-গবেষণা এবং পর্যালোচনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। ইমাম মুজতাহিদগণের গবেষণা-পর্যালোচনা একটি আয়াত থেকে বহু বিষয় উদ্ভাবন করবে। ওলামা সম্প্রদায়ের চিন্তা-গবেষণা এসব বিষয় উপলব্ধি করবে। আর সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায়

কুরআনের তরজমা-অনুবাদ পড়ে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন তাতে তাদের মনে সৃষ্টি হবে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্বের ধারণা ও ভালোবাসা। এটাই হলো কৃতকার্যতার মূল চাবিকাঠি। অবশ্য জনসাধারণের জন্য ভুলবোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে কোনো বিজ্ঞ আলেমের নিকট কুরআন পাঠ করা উত্তম। আর তা সম্ভব না হলে কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসীর অধ্যায়ন করবে এবং কোনো জটিলতা বা সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলে নিজের মন মতো তার কোনো সমাধান করবে না; বরং বিজ্ঞ কোনো আলেমের সাহায্য নিবে।

কুরআন ও সুন্নাহর তাফসীরের কয়েকটি শর্ত : উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনা করার অধিকার প্রতিটি লোকেরই রয়েছে। কিন্তু আমরা বলেছি যে, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনার স্তরভেদ রয়েছে, সে মতে প্রত্যেক স্তরের হুকুমও পৃথক পৃথক। যে মুজতাহিদ সুলভ গবেষণার দ্বারা কুরআনে হাকীমের ভিতর থেকে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মীমাংসাজনিত সিদ্ধান্ত বের করা হয়, তার জন্য তার লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করে নেওয়া অপরিহার্য, যাতে নির্ভুল মর্ম নির্ণয় করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে যদি তার পটভূমি সংক্রান্ত জ্ঞান মোটেই না থাকে, কিংবা স্বল্প পরিমাণ থাকে, তাহলে বুঝাতে হবে, একজন মুজতাহিদের যে সব গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা তার মধ্যে নেই। বলাবাহুল্য, তাহলে সে আয়াতের দ্বারা যেসব মর্ম উদ্ভাবন করবে, তাও হবে ভ্রান্ত। এমতাবস্থায় আলেম সম্প্রদায় যদি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তা হবে একান্তই ন্যায়সঙ্গত।

যে লোক কোনো দিন মেডিক্যাল কলেজের ছায়াও মাড়ায়নি, সে যদি আপত্তি তুলে বসে যে, দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারদের একক আধিপত্য কেন দেওয়া হলো? একজন মানুষ হিসেবে আমারও সে অধিকার রয়েছে। কিংবা কোনো নির্বোধ যদি বলতে শুরু করে যে, দেশে নদীনালা, পুল-নর্দমা প্রভৃতি সংস্কার ও নির্মাণের ঠিকাদার শুধুমাত্র বিজ্ঞ প্রকৌশলীদেরকে কেন দেওয়া হবে? আমিও তো একজন নাগরিক হিসেবে এ দায়িত্ব পালনের অধিকারী। অথবা বিকৃত-বুদ্ধির কোনো লোক যদি এমন আপত্তি তুলতে আরম্ভ করে যে, দেশের সংবিধান বা আইন-কানুনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শুধু আইনবিদদের একচ্ছত্র অধিকার হবে কেন? আমিও একজন বুদ্ধিমান নাগরিক হিসেবে একাজ সম্পাদন করতে পারি। তখন নিঃসন্দেহে এসব লোককে বলা হবে যে, দেশের নাগরিক হিসেবে অবশ্যই এসব কাজ সমাধা করার অধিকার তোমরাও রয়েছ, কিন্তু এ সমস্ত কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করতে গিয়ে যে বছরের পর বছর মাথা ঘামাতে হয়, সুবিজ্ঞ শিক্ষকদের নিকট এসব শাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং সে জন্য যেসব সনদ হাসিল করতে হয়, তোমরাও প্রথমে সে কষ্টটুকু স্বীকার করে আস। তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তোমরাও এ সমস্ত কার্য সম্পাদনে সমর্থ হবে। কিন্তু এ কথাগুলোই যদি কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মতো সূক্ষ্ম ও জটিল কাজের বেলায় বলা হয়, তাহলে তখন আলেম সমাজের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে শ্লোগান উত্থিত হয়। তাহলে কি সমগ্র বিশ্বে শুধুমাত্র কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানটিই এমন লা-ওয়ারিশ রয়ে গেছে যে, এ ব্যাপারে যে কোনো লোক নিজ নিজ ভঙ্গিতে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিকার সংরক্ষণ করবে। যদি সে লোক কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানার্জনে কয়েকটি মাসও ব্যয় না করে থাকে, তবুও কি?

কিয়াস একটি দলিল : এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও বুঝা যাচ্ছে যে, কোনো মাসআলার বিশ্লেষণ যদি কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে সরাসরি না পাওয়া যায়, তাহলে তাতেই চিন্তা-ভাবনা করে সমাধান বের করার চেষ্টা করা কর্তব্য। আর একেই শরিয়তের পরিভাষায় 'কিয়াস' বলা হয়।

বহু মতবিরোধ ও তার ব্যাখ্যা : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا এ আয়াতে উল্লিখিত اِخْتِلَافٌ كَثِيْرٌ [বা বহু মতবিরোধ] এর মর্ম এই যে, যদি কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ একটি হয়, তবে বহু বিষয়ে মতবিরোধও বহু হয়ে থাকে। –[বয়ানুল কুরআন] কিন্তু এখানে [অর্থাৎ কুরআনে] কোনো একটি বিষয়েও কোনো মতবিরোধ বা মতপার্থক্য নেই। অতএব, এটা একান্তভাবেই আল্লাহর কালাম। মানুষের কালামে এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য হতেই পারে না। এর কোথাও না আছে ভাষালঙ্কারের কোনো ত্রুটি, না আছে তাওহীদ, কুফর, কিংবা হারাম হালালের বিবরণে কোনো স্ববিরোধিতা ও পার্থক্য। তাছাড়া গায়েবি বিষয়সমূহের মাঝেও এমন কোনো সংবাদ নেই, যা প্রকৃত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি না আছে কুরআনের ধারাবাহিকতার কোনো পার্থক্য যে, একটি হবে অলঙ্কারপূর্ণ আরেকটি হবে অলঙ্কারহীন। প্রত্যেক মানুষের ভাষ্য-বিবৃতি ও রচনা সঙ্কলনে পরিবেশের কম-বেশি প্রভাব অবশ্যই থাকে– আনন্দের সময় তা এক ধরনের হয়, আবার বিষাদে হয় অন্য রকম। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় এক রকম, আবার অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় অন্য রকম। কিন্তু কুরআন এ ধরনের যাবতীয় ত্রুটি, পার্থক্য ও স্ববিরোধিতা থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। আর এটাই হলো কালামে-এলাহী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যাচাই না করে কোনো কথা রটনা করা মহাপাপ : এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোনো শোনা কথা যাচাই-অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বর্ণনা করা উচিত নয়। রাসূলে কারীম ==-এর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "কোনো লোকের পক্ষে মিথ্যাবাদি হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোনো রকম যাচাই না করেই সমস্ত শোনা কথা প্রচার করে।"

অপর এক হাদীসে তিনি আরো বলেছেন, "যে লোক এমন কোনো কথা বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে দু'জন মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী। –[ইবনে কাছীর]

'উলুল আমর' কারা : وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ আয়াতে উল্লিখিত إِسْتِنْبَاطٌ শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কূপের গভীরতা থেকে পানি তোলা সে জন্যই কূপ খননকালে প্রথমে যে পানি বেরোয় তাকে আরবিতে مَاءٌ مُسْتَنْبَطٌ বলা হয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো কোনো বিষয়ের গভীরে গিয়ে তার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। –[কুরতুবী]

'উলুল-আমর' বা দায়িত্বশীল লোক নির্ণয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

হযরত হাসান, কাতাদা ও ইবনে আবী লায়লা (র.) প্রমুখের মতে দায়িত্বশীল লোক বলতে ওলামা ও ফকিহগণকে বুঝায়। হযরত সুদ্দী (র.) বলেন যে, এর দ্বারা শাসনকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে বুঝায়। আল্লামা আবূ বকর জাসসাস এতদুভয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক ব্যাপার হলো এই যে, এতদুভয় অর্থই ঠিক। কারণ 'উলুল আমর' শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যে, 'উলুল আমর' বলতে ফকিহগণকে বুঝানো যেতে পারে না। তার কারণ أُولُو الْأَمْرِ [উলুল আমর] শব্দটি তার শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে সে সমস্ত লোককে বুঝায়, যাদের হুকুম বা নির্দেশ চলতে পারে। বলাবাহুল্য, এ কাজটি ফকীহগণের নয়। প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, হুকুম চলার দুটি প্রেক্ষিত রয়েছে, এক. জবরদস্তিমূলক, এটা শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠী বা সরকার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। দুই. বিশ্বাস ও আস্থার দরুন হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহগণই অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং যা সর্বযুগের মুসলমানদের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ধর্মীয় ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানগণ নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলেম সম্প্রদায়ের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত করে থাকে। তাছাড়া শরিয়তের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের হুকুম মান্য করা ওয়াজিবও বটে। সুতরাং তাঁদের ক্ষেত্রেও 'উলুল আমর'-এর প্রয়োগ যথার্থ হবে। –[আহকামুল কুরআন, জাসসাস]

আধুনিক সমস্যাবলি সম্পর্কিত বিষয়ে কিয়াস ও ইজতেহাদ : এ আয়াতের দ্বারা একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, যেসব বিষয়ে কোনো নস তথা কুরআন হাদীসের সরাসরি কোনো বিধান নেই, সেগুলোর হুকুম 'ইজতেহাদ' ও কিয়াসের রীতি অনুযায়ী কুরআনের আয়াত থেকে উদ্ভাবন করতে হবে। তার কারণ, এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আধুনিক কোনো বিষয়ের সমাধানকল্পে রাসূলে কারীম == -এর বর্তমানে তাঁর নিকট যাও। আর যদি তিনি বর্তমান না থাকেন, তাহলে ফকিহগণের নিকট যাও। কারণ তাঁদেরই মধ্যে বিধান উদ্ভাবন করার মতো পরিপূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে।

এই বর্ণনার দ্বারা কতিপয় বিষয় প্রতীয়মান হয়। যথা, 'নস' বা কুরআন হাদীসের সরাসরি নির্দেশের অবর্তমানে আলেমদের কাছে যেতে হবে।

- দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর নির্দেশ দু'রকম। কিছু হলো সরাসরি 'নস' বা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক এবং কিছু হলো পরোক্ষ ও অস্পষ্ট, যা আল্লাহ তা'আলা আয়াতসমূহের গভীরে নিহিত রেখেছেন।
- তৃতীয়তঃ এ ধরনের অন্তর্নিহিত মর্মগুলো কিয়াস ও ইজতেহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা আলেম সম্প্রদায়ের একান্ত দায়িত্ব।
- চতুর্থতঃ এসব বিধানের ক্ষেত্রে আলেম সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা সাধারণ মানুষের অবশ্য কর্তব্য। –[আহকামুল কুরআন, জাসসাস]

রাসূলে কারীম ==-এর প্রমাণ উদ্ভাবন সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত : لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলে কারীম == ও দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার কারণ, আয়াতে দু'রকম লোকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের একজন হলেন রাসূলে আকরাম == এবং অপরজন হচ্ছেন 'উলুল আমর'। অতঃপর বলা হয়েছে لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ আর এই নির্দেশটি হলো ব্যাপক। এতে উল্লিখিত দু'রকম লোকের মধ্যে কাউকেও নির্দিষ্ট করা হয়নি। অতএব, এতে প্রমাণিত হয় যে, হুজুর == নিজেও আহকাম উদ্ভাবন-সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত। –[আহকামুল কুরআন, জাসসাস]

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় : ১. কারো মনে যদি এমন কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এ আয়াতের দ্বারা শুধুমাত্র এতটুকুই বুঝা যায় যে, শত্রুর ভয়-শঙ্কা সম্পর্কে তোমরা নিজে নিজে কোনো রটনা করো না; বরং যারা জ্ঞানী ব্যক্তি এবং যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় তাদের সাথে যোগাযোগ কর। তারা চিন্তা-ভাবনা করে যা করতে বলবেন তোমরা সে মতেই কাজ করবে। বলাবাহুল্য, দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

তাহলে তার উত্তর এই যে, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ বাক্যে শত্রুর কোনো উল্লেখ নেই। কাজেই এ নির্দেশ ভয় ও শান্তি উভয় অবস্থাতেই ব্যাপক। এ নির্দেশের সম্পর্ক যেমন শত্রুর সাথে, তেমনিভাবে দুর্যোগ সংক্রান্ত সমস্যার সাথেও বটে। কারণ যখন কোনো নতুন বিষয় বা মাসআলা সাধারণ মানুষের সামনে উদ্ভব হয়, যার হালাল হওয়া কিংবা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সরাসরি কুরআন বা হাদীসের কোনো নির্দেশ নেই, তখন তারা বিরাট দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তারা বুঝে উঠতে পারে না, কোন দিকটি তারা গ্রহণ করবে। অথচ উভয় দিকেই লাভ-ক্ষতি উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। এমন অবস্থায় শরিয়ত সবচেয়ে উত্তম পথ বাতলে দিয়েছে। তাহলো উদ্ভাবন اِسْتِنْبَاطٌ কর। উদ্ভাবনের মাধ্যমে যা পাওয়া যায়, তারই উপর আমল করবে। –[আহকামুল কুরআন, জাসসাস]

ইজতিহাদ ও ইস্তেম্বাত বলিষ্ঠ ধারণা সৃষ্টি করে, নিশ্চিত বিশ্বাস নয় : ২. এস্তেম্বাত -এর মাধ্যমে আলেমগণ যে নির্দেশ উদ্ভাবন করবেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে একথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ তা'আলার নিকটও এটাই নিশ্চিতভাবে সত্য ও সঠিক; বরং এই নির্দেশ বা বিধানটি সম্পূর্ণভাবে অভ্রান্ত নাও হতে পারে। তবে তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে থাকে, যা আমল করার জন্য যথেষ্ট। –[আহকামুল কুরআন, জাসসাস]

কুরআনি বিধানের বর্ণনাশৈলি : فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ এ আয়াতের প্রথম বাক্যে রাসূলে কারীম ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "আপনি একাই যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে পড়েন; কেউ আপনার সাথে থাকুক বা নাই থাকুক।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যে একথাও বলা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দানের পরেও যদি তারা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে আপনার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল, তাদের কর্মের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে– "আশা করা যায় আল্লাহ কাফেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দিবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দিবেন। আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন।" অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ তা'আলার সমর্থন রয়েছে, যার সমরশক্তি কাফেরদের শক্তি অপেক্ষা অসংখ্যগুণ বেশি, তখন আপনার বিজয়ই অবশ্যম্ভাবী ও নিশ্চিত। তারপর এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শাস্তির কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ শাস্তি কেয়ামতের দিনেই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক, যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন আমার শক্তি অপরাজেয়, তেমনি শাস্তি দানের ক্ষেত্রেও আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

সুপারিশের স্বরূপ, বিধি ও প্রকারভেদ : مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً এ আয়াতে শাফা'আত অর্থাৎ, সুপারিশকে ভালো ও মন্দ দু'ভাগে বিভক্ত করার পর এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সুপারিশ যেমন মন্দ নয়, তেমনি প্রত্যেক সুপারিশ ভালোও নয়। আরো বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভালো সুপারিশ করবে, সে ছওয়াবের অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে, সে আজাবের অংশ পাবে। আয়াতে ভালো সুপারিশের সাথে نَصِيبٌ শব্দ এবং মন্দ সুপারিশের সাথে كِفْلٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানে উভয় শব্দের অর্থই এক। অর্থাৎ, কোনো কিছুর অংশবিশেষ। কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় نَصِيبٌ শব্দটি ভালো অংশ এবং كِفْلٌ শব্দটি মন্দ অংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যদিও কখনো ভালো অংশেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, কুরআন পাকে كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ (তাঁর রহমতের দু'টি অংশ) ব্যবহার করা হয়েছে।

شَفَاعَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ মিলিত হওয়া বা মিলিত করা। এ কারণেই আরবি ভাষায় شُفْعَةٌ শব্দ জোড় অর্থে এবং বিপরীতে وِتْرٌ শব্দ বিজোড় অর্থে ব্যবহার করা হয়। অতএব شَفَاعَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোনো দুর্বল অধিকার প্রার্থীর সাথে স্বীয় শক্তি যুক্ত করে তাকে দেওয়া কিংবা অসহায় এক ব্যক্তির সাথে নিজে মিলিত হয় তাকে জোড় করে দেওয়া।

এতে জানা গেল যে, বৈধ শাফায়াত ও সুপারিশের একটি শর্ত এই যে, যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে, তার দাবি সত্য ও বৈধ হতে হবে এবং অপর শর্ত এই যে, দুর্বলতার কারণে সে স্বীয় দাবি প্রবলদের কাছে স্বয়ং উত্থাপন করতে পারবে না। এতে বুঝা গেল, অসত্য সুপারিশ করা অথবা অপরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে মন্দ সুপারিশ। নিজ সম্পর্কে ব্যবহার করলে কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তিজনিত চাপ ও জবরদস্তি প্রয়োগ করা হলে জুলুম হওয়ার কারণে তাও অবৈধ। কাজেই এরূপ সুপারিশও মন্দ সুপারিশেরই অন্তর্ভুক্ত।

এখন আলোচ্য আয়াতের সারবস্তু এই যে, যে ব্যক্তি কারো বৈধ অধিকার ও বৈধ কাজের জন্য বৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সেও ছওয়াবের অংশ পাবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো অবৈধ কাজের জন্য অথবা অবৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সে আজাবের অংশ পাবে।

অংশ পাওয়ার অর্থ এই যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয়, সে যখন এ উৎপীড়িতের কিংবা বঞ্চিতের কার্যোদ্ধার করে দিবে, তখন কার্যোদ্ধারকারী ব্যক্তি যেমন ছওয়াব পাবে, তেমনি সুপারিশকারীও ছওয়াব পাবে।

এমনিভাবে কোনো অবৈধ কাজের সুপারিশকারীও গুনাহগার হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুপারিশকারীর ছওয়াব কিংবা আজাব তার সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বাবস্থায় সে নিজ অংশ পাবে।

রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : "যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, সেও ততটুকু ছওয়াব পায়, যতটুকু সৎকর্মী পায়।" –[মাযহারী]

সুনানে ইবনে মাজায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে হত্যার কাজে একটি বাক্য দ্বারাও সাহায্য করে, তাকে কিয়ামতে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তার কপালে লিখিত থাকবে; "এ ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত ও নিরাশ।" –[মাযহারী]

এতে জানা গেল যে, সৎকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যেমন একটি সৎকাজ, তেমনি অসৎ ও পাপ কাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা সহযোগিতা প্রদান করা সমান গুনাহ।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে : وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا; অভিধানিক দিক দিয়ে مُقِيْتٌ শব্দের অর্থ তিনটি এক. শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান, দুই. উপস্থিত ও দর্শক এবং তিন. রুজি বন্টনকারী। উল্লিখিত বাক্যে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের অর্থ হবে– আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। যে কাজ করে এবং যে সুপারিশ করে তাদেরকে প্রতিদান কিংবা শাস্তিদান তাঁর পক্ষে কঠিন নয়।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের উদ্দেশ্য হবে– আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর পরিদর্শক ও প্রত্যেক বস্তুর সামনে উপস্থিত। কে কোন নিয়তে সুপারিশ করে; আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যার্থে করে, না ঘুষ হিসেবে তার কাছ থেকে কোনো মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে করে, তিনি সে সবই জানেন।

তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের মর্ম হবে রিজিক ও রুজি বন্টনের কাজে আল্লাহ স্বয়ং জিম্মাদার। যার জন্য যতটুকু লিখে দিয়েছেন, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে। কারো সুপারিশে তিনি প্রভাবিত হবেন না; বরং যাকে যতটুকু ইচ্ছা দিবেন। তবে সুপারিশকারী ব্যক্তি মাঝখান থেকে ছওয়াব পেয়ে যাবে। কেননা এটা হচ্ছে দুর্বলের সাহায্য।

হাদীসে বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য অব্যাহত রাখেন, যতক্ষণ সে কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে ব্যাপৃত থাকে। তোমরা সুপারিশ কর, ছওয়াব পাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরের মাধ্যমে যে ফয়সালা করেন তাতে সন্তুষ্ট থাক।"

এ কারণেই কুরআন পাকের ভাষায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, সুপারিশের ছওয়াব ও আজাব সুপারিশ সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সুপারিশ করলেই সর্বাবস্থায় ছওয়াব অথবা আজাব হবে। আপনি ভালো সুপারিশ করলেই ছওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবেন এবং মন্দ সুপারিশ করলেই আজাবের যোগ্য হয়ে পড়বেন– আপনার সুপারিশ কার্যকারী হোক বা না হোক।

তাফসীরে বাহরে মুহীত, বয়ানুল কুরআন প্রভৃতি গ্রন্থে مَنْ يَّشْفَعْ বাক্যে مِنْهَا শব্দটিকে سَبَبٌ সাব্যস্ত করে এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে তাফসীরবিদ মুজাহিদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুপারিশকারী সুপারিশের ছওয়াব পাবে, যদি তার সুপারিশ গ্রহণ করা নাও হয়। এ বিষয়টি শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং অন্যের কাছে সুপারিশ করেই সুপারিশকারী যেন ক্ষান্ত হয়ে যায়, তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর মুক্ত করা বাঁদী বারীরা আজাদ হওয়ার পর স্বীয় স্বামী মুগীছের কাছ থেকে শরিয়ত সম্মতরূপে বিচ্ছেদ নিয়েছিলেন। বিচ্ছেদ হওয়ার পর মুগীছ বরীরার ভালোবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুগীছকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য বরীরার কাছে সুপারিশ করেন। বরীরা আরজ করলেন; ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি আপনার নির্দেশ হলে শিরোধার্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন তাতে সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নির্দেশ নয়; বরং সুপারিশই। বরীরা জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নীতির বাইরে অসন্তুষ্ট হবেন না। তাই পরিষ্কার ভাষায় আরজ করলেন : তাহলে আমি এ সুপারিশ গ্রহণ করব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃষ্টচিত্তে তাকে তদবস্থায়ই থাকতে দিলেন।

এ ছিল সুপারিশের স্বরূপ। শরিয়তের দৃষ্টিকোণে এ জাতীয় সুপারিশ দ্বারাই ছওয়াব পাওয়া যায়। আজকাল বিকৃত আকারের যে সুপারিশ মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে, তা প্রকৃতপক্ষে সুপারিশ নয়; বরং এ হচ্ছে সম্পর্ক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা। এ কারণেই আজকাল সুপারিশ গ্রহণ করা না হলে সুপারিশকারী অসন্তুষ্ট হয়ে যায়; বরং শত্রুতা সাধনে উদ্যত হয়। অথচ বিবেক ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাপ সৃষ্টি করা জবরদস্তির অন্তর্ভুক্ত এবং কঠোর গুনাহ। এটি কারো অর্থ সম্পদ কিংবা কারো অধিকার জবরদস্তি করায়ত্ত করে নেওয়ার মতোই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শরিয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে স্বাধীন ছিল। আপনি জোর-জবরদস্তি করে তার স্বাধীনতা হরণ করলেন। সুতরাং এ হচ্ছে একজনের অভাব দূর করার জন্য অন্যের ধন-সম্পদ চুরি করে বিলিয়ে দেওয়ার অনুরূপ। সুপারিশের বিনিময় গ্রহণ করা ঘুষ। হাদীসে একে سُحْتٌ বা হারাম বলা হয়েছে। আর্থিক ঘুষ হোক কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শ্রমের বিনিময়ে নিজের কোনো কাজ হাসিল করা হোক– সর্বপ্রকার ঘুষই এর অন্তর্ভুক্ত।

কাশশাফ প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে : ঐ সুপারিশ ভালো, যার উদ্দেশ্য কোনো মুসলমানের অধিকার পূর্ণ করা অথবা তার কোনো বৈধ উপকার করা অথবা ক্ষতির কবল থেকে তাকে রক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ সুপারিশটিও কোনো জাগতিক লাভালাভ অর্জনের জন্য না হওয়া চাই; বরং আল্লাহর ওয়াস্তে দুর্বলের সমর্থনের লক্ষ্যে হওয়া উচিত এবং সুপারিশ করে কোনো আর্থিক অথবা কায়িক ঘুষ না নেওয়া চাই। এ সুপারিশ কোনো অবৈধ কাজে না হওয়া চাই এবং যে অপরাধের শাস্তি কুরআনে নির্ধারিত রয়েছে, এরূপ কোনো অপরাধ মাফ করাবার জন্যও না হওয়া চাই।

বাহরে মুহীত, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে : কোনো মুসলমানের অভাব-অনটন দূর করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করাও ভালো সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত। এতে দোয়াকারীও ছওয়াব পায়। এক হাদীসে আছে, যখন কেউ মুসলমান ভাইয়ের জন্য নেক দোয়া করে, তখন ফেরেশতাগণ বলেন وَلَكَ بِمِثْلٍ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমারও অভাব দূর করুন।

সালাম ও ইসলাম : وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সালাম ও তার জওয়াবের আদব বর্ণনা করেছেন।

تَحِيَّةٌ শব্দের ব্যাখ্যা ও এর ঐতিহাসিক পটভূমি : تَحِيَّةٌ-এর শাব্দিক অর্থ– حَيَّاكَ اللّٰهُ [আল্লাহ তোমাকে জীবিত রাখুন] বলা। ইসলামপূর্ব কালে আরবরা পরস্পরের সাক্ষাৎকালে একে অন্যকে حَيَّاكَ اللّٰهُ কিংবা أَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا কিংবা أَنْعِمْ صَبَاحًا ইত্যাদি সম্ভাষণে সালাম করত। ইসলাম এ সালাম পদ্ধতি পরিবর্তন করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার রীতি করেছে। এর অর্থ, তুমি সর্বপ্রকার কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাক।

ইবনে আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেন : 'সালাম' শব্দটি আল্লাহ তা'আলার উত্তম নামসমূহের অন্যতম। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এর অর্থ এই যে, رَقِيْبٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সংরক্ষক।

ইসলামি সালাম অন্যান্য জাতির সালাম থেকে উত্তম : জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের সময় ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থে কোনো না কোনো বাক্য আদান প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামি সালাম যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোনো সালাম ততটুকু নয়। কেননা এতে শুধু ভালোবাসাই প্রকাশ করা হয় না; বরং সাথে সাথে ভালোবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয় যে, আল্লাহ আপনাকে সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। আর এ দোয়াটি আরবদের প্রথা অনুযায়ী শুধু জীবিত থাকার দোয়া নয়; বরং পবিত্র জীবনের দোয়া অর্থাৎ, সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া। এতে এ বিষয়েরও অভিব্যক্তি রয়েছে যে, আমরা ও তোমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা একে অপরের উপকার করতে পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি একাধারে একটি ইবাদত এবং মুসলমান ভাইকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেওয়ার একটি উপায়ও বটে।

ইবনে আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে ইমাম ইবনে উয়াইনার এ উক্তি উদ্ধৃতি করেছেন :

أَتَدْرِيْ مَا السَّلَامُ يَقُوْلُ أَنْتَ آمِنٌ مِنِّيْ অর্থাৎ সালাম কি বস্তু, তুমি জান? সালামকারী ব্যক্তি বলে যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে বিপদমুক্ত।

মোটকথা এই যে, ইসলামি সালামে বিরাট অর্থগত ব্যাপ্তি রয়েছে। যথা,

১. এতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার জিকির।
২. আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেওয়া।
৩. মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ।
৪. মুসলমান ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম দোয়া এবং
৫. মুসলমান ভাইয়ের সাথে এ চুক্তি যে, আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোনো কষ্ট হবে না।

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ সেই প্রকৃত মুসলমান।" আয়াতে বিষয়বস্তুর উপসংহারে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর হিসাব নিবেন।" মানুষ এবং ইসলামি অধিকার; যথা সালাম ও সালামের জওয়াব ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এগুলোরও হিসাব নিবেন। এরপর বলা হয়েছে।

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাকেই উপাস্য মনে কর এবং যে কাজই কর, তাঁর ইবাদতের নিয়তে কর; তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। ঐ দিন সবাইকে প্রতিদান দিবেন। কিয়ামতের ওয়াদা, প্রতিদান ও শাস্তির সংবাদ সব সত্য। وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا কেননা এ সংবাদ আল্লাহর দেওয়া। আল্লাহর চাইতে অধিক কার কথা সত্য হতে পারে?

শব্দ বিশ্লেষণ

أَذَاعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِذَاعَةُ মূলবর্ণ (ذ - ى - ع) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা ছড়িয়ে দিল।

حَرِّضْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْرِيْضُ মূলবর্ণ (ح - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ– তুমি উৎসাহিত কর।

حُيِّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحِيَّةُ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয়েছে।

لَيَجْمَعَنَّكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف بانون ثقيلة বাব فَتَحَ মাসদার اَلْجَمْعُ মূলবর্ণ (ج - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– তিনি অবশ্যই একত্রিত করবেন।

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۭ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٨﴾

অনুবাদ : (৮৮) অনন্তর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা এই মুনাফিকদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলের দরুন তাদেরকে উল্টা দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তোমরা কি ইচ্ছা রাখ যে, এরূপ লোকদেরকে হেদায়েত করবে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীতে নিপতিত রেখেছেন? এবং যাকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীতে নিপতিত রাখেন, তার [মুমিন হওয়ার] জন্য কোনোই পথ খুঁজে পাবে না।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاۗءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاۗءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۠ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾

(৮৯) তারা এই আশা করে যে, যেমন তারা কাফের, তদ্রূপ তোমরাও কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা ও তারা একরূপ হয়ে যাও, অতএব, তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু বানিও না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে, আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে ধর এবং হত্যা কর, যেখানেই তাদেরকে পাও, আর তাদের মধ্যে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারীরূপেও নয়।

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَاۗءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ۭ

(৯০) কিন্তু যারা এরূপ যে, এমন লোকের সাথে মিলিত হয়, যাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে কিংবা তোমাদের নিকট এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে ও স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সংগ্রাম করতে সংকোচ বোধ করে [তাদের সম্বন্ধে এই নির্দেশ প্রযোজ্য নয়],

শাব্দিক অনুবাদ

(৮৮) فَمَا لَكُمْ অনন্তর তোমাদের কি হলো যে فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ তোমরা এই মুনাফিকদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে গেলে? وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উল্টা দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন بِمَا كَسَبُوْا তাদের আমলের দরুন اَتُرِيْدُوْنَ তোমরা কি ইচ্ছা রাখ যে اَنْ تَهْدُوْا হেদায়েত করবে مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ এরূপ লোকদেরকে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীতে নিপতিত রেখেছেন? وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ এবং যাকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীতে নিপতিত রাখেন فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا তার [মুমিন হওয়ার] জন্য কোনোই পথ খুঁজে পাবে না।

(৮৯) وَدُّوْا তারা এই আশা করে যে لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا যেমন তারা কাফের, তদ্রূপ তোমরাও কাফের হয়ে যাও فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاۗءً যাতে তোমরা ও তারা একরূপ হয়ে যাও فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاۗءَ অতএব, তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু বানিওনা حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে فَاِنْ تَوَلَّوْا আর যদি তারা বিমুখ হয় فَخُذُوْهُمْ তবে তাদেরকে ধর وَاقْتُلُوْهُمْ এবং হত্যা কর حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ যেখানেই তাদেরকে পাও وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا আর তাদের মধ্যে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না وَّلَا نَصِيْرًا এবং সাহায্যকারীরূপেও নয়।

(৯০) اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ কিন্তু যারা এরূপ যে, এমন লোকের সাথে মিলিত হয় بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ যাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে اَوْ جَاۗءُوْكُمْ কিংবা তোমাদের নিকট এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হয় যে حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ তাদের অন্তর সংকোচ বোধ করে اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ তোমাদের সাথে ও স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সংগ্রাম করতে [তাদের সম্বন্ধে এই নির্দেশ প্রযোজ্য নয়]

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا (٩٠)

অনুবাদ : আর যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করতেন, তবে তাদেরকে তোমাদের উপর প্রবল করে দিতেন, অনন্তর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত, অতএব, যদি তারা তোমাদের হতে নিবৃত্ত থাকে অর্থাৎ তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে শান্তি ভাব রক্ষা করে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের প্রতি [হত্যা বা আবদ্ধ করার] কোনো পন্থা [-এর অনুমতি] দেননি।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (٩١)

(৯১) তোমরা নিশ্চয় এমনও কতক লোক পাবে যারা [প্রবঞ্চনা করে] তাও কামনা করে যে, তোমাদের হতেও নিরাপদ হয়ে থাকে এবং স্বীয় সম্প্রদায় হতেও নিরাপদ হয়ে থাকে, যখনই তাদেরকে দুষ্টামির [ফ্যাসাদের] প্রতি আকৃষ্ট করা হয়, তখনই তারা তাতে পতিত হয়, সুতরাং এ সমস্ত লোক যদি তোমাদের হতে নিবৃত্ত না থাকে, এবং তোমাদের সাথে শান্তি রক্ষা না করে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে সংরুদ্ধ না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে ধর এবং হত্যা কর, যেখানে তাদেরকে পাও, এবং আমি তোমাদেরকে তাদের উপর উজ্জ্বল প্রমাণ দিয়েছি।

শাব্দিক অনুবাদ

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ আর যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করতেন لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ তবে তাদেরকে তোমাদের উপর প্রবল করে দিতেন فَلَقٰتَلُوْكُمْ অনন্তর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ অতএব, যদি তারা তোমাদের হতে নিবৃত্ত থাকে فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ এবং তোমাদের সাথে শান্তি ভাব রক্ষা করে فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের প্রতি [হত্যা বা আবদ্ধ করার] কোনো পন্থা [-এর অনুমতি] দেননি।

(৯১) سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ তোমরা নিশ্চয় এমনও কতক লোক পাবে يُرِيْدُوْنَ যারা [প্রবঞ্চনা করে] তাও কামনা করে যে اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ তোমাদের হতেও নিরাপদ হয়ে থাকে وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ এবং স্বীয় সম্প্রদায় হতেও নিরাপদ হয়ে থাকে كُلَّ مَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ যখনই তাদেরকে দুষ্টামির [ফ্যাসাদের] প্রতি আকৃষ্ট করা হয় اُرْكِسُوْا فِيْهَا তখনই তারা তাতে পতিত হয় فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ সুতরাং এ সমস্ত লোক যদি তোমাদের হতে নিবৃত্ত না থাকে وَيُلْقُوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ এবং তোমাদের সাথে শান্তি রক্ষা না করে وَيَكُفُّوْا اَيْدِيَهُمْ এবং স্বীয় হস্তসমূহকে সংরুদ্ধ না রাখে فَخُذُوْهُمْ তবে তোমরা তাদেরকে ধর وَاقْتُلُوْهُمْ এবং হত্যা কর حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ যেখানে তাদেরকে পাও وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا এবং আমি তোমাদেরকে তাদের উপর উজ্জ্বল প্রমাণ দিয়েছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৮৮) قوله فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আবদ বিন হুমাইদ মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদল মানুষ মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনায় পৌছল, তখন ঈমানদাররা ধারণা করেছিল যে, তারা হয়তো হিজরত করে চলে এসেছে। অতঃপর তারা মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ-এর নিকট অনুমতি তলব করে এই মর্মে যে, সেখানে তাদের ব্যবসায়িক দ্রব্যাদি রয়েছে। সে গুলো নিয়ে আসবে। সে সম্পর্কে তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে

এ মতবিরোধ দেখা দিল। কেউ বললেন যে, তারা হলো মুনাফিক, আবার কেউ বা বললেন, তারা ঈমানদার মুমিন সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের নিফাককে প্রকাশ করে দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন এবং তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। –[রূহুল মা'আনী – ১০৭/৩/৫]

ইবনে জারীর যাহহাক হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদল মানুষ রাসূল ﷺ-এর সাথে হিজরত না করে পশ্চাতে থেকে মক্কায় অবস্থান করেই ঈমানের দাবি করতে লাগল। কিন্তু তারা পরেও হিজরত করেনি। ফলে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তাদের সম্পর্কে মত পার্থক্যতা দেখা দিল। তখন সাহাবীগণ তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করতেন এবং আর কতক সাহাবীগণ তাদের দায় মুক্তিতা প্রকাশ করতেন এবং বলতেন যে, তারা রাসূল ﷺ থেকে মুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন।

শানে নুযূল– ২ : বুখারী, মুসলিম তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ তাদের হাদীস গ্রন্থে হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহুদ অভিযানে বের হন, তখন যারা তাঁর সাথে বের হয়েছিল, তাদের থেকে কতকজন ফিরে আসল, সাহাবায়ে কেরাম তখন তাদের সম্পর্কে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন। কেউ বলতেন তাদেরকে আমরা হত্যা করব। আবার কেউ বলতেন না, হত্যা করব না। তখন আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিরোধ নিরসন কল্পে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৩ : হযরত আবূ সালমা বিন আব্দুর রহমান তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াত এমন সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা মদিনার মুখামুখি দেখা হয়। তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হলো তোমরা যে ফিরে যাচ্ছ? তারা বলল, আমরা মদিনার মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পোহাচ্ছি। তখন তারা বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মাঝে কি তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা বা চারিত্র মাধুর্যতা নেই? সুতরাং কতক সাহাবী বললেন যে, তারা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। আর কেউ বললেন তারা মুনাফিক হয়নি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী – ২৯৮/৫]

(৮৮) قوله وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً الخ : **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে আবূ হাতেম হযরত হাসান এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সুরাকা বিন মালেক মুদলাজী তাদের নিকট বর্ণনা করে তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন ঐতিহাসিক বদর ও ওহুদ প্রান্তে বিজয়ী হন, তখন তার আশপাশের কিছু সংখ্যক লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। সুরাকা বলল, আমি জানতে পারলাম যে, রাসূল ﷺ খালেদ বিন ওয়ালিদকে আমার মুদলাজ গোত্রের প্রতি প্রেরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, আমি আপনাকে উপঢৌকন প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, রাসূল ﷺ বললেন, তোমার ইচ্ছানুযায়ী বস্তুর উপর সন্ধি আরোপ করার অধিকার দেওয়া গেল। সুরাকা বলল, আমি জানতে পারলাম আমার গোত্রের প্রতি অভিযান চালনা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আমিও তাদেরকে সন্ধিবদ্ধ হতে পরামর্শ দিচ্ছি। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার গোত্রবাসী যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তারা নিরাপদ থাকবে। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে তোমার গোত্রবাসীকে চাপের মুখে ফেলা যাবে না। তখন রাসূল ﷺ খালেদ বিন ওয়ালিদের হাতে ধরে বললেন, তুমি তার সাথে যাও সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সে সিদ্ধান্তানুপাতে তুমি কর্ম পন্থা অবলম্বন করবে। অতঃপর খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন এ শর্তের ভিত্তিতে যে, তারা রাসূল ﷺ-এর বিপক্ষে কাউকে কোনো প্রকারের সাহায্য সহযোগিতা করবে না। কুরাইশরাও যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তারাও নিরাপদে থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ৫৩৩/১, রূহুল মা'আনী : ১০৯/৩/৫]

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, ইবনে আবূ হাতেম ইকরিমার সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হেলাল বিন ওয়াইমির আসলামী, সুরাকা বিন মালেক আল-মুদলাজী ও বনূ খুযাইমা বিন আমের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১০৯/৩/৫]

(৯১) قوله سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াত মক্কা নগরীর এমন এক সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা কপটতা স্বরূপ ইসলাম গ্রহণ করত। অতঃপর তারা কুরাইশদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে فَيَرْتَكِسُوْنَ فِى الْاَوْثَانِ তথা যার দ্বারা তার ইহজগত ও পরজগতে নিরাপত্তা বিধানের কামনায় তারা দেব-দেবির উপাসনায় আত্মনিয়োগ করত। পরবর্তীতে তারা মূর্তি পূজা বর্জন ও সংশোধিত না হলে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশও আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন। –[ইবনে কাছীর– : ৫৩৩/৩/৫]

শানে নুযূল- ২ : ইবনে জারীর থেকে বর্ণনা করেন, এ আয়াত এক মক্কী কাফের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কাতাদাহ বলেন, উক্ত আয়াত তেহামার কোনো গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। নবী করীম ﷺ-এর নিকট তারা আমান বা নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেছিল। যাতে করে তারা নবী করীম ﷺ-এবং তাদের গোত্রীয় লোকজনের নিকট নিরাপদে থাকতে পারে। মুজাহিদ বলেন, মক্কা নগরীর অন্তর্গত কোনো এক গোত্রীয় অধিবাসীদের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল— ৩ : সুদ্দী বলেন, নুআইম বিন মাসউদ সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। এ ব্যক্তি মুসলমান ও মুশরিক সকলেরই নিকটই নিরাপত্তা লাভ করার প্রচেষ্টা করতো।

শানে নুযূল— ৪ : হাসান বলেন, মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল— ৫ : কারো মতে আসাদ ও গাতফান গোত্রগুলোর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতঃপর তারা নিজ দেশে ফিরে গিয়ে কুফরি প্রকাশ করেছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। -[কুরতুবী : ২৯৬/৫]

قوله فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ الخ আলোচ্য আয়াতসমূহে তিনটি দলের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে দু'টি বিধান উল্লিখিত হয়েছে। এসব দলের ঘটনাবলি নিম্নোদ্ধৃত রেওয়ায়েতগুলো থেকে জানা যাবে।

প্রথম রেওয়ায়েতে : আবদ ইবনে হুমাইদ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, একবার কতিপয় মুশরিক মক্কা থেকে মদিনায় আগমন করে এবং প্রকাশ কর যে, তারা মুসলমান; হিজরত করে মদিনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কা চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্য দ্বিমত দেখা দেয়। কেউ কেউ বলল, এরা কাফের। আর কেউ কেউ বলল। এরা মুমিন। আল্লাহ তা'আলা فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ আয়াতে এদের কাফের হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান দিয়েছেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত : ইবনে আবী শায়বা হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইবনে মালেক মুদলাজী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানাল, আমাদের গোত্র বনী মুদলাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করুন। তিনি হযরত খালেদকে সন্ধি সম্পন্ন করার জন্য সেখানে প্রেরণ করলেন। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল এই :
আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করব না। কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গেলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব। যেসব গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে, তারাও এ চুক্তিতে আমাদের অংশীদার।
এর পরিপ্রেক্ষিতে إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ থেকে وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তৃতীয় রেওয়ায়েত : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ আয়াতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মদিনায় এসে বাহ্যতঃ নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করত এবং স্বগোত্রের কাছে বলত আমরা তো বানর ও বিচ্ছুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারাই আবার মুসলমানদের কাছে বলত, আমরা তোমাদের ধর্মে আছি।

যাহহাক, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বনী আবদুদ্দারেরও একই অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েত রুহুল মা'আনীতে এবং তৃতীয় রেওয়ায়েত মা'আলেমে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত থানভী (র.) বলেন, তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থা প্রথমে রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থার মতোই হয়ে গেছে অর্থাৎ, তারা যে পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়, একথা রেওয়ায়েত থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ কারণেই তারা সাধারণ কাফেরদের অনুরূপ। অর্থাৎ সন্ধিচুক্তি থাকাকালে তাদের সাথে যুদ্ধ করা চলবে না। কিন্তু সন্ধিচুক্তি না থাকা অবস্থায় যুদ্ধ করা চলবে। সে মতে প্রথম রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ গ্রেফতার করা ও হত্যা করা নির্দেশ এবং তৃতীয় আয়াত إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ শান্তি চুক্তির সময় তাদের ব্যতিক্রম বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে তাদের শান্তিচুক্তি উল্লিখিত হয়েছে। ব্যতিক্রমকে জোরদার করার জন্য পুনরায় فَإِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ বলে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ سَتَجِدُونَ اٰخَرِيْنَ এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়; বরং লড়াই করে, তবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। এ থেকে বুঝা যায় যে, তারা সন্ধিচুক্তি করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। –[বয়ানুল কুরআন]

মোটকথা এখানে তিন দল লোকের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

১. মুসলমান হওয়ার জন্য যে সময় হিজরত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়, সে সময় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হিজরত করার পর দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হরবে চলে যায়।
২. যারা স্বয়ং মুসলমানদের সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করে কিংবা এরূপ চুক্তিকারীদের সাথে চুক্তি করে।
৩. যারা সাময়িকভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তিচুক্তি করে অতঃপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হলে তাতে অংশগ্রহণ করে এবং চুক্তিতে কায়েম না থাকে।

প্রথম দল সাধারণ কাফেরদের মতো। দ্বিতীয় দল হত্যা ও ধরপাকড়ের আওতা বহির্ভূত এবং তৃতীয় দল প্রথম দলের অনুরূপ শাস্তির যোগ্য। এসব আয়াতে মোট দুটি বিধান উল্লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ সন্ধিচুক্তি না থাকা কালে যুদ্ধ এবং সন্ধিচুক্তি থাকাকালে যুদ্ধ নয়।

হিজরতের বিভিন্ন প্রকার ও বিধান : حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ফরজ ছিল। ১. এর কারণে যারা এ ফরজ পরিত্যাগ করত, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মতো ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন। মক্কা বিজিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ। অর্থাৎ মক্কা বিজিত হয়ে যখন দারুল ইসলাম হয়ে গেল, তখন সেখান থেকে হিজরত করা ফরজ নয়। –[সহীহ বুখারী] এটা ছিল তখনকার কথা, যখন হিজরত ঈমানের শর্ত ছিল। তখন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হিজরত করতো না, তাকে মুসলমান মনে করা হতো না। কিন্তু পরে এ বিধান রহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার হিজরত কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে : لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ। অর্থাৎ, যতদিন তওবা কবুল হওয়ার সময় থাকবে, ততদিন হিজরত বাকি থাকবে। –[সহীহ বুখারী]

এ হিজরত সম্পর্কে সহীহ বুখারী টীকাকার আল্লামা আইনী (র.) লিখেন : "স্থায়ী হিজরতের অর্থ হচ্ছে পাপকর্ম পরিত্যাগ করা।" যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে। –[মিরকাত : ১]

وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম। বর্ণিত আছে যে, আনসাররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কাফেরদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন : এরা দুরাচারী জাতি। তাদের প্রয়োজন আমাদের নেই। –[মাযহারী :২য় খণ্ড]

শব্দ বিশ্লেষণ

يُهَاجِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُهَاجَرَةُ মূলবর্ণ (ه . ج . ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা হিজরত করে।

يَصِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَصْلُ মূলবর্ণ (و . ص . ل) জিনস مثال واوى অর্থ– তারা পৌঁছতে পারবে না।

تَجِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوُجُوْدُ মূলবর্ণ (و . ج . د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা পাও।

اُرْكِسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْكَاسُ মূলবর্ণ (ر . ك . س) জিনস صحيح অর্থ– উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۚ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۫ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾

অনুবাদ : (৯২) আর কোনো মুমিনের শান এরূপ নয় যে, কোনো মুমিনকে হত্যা করে, হ্যাঁ ভ্রমবশতঃ আর যে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তবে তাকে একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করে দিতে হবে এবং রক্ত-বিনিময় [-ও ওয়াজিব] যা নিহত ব্যক্তির বংশধরগণকে সমর্পণ করতে হবে, তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয়, আর যদি সেই [নিহত] ব্যক্তি এরূপ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যারা তোমাদের শত্রু অথচ সে নিজে মুমিন, তবে একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করতে হবে, আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যে, তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধি-চুক্তি রয়েছে, তবে রক্ত-বিনিময় [ওয়াজিব] যা তার বংশধরগণকে সমর্পণ করতে হবে, এবং একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করতে হবে, তবে যে ব্যক্তি [এটা] না পায়, তাহলে লাগাতার দুই মাস রোজা রাখবে, যা আল্লাহর পক্ষ হতে তওবা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

(৯৩) আর যে ব্যক্তি মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে ফেলে, তবে তার [মূল] শাস্তি [তো] জাহান্নাম ছিল- যাতে সে অনন্তকাল থাকত, [কিন্তু আল্লাহর করুণায়, ঈমানের বরকতে পরিশেষে মুক্তি পাবে]। এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন এবং তাকে স্বীয় [বিশেষ] করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করবেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯২) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ আর কোনো মুমিনের শান এরূপ নয় যে اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا কোনো মুমিনকে হত্যা করে اِلَّا خَطَـًٔا হ্যাঁ ভ্রমবশতঃ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا আর যে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ কোনো মুমিনকে হত্যা করে فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ তবে তাকে একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করে দিতে হবে وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ এবং রক্ত-বিনিময় [-ও ওয়াজিব] যা নিহত ব্যক্তির বংশধরগণকে সমর্পণ করতে হবে اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয় فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ আর যদি সেই [নিহত] ব্যক্তি এরূপ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যারা তোমাদের শত্রু وَهُوَ مُؤْمِنٌ অথচ সে নিজে মুমিন فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ তবে একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করতে হবে وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যে بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধি-চুক্তি রয়েছে فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ তবে রক্ত-বিনিময় [ওয়াজিব] যা তার বংশধরগণকে সমর্পণ করতে হবে وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ এবং একটি মুসলমান গোলাম বা দাসী আজাদ করতে হবে فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ তবে যে ব্যক্তি [এটা] না পায় فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ তাহলে লাগাতার দুই মাস রোজা রাখবে تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ যা আল্লাহর পক্ষ হতে তওবা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(৯৩) وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا আর যে ব্যক্তি মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে ফেলে فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ তবে তার [মূল] শাস্তি [তো] জাহান্নাম ছিল- خٰلِدًا فِيْهَا যাতে সে অনন্তকাল থাকত وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ [কিন্তু আল্লাহর করুণায়, ঈমানের বরকতে পরিশেষে মুক্তি পাবে] এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন وَلَعَنَهٗ এবং তাকে স্বীয় [বিশেষ] করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করবেন وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (٩٤)

(৯৪) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে বহির্গত হও, তখন প্রত্যেক কাজই তাহকীক করে করো, এবং এমন ব্যক্তিকেও যে, তোমাদের সম্মুখে আনুগত্য প্রকাশ করে এরূপ বলো না যে, তুমি মুসলমান নও, এই অবস্থায় যে, তোমরা পার্থিব জীবনের সরঞ্জাম কামনা কর, বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট প্রচুর গনিমতের মাল রয়েছে, প্রথমে তোমরাও এরূপই ছিলে, অনন্তর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, অতএব, ভেবে দেখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا (٩٥)

(৯৫) সমান নয়- সেই মুসলমানগণ যারা কোনো ওজর ব্যতিরেকে গৃহে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে, আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা অনেক বেশি করে দিয়েছেন, যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে, গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় আর সকলকেই আল্লাহ তা'আলা উত্তম গৃহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর আল্লাহ মুজাহিদদেরকে গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় অতি মহান পুরস্কার দিয়েছেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৪) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ। اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে বহির্গত হও। فَتَبَيَّنُوْا তখন প্রত্যেক কাজই তাহকীক করে করো। وَلَا تَقُوْلُوْا এরূপ বলো না لِمَنْ اَلْقٰۤى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ এবং এমন ব্যক্তিকেও যে, তোমাদের সম্মুখে আনুগত্য প্রকাশ করে যে لَسْتَ مُؤْمِنًا তুমি মুসলমান নও تَبْتَغُوْنَ এই অবস্থায় যে, তোমরা কামনা কর عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনের সরঞ্জাম فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট প্রচুর গনিমতের মাল রয়েছে كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ প্রথমে তোমরাও এরূপই ছিলে فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ অনন্তর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। فَتَبَيَّنُوْا অতএব, ভেবে দেখ। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

(৯৫) لَا يَسْتَوِى সমান নয়- الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ সেই মুসলমানগণ যারা গৃহে বসে থাকে غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ কোনো ওজর ব্যতিরেকে وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ আল্লাহ তা'আলা অনেক বেশি করে দিয়েছেন بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় তাদের মর্যাদা وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى আর সকলকেই আল্লাহ তা'আলা উত্তম গৃহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ আর আল্লাহ মুজাহিদদেরকে দিয়েছেন عَلَى الْقٰعِدِيْنَ গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় اَجْرًا عَظِيْمًا অতি মহান পুরস্কার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৭২. قوله وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً الخ : আয়াতের শানে নুযূল– ১ : ইবনে জারীর মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন যে, আইয়াশ বিন আবূ রবিআহ আল মাখযূমী [আইয়াশ ছিলেন আবূ জাহেলের বৈপিত্রের ভাই তার পিতা ছিল হারেছ বিন হিশাম।] তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নবী করীম ﷺ-এর নিকট হিজরত করে চলে আসেন। তিনি তার মাতার নিকট অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিলেন। সুতরাং তার ইসলাম গ্রহণ মাতার নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক অনুভব হলো। কাজেই তার মাতা অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো যে, যতক্ষণ না তাকে দেখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘরের অভ্যন্তরে গমন করবে না। সে জন্য হারিছ ও আবূ জাহেল উভয়ে মদিনায় এসে তার মায়ের মনোবেদনার কথা বলল এবং তারা দুজনে তাকে তাদের সাথে যাবার জন্য আবেগ প্রকাশ করে। যাতে তার মাতা তাকে দেখতে পায়। তার মাতা তাকে দেখার পর ফিরে আসার পথে তারা কোনো প্রকারের বাধা দিবে না বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তাদের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তিনি তাদের সাথে যান। তারা যখন মদিনায় সীমানা অতিক্রম করে তখন তারা তাঁকে বেঁধে ফেলে। আর এ কর্মে বনূ কেনানার এক ব্যক্তি তাদেরকে সহযোগিতা করে। তখনই হযরত আইয়াশ (রা.) কেনানীকে সুযোগমতো হত্যা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। তারা মদিনার বাইরে এসে তাকে আর বন্দী হতে রেহাই দেয়নি। অবশেষে রাসূল ﷺ যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন তিনি মুক্ত হয়ে বেড়িয়ে আসার পর সে কেনানীর সাথে সাক্ষাৎ হয়, তৎকালে কেনানী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তা আইয়াশ জানতেন না। সুতরাং তিনি কেনানীকে আঘাত করে হত্যা করে ফেলেন। পরক্ষণে তিনি তার ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে জানতে পারলেন। ফলে তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকট খবর জানালেন। তখন ভুলক্রমে একটি হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হয়ে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। মুজাহিদ ও ইকরিমা হতে এ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারী ইবনে যায়েদ হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবুদ দারদা (রা.) এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তার ঘটনাটি হলো নিম্নরূপ–

হযরত আবূ দারদা (রা.) এক যুদ্ধাভিযানে ছিলেন। তখন তিনি তার হাজত [ইস্তেঞ্জা] সেরে নেওয়ার জন্য কোনো উপাত্যকায় গিয়ে তার বকরির পালের মাঝে একটি মানুষকে দেখতে পান। তৎক্ষণাত তিনি তাঁর উপর তরবারি উঠান। সে মুহূর্তে ঐ ব্যক্তি বলল, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ তারপরও তিনি তার উপর তরবারি দ্বারা আঘাত করেন এবং তাঁর বকরিগুলোকে সাথে করে নিয়ে আসেন। অতঃপর মানসিকভাবে তিনি অশান্তি অনুভব করতে লাগলেন ফলে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে কি? পক্ষান্তরে সে তো তার মুখ দিয়ে ঈমান প্রকাশ করেছিল। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি তাতে অস্বীকার করেছিলে কেন? তখন তিনি বললেন, তা আবার কিরূপভাবে, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ কিরূপভাবে কেন? لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ দ্বারা! রাসূল ﷺ তা একাধিকবার বললেন, হযরত আবুদ দারদা বলেন, আমি সেদিন নতুনভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি বলে অনুভব করছিলাম। অতঃপর সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী- :১১২/৩/৫, ইবনে কাছীর : ৫৩৪/১, ফাতহুল কাদীর : ৪৯৯/১, বাহরে মুহীত : ৩৩২/৩]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে উক্ত আয়াত হলো সর্ব শেষের দিকে নাজিলকৃত। যা মানসূখ বা রহিত হয়নি -[ইবনে কাছীর : ৫৩৬/১]

(৯৩) قوله وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম ইবনে যুবাইর হতে বর্ণনা করেন, উপরিউক্ত আয়াত মাকীস ইবনে মাবাবাহ আল কেনানী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মাকীস এবং তার ভাই হিশাম দুজনে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় অবস্থান করেছিল। ঘটনাচক্রে মাকীস এক রাতে তদীয় ভাই হিশামকে আনসারী গোত্র বনী নাজ্জারে নিহতাবস্থায় পেল। সুতরাং তৎক্ষণাত সে নবী করীম ﷺ-এর দরবারে গিয়ে এ সংবাদ জানালো। এরই প্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ কুরাইশের বনী ফিহর গোত্রের এক ব্যক্তিকে মাকীসের সঙ্গে দিয়ে বনী নাজ্জার গোত্র প্রেরণ করলেন। বনূ নাজ্জার গোত্রটি তৎকালে কুবার অন্তরগত অঞ্চল ছিল। রাসূল ﷺ তাদের নির্দেশ জারি করেন যে,

মাকীসের ভাইয়ের হত্যাকারী সম্পর্কে তোমাদের জানা থাকলে, সে হত্যাকারীকে মাকীসের নিকট সোপর্দ কর, নতুবা তার নিকট দিয়ত তথা রক্ত বিনময় প্রদান কর। রাসূল ﷺ-এর কাসেদ যখন তাদের নিকট পৌছেন, তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অনুগামী। আল্লাহর শপথ হত্যাকারী সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। তবে আমরা দিয়ত আদায় করব। সে মর্মে তারা তার ভাইয়ের দিয়ত স্বরূপ একশত উট প্রদান করল। সুতরাং মাকীস ও ফিহরী যখন কূবা থেকে মদিনা অভিমুখী যাত্রা করে কূবা ও মদিনার মাঝে আসল, তখন মাকীস রাসূল ﷺ-এর কাসেদ ফিহরীকে হত্যা করে মুরতাদ [ধর্মত্যাগী] হয়ে যায়। অতঃপর দিয়তের একটি উটে আরোহণ করে বাকিগুলোকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় গিয়ে অবস্থান করে এবং এ কবিতা আবৃত্তি করে–

قَتَلْتُ بِهِ فِهْرًا وَحَمَلْتُ عَقْلَهُ ـ سُرَاةَ بَنِي النَّجَّارِ اَرْبَابُ فَارِعِ

حَلَلْتُ بِهِ وَتَرِى وَاَدْرَكْتُ ثُورَتِىْ ـ وَكُنْتُ اِلَى الْاَوْثَانِ اَوَّلُ رَاجِعِ

রাসূল (সা.) তখন ঘোষণা দিলেন, আমি তাকে হিল এবং হেরম কোথাও আমান বা নিরাপত্তা বিধান করব না। সুতরাং মক্কা বিজয়ে দিনে কা'বা গৃহ জড়িয়ে থাকাবস্থায়ই তিনি তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। মাকীসের এহেন নিষ্ঠুরতম আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী– ১১৪/৩/৫, বাহরে মুহীত : ৩৩৮/৩, ফাতহুল কাদীর : ৫০০/১, কুরতুবী ৩১৭/৫, বায়যাভী ৯০/২]

৯৪. قوله يَآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে অনেক মত পার্থক্য রয়েছে। আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে হামীদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনী সুনাইম গোত্রের এক লোক সাহাবায়ে কেরামের এক জামাতের সাথে কোথাও যাচ্ছিল। তার সাথে ছিল ছাগল। ফলে সে তাদের নিকট ইসলাম প্রকাশ করল। তাঁরা বললেন, তুমি আমাদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই কেবল ইসলাম প্রকাশ করছ। অতঃপর তাঁরা তাকে হত্যা করে নবী করীম ﷺ-এর নিকট তার ছাগল পাল নিয়ে আসেন তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর সুদ্দী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হযরত উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে বনূ যামরার প্রতি এক অভিযান প্রেরণ করেন। তখন বনূ যুমরার মিরদাস বিন নাহিক নামক এক ব্যক্তির সাথে দেখা হয়। তার সাথে ছিল ছাগল ও লাল উট। সে জন্য পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। উসামাও তৎক্ষণাত তার পিছু ধাওয়া করেন। অতঃপর মিরদাস তার গুহায় ছাগল পাল রেখে তাদের নিকট ফিরে এসে বলল اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ উসামা তার প্রতি কঠোরতা আরোপ করে এবং তার ছাগল বকরির জন্য তাকে হত্যা করেন। নবী করীম ﷺ যখন হযরত উসামাকে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাঁর প্রশংসা করে মঙ্গল কামনা করেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেসও করেন, কিন্তু যখন ফিরে আসেন তখন তার সম্পর্কে রাসূল ﷺ কাউকে জিজ্ঞেস করেননি। তখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট উসামার সঙ্গি সাথীরা বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা উসামাকে দেখলাম এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ তারপর তিনি তার প্রতি কঠোরতা করে তাকে হত্যা করেন। অপর দিকে নবী করীম ﷺ তাদেরকে উপক্ষো করে যাচ্ছিলেন। উসামার প্রতি অভিযোগ যখন বেশি করে উত্থাপিত হলো, তখন তিনি উসামার প্রতি মাথা মুবারক উঠিয়ে বললেন, তুমি কোথায় আর لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কোথায়। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আত্মরক্ষার জন্য এরূপ বলেছিল, নবী করীম ﷺ জবাবে বললেন, তার কলব ফেঁড়ে কেন দেখনি? পরক্ষণেই আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী – ১১৯/৩/৫]

শানে নুযূল– ৩ : ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী হাসান হতে বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম একদা পথ চল ছিলেন, তখন শত্রু পক্ষের কতিপয় লোকজনের মুখোমুখি হন। মুসলমানেরা তৎক্ষণাৎ তাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে পরাজিত করেন এবং তাদেরই একজন মানুষকে বাঁধা হলো। অতঃপর তার সাথের মালামালের প্রত্যাশায় তার প্রতি তরবারি প্রশারিত করেন। সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বলল, আমি মুসলমান, আমি মুসলমান। তা সত্ত্বেও তার উপর তরবারি চালনা করতঃ হত্যা করে তার মালামাল তারা হস্তগত করেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ বিষয়টি উত্থাপিত করা হয় শুনে রাসূল বললেন তোমরা তাকে হত্যা করে ফেললে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আত্মরক্ষা করার জন্য এমনটি সে বলেছিল। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি তার অন্তর কি ফাটিয়ে দেখেছিলে? তিনি বললেন, তা আবার কেন

হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বললেন, সে তার কথায় সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী, তা জানার জন্য? তিনি বললেন এ ব্যাপারে আমি তো জানি হে আল্লাহর রাসূল! রাবী বলেন, খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই সে হত্যাকারী ইন্তেকাল করে; তখন তার সাথী সাহাবীগণ তার জন্য কবর খনন করে দাফন করেন, কিন্তু ভোরে দেখা গেল জমিন তাকে উঠিয়ে ফেলে রাখে। অতঃপর আবারো তার সাথী সাহাবীগণ তাকে দাফন করেন। কিন্তু ভোরে অমনি তার কবরের পাশেই উঠিয়ে ফেলে রাখে। হাসান রাবী বলেন, আমার জানা নেই সাহাবীগণ কতবার বলেছিলেন যে, তাকে দু'বার তিন বার তাকে দাফন করেছি। কিন্তু একবারও জমিন তাকে গ্রহণ করেনি। অতঃপর যখন দেখতে পেলাম যে, জমিন তাকে গ্রহণ করছে না, তখন তার পায়ে ধরে টেনে এ পার্বত্যাঞ্চলে তাকে ফেলে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম হাদীস নং ৫৮৫৮]

শানে নুযূল– ৪ : আহমদ ও ইবনে মুনযির তাবারানী প্রমুখ আব্দুল্লাহ বিন আবী হাদরাদ আল আসলামী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইযাম -এর দিকে এক অভিযানে আমাদেরকে প্রেরণ করেন। তখন মুসলিম বাহিনীর মাঝে আমি অংশ গ্রহণ করি। সে বাহিনীতে ছিলেন আবূ কাতাদাহ আল হারিছ বিন রবয়ী ও মুহাল্লাম ইবনে জাসসামাহ বিন কায়স আল লাইছী। আমরা যখন ইযাম অঞ্চলে পৌছলাম, তখন আমের বিন আযবাত আল আশাজায়ী রুটির থলে ও দুধের মশক সাথে নিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং আমাদের পাশ দিয়ে যখন অতিক্রম করে যাচ্ছিল, তখন ইসলামি রীতি অনুযায়ী সে আমাদেরকে সালাম জানালো। তখন মুহাল্লিম ইবনে জাসসামাহ আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে পারস্পরিক মতবিরোধ থাকার কারণে এবং তার সাথে যা কিছু ছিল তাও নিয়ে যায়। অতঃপর আমরা যখন রাসূল ﷺ-এর নিকট আসলাম তখন আমরা রাসূল ﷺ-কে এ বিষয়ে অবগত করলাম, সে পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী : ১২০/৩/৫, কুরতুবী : ৩২০/৫, বাহরে মুহীত : ৩৩৮/৩, ফাতহুল কাদীর : ৫০২/১, ইবনে কাছীর : ৫৩৮/১, ৫৪৯/৩]

শানে নুযূল– ৫ : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম, সুফিয়ান বিন ওয়াইনার মধ্যস্থতায় বর্ণনা করেন যে, তার ভাই ফজার তদীয় পিতার নির্দেশে হিজরত করে রাসূল ﷺ-এর নিকট চলে গেলেন। তার যাওয়ার পথে সাহাবীগণের এক জামাত তার সাথে রাতের আঁধারে তার সাক্ষাৎ হয়। আর তিনি তাদেরকে বললেন যে, আমি তো মুসলমান। তারা তা বিশ্বাস না করে তাকে হত্যা করে ফেলেন। অতঃপর তার পিতা বললেন যে, আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট গমন করলাম। রাসূল ﷺ আমাকে এক হাজার দিনার প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর : ৫৩৯/১]

(৯৫) قوله لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ আয়াতের শানে নুযূল– ১ : ইমাম বুখারী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত اَلْقٰعِدُوْنَ বলে বদরের যুদ্ধ থেকে যারা বিরত রয়েছিল তাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : আবূ হামযা বলেন, যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল তাদেরকে اَلْقٰعِدُوْنَ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আরো বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে বনূ সালমা গোত্রের কা'ব ইবনে মালেক বনূ আমর ইবনে আওফ গোত্রের মুরারা বিন রাবিয়া, এবং বনী ওয়াকেফ গোত্রের রবী ও হেলাল বিন উমাইয়া, ইত্যাদি লোকজন সম্পর্কে। তারা যখন বদরের অভিযানে ও তাবুকের অভিযানে রাসূল ﷺ থেকে পশ্চাদপদ ও পিঠ টান দিয়ে থাকে, তখন তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী – ১২১/৫]

শানে নুযূল– ৩ : ইমাম বুখারী (র.) হযরত বারা বিন আযেবের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন রাসূল ﷺ যায়েদ বিন ছাবেত (রা.) কে ডেকে এনে তা লিখিয়ে নেন। অতঃপর অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) উপস্থিত হন এবং তাঁর অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর : ৫৪০/১]

যোগসূত্র : পূর্ব থেকে হত্যা ও যুদ্ধের আলোচনা চলে এসেছে। হত্যা সর্বমোট আট প্রকার। কেননা নিহত ব্যক্তি হয় মুসলমান, না হয় জিম্মি না হয় চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত এবং না হয় দারুল হরবের কাফের হবে। এ চার অবস্থার কোনো না কোনো একটি হবেই। হত্যাকারী দুই প্রকার হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভ্রমবশতঃ। অতএব, মোট প্রকার হলো আটটি : এক.

মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, দুই. মুসলমানকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, তিন. জিম্মিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, চার. জিম্মিকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, পাঁচ. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, ছয়. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভ্রমবশতঃ হত্যা, সাত. হরবী কাফেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং আট. হরবী কাফেরকে ভ্রমবশতঃ হত্যা।

এসব প্রকারের মধ্যে কিছু সংখ্যকের বিধান পূর্বে বলা হয়েছে, আর কিছু পরে বর্ণিত হবে এবং কিছু সংখ্যকের বিধান হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে। প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান অর্থাৎ, কেসাস ওয়াজিব হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে এবং পারলৌকিক বিধান পরবর্তী আয়াত وَمَنْ يَقْتُلْ দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ থেকে وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ আয়াতে আসবে। তৃতীয় প্রকারের বিধান দারাকুতনীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, জিম্মি হত্যার বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানের কাছ থেকে কেসাস নিয়েছেন। –[তাখরীজে হেদায়া]

চতুর্থ প্রকার وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ আয়াতে উল্লিখিত হবে। পঞ্চম প্রকার পূর্ববর্তী রুকূ'র فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ প্রকারের বিধান চতুর্থ প্রকারের সাথেই উল্লিখিত হয়েছে। কেননা مِيْثَاقٌ তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই হতে পারে। অতএব, জিম্মিও অভয়প্রাপ্ত কাফেরের অন্তর্ভুক্ত। দুররে মোখতার গ্রন্থের দিয়তঃ অধ্যায়ের শুরুতে অভয়প্রাপ্ত উভয়ের রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার মাসআলা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জিহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মাসআলা থেকে পূর্বেই জানা গেছে। কেননা জিহাদে দারুল হরবের কাফেরদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিহত করা হয়। অতএব, ভ্রমবশতঃ হত্যার বৈধতা আরো সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে।–[বয়ানুল কুরআন]

তিন প্রকার হত্যা ও তার বিধান : عَمْد প্রথম প্রকার অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত হত্যা। এর সংজ্ঞা এই বাহ্যতঃ ইচ্ছা করে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা, যা লৌহনির্মিত অথবা অঙ্গচ্ছেদনের ব্যাপারে লৌহনির্মিত অস্ত্রের মতো। যথা– ধারালো বাঁশ, ধারালো পাথর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার شِبْه عَمْد অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এই : ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যা দ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার خَطَأً অর্থাৎ, ভ্রমবশতঃ হত্যা। ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম হওয়া। যেমন, দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল হরবের কাফের মনে করে লক্ষ্য স্থির করতঃ গুলি করে ফেলা কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলি ছোঁড়া, কিন্তু তা কোনো মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া। এগুলো সব ভ্রমবশতঃ হত্যার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে ভ্রম বলে 'ইচ্ছা নয়' বুঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে গুনাহ ও রক্ত-বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারে পাঁচটি করে উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত বিনিময়ও একশ উট। কিন্তু উটগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত-বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকার দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দিনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গুনাহ বেশি এবং তৃতীয় প্রকারের গুনাহ কম। অর্থাৎ, শুধু অসাবধনাতার গুনাহ হবে। –[হিদায়া] ক্রীতদাস মুক্তকরণ ওয়াজিব হওয়া এবং তওবা শব্দ দ্বারা একথা বুঝা যায়। উপরিউক্ত তিন প্রকারের হত্যার যে স্বরূপ বর্ণিত হলো, তা পার্থিব বিধানের দিক দিয়ে। গুনাহর দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হওয়া আন্তরিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। শাস্তিবাণীও এরই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা জানেন, এদিক দিয়ে প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

- রক্ত বিনিময়ের উপরিউক্ত পরিমাণ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন নিহত ব্যক্তি পুরুষ হবে। পক্ষান্তরে মহিলা হলে এর পরিমাণ হবে অর্ধেক। –[হিদায়া]
- মুসলমান ও জিম্মির রক্ত-বিনিময় সমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : دِيَةُ كُلِّ ذِيْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهٖ اَلْفُ دِيْنَارٍ –[হিদায়া, আবূ দাউদ]
- কাফফারা অর্থাৎ, ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোজা রাখার স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত-বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের জিম্মায় ওয়াজিব। শরিয়তের পরিভাষায় তাদেরকে 'আকেলা' বলা হয়। –[বয়ানুল কুরআন]

এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ। এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল কাজ-কর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ত্রুটি করবে না।

- কাফফারায় বাঁদী ও ক্রীতদাস সমান। رَقَبَةٌ শব্দে উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। তবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হতে হবে।
- নিহত ব্যক্তির রক্ত বিনিময় তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কোনো ওয়ারিশ স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সে পরিমাণ মাফ হয়ে যাবে। সবাই মাফ করে দিলে সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে।
- যে নিহত ব্যক্তির কোনো ওয়ারিশ নেই: তার রক্ত বিনিময় বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাঘারে জমা হবে। কেননা, রক্ত-বিনিময় ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান তাই। –[বয়ানুল কুরআন]
- চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় [জিম্মি অথবা অভয়প্রাপ্ত] এর ক্ষেত্রে যে রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হয়, বাহ্যতঃ তা তখনই হয়, যখন জিম্মি কিংবা অভয়প্রাপ্তের পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার পরিবার পরিজন বিদ্যমান না থাকে কিংবা তারা অমুসলমান হয়; মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না বলে এরূপ পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকা না থাকারই শামিল– এমন ক্ষেত্রে জিম্মি হলে তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল মালে জমা হবে। কেননা জিম্মি বে-ওয়ারিশের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ত-বিনিময়সহ বায়তুল মালে যায়। –[দুররে মুখতার]
- নিহত ব্যক্তি জিম্মি না হলে রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হবে না। –[বয়ানুল কুরআন]
- কাফফারার রোজায় যদি রোগ-ব্যাধির উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হয়, তবে প্রথম থেকে রোজা রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের ঋতুস্রাবের কারণে যে রোজা ভাঙ্গতে হয় তাতে উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হবে না।
- ওজরবশতঃ রোজা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা করবে।
- ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কাফফারা নেই– তওবা করা উচিত। –[বয়ানুল কুরআন]

মুসলমান মনে করার জন্য ইসলামি লক্ষণাদিই যথেষ্ট : উল্লিখিত তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তার উক্তিকে কপটতা মনে করা কোনো মুসলমানের জন্যই বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কোনো কোনো সাহাবী থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ঘটনার তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বৈধ নয় : আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলমানেরা কোনো কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হয়েছে : إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا অর্থাৎ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কাজ করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি সফরে সংঘটিত হয়েছিল বলে আয়াতে সফর উল্লেখ করা হয়েছে। কিংবা এর কারণ এও হতে পারে যে, সাধারণতঃ সফরে থাকা অবস্থায় অন্যের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। নিজ শহরে অন্যের অবস্থা সাধারণত জানা থাকে। তাই আসল নির্দেশটি ব্যাপক। অর্থাৎ, সফরে হোক কিংবা বাসস্থানে হোক, সর্বত্রই খোঁজ-খবর না নিয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে : ভেবে চিন্তে কাজ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তড়িঘড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে। –[বাহরে মুহীত]

কেবলার অনুসারীকে কাফের না বলার তাৎপর্য : এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমানরূপে পরিচয় দেয়, কালিমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোনো ইসলামি বৈশিষ্ট্য যথা নামাজ, আজান ইত্যাদিতে যোগদান করে, তাকে মুসলমান মনে করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য তার সাথে মুসলমানদের মতোই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছে না কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, একথা প্রমাণ করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

এছাড়া এ ব্যাপারে তার কাজকর্মের উপরও উপরিউক্ত নির্দেশ নির্ভরশীল হবে না। মনে করুন, সে নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না এবং সর্বপ্রকার গুনাহে জড়িত, তবুও তাকে ইসলাম বহির্ভূত বলার কিংবা তার সাথে কাফেরের মতো ব্যবহার

করার অধিকার কারো নেই। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন 'আমরা কেবলার অনুসারীকে কোনো পাপ কার্যের কারণে কাফের সাব্যস্ত করি না' কোনো কোনো হাদীসে এ জাতীয় উক্ত বর্ণিত আছে যে, যত গুনাহগার দুষ্কর্মীই হোক, কেবলার অনুসারীকে কাফের বলো না।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও স্মরণযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলেন, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাফের বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ, এরূপ কোনো কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামের স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে মুসলমানই বলা হবে। তার সাথে মুসলমানের মতোই ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারো থাকবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু কুফরি কালেমাও বকাবকি করে, অথবা প্রতিমাকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোনো অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাফেরদের কোনো ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে; যেমন গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তবে তাকে সন্দেহাতীতভাবে কুফরি কাজকর্মের কারণে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতের শব্দে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। নতুবা ইহুদি ও খ্রিস্টান সবাই নিজেকে মুমিন, মুসলমান বলত। মুসায়লামা কাযযাব শুধু কালিমার স্বীকারোক্তিই নয়; ইসলামি বৈশিষ্ট্য, যথা নামাজ, আজান ইত্যাদিরও অনুগামী ছিল। আজানে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, এর সাথে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহও উচ্চারণ করত। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকেও নবী-রাসূল ও ওহীর অধিকারী বলে দাবি করত, যা কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচারণ। এ কারণেই তাকে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়।

মোটামুটি মাসআলা হলো এই যে, প্রত্যেক কালিমা উচ্চারণকারী কেবলার অনুসারীকে মুসলমান মনে কর। তার অন্তরে কি আছে, তা খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন নেই, অন্তরে বিষয় আল্লাহর হাতে সমর্পণ কর। তবে ঈমান প্রকাশের সাথে সাথে ঈমান বিরোধী কোনো কাজ সংঘটিত হলে তাকে মুরতাদ অর্থাৎ, ধর্মত্যাগী মনে কর। এ জন্য শর্ত এই যে, কাজটি যে ঈমান বিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে। এতে কোনোরূপ দ্ব্যর্থতার অবকাশ না থাকা চাই।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَصَّدَّقُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّصَدُّقُ মূলবর্ণ (ص . د . ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা সমর্থন করে।

تَبْتَغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা চাও।

مَغَانِمُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন مَغْنَمٌ অর্থ– গনিমত।

أُوْلِي الضَّرَرِ : এখানে أولي এটি (খেলাফে কেয়াস) ذو-এর বহুবচন, ضَرَرٌ এটি একবচন, বহুবচন اَضْرَارٌ অর্থ– ক্ষতি।

অনুবাদ : (৯৬) অর্থাৎ বহু পদমর্যাদা যা আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত হবে এবং ক্ষমা ও করুণা, আর আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۹۶﴾
(৯৭) নিশ্চয় যখন ফেরেশতাগণ এরূপ লোকদের রূহ কবজ করেন– যারা [ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হিজরত না করে] নিজেদেরকে পাপী করে রেখেছিল– তখন ফেরেশতা তাদেরকে বলবেন যে, তোমরা [ধর্মের] কোন কর্মে ছিলে? তারা [উত্তরে] বলবে, আমরা জমিনে সম্পূর্ণ প্রভাবান্বিত ছিলাম, ফেরেশতাগণ বলবে, আল্লাহর দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না? তোমাদের উচিত ছিল স্বদেশ পরিত্যাগ করে তাতে চলে যাওয়া, অতএব, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।	اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۹۷﴾
(৯৮) কিন্তু যে সমস্ত পুরুষ ও নারী এবং শিশু [হিজরত করতে] এমন অক্ষম যে, তারা কোনো উপায়ই অবলম্বন করতে পারে না এবং পথ সম্বন্ধেও জ্ঞাত নয়,	اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿۹۸﴾
(৯৯) সুতরাং তাদের জন্য আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করে দিবেন, এবং আল্লাহ অতিশয় মার্জনাকারী, অতীব ক্ষমাশীল।	فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۹۹﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(৯৬) دَرَجٰتٍ مِّنْهُ অর্থাৎ বহু পদমর্যাদা যা আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত হবে وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً এবং ক্ষমা ও করুণা وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আর আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

(৯৭) اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ নিশ্চয় যখন ফেরেশতাগণ এরূপ লোকদের রূহ কবজ করেন– ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ যারা [ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হিজরত না করে] নিজেদেরকে পাপী করে রেখেছিল– قَالُوْا তখন ফেরেশতা তাদেরকে বলবে যে, فِيْمَ كُنْتُمْ তোমরা [ধর্মের] কোন কর্মে ছিলে? قَالُوْا তারা [উত্তরে] বলবে كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ আমরা জমিনে সম্পূর্ণ প্রভাবান্বিত ছিলাম। قَالُوْا ফেরেশতাগণ বলবেন اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً আল্লাহর দুনিয়া কি প্রশস্ত ছিল না? فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا তোমাদের উচিত ছিল স্বদেশ পরিত্যাগ করে তাতে চলে যাওয়া فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ অতএব, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। وَسَآءَتْ مَصِيْرًا আর তা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।

(৯৮) اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ কিন্তু যে সমস্ত পুরুষ ও নারী এবং শিশু [হিজবত করতে] এমন অক্ষম যে لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً তারা কোনো উপায়ই অবলম্বন করতে পারে না وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا এবং পথ সম্বন্ধেও জ্ঞাত নয়,

(৯৯) فَاُولٰٓئِكَ সুতরাং তাদের জন্য عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করে দিবেন وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا এবং আল্লাহ অতিশয় মার্জনাকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۚ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾

(১০০) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে, ভূপৃষ্ঠে সে যাওয়ার বহু স্থান পাবে এবং [ধর্ম প্রকাশেরও] বহু সুযোগ পাবে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ হতে এই উদ্দেশ্যে বহির্গত হয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করবে, অতঃপর তার মৃত্যু হয়, তথাপিও আল্লাহর নিকট তার ছওয়াব সাব্যস্ত হয়ে গেছে. আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾

(১০১) আর যখন তোমরা জমিনে সফর কর তখন তোমাদের তাতে কোনো পাপ হবে না যে, তোমরা [জোহর, আছর ও ইশার ফরজ] নামাজ [-এর রাকাত] -কে কম করে দাও, যদি তোমাদের এই আশঙ্কা হয় যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে, নিঃসন্দেহে কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০০) وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে يَجِدْ فِي الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে সে পাবে مُرٰغَمًا كَثِيْرًا যাওয়ার বহু স্থান وَّسَعَةً এবং [ধর্ম প্রকাশেরও] বহু সুযোগ পাবে وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ আর যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ হতে এই উদ্দেশ্যে বহির্গত হয় যে مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করবে ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ অতঃপর তার মৃত্যু হয় فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ তথাপিও আল্লাহর নিকট তার ছওয়াব সাব্যস্ত হয়ে গেছে وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

(১০১) وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ আর যখন তোমরা জমিনে সফর কর فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ তখন তোমাদের তাতে কোনো পাপ হবে না যে اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ তোমরা [জোহর, আছর ও ইশার ফরজ] নামাজ [-এর রাকাত] -কে কম করে দাও اِنْ خِفْتُمْ যদি তোমাদের এই আশঙ্কা হয় যে اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ নিঃসন্দেহে কাফেররা তোমাদের عَدُوًّا مُّبِيْنًا প্রকাশ্য শত্রু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(৯৭) قوله اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম তাবারানী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, মক্কার এক গোত্র ছিল, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করেন, তখন রাসূল ﷺ-এর হিজরত করাকে পছন্দ করেনি; বরং তারা ভয় করে তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[লুবাবুন নুকূল পৃ. ৯৪]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর যাহহাক হতে বর্ণনা করেন, তারা হলো মক্কায় অবস্থানকারী মুনাফিক সম্প্রদায়, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদিনাভিমুখে হিজরত করেনি; বরং তারা কুরাইশদের সহযোগিতায় রাসূল ﷺ মোকাবিলায় বদর অভিযানে অংশগ্রহণ করে। ফলে তাদের থেকে যারা নিহত হওয়ার নিহত হলো। তাদের এহেন দুঃখজনক পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১২৫/৩/৫, বাহরে মুহীত : ৩৪/৭/৩]

শানে নুযূল– ৩ : ইকরিমা বলেন, বদর প্রান্তরে নিহত পাঁচজন সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা হলো ১. কায়স বিন নায়েহা বিন মুগীরাহ, ২. হারেছ বিন যুমআহ বিন আসওয়াদ বিন আসাদ, ৩. কাইস বিন ওয়ালীদ বিন মুগীরা, ৪. আবুল আসী বিন মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ, ৫. আলী বিন উমাইয়্যা বিন খালাফ। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[লুবাবুন নুকূল পৃ. ৯৪]

শানে নুযূল– ৪ : কারো মতে মক্কাবাসীদের কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ যখন হিজরত করেন, তখন তারা হিজরত না করে নিজ গোত্রীয় লোকজনের সাথে মক্কায়ই থেকে যায়। ফলে তাদের মধ্যে কতকজন, গোত্রীয় লোকজন দ্বারা নির্যাতিতও হয়। পরবর্তীতে বদর অভিযানের সময় যখন হলো, তখন কতিপয় মুসলমান কাফেরদের সাথে বদরে অংশ গ্রহণ করে। এবং বদর প্রান্তরে নিহত হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ৫ : সুদ্দী বলেন, আব্বাস, আকীল ও নাওফল তারা যখন বন্দী হয়ে আসে, তখন রাসূল ﷺ হযরত আব্বাস (রা.) কে লক্ষ্য করে বলেন, হে আব্বাস! তোমাকে এবং তোমার ভাইকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যাও। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার কেবলার দিক হয়ে নামাজ পড়িনি? আপানার প্রতি কি সাক্ষ্য প্রদান করিনি? রাসূল ﷺ বললেন, হে আব্বাস! তোমরা প্রতিপক্ষ হয়ে এসেছ। কাজেই তোমরা প্রতি পক্ষ হয়ে গেছ। অতঃপর أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ৬ : ইবনে জারীর, মুনযির আবি হাতেম ও মারদুভিয়া হযরত আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, মক্কাবাসীর এক সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তারা ইসলামকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ফলে মুশরিকরা তাদেরকে সাথে করে বদর অভিযানে নিয়ে আসে। এতে করে তাদের কেউ আহত হলো, কেউ নিহত হলো। তখন মুসলমানরা বলল, এরাতো আমাদের মুসলিম সাথি ছিল। এদের বাধ্য করা হয়েছে, কাজেই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[ফাতহুল কাদীর : ৫০৬/১]

(১০০) قوله وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– :** ইবনে আবি হাতেম, হিশাম ইবনে উরওয়া কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস বর্ণনা করেন, যুবাইর বিন আওয়াম বলেছেন, খালেদ বিন হেজাম বিন খুআইলিদ হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভাতিজা আবেসিনিয়া অভিমুখে হিজরত করেন, রাস্তার মাঝে বিষধর সাপ তাকে দংশন করার কারণে পথিমধ্যেই ইন্তেকাল করেন। হিজরত করার অবস্থায় খালেদ বিন হেজাম এর মৃত্যু সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, যুমরা বিন জুন্দাব (রা.) রাসূল ﷺ-এর প্রতি যাত্রা করেন। রাসূল ﷺ-এর নিকট পৌছার পূর্বেই রাস্তায় ইন্তেকাল করেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[ইবনে কাছীর : ৫৪৩/১, কুরতুবী : ৩৩১/৫]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন একজন অসুস্থ ঈমানদার অন্যান্য মুসলমানদেরকে বললেন যে, আল্লাহর শপথ, আমার কোনো ওজর নেই। আর রাস্তা-ঘাট সবই চিনি। আমার আর্থিক স্বচ্ছলতাও রয়েছে। সুতরাং আমাকে বহন করে নিয়ে যাও। ফলে তারা তাকে বহন করে নিয়ে চললেন। আসার পথে রাস্তার মাঝেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবীগণ বললেন, আমাদের পর্যন্ত যদি এসে পৌছে যেত, তাহলে সে পূর্ণ প্রতিদান পেত। অথচ তিনি তানঈমে ইন্তেকাল করলেন। অতঃপর তার পুত্র রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে সে ঘটনা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জানালেন। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী ১২৮/৩৫ কুরতুবী : ৩৩২/৫]

শানে নুযূল– ৪ : হযরত শা'বী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, উপরিউক্ত আয়াত আকসাম বিন সাইফী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আকসাম বিন সাইফী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরত করছিলেন, তখন তার ইন্তেকাল হয়। হিজরত করা কালে ইন্তেকাল করা সম্পর্কে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী : ১২৯/৩/৫]

(১০১) قوله وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইবনে জারীর হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একজন বণিক রাসূল ﷺ-এর নিকট আবেদন করে বলল যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করি, সুতরাং আমরা কিরূপভাবে নামাজ আদায় করব? তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১৩৪/৩/৫, ফাতহুল কাদীর : ৫০৯/১]

শানে নুযূল– ২ : মুজাহিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমরা মুশরিকদের মোকাবিলায় রাসূল ﷺ-এর সাথে আসফান নামক স্থানে ছিলাম। মুশরিকদের আমীর ছিল তখন খালেদ বিন ওয়ালিদ। মুশরিকরা বলল, আমাদের জন্য সুযোগ এসেছে আমরা যদি তাদের নামাজরত অবস্থায় আক্রমণ করি, তাহলে আমরা সফল হবো নিশ্চিত। তখন জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে কসরের বিধান সংক্রান্ত বিধান নিয়ে উপরোল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়। –[বাহরে মুহীত : ৩৫২/৩]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল বণিক রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করল যে, আমরা বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করি, সুতরাং সফর অবস্থায় কিভাবে নামাজ আদায় করব? তখন সফরে থাকা অবস্থায় নামাজ আদায় করার বিধান সম্বলিত আল্লাহ তা'আলা وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ নাজিল করেন। অতঃপর একবছর পর রাসূল ﷺ কোনো অভিযানে যখন জোহরের নামাজ আদায় করছিলেন, তখন মুশরিকরা পরস্পর বলল, মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা তাদের পিছ থেকে আক্রমণ করার জন্য তোমাদের সুযোগ দিয়েছে। তোমরা তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করনি কেন? তখন থেকেই একজন বলল, যদি তাদের পিছনে পুনর্বার আবার সুযোগ আসে তাহলে আক্রমণ করা হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা দু'নামাজের [জোহর ও আসর] মধ্যবর্তী সময়ে إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অতঃপর সালাতুল খওফ তথা ভয়ের নামাজের বিধান জারি হয়েছে। –[কুরতুবী : ৩৪৫/৫]

হিজরতের সংজ্ঞা : আলোচ্য চারটি আয়াতে জিরতের ফজিলত, বরকত ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। অভিধানে হিজরত শব্দটি 'হিজরান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, অসন্তুষ্টিচিত্তে কোনো কিছুকে ত্যাগ করা। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় দেশত্যাগ করাকে হিজরত বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় দারুল কুফর তথা কাফেরদের দেশ ত্যাগ করে দারুল ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে গমন করার নাম হিজরত। -[রূহুল মা'আনী]

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) মিশকাতের শরাহি বলেন : ধর্মীয় কারণে কোনো দেশ ত্যাগ করাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত। –[মিরকাত : ১ : ৩৯]

মুহাজির সাহাবীগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা হাশরের الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোনো দেশের কাফেররা যদি মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার কারণে দেশ থেকে জোর জবরদস্তিমূলকভাবে বহিষ্কার করে তবে তাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।

হিজরতের ফজিলত : জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ যেমন সমগ্র কুরআন পাকে ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি হিজরতের বর্ণনাও কুরআন পাকের অধিকাংশ সূরায় একাধিকবার বিবৃত হয়েছে। সবগুলো আয়াত একত্রিত করলে জানা যায় যে, হিজরত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন রকমের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এক. হিজরতের ফজিলত, দুই. হিজরতের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বরকত এবং তিন. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দারুল কুফর থেকে হিজরত না করার কারণে শাস্তিবাণী।

হিজরতের ফজিলত সম্পর্কিত প্রথম বিষয়বস্তু সূরা বাকারার এক আয়াতে রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এব আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে,তারা আল্লাহর অনুগ্রহ-প্রার্থী। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা তওবায় আছে

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী এবং তারাই সফলকাম।

তৃতীয় আয়াত আলোচ্য সূরা নিসার : وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পথেই মৃত্যুবরণ করে তার ছওয়াব আল্লাহর জিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়।

এক হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : 'হিজরত পূর্বকৃত সব গুনাহকে নিঃশেষ করে দেয়।

হিজরতে বরকত : হিজরতের বরকত সম্পর্কে সূরা নাহলের এক আয়াতে বলা হয়েছে :

"যারা আল্লাহর জন্য হিজরত করে নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দান করব এবং পরকালের বিরাট ছওয়াব তো রয়েছেই, যদি তারা বুঝে।"

সূরা নিসায় উল্লিখিত চার আয়াতে বলা হয়েছে :

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা ও সুযোগ-সুবিধা পাবে।"

আয়াতে বর্ণিত مُرَاغَمْ শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া। স্থানান্তরিত হওয়ার জায়গাকেও অনেক সময় مُرَاغَمْ বলে দেওয়া হয়।

এ আয়াতদ্বয়ে হিজরতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বরকত বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের জন্য হিজরত করে, আল্লাহ তার জন্য দুনিয়াতে অনেক পথ খুলে দেন। সে দুনায়তেও উত্তম অবস্থান লাভ করে এবং পরকালের ছওয়াব ও পদমর্যাদা তো কল্পনাতীত।

মোটকথা, এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে মুহাজিরদের জন্য যে ওয়াদা করেছেন, জগদ্বাসী তা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতেই এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে যে, فَاجِرُوا فِى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর পথে হিজরত হওয়া চাই। পার্থিব ধন-সম্পদ, রাজত্ব, সম্মান অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্বেষায় হিজরত না হওয়া চাই। সহীহ বুখারীর হাদীসে রাসূল ﷺ-এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহর ও রাসূলের জন্যই হয়। অর্থাৎ এটিই বিশুদ্ধ হিজরত। এর ফজিলত ও বরকত কুরআনে পাকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে "যে ব্যক্তি অর্থের অন্বেষণে কিংবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরতের বিনিময়ে ঐ বস্তুই পাবে, যার জন্য সে হিজরত করে।"

আজকাল কিছুসংখ্যক মুহাজিরকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা যায়। হয় তারা এখনো অন্তর্বর্তীকালে অবস্থান করছে, অর্থাৎ হিজরতের প্রাথমিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, না হয় তারা সঠিক অর্থে মুহাজির নয়। স্বীয় নিয়ত ও অবস্থা সংশোধনের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করা উচিত। নিয়ত ও আমল সংশোধন করার পর তারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার সত্যতা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَوَفّٰهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে মৃত্যু দিল।

مُسْتَضْعَفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِضْعَافُ মূলবর্ণ (ض . ع . ف) জিনস صحيح অর্থ– দুর্বল ব্যক্তিগণ।

لَايَسْتَطِيْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তাদের ক্ষমতা নেই।

مُرٰغَمًا : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব مُفَاعَلَةَ মাসদার اَلْمُرَاغَمَةُ মূলবর্ণ (ر . غ . م) জিনস صحيح অর্থ– অনেক জায়গা।

وَاِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا (١٠٢)

(১০২) আর যখন আপনি তাদের সঙ্গে থাকেন এবং আপনি তাদেরকে [জামাতে] নামাজ পড়াতে চান, তবে এরূপ করতে হবে যে, তন্মধ্য হতে একদল আপনার সঙ্গে [নামাজে] দাঁড়াবে এবং তারা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে। অনন্তর যখন তারা সেজদা করে [এক রাকাত পূর্ণ করে] নেয়, তখন তারা আপনাদের পিছনে যাবে এবং অন্য দল যারা এখানো নামাজ পড়েনি তারা আসবে এবং আপনার সঙ্গে নামাজ [-এর অবশিষ্ট এক রাকাত] পড়ে নিবে, এবং এরাও আত্মরক্ষার সরঞ্জাম এবং নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে [কেননা] কাফেররা এটাই চায়, যদি আপনারা নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র এবং দ্রব্যসম্ভার হতে [একটু] অসতর্ক হন, তবে অমনি তারা আপনাদের উপর একযোগে আক্রমণ করে বসবে, আর যদি বৃষ্টির দরুন আপনাদের কষ্ট হয় অথবা আপনারা পীড়িত হন, তবে তাতে আপনাদের কোনো পাপ হবে না যে, আপনারা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রাখেন, এবং [তবুও] নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ [অবশ্যই] নিয়ে নিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০২) وَاِذَا كُنْتَ فِيهِمْ আর যখন আপনি তাদের সঙ্গে থাকেন فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ এবং আপনি তাদেরকে [জামাতে] নামাজ পড়াতে চান فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ তবে এরূপ করতে হবে যে, তন্মধ্য হতে একদল আপনার সঙ্গে [নামাজে] দাঁড়াবে وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ এবং তারা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে। فَاِذَا سَجَدُوْا অনন্তর যখন তারা সেজদা করে [এক রাকাত পূর্ণ করে] নেয় فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ তখন তারা আপনাদের পিছনে যাবে وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى এবং অন্য দল আসবে لَمْ يُصَلُّوْا যারা এখানো নামাজ পড়েনি فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ তারা আপনার সঙ্গে নামাজ [-এর অবশিষ্ট এক রাকাত] পড়ে নিবে وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ এবং এরাও আত্মরক্ষার সরঞ্জাম এবং নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে [কেননা] وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا কাফেররা এটাই চায় لَوْ تَغْفُلُوْنَ যদি আপনারা অসতর্ক হন عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র وَاَمْتِعَتِكُمْ এবং দ্রব্যসম্ভার হতে [একটু] فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً তবে অমনি তারা আপনাদের উপর একযোগে আক্রমণ করে বসবে وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ তবে তাতে আপনাদের কোনো পাপ হবে না যে اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ আর যদি বৃষ্টির দরুন আপনাদের কষ্ট হয় اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى অথবা আপনারা পীড়িত হন اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ আপনারা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রাখেন وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ এবং [তবুও] নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ [অবশ্যই] নিয়ে নিবেন اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন عَذَابًا مُّهِيْنًا লাঞ্ছনাময় শাস্তি ।

فَاِذَا قَضَيۡتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذۡكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوۡدًا وَّعَلٰى جُنُوۡبِكُمۡ ۚ فَاِذَا اطۡمَاۡنَنۡتُمۡ فَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا (١٠٣)

অনুবাদ : (১০৩) অনন্তর যখন তোমরা এই নামাজ সম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক দাঁড়িয়েও এবং বসেও এবং শায়িত অবস্থায়ও, তৎপর যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হও, তখন নামাজ পড়তে থাক যথানিয়মে, নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরজ করা হয়েছে।

وَلَا تَهِنُوۡا فِى ابۡتِغَآءِ الۡقَوۡمِ ؕ اِنۡ تَكُوۡنُوۡا تَاۡلَمُوۡنَ فَاِنَّهُمۡ يَاۡلَمُوۡنَ كَمَا تَاۡلَمُوۡنَ ۚ وَتَرۡجُوۡنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرۡجُوۡنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا (١٠٤)

(১০৪) আর ভগ্নোৎসাহ হয়ো না এই বিরোধী সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবন করতে, যদি তোমরা ব্যথিত হয়ে থাক, তবে তারাও তো ব্যথা পেয়েছে যেমন তোমরা ব্যথা পেয়েছ, এবং তোমরা আল্লাহর সমীপে এমন এমন বস্তুর [ছওয়াবের] আশা রাখ যে, তারা [যার] আশা রাখে না, আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০২) وَاِذَا كُنۡتَ فِيۡهِمۡ আর যখন আপনি তাদের সঙ্গে থাকেন فَاَقَمۡتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ এবং আপনি তাদেরকে [জামাতে] নামাজ পড়াতে চান فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٌ مِّنۡهُمۡ مَّعَكَ তবে এরূপ করতে হবে যে, তন্মধ্য হতে একদল আপনার সঙ্গে [নামাজে] দাঁড়াবে وَلۡيَاۡخُذُوۡۤا اَسۡلِحَتَهُمۡ এবং তারা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে فَاِذَا سَجَدُوۡا অনন্তর যখন তারা সেজদা করে [এক রাকাত পূর্ণ করে] নেয় فَلۡيَكُوۡنُوۡا مِنۡ وَّرَآئِكُمۡ তখন তারা আপনাদের পিছনে যাবে وَلۡتَاۡتِ طَآئِفَةٌ اُخۡرٰى এবং অন্য দল আসবে لَمۡ يُصَلُّوۡا যারা এখানো নামাজ পড়েনি فَلۡيُصَلُّوۡا مَعَكَ তারা আপনার সঙ্গে নামাজ [-এর অবশিষ্ট এক রাকাত] পড়ে নিবে وَلۡيَاۡخُذُوۡا حِذۡرَهُمۡ وَاَسۡلِحَتَهُمۡ এবং এরাও আত্মরক্ষার সরঞ্জাম এবং নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে রাখবে [কেননা] وَدَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا কাফেররা এটাই চায় لَوۡ تَغۡفُلُوۡنَ যদি আপনারা অসতর্ক হন عَنۡ اَسۡلِحَتِكُمۡ নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র وَاَمۡتِعَتِكُمۡ এবং দ্রব্যসম্ভার হতে [একটু] فَيَمِيۡلُوۡنَ عَلَيۡكُمۡ مَّيۡلَةً وَّاحِدَةً তবে অমনি তারা আপনাদের উপর একযোগে আক্রমণ করে বসবে وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ তবে তাতে আপনাদের কোনো পাপ হবে না যে اِنۡ كَانَ بِكُمۡ اَذًى مِّنۡ مَّطَرٍ আর যদি বৃষ্টির দরুন আপনাদের কষ্ট হয় اَوۡ كُنۡتُمۡ مَّرۡضٰۤى অথবা আপনারা পীড়িত হন اَنۡ تَضَعُوۡۤا اَسۡلِحَتَكُمۡ আপনারা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রাখেন وَخُذُوۡا حِذۡرَكُمۡ এবং [তবুও] নিজেদের আত্মরক্ষার উপকরণ [অবশ্যই] নিয়ে নিবেন اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلۡكٰفِرِيۡنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন عَذَابًا مُّهِيۡنًا লাঞ্ছনাময় শাস্তি।

(১০৩) فَاِذَا قَضَيۡتُمُ الصَّلٰوةَ অনন্তর যখন তোমরা এই নামাজ সম্পন্ন কর فَاذۡكُرُوا اللّٰهَ তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক قِيَامًا وَّقُعُوۡدًا দাঁড়িয়েও এবং বসেও وَّعَلٰى جُنُوۡبِكُمۡ এবং শায়িত অবস্থায়ও فَاِذَا اطۡمَاۡنَنۡتُمۡ তৎপর যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হও فَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ তখন নামাজ পড়তে থাক যথানিয়মে اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরজ করা হয়েছে।

(১০৪) وَلَا تَهِنُوۡا আর ভগ্নোৎসাহ হয়ো না فِى ابۡتِغَآءِ الۡقَوۡمِ এই বিরোধী সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবন করতে اِنۡ تَكُوۡنُوۡا تَاۡلَمُوۡنَ যদি তোমরা ব্যথিত হয়ে থাক فَاِنَّهُمۡ يَاۡلَمُوۡنَ তবে তারাও তো ব্যথা পেয়েছে كَمَا تَاۡلَمُوۡنَ যেমন তোমরা ব্যথা পেয়েছ وَتَرۡجُوۡنَ مِنَ اللّٰهِ এবং তোমরা আল্লাহর সমীপে এমন এমন বস্তুর [ছওয়াবের] আশা রাখ যে مَا لَا يَرۡجُوۡنَ তারা [যার] আশা রাখে না وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১০৫) নিশ্চয় আমি আপনার নিকট এই কিতাব প্রেরণ করেছি [যা দ্বারা] বাস্তব অনুরূপ [অবস্থা জানা যাবে], যেন আপনি মানুষের মধ্যে তদনুযায়ী মীমাংসা করেন যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে [ওহী দ্বারা] জানিয়ে দিয়েছেন, আর আপনি ঐ বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষপাতমূলক কথা বলবেন না।	إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৫) إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَٰبَ নিশ্চয় আমি আপনার নিকট এই কিতাব প্রেরণ করেছি [যাদ্বারা] بِالْحَقِّ বাস্তব অনুরূপ [অবস্থা জানা যাবে] لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ যেন আপনি মানুষের মধ্যে তদনুযায়ী মীমাংসা করেন بِمَآ أَرَىٰكَ اللَّهُ যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে [ওহী দ্বারা] জানিয়ে দিয়েছেন وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا আর আপনি ঐ বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষপাতমূলক কথা বলবেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০২) قوله وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আবূ আয়্যাশ আযযুরাকী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে আমরা যাতুর রেকা'-এর অভিযানে বনী সালিম অঞ্চলের উসফান নামক স্থানে রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। সে অভিযানে মুশরিকরা আমাদের সামনে আমাদের কিবলার দিকে অবস্থান করছিল। রাসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করেন। তখন তারা পরস্পর বলছিল যে, এরা এখন এমন এক অবস্থায় ছিল, আমরা যদি তাদের উপর আক্রমণ করতাম, তাদের পরাস্ত করে দিতাম। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করছিল, যা হোক সামনে এখন তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নামাজের সময় আছে, যা তাদের জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষাও অতি প্রিয়। তখনই হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.) সালাতুল খওফ তথা শত্রুদের ভয়ের সময় নামাজ পড়ার বিধান সম্বলিত আলোচ্য আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। –[ইবনে কাছীর ৫৪৮/১, কুরতুবী ৩৪৬/৫, ফাতহুল কাদীর ৫০৯/১)

(১০৪) قوله وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** আলোচ্য আয়াত ওহুদের অভিযান সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম ওহুদের যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হলেন, যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ যখন সাহাবীগণকে আবূ সুফিয়ান ও তার দলবলকে পিছু তাড়া করার জন্যে আদেশ করলেন, তখন সে হুকুম কোনো কোনো সাহাবীর নিকট কষ্টকরই মনে হলো তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : কারো মতে ওহুদের দিনে আবূ সুফিয়ান বদরে সুগরায় মোকাবিলা করার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সে বদরে সুগরার অভিযানে যাওয়া সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ১৩৮/৩/৫, কুরতুবী ৩৫৬/৫]

শানে নুযূল– ৩ : কারো মতে ওহুদ থেকে সাহাবায়ে কেরামগণ ফিরে আসার সময়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে আবূ সুফিয়ানের পিছু তাড়া করার জন্যে নির্দেশ করেছিলেন। তিনি আরো হুকুম করেছিলেন যে, যারা ওহুদের যুদ্ধে তার সাথে ছিলেন, কেবল তারাই তাতে অংশ গ্রহণ করবে। সে সময়ে সাহাবায়ে কেরাম ক্ষত-বিক্ষতের ওজর জানালেন, সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত ৩৫৭/৩]

(১০৫) قوله إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** তিরমিযি, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবি হাতেম, আবূ শায়খ প্রমুখ হযরত কাতাদাহ বিন নোমান (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আমাদের মাঝে একটি পরিবার ছিল বনূ উবায়রাক পরিচিতিতে। তারা হলো বিশর, বশির ও মুবাশশির। তাদের মাঝে বিশর ছিল মুনাফিক। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করত। এতে সাহাবায়ে কেরাম তাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। তারা ছিল জাহিলি ও ইসলামি যুগে সহায়-সম্বলহীন, দরিদ্র। মদিনাবাসীর প্রধান খাবার ছিল খেজুর ও জব। লোক সমাজে স্বচ্ছলতা দেখা দিলে, সিরিয়া থেকে তারা জবের আটা এনে মজুত করে রাখত ও এ দিয়ে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা

হতো। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, সে সুবাদে আমার চাচা রেফাআহ বিন রাফে' সিরিয়া থেকে যবের আটা সংগ্রহ করে বস্তা বন্দী করে ঘরে রেখে দিলেন। এ বস্তার সাথে দুটি অস্ত্র (বর্শা ও একটি তরবারি) রেখে দিলেন। রাতের আঁধারে সিঁধ কেটে সে খাদ্যসহ অস্ত্র দুটি চুরি করে নিয়ে গেল সকাল হতেই আমার চাচা রেফাআহ আমার নিকট এসে বলল, ওহে ভাতিজা! তুমি কি জান, গত রাতে আমার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আমার ঘরে সিঁধ কেটে আহার্যসহ যুদ্ধাস্ত্রগুলো নিয়ে গেল এবং সে সম্পর্কে আমরা অনুমানও করেছি এবং জিজ্ঞাসাবাদও করেছি। এতে কেউ কেউ বলেছেন যে, এ রাতে বনূ উবাইরাক গোত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত হতে দেখতে পেয়েছে। মনে হয় চোরাইকৃত মাল হতেই খাবার তৈরি হচ্ছিল। বনূ উবায়রাক উপস্থিত হয়ে বলল, এ ব্যাপারে লবীদ বিন সাহলকে অভিযোগ করা যেতে পারে, যে ব্যক্তিটি আমাদের মাঝে একজন ভালো মানুষ। লবীদ বিন সাহল এ কথা শুনতে পেয়ে নাঙ্গা তরবারি হাতে নিয়ে বলে, আমি কি চুরি করেছি ? আল্লাহর কসম সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে হবে। না হয় তরবারি দ্বারা তা ফয়সালা করা হবে। তখন আমার চাচা বললেন, ভাতিজা! আমরা যদি রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে আলোচনা করি কেমন হয়? হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, তখন আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরই একটি অস্বচ্ছল পরিবার আমার চাচা রেফাআহ বিন যায়েদের ঘরে সিঁধ কেটে অস্ত্র ও খাদ্য দ্রব্য চুরি করে নিয়ে গেছে। তারা যদি খাদ্যদ্রব্যগুলো রেখে আমাদের হাতিয়ারগুলো ফেরত দিত। রাসূল ﷺ বললেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখি বনূ উবাইরাকের লোকেরা এ বিষয়ে যখন জানতে পেল, তখন উসাইর বিন উরওয়া-এর কাছে একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবে। অতঃপর তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! হযরত কাতাদাহ বিন নোমান এবং তার চাচা আমাদেরই একটি সৎ ও ভাল পরিবারের প্রতি চুরির মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করেছে। তাতে কোনো দলিল ও প্রমাণাদি নেই। কাতাদাহ বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করলাম। রাসূল ﷺ তখন বললেন, কোনো প্রমাণাদি ছাড়াই তোমরা তো সৎ ও ভালো পরিবারের প্রতি চুরির মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করছ। কাতাদাহ বললেন, তখন আমি ফেরত এলাম। আর মনে মনে ভাবলাম, হায়! আমার সম্পদ হতে কিছু সম্পদ দিয়ে দিতাম ও রাসূল ﷺ-এর দরবারে এ বিষয়ে কোনো আলোচনাই না করতাম তাই ভালো ছিল। অতঃপর আমার চাচা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করলে? রাসূল ﷺ আমাকে যা বললেন তা আমি তাকে শুনালাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহই প্রকৃত সাহায্যকারী। অতঃপর অনতি বিলম্বেই কুরআন মাজীদের إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا আয়াত নাজিল হয়। –[ফাতহুল কাদীর : ৫২২/১, ইবনে কাছীর : ৫৫১/১, রূহুল মা'আনী ১৩৯/৩/৫]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ইমাম তাবারী (র.)ও ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এক ইহুদি তু'মা বিন উবাররাকের নিকট একটি বর্ম আমানত রেখেছিল। তু'মা নিজ ঘরে নিয়ে গর্তের ভিতরে হেফাজতে রাখে। পরবর্তীতে ইহুদি যখন তু'মার নিকট তা ফেরত দেওয়ার কথা বলে, তখন তু'মা বর্মের কথা অস্বীকার করে। ফলে ইহুদি তার গোত্রের নিকট গিয়ে আসল ঘটনা বর্ণনা করে বলল, তোমরা আমার সাথে চল, বর্ম কোথায় রাখা হয়েছে তা আমি জানি। তু'মা এ কথা জানতে পেরে বর্মটিকে আবূ মুলাইকা আনসারীর ঘরে নিয়ে ফেলে দেয়। পরক্ষণে বর্মের জন্য অন্যান্য লোকজনসহ তাকে মন্দাচারী ও ভর্ৎসনা করে। এক পর্যায়ে তু'মা বলল, তোমরা কি আমাকে আত্মসাৎকারী মনে করছ? তোমরা আবূ মুলাইকের ঘরে গিয়ে অনুসন্ধান কর। তারা সেখানে গিয়ে বর্মটি পেল, তু'মা তখন বলল, আবূ মুলাইকা তা নিয়েছে। সুতরাং তু'মা এর পরিবর্তে আনসারদের সঙ্গে সে ঝগড়া বাধল। তু'মা বলল, তোমরা আমার সাথে রাসূল ﷺ -এর নিকট চল। তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং ইহুদিদের দলিলকে মিথ্যা বলে মনে করবেন। তখন তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট আসল, ফলে রাসূল ﷺ কিছু বলতে ইচ্ছা করলেন। এ মুহূর্তেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১৩৯/৩/৫]

আল্লাহ যখন তাকে অবাঞ্ছিত করেছেন বলে জানতে পারল, তৎক্ষণাৎ তু'মা পালিয়ে মক্কা চলে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফেরে পরিণত হয়ে যায়। সেখানে হাজ্জাজ বিন আলাত্ব সুলামির নিকট এসে মেহমান হলো। সে তার ঘরের সিঁধ কেটে চুরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। সে মুহূর্তে হাজ্জাজ তার ঘরে খশখশ ও চামড়া কাটার শব্দ শুনতে পেল। তখন চক্ষু খোলে তু'মাকে দেখে বলল, তুমি হলে আমার ঘরের মেহমান ও ভ্রাতুষ্পুত্র। তুমিই আবার আমার ঘর চুরি করার ইচ্ছা করছ? ফলে তাকে সে বের করে দিল, পরবর্তীতে কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ করল। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৪০/৩/৫]

যোগসূত্র : পূর্বে জিহাদ ও হিজরতের আলোচনা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিহাদ ও হিজরতের জন্য সফর করতে হয় এবং এ জাতীয় সফরে শত্রুদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কাও থাকে। তাই সফর ও আতঙ্কাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাজে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা ও সংক্ষিপ্ততা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে।

সফর ও কসরের বিধান : তিন মনজিল থেকে কম দূরত্বের সফরে পূর্ণ নামাজ পড়া হয়।

- সফর শেষ করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর যদি সেখানে পনের দিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থানও সফরের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ অর্ধেক পড়তে হবে। একে শরিয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি একই জনপদে পনের দিন অথবা তদূর্ধ্ব সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে তা সাময়িক বাসস্থান হিসেবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় অস্থায়ী বাসস্থানের মতো কসর পড়া যাবে না। –পূর্ণ নামাজ পড়তে হবে।
- কসর শুধু তিন ওয়াক্তের ফরজ নামাজে হবে। মাগরিব, ফজর এবং সুন্নত ও বিতিরের নামাজে কসর নেই।
- পূর্ণ নামাজের স্থলে অর্ধেক পড়ার মধ্যে কারো মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করা যে, বোধ হয় এতে নামাজ পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। কারণ কসরও শরিয়তেরই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গুনাহ হয় না; বরং ছওয়াব পাওয়া যায়।
- আয়াতে وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ বলা হয়েছে (অর্থাৎ, আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন), এতে এরূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল খওফ' এর বিধান নেই। কেননা তখনকার অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে। নবী বিদ্যমান থাকলে ওজর ব্যতীত অন্য কেউ নামাজে ইমাম হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর এখন যে ইমাম হবেন, তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল খওফ' পড়াবেন। সব ফিকহবিদগণের মতে সালাতুল খওফরে বিধান এখনও অব্যাহত রয়েছে, রহিত হয়নি।
- মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কার কারণে 'সালাতুল খওফ' পড়া যেমন জায়েজ, তেমনিভাবে যদি বাঘ-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং নামাজের সময়ও সংকীর্ণ হয়, তাহলে তখনো 'সালাতুল খওফ' পড়া জায়েজ।
- আয়াতে উভয় দলের এক এক রাকাত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাকাতের নিয়ম হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'রাকাতের পর সালাম ফিরিয়েছেন। –[বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের দ্রষ্টব্য]

শব্দ বিশ্লেষণ

تَقْصُرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَصْرُ মূলবর্ণ (ق . ص . ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা কম করবে।

اَسْلِحَتَهُمْ : শব্দটি বহুবচন, একবচন سلاح অর্থ– অস্ত্রসমূহ।

خُذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (ا . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমরা ধর।

لَاتَهِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَهْنُ মূলবর্ণ (و . ه . ن) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা সাহস হারিয়ো না।

خَائِنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخِيَانَةُ মূলবর্ণ (خ . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– খেয়ানতকারী।

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٦﴾	অনুবাদ : (১০৬) আর আপনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।
وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ﴿١٠٧﴾	(১০৭) আর আপনি তাদের পক্ষ হতে জবাবদিহির কোনো কথা বলবেন না যারা নিজেদের অনিষ্ট করছে, নিশ্চয় আল্লাহ এরূপ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে অতি বড় বিশ্বাসঘাতক, মহাপাপী।
يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾	(১০৮) যাদের অবস্থা এরূপ যে, মানুষ হতে তো গোপন করে আর আল্লাহ তা'আলাকে লজ্জা করে না, অথচ আল্লাহ ঐ সময়ে [-ও] তাদের নিকটে থাকেন রাতে যখন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিরুদ্ধ কথাবার্তা সম্বন্ধে রাতে অভিসন্ধি করতে থাকে; এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মসমূহকে স্বীয় বেষ্টনীতে রেখেছেন।
هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾	(১০৯) হাঁ' তোমরা এরূপ যে, পার্থিব জীবনে তো তোমরা তাদের পক্ষ হতে জবাবদিহির কথা বললে, কিন্তু কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সম্মুখে তাদের পক্ষ হয়ে কে জবাবদিহী করবে? কিংবা সেই ব্যক্তি কে যে তাদের কার্যনির্বাহক হবে।
وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾	(১১০) আর যে ব্যক্তি কোনো দুষ্কর্ম করে, অথবা নিজ আত্মার ক্ষতি সাধন করে, অতঃপর আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে, সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় পাবে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১০৬) وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ আর আপনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

(১০৭) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ আর আপনি তাদের পক্ষ হতে জবাবদিহির কোনো কথা বলবেন না যারা يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ নিজেদের অনিষ্ট করছে اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ নিশ্চয় আল্লাহ এরূপ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا যে অতি বড় বিশ্বাসঘাতক, মহাপাপী।

(১০৮) يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ যাদের অবস্থা এরূপ যে, মানুষ হতে তো গোপন করে وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ আর আল্লাহ তা'আলাকে লজ্জা করে না وَهُوَ مَعَهُمْ অথচ আল্লাহ ঐ সময়ে [-ও] তাদের নিকটে থাকেন اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ রাতে যখন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিরুদ্ধ কথাবার্তা সম্বন্ধে অভিসন্ধি করতে থাকে وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মসমূহকে স্বীয় বেষ্টনীতে রেখেছেন

(১০৯) هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ হাঁ' তোমরা এরূপ যে فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ পার্থিব জীবনে তো তোমরা তাদের পক্ষ হতে জবাবদিহির কথা বললে فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ কিন্তু আল্লাহর সম্মুখে তাদের পক্ষ হয়ে কে জওয়াবদিহী করবে? يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا কিংবা সেই ব্যক্তি কে যে তাদের কার্যনির্বাহক হবে।

(১১০) وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا আর যে ব্যক্তি কোনো দুষ্কর্ম করে اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ অথবা নিজ আত্মার ক্ষতি সাধন করে ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ অতঃপর আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় পাবে

(১১১) আর যে ব্যক্তি কোনো পাপ কার্য করে, সে শুধু স্বীয় আত্মার উপরই তার প্রতিক্রিয়া পৌছায়, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, হেকমতওয়ালা।	وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (١١١)
(১১২) আর যে ব্যক্তি কোনো ছোট পাপ কিংবা বড় পাপ করে, অতঃপর এটার অপবাদ কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে, তবে সে নিজের উপর চাপিয়ে নিল জঘন্যতর অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপ।	وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا (١١٢)
(১১৩) আর যদি আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো, তবে তাদের মধ্য হতে একদল তো আপনাকে ভ্রান্তিতেই ফেলার ইচ্ছা করছিল, আর তারা বিভ্রান্ত করতে পারবে না স্বীয় আত্মাকে ব্যতীত, এবং আপনার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি নাজিল করেছেন কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় এবং আপনাকে এমন সকল বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না, এবং আপনার প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ রয়েছে।	وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (١١٣)

শাব্দিক অনুবাদ

(১১১) وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا আর যে ব্যক্তি কোনো পাপ কার্য করে فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ সে শুধু স্বীয় আত্মার উপরই তার প্রতিক্রিয়া পৌছায় وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, হেকমতওয়ালা।

(১১২) وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا আর যে ব্যক্তি কোনো ছোট পাপ কিংবা বড় পাপ করে ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا অতঃপর এটার অপবাদ কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে فَقَدِ احْتَمَلَ তবে সে নিজের উপর চাপিয়ে নিল بُهْتَانًا জঘন্যতর অপবাদ وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا এবং প্রকাশ্য পাপ।

(১১৩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ আর যদি আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ তবে তাদের মধ্য হতে একদল তো আপনাকে ভ্রান্তিতেই ফেলার ইচ্ছা করছিল وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ আর তারা বিভ্রান্ত করতে পারবে না স্বীয় আত্মাকে ব্যতীত وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ এবং আপনার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ আর আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি নাজিল করেছেন الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় وَعَلَّمَكَ এবং আপনাকে এমন সকল বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ যা আপনি জানতেন না وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا এবং আপনার প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১০৭) قوله وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত বনূ উবাইরাক গোত্রের এক বিষয় সম্পর্ক নাজিল হয়েছে। বনূ উবাইরাকের ছিল তিন ভাই বিশর, বশির ও মুবাশশির। উসাইর বিন উরওয়া ছিল তাদের চাচাতো ভাই। তারা রাতের আঁধারে রেফাআহ বিন যায়েদের ঘরে সিঁধ কেটে তার অস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু সে তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। কারো মতে বশির একাই চোর। তার উপনাম বা ডাক না হলো তু'মা। সে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে গেল। যুদ্ধাস্ত্রগুলো ছিল জবের আটার বস্তার মাঝে। বস্তাটি ছিল ফাটা। সে ফাটা দিয়ে তার ঘর পর্যন্ত আটা পড়ে রইল। সুতরাং রেফা'আর ভাতিজা কাতাদাহ বিন নোমান রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে তাদের [বনূ উবাইরাক]

সম্পর্কে মন্তব্য করলেন। তৎক্ষণাৎ উসাইর বিন উরওয়া নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এরা একটি ধার্মিক আল্লাহভীরু পরিবারের প্রতি চুরি করার অভিযোগ আরোপ করেছে। সে সম্পর্কে তাদের নিকট সুস্পষ্ট কোনো ধরনের প্রমাণাদি নেই। মূলতঃ রাসূল ﷺ কাতাদাহ (রা.) ও রেফাআহ -এর প্রতি ক্রোধান্বিত হলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী : ৩৫৭/৫]

(১১০) قوله وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উপরোল্লিখিত আয়াতে বনূ উবাইরাকের যারা চুরি করেছিল, তাদেরকে তওবা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অতি মহান ও দয়ালু তাদের জন্য, যারা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

যাহহাক বলেন, উপরোল্লিখিত আয়াত হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যাকারী ওয়াহশী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ওয়াহশী শিরক করে ও হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যার ন্যায় জঘন্যতর কাজ করে মহানবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল যে, আমি অন্যায় ও অপরাধ করেছি তার জন্য তওবা করার মতো আমার কি কোনো সুযোগ রয়েছে? তাঁর এহেন বিনয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উপরোল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। -[ফাতহুল কাদীর : ৫১৩/১, কুরতুবী : ৩১৬/১]

(১১২) قوله وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** কারো মতে উপরিউক্ত আয়াত তু'মা বিন উবাইরাক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তু'মা বিন উবাইরাক বর্ম চুরি করে তা অপর ইহুদির ঘরে ফেলে দেয়। তার এ দৃষ্টান্তমূলক কাজের পরিণতি বর্ণনা করণার্থে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

যাহহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, উক্ত আয়াত আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল যখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ রচনা করেছিল, তখন সে কুচক্রীর চির নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজের পরিণতির ভয়াবহতা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করা হয়।

(১১৩) قوله وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম যাহহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। উপরিউক্ত আয়াত ছাকীফ গোত্রীয় প্রতিনিধিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট গমন করে বলল, আমরা আপনার নিকট এসেছি এ মর্মে বায়আত গ্রহণ করার জন্য যে, أَنْ لَا نُحْشَرَ وَلَا نُعْشَرَ আমরা কোনো প্রকারের কলহ-বিবাদ করব না এবং উশরও দেব না। আর এক বছর নাগাদ আমরা উযযার উপাসনা করব। রাসূল ﷺ তাদেরকে কোনো প্রকারের জবাব দেননি। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। -[বাহরে মুহীত :৩৬২/৩]

উপরোল্লিখিত ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য হলো-

প্রথম(অর্থাৎ ১০৫) আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চুরির ঘটনার আসল স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে : আমি আপনার প্রতি কুরআন ও ওহী এজন্য অবতরণ করেছি, যাতে আপনি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও তত্ত্ব অনুযায়ী ফয়সালা করেন এবং বিশ্বাসঘাতকদের অর্থাৎ, বনী উবাইরাকের পক্ষপাতিত্ব না করেন। যদিও বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে চুরির ব্যাপারে ইহুদির প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রবল ধারণা হওয়া কোনো গুনাহ ছিল না; কিন্তু ছিল বাস্তব ঘটনার পরিপন্থি। তাই

দ্বিতীয় (অর্থাৎ, ১০৬) আয়াতে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা পয়গম্বরগণের স্থান অনেক উর্ধ্বে। এতটুকু ব্যাপারও তাঁর পক্ষে শোভা পায় না।

তৃতীয় (অর্থাৎ, ১০৭) আয়াতে পনুরায় তাকিদ করা হয়েছে যে, আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে কোনো বিতর্ক করবেন না। কেননা আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।

চতুর্থ (অর্থাৎ ১০৮) আয়াতে বিশ্বাসঘাতকদের জঘন্য অবস্থা ও নির্বুদ্ধিতা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের মতো মানুষের কাছে তো লজ্জাবোধ করে এবং চুরি গোপন করে; কিন্তু আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না; যিনি সর্বদা তাদের সাথে রয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেক কাজ নিরীক্ষণ করছেন, বিশেষ করে এ ঘটনাটি দেখেছেন যে, তারা পরস্পর পরামর্শ করে স্থির করে যে, ইহুদির বিরুদ্ধে নালিশ কর এবং তাঁকে অনুরোধ করল তিনি যেন ইহুদির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সমর্থন করেন।

পঞ্চম (অর্থাৎ ১০৯) আয়াতে বনী উবায়রাকের সমর্থকদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তো তোমরা তাদের সমর্থন করলে? কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। কিয়ামতে যখন আল্লাহর আদালতে মকদ্দমার শুনানি হবে, তখন কে সমর্থন করবে? এ আয়াতে তাদেরকে একাধারে তিরস্কার করা হয়েছে এবং পরকালের ভীতি প্রদর্শন করে স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য তওবা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ (অর্থাৎ ১১০) আয়াতে কুরআনে পাকের সাধারণ বিজ্ঞোচিত পদ্ধতি অনুযায়ী অপরাধী-পাপীদেরকে নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে যে, ছোট গুনাহ, হোক বা বড় গুনাহ, গুনাহগার ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহকে ক্ষমাশীল করুণাময় পায়। এতে করে উপরিউক্ত গুনাহে যারা জড়িত ছিল, তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, এখনো সময় আছে ফিরে এসো। খাঁটি মনে তওবা করলে কিছুই নষ্ট হয়নি, আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন।

সপ্তম (অর্থাৎ, ১১১) আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা এখনো যদি তওবা না করে, তাহলে তাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ কিংবা মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং এ পাপের বোঝা তাদেরকেই বহন করতে হবে।

অষ্টম (অর্থাৎ ১১২) আয়াতে একটি সাধারণ বিধির আকারে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজে কোনো অপরাধ করে তা অন্য নিরাপরাধ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, [যেমন বর্ণিত ঘটনায় বনী উবায়রাক নিজে চুরি করে হযরত লবীদ অথবা ইহুদির ঘাড়ে চাপিয়েছিল] সে জঘন্য অপবাদ এবং প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা নিজে বহন করে।

নবম (অর্থাৎ, ১১৩) আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী না হলে তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করে দিত। তিনি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে সত্য ঘটনা বলে দিয়েছেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী। তাই কখনো তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না; বরং নিজেরাই পথভ্রষ্ট হবে। আপনার বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি করতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি আসমানি কিতাব এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি অবতরণ করেছেন, যা আপনি ইতঃপূর্বে জানতেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইজতিহাদ করার অধিকার : إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ আয়াত থেকে পাঁচটি বিষয় প্রমাণিত হয়।

এক. যেসব বিষয় সম্পর্কে কুরআন পাকে কোনো স্পষ্ট উক্তি বর্ণিত নেই সেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজ মতামত দ্বারা ইজতিহাদ করার অধিকার ছিল। জরুরি বিষয়াদিতে তিনি অনেক ফয়সালা স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারাও করতেন।

দুই. আল্লাহ তা'আলার কাছে সে ইজতিহাদই গ্রহণযোগ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি থেকে গৃহীত। এ ব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত মতামত ও ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, শরিয়তের পরিভাষায় একে ইজতিহাদ বলা যায় না।

তিন. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইজতিহাদ অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদের মতো ছিল না, যাতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। তিনি যখন ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো ফয়সালা করতেন, তাতে কোনো ভুল হয়ে গেল, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সতর্ক করে ফয়সালাকে নির্ভুল ও সঠিক করে দিতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর, কোনো ইজতিহাদী ফয়সালার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি এ সম্পর্কে কোনো হুঁশিয়ারী অবতীর্ণ না হতো, তবে তাতে প্রতিভাত হতো যে, ফয়সালাটি আল্লাহর পছন্দনীয় ও নির্ভুল হয়েছে।

চার. রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন থেকে যা কিছু বুঝতেন, তা ছিল আল্লাহ তা'আলারই বুঝানো বিষয়। এতে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ ছিল না। অন্যান্য আলেম ও মুজতাহিদের অবস্থা তেমন নয়। তাঁরা যা বুঝেন সে সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বলে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন। এ কারণেই فَاحْكُمْ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন)। তখন তিনি শাসিয়ে দিয়ে বললেন, এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্য কারো নয়।

পাঁচ. মিথ্যা মকদ্দমা ও মিথ্যা দাবির তদবীর করা, ওকালতি করা, সমর্থন করা ইত্যাদি সবই হারাম।

তওবার তাৎপর্য : ১১০তম আয়াত অর্থাৎ, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ থেকে জানা যায় যে, সংক্রামক গুনাহ ও অসংক্রামক গুনাহ, অর্থাৎ বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহর হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গুনাহই তওবা ও ইস্তেগফারের দ্বারা মাফ

হতে পারে : তবে তওবা ও ইস্তেগফারের স্বরূপ জানা জরুরি। শুধু মুখে أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ বলার নাম তওবা ও ইস্তেগফার নয়। তাই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সে জন্য অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করতে কৃতসংকল্প না হয়, তবে মুখে মুখে أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ বলা তওবার সাথে উপহাস করা বৈ কিছু নয়।

তওবার জন্য মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরি : এক. অতীত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, দুই. উপস্থিত গুনাহ অবিলম্বে ত্যাগ করা। এবং তিন. ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়া। বান্দার হকের সাথে যেসব গুনাহের সম্পর্ক, সেগুলো বান্দার কাছ থেকেই মাফ করিয়ে নেওয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেওয়া তওবার অন্যতম শর্ত।

নিজের গুনাহর দোষ অন্যের উপর চাপানো দ্বিগুণ শাস্তির কারণ : ১১২তম আয়াতে অর্থাৎ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ থেকে জানা যায় যে, যে লোক নিজে পাপ করে এবং অপর নিরপরাধ ব্যক্তিকে সেজন্য অভিযুক্ত করে, সে নিজ গুনাহকে দ্বিগুণ ও অত্যন্ত কঠোর করে দেয় এবং নির্মম শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়।

একে তো নিজের আসল গুনাহর শাস্তি, দ্বিতীয়তঃ অপবাদের কঠোর শাস্তি।

কুরআন ও সুন্নাহর তাৎপর্য : وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا বাক্যে 'কিতাব'-এর সাথে 'হেকমত' শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ ও শিক্ষার নাম যে 'হেকমত' তাও আল্লাহ তা'আলারই অবতারিত। পার্থক্য এই যে, সুন্নাহর শব্দাবলি আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। তাই উভয়ের বাস্তবায়নই ওয়াজিব।

এ থেকে কোনো কোনো ফিকহবিদের এ উক্তির স্বরূপও জানা গেল যে, ওহী দুই প্রকার। এক. مَتْلُوٌّ যা তেলাওয়াত করা হয়েছে এবং দুই. غَيْر مَتْلُوٌّ যা তেলাওয়াত করা হয় না। প্রথম প্রকার ওহী কুরআনকে বলা হয়, যার অর্থ ও শব্দাবলি উভয় আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত। দ্বিতীয় প্রকার ওহী হাদীস তথা সুন্নাহ। এর শব্দাবলি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এবং মর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টজীবের চাইতে বেশি : وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মতো সর্বব্যাপী ছিল না; যেমন কতক মূর্খ বলে থাকে; বরং আল্লাহ যতটুকু দান করতেন, তিনি তাই পেতেন। তবে এতে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সমগ্র সৃষ্টিজীবের জ্ঞানের চাইতে অনেক বেশি।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَخْتَانُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِيَانُ মূলবর্ণ (خ . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা খেয়ানত করবে।

خَوَّانٌ : এটি فعال এর ওজনে বাব نَصَرَ থেকে مبالغة এর সীগাহ। অর্থা- মহা খেয়ানতকারী।

يَسْتَخْفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِخْفَاءُ মূলবর্ণ (خ . ف . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা গোপন করতে চায়।

يُبَيِّتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّبْيِيْتُ মূলবর্ণ (ب . ى . ت) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা রাতের বেলায় পরামর্শ করে।

بَرِيْئٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচন اَبْرِيَاءُ অর্থ- নির্দোষ।

هَمَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَمُّ মূলবর্ণ (ه . م . م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে ইচ্ছা করেছে।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১১৪) মানুষের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোনো মঙ্গল নিহিত থাকে না, হ্যাঁ, তবে যে ব্যক্তি দান অথবা কোনো নেক কাজ কিংবা জনগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপনে উৎসাহিত করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ কাজ করবে, আমি সত্বরই তাকে মহান পুরস্কার প্রদান করব।	لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا (١١٤)
(১১৫) আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে, তার নিকট সত্য বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর, এবং মুসলমানদের পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করবে, তাহলে আমি তাকে করতে দিব সে যা কিছু করে, এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, আর তা হচ্ছে নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান।	وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا (١١٥)
(১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তাঁর সাথে শরিক স্থির করাকে এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক স্থির করে, সে তো বহু দূরের পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে।	اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا (١١٦)
(১১৭) তারা [অংশীবাদীরা] খোদাকে পরিত্যাগ করে কেবল কয়েকটি নারী জাতীয় বস্তুর পূজা করে, আর কেবল শয়তানের পূজা করে, যে [আল্লাহর] নির্দেশ লঙ্ঘনকারী।	اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا (١١٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৪) لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ মানুষের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোনো মঙ্গল নিহিত থাকে না اِلَّا مَنْ اَمَرَ হ্যাঁ, তবে যে ব্যক্তি উৎসাহিত করে بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ দান অথবা কোনো নেক কাজ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ কিংবা জনগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপনে وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا তাহলে আমি সত্বরই তাকে মহা পুরস্কার প্রদান করবে।

(১১৫) وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى তার নিকট সত্য বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং মুসলমানদের পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করবে نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى তাহলে আমি তাকে করতে দিব সে যা কিছু করে وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব وَسَآءَتْ مَصِيْرًا আর তা হচ্ছে নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান।

(১১৬) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন না اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ তাঁর সাথে শরিক স্থির করাকে وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক স্থির করে فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا সে তো বহু দূরের পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে।

(১১৭) اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا তারা [অংশীবাদীরা] খোদাকে পরিত্যাগ করে কেবল কয়েকটি নারী জাতীয় বস্তুর পূজা করে وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا আর কেবল শয়তানের পূজা করে, مَّرِيْدًا যে [আল্লাহর] নির্দেশ লঙ্ঘনকারী।

অনুবাদ	আয়াত
(১১৮) যাকে আল্লাহ স্বীয় [বিশেষ] করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, এবং যে এরূপ বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাগণ হতে স্বীয় নির্ধারিত অংশ নিব।	لَعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا (۱۱۸)
(১১৯) [আনুগত্যের দ্বারা] আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব এবং আমি তাদেরকে বৃথা আশ্বাস প্রদান করব এবং আমি তাদেরকে শিক্ষা দিব যেন তারা [প্রতিমার নামে] চতুষ্পদ জন্তুর কান কর্তন করে, এবং আমি তাদেরকে [আরো] শিক্ষা দিব, যেন তারা আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতিকে বিকৃত করে দেয়, আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে নিশ্চয় প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত হবে।	وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا (۱۱۹)
(১২০) শয়তান তাদের সাথে অঙ্গীকার করে ও বৃথা আশ্বাস দেয়, আর শয়তান তাদের সাথে শুধু মিথ্যা [প্রবঞ্চনামূলক] অঙ্গীকার করে।	يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا (۱۲۰)
(১২১) এরূপ লোকের বাসস্থান হবে জাহান্নাম, এবং তা হতে বাঁচার স্থান কোথাও পাবে না।	اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۡ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا (۱۲۱)

শাব্দিক অনুবাদ

(১১৮) لَعَنَهُ اللّٰهُ যাকে আল্লাহ স্বীয় [বিশেষ] করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন وَقَالَ এবং যে এরূপ বলেছিল لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাগণ হতে নিব نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا স্বীয় নির্ধারিত অংশ ।

(১১৯) وَلَاُضِلَّنَّهُمْ [আনুগত্যের দ্বারা] আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ এবং আমি তাদেরকে বৃথা আশ্বাস প্রদান করব وَلَاٰمُرَنَّهُمْ এবং আমি তাদেরকে শিক্ষা দিব فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ যেন তারা [প্রতিমার নামে] চতুষ্পদ জন্তুর কান কর্তন করে وَلَاٰمُرَنَّهُمْ এবং আমি তাদেরকে [আরো] শিক্ষা দিব فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ যেন তারা আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতিকে বিকৃত করে দেয় وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا আর যে ব্যক্তি শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ত্যাগ করে فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا সে নিশ্চয় প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত হবে।

(১২০) يَعِدُهُمْ শয়তান তাদের সাথে অঙ্গীকার করে وَيُمَنِّيْهِمْ ও বৃথা আশ্বাস দেয়। وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا আর শয়তান তাদের সাথে শুধু মিথ্যা [প্রবঞ্চনামূলক] অঙ্গীকার করে।

(১২১) اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ এরূপ লোকের বাসস্থান হবে জাহান্নাম وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا এবং তা হতে বাঁচার স্থান কোথাও পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১১৫-১১৬) قوله وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো উভয়টি আয়াত ইবনে উবাইরিক চোরের কারণে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ ইবনে উবাইরিককে যখন হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন, তখন সে মক্কায় পালিয়ে গিয়ে মুরতাদ হয়ে যা। হযরত সাঈদ বিন জুবাইর বলেন, ইবনে উবাইরিক

যখন মক্কায় চলে গেল, সেখানেও এক ঘরে সিঁধ কাটে। ফলে মক্কাবাসী তাকে ধরে হত্যা করে ফেলে। সে পরিপ্রেক্ষিতে اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ الخ আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল– ২ : যাহহাক বলেন, কুরাইশ এক প্রতিনিধি দল মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে, অতঃপর মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কায় ফিরে যায়। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল- ৩ : কালবী বলেন, ইবনে উবাইরিকের বাস্তব অবস্থা যখন উদ্ভাসিত হয়ে যায়, এবং সে-ই চুরি করেছে বলে যখন প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে যায়। সে মক্কায়ও হাজ্জাজ বিন আল্লাত নামী এক ব্যক্তির ঘরে সিঁধ কাটে। ফলে সে দেয়াল তার উপর ধসে পড়ে যায় এবং সিঁধে চাপাবস্থায় তাকে পাওয়া যায়। তখন তারা তাকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেয়। পরবর্তীতে সিরিয় এক কাফেলার মাল চুরি করে নিয়ে যায়, অতঃপর আবারো কোনো এক কাফেলা থেকে কোনো একজনের মাল চুরি করে নিয়ে যায়। সুতরাং একে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

শানে নুযূল– ৪ : যাহহাক বলেন, একজন বেদুইন রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পাপ পঙ্কিলতায় ও ভ্রান্ততায় নিমজ্জিত একজন বৃদ্ধ মানুষ, তবে আমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক নির্ধারণ করিনি। যখন থেকে আমি আল্লাহর পরিচয় লাভ করেছি এবং যখন থেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। সুতরাং আল্লাহর নিকট আমার কি পরিণতি ঘটবে? তখন اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ আয়াতে নাজিল হয়। –[কুরতুবী : ৩৬৬-৬৭/৫, রূহুল মা'আনী : ১৪৭/৩/৫/ ফাতহুল কাদীর : ৫১৬/১, কাশশাফ : ৫৯৯/১]

(১১৭) قوله اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** সাঈদ বিন মানসূর, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির হাসান হতে বর্ণনা করেন, আরবের প্রতিটি গোত্রের জন্যই স্বতন্ত্র দেবতা ও প্রতিমা ছিল। যেগুলোকে তারা উপাসনা করত, সেগুলোর নাম রাখত গোত্রের মহিলাদের নামের সাথে মিলিয়ে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৫১৮/১, কুরতুবী : ৩৬৭/৫]

পারস্পরিক সলা-পরামর্শ ও মজলিসের উত্তম পন্থা : বলা হয়েছে لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ অর্থাৎ, মানুষের যেসব পারস্পরিক সলা-পরামর্শ পরকালের ভাবনা ও পরিণতির চিন্তা বিবর্জিত শুধু ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ও সাময়িক উপকার লাভের জন্য হয়ে থাকে, সেগুলোতে কোনো মঙ্গল নেই।

এরপর বলা হয়েছে : اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ, এসব সলা-পরামর্শ ও কানাকানিতে মঙ্গলের কোনো কিছু থাকলে তা হচ্ছে একে অপরকে দান খয়রাতে উৎসাহিত করা কিংবা সৎকাজের আদেশ দেওয়া অথবা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের পরমার্শ দান করা। এক হাদীসে বলা হয়েছে : মানুষের যেসব কথাবার্তায় আল্লাহর জিকির কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থাকে, সেগুলো ছাড়া সবই তাদের জন্য ক্ষতিকর।

مَعْرُوْفٍ এমন কাজকে বলা হয়, যা শরিয়তে প্রশংসিত এবং যা শরিয়তপন্থিদের কাছে পরিচিত। এর বিপরীতে مُنْكَرٌ ঐ কাজ, যা শরিয়তে অপছন্দনীয় এবং শরিয়তপন্থিদের কাছে অপরিচিত।

যে কোনো সৎকাজের আদেশ এবং উৎসাহ দান 'আমর বিল মারূফে'র অন্তর্ভুক্ত। উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, অভাবীদের ঋণ দেওয়া, পথভ্রান্তকে পথ বলে দেওয়া ইত্যাদি সৎকাজও 'আমর বিল মারূফে'র অন্তর্ভুক্ত। সদকা এবং মানুষের পারস্পরিক শান্তি স্থাপন যদিও এর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এতদুভয়ের উপকারিতা বহু লোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং জাতীয় জীবন সংশোধিত হয়।

এ ছাড়া দুটি কাজ জনসেবার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহেকে পরিব্যাপ্ত করে। এক. সৃষ্টি জীবের উপকার করা। দুই. মানুষকে দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করা। সদকা উপকার সাধনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং মানুষে মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা, সৃষ্টজীবকে ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করার সর্বপ্রধান মাধ্যম। তাই তাফসীরবিদগণ বলেন : এখানে সদকার অর্থ ব্যাপক। ওয়াজিব সদকা, জাকাত, নফল সদকা এবং যে কোনো উপকার এর অন্তর্ভুক্ত।

শিরক ও কুফরের শাস্তি চিরস্থায়ী হওয়া : এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে, কর্ম পরিমাণে শাস্তি হওয়া উচিত। মুশরিক ও কাফেররা যে শিরক ও কুফরের অপবাদ করে, তা সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কালের মধ্যে করে। অতএব, এ শাস্তি অনন্তকাল ও চিরস্থায়ী হবে কেন? এর উত্তর এই যে, কাফের ও মুশরিকরা কুফর ও শিরককে অপরাধই মনে করে না; বরং পুণ্যের কাজ

বলে মনে করে। তাই তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প এটাই থাকে যে, চিরকাল এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকবে। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত যখন সে এ অবস্থার উপর কায়েম থাকে, তখন সে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত চিরস্থায়ী অপরাধ করে নেয়। তাই শাস্তিও চিরস্থায়ী হবে।

জুলুম ও অবিচার তিন প্রকার : এক প্রকার জুলুম আল্লাহ তা'আলা কখনো ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার জুলুম মাফ হতে পারে। তৃতীয় প্রকার জুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ তা'আলা না নিয়ে ছাড়বেন না।

প্রথম প্রকার জুলুম হচ্ছে শিরক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহর হকে ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা। –[ইবনে কাছীর]

শিরকের তাৎপর্য : শিরকের তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত কোনো সৃষ্টবস্তুকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা। জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা যে উক্তি করবে, কুরআনে পাক তা উদ্ধৃত করেছে: تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اَوْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ: অর্থাৎ, আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বপালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম।

জানা কথা যে, মুশরিকদেরকেও এরূপ বিশ্বাস ছিল না যে, তাদের স্বনির্মিত প্রস্তরমূর্তি বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও মালিক। তারা অন্যান্য ভুল-বুঝাবুঝির কারণে এদেরকে ইবাদতে কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য স্থির করে নিয়েছিল। এ শিরকই তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে। –[ফাতহুল মুলহিম] জানা গেল যে, স্রষ্টা রিজিকদাতা, সর্বশক্তিমান, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার ইত্যাকার বিশেষ গুণে কোনো সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করাই শিরক।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُشَاقِقْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُشَاقَّةُ মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে বিরোধিতা করবে।

نُوَلِّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّوَلِّيْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– আমরা তা অর্পণ করব।

اِنٰثًا : শব্দটি বহুবচন, একবচন اُنْثٰى অর্থ– মহিলাগণ, দেবীসমূহ।

مَرِيْدًا : শব্দটি একবচন, বহুবচন مُرَدَاءُ অর্থ– নাফরমান,নির্দেশ লঙ্ঘনকারী।

لَاُمَنِّيَنَّهُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ فعل مستقبل معروف در فعل ثقيلة بانون تاكيد لام বাব تَفْعِيل মাসদার اَلتَّمْنِيَةُ মূলবর্ণ (م ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই।

مَأْوٰى : শব্দটি একবচন, বহুবচন مَاٰوِيْ অর্থ– ঠিকানা।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿۱۲۲﴾

(১২২) আর যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং নেক কাজ করেছে, আমি তাদেরকে সত্বরই এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করব যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর আল্লাহ তা'আলার চেয়ে কার কথা অধিক সত্য হবে?

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَاۤ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۲۳﴾

(১২৩) না তোমাদের আকাঙ্ক্ষায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবদের আকাঙ্ক্ষায় যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে তদবিনিময়ে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সে ব্যক্তি আল্লাহকে ব্যতীত কোনো বন্ধুও পাবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও পাবে না।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾

(১২৪) আর যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ করবে চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক, যদি সে মুমিন হয়, তবে এরূপ লোকগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾

(১২৫) আর এরূপ ব্যক্তি [-র ধর্ম] অপেক্ষা কার ধর্ম অধিক উত্তম হবে? যে ব্যক্তি স্বীয় চেহারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়, এবং সে নিষ্ঠাবানও হয়, এবং সে মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসরণও করে, যাতে বক্রতার লেশ নেই, এবং আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে স্বীয় খাঁটি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১২২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান আনয়ন করেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ আমি তাদেরকে সত্বরই এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করব تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا আর আল্লাহ তা'আলার চেয়ে কার কথা অধিক সত্য হবে?

(১২৩) لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ না তোমাদেরকে আকাঙ্ক্ষায় কাজ হবে وَلَاۤ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ আর না আহলে কিতাবদের আকাঙ্ক্ষায় مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে يُّجْزَ بِهٖ তদবিনিময়ে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে وَلَا يَجِدْ لَهٗ এবং সে ব্যক্তি পাবে না مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ব্যতীত وَلِيًّا কোনো বন্ধু وَّلَا نَصِيْرًا এবং কোনো সাহায্যকারীও।

(১২৪) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ আর যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজ করবে مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক وَهُوَ مُؤْمِنٌ যদি সে মুমিন হয় فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ তবে এরূপ লোকগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না।

(১২৫) وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا আর কার ধর্ম অধিক উত্তম হবে? مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ এরূপ ব্যক্তি [-র ধর্ম] অপেক্ষা যে ব্যক্তি স্বীয় চেহারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় وَهُوَ مُحْسِنٌ এবং সে নিষ্ঠাবানও হয় وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ এবং সে মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসরণও করে حَنِيْفًا যাতে বক্রতার লেশ নেই وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا এবং আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে স্বীয় খাঁটি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا (١٢٦)

(১২৬) আর আল্লাহরই আধিপত্যে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে আছে ও যা কিছু জমিনে আছে, এবং আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا (١٢٧)

(১২৭) আর মানুষ আপনার নিকট নারীদের [মিরাশ ও মহর] সম্বন্ধে বিধান জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে [ঐ পূর্ব] ব্যবস্থা দিচ্ছেন এবং সেই আয়াতগুলো যা কিতাবের মধ্যে তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয়ে থাকে– যা ঐ এতিম নারীদের সম্বন্ধে [নাজিল হয়েছে] যাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত স্বত্ব প্রদান কর না, এবং যাদেরকে বিবাহ করতে ঘৃণা কর এবং [ঐ আয়াতগুলোও] দুর্বল শিশুদের সম্বন্ধে এবং এই সম্বন্ধে যে, এতিমদের [যাবতীয়] কার্য ন্যায়ের সাথে সম্পাদন কর, আর তোমরা যে নেক কাজ কর নিশ্চয় আল্লাহ তা খুব জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১২৬) وَلِلّٰهِ আর আল্লাহরই আধিপত্যে রয়েছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ যা কিছু আসমানসমূহে আছে وَمَا فِي الْاَرْضِ ও যা কিছু জমিনে আছে وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا এবং আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

(১২৭) وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ আর মানুষ আপনার নিকট নারীদের [মিরাশ ও মহর] সম্বন্ধে বিধান জিজ্ঞাসা করে قُلِ আপনি বলে দিন اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে [ঐ পূর্ব] ব্যবস্থা দিচ্ছেন وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ এবং সেই আয়াতগুলো যা কিতাবের মধ্যে তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয়ে থাকে– فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ যা ঐ এতিম নারীদের সম্বন্ধে [নাজিল হয়েছে] الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ যাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত স্বত্ব প্রদান কর না وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ এবং যাদেরকে বিবাহ করতে ঘৃণা কর وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ এবং [ঐ আয়াতগুলোও] দুর্বল শিশুদের সম্বন্ধে এবং এই সম্বন্ধে যে وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ এতিমদের [যাবতীয়] কার্য ন্যায়ের সাথে সম্পাদন কর وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ আর তোমরা যে নেক কাজ কর فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ তা খুব জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১২৩) قوله لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** সাঈদ বিন মানসূর, আবদ বিন হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আরবরা বলত আমরা পুনর্বার উত্থিত হবো না, আমাদের হিসাবও নেওয়া হবে না, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলত, একমাত্র ইহুদি ও খ্রিস্টানরাই বেহেশতে যাবে। তারা আরো বলত গণনার কতক দিনই মাত্র আমাদের জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে। তাদের এ সকল অবান্তর দাবি ও মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৪৭/১]

শানে নুযূল– ২ : সাঈদ বিন মানসূর, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির মাসরূকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, মুসলমান ও যারা আহলে কিতাব, তাদের মাঝে একটি বিরোধ ছিল আর তা ছিল এরূপভাবে যে, মুসলমানরা বলত, তোমাদের অপেক্ষা আমরা অধিক হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং যারা আহলে কিতাব তারা বলত যে, তোমাদের অপেক্ষা আমরা অধিক সরল পথ প্রাপ্ত। সুতরাং তাদের উপর মুসলমানদের সফলতার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

শানে নুযূল– ৩ : কাতাদাহ বলেন, আমাদেরকে জানানো হলো যে, মুসলমান ও আহলে কিতাবের পরস্পরে এই মর্মে বিরোধিতা চল ছিল যে, আহলে কিতাব বলত, আমাদের নবী হলো তোমাদের নবী হতে পূর্বে আগত এবং আমাদের কিতাবও তোমাদের কিতাবের পূর্বেকার কিতাব কাজেই আমরাই আল্লাহর অতি নিকটতম তোমাদের অপেক্ষা। মুসলমানগণ বলতেন, আমরা আল্লাহর অতি আপনজন, কারণ আমাদের নবী হলেন সর্বশেষ নবী এবং আমাদের কিতাব দ্বারাই পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সমাধান করা যায়। তখন সে বিরোধ নিষ্পত্তি করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৪৯/১]

(১২২) قوله وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মাসরূকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, খ্রিস্টান ও মুসলমানরা পরস্পরের মাঝে গর্ব প্রকাশ করছিল। সুতরাং এক পক্ষ বলত আমরা তোমাদের অপেক্ষা শ্রেয় এবং অপর পক্ষও বলত আমরা তোমাদের অপেক্ষা অতি উত্তম। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর ৫১৯/১]

(১২৭) قوله وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاۤءِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম বুখারী (র.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, যে কোনো ব্যক্তির নিকট যদি এতিম মেয়ে থাকত, সে তার অভিভাবক ও ওয়ারিশ হতো, সে এতিম মেয়েটি তার মালের সাথে শামিল হয়ে যেত। ফলে সে নিজেই তাকে বিবাহ করতে উদ্যোগী হতো। আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।–[ইবনে কাছীর : ৫৬১]

শানে নুযূল– ২ : ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনযির ইবনে জুরাইজ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন , যে সকল পুরুষ মাল হেফাজত করা ও তাতে উৎপন্ন করার যোগ্য হতো কেবল তারাই মৃত ব্যক্তির মালের ওয়ারিশ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতো। ছোট কচি-কাচা শিশু ও মহিলারা ওয়ারিশ হতো না। সুতরাং সে সমস্যার স্থায়ী সমাধান কল্পে সূরায়ে নিসায় মিরাশের আয়াত নাজিল হয়, তখন তা মানুষের কাছে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। তারা বলতে লাগল, সম্পদ সংরক্ষণে অক্ষম শিশু কন্যারাও পুরুষদের ন্যায় ওয়ারিশ হবে কী? অতঃপর তারা এ সম্পর্কে আসমান থেকে নতুন কোনো বিধান কামনা করে অপেক্ষমান থাকল। সুতরাং তারা যখন নতুন কোনো বিধান আসতে দেখতে পেল না। তখন বলতে লাগল নতুন কোনো বিধান আসে, তাহলে তাই মান্য করা আবশ্যকীয় হয়ে থাকবে। অতঃপর তারা পরস্পর বলল, এ সম্পর্কে জেনে নাও। সুতরাং সাহাবীগণ হতে কেউ কেউ নবী করীম ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে জানতে চান। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করন।

শানে নুযূল– ৩ : আবদ বিন হুমাইদ মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, জাহেলি যুগে শিশু ও নারীদেরকে ওয়ারিশ বানানো হতো না। তাদের দাবি ছিল, ওরা যুদ্ধ করতে পারে না, গনিমতের মালও সংগ্রহ করতে পারে না, বিধায় তারা ওয়ারিশ হবার যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং তাদের সে দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড : لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَاۤ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ আয়াতে মুসলমান ও আহলে কিতাবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি কথোপকথন উল্লিখিত হয়েছে। এরপর এ কথোপকথন বিচার করে উভয় পক্ষকে বিশুদ্ধ হেদায়েতের পর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশেষে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার একটি মানদণ্ড ব্যক্ত করা হয়েছে, যা সামনে রাখলে মানুষ কখনো ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার শিকার হবে না।

এতে বলা হয়েছে, এ গর্ব ও অহংকার কারো জন্য শোভা পায় না। শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবি দ্বারা কেউ কারো চাইতে শ্রেষ্ঠ হয় না; বরং প্রত্যেক কাজ কর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। কারো নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে। এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে– এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না।

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا يُّجْزَ بِهٖ অর্থাৎ, যে কেউ কোনো অসৎ কাজ করবে, সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আমরা খুব দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলাম যে, এ আয়াতটি তো কোনো কিছুই ছাড়েনি। সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চিন্তা করো না, সাধ্যমতো কাজ করে যাও। কেননা উল্লিখিত শাস্তি যে জাহান্নামই হবে, তা জরুরি নয়। তোমরা দুনিয়াতে যে কোনো কষ্ট অথবা বিপদাপদে পড়, তাতে তোমাদের গুনাহের কাফফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে। এমন কি কারো পায়ে কাঁটা ফুটে, তাও গুনাহের কাফফারা বৈ নয়।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে মুসলমান দুনিয়াতে যে কোনো দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখ অথবা চিন্তা-ভাবনার সম্মুখীন হয়, তা তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

তিরমিযী ও ইবনে জারীর হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁদেরকে مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِه আয়াতটি শুনালেন, তখন তাঁদের যেন কোমর ভেঙ্গে গেল। এ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বললেন, ব্যাপার কি? হযরত সিদ্দীক (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে? যে কোনো মন্দ কাজ করেনি? প্রত্যেক কাজেরই যদি প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তবে কে রক্ষা পাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ বকর! আপনারা মোটেই চিন্তিত হবেন না। কেননা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে আপনাদের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বললেন, আপনি কি অসুস্থ হন না? আপনি কি কোনো দুঃখ ও কোনো বিপদে পতিত হন না? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আরজ করলেন : নিশ্চয় এসব বিষয়ের সম্মুখীন হই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ব্যাস, এটাই আপনাদের প্রতিফল।

আবূ দাউদ প্রমুখের বর্ণনাকৃত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে বলা হয়েছে, বান্দা জ্বরে কষ্ট পেলে কিংবা পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা তাঁর গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। এমনকি, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু এক পকেটে তালাশ করে অন্য পকেটে পায়, তবে এতটুকু কষ্টও তার গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াত মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, শুধু দাবি ও বাসনায় লিপ্ত হয়ো না; বরং কাজের চিন্তা কর। কেননা তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী– শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে না; বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদনুযায়ী সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَمَانِيِّكُمْ : শব্দটি বহুবচন, একবচন أُمْنِيَّةٌ অর্থ– আশা, আকাঙ্ক্ষা।

يَسْتَفْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ মূলবর্ণ (و . ف . ت) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা ফতোয়া চায়।

يُفْتِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف . ت . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে আদেশ দেয়।

مُسْتَضْعَفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اَلْاِسْتِضْعَافُ মূলবর্ণ (ض . ع . ف) জিনস صحيح অর্থ– পরাজিত লোকগণ।

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (۱۲۸)

অনুবাদ : (১২৮) আর যদি কোনো নারী নিজ স্বামী হতে দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে [এই অবস্থায়] তাদের কোনো পাপ নেই যে, উভয়ে পরস্পর এক বিশেষ পদ্ধতিতে মীমাংসা করে নেয় এবং [বিবাহ-বিচ্ছেদের চেয়ে] এই মীমাংসাই অধিক কল্যাণকর, আর লালসার সাথে আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক [ও মিল স্বাভাবিক] আর যদি তোমরা সদ্ব্যবহার কর ও [দুর্ব্যবহার হতে] সংযমী হও, তবে [তোমরা মহা পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। কেননা] নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আমলের পূর্ণ খবর রাখেন।

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (۱۲۹)

(১২৯) আর তোমাদের দ্বারা তা কখনো সম্ভব হবে না যে, তোমরা পত্নীদের মধ্যে [সর্বদিক দিয়ে] সমতা রক্ষা করবে, যদিও তোমরা [সমতা রক্ষার জন্য] কতই না আকাঙ্খা কর, তবে তোমরা [ক্ষমতাধীন বিষয়ে] সম্পূর্ণরূপে এক দিকে ঝুঁকে পড়ো না, যদ্দরুন, তাকে [অত্যাচারিত পত্নীকে] এরূপ করে দাও যেমন কেউ শূন্যে ঝুলছে আর যদি সংশোধন করে নাও এবং [এরূপ আচরণ হতে] আত্ম সংবরণ কর, তবে [ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে] নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا (۱۳۰)

(১৩০) আর যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রাচুর্য হতে প্রত্যেককে মুখাপেক্ষীহীন করে দিবেন, আর আল্লাহ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ

(১২৮) وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ আর যদি কোনো নারী আশঙ্কা করে مِنْ بَعْلِهَا নিজ স্বামী হতে نُشُوْزًا দুর্ব্যবহার اَوْ اِعْرَاضًا কিংবা উপেক্ষার فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا তবে [এই অবস্থায়] তাদের কোনো পাপ নেই যে اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا উভয়ে পরস্পর এক বিশেষ পদ্ধতিতে মীমাংসা করে নেয় وَالصُّلْحُ خَيْرٌ এবং [বিবাহ-বিচ্ছেদের চেয়ে] এই মীমাংসাই অধিক কল্যাণকর وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ আর লালসার সাথে আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক [ও মিল স্বাভাবিক] وَاِنْ تُحْسِنُوْا আর যদি তোমরা সদ্ব্যবহার কর وَتَتَّقُوْا ও [দুর্ব্যবহার হতে] সংযমী হও فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا তবে [তোমরা মহা পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। কেননা] নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আমলের পূর্ণ খবর রাখেন।

(১২৯) وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا আর তোমাদের দ্বারা তা কখনো সম্ভব হবে না যে اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ তোমরা পত্নীদের মধ্যে [সর্বদিক দিয়ে] সমতা রক্ষা করবে وَلَوْ حَرَصْتُمْ যদিও তোমরা [সমতা রক্ষার জন্য] কতই না আকাঙ্ক্ষা কর فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ তবে তোমরা [ক্ষমতাধীন বিষয়ে] সম্পূর্ণরূপে এক দিকে ঝুঁকে পড়ো না فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ যদ্দরুন তাকে [অত্যাচারিত পত্নীকে] এরূপ করে দাও যেমন কেউ শূন্যে ঝুলছে وَاِنْ تُصْلِحُوْا আর যদি সংশোধন করে নাও وَتَتَّقُوْا এবং [এরূপ আচরণ হতে] আত্ম সংবরণ কর فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا তবে [ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে] নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(১৩০) وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا আর যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ তবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রাচুর্য হতে প্রত্যেককে মুখাপেক্ষীহীন করে দিবেন وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا আর আল্লাহ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়।

অনুবাদ : (১৩১) আর আল্লাহ তা'আলারই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে আছে ও যা কিছু জমিনে আছে, এবং বাস্তবিকই আমি তাদেরকেও আদেশ করেছিলাম যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব পেয়েছিল এবং তোমাদেরকেও [আদেশ দিয়েছি] যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর যদি তোমরা শোকরগুজারী না কর, তবে [আল্লাহর কোনো অনিষ্ট হবে না, কেননা] আল্লাহরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে, আর আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ং নিজ সত্তায় প্রশংসিত।	وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا (١٣١)
(১৩২) আর আল্লাহরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।	وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا (١٣٢)
(১৩৩) হে মানব! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে লোপ করে দিবেন এবং অন্যদেরেকে অস্তিত্ব দান করবেন, আর আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।	اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا (١٣٣)
(১৩৪) যে ব্যক্তি [দীনের কাজে] পার্থিব বিনিময় কামনা করে, তবে [সে বড়ই ভুল করবে, কেননা] আল্লাহর নিকট তো ইহলোক এবং পরলোক উভয়েরই বিনিময় রয়েছে, এবং আল্লাহ অতিশয় শ্রবণকারী, অতীব দর্শনকারী।	مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (١٣٤)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩১) وَلِلّٰهِ আর আল্লাহ তা'আলারই স্বত্বে রয়েছে مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে আছে ও যা কিছু জমিনে আছে وَلَقَدْ وَصَّيْنَا এবং বাস্তবিকই আমি তাদেরকেও আদেশ করেছিলাম الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব পেয়েছিল وَاِيَّاكُمْ এবং তোমাদেরকেও [আদেশ দিয়েছি] যে اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর وَاِنْ تَكْفُرُوْا আর যদি তোমরা শোকরগুজারী না কর فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ তবে [আল্লাহর কোনো অনিষ্ট হবে না, কেননা] আল্লাহরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে। وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا আর আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ং নিজ সত্তায় প্রশংসিত।

(১৩২) وَلِلّٰهِ আর আল্লাহরই স্বত্বে রয়েছে যা مَا فِي السَّمٰوٰتِ কিছু আসমানসমূহে আছে وَمَا فِي الْاَرْضِ এবং যা কিছু জমিনে আছে وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

(১৩৩) اِنْ يَّشَاْ তিনি ইচ্ছা করলে يُذْهِبْكُمْ তোমাদেরকে লোপ করে দিবেন اَيُّهَا النَّاسُ হে মানব! وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ এবং অন্যদেরেকে অস্তিত্ব দান করবেন। وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا আর আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

(১৩৪) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا যে ব্যক্তি [দীনের কাজে] পার্থিব বিনিময় কামনা করে فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ তবে [সে বড়ই ভুল করবে, কেননা] আল্লাহর নিকট তো ইহলোক এবং পরলোক উভয়েরই বিনিময় রয়েছে। وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا এবং আল্লাহ অতিশয় শ্রবণকারী, অতীব দর্শনকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১২৮) قوله وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا الخ **আয়াতের শানে নুযূল– ১ :** ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত ইবনে আববাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাওদাহ (রা.) ভয় করছিলেন যে, হযরত রাসূল ﷺ তাঁকে তালাক দিয়ে দিবেন। সুতরাং তিনি বললেন হে, আল্লাহ আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে তালাক দিবেন না।

আমার জন্য যে বারী নির্ধারিত রয়েছে, তা আয়েশার জন্য নির্ধারণ করে দিন। ফলে রাসূল ﷺ এমনই করেন সুতরাং এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী : ১৬১/৩/৫ ইবনে কাছীর : ৫৬২, ফাতহুল কাদীর : ৫২২/১, কুরতুবী : ৩৮৪/৫]

শানে নুযূল- ২ : ইমাম শাফেয়ী (র.) ইবনে সায়েবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর কন্যা রাফে' বিন খাদীজ (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। রাফে' বিন খাদীজের মনে তার স্ত্রীর কোনো বিষয়ে অবাধ্যতা জনিত অসন্তুষ্টি ছিল ; ফলে তিনি তালাক দিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামার কন্যা তা বুঝতে পেরে বললেন, আপনি আমাকে তালাক দিবেন না। এর বিনিময়ে আমার পক্ষ থেকে কিছু সম্পদ গ্রহণ করুন। তিনি তালাক না দিয়ে তা গ্রহণ করে নিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী ১৬১/৩/৫, ইবনে কাছীর : ৫৬৩/১, বাহরে মুহীত : ৩৭৯, কুরতুবী : ৩৮৪/৫]

ইবনে জারীর মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত আবুস সায়েব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী : ১৬১/৩/৫]

(১২৯) قوله وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে জারীর আবূ মুলাইকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ অপেক্ষাকৃত অন্যান্য বিবিগণ থেকে তাঁকে অধিক ভালোবাসতেন। তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ সকল বিবিগণের মাঝে সমতা রাখতেন। অতঃপর বলতেন, হে আল্লাহ! এত আমার বণ্টন, আমি যাতে ক্ষমতাবান রয়েছি। পক্ষান্তরে যে কাজ তোমার কর্তৃত্বে রয়েছে, কিন্তু আমার কর্তৃত্বাধীন নেই, অর্থাৎ, অন্তরে মুহাব্বত, সে সম্পর্কে আমাকে ভর্ৎসনা করো না। রাসূল ﷺ-এর এ দোয়া করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মাআনী : ১৬৩/৩/৫, ইবনে কাছীর : ৫৬৪/১]

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় পথনির্দেশ : وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ ... وَاسِعًا حَكِيمًا অত্র তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দাম্পত্য জীবনে এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথনির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পত্তিকেই যার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা, যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত কলহ-বিবাদ তথা হানাহানি পর্যন্ত পৌছে দেয়। কুরআনে পাক নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণিকে এমন এক সার্থক জীবন ব্যবস্থা বাতলে দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক জীবন সুখময় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর অনুসরণে পারস্পরিক তিক্ততা ও মর্ম-পীড়া, ভালোবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যদি অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক ও সৌজন্যমূলক পন্থায়, যেন তার পিছনে শত্রুতা, বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে।

১২৮তম আয়াতটি এমনি সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসেবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করে। যেমন, একজন সুদর্শন, সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা অথবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না, অন্যদিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়।

অত্র আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে এ ধরনের কতিপয় ঘটনা তাফসীরে মাযহারী প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে কুরআনে পাকের সাধারণ নীতি فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ -অর্থাৎ, উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোনো আশ্রয় না থাকার কারণে, বিবাহ বিচ্ছেদ অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য মহর বা খোর-পোষের ন্যায্য দাবি আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাবে। দায়দায়িত্ব ও ব্যয় ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়তো এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে।

কুরআনে কারীমের অত্র আয়াতে এ ধরনের সমঝোতার সম্ভাব্যতার প্রতি পথ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ। অর্থাৎ, প্রত্যেক অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে।" কাজেই স্ত্রী হয়তো মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরদবাদ হবে, অথবা অন্যত্র আমার জীবন আরো দুর্বিসহ হতে পারে। তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই লাভজনক। স্বামী হয়তো মনে করবে যে, দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? অতএব, এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে। সাথে সাথে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

"যদি কোনো নারী স্বামীর পক্ষ থেকে কলহ-বিবাদ বা বিমুখ হওয়ার আশঙ্কা বোধ করে, তবে উভয়ের কারোই গুনাহ হবে না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হয়। এখানে গুনাহ না হওয়ার কথা বলার

কারণ এই যে, ব্যাপারটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘুষের আদান-প্রদানের মতো মনে হয়। কারণ স্বামীকে মোহরানা ইত্যাদির ন্যায্য দাবি হতে অব্যাহতির প্রলোভন দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখা হয়েছে। কিন্তু কুরআন পাকের এ ভাষ্যের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বস্তুতঃ এটা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং উভয় পক্ষ কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার ব্যাপার। অতএব, এটা সম্পূর্ণ জায়েজ।

দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় : তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, أَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কোনো সমঝোতা করে নিবে। এখানে بَيْنَهُمَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহ বা সন্ধি-সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোনো তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না; বরং তাদের নিজেদেরকে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কারণ তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অন্য লোকের গোচরীভূত হয়, যা তাদের উভয়ের জন্য লজ্জাকর ও স্বার্থের পরিপন্থি। তদুপরি তৃতীয় পক্ষের কারণ সন্ধি-সমঝোতা দুষ্কর হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। অত্র আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَإِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

অর্থাৎ, "আর যদি তোমরা কল্যাণ সাধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।" এখানে বুঝানো হয়েছে যে, অনিবার্য কারণ বশতঃ স্বামীর অন্তরে যদি স্ত্রীর প্রতি কোনো আকর্ষণ না থাকে এবং তার ন্যায্য অধিকার পূরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায়, তবে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীকে সে অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমঝোতা করাও জায়েজ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি সংযম ও আল্লাহভীতির পরিচয় দেয়, স্ত্রীর সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্কেচ্ছেদ না করে; বরং তার যাবতীয় অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে, তবে তার এই ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ওয়াকিফহাল রয়েছেন। অতএব, তিনি এহেন ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতা ও মহানুভবতার এমন প্রতিদান দিবেন, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এখানে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিদান কি দিবেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এর প্রতিদান হলো কল্পনার উর্ধ্বে, ধারণার অতীত।

মোটকথা, কুরআন পাক উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব-অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনতঃ অধিকার দিয়েছে। অপর দিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র আয়ত্ব করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহবিচ্ছেদ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা কর্তব্য; বরং উভয়ের পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার। এখানে এই উক্তিটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বুঝানো হয়েছে আল্লাহর স্বচ্ছলতা, প্রাচুর্য ও তাঁর দরবারের অভাবহীনতা। দ্বিতীয়বার বুঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ তা'আলার কোনোই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহ পাকের অপার রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহভীতি ও আনুগত্য করো, তবে তিনি তোমাদের সর্ব কাজে সহায়তা করবেন, রহমত বর্ষণ করবে, এবং অনায়াসে তা সুস্পন্ন করে দিবেন।

তৃতীয় আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অপরিসীম ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সব কিছু পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম। অবাধ্যদের পরবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে সক্ষম। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনির্ভরতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অবাধ্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

خَافَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ . و . ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে আশঙ্কা করেছে।

أُحْضِرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِحْضَارُ মূলবর্ণ (ح . ض . ر) জিনস صحيح অর্থ– তাকে হারিজ করা হলো।

لَاتَمِيْلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَيْلُ মূলবর্ণ (م . ى . ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা ঝুঁকে পড় না।

تَذَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و . ذ . ر) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা ছেড়ে রাখবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

অনুবাদ : (১৩৫) হে ঈমানদারগণ! [আদান প্রদানে ও মীমাংসায়] ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত [এবং স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্যকালে] আল্লাহর উদ্দেশ্যে [সত্য] সাক্ষ্য প্রদানকারী থাক, যদিও তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সেই ব্যক্তি [যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হবে] চাই ধনী হোক কিংবা গরিব হোক উভয়ের সাথেই আল্লাহর সমধিক সম্বন্ধ রয়েছে। সুতরাং তোমরা [এই সাক্ষ্য প্রদানে] প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, এই জন্য যে, ন্যায় বিচ্যুতি হয়ে পড়বে, আর যদি তোমরা বর্ণনায় বক্রতা অবলম্বন কর কিংবা [সাক্ষ্য প্রদানে] পশ্চাৎপদ হও, তবে [স্মরণ রেখ] নিশ্চয়, আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

(১৩৬) হে ঈমানদারগণ! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি স্বীয় রাসূলের প্রতি নাজিল করেছেন এবং ঐ কিতাবসমূহের প্রতি যা অতীতে [অন্যান্য নবীদের প্রতি] নাজিল করা হয়েছে, আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলাকে এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে এবং তাঁর কিতাবসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে এবং কিয়ামত দিবসকে, তবে তো সে ভ্রষ্টতায় বহু দূরে সরে পড়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৫) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক شُهَدَآءَ لِلّٰهِ [এবং স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্যকালে] আল্লাহর উদ্দেশ্যে [সত্য] সাক্ষ্য প্রদানকারী হও وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ যদিও তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয় اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ অথবা পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের। اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا সেই ব্যক্তি [যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হবে] চাই ধনী হোক কিংবা গরিব হোক فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا উভয়ের সাথেই আল্লাহর সমধিক সম্বন্ধ রয়েছে فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى সুতরাং তোমরা [এই সাক্ষ্য প্রদানে] প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। اَنْ تَعْدِلُوْا এই জন্য যে, ন্যায় বিচ্যুতি হয়ে পড়বে। وَاِنْ تَلْوٗۤا আর যদি তোমরা বর্ণনায় বক্রতা অবলম্বন কর। اَوْ تُعْرِضُوْا কিংবা [সাক্ষ্য প্রদানে] পশ্চাৎপদ হও, তবে [স্মরণ রেখ] فَاِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয়, আল্লাহ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

(১৩৬) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا হে ঈমানদারগণ! اٰمِنُوْا বিশ্বাস স্থাপন কর بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি স্বীয় রাসূলের প্রতি নাজিল করেছেন وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ এবং ঐ কিতাবসমূহের প্রতি যা অতীতে [অন্যান্য নবীদের প্রতি] নাজিল করা হয়েছে وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলাকে وَمَلٰٓئِكَتِهٖ এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে وَكُتُبِهٖ এবং তাঁর কিতাবসমূহকে وَرُسُلِهٖ এবং তাঁর রাসূলগণকে وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এবং কিয়ামত দিবসকে। فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا তবে তো সে ভ্রষ্টতায় বহু দূরে সরে পড়েছে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا (١٣٧)

অনুবাদ : (১৩৭) নিশ্চয় যারা মুসলমান হয়েছে, অতঃপর কাফের হয়ে গেছে, তৎপর মূসলমান হয়েছে পুনঃ কাফের হয়ে গেছে, অতঃপর [মৃত্যু পর্যন্ত] কুফরিতে অগ্রসর হয়ে চলছে– আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না এবং পথও প্রদর্শন করবেন না।

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (١٣٨)

(১৩৮) মুনাফিকদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا (١٣٩)

(১৩৯) যাদের অবস্থা এই যে, মুসলমানদেরকে ত্যাগ করে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, এরা কি তাদের নিকট সম্মানিত হয়ে থাকতে চায়? বস্তুতঃ সমস্ত সম্মান আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا (١٤٠)

(১৪০) আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, যখন [কোনো মজলিসে] শুনতে পাও যে, আল্লাহর বিধানসমূহের প্রতি উপহাস ও কুফরি করা হচ্ছে, তখন তাদের নিকট বসো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অন্য কোনো আলোচনা আরম্ভ করে, অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে, নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফের সকলকেই দোজখের মধ্যে একত্র করবেন।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৩৭) إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নিশ্চয় যারা মুসলমান হয়েছে। ثُمَّ كَفَرُوْا অতঃপর কাফের হয়ে গেছে। ثُمَّ اٰمَنُوْا তৎপর মুসলমান হয়েছে। ثُمَّ كَفَرُوْا পুনঃ কাফের হয়ে গেছে। ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا অতঃপর [মৃত্যু পর্যন্ত] কুফরিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে– لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا এবং পথও প্রদর্শন করবেন না।

(১৩৮) بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ মুনাফিকদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا তাদের জন্য ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(১৩৯) الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ যাদের অবস্থা এই যে, কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদেরকে ত্যাগ করে اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ এরা কি তাদের নিকট সম্মানিত হয়ে থাকতে চায় فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا বস্তুতঃ সমস্ত সম্মান আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে।

(১৪০) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ আর আল্লাহ তা'আলা কিতাবে তোমাদের নিকট এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ যখন [কোনো মজলিসে] শুনতে পাও যে اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا আল্লাহর বিধানসমূহের প্রতি উপহাস ও কুফরি করা হচ্ছে فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ তখন তাদের নিকট বসো না حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অন্য কোনো আলোচনা আরম্ভ করে اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফের সকলকেই দোজখের মধ্যে একত্র করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৩৫) قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে জারীর সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, উপরোল্লিখিত আয়াত রাসূল ﷺ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ধনাঢ্য ও গরিব দুজন পুরুষ তারা দুজনের মধ্যকার কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে এক মকদ্দমা পেশ করে। রাসূল ﷺ স্বভাবত দরিদ্রের দিকেই ধাবিত ছিলেন। কারণ রাসূল ﷺ-এর দৃষ্টি কোনো গরিব ধনী ব্যক্তির উপর জুলুম করতে পারে না। তখন আল্লাহ তা'আলা সাক্ষীর ভিত্তিতে ধনী গরিবের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ করেন। ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশপ্রদান সম্বলিত বিধানসহ আল্লাহ তা'আলা উপরোল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী : ১৬৯/৫/৩]

(১৩৬) قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ছা'লাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ বিন সালাম এবং কা'আবের দুপুত্র আসাদ ও উসাইদ সালাম বিন কায়েস, সালাম, আব্দুল্লাহ বিন সালামের ভাগিনা সালাম বিন ইয়ামীন, প্রমুখ তারা সম্মিলিতভাবে রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার প্রতি, কিতাবের প্রতি, মূসা ও তাওরাতের প্রতি এবং উযাইরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তাছাড়া অন্য সকল কিতাব ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করি না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল মুহাম্মদ ﷺএবং তাঁর পূর্ববর্তী সকল কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তখন তারা বলল, আমরা এমন করব না। তখন উল্লিখিত ঈমানদারগণ এবং রাসূল ﷺ -এর পারস্পরিক মতবিনিময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী : ৩৮৭/৩৫/ ফাতহুল কাদীর : ৫২৫/১]

قوله يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ الخ দুনিয়ার বুকে নবী প্রেরণ ও কিতাব নাজিলের উদ্দেশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং এটাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি।

সূরা নিসার এই আয়াতে সব মুসলমানকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপর অটল থাকতে এবং সত্য সাক্ষ্যদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই বিষয় প্রসঙ্গে সূরা মায়েদা ও সূরা হাদীদে দু'খানি আয়াত রয়েছে। সূরা মায়েদার আয়াতের বিষয়বস্তু এমনকি শব্দাবলিও প্রায় অভিন্ন সূরা হাদীদের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আদম (আ.)-কে প্রতিনিধিরূপে দুনিয়ায় পাঠানো, অতঃপর একের পর এক নবী প্রেরণ এবং শতাধিক সহীফা ও আসমানি কিতাব নাজিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার বুকে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নসিহত, তা'লিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে যেসব অবাধ্য লোককে সত্য ও ন্যায়ের পথে আনা যাবে না, তাদেরকে প্রশাসনিক আইন অনুসারে উপযুক্ত শাস্তি দান করে সৎপথে আসতে বাধ্য করা হবে।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও তার উপর অবিচল থাকা শুধু সরকার ও বিচার বিভাগেরই বিশেষ দায়িত্ব নয়; বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সে নিজে ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকে এবং অন্যকেও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অবশ্যই ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি পর্যায় সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব তা হচ্ছে দুষ্ট ও অবাধ্য লোকেরা যখন ন্যায়নীতিকে পদদলিত করবে নিজেরা তো ন্যায়-নীতির ধার ধারবেই না; বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকতে দিবে না; তখন অন্যদেরকে দমন করার জন্য আইনের শাসন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকার ও কর্তৃপক্ষই ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বের মূর্খ জনগণ তো দূরের কথা, শিক্ষিত সুধীরাও মনে করেন যে, ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা শুধু সরকার ও আদালতেরই দায়িত্ব; এ ব্যাপারে জনগণের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। এহেন ভ্রান্ত ধারণার কারণেই বিশ্বের সব দেশে সব রাজ্যে সরকার ও জনগণ দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশের জনগণ সরকারের কাছে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি দাবি করে, কিন্তু নিজেরা কখনো ন্যায়-নীতি পালন করতে প্রস্তুত নয়। এই কুফল আজ সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। আইন-কানুন নিষ্ক্রিয় ও অপরাধ প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। আজকাল সব দেশেই আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ রয়েছে। এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আর তার

সদস্য মনোনয়নের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সারা দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যাচ্ছে। অতঃপর নির্বাচিত সদস্যগণ দেশবাসীর মন-মানসিকতা, আবেগ-অনুভূতি ও দেশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আইন প্রণয়ন করছেন। তারপর জনমত যাচাই করার জন্য তার প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং জনসমর্থন লাভের পর তা প্রবর্তন করা হয়। আর সেটা কার্যকরী করার জন্য সরকারের প্রশাসনযন্ত্র সচল হয়ে উঠে যার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন দেশের সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। দেশের শান্তিশৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য তারা সক্রিয় কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এত বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও প্রচলিত তন্ত্র-মন্ত্রের মোহমুক্ত হয়ে, তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঠিকাদারদের অন্ধ অনুকরণের উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ফলাফল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক।

আল্লাহভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্ব শান্তির চাবিকাঠি : সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি চলমান সমাজের প্রথা ও রীতিনীতির বন্ধন ছিন্ন করে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রাসূলে আরাবী ﷺ-এর আনীত পয়গাম সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, শুধু আইন ও দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি; বরং ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না। একমাত্র আল্লাহভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। যার ফলে রাজা-প্রজা, শাসক ও শাসিত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব উপলব্ধি করতে, তা যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জনসাধারণ এ কথা বলে দায়িত্ব এড়াতে পারে না যে, এটা সরকারের কাজ। কুরআন মাজীদের পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এক বৈপ্লবিক বিশ্বাসের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আয়াতত্রয়ের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অটল-অনড় থাকা এবং অন্যকেও অটল রাখার চেষ্টা করার জন্য শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আয়াতসমূহের শেষ দিকে এমন এক তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানুষের ধ্যান-ধারণা ও প্রেরণার জগতে মহা-বিপ্লবের সূচনা করতে পারে। তা হলো আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম ক্ষমতা ও পরাক্রম, তার সম্মুখে উপস্থিতি ও জবাবদিহী এবং প্রতিদান ও প্রতিফল লাভের বিশ্বাস। এটা এমন এক সম্পদ যার দৌলতে আজ থেকে সাতশত বছর পূর্ববর্তী অশিক্ষিত বিশ্বাসী লোকেরা ও বিপুল শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করতো এবং যার অভাবের কারণেই আজকের মহাশূন্যের অভিযাত্রী, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী উন্নত বিশ্ববাসীরা শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূজারি ও তন্ত্র-মন্ত্রের অন্ধ অনুসারীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে তারা হয়তো মহাশূন্যে আরোহণ করতে, গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ভেসে বেড়াতে এবং মহাসাগর পাড়ি দিতে পারবে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কারখানা, উপাদান-উপকরণ প্রচেষ্টা ও মূখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ, সুখ-শান্তিও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথাও পাবে না। কোনো অত্যাধুনিক আবিষ্কারের মাঝে কিংবা কোনো গ্রহ-উপগ্রহেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না; বরং পাওয়া যাবে একমাত্র রাসূলে আরাবী ﷺ-এর পয়গাম ও শিক্ষার মধ্যে, আল্লাহ ভীতি ও আখেরাতের বিশ্বাসের মধ্যে। ইরশাদ হয়েছে। أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ, মনে রেখ, একমাত্র আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই অন্তরসমূহের প্রশান্তি নিহিত। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত কুদরত ও কল্পনাতীত সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে ভাস্বর করে চলছে, যার সামনে মানুষ তার অক্ষমতা ও অযোগ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু অনুভূতিশীল অন্তর ও অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ না হলে তাতেই বা কি লাভ।

কুরআন হাকীম একদিকে পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেছে, অপরদিকে এমন এক অপূর্ব নীতিমালা ঘোষণা করেছে– যাকে পুরোপুরি গ্রহণ ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করা হলে, জুলুম ও অনাচাররে জর্জরিত দুনিয়া সুখ-শান্তির আধারে পরিণত হবে। আখেরাতে জান্নাত লাভের পূর্বে দুনিয়াতেই জান্নাতী সুখের নমুনা উপভোগ করা যাবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا কারো মতে অত্র আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আর অনেকের মতে আয়াতটিতে ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা প্রথমে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল তারপর গো-বৎসের পূজা করে কাফের হয়েছিল, অতঃপর তওবা করে আবার ঈমান এনেছিল, পুনরায় হযরত ঈসা (আ.) কে অস্বীকার করে কুফরির চরমে উপনীত হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, বার বার কুফরির মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে তওবা করার ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কুরআন হাদীসের অকাট্য দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যত বড় কট্টর কাফের বা মুরতাদই হোক না কেন, যদি সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে পূর্ববর্তী সমুদয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অতএব, বার বার কুফরি করার পরও যদি তারা সত্যিকারভাবে তওবা বরে, তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার আইন উন্মুক্ত রয়েছে।

এখানে প্রথম আয়াতে মুনাফিকদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তবে এহেন দুঃসংবাদকে بَشِّرِ অর্থাৎ 'সু-সংবাদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোনো সু-সংবাদ শুনার জন্য প্রত্যেকেই উদগ্রীব থাকে। কিন্তু মুনাফিকদের জন্য এছাড়া আর কোনো সংবাদ নেই; বরং তাদের জন্য সু-সংবাদের পরিবর্তে এটাই একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী।

মানবমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সমীপে কামনা করা বাঞ্ছনীয় : দ্বিতীয় আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে এ ধরনের আচরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সতকর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করতঃ একেও অযথা-অবান্তর প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ, "তারা কি ওদের কাছে গিয়ে ইজ্জত-সম্মান লাভ করতে চায়? তবে ইজ্জত-সম্মান তো সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারাধীন।"

কাফের মুশরিকদের সাথে সৌহার্দ ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং অন্তরঙ্গ মেলামেশার প্রধান কারণ এই যে, ওদের বাহ্যিক মান-মর্যাদা, শক্তি সামর্থ্য, ধনবলে প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে করে যে, ওদের সাহায্য-সহযোগিতায় আমাদেরও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, তারা এমন লোকদের সাহায্যে মার্যাদাবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছে, যাদের নিজেদেরই সত্যিকার কোনো মর্যাদা নেই। তাছাড়া যে ব্যক্তি ও বিজয়ের মধ্যে সত্যিকার ইজ্জত ও সম্মান নিহিত, তাতো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারভুক্ত। অন্য কারো মধ্যে যখন কোনো ক্ষমতা বা সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা সবই আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব, মান-মর্যাদা দানকারী মালিককে অসন্তুষ্ট করে তাঁর শত্রুদের থেকে ইজ্জত হাসিল করার অপচেষ্টা কতো বড় বোকামী।

এ সম্পর্কে সূরায়ে মুনাফিকূন'– এ ইরশাদ হয়েছে : وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ, ইজ্জত-সম্মান একমাত্র আল্লাহ, রাসূল এবং ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফিকরা তা অবগত নয়। এখানে আল্লাহ তা'আলার সাথে হযরত রাসূল ﷺ ও মুমিনদের উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা আংশিক মর্যাদা দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগত, পছন্দনীয় ও প্রিয়পাত্র, তাই তিনি তাঁদেরকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফের ও মুশরিকদের ভাগ্যে সত্যিকার কোনো ইজ্জত নেই। অতএব, তাদের সাথে সৌহার্দের সম্পর্ক স্থাপন করে সম্মান অর্জন করা সুদূর পরাহত। ফারূকে আযম হযরত ওমর (রা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি বান্দাদের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার বাসনা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করেন।

হযরত আবূ বকর জাসসাস (র.) 'আহকামুল কুরআনে' লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই যে, কাফের, মুশরিক, পাপিষ্ঠ ও পথভ্রষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করা অন্যায় ও অপরাধ। তবে এই উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষেধ করা হয়নি। কেননা সূরা মুনাফিকুনের পূর্বোক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ-কে ও মুমিনদেরকে ইজ্জত দান করেছেন।

এখানে মর্যাদার অর্থ যদি আখেরাতের চিরস্থায়ী ইজ্জত-সম্মান হয়, তবে তা আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তাঁর রাসূল ﷺ ও মুমিনদের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কারণ আখেরাতের আরাম আয়েশ, ইজ্জত-সম্মান কোনো কাফের বা মুশরিক কস্মিনকালেও লাভ করবে না। আর যদি এখানে পার্থিব মান-মর্যাদা ধরা হয়, তবে মুসলমানরা যতদিন সত্যিকার মুমিন থাকবে, ততদিন সম্মান ও প্রতিপত্তি তাদেরই করায়ত্ত্ব থাকবে। অবশ্য তাদের ঈমানের দুর্বলতা, আমলের গাফলতি বা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের সাময়িক ভাগ্যবিপর্যয় হলে বা ঘটনাচক্রে অসহায় হলেও পরিশেষে তারাই আবার মর্যাদা ও বিজয়ের গৌরব লাভ করবে। দুনিয়ার ইতিহাসে এর বহু নজির রয়েছে। শেষ যুগে হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে মুসলমানরা আবার যখন সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হবে, তখন তারাই দুনিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ; অত্র আয়াতে ইতঃপূর্বে মক্কা মোকাররমায় অবতীর্ণ সূরা আন'আমের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে, আমি তো মানুষের সংশোধনের নিমিত্ত আগেই হুকুম নাজিল করেছিলাম যে, কাফের ও বদকারের ধারে কাছেও বসবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কপটাচারী মুনাফিকরা আদেশ লঙ্ঘন করে ওদের সাথে সৌহার্দ স্থাপন করতে শুরু করেছে এবং তাদেরকে ইজ্জত-সম্মানের মালিক মোখতার মনে করেছে।

সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াত এবং সূরায়ে আন'আমের যে আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এতদুভয়ের সমন্বিত মর্ম এই যে, যদি কোনো প্রভাবে কতিপয় লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার কোনো আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে, তবে যতক্ষণ তারা এহেন গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কার্যে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তাদের মজলিসে বসা বা যোগদান করা মুসলমানদের জন্য হারাম।

মোটকথা, বাতিল পন্থিদের মজলিসে উপস্থিতি ও তার হুকুম কয়েক প্রকার। প্রথমতঃ তাদের কুফরি চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি সহকারে যোগদান করা। এটা মারাত্মক অপরাধ ও কুফরি। দ্বিতীয়তঃ গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন করা। এটা অত্যন্ত অন্যায় ও ফাসেকী। তৃতীয়তঃ পার্থিব প্রয়োজনবশতঃ বিরক্তি সহকারে বসা জায়েজ। চতুর্থতঃ জোর-জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার্হ। পঞ্চমত : তাদেরকে সৎপথে আনয়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া ছওয়াবের কাজ।

কুফরির প্রতি মৌন সম্মতিও কুফরি : আলোচ্য আয়াতের শেষে ইরশাদ হয়েছে : إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ অর্থাৎ, এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও আহকামকে অস্বীকার, বিদ্রূপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও তাদের গুনাহের অংশীদার হবে। অর্থাৎ আল্লাহ না করুন, তোমরা যদি তাদের কুফরি কথাবার্তা মনে প্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুতঃ তোমরাও কাফের হয়ে যাবে। কেননা কুফরিকে পছন্দ করাও কুফরি। আর যদি তাদের কথা বার্তা পছন্দ না করা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে উঠা বসা কর এমতাবস্থায় তাদের সমতুল্য হওয়ার অর্থ হবে তারা যেভাবে শরিয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা তাদের আসরে যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতোই ইসলামের ক্ষতি সাধন করছ। (না'উযুবিল্লাহি মিন যালিকা।)

শব্দের বিশ্লেষণ :

اَلْهَوٰى : শব্দটি একবচন, বহুবচন اهواء। অর্থ– খাহেশ, প্রবৃত্তি।

تَلْوٗا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَللَّىُّ মূলবর্ণ (ل . و . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– তোমরা মুড়িয়ে দাও।

يُسْتَهْزَأُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع مجهول বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه . ز . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তাকে বিদ্রূপ করা হবে।

يَخُوْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَوْضُ মূলবর্ণ (خ . و . ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা লিপ্ত হবে।

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)

অনুবাদ : (১৪১) তারা [মুনাফিকরা] এরূপ যে, তোমাদের প্রতি বিপদ আসার প্রতীক্ষায় থাকে, অনন্তর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় হয়ে যায়, তখন তারা বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না! [আমরা কি গনিমতের মাল পাব না?] আর যদি কাফেররা [বিজয়ের] কোনো অংশ পায়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদের উপর বিজয়ী হচ্ছিলাম না? এবং আমরা কি [সুযোগ দিয়ে] তোমাদেরকে মুসলমানগণ হতে রক্ষা করিনি? [কাজেই আমাদেরকেও অংশ দাও;] সুতরাং আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন [কার্যকরী] মীমাংসা করে দিবেন, আর [ঐ মীমাংসায়] আল্লাহ তা'আলা কখনো কাফেরদেরকে মুসলমানদের মোকাবিলায় জয়ী করবেন না।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (١٤٢)

(১৪২) নিশ্চয় মুনাফিকরা প্রতারণা করে আল্লাহর সাথে, অথচ আল্লাহ এই প্রতারণার প্রতিফল তাদেরকে প্রদান করবেন, আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায়, তখন নিতান্ত অলসতার সাথে দাঁড়ায়, শুধু লোকদেরকে দেখায় এবং আল্লাহর জিকির [মুখে]-ও করে না কিন্তু খুবই কম।

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٤٣)

(১৪৩) লটকানো অবস্থায় আছে [মুমিন ও কাফের] উভয়ের মধ্যস্থলে, না এদিকে না ওদিকে, আর আল্লাহ যাকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেন, এরূপ লোকের জন্য কোনো পথ পাবে না।

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪১) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ তারা [মুনাফিকরা] এরূপ যে, তোমাদের প্রতি বিপদ আসার প্রতীক্ষায় থাকে فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ অনন্তর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় হয়ে যায় قَالُوا তখন তারা বলে أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না! [আমরা কি গনিমতের মাল পাব না?] وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ আর যদি কাফেররা [বিজয়ের] কোনো অংশ পায় قَالُوا তবে বলে أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ আমরা কি তোমাদের উপর বিজয়ী হচ্ছিলাম না? وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ এবং আমরা কি [সুযোগ দিয়ে] তোমাদেরকে মুসলমানগণ হতে রক্ষা করিনি? [কাজেই আমাদেরকেও অংশ দাও;] فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ সুতরাং আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন [কার্যকরী] মীমাংসা করে দিবেন وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا আর [ঐ মীমাংসায়] আল্লাহ তা'আলা কখনো কাফেরদেরকে মুসলমানদের মোকাবিলায় জয়ী করবেন না।

(১৪২) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ নিশ্চয় মুনাফিকরা يُخَادِعُونَ اللَّهَ প্রতারণা করে আল্লাহর সাথে وَهُوَ خَادِعُهُمْ অথচ আল্লাহ এই প্রতারণার প্রতিফল তাদেরকে প্রদান করবেন وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় قَامُوا كُسَالَىٰ তখন নিতান্ত অলসতার সাথে দাঁড়ায় يُرَاءُونَ النَّاسَ শুধু লোকদেরকে দেখায় وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ এবং আল্লাহর জিকির [মুখে]-ও করে না إِلَّا قَلِيلًا কিন্তু খুবই কম।

(১৪৩) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ লটকানো অবস্থায় আছে [মুমিন ও কাফের] উভয়ের মধ্যস্থলে لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ না এদিকে না ওদিকে وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ আর আল্লাহ যাকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেন فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا এরূপ লোকের জন্য কোনো পথ পাবে না।

অনুবাদ	আয়াত
অনুবাদ : (১৪৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদেরকে ত্যাগ করে [মুনাফিক কিংবা প্রকাশ্য] কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি [তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে] এরূপও চাও যে, নিজেদের [দোষী হওয়ার] উপর আল্লাহর স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে নাও?	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (١٤٤)
(১৪৫) নিশ্চয় মুনাফিকরা দোজখের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে, এবং তুমি কখনো তাদের কোনো সাহায্যকারী পাবে না।	اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا (١٤٥)
(১৪৬) কিন্তু যারা তওবা করে নেয় এবং সংশোধন করে নেয় এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে এবং স্বীয় দীন [-এর আমল]-কে খালেছ আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে, তবে এসমস্ত লোক মুমিনদের সঙ্গে থাকবে, আর আল্লাহ মুমিনদেরকে মহান পুরস্কার প্রদান করবেন।	اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا (١٤٦)
(১৪৭) আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করে কি করবেন? [কেননা, তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানের উপর আল্লাহর কোনো কাজ আটকে রয়নি।] যদি তোমরা শোকরগুজারী কর এবং ঈমান আন, আর আল্লাহ অত্যন্ত গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী।	مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا (١٤٧)

শাব্দিক অনুবাদ

(১৪৪) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ! لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ তোমরা [মুনাফিক কিংবা প্রকাশ্য] কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদেরকে ত্যাগ করে اَتُرِيْدُوْنَ তোমরা কি [তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে] এরূপও চাও যে اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا নিজেদের [দোষী হওয়ার] উপর আল্লাহর স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে নাও?

(১৪৫) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ নিশ্চয় মুনাফিকরা فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ দোজখের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে। وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا এবং তুমি কখনো তাদের কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

(১৪৬) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا কিন্তু যারা তওবা করে নেয় وَاَصْلَحُوْا এবং সংশোধন করে নেয় وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ এবং স্বীয় দীন [-এর আমল]-কে খালেছ আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ তবে এসমস্ত লোক মুমিনদের সঙ্গে থাকবে وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا আর আল্লাহ মুমিনদেরকে মহান পুরস্কার প্রদান করবেন।

(১৪৭) مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করে কি করবেন? [কেননা তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানের উপর আল্লাহর কোনো কাজ আটকে রয়নি।] اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ যদি তোমরা শোকরগুজারী কর এবং ঈমান আন وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا আর আল্লাহ অত্যন্ত গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(১৪২) قوله اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** জারীর, ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও আবূ আমের বিন নোমান সম্পর্কে এবং সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, মুনাফিকদের নামাজ আদায় করা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর : ৫৩০/১]

قوله اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** نفاق হলো "মুখ দিয়ে কল্যাণময় বিষয় প্রকাশ, আর অন্তরে অনিষ্ট গোপন রাখা।" নিফাক দু' প্রকার। যথা– ১. বিশ্বাসে কপটতা। এটা ব্যক্তিকে অনন্ত জীবন দোজখে থাকার ব্যবস্থা করে। ২. কর্মে কপটতা, তা মহাপাপ। কথার সাথে কাজের বৈপরীত্য হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলার নিকট চরম ঘৃণিত ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের অন্তরে কুফরি আকিদা-বিশ্বাস ও কুফরের প্রতি আস্থাশীলতা লুকিয়ে রেখে

বাহ্যত মৌখিক ইসলামের দাবি করেছিল। অথচ তারা আন্তরিকভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। বন্ধুবেশে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে গোপনীয় বিষয়সমূহ অবগত হয়ে তা কাফেরদের নিকট পৌঁছিয়ে দিত। প্রকাশ্য কাফেরদের তুলনায় এ বর্ণচোরা কাফেররা মুসলমানদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর শত্রু ছিল। ইসলামের পরিভাষায় এদেরকে মুনাফিক নামে অভিহিত করা হয়।

قوله يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ -এর ব্যাখ্যা : মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে, অথচ তারা নিজেরাই তাদের প্রতারিত করে। ধোঁকা দেওয়া যায় ঐ ব্যক্তিকে, যে ঐ বিষয়ে কিছু জানে না। আল্লাহ তা'আলা তো সব কিছু জানেন, কিভাবে তাঁকে ধোঁকা দেওয়া হয়? এর জবাবে আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার হুকুমসমূহের সাথে এমন ব্যবহার দেখায়, যেমন ধোঁকাবাজদের ব্যবহার হয়ে থাকে। তারা ধোঁকাবাজদের ন্যায় কাজ করে এভাবে যে, আমরা আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দিয়েছি এবং এতে আমাদের অনেক স্বার্থসিদ্ধি হয়। মোটকথা, মুনাফিকদের অনুসৃত কর্মনীতি যেহেতু প্রতারণার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছিল, সেহেতু তাদের কর্মবিচারে একে রূপক অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে প্রতারিত করা বলা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে প্রতারণা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, يَفْعَلُوْنَ مَا يَفْعَلُ الْمُخَادِعُ فَيُظْهِرُوْنَ الْاِيْمَانَ وَيُضْمِرُوْنَ نَقِيْضَهٗ অর্থাৎ, ধোঁকাবাজরা যে কাজ করে তারাও অনুরূপ কাজ করে, তারা বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করে কিন্তু এর বিপরীত জিনিস তথা কুফরি গোপন করে রাখে। এটা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজিরই নামান্তর। মূলত মুনাফিকদের অনুসৃত কর্মনীতি যেহেতু প্রতারণার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছিল সেহেতু তাদের কর্মবিচারে একে রূপক অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে প্রতারিত করা বলা হয়েছে।

অথবা, তারা আল্লাহকে প্রতারিত করছে এর অর্থ, তারা আল্লাহর নবীকে প্রতারিত করছে। আর নবীকে প্রতারিত করার অর্থই হলো আল্লাহকে প্রতারিত করা। কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে– اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ আসলে আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়া যায় না। তিনি সকল কিছু সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখেন।

قوله قَامُوْا كُسَالٰى -এর মর্মার্থ : একান্ত শিথিলভাবে [নামাজে] দাঁড়ায় তথা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামাজ আদায় করে। كُسَالٰى শব্দের অর্থ অলসতাসহকারে। كُسَالٰى -এর স্বরূপ উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা আলূসী (র.) বলেন–

كُسَالٰى اَىْ مُتَثَاقِلِيْنَ مُتَبَاطِئِيْنَ لَا نَشَاطَ لَهُمْ وَلَا رَغْبَةَ كَالْمُكْرَهِ عَلَى الْفِعْلِ لِاَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُوْنَ ثَوَابًا فِىْ فِعْلِهَا وَلَا عِقَابًا عَلٰى تَرْكِهَا

অর্থাৎ তারা মনমরা ঢিলেঢালা হয়ে নামাজে দাঁড়ায়। তাতে নেই কোনো প্রাণ-চঞ্চলতা আর নেই কোনো আগ্রহ। মনে হয় যেন খুব চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে আনা হয়েছে। আসলে এর কারণ হলো তারা এ কাজে কোনো পুণ্য হবে বলে বিশ্বাস করে না আর এটা পরিত্যাগ করলে শাস্তি হবে বলেও ভয় করে না। মূলত তারা বেকায়দায় পড়ে নামাজে এসে হাজির হয়েছে। কারণ যারা রীতিমতো নামাজ আদায় করে না, এমন ব্যক্তিগণ মহানবী ﷺ-এর সময় মুসলিম বলে গণ্য হতো না। এ কারণে বড় বড় ও শক্ত মুনাফিকদেরকেও এ সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য মসজিদে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হতে হতো। কেননা এটা ব্যতীত তারা মুসলিম জামাতে গণ্যই হতে পারত না। অতএব আজানধ্বনি যদিও তাদের মনের উপর পাথর বর্ষণ করত, তথাপিও মনের উপর জোর করেই তাদেরকে নামাজের জন্য উঠতে হতো। তাদের মসজিদের দিকে অগ্রসর হওয়ার গতি দেখে স্পষ্ট হয়ে যেত যে, তারা নিজেদেরকে টেনে মসজিদে আনছে।

قوله مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ -এর মর্মার্থ : দু'টি বিষয়ের মধ্যে দোদুল্যমান থাকা ব্যক্তিকে مُذَبْذَبْ বলা হয়। এটি মুনাফিকদের বাস্তব এবং প্রকৃত রূপ। কাফেরদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে, মু'মিনদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে। উভয় দল থেকে সুযোগ গ্রহণের চেষ্টায় মত্ত থাকে। যেহেতু সে মু'মিন, সেহেতু কাফের থেকে আলাদা। পক্ষান্তরে সে কাফের, অতএব সে মু'মিন নয়। এ কারণে بَيْنَ ذٰلِكَ বলা হয়েছে অর্থাৎ দু'দলের মধ্যখানে অবস্থান করা।

হাদীস শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ اِلٰى هٰذِهٖ وَاِلٰى هٰذِهٖ اُخْرٰى (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

مُذَبْذَبِيْنَ ও كُسَالٰى -এর মহল্লে ই'রাব : كُسَالٰى শব্দটি حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ -এর স্থানে রয়েছে। মূলবাক্য এরূপ হবে যে قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ كَاسِلِيْنَ আর مُذَبْذَبِيْنَ পদটি উহ্য ক্রিয়া হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ অবস্থায় আছে। উহ্য বাক্য এরূপ হবে– (مُتَرَدِّدِيْنَ) ذَبْذَبَهُمُ الشَّيْطَانُ بَيْنَ الْاِيْمَانِ وَالْكُفْرِ مُذَبْذَبِيْنَ

قوله اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য : যদি মুনাফিক উদ্দেশ্য হয়, তখন অর্থ হবে, হে বাহ্যত ঈমান প্রকাশকারীগণ! তোমরা প্রকৃত মুসলমানদের ত্যাগ করে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। এতে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির হয়ে যাবে। যদি اٰمَنُوْا দ্বারা মুসলমান বুঝায়, তখন كٰفِرِيْنَ দ্বারা মুনাফিক বুঝাবে। তখন অর্থ হবে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুসলমানদের পরিবর্তে মুনাফেকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না।

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব : কাফেরদের সাথে তিন প্রকার আচার-ব্যবহার হতে পারে–

১. مُوَالَاةٌ (মুওয়ালাত) অর্থাৎ বন্ধুত্ব,

২. مُدَارَاتٌ (মুদারাত) অর্থাৎ বাহ্যিক সদ্ব্যবহার, ৩. مُوَاسَاةٌ (মুওয়াসাত) বা ইহসান [উপকার করা]। উল্লিখিত ব্যবহারসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এই :

১. মুওয়ালাত কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

২. মুদারাত, এটা তিন অবস্থায় বৈধ– ক. ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য বাহ্যিক বন্ধুত্ব বৈধ। খ. ধর্মীয় মঙ্গল বিধানার্থে অর্থাৎ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে যদি তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়ার আশা থাকে, তবে বাহ্যিক সদ্ব্যবহার বৈধ। গ. মেহমান হিসেবে অভ্যর্থনা বৈধ।

৩. মুওয়াসাত বা ইহসান [উপকার করা]। হরবী কাফেরদের সাথে মুওয়াসাত অবৈধ, অন্যদের সাথে বৈধ।

মোটকথা, কাফেরদের মিথ্যা দীনকে ঈমানের সাথে ভালো মনে করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, তাদের আচার-আচরণকে ভালো জানা এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের সাহায্য-সহানুভূতি পাওয়া যাবে, এটা সম্পূর্ণ হারাম। তবে তাদের জুলুম-অত্যাচার হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, তাদের সাথে মিলে-মিশে চলাফেরা করা জায়েজ। পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্যও জায়েজ।

قوله اَلدَّرْكِ الْاَسْفَلِ -এর মর্মার্থ : اَلدَّرْكِ الْاَسْفَلِ অর্থ– সর্বনিম্নস্তর। দোজখের সাতটি স্তর রয়েছে –জাহান্নাম, লাযা, হুতামা, সাঈর, সাকার, জাহীম ও হাবিয়াহ। শেষ স্তর হাবিয়াতেই তারা অবস্থান করবে। এটি সর্বনিম্ন জাহান্নাম, শাস্তির দিক দিয়ে খুবই মারাত্মক হবে। হাদীস শরীফে রয়েছে–

عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ قَالَ اِنَّ فِى النَّارِ لَبِئْرًا لَمَّا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا بَعْدَ مُغْلَقِهَا مَا جَاءَ عَلٰى جَهَنَّمَ يَوْمٌ مُنْذُ خَلَقَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا يَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَرِّهَا وَهِيَ الدَّرْكُ الْاَسْفَلُ مِنَ النَّارِ ـ

উল্লেখ্য, দোজখের এ সাতটি স্তরের উপর সমভাবে 'জাহান্নাম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

قوله تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا -এর ব্যাখ্যা : تَوْبَةٌ -এর অর্থ– অন্যায় কাজ হতে ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা, অনুতপ্ত হওয়া। বান্দার পক্ষ হতে তওবার ধরন হলো, সকল পাপ কাজ হতে ফিরে থাকা। পাপ কাজ করে থাকলে ছেড়ে দিয়ে ভালো কাজের প্রতি মনোনিবেশ করা। আর যখন তওবার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার প্রতি করা হয়, তখন অর্থ হবে– বান্দাকে পাকড়াও করা থেকে বিরত থাকা, রহমত বর্ষণ করা এবং করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। আজাব না দেওয়া; বরং আজাব থেকে পরিত্রাণ দেওয়া।

আর اِصْلَاحٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– সংশোধন করা, সংস্কার করা। পারিভাষিক অর্থে تَوْبَةٌ হলো, মঙ্গলজনক ও কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসা অর্থাৎ প্রচলিত সকল অবৈধ এবং জাহিলি কর্মকাণ্ডকে মুছে ফেলে মঙ্গলজনক এবং বৈধ কাজে আত্মনিয়োগ করাই হচ্ছে اِصْلَاحٌ [সংশোধন করা]।

এবং اِعْتِصَامٌ অর্থ– কোনো কিছুকে দৃঢ়ভাবে ধারণা করা, অন্যায় থেকে বিরত থাকা। আয়াতে اِعْتِصَامٌ -এর অর্থ হচ্ছে, সকল প্রকার মুনাফেকী এবং কুকর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দেওয়া নীতি এবং কল্যাণমূলক কাজকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা– সকল ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা।

اِخْلَاصٌ অর্থ– ভেজালমুক্ত রাখা, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে কোনো কিছু করা। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন যেন, সকল কাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে হয়ে থাকে। এর সাথে কোনো স্বার্থ জড়িত না হয়।

শব্দের বিশ্লেষণ :

لَمْ نَسْتَحْوِذْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى جحد بلم در فعل مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْوَاذُ মূলবর্ণ (ح . و . ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা প্রবল ছিলাম না।

يُرَاءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مجهول معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاءَاةُ মূলবর্ণ (ر . ا . ى) জিনস মুরাক্কাব, مهموز عين و ناقص يائى অর্থ– তারা দেখায়।

مُذَبْذَبِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব بَعْثَرَ মাসদার اَلذَّبْذَبَةُ মূলবর্ণ (ذ . ب . ذ . ب) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– ভবঘুরে, সামনে যাবে না কি পিছনে যাবে, তা স্থির করতে পারে না।

اِعْتَصَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِصَامُ মূলবর্ণ (ع . ص . م) জিনস صحيح অর্থ– তারা আঁকড়ে ধরেছে।